কোথায় পাব তারে (২য় অংশ)
মন মেরামতের আশায়
হারায়ে সেই মানুষে

কালকূট
কালকূট
রচনা
রচনা
সমগ্র
সমগ্র

কালকূট রচনা সমগ্র

[তৃতীয় খণ্ড]

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত

boiRboi.net

মৌসুমী প্রকাশনী ।। কলকাতা-৯

প্রকাশকাল :
আশ্বিন, ১৩৮৩
সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ :
বৈশাখ, ১৩৮৫
মে, ১৯৭৮

প্রকাশক :
দেবকুমার বসু
মৌসুমী প্রকাশনী
১এ, কলেজ রো
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স প্রাঃ লিঃ
২৪৮ সি. আই. টি. রোড
কলকাতা-৫৪

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ :
গৌতম রায়

দাম : ত্রিশ টাকা

boiRboi.net

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা

কালকূটের 'হারায়ে সেই মানুষে' তাঁর অন্য এই-গোত্রের রচনা থেকে একটু আলাদা। দেশ থেকে দেশান্তরে তিনি পাড়ি দিয়েছেন—ডেকেছে তাঁকে পাহাড়, ডেকেছে সমুদ্র—নদী। গহনে অথবা গহীনে—জটিল অরণ্যে বা মানুষের মেলায় তিনি ছুটে গেছেন। পথ তাঁকে বারে বারে বাউলের একতারা বাজিয়ে ডাক দিয়েছে—তিনি অধীর পথপাগল পথিকের মতো ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন—আরেক চাবি দিয়ে খুলে দিয়েছেন আরেক দরজা। নিয়ে গেছেন আমাদের অন্য জগতে। কিন্তু সে সবই দেশ থেকে দেশ থেকে যাত্রা—এ-গাঁ থেকে ভিন-গাঁয়ে চলা। 'হারায়ে সেই মানুষে' সেদিক থেকে বলা যায় কাল থেকে হারিয়ে-যাওয়া-অন্য এক কালের দিকে যাত্রা। যেসব দিনগুলো দিগন্তে বিলীন হয়ে গেছে কতদিন আগে, অথচ কালকূটের কৈশোরকে ঘিরে যেসব দিনগুলি একদিন জোনাকির মতো জ্বলেছে, নিভেছে—'হারায়ে সেই মানুষে' গ্রন্থে সেই সব দিনগুলির আলো-ছায়ার ছবি মুদ্রিত হয়ে থাকল। বর্তমান ভূমিকালেখক একাধিকবার ব্যক্তি কালকূটকে অনুরোধ করেছে তার বিচিত্র শৈশব কথা—যা মৌখিক গল্পে শোনার সুযোগ ঘটেছে—তা লিখে ফেলার জন্য। সেই অনুরোধের ফলে নয়, তার নিজের ভিতরের তাগিদেই সে লিখেছে স্বনামে ও কালকূট-নামে কিছু রচনা। 'হারায়ে সেই মানুষে'—ভ্রমণ কাহিনী নয়—মনভ্রমণ কথা। মনে মনে বেড়াতে গেছেন নিজেরই জীবনের ফেলে আসা অংশে। পটভূমি এখানে পূর্ববঙ্গ—কালকূটের বাহন এখানে নদী খাল বিল। যেখানে, 'অকূল কালিয়া বিল কলকল ছলছল, ঢেউ ফণা তোলা। সেই বিলের এক কূলের দুস্তর ঢালু চর, নেমেছে গিয়ে শীতলক্ষ্যা নামে নদী-গহীনের বুকে।' বর্ণনা এখানে স্মৃতির রসে ডোবানো। স্মৃতি এখানে বর্ণনার নেশায় মজগুল। এ রচনা লেখকেরই আত্মজীবনীর অংশ। অনেক নাম বাস্তবের নামেই গ্রন্থে ঠাঁই পেয়েছে। লেখক বদলানোর প্রয়োজন মনে করেন নি। বর্ণনাভঙ্গীতে এসেছে একটা পৃথক স্বাদ। নদীর বুক ছেড়ে নৌকার মতো তরতর করে এগিয়ে যায়। জল, তট, আকাশ সব কিছু একসঙ্গে জড়িয়ে যায়। একটা স্বপ্নের মতো ভাসতে

থাকে হালকা দায়হীন দিনগুলি।

কালকূট চিরদিনই ঘর-পালানো ছেলে। 'বিদেশ' বলে তার কাছে কিছু নেই। 'বিভূঁই' বলে কিছু সে মানে না।' চিরদিন সে চেয়েছে ভেসে পড়তে। তার তালুইমশায়ের ভাষা নকল করেই আমাদের বলতে ইচ্ছে করে—'সে আপনার বেগে ভাসিতে ভাসিতে বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার বেগ বাহিরে স্তিমিত হইয়াছে, ভিতরে বাড়িয়াছে।' এই বেড়ে ওঠাকে রোধ করতে পারে এমন কিছু আমার জানা নেই। যে কিশোরটির বেড়ে ওঠার ছবি এই বইয়ের মূল কথা, লেখক অযথা তার মনঃসমীক্ষণের চেষ্টা করেন নি। ছেলেটি জলের বুকে ভাসমান পদ্মপাতার মতো। কোনো অপরাধ বা পাপ বোধ তার বুকে দাগ কাটে না। মূল্যো দিয়ে কাছিমের মাংস খাওয়া এবং গোপালের কাছ থেকে নিয়ে সিগারেট খাওয়া—সমস্তই প্রথম নতুন কাজ করতে পারার আমোদে ভরপুর। এরকম কিশোর-চিত্র বর্তমান বাংলা সাহিত্যে বিরল। ইন্দ্রনাথ বা অপু পড়ার পরে এই চরিত্র-চিত্র পাঠককে ভিন্ন স্বাদ এনে দেয়।

এই সংকলনের হ্রস্বতম লেখাটিতে পটভূমি আবার পাল্টেছে। 'হারায়ে সেই মানুষে' যেমন বাংলার পূর্ব প্রান্ত ফুটে উঠল, 'মন মেরামতের আশায়' রচনাটিতে তেমনি বর্ণিত হল পশ্চিম বাংলার পশ্চিম প্রান্তের একটি বিশেষ গ্রাম। তার একদা-গ্রামজীবনের যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন, সেখানে মানুষদের নতুন সমস্যা, নতুন নেশা, নেশার ব্যবসা, এ রচনার উপাদান যুগিয়েছে। 'হারায়ে সেই মানুষে' গ্রন্থে যেমন নদী, স্রোত এবং আলোর প্রাধান্য, শিশুমনটিও সেখানে যেমন জলের মতো—কিছুই সেখানে স্থায়ী দাগ কাটে না—কিন্তু সবকিছুই রঙেলা জলছবির মতো চেপে বসে যায়—আলোচ্য 'মন মেরামতের আশায়' রচনাটির রসাস্বাদ তা থেকে ভিন্ন। বন্ধুর ম্লান মৃত্তিকা, রুক্ষ পরিবেশ কালকূটের পরিণত অভিজ্ঞতার যোগানদার। এখানে আর তিনি পূর্বোক্ত গ্রন্থের মতো স্মৃতিচারী নন, এখানে প্রত্যক্ষের মুখোমুখি হয়ে তিনি এঁকেছেন এক অসাধারণ অভিজ্ঞতার ছবি। এই লেখাটি কালকূটের সবচেয়ে বস্তুধর্মী লেখা। মন এখানে হালকা হবার অবকাশ পায় না বললেই হয়। 'কোথায় পাবো তারে'-র সঙ্গে এবার তৃতীয় খণ্ডে থাকল এই দুই ভিন্ন জাতের, ভিন্ন স্বাদের রচনা। 'কোথায় পাবো তারে'-র ভাষায় এক আপনভোলা উদাসী পথিকের অনাসক্ত অনুরাগের স্পর্শ। 'হারায়ে সেই মানুষে'-র ভাষায় অত খুশিয়াল ছলছলানির মধ্যেও কোথায় যেন লেগে আছে একটা বিষণ্ণতার ছোঁয়া। স্মৃতি মাত্রেই বুঝি কিছুটা বিষণ্ণতা সঞ্চারিণী—তা সুখেরই হোক, আর দুঃখের হোক। 'মন মেরামতের আশায়' রচনাটি ভাষার দিক থেকেও আলাদা ছাঁদের। এখানে পাওয়া যাবে গল্পলেখকের ভাষার গতিবেগ। অল্পের ভিতর দিয়ে বৃহৎকে ব্যঞ্জিত করার প্রবণতা। কাহিনীর শেষটিও ছোট গল্পের রীতি প্রকরণকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮৭, অরবিন্দ রোড
নৈহাটী
২৪ পরগণা

boiRboi.net

সূচীপত্র

কোথায় পাবো তারে (দ্বিতীয়াংশ)	১
মন মেরামতের আশায়	৩২৫
হারায়ে সেই মানুষে	৩৪৫
বর্তমান খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয়	৩৯৬

boiRboi.net

www.boiRboi.net

কোথায় পাবো তারে

[দ্বিতীয় খণ্ডের পর]

সুষি জিজ্ঞেস করেছিল, 'সেই তখন বেরিয়ে—এতক্ষণ এখানেই ছিলেন?'

বলেছিলাম, 'না, মৌলীক্ষার মাঠে গিয়েছিলাম।'

বলতে গিয়ে মনে পড়েছিল ধনুর কথা। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ধনু বাড়ি গেছে?'

সুষি ওর কালো চোখে অবাক ঝিলিক হেনে বলেছিল, 'না। কেন বলুন তো?'

ধনুর কথায় সবাই শশব্যস্ত। বলেছিলাম, 'না, তাকে মাঠে দেখেছিলাম কিনা।'

তবুও সুষি চোখ সরাতে দেরি করছিল। শুধু আমার মুখের ওপর চোখ রাখেনি। আমার চোখ দিয়ে মনেতে ডুব দিতে চেয়েছিল। জানতাম, ধনুর ব্যাপার বলেই। সুষি মুখে চোখ রেখে খোঁজ করছিল, কোনো অঘটনের ছায়া সেখানে পড়েছে কি না।

অঘটন না, তবে সেই তাড়ির জালা শেষ করে ধনু যদি বাড়ি ফিরে থাকে, তা হলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়াতে পারে, সেই ভয়ের কথাটাই, ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম সুষিকে।

সুষি হেসেছিল খিলখিলিয়ে। বলেছিল, 'তাই ভালো। আমি ভাবছি, অন্য কিছু নাকি। ও যে তাড়ি খায়, সে কথা সবাই জানে। তবে জ্যাঠার সামনে আসবে না। বাড়িতেও ঢুকবে না।'

'তবে খাবে কোথায়?'

সুষি নির্বিকার হেসে বলেছিল, 'সে কথাও ধনুই বলতে পারে। হয়তো যাদের সঙ্গে তাড়ি খাচ্ছে, তাদের সঙ্গেই একটা ব্যবস্থা হবে।'

তা বটে। ধনুকে যা দেখেছিলাম, তার পক্ষে সেটা খুব আশ্চর্যের না। কিন্তু আর একটা কথা মনের মধ্যে দপদপিয়ে উঠেছিল। সুষিকে জিজ্ঞেস করব কি না ভাবছিলাম, সেই কিশোরীটি কে, ধনুর গালে যে থাপ্পড় মারতে পারে।

কিন্তু তার আগে সুষিই জিজ্ঞেস করেছিল, 'আর কাউকে দেখলেন ওর সঙ্গে?'

'আর কেউ মানে?'

সুষি একটু ঠোঁট টিপে হেসেছিল। অন্যদিকে চেয়ে বলেছিল, 'কোনো মেয়ে-টেয়ে?'

বলে চোখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিল আমার দিকে। কিন্তু আমি জবাব দেবার আগেই, সুষি হঠাৎ নিজের মনেই হেসে উঠে, মুখে আঁচল চেপেছিল। আমি দেখেছিলাম, সেই হাসিতে যেন চপেটাঘাত আর বালিকা-রহস্যের ইঙ্গিত আছে।

অবাক হয়ে চেয়েছিলাম সুষির দিকে। এই কি অবাক কাণ্ড দেখ হে, তার কথায় চপেটাঘাত আর বালিকা-রহস্যের যে ইঙ্গিতই থাক, তা বলে কি ধনুর সঙ্গে মাঠে-ঘাটে মেয়ের দেখাও মিলতে পারে। সে কথা জিজ্ঞেস করবার আগেই ঠেক। সুষি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে আঁচল নামিয়ে নিয়েছিল মুখ থেকে। যেন ঝটিতি সহবতে,

মেয়ে একেবারে কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্রপাত।

চোখ তুলে সামনে তাকিয়ে দেখেছিলাম দীর্ঘদেহ প্রৌঢ় ব্যক্তি। খালি গা, খালি পা, সামান্য খাটো ধুতি, গলায় উপবীত। চক্ষে দৃষ্টি তীক্ষ্ন, ঈষৎ আরক্ত। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কুথা গেল্ছিলি র‍্যা?'

সুষি যেন শঙ্কিত সম্ভ্রমে ভয়-পাওয়া বিহঙ্গী। বলেছিল, 'দিনদাদের বাড়ি।'

পরবর্তী প্রশ্ন, আওয়াজ উঠেছিল গম্ভীর গোঙানো গলায়, 'ইটি কে?'

সুষি তেমনি করেই জবাব দিয়েছিল, 'জ্যাঠার সঙ্গে এসেছেন, জ্যাঠা যেখানে চাকরি করেন সেখান থেকে। দিনদাদের বাড়ি গেছলেন, ডাকতে গেছলাম।'

'অ।'

অস্ফুট মোটা একটি শব্দ মাত্র। তারপরে ভিন্‌দেশীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত। সুষি আমার দিকে ফিরে বলেছিল, 'বড় পিসেমশাই।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে পায়ের ধুলো নিয়েছিলাম। সেই শান্ত বজ্রস্বরে আবার আওয়াজ উঠেছিল, 'থাক বাবা থাক, জয়স্তু। পরে দেখা হবে। অ সুষি, আমাদিগের ঘর লিয়ে যাস্ ক্যানে একবারটি।'

'যাবো।'

গোরা ব্রাহ্মণ তখন অগ্রগামী। আর কোনো কথা বলেননি। সুষি বলেছিল, 'আপনি যাঁদের বাড়ি এসেছেন, সে বাড়ির বড় জামাই উনি। খুব রাশভারী লোক।'

বলবার দরকার ছিল না। দেখে-শুনেই মালুম হয়েছিল। কেবল রাশভারী কেন, তার চেয়ে বেশী। মহাদেবের মতো আচ্ছন্ন গম্ভীর, কিন্তু রুদ্র হয়ে উঠতে যাঁর সময় লাগে না। বলেছিলাম, 'তুমি যেন ভয় পেয়ে গেছ।'

সুষি বলেছিল, 'সবাই পায়। আপনার সঙ্গে হেসে কথা বলতে বলতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। যদি কিছু বলে উঠতেন। বাবা রে, ওঁকে ভীষণ ভয় পাই।'

তা বটে! সোমত্থ মেয়্যা, আন্‌কা পুরুষের সঙ্গে হেসে কথা বুলতে বুলতে যাবে কী হে! হায়া বুলে কিছু নাই না কী। তবে কিনা, রাঙা ভুঁয়ে রাঙা রাঙা পা দু'খানি ফেলে চলে যাওয়া খালি-গা ব্রাহ্মণটিকে দেখে মনে কেমন সম্ভ্রমের উদয় হয়েছিল। কিন্তু উত্থাপিত প্রসঙ্গ আবার ঢেউ দিয়েছিল।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ধনুর সঙ্গে মেয়েরা কি মাঠেও যায় নাকি?'

সুষির কালো মুখে আবার হাসির ঝলক লেগেছিল। যে হাসি লজ্জা দিয়ে রাঙানো। বলেছিল, 'মেয়েরা নয়, একজন।'

বলেছিলাম, 'পুকুরের ধারে যেখানে সে বসল, সেখানেও তো দু'জন মেয়ে ছিল।'

'না, না, তারা না। গাঁয়ের মেয়ে।'

মনে তখন আমার রহস্যের রঙ। ভেবেছিলাম, টিপে দেখি না। বলেছিলাম, 'ও! বছর পনের ষোল বয়সের মেয়ে কী?'

সুষির ডাগর চোখ দু'টি প্রায় গোল হয়ে উঠেছিল। গলায় তরাস দিয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওইরকম, চোদ্দ-পনেরর বেশী না।'

হুম্! হদিসের কপাট খুলেছিল। তাই আর একটু চাড় দিয়েছিলাম, 'রঙটা ফরসা, শাড়ি পরা, দেখতে-শুনতে মন্দ না!'

শুনে সুষি দাঁড়িয়ে পড়েছিল প্রায়। সেই তরাসী গলায় বলেছিল, 'হ্যাঁ। ধনুর সঙ্গে মাঠে দেখেছেন নাকি?'

সুষির চোখে পলক পড়েনি। মুখ-ভরা বিস্ময়। একটু যদি বা ভয়, কিন্তু ঈর্ষা একবিন্দু না। হাসি চেপে বলেছিলাম, 'দেখেছি। তবে মাঠে না।'

'কোথায় তবে?'

সুষি তখন আমার মুখে রহস্য দেখছিল। বলেছিলাম, 'সকালবেলা দেখেছিলাম সেই দোতলার ঘরের পেছনে।'

সুষি কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারেনি। কিন্তু ইতিমধ্যেই তার ভয়-তরাসী চোখের কূলে হাসির বান চুঁইয়ে আসছিল। আমি ঘরের পিছনের দৃশ্য বর্ণনা করেছিলাম। সুষি হেসে বাঁচেনি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'সেই মেয়ের কথাই জিজ্ঞেস করছ বোধ হয়।'

তখন আবার সুষির ভারি লজ্জা। বলেছিল, 'হ্যাঁ। ওর নাম তৃপ্তি। খুব সুন্দর না দেখতে?'

সে কথা স্বীকার করতেই হয়েছিল, তৃপ্তি রূপসী। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ধনুর গালে যে চাঁটি মারতে পারে সে কি আবার তার সঙ্গে মাঠে-ঘাটেও যেতে পারে?'

সুষি ঘাড় দুলিয়ে বলেছিল, 'পারে। তিপুর মতো মেয়ে পারে।'

'ওই মারের পরেও?'

'হ্যাঁ। ধনুও কি ওকে ছেড়ে কথা বলে নাকি। ধনু মারে না?'

না, অই গ, ওহে প্রেমের দেবতা, অমন মারন-ধরন প্রেম-কথা তখন ইস্তক শোনা ছিল না। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'দুজনেই মারামারি করে নাকি?'

সুষি বলেছিল, 'ধনুই মারে বেশী। তখন নিশ্চয় ধনু কোনো বাজে কথা বলেছিল, তাই—।'

কথা শেষ করেনি সুষি। অ-বলা ইঙ্গিতের লজ্জায় গলায় ঠেক লেগেছিল। তবু না জিজ্ঞেস করে পারিনি, 'তৃপ্তি কাদের বাড়ির মেয়ে?'

আমরা তখন একটা পথের বাঁকে। একটি আধ-কাঁচা আধ-পাকা ইঁটের দেওয়ালের ঘরের পাশে মাটির ঘরে মেশামেশি এমনি বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে সুষি বলেছিল, 'ওই বাঁড়ুজ্জেদের বাড়ির মেয়ে।' বলে সুষি আমার দিকে তাকিয়ে আবার একটু হেসেছিল। বলেছিল, 'ধনু মারুক ধরুক যাই করুক, দেখবেন তিপু আবার ঘুরে-ফিরে ঠিক ওর কাছে যাবে।'

বটে! সে যে একেবারে পাকা প্রেম, জবর ভিতের গাঁথনি। কিন্তু গ্রামের মধ্যে এমন অনাচার! চ্যাঙড়া-চেঙড়িকে শাসন করার কেউ ছিল না নাকি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেউ কিছু বলে না ওদের?'

সুষি জিব কেটে চোখ বড় করেছিল, 'ওমা, বলবে কী। কেউ কিছু জানে নাকি!'

'তুমি তো জানো দেখছি।'

'ওমা, আমি তো লুকিয়ে জানি।'

তাও তো বটে। প্রেমের খবর আবার জানাজানি করে জানা হয় নাকি। সুষি আবার বলেছিল, 'আমি যে জানি তা ওরা জানে না।'

তা-ই বা ওরা জানবে কী করে। ওদের তা জানতে নেই। তবে, দু'টিকেই যেমন ভয়ডরহীন ডাকা-ডাকিনী মনে হয়েছিল, জানাজানি হলেও যে তাদের কিছু আসে-যায়, তেমন মনে হয়নি। তা ছাড়া, ধনু তো আগেই আমার কাছে ঘোষণা করেছিল, বিয়েটা সে এই গ্রামেই করবে। তারপরে আর কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু যতই আমি দু'জনের কথা ভেবেছিলাম, ততই যেন এক হাসির ঝরা কুলকুলিয়ে যাচ্ছিল আমার ভিতরে।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ওদের কি বিয়ে হবে নাকি?'

সুষি বলেছিল, 'ধনু তো তাই পণ করে বসে আছে।'

'বলেছে নাকি?'

'সবাইকেই। ধনুর তো কিছু রাখ-ঢাক নেই। নিজের পিসা-পিসীকেও বলেছে,

তিপনুকে ও বিয়ে করবে।' বলে সুষি আমার দিকে তাকিয়েছিল। তারপরে, সুষি কেন হেসে উঠেছিল তা জানি না। তার সঙ্গে আমিও কেন, তাও বুঝতে পারিনি।

কিন্তু মিছা বলো না হে। একেবারে কি বুঝতে পারনি? পেরেছিলে। বুঝতে পেরেছিলে, হাসির কারণ আর কিছু না। মনেতে কেমন একটা বাদ্যি ঝনঝনিয়ে উঠেছিল। তা-ই হাসি।

ইতিমধ্যে আমরা পুজো-দালানের উঠোনে এসে পড়েছিলাম। দেখেছিলাম, সাঁওতাল প্রজাদের সংখ্যা আরো বেড়েছে। সেই সঙ্গে অজা, বলির পশু। তাই কাঁঠালপাতার ছড়াছড়ি। তবে প্রজারা কেউ একলা আসেনি। সকলেই সপরিবারে। শিশুরা কেউ তাদের কোলে, কেউ মায়ের পাশে শুয়ে নিদ্রামগ্ন। নয়তো কালো মেয়ের খোলা বুকে শিশুর অঝোর অমৃতপান। সকলেরই চোখে যেন এক অলৌকিক দৃষ্টি। সবাই দেখছিল প্রতিমা রঙ-করা। যতটুকু দেখে গিয়েছিলাম, রঙ তার থেকে তখন বেশী লেগেছিল। কালীর পায়ের তলায় মহাদেবের গায়ে খড়িগোলা মাখানো হয়েছিল। প্রতিমার কালো রঙে ঝলক দিয়েছিল। ছিন্নমুণ্ডের নাক মুখ চোখে লেগেছিল রঙ। উঠোনে আরো দেখেছিলাম, ঢাকের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। একটা জায়গা সাদা-কালো পালকের বাঁকানো শিখায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

বাড়ির মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতে বড় রায়। স্নান-শেষে গামছা পরে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। দেখেই বলেছিলেন, 'ইস্ দেখ দিকি, বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, এখনো চান-খাওয়ার দেখা নেই। যাও, যাও বাবা, তাড়াতাড়ি একটু মাথায় জল দিয়ে এসো।'

সকালের খাবার সময় শুনেছিলাম ভিন্ন কথা। খেতে নাকি অনেক বেলা হবে। এখন আবার অন্য কথা। অনেক নাকি দেরি হয়ে গিয়েছে। তবে রাঙা হাসিটুকু মুখে ছিল ঠিক। আবার বলেছিলেন, 'চাটুয্যেমশাই ধরে রেখেছিলেন বুঝি?'

জবাব দিয়েছিল সুষি, 'আমি না গেলে ছাড়তেন না।'

'অই বলে কে, পাগল মানুষ।'

সুষি আবার বলেছিল, 'কাল দুপুরে ওঁকে ওঁদের বাড়িতে খাবার কথা বলেছেন!'

বড় রায়ের ভুরু কুঁচকে উঠেছিল। আওয়াজ দিয়েছিলেন, 'কী?'

তখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বড় গিন্নী। তিনি বলে উঠেছিলেন, 'আ দূর, তাই কি হয় নাকি। আজ রাতে পুজো, কাল ঘরে আমার কত কী। কাল কি পরের বাড়িতে খেতে দিতে পারি। ঠাকুর-জামাই যেন কী।'

বড় রায় রাঙা মুখখানি ঢেউ খেলিয়ে বলেছিলেন, 'অ গ, না, না, চাটুয্যেমশায়ের খেয়াল নাই। তুমি যাও, যাও বাবা, চান করে এসো। সুষি, ওকে জল দে মা তাড়াতাড়ি।'

আমি জামাকাপড় ছেড়ে স্নানের সরঞ্জাম আনতে যাচ্ছিলাম ওপরে। কিন্তু ঠেক লেগেছিল জল এনে দেবার কথায়। তা-ই সরে গিয়ে সুষিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তোমরা চান করো কোথায়?'

'কাঁদরে, উত্তরের কাঁদরে।'

'আমিও সেখানেই যাবো।'

'না, না।'

সুষির কথা শুনিনি আর। চলে গিয়েছিলাম ওপরে। নীচে এসে দেখেছিলাম, সুষি দাওয়ায় দাঁড়িয়ে। বাড়িটাকে দেখে মনে হয়েছিল, আরো লোক বেড়েছে। আরো ব্যস্ততা, আরো কণ্ঠস্বরের ভিড়। সুষিকে বলেছিলাম, 'বাড়ির ছেলেদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। চাকর-বাকর কেউ থাকলে একটু কাঁদরের রাস্তাটা—।'

সুষি বলেছিল, 'সত্যি কাঁদরেই যাবেন? শরীর খারাপ করবে না?'

বলেছিলাম, 'দেখা যাক।'

'তা হলে চলুন, আমিই নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু—।'

সুষি কথা শেষ না করে দাওয়া থেকে নেমে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসেছিল। বলেছিল, 'জ্যাঠা বকলে আমি কিছু জানি না।'

বচনেই বোঝা যাচ্ছিল, সুষি অনেক সহজ হয়েছে। বলেছিলাম, 'না হয় আমিই জানাব। কিন্তু এত বেলায় জল টানাটানি চলে না।'

'তার চেয়ে এতটা হেঁটে কাঁদরে যাওয়া ভালো।'

বলে বাড়ির পিছন দিক দিয়ে এক নতুন রাস্তায় যেতে যেতে সুষি হেসেছিল খিলখিলিয়ে। আর তখনই একটি ঘর দেখিয়ে বলেছিল, 'আমরা এ ঘরে থাকি।'

ঘরের কাছে তালগাছ, তার পাশে এক নিম। সেই ছায়াতে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক বিধবা। আমাকে দেখেই ঘোমটা একটু টেনে দিয়েছিলেন, বয়সে যদিও প্রৌঢ়া। তবে কিনা, বয়স বলে তো কথা না। কথা হলো স্বজাত আর প্রথা নিয়ে।

সুষি আমাকে ঘর দেখিয়ে সেই মহিলাকে বলেছিল, 'মা, কাঁদর থেকে আসছি। তুমি উপোসের শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না। একটু শুয়ে থাকো গে।'

সুষির মা তাঁর থানের ঘোমটার আড়াল থেকে একবার আমাকে দেখেছিলেন। আমি চলতে চলতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'উপোস কেন?'

সুষি বলেছিল, 'অমাবস্যা পড়েছে বেলা বারোটার পর। তা ছাড়া পুজোপাটের দিন মা খায় না।'

বলে সুষি একবার ফিরে তাকিয়েছিল মায়ের দিকে। এমন কিছু অভিনব দৃশ্য নয়। তবু সেই যে সুষি কালো মেয়েটি, এলো চুলে আলগা খোঁপা, ডাগর চোখ, স্বাস্থ্যবতী, চলনে এক স্বভাব-প্রকৃতির ছন্দ, বলনে হাস্যময়ী ব্রীড়া, থাকে এক কোন্ ঠাঁই নিরালা ঘরে, যেখানে আরো ভাইবোন আছে, আর ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকেন বিধবা মা, সব মিলিয়ে কী যেন এক সুর বেজে যায়। সেই যে এক গান শোনা ছিল, "আমি কাঁদন ভরা হাসি হেসেছি" তেমনি মনে হয়েছিল। কেন যে অমন মনে হয়েছিল, তা জানি না।

'কুথা চললে গ সুষি দিদি?'

দেখেছিলাম দেওয়ালে ফাটল-ধরা মাটির ঘরের সামনে এক মেয়ে। রুক্ষু চুল, একবেড়ে খাটো শাড়ি পরা, কষ্টিপাথরে কাটা এক মূর্তি। পাথর যেমন ভাঙে, টুকরো হয়, কিন্তু নম্রতা জানে না, সেই মতো। এ সেই যুবতী না, যাকে দেখেছিলাম ঢোকবার পথে, কাঁদরের পাথরের ওপর। এ আর একজন, যার চোখ ঢুলুঢুলু, গা টিসটিস। মেটে সিঁদুরের দাগ তার রুক্ষু চুলের সিঁথায়। জিজ্ঞাসা সুষি দিদিকে, ঢুলুঢুলু নজরখানি বিদেশীর চোখে চোখে।

সুষি বলেছিল, 'কাঁদরে।'

চোখের মণি ঘুরিয়ে পুছ করেছিল, 'ইটো?'

'বড় তরফের অতিথি।'

'তুমি নাওয়াতে লিয়ে যেইছ?'

'কাঁদর দেখাতে যাচ্ছি।'

'অই। তাই তো বুইলছি।'

বললে কী হবে গ কালিন্দী মেয়্যা, তুমার লজরে যে আন্ কথা দেখি। সুষি যেন কোপ জানত না, কটাক্ষও না। বলেছিল, 'খোয়ারি কাটেনি বুঝি তোর।'

ততক্ষণে আমরা একটু এগিয়ে গিয়েছিলাম। হাসির ঝরায় জবাব এসেছিল, 'অই গ, কাটে নাই। কত্তার ইচ্ছায় কম্মো দ্যাখ ক্যানে, লোকের তো এখনো হুঁশ নাই,

খসে পড়ে রয়েছে।'

তখন সুষির আর এক মূর্তি। ঘাড় ফিরিয়ে কটাক্ষ করে হেসেছিল। বলেছিল, 'আজ রাত্রে আবার পুজো। তোদের দু'টোর কি মরণ নেই?'

জবাবে শুধু হাসির আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। যেন বেলোয়ারি চুড়ি ঝনঝনানো হাসি। সুষি আমার দিকে ফিরে বলেছিল, 'বাউরি। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই কী মদ যে খায়, বাবা বাবা!'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, নিজেরাই ঘরে তৈরি করে। কাল রাত্রে তো কী মাতলামি দু'জনে। যত মারামারি করে, তত হাসাহাসি করে। আর কান্নাকাটিও তত।'

শুধু হাসি, শুধু কান্না, শুধু বিবাদ না। সব মিলিয়ে একাকার। তা নইলে আর মাতলামি কিসের। আর সে মাতলামি দেখে যে সুষিরা বেশ মজা পায়, ব্যঞ্জনাতে সেই কথা। সুষি আরো বলেছিল, 'কালীপুজো আসবার আগেই সব ক্ষেপে ওঠে। আজ যে কী করবে, দেখবেন।'

দেখব, দেখতেই তো গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন পথের ওপর পাথর ছড়াছড়ি। অতিথিকে সাবধানে চলতে হচ্ছিল। মৃত্তিকা ঢালুতে গড়িয়ে যাচ্ছিল। কোথাও কাঁকর বিছানো রক্তভূমি, কোথাও দূর্বা-ছাওয়া সবুজ। মাঝে মাঝে আম-কাঁঠাল, তাল-তেঁতুলের ছায়া। কলসী কাঁখে ভেজা কাপড়ের ঘোমটা শালীনতায় ঢাকা হয়ে গিয়েছিল বউ-ঝিয়েরা। গামছা-পরা পুরুষেরা। তার মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ ঠিকই ছিল, 'ইটো কে?' তবে কাঁদরে তখন ভিড় কম।

কাঁদরের ওপারে পাথুরে ভূঁই যেন ঘাড় উঁচিয়ে উঠেছিল। শাল-তালের ছায়ায় ঢাকা মৃত্তিকা আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। মাঝখানে কাঁদর, একটু বাঁয়ে বেঁকে ডাইনের মোড়ে অদৃশ্য হয়েছিল। নীল জল ছলছল কলকলিয়ে ধারায় বইছিল। স্বচ্ছ জলের নিচে পাথরের নুড়ি আর বেলেমাটি পরিস্কার দেখা যাচ্ছিল।

অমন জলে অবগাহন হয় না, শয়নে স্নান হয়েছিল। কোমরের বেশী জল ছিল না। কিন্তু ঠাণ্ডা আর মিষ্টি স্বাদ। হাত দিয়ে ছিটিয়ে ছিটিয়ে মেখেছিলাম। স্রোতের টানে নিজেকে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম বড় পাথরের ঠেক দিয়ে। দেখে সুষি হেসেছিল পাড়ে দাঁড়িয়ে।

জল থেকে যখন উঠেছিলাম তখন আমার সর্বাঙ্গ জুড়ে এক শীতল শান্তি। জলে মধু ছিল কিনা জানি না, মাদকের নেশা লেগেছিল যেন। বাড়ি ফিরে গিয়ে বড় রায় আর ছোট রায়ের সঙ্গে খেয়ে সেই যে শুয়েছিলাম আর কোনো হুঁশ ছিল না। যখন হুঁশ হয়েছিল, তখন গভীর অন্ধকার। কেবল মোটা দরাজ গলায় কোথা থেকে যেন গান ভেসে আসছিল—

'অ মা, বাজবে গ মহেশের হৃদে
আর লাচিস না গ ক্ষ্যাপা মাগী।
মরে নাই দেব বেঁচ্যা আছে
বগে রইছে মহাযগী,
আর লাচিস না গ ক্ষ্যাপা মাগী।'

সুরেতে রামপ্রসাদী, কথায় কিঞ্চিৎ ভিন্নতর। ক্ষণিকের বিভ্রম লেগেছিল ঘোর অন্ধকারে। বুঝতে পারিনি কোথায় আছি। কোন্ দুনিয়ায়, কোন্ সংসারে, কালাকালের কোন্ সীমায়। তখনো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম—

'যা দেখি তুর চরণের জোর
লাচলে শিবের ভাঙবে পাঁজর
অ গ মা, বিষখেকো দেব লয় হে সজোর
তু লেগে উয়ার মন বিবাগী।'...

সেই চেতনহীন অন্ধকার বিভ্রমে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল কালো প্রতিমা। কিন্তু স্থান কাল কিছুই মনে পড়েনি। সেই মুহূর্তেই আমার নাকে এক তিক্ত টক রসের গন্ধ লেগেছিল। হাত সরাতে গিয়ে হঠাৎ কিসের সঙ্গে ঠেকেছিল। কালো কুচকুচে অন্ধকারে আমার কেমন গা ছমছমিয়ে উঠেছিল। হাত বাড়িয়ে আর একটু দেখে মনে হয়েছিল, শায়িত এক মানুষের শরীর। সর্বাঙ্গে তার জামাকাপড় জড়ানো। তখনই এক অস্পষ্ট পায়ের শব্দ, নাকি অস্ফুট এক ঝনাৎকার, কী যেন শুনেছিলাম। তারপরেই অস্পষ্ট ডাক, 'ধনুদা, এই ধনুদা!'

ডাক শেষ হতে না হতেই আলোর রেশ পড়েছিল মাটির দেওয়ালে। সুষির গলা আমি শুনতে পেয়েছিলাম, 'ওখানে কে রে?'

জবাব বাজেনি। আবার প্রশ্ন, 'কে ওখানে?'

তখন জবাব বেজেছিল, 'আমি তিপু।'

তৃপ্তি! অই গ, কী বুলব হে, আমার পাশে তবে ধনুবাবু শুয়েছিলেন এসে। তাই অমন তিক্ত টক রসের গন্ধ! তাই অন্ধকারে চুপি চুপি তিপুর আবির্ভাব। আমি মলুটিতে রয়েছি। সেইদিন কালীপুজো। ভাবতে ভাবতেই বাতি হাতে উঠে এসেছিল সুষি। আর বাইরে গানের শব্দ ডুবিয়ে হঠাৎ একবার ঢাক বেজে উঠেছিল।

কী পালার কোন্ দৃশ্য যে ঘটতে যাচ্ছিল, তেমন আন্দাজ করতে পারিনি। অন্ধকারে মঞ্চসজ্জা, পাত্রপাত্রীর অবস্থান অনুমান করতে পারছিলাম। কাল—রাত্রি। স্থান—মাটির ঘরের দ্বিতল। সেথায় পাত্র আমি বসা, ধনু শোয়া, নিশ্চিত নেশা ও নিদ্রায় অচৈতন্য। সিঁড়ির কাছে কোথাও তৃপ্তি। নিচে থেকে আগমন ঘটছিল সুষির। কেবল, একবার ঢাক বেজে ওঠার শব্দে আমার মনটা দুরদুরিয়ে উঠেছিল। নিশাযোগে কালীপুজো দেখা বুঝি হারাই।

বাতি যত এগিয়ে এসেছিল সুষির হাতে, দেখেছিলাম, এক মূর্তি সিঁড়ির ধারে। সরু সিঁড়ি, দু'জনাতে পাশাপাশি কুলায় না। সুষি বলেছিল, 'এখানে দাঁড়িয়ে কেন, ঘরে ঢোক। আমাকে উঠতে দে।'

তৃপ্তি ঘরে ঢুকে পাশ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। হ্যারিকেন হাতে উঠে এসেছিল সুষি। সুষির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ওর ঠোঁটের কোণে দেখেছিলাম হাসির টিপুনি। চোখেতে তারই ঝলক, তার মধ্যেই একটু আড়চোখে দেখে নেওয়া তিপুকে। যেন সুষির নিজের দেখা না, আমাকে দেখানো।

দেখেছিলাম। সে নায়িকা যে চোখের তৃপ্তি, সন্দেহ ছিল না। তার চেয়ে বলো, নয়নসুখ। বরং বলতে ইচ্ছা করেছিল, গোরোচনা গোরী নবীনা কিশোরী। একেবারে পাকা কুমোরের হাতে গড়া প্রতিমামুখ। পুজোর উৎসবের সাজ গায়ে। লাল শাড়ি লাল জামা। আটপৌরে ধরনে না, পোশাকী চালের ফেত্তা ছিল শাড়িতে। উৎসবের সাজ কি না! সামনে থেকে টেনে আঁচড়ানো চুলে খোঁপা বাঁধা, তাতে ঝুমকা রুপোর কাঁটা। কপালে খয়েরী রঙের টিপ। তার ওপরে টুকুস হিমানী পাউডার পড়েনি, তা বলতে পারবে না। ডাগর চোখ দুটিতে কাজল মাখায়, আরো যেন ডাগর লেগেছিল। পায়ে যে কেবল আলতা পরেছিল, তা না। নতুন চামড়ার গন্ধ পেতে পারো, এমন নয়া রুপালী রঙের স্যান্ডেল পরেছিল। পুজোর উৎসবের সাজ কি না!

সব মিলিয়ে, এ সব বলতে পারো, চোখের তৃপ্তি। সেই সঙ্গে আরো ছিল, গন্ধ

তৃপ্তি। কী সৌগন্ধ যে মেখে এসেছিল মেয়ে, ঘরে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

দেখেশুনে তারপরে ধনুর দিকে নজর না পড়ে যায়নি। শ্রীমানের রূপের রুচির প্রশংসা না করে উপায় ছিল না। কিন্তু হায়, মুখপোড়া, 'উমা ত্যাজে ভাঙ খেয়ে, সাপ জড়িয়ে রইলি পড়ে।' ধনুর তখন সেই দশা। আই কী বুইলব হে, জলচুড়িপাড় কাঁচি-ধুতির কোঁচার পত্তন আধখানা ধুলায় পড়ে। সিলিকের পাঞ্জাবির দশা দেখলে জন্তুতেও কাঁদত। কুঁচকে দলা পাকিয়ে, গোটা গায়ে যেন লেপটে ছিল। হাত-পা এলোপাথাড়ি ছড়ানো। অঘোর ঘুমের গাঢ় নিশ্বাস।

বলতে যত সময়, দেখতে তত লাগেনি। একবার এদিক, একবার ওদিক করতেই, সুষি বলেছিল, 'ক'বার এসে দেখে গেছি। আপনি খুব ঘুমোচ্ছেন, তাই আর ডাকিনি।'

আমি সুষির দিকে তাকিয়েছিলাম। তার চোখমুখে যে কেবল হাসি চাপবার ঝলকানি, তা না। কিছু ল্যাজে লাজানো ভাবও ছিল। সুষি একটু লজ্জায়ও পড়েছিল। আমি বলেছিলাম, 'ডাকলেই পারতে। এখন কত রাত?'

সুষি বলেছিল, 'রাত কোথায়! একটু আগেই সন্ধ্যাবাতি দেখানো হয়েছে।'

যাক, পূজা হারাইনি। নিদ্রা কেবল গত রাত্রি জাগরণের মাসুল আদায় করেছিল। সুষি আবার বলেছিল, 'জেঠী খালি বলছেন, আপনাকে চা দেওয়া হচ্ছে না। হয়তো উঠে বসে আছেন। তাই কয়েকবার দেখে গেছি, উঠেছেন কি না। চা নিয়ে আসবো?'

শুয়ে মাতালের মতোই বলে উঠেছিলাম, 'নিশ্চয়।'

দিবানিদ্রার জড়তা কাটাবার আর কী ওষুধ ছিল। যেন, চা আনতে যাবে বলেই তৃপ্তির দিকে ফিরে সুষি থমকে দাঁড়িয়েছিল। আসলে, কথা বলে একটু লজ্জা কাটাবার চেষ্টা। বলেছিল, 'তিপু কি ধনুকে ডাকছিলি নাকি?'

তিপুর প্রতিমা-চক্ষু একবার অচেনাকে দেখে নিয়েছিল। তার আগে অনেকবারই দেখে নিয়েছিল। একটু সঙ্কোচ ছিল না, তা নয়। তবে, অনায়াসেই ঘাড় দুলিয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ।'

তারপরেই সুষির দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'দুপুরে খায় নাই, না?'

বক্তার সঙ্কোচ নেই, শ্রোত্রীর লজ্জা! যেন এমন একটা প্রশ্ন সুষি আশা করেনি। তাই প্রায় চমক খাওয়াটা হাসি দিয়ে সামলে বলেছিল, 'খাবে কী, ধনু তো এলই প্রায় সাঁঝবেলায়। কারুর সঙ্গে কথাবার্তা নেই, একেবারে এসে শুয়ে পড়েছে।'

শুনতে শুনতে তিপুর নজর বিদ্ধ ধনুর ঘুমন্ত মুখে। সেই নজরে বেজায় কোপ। বলেছিল, 'দেখ তো কাণ্ড। খাওয়াদাওয়া নাই। সব্বাই পূজা দেখতে যেইছে, এ ঘুম লাগাচ্ছে। একটু ডেকে দাও তো সুষিদি।'

সুষি বলেছিল, 'তুই ডাক না।'

আবার একবার অচেনা লোকটার দিকে তিপুর নজর পড়েছিল। ওইটুকুই যা বাধা। আমি উঠে দাঁড়াইনি কেবল, বারান্দায় যাবার দরজা দিয়ে বাইরে গিয়েছিলাম। সুষি বলেছিল, 'আমি আপনার চা নিয়ে আসছি।'

সেও নিচে চলে গিয়েছিল। উঠোনের দিকে নজর দেবার অবকাশ পাইনি। যেখানে আমার শ্রবণ ছিল, নজর মনে মনে সেইখানতেই। শুনেছিলাম, 'এই ধনুদা, ধনুদা! শুইনছ, এই ধনুদা, উঠ ক্যানে, শুইনছ।'

তারপরেই ডাকার স্বর, 'অ্যাঁ—কে রা?'

'অই, চিনতে লারছ গ ধনুদা?'

ধনুর দ্বিতীয় কথায় ঘুমের রেশ কম ছিল। শুনেছিলাম, 'কে, তিপু?'

'হ্যাঁ। উঠ।'

'নাঃ, তু যা। তু আমার সাথে কথা বলিস না। মেয়েছেলে হয়ে তু আমার গায়ে

হাতে তুলিস...।'

'এই ধনুদা, আর শুয়ো না বইলছি। তুমি যখন আমাকে মারো, তখন?'

'আমি বিটাছেলে। বিটাছেলেকে তু মারবি? যা, আমি ঘুমাব।'

'ই দ্যাখ ক্যানে, এই ধনুদা, তোমার নিশা কাটে নাই। লজ্জা করে না ইসব কইর্‌তে, আবার মেজাজ দেখাল্‌ছ। উঠবে কি না, পুজো দেখবে না?'

'না না না, তু যা।। আমার ইচ্ছে হয়েছে নিশা করেছি, আরো কইর্‌ব, তু যা। কথা বলিস না।'

চোখে দেখতে পাইনি, মনে হয়েছিল, ধনু আবার লুটিয়ে পড়েছে বিছানায়। আর সম্ভবত তৃপ্তি তাকে ধরে টেনে তোলবার চেষ্টা করেছিল। গলার স্বরে সেইরকমই মনে হয়েছিল, 'উঠ বইলছি, ধনুদা, উঠ। আমি তোমাকে শুতে দেবো না।'

জবাব, 'আহ্‌, ছাড়্‌ বইলছি; মারব মুখে এক থাপ্পড়।'

'তা-ই মারো ক্যানে। তুমি কি মারো না? কাল আমার চুল ছিঁড়ে দাও নাই? উঠ বইলছি, উঠ।'

'ন্না না না। আমি তোর মুখ দেখতে চাই না। তু যা।'

ইতিমধ্যে আবার সুষির আবির্ভাব হয়েছিল। তার গলা শুনতে পেয়েছিলাম, 'তোরা কী করছিস। মারামারি করবি নাকি!'

তৃপ্তির জবাব, 'দ্যাখ ক্যানে সুষিদি, কিছুতেই উঠছে না। আবার বইলছে, আমার মুখ দেখবে না। লজ্জাও নাই। কুটুম বাড়ি এসে কাঁড়ি কাঁড়ি তাড়ি গিলে, আবার মেজাজ দেখাল্‌ছে।'

ধনুর বাণী, 'এক শ বার দেখাব। তু যা, আমি পুজো দেখব না, কুথাও যাবো না। এই সুষি, একে যেতে বল্‌ তো। লইলে একটা কান্ড হবে বলে দিচ্ছি।'

তিপুর ঠোঁট নিশ্চয় বেঁকে উঠেছিল, চোখের নজরও তাই। বিদ্রূপে ঢেউ দিয়ে বলেছিল, 'ইস্‌ মুরোদ। কান্ড হবে!'

তখন সুষির গলা শোনা গিয়েছিল, 'আহ্‌, তোরা কী করছিস। জ্যাঠা জেঠী শুনলে বুঝি ভালো হবে। তুই এখন যা তিপু, ঝগড়া করিস না।'

সুষির গলায় ধমকের সুর। কয়েক মুহূর্ত কারুর কথাই শোনা যায়নি। তারপরে হঠাৎ তিপুর একেবারে নতুন স্বর শোনা গিয়েছিল। যে স্বর কেবল স্ফুরিত না, একটু মোচড় লাগানো, 'বেশ, আমি যেইছি, মনে থাকে যেন।'

দোতলার মাটির মেঝে কেঁপেছিল কি না, টের পাইনি। দুপ্‌ দুপ্‌ আওয়াজ পেয়েছিলাম। তিপু অন্তর্ধান করেছিল। সুষির গলায় ডাক এসেছিল, 'আপনি কি বারান্দায়?'

জবাব দিয়ে ঘরে ঢুকেছিলাম। দেখেছিলাম, ধনু পূর্ববৎ শায়িত। সে যে এতক্ষণ ঝগড়া করছিল, কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। সুষির দিকে তাকিয়েছিলাম। সে ঠোঁট টিপে হেসে, চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে, মনে মনে বলেছিলাম, জীবনে এমন পালা দেখাও আমার কপালে ছিল। এমন বিবাদ বচন শোনাও ছিল ভাগ্যে। অই কী বইলব হে, তাতে নীতির ঝাপটা লাগেনি আমার প্রাণে। অনাচারের ব্যাজ দেখিনি কোথাও। ভালো বলো মন্দ বলো, সেই আমার প্রথম-দেখা-রাঢ়ের-প্রাণে টুকুস রঙ লেগে গিয়েছিল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে, রসের ভাগীদার সুষির দিকে তাকিয়েছিলাম। দেখেছিলাম, উদ্গত হাসির ধারা ওর চোখে মুখে ঝরঝরিয়ে পড়তে চাইছে। চোখের কোণ দিয়ে একবার ধনুকে দেখে, মুখে আঁচল চেপে এগিয়ে গিয়েছিল সিঁড়ির দিকে। তারপরে মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে বলেছিল, 'নিচে আপনার হাতমুখ ধোয়ার জল আছে। দেরি

করবেন না। জ্যাঠা বারবার আপনার কথা জিজ্ঞেস করছেন।'

অবুঝের মতো জিজ্ঞেস করে ফেলেছিলাম, 'কেন?'

সুষি বলেছিল, 'আপনি সব দেখবেন শুনবেন, তাই।'

তাও তো বটে। আমি যে উৎসবের বাড়ির অতিথি। আমার কি কেবল ঘরে বসে থাকা চলে। আবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'গান করছে কে?'

সুষি হেসে বলেছিল, 'সে এক মজার মানুষ। নিচে এসে দেখবেন।'

সুষি চলে গিয়েছিল। আমিও আর দেরি করিনি। চা শেষ করেই নিচে নেমেছিলাম। যজ্ঞিবাড়ি বটে। তখন নতুন রূপ খুলেছিল। উঠোনের এক পাশে জ্বলছিল কারবাইডের বাতি। ঘরে ঘরে হ্যারিকেন। ঘরে উঠোনে কত মেয়েপুরুষের যে জটলা। বোঝা যাচ্ছিল, অতিথি আত্মীয় কুটুমের ভিড় ইতিমধ্যে আরো অনেক বেড়েছে। এখানে দু'জন, ওখানে চারজন, ঘরে উঠোনে গুচ্ছ গুচ্ছ জটলা। অনেকদিন পর সবার দেখাশোনা। সকলের অনেক কথা। 'অ, তাই তে বলি, ই বিটি কার গ। খাসা হয়েছে। ছেলে দেখাশোনা চইলছে তো?' একদিকে যখন এই কথা, আর একদিকে তখন, 'না, সে চাকরি হলো কুথা। দেখি, বানপুরের সাহেব তো বইলেছে বিটাকে একবার লিয়ে যেতে।' কিংবা অন্যদিকে, 'তা আমি কালীপুজোর সময়, পেত্যেক বছরই আসি। এক বাড়ি তো না, ছ' বাড়িতে নেমন্তন্ন।' তারপরে হাসির লহর।

কেবল, দক্ষিণের ভিটেখানিই যা একটু ফাঁকা-ফাঁকা। তাও হাতমুখ ধুতে ধুতেই অচেনার ওপর অনেক নজর পড়েছিল। নজরের সেই এক ভাষা, 'ইটো কে বটে!'

ওদিকে পুজো-দালানের উঠোন থেকে হ্যাজাকের ধবধবে আলোর ঝলক গলির গায়ে পড়েছিল। সেই ফাঁক দিয়ে যতটুকু নজর যায়, দেখেছিলাম, সেখানেও ভিড় কম না। বাক-জটলা সেখানেও। গান ভেসে আসছিল সেখান থেকেই, তখনো শুনতে প্যাচ্ছিলাম—

অই অই অই সমরে বিহরে শ্যামা...।

গলা তো না, বজ্রনাদ। তার মধ্যে কোথায় যেন একটু ক্ষ্যাপা ভাবের ঘোর। সেই ভাবের জন্যেই বজ্রনাদেও একটা যেন মিঠে ঝঙ্কারের আমেজ। কে গাইছিল। সুষি বলে গিয়েছিল, 'এক মজার মানুষ।'

আর আমার তর সয়নি। কোনোরকমে হতমুখ ধুয়ে ওপরে গিয়ে জামকাপড় পরে একটু ভব্য হয়ে নিচে নেমে এসেছিলাম। উত্তরের ঘরের কাছে যেতেই প্রথম দেখা ছোট রায়ের সঙ্গে। দেখেছিলাম, রাঙা রায়ের গায়ে তখন গরদের একখানি লালপাড় শাড়ি। পুজো বলে কথা। তার অয়োজন তো আর কাপাস পরে হয় না। তার মধ্যেই আবার সাবধানতা। পাছে ছুঁয়ে ফেলি। রাঙা হাসি হেসে বলেছিলেন, 'অ্যাই যে বাবা, এসেছ? ঘুমটুম হয়েছিল তো? চা দিয়েছিল? পুজোপাটের বাড়ি বাবা, একটু নিজে থেকে দেখেশুনে লিও।'

কোন্ কথাটার জবাব দেবে? জবাব তোমার কাছে কেউ প্রত্যাশা করেনি। ঘাড় নেড়েছিল, তাই যথেষ্ট। তিনি সরে যেতেই, পিছন পিছন বড় রায়। রাঙা বর্ণে যেন দ্বিগুণ ঝলক। হাতে কলাপাতা, তাতে জলে ভেজানো আতপচাল। গন্তব্য পুজোদালানে নিশ্চয়ই। পুজোর আয়োজনে ব্যস্ত। তাঁর অঙ্গেও একখানি গরদের কাপড়, কিন্তু শাড়ি না। থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'এই যে বাবা, উঠেছ? এর পরে তো আর কথা বলতে পারব না। তুমি নিজে থেকে সব ঘুরে-টুরে দেখ। ছেলেরা আসবে কয়েকজন, তোমাকে ডেকে নিয়ে যাবে, ঘোরাবে বেড়াবে, কেমন?'

বলেই এক দিকে ফিরে একজনকে ডেকেছিলেন। এক যুবককে। তার সঙ্গে আরো দু'জন। বড় রায় পরিচয় দিয়ে আলাপ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'একে লিয়ে সব দেখা-

দেখা তোরা।'

তারপরেই তিনি অন্তর্ধান করেছিলেন। প্রয়োজন না থাকলেও তিনজনের সঙ্গে ঘুরেছিলাম। আগে গিয়েছিলাম পুজো-দালানের উঠোনে।

তখন আর দিনের বেলার সেই উঠোন না। হ্যাজাকের আলোয়, ভিড়ে তার চেহারা তখন আলাদা। দশ-বারোখানি ঢাক এক জায়গাতে সার দেওয়া। দশ-বারো পালকের নিশানে দোলা। ঢাকীদের ভিড় সেখানে। সেই সময়ের মধ্যেই, দেখেছিলাম, কম করে বিশ-পঁচিশটি অজা। কেউ করে ম্যা ম্যা, কেউ ভ্যা ভ্যা। তার সঙ্গেই বেড়েছিল সাঁওতাল প্রজাদের ভিড়। গামছা আর কাপড় পেতে পরিবারগুলো নিজেদের সীমানা ভাগ করে নিয়েছিল।

ওদিকে কুমোরের কাজ তখনো চলছিল। প্রতিমা প্রায় শেষ। যদিও রঙ লাগানো চলছিল তখনো। তখন কেবল বিশেষ বিশেষ কাজ। জিভের লাল রঙ, ললাটের নয়ন আঁকা, গহনাতে সোনালী তুলির লেপন। চালচিত্রও প্রায় শেষ। বাকী কেবল একটি জিনিস, সেখানে কিছুই ছোঁয়ানো হয়নি। প্রতিমার চোখের তারা। চোখের দুই কোণে লাল রঙটুকুও ছোঁয়ানো হয়েছিল। তবু চোখের তারা ছিল না বলে প্রতিমা যেন মাটির পুতুল তখনো। তাতে প্রাণসঞ্চার হয়নি।

তা ছাড়া, ডাকের সাজের কিছু কিঞ্চিৎ কাজ চলছিল। নয়া চেনাদের একজন বুঝিয়ে দিয়েছিল, শোলার তৈরি পদ্মফুলের গায়ে যেসব চিহ্ন আঁকা ছিল, সবই তন্ত্রমতের নানান প্রতীক। মলুটির কালীপুজো তন্ত্রমতের পুজো। জেনেছিলাম, কারণবারি ছাড়া সে পুজো অবিধেয়। কারণবারি ছাড়া পুজো বিফল। কারণ জাগ্রত, কারণ পবিত্র। আর সে কারণ তোমার, ফটাস করে বোতলের মুখ খুলে, ঢকঢকিয়ে পান করা না। সে কারণ বারি পবিত্র মতে, পবিত্র মনে তৈরি।

প্রতিমার সাজ, পুজোর আয়োজন সমানে চলছিল। বাড়ির ভিতর থেকে আসছিল নানান উপচার-নৈবেদ্যের থালা। তার মধ্যে সব থেকে আকর্ষণীয়, উঠোনের এক ধারে কালী নামের ক্ষ্যাপা গায়ক। তাকে ঘিরে সব থেকে ভিড় বেশী।

কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম গায়কের। কালীর ছেলে বটে। বাতি সরিয়ে নিলে, গায়ককে খুঁজে পাওয়া যেতো না, এমন নিকষ কালো রঙ। কিন্তু গায়ে আর কোমরের ফিতাতে কাপড় দুখানি, যেন রাঢ়ের মাটি গুলে ছোপানো। হঠাৎ দেখে মনে হয়েছিল, মাথায় বুঝি জটা। জটা না, ঝাঁকড়া চুলে তেলের ভাঁজ ছিল না। রাঙা ধুলায় কাঁচাপাকা চুলের গোছ যেন শণনুড়ি। তবে অই, কী বইলব হে, মানুষের চোখ না। কোকিলের। লাল বলে তার বিচার হয় না, বলো অক্তবর্ণো। চোখের দিকে চেয়ে থাকা যায়নি। মুখের হাসিটিও যেমন-তেমন না। চোখ পাকানো ক্ষ্যাপা হাসি। আবার হাসতে হাসতে চোখ ভেসে যায়। চিৎকার করে তখন গায়ক মা মা বলে একেবারে অবশ বিবশ।

একের পর এক, থামবার নাম ছিল না। আপনাকে আপনি পুছ করেছিলাম, একে গান বলে, না ডাক বলে। গায়ক যেন ধন্দ ধরিয়েছিল। কখনো যেন মা-হারানো ছেলের শোক-বিষাদের কাঁদন, কখনো হাসন নাচন কোঁদন। আবার অন্যতরও ছিল। যেমন, ছোট রায় যখন মস্ত একখানি পেতলের থালা নিয়ে পুজোদালানে উঠতে যাচ্ছিলেন, গায়ক হাঁক দিয়ে উঠেছিল, 'অই গ কত্তা, বাসন লিয়ে যান কুথা। শোনেন গ, শোনেন।' বলেই গান ধরে দিয়েছিল,

'অই হে, এমনি করে মাজবি বাসন,
দেখা যায় রে আপন বদন—
তখন বাসন মাঝে দেখবি মায়ের সেই চরণ।'

ছোট রায় দাঁড়িয়ে শুনে, রাঙা হাসি ছিটিয়ে আবার উঠতে যাচ্ছিলেন। গায়ক

তৎক্ষণাৎ আবার গেয়ে উঠেছিল:

'অই ওহে, বাসনে মলা থাকলে
মায়ের চরণ নাহি মিলে
ঝাপসা আয়নায় হয় না কভু মুখ দরশন।'

ছোট রায় অমনি থালাখানি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছিলেন। গান শুনে তাঁর ধন্দ, বাসন সাফা আছে কিনা। তা-ই দেখে গায়ক খলখলিয়ে হেসে উঠেছিল। যেন, রহস্য করে গোপন কথা বলে, তেমনি ভাবে চোখ ঢুলুঢুলু করে ছড়া কেটে বলেছিল, 'ওহে, বিরজা পার হলে পরে, বাসনেতে ছায়া পড়ে। রূপে ভোবন আলো করে, শেতল হয় হে তপ্ত জীবন।...বুইলেন গ কত্তা। টুকুস চন্নামেত্ত কিন্তুক চাই।'

বলে, রক্তবর্ণ চোখে ইশারা করে হেসেছিল। ছোট রায় হাত তুলে হেসে বলেছিলেন, 'হবে হবে।'

যারা ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, তারাও অনেকে হেসে উঠেছিল। কে একজন বলেছিল, 'মায়ের চন্নামেত্ত তো সারা রাতই হবে। এখনো তো পেটে আছে।'

গায়ক দাঁত দেখিয়ে হেসেছিল। গান গেয়ে উঠেছিল আবার,

'ওহে কালী কুণ্ডলিনী, শম্ভুভাবিনী
জাগ মা অন্তরে শ্যামা, জাগ হে অন্তরে।'

অমন গায়ককে কি বলে তা জানি না। কাকে অমন ডাকাডাকি, ডেকে হাসাহাসি কাঁদাকাঁদি, কিছুই জানি না। যেন পাশে দাঁড়িয়ে, ভিন্ জগতের বোল বলে। ভাবের চালাচালি করে। এমন চোখ পাইনি যে, প্রতিমাকে প্রতিমা ছাড়া আর কিছু দেখি। না মনে, না চোখে। কেমন করে অমন মা মা বলে ডাক দেওয়া যায়। হাসা কাঁদা যায়, আমার অনুভবের অগম্য।

তবে কি না সে কথাও কবুল করি, গায়কের ভাবেতে যেন ভাব লেগেছিল। কেন, তাও জানি না। বোধ হয় গায়কেতে ছল ছিল না। সাচ্চা ভাবের এক দান আছে। সেই দান মিলেছিল শ্রবণ মন ভরে। যেমন কিনা পুত্রহারা শোকাতুরা কান্না দেখলে বুকে মোচড়ায়, তেমনি। তোমার পুত্রশোক নাই-বা যদি থাকে, তবু যেমন মোচড়ায়, তেমনি। তেমনি করেই গায়কের ভাবে ভাব লেগেছিল। তার তালেতে দোলা লেগেছিল। হাসিতে হাসি। আবার যখন কালী ক্ষ্যাপা, জলে ভেসে গিয়েছিল, 'কী খেলা খেলাও মা তুমি, জীবন্ত পুতুলি সনে। সে-ই জানে তোর খেলার মর্ম, যে থাকে তোর সদা ধ্যানে' তখন কেন যে মন টাটিয়ে গিয়েছিল তাও বুঝতে পারিনি।

তখন লোকটির মুখ থেকে চোখ সরাতে পারিনি। আমি শক্ত দুনিয়ার খোঁচা খেয়ে চলা মানুষ। জীবন-ধারণের কোথাও আমার কালীর খবর নেই। তবু ভালো বলো মন্দ বলো, দীর্ঘশ্বাসে যেন এক পাষাণভার নামতে চেয়েছিল কোথা থেকে। কেন, তা জানি না।

শুনেছিলাম, গায়কের আগমন হয়েছিল তারাপীঠ থেকে। সেখানে শিমুলতলার মহাশ্মশানে তার বাস, যেখানে নাকি বামাচরণ বামাক্ষ্যাপা হয়েছিলেন। গায়কও আর এক ক্ষ্যাপা। সকলের মুখে তাঁর নাম শুনেছিলাম ক্ষ্যাপা গোবিন্। জানি না, এযুগে আর বামাক্ষ্যাপা হয় কিনা কেউ। ক্ষ্যাপা গোবিন্ তেমন সাধক কি না, তাও আমার অজানা ছিল। কিন্তু বামাক্ষ্যাপার তত্ত্ব-রহস্য কিছু আমার জানা নেই। ক্ষ্যাপা গোবিনের গানের রস আমার মনে নানান খেলা খেলিয়েছিল। প্রত্যেক বছর কালীপুজোর সময় নাকি তার আবির্ভাব হতো।

কতক্ষণ গান শুনেছিলাম জানি না। এক সময়ে হঠাৎ ঢাক বেজে উঠেছিল। একটা না, একসঙ্গে অনেকগুলো। প্রথমেই, ঢাকীর দগর দিয়েছিল। গান চাপা পড়ে গিয়েছিল।

মনে হয়েছিল জগৎ-সংসার সকলই যেন কাঁপছে। একসঙ্গে এত ঢাকের দগর দেওয়া আর কখনো শুনিনি। বুকে, রক্তে, মস্তিষ্কে সেই শব্দ যেন কোনো অন্য লোকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিনি। কেবল দু'-একটা ভীত অজার স্খলিত অসহায় অবাক ডাক কেমন করে যেন কানে এসেছিল।

তখন চারদিকেই যেন একটা বিশেষ ছুটোছুটি। কেউ যেন বসে ছিল না। প্রতিমার দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম, চোখের তারায় জীবন্ত দৃষ্টি। আমার সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি, চোখাচোখি। পরমুহূর্তেই দুম্ করে পটকা ফেটেছিল। ফুলঝুরি জ্বালিয়ে ছোটরা ধিতাং ধিতাং নাচ শুরু করেছিল।

বড় রায় যাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন, তাদের একজন কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল, 'চলুন, অন্যান্য বাড়ি একটু দেখে আসি।'

আমি যেন একটা ঘোরের মধ্যেই তাদের সঙ্গে চলে গিয়েছিলাম। অন্ধকার পথের ওপরে ঘন অন্ধকারে তৈরি মানুষের মূর্তিরা আমার চারপাশে চলাফেরা করছিল। আর আমার মনে হয়েছিল চারদিকে কেবল ঢাকের বাজনা। গোটা মলুটি যেন ঢাকের বাজনায় সহসা বাঁধা পড়ে গিয়েছে। কাঁপছে থরথরিয়ে। দূরান্তের কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম, আকাশও যেন তারা ঝিকমিকিয়ে কাঁপছে। মলুটির বুকে যেন কী এক অলৌকিকতা নেমে আসছে। আর সেই অলৌকিক ঘোরের মধ্যে আমি হারিয়ে যাচ্ছিলাম।

কত যে জলহাস মত্তভাষ স্রোতের টানে ভেসে চলেছিল আমার দু' পাশ দিয়ে, তার হিসাব করতে পারিনি। নিশিঘোর কাটেনি আমার। যেন অগাধ অসীম অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ভেসে চলেছিলাম। কখনো সোজা, কখনো এঁকেবেঁকে, কুটির ইমারত মন্দিরের পাশ দিয়ে। পথে পথে, আমার চলার স্রোতে মানুষ। আমার উজানেও অনেক। যে যার আপন পথে চলেছিল। সেই কালো রাত্রে, কারুর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। সকলই অস্পষ্ট, ছায়া-ছায়া। যেন আমরা কেউ মর্ত্যভূমে নেই। যেন অন্য কোথাও কোনো দূর লোকে—কালের ওপারে, সময় যেখানে বন্দী হয়ে পড়েছে, বাঁধা পড়েছে ঢাকের উদ্দাম দগরের ঝম্ ঝম্ ঝন্ ঝন্ কম্পনে।

কেবল মাঝে মাঝে এক-একটা আলোকিত দ্বীপ ভেসে উঠছিল। যেখানে শ্রবণ ফেটে যাওয়া ঢাকের শব্দ। ফুলঝুরি রঙমশাল দুম্ দুম্ বাজী, মানুষের ভিড় আর সেই কালীর প্রতিমা, যার সঙ্গে কেবলই চোখাচোখি, যে-দিকেই চোখ ফেরাই। আলোর দ্বীপগুলো এক-একটা পূজাবাড়ি। কারা যেন কথা বলেছিলেন। কারা যেন সামাজিকতা করেছিলেন, এইস হে, বইস হে। হয়তো বসেছিলাম, হয়তো দুই-চারি কুশল বার্তা বিনিময় হয়েছিল। কিন্তু মনে নেই কিছু। কোথায় যেন আরো কিছু গাঢ়, আরো গূঢ় কিছু ছিল, মলুটির সেই অজ্ঞেয় সীমায় চলে গিয়েছিলাম।

পূজাবাড়ি সকল ছাড়িয়ে এলেই আবার অন্ধকার। ঘোর করাল সেই রাত্রি। উদ্দাম উন্মত্ত নিশা। কানে আসছিল কত বিচিত্র বচন। কেউ হাসে খিলিখিলি, খলখল কেউ। কেউ হাঁকে রুদ্র গলায়, কেউ কাঁদে ফুঁপিয়ে। তারা কে, দেখতে পাইনি কাউকে। তারা কোন্ নারী, কোন্ পুরুষ, কাউকে চিনিনি।

তার সঙ্গে, কোথা থেকে এসেছিল বাতাস, কে জানে। রাজমহলের পাহাড় থেকে, নাকি বঙ্গোপসাগর থেকে, বুঝতে পারিনি। তালের পাতায় পাতায়, অসিধারে খান খান, সেই বাতাসে শুনেছিলাম চাপা গোঙানি গরগর্। পাতায় পাতায় ঝাপটা। সব মিলিয়ে যেন শাসানি গোঙানি প্রহার। কিন্তু সাবধান হে, অন্ধকারে পা পড়ে গিয়েছিল কার গায়ে। মেয়ে গলায় শুনেছিলাম অস্ফুট আর্তনাদ, 'উহ্!'

যেন অবশ হয়েছিল পা। কালো ডাগরী মেয়েটির আঢাকা বুক মুখ বাহু কেমন

করে চোখে পড়েছিল জানি না। কালো চোখ দুটিতে যেন ব্যথার তরাস। আমি ত্রাসে লজ্জায় বিমূঢ়। সঙ্গের সঙ্গী হেঁকে উঠেছিল, 'পথের উপর শুয়ে রইছিস। সরে শুবি তো!'

তখন, লক্ষ্য পড়েছিল, কেবল যাতায়াত না। মলুটির পথে-পথে মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। মন্দিরের ধারে, কুটিরের পাশে, ইমারতের দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে। মেয়ে পুরুষ শিশু, সপরিবারে সাঁওতাল প্রজারা এসেছে রাজার গ্রামে। পুজোয় এসেছে। যে যেখানে পেরেছে, পেতেছে রাত্রির আস্তানা। মন্ত্র পুজো, যা কিছু আর্য নিয়মের পার, তাদের উৎসব। তখন সেই প্রতীক্ষা।

দেখেছিলাম, তাদের কারুর সঙ্গে মাদল, কারুর বিশাল বাঁশী। কেউ বাজাচ্ছিল, কেউ মাদল বুকে ধরে ঘুমে কাতর। তবু তারই মধ্যে কোনো মেয়ে গলায় গুনগুনানি। পুরুষের রস খাওয়া মন্দা পায়রার বক্‌বকম। আর যদি থেকে থেকে হঠাৎ কারুর হাতের কেরোসিনের টিমটিম লাল আলো ভেসে উঠছিল, তখন আরো অলৌকিক। জীবন্ত নরনারী, আর কাঁপা আলোয় কাঁপা কাঁপা মন্দিরের গায়ের দেবতারা, সকলই যেন একাকার হয়ে উঠছিল।

আমার নিশিঘোর, নিশায় নিশায় বাড়ছিল। কখন এক সময়ে, তাল সারির নিচে, বাবলা বনের ধারে, এক মন্দিরের কালো জমাট মূর্তির পাশ দিয়ে, সহসা ভেসে উঠেছিল আগুনের লেলিহান শিখা। কাছে না, দূরে—এক উৎরাইয়ের মন্থর ঢালুর ওপারে, প্রান্তরে। সারি সারি চিতার মতো, পাশাপাশি, আগুনের কুন্ড। কালো আকাশের তারায় হাতবাড়ানো শিখা। দু'-একটা কালো ছোট ছোট মানুষের মূর্তি সেখানে ভেসে ভেসে উঠছিল।

ওখানে কী! ওরা কারা! কী করে!

এই যখন মনে মনে জিজ্ঞাসা, সঙ্গের সাথীরা নিজেরাই বলে উঠেছিল, 'উয়ারা রস জ্বাল দিচ্ছে। পচুই রস সব চোলাই হচ্ছে, কালকের জন্যে।'

তারপরেই যেন একটা স্তব্ধতা নেমে এসেছিল। অই, কী বইলব হে, অমন নিঝুম নিশ্চুপে কেউ সোজা খাড়া থাকতে পারে না। ঢাকের দগরে কম্পন থেমে গিয়েছিল। এত নিশ্চুপ, ঝিঁঝির ডাক শোনা গিয়েছিল। পাখির স্খলিত গলা। যেন ভুলে ডেকে উঠে থেমে গিয়েছিল। কিন্তু সেই নিশ্চুপ স্তব্ধতায় যেন আমার শিরদাঁড়ায় কাঁপুনি লেগে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, কী যেন ঘটতে চলেছে। একটা ভয়ংকর কিছু। তারই পূর্বমুহূর্তের নিশ্চুপ নিশ্চলতায় সব কিছু থমকে গিয়েছিল। সর্বচরাচর।

নিজের সঙ্গীদের পায়ের শব্দে শব্দে কখন ফিরতে আরম্ভ করেছিলাম, জানি না। হঠাৎ, আচমকা ছুরি বেঁধার মতো একটা আর্ত চিৎকার উঠেছিল। অসহায় পশুর চিৎকার। তখন আমি এক আলোকের দ্বীপে, পুজোবাড়িতে। কোন্ বাড়ি কোন্ রাজার, কিছুই বুঝতে পারিনি। তাকিয়ে দেখার কথা মনে ছিল না।

কেবল দেখেছিলাম, জলে ভেজানো কালো চকচকে একটা প্রকান্ড মূর্তি পাক দিয়ে ফিরছে। চক্ষু তার আরক্ত, চাহনি ক্ষ্যাপা। সে একবার এদিকে ছুটে যায়, আবার ওদিকে। ছোটরা তার চোখের সামনে ফুলঝুরি রংমশাল জ্বালিয়ে ধরছিল। কেউ শব্দ করছিল পটকার। কেউ টেনে ধরছিল তার ল্যাজ। কালো মূর্তি ভয়ে রাগে তার নাতিদীর্ঘ শিং নিয়ে চুঁ মারতে আসছিল। হয়তো পালাতে চাইছিল। কিন্তু খুঁটির সঙ্গে বাঁধা ছিল সে।

তারপরেই তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যূপকাষ্ঠের কাছে। সেই কালো মূর্তির অন্ধকার প্রাণে কী ভাব এসেছিল, কে জানে। যমের বাহন সে মহিষ, আপন ঈশ্বরের কথা হয়েছিল নাকি! কার দুটো বলিষ্ঠ হাত যূপকাষ্ঠের মাঝখানে ঢুকিয়ে

দিয়েছিল তার গর্দান। আর এক জোড়া ঘিয়ে ডোবানো হাত এগিয়ে এসে, তার গলায় মর্দন করতে আরম্ভ করেছিল। তখন একজন সামনের দড়ি ধরে টানছিল। আর একজন পিছন থেকে। আর কেবলই, মর্দন-মর্দন।

অই, কী অন্ধকার হে, মলুটি, তুমি আমার বুকের নিশ্বাস যেন বন্ধ করে দিয়েছিলে। আমার দৃষ্টিকে অসহায় করে তুলেছিলে। ঢাকের পিঠে সহস্র কাঠির সজোর শব্দে দগর উঠেছিল। আবার সেই কম্পন। সেও যেন এক স্তব্ধতা। মহাকালকে বন্দী করে রাখা।

তারপরেই খাঁড়া উঠেছিল শূন্যে। শাণিত উজ্জ্বল ধারে দেখেছিলাম, দুটি চোখ-আঁকা খাঁড়া। আমার দৃষ্টি চকিতে একবার ছুটেছিল প্রতিমার দিকে। সেই চোখ! সেই চক্ষু! আমার সঙ্গেই যেন তখনো তার চোখাচোখি। পরমুহূর্তেই কী ঘটে গিয়েছিল। খাঁড়া একবার ঝিলিক হেনে নেমে গিয়েছিল নিঃশব্দে।

যমের বাহন তখন ছিন্ন। কালো এক বিশাল ধড়, আকুঞ্চিত, অস্থির বেগে থরথর দাপাদাপি। কিন্তু, তার কণ্ঠনালী থেকে নির্গত, প্রথম রক্তের ফোঁটা রাঙিয়ে দিয়েছিল পুরোহিতের মধ্যম আঙুল। প্রতিটি কপালে কপালে লাগিয়ে দিয়েছিল নিহতের রক্তের ফোঁটা।

কখন এক সময়ে, সেই আঙুল ছুঁয়ে দিয়েছিল আমার কপাল। তখনো রক্ত ঠাণ্ডা হয়নি। কপালে একটা উষ্ণ স্পর্শের মতো লেগেছিল। আমার গায়ের মধ্যে শিউরে উঠেছিল। বুকের মধ্যে একটা আর্তধ্বনি শুনতে পেয়েছিলাম যেন। তখনই কালো কচি নধর আর একটি জীব তুলে দেওয়া হয়েছিল যূপকাষ্ঠে। আমি চোখ বুজে ফেলেছিলাম। আমার সেই নিশির ঘোর, আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল আলোর বাইরে। অন্ধকারে কোথায় চলেছিলাম জানি না। কেবল সেই দোতলার ঘরটির সন্ধানে চলেছিলাম।

অই, কী অন্ধকার হে! চারদিকে ঢাকের পটহ ধ্বনি, পশুর চিৎকার, মানুষের উল্লাস। আরো, আরো কিছু, চারপাশে, বিহ্বল কুহর, সীৎকার, কাঁচ ও রূপার চুড়ির নিক্কণ। কুথা হে, সেই ঘরখানি!

আমার প্রথম বার দেখা, বিচিত্রের সন্ধানে ফেরা, কী বিচিত্র দেখেছিলাম! কার খোঁজে ঘুরে ফিরি, কিসের সন্ধানে, এদিনে যেমন জানি না, সেদিনেও না। যখন যা পেয়েছি, নিয়েছি মন ভরে। কিছু গিয়েছে উপছে, কিছু পুরানো ঝোলার ছিদ্রে গিয়েছে ঝরে। যা কিছু থেকে গিয়েছে, সে-ই আমার অচিনে ফেরার অধরা কি না জানি না। যদি তাই, তবে সেই আমার মলুটির এক রাত্রি, এক দিনের স্মৃতি। নির্বাকে, যেখানে কেবল, বুকের কাছে হাত জড়ো করে, দু' চোখ মেলে তাকিয়েছিলাম।

এ কথা বলব না, আমার অনুভূতির গোচরে কিছু ধরা দিয়েছিল। এ কথা বলব, পৃথিবীর এক ঠাঁই, মানুষের এক লীলা দেখেছিলাম।

অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে, কেমন করে আমার নিমন্ত্রণের বাড়ি এসেছিলাম, জানি না। সেখানেও সেই ঢাকের নিরন্তর বাজনা, পশুর চিৎকার, মানুষের উল্লাস। কালা কালী ধলা ধলী রাঙা রাঙী কতেক নারী-পুরুষ, প্রতিমা আর যূপকাষ্ঠ ঘিরে। কী আশ্চর্য হে, বড় রায় যেন কেমন আচ্ছন্ন। কাছে দাঁড়িয়ে তিনি আমাকে চিনতে পারেননি। ছোট রায়ও না। তাঁদের রাঙা মুখে তখন যেন কিসের ঘোর।

আমি বাড়ির মধ্যে গিয়েছিলাম। সেখানে তখন একটি মাত্র আলো, এক দাওয়ার কাছে টিমটিম করছিল। যেন সেখানে উৎসববর্জিত হাহাকার। উঠোন পেরিয়ে, দক্ষিণের দাওয়ায় উঠে ডান দিকে ফিরে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিলাম। আবার থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল।

কে যেন কোথায় বলছিল, 'না না না।'

মেয়েলি স্বরে কান্নার আভাস। তারপরে পুরুষের গলা, 'এ্যাই তোর পায়ে ধরি, অন্যায় হয়ে যেছে, মাইরি।'

যেন আর এক জগৎ। রক্তের উৎসব থেকে মুরলীধ্বনি বলে, 'দেহি পদপল্লব-মুদারম্।' গলা চিনতে ভুল করিনি।

সেই ডাকা আর ডাকিনী, ধনু আর তিপু। কিন্তু কোথায়, আওয়াজ বোলে কোথা থেকে!

তারপরে ত্রাস রোষ, 'এই বইলছি, পায়ে হাত দিও না। আমি যাবো না পূজা দেখতে।'

'তিপু, তু নক্‌কী মেয়ে, কথা শুনবি না!'

অই, ওহে পুরুষ, তুমদিগে চিনতে বাকী নাই। তাই কান্না ঝাঁজানো গলায় বেজেছিল, 'না না না। ক্যানে, লজ্জা করে না, মুখ দেখবে না বইলছিলে। মুখে থাপ্‌পড় মারবে।'

ওরে পুরুষ, তখন কী ধনে ধনী হয়ে অমন বুলি বলেছিলি, মনে ছিল না। আর তোষবার সময় বলছিল, 'মাইরি বইলছি, অন্যায় হয়ে গেছে, অ্যাই শোন্ তিপু—।'

মানভঞ্জনের পালা, আর কিছু শোনবার ছিল না। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গিয়েছিলাম। এক কোণে একটি টিমটিমে বাতি ছিল। সেই আলোয় জামা খুলে, পাতা বিছানায় লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম। বারান্দার দরজার কাছ থেকে সুষির গলা জেগে উঠেছিল, 'খাবেন না?'

একটু চমক খেতে হয়েছিল। কিন্তু মলুটির নিশিঘোর আমার মন মস্তিষ্কের সীমায় সীমায়। সেই ঘোরে একটু চমক লেগেছিল। সুষি এখানে কেন, এই অন্ধকারে, নিরালা নির্জনে, উৎসবের আসর ছেড়ে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি পূজার ওখানে যাওনি?'

'না।'

ছোট জবাব, কিন্তু ছোট না। স্বর এসেছিল যেন অনেক দূর থেকে। কী একটা সুর ছিল ধরতে পারিনি। যেন কিসের ভারে চাপ খাওয়া সুরের মতো। জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন?'

'ভালো লাগে না।'

কার্তিকের চতুর্দশী মহানিশায়, মলুটিতে নতুন কথা! নতুন সুর, নতুন ভাব! ভালো লাগে না! টিমটিমে অস্পষ্ট আলোয় দেখেছিলাম, সুষির মাথা নিচু। কোনো এক অবসরে, খোঁপা বাঁধবার সময় হয়েছিল ওর। সেই খোঁপাটি, নত মাথায় বড় হয়ে জেগেছিল। একটু বুঝি সাজতেও হয়েছিল। কিছু রঙগীন বসন, কিছু চাকচিক্য।

আস্তে আস্তে মাথা তুলেছিল। দেখেছিলাম, কপালে একটি টিপ। যেন দু' চোখে দুই তারা, কপালে আর এক। সেখানে হাসির ঝিলিক না, উৎসবের উল্লাস না। নির্বাক বিস্ময়াহত বিমর্ষ মুখ। তার চেয়ে বেশী, যেন ভিতরে প্লাবন বহে, বাইরে থম্‌থম্।

আমার জিজ্ঞাসু মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে আবার বলেছিল, 'আমি দেখতে পারি না।'

কী দেখতে পারে না, সে কথা আর জিজ্ঞেস করিনি। হঠাৎ দেখেছিলাম, কালো টিপ পরা ত্রিনয়নী মেয়েটির চোখের কোণে জল জমে উঠেছে। আবার বলেছিল, 'আমি পারি না।'

বলেই সুষি পিছন ফিরে, বারান্দার কোলে আঁধারে সরে গিয়েছিল। আমি চুপ করে বসেছিলাম। বাইরে পূজা-দালানে উল্লাস বাজনা পশুর চিৎকার। ঘরের নিচে,

অন্ধকারে 'দেহিপদপল্লবমুদারম্'-এর সুর, ওপরে 'শ্রীমতী নামে সে দাসী' রক্তের ধুলোয় যে অহিংসার সাহসে কাঁদে!

মনে হয়েছিল, পথ চলার এমন বিচিত্র ছবি আর কবে দেখেছি। বারে বারে বুকের কাছে হাত এনে, কাকে যে নমস্কার করতে চেয়েছিলাম, জানি না। কেবল, প্রার্থনা করেছিলাম, আমার মনকে স্পন্দিত রাখতে দাও, আমার চোখ খোলা রাখো।

একটু পরেই সুষি দরজায় ভেসে উঠেছিল। তখন তার দৃষ্টিতে ও গলায় স্বচ্ছলতা। বলেছিল, 'আপনি চলে এলেন কেন!'

মন খুলেই বলেছিলাম, 'তোমাদের এই মলুটির এক নিশির ঘোর লেগেছে আমার। আমি যেন ঠিক কিছুই বুঝতে পারছি না। অথচ পারছি।'

সুষি এক মুহূর্ত, তিন চোখে অপলক চেয়েছিল আমার দিকে। দৃষ্টিতে অনুসন্ধিৎসা, কিছু বা বিস্ময়। হঠাৎ চোখ নামিয়ে আবার তাকিয়েছিলাম। তখন যেন ওর কালো মুখে হাসি ফুটেছিল একটু। বলেছিল, 'যাদের সঙ্গে গেছলেন, তারা কোথায়?'

'জানি না।'

'ওদের সঙ্গে যদি একটু মেতে যেতেন, তা হলে সব ঠিক লাগত।'

কথাটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম হয়নি। তাই অবাক চোখে তাকিয়েছিলাম।

সুষি যেন একটা লজ্জা পেয়ে হেসেছিল। বলেছিল, 'যেমন ঠাকুরের যেমন পুজো। জানেন তো, কারণবারি ছাড়া এ পুজো হয় না।'

বলে সুষি আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। আর বেশী বলবার দরকার ছিল না। সেইটুকু ইঙ্গিতেই বুঝতে পেরেছিলাম, ওর বক্তব্য কী। কিন্তু সুষির একটু বুঝতে ভুল হয়েছিল। আমি মেতেছিলাম ঠিকই। সে-মাতনের চেহারাটা অন্যরকম। আমার সমগ্র অনুভূতি জুড়ে তার খেলা। এমনি তার প্রাণ-ধাঁধানো ঝলক, অসীম বিস্ময়, প্রায় এক অলৌকিকের রহস্যে যেন বিবশ হয়েছিলাম। তার চেয়ে বলি, আমার ঘোর লেগেছিল, মাতনের ঘোর। বলেছিলাম, 'তার দরকার নেই। বেঠিক আমার লাগেনি কিছুই। এমন আর কখনো দেখিনি।'

সুষি তাড়াতাড়ি দু' পা এগিয়ে এসেছিল। অবাক ত্রস্ত গলায় বলেছিল, 'রাগ করলেন নাকি!'

হেসে বলেছিলাম, 'না।'

তারপর সুষির চোখের দিকে এক পলক দেখে, জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'মলুটির পুজো কি এই তোমার প্রথম দেখা?'

সুষি ভুরু তুলে বলেছিল, 'না না, ছেলেবেলা থেকেই দেখছি।'

'তবে তুমি দেখতে পারো না কেন?'

সুষি একটু চুপ করে ছিল। মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিল টিমটিমে আলোটার দিকে। দৃষ্টি দেখে মনে হয়েছিল, সে-ঘর থেকে ও যেন অন্য কোথায় চলে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে বলেছিল, 'ছেলেবেলায় বেশ ভালো লাগত। তারপরে যত বড় হতে লাগলাম, আর ভালো লাগত না। বাবা মারা যাবার পর, বলি দেখতে আর কখনো যাই না।'

দেখেছিলাম, এক হরিণী আমার সামনে দাঁড়িয়ে। সংসার যাকে অসহায় করেছে। ব্যাধভীতা হরিণী করেছে। পিতৃহীনা একটি মেয়ে, যে তার চারপাশে দেখেছে অনেক উদ্যত খড়্গের ভিড়। যে তার নিজের বুকে কান পেতে শুনেছে অসহায়ের আর্তনাদ। চারদিকে তার অনেক যূপকাষ্ঠ, ক্ষুধা-অসম্মান-অনিরাপত্তা-অপ্রতিষ্ঠা।

বাইরে বাজনা উল্লাস আর্তনাদ। ঘরের মধ্যে তখন, সুষির দিকে তাকিয়ে, আমার ঘোরের মধ্যেও এক নিবিড় মমতা স্পন্দিত হচ্ছিল। ইচ্ছা করছিল, মেয়েটিকে কাছে

ডেকে একটু স্নেহ করি। অনেক কথা ও বলেনি। কয়েকটি কথার মধ্যে ওর ভিতরের পুরো ছবিটা ভাসছিল।

'আপনাকে খেতে দিই?'

কথা শুনে চমক ভেঙেছিল। চোখ ফেরাতে ভুলেছিলাম। পুরুষের অপলক চোখের সামনে, কখন লজ্জায় সংকোচে কুঁকড়ে উঠেছিল সুষি। ঘোর ভাঙাবার জন্যেই ডেকে কথা বলেছিল। আবার বলেছিল, 'জেঠি বলেছে, আপনি ফিরে এলে খেতে দিতে। রাত কিন্তু দুটো বেজে গেছে।'

দুটো! হাত তুলে ঘড়ি দেখেছিলাম। দুটো না, তার চেয়ে আধঘণ্টা বেশী। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আর সবাই খাবে কখন?'

সুষি বলেছিল, 'তার কোনো ঠিক নেই।'

ক্ষুধার অনুভূতি আমার একটুও ছিল না। মলুটির নিশিঘোরের মধ্যে, স্নায়ুতন্ত্রে কেমন একটা শৈথিল্যের আচ্ছন্নতা নিবিড় হয়ে এসেছিল। বলেছিলাম, 'খাবার ইচ্ছা একটুও নেই। তার চেয়ে একটু শুয়ে থাকি।'

শরীর এলিয়ে দিয়েছিলাম। সুষি বলেছিল, 'তবে বাতিটা একেবারে নিভিয়ে দিই।'

ঘরটা অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি কী করবে এখন?'

অন্ধকারের মধ্যে সুষির গলা শোনা গিয়েছিল, 'বারান্দায় বসে থাকব।'

'শুতে পারো তো।'

'আমার ঘুম আসবে না।'

আমি চুপ করেছিলাম। টের পাইনি, সুষি বারান্দায় গিয়েছে কিনা। সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, বুঝতে পারিনি। নিকষ অন্ধকারে, আমার চোখের সামনে, তবু সুষির মুখটিই ভাসছিল। আর ওর অকপট করুণ স্বর শ্রবণে বাজছিল, 'আমার ঘুম আসবে না'...বাইরে বলির উৎসব তেমনিই চলছিল। আমার চেতনা কখন হারিয়ে গিয়েছিল, জানতে পারিনি।

সহসা কানের কাছে যেন ঢাকের দগর বেজে উঠেছিল। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেছিলাম, দিনের আলো। আমার সারা গায়ে ঘাম। নিচে নেমে, থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। উঠান ভরে রক্ত। গলি দিয়ে চোখে পড়েছিল, পূজামণ্ডপে তেমনি ভিড়। সেই বাজনা, সেই উল্লাস, সেই আর্তনাদ।

রোদের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম, বেলা কম হয়নি। বলি তখনো থামেনি। গলিটা রক্তে ভাসছিল। কখন যে হাতমুখ ধুয়েছিলাম, সুষির কাছ থেকে চা খেয়েছিলাম, এখন মনে করতেও পারি না। মলুটির নিশি আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

দেখেছিলাম, মলুটির পথে পথে রক্তের স্রোত। মুণ্ডহীন রক্তাক্ত বলির দেহ নিয়ে, শূন্যে ছুঁড়ে লোফালুফি। হাত দিয়ে ছাল ছাড়িয়ে, দগদগে ধড় কাঁধে করে মত্ত কুর্দন নর্তন। অই কী বইলব হে, রক্ত নিয়ে গায়ে ছোঁড়াছুঁড়ি, রক্ত ছিটিয়ে খেলা। গত রাত্রির রক্তপাত, দিনের বেলাও সমানে চলছিল। মলুটির লাল মাটিতে, রক্তে রক্তে দইকাদা।

তার সঙ্গে, রসের অনুপান। সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষেরা, পাত্র উজাড় করা মত্ততায়, কলকল টলটল। ঢাকীদেরও সেই দশা। ঢুকুঢুকু রসের ধারায়, হাতে তাদের অসুর শক্তি। থামতে ভুলে গিয়েছিল। দাঁড়াতে ভুলে গিয়েছিল। ছুটে ছুটে, পাক দিয়ে দিয়ে শূন্যে লম্ফ নাচ। রক্তচোখে মত্ত দৃষ্টি, মাতাল মুখে রসের ঝলক।

যেন চতুর্দশীর অমানিশা তখনো শেষ হয়নি। ঢাকের বাজনায়, রক্তে, নৃত্যে, উল্লাসে,

সময় সেখানে বাঁধা পড়েছিল। ভদ্রাভদ্র, সকলের এক দশা। বড় রায় ছোট রায়, সবাই উন্মাদের ঘোরে। তবু তার মধ্যেই পুছাপুছি কাজকর্ম সবই চলছিল।

কেমন করে যে দুপুরের স্নানাহার মিটেছিল, সেই স্মৃতি অস্পষ্ট। দেখেছিলাম, মলুটির পথে পথে কোথা থেকে এসেছিল মনোহারির দোকানদার। ঘন্টা বাজানো মিঠাইওলা। আর এসেছিল, ঝাঁপি মাথায় মেয়ে-পুরুষ সাপুড়ে।

তারা ঝাঁপি খুলে, সাপ ছড়িয়ে দিয়েছিল পূজা বাড়ির উঠানে। খেলিয়েছিল মলুটির ক্ষ্যাপা ভিড়ের পথে পথে। 'অই গ, ই দেখে লাও চন্দ্রবোরা। লীলেতে সনার চন্দর। আসমানে তারা হে!' বলে আবার মেয়ে সাপুড়ে, তার ক্ষীণ কটি গুরুনিতম্বে, চন্দ্রবোড়া জড়িয়ে পাছাবাহার দেখিয়েছিল। কোমর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেচেছিল। কেউটে নিয়ে সোহাগ করে বুকের উপর ছেড়ে দিয়ে চাপড়ে চাপড়ে বলেছিল, 'লেটো করে থাক রে নাগ, ঘুম যা।'

আর সাপুড়ে গলায় ঝুলিয়ে অজগর, দুধ গোখরোর ফণা গিলেছিল হাঁ করে। অই হে, তোমার গায়ে কাঁটা দিলে কী হবে। ই দ্যাখ গ, নাগিনীর চুমা কেমন লাগে। সাপুড়ে শব্দ করে চুমো খেয়েছিল। সাপিনী তার লকলকে জিভ দিয়ে সাপুড়ের মুখের ভিতর চেটেছিল। মাতাল সাঁওতাল মেয়েরা তখন গুনগুনিয়ে গান গেয়ে উঠেছিল। তাদের চোখেমুখে রসের ঝলক, রসের গলন।

মলুটিতে না গেলে, অমন সাপ খেলাও দেখতে পেতাম না।

কে জানে কী ধরন-ধারণ, সাপের খেলা দেখে যেন সাঁওতাল মেয়েরা সব লাজে ভয়ে শিউরে শিউরে উঠেছিল। কেবল সাঁওতাল মেয়েরা বলব কেন, বাউরি বাগ্দি মেয়েরাও। তাই যদি বইললে হে, বাকীরাও বাদ থাকে কেন। কেতাবীতে যারা ভদ্র-মহিলা, অন্তঃপুরের ঝি-বউয়েরাও মুখে আঁচল চেপে হেসে কুটিপাটি। পাছে পুরুষদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায় তাই ঘন ঘন ঘোমটা ঢাকা, ভারি লাজে লাজানো।

সাঁওতালি বাউরি বাগ্দি মেয়েদের অত ঢাকাঢাকি ছিল না। লাজে লাজানো ছিল। হাসতে গিয়ে যেন গায়ে কাঁপন ধরে যাচ্ছিল ভয়ে, 'ই বাবা গ! অই গ, আহ্ ছি, উয়াদের লজ্জা নাই গ!' বলে খিলখিল হাসি। হেসে ঢলাঢলি। কেন, কেন সাপুড়ে মেয়ের নাচে, না সাপুড়ে পুরুষের বয়ানে! ধরতে পারিনি। সাপুড়েদের ভাবভঙ্গি একটু কেমন কেমন ছিল, সেইটুকু নজর করেছিলাম। চোখ পুরু পুরু, হেসে বচন, 'ই দ্যাখ গ, সামলে বিটি, নাগের ফণা কুথা উঠে হে। দমশন কইরলে জানি না।'

বলে হঠাৎ কাপড় ঝাড়া দিয়ে সাপ বের করেছিল। অমনি হাসাহাসি ঢলাঢলি। আবার ফণা চেপে ধরে যখন মুখে পুরে দিয়েছিল তখন মেয়েদের গলায় আর্তস্বর। আর্তস্বর নয় হে, বলো সীৎকার। নাগরদোলার ভয় পাওয়া খুশি।

যখন পূজাদালানের উঠানে খেলা, তখন সুষিকে দেখেছিলাম। মেয়েদের দলের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। রক্তারক্তিতে যার ভয়, সাপের খেলা দেখে যেন তার চোখেতেই আমেজ। কালো মেয়েটির ডাগর চোখে খুশির ঝলকে যেন রাঙা ছোপ ধরে গিয়েছিল। বারেক চোখাচোখি হয়েছিল বলে হেসে চোখের পাতা নামিয়ে নিয়েছিল। যেন রাঙা ছোপ চোখে না, মনেতে লেগেছিল, কেন, তা বুঝতে পারিনি।

আমি দেখেছিলাম, সাপ নিয়ে জাদু। চোখের সামনে সাপ লুকোবার হাতসাফাই। তার সঙ্গে অমন ভয়ংকর নাগ-নাগিনী নিয়ে হাসি-ঢঙের খেলা। খেলার সঙ্গে আর যেসব দাবি ছিল তা হলো, 'লতুন লতুন কাপড় চাই। নাগের দুধ চাই, পেট ভরা খাবার চাই। তবে একেবারে এমনি না। কেবল খেলা দেখিয়েই সব চাওয়া না। 'বিষ ঝাড়বার শিকড় দেবো, নাগ ঠেকাবার জন্য হেঁতালের ডাল দেবো, মন মজাবার ওষুধ দেবো।' তবে না এত দাবিদাওয়া!

ওদিকে যত নাগ-নাগিনীর খেলা, সাপুড়েদের নাচ-নাচন, তত যেন সাঁওতালি মেয়েদেরও নাগিনী দোলন লেগেছিল। রসের ভরায় তারা ঝলকাচ্ছিল। তারপরে নাগিনীর মতোই দুলতে আরম্ভ করেছিল। এক একা না। দলে দলে, গুচ্ছে গুচ্ছে। কেবল মেয়েরা না। মেয়েরা যেমন সারি সারি হাত ধরাধরি, কোমর ধরাধরি, পুরুষেরা তেমনি তাদের মুখোমুখি, দলে দলে, গুচ্ছে গুচ্ছে, সারি সারি। তাদের কারুর গলায় মাদল, কারুর হাতে বাঁশি। মেয়েদের গলা তখনো তেমন খোলেনি, গুনগুনানি চলছিল।

তাদের নাচ চলছিল পুজোদালানের উঠানে, বাড়ির মধ্যে উঠানে। তারপরে উঠান থেকে একেবারে এ ঘরের দাওয়ায়, সে ঘরের দাওয়ায়। ইস্তক রান্নাঘরের সামনেও।

সবাইকে দেখাতে হবে যে। 'উই গ রাঙা বউ, লাচ দেখবি না?' দেখবে বইকি। বড় গিন্নী, ছোট গিন্নী, তাবত বউ-ঝিয়েরা সব বেরিয়ে এসেছিলেন ঘর ছেড়ে। কর্তারা দেখতে দেখতে আবার সামাল দিচ্ছিলেন, 'হুঁ হুঁ, খুব হয়েছে রে, খুব হয়েছে।'

সে কথাটি বলবার জো ছিল না। 'ক্যানে, খুব কুথা দেখলি রে, ই কি লাচ হলো যে, খুব দেখলি?'

বলেই কাছের রস-অধরা-ঢলঢল মেয়েটিকে ধরে সে কী প্রাকৃত ভঙ্গির নাচ হে। ওহে নগর-মজা চোখওয়ালা বিদ্যেধর, অমন অশ্লীল জ্ঞানে নজর ঘুরিয়ে নিও না। মস্‌করা বোঝ না হে, মস্‌করা! অশ্লীলতা যদি কোথাও ছিল সে তোমার চোখে। ওদের না। ওরা যেমন, তেমনি-ই। নিজেদের মতো নিজেদের সব কিছু। তোমার নগর-ঝলক যখন ওদের হাতছানি দেয়, জানবে তখন ওরা বিপরীতে বাঁকা। নয়া রীতের ধরতাই জানা নেই অথচ আপন রীত ছাড়া সে বড় বিষ। এ আপন রীতে চলা, এ হলো অনায়াস, স্বচ্ছন্দ, সুন্দর।

তবু বড় রায় ছোট রায় রাঙা মুখে হেসে ধমক দিয়েছিলেন, 'আরে ধু—হারামজাদা।'

বউ-ঝিয়েরা হেসেই বাঁচেননি। ঘোমটা টেনে আঁচল চেপে সরে গিয়েছিলেন।

উঠানে, দাওয়ায়, পথে পথে নাচ গান, সাপ খেলানো। টিং টিং ঘণ্টা, বোম্বাই মিঠাই, লাড্ডু, জিলিপি, তেলেভাজা। আর 'বেলোয়ারি চুড়ি লয় গ, ইয়ার নাম রেশমি চুড়ি, চ্যাংড়া ধরার ফাঁদ, পয়সা পয়সা দাম।' তার সঙ্গে চোখঝলসানো টিপ ছাপ আলতা সিঁদুর, বেলাতি পাথর বসানো আঙটি। রামপুরহাটের দোকানদার সেসব জানে। বেলাতি পাথর কাকে বলে আর কলকাতার ফুলেল তেল।

তারপরে দেখেছিলাম মলুটির পথে পথে রক্ত শুকোবার আগেই বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠেছিল। 'জয় মা কালী।' তখনো সূর্য অস্ত যায়নি। তখনো খড়ের চালে, তালপাতায়, গাছে গাছে, মন্দিরের চূড়ায় চূড়ায় হেমন্তের রাঙা রোদ। ঢাকের কাঠিতে নতুন তাল বেজে উঠেছিল। ঢাকীদের নাচেও। কালো পাথরে তৈরি এবড়ো-খেবড়ো বিশাল মূর্তি রক্তচক্ষু পুরুষেরা বাঁশের চালি পেতেছিল উঠানে। বরণের জন্য, প্রতিমার পায়ে সিঁদুর ছোঁয়াবার জন্য, সেই সিঁদুরের অবশিষ্ট ঘরে তোলবার জন্য সধবারা পুজোদালান ঘিরে ধরেছিল।

নাচ গান সাপ খেলানো ঢাকের দগর আর কালীর জয়ধ্বনি। মলুটির রূপ বদলে যাচ্ছিল। তবু সেই উৎসবের মত্ততায় মলুটির মন্দিরের চূড়ায় যে রাঙা রোদ চিকচিক করছিল, সে যেন এক কাঁদন-ভরা হাসির ছোঁয়া মনে হয়েছিল। সেই শ্রবণফাটা শব্দের মধ্যেও দেখেছিলাম পাখাগুটানো পাখি নির্বাক হয়ে বসে ছিল গাছের ডালে। দূরে পশ্চিমের লাল আকাশে যেন বিহঙ্গের নিবিড় দৃষ্টি। রক্তঝরা লাল মাটিতে যেন ছায়ার বিষণ্ণতা। আর তেমনি নিশ্চুপ নতমুখ প্রাণহীন স্থবির দেখেছিলাম মন্দিরের দেওয়ালের দেবদেবীদের।

প্রতিমার বিদায় কী, তা জানি না। বিসর্জনের ব্যথা কী, তা-ই বা কী জানি।

উৎসব শেষ, শেষ হতে চলেছে। সব মিলিয়ে আকাশের রাঙা রোদ, নির্বাক পাখি আর মূর্তি, মৃত্তিকার ছায়া যেন তারই অন্য রূপ।

দাঁড়িয়েছিলাম ভিড়ের পিছনে। হঠাৎ লক্ষ্য পড়েছিল, বড় রায় দাঁড়িয়ে আছেন একটু দূরেই। শেষ প্রণাম সেরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই গরদের কাপড়খানিরই এক অংশে পিঠ ঢাকা দেওয়া। খোলা বুকে উপবীতটা দেখা যাচ্ছিল। দু' হাত জোড় করে রেখেছিলেন বুকের উপবীতের কাছেই। গতকাল থেকে দাড়ি কামাবার সময় পাননি। তাই রাঙা মুখে দাগ ফুটেছিল। দেখেছিলাম তাঁর নীল চোখে জল। রাঙা গাল বেয়ে পড়ছিল। ঝাপসা চোখে তাকিয়ে ছিলেন প্রতিমার দিকে।

দেখে চোখ ফেরাতে পারিনি। মন চল্‌কে উঠেছিল। অবাক তেমন হইনি, বুকের কোথায় একটু ঠেক লেগেছিল। হাত কয়েক দূরে, ইচ্ছা হলেও কাছে যেতে পারিনি। তাকিয়ে দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, কেন, কিসের জন্য। এমন মন তো আমার হয় না। এই কি বিসর্জনের অশ্রুপাত?

চোখ ফেরাতে গিয়ে আর একবার ঠেক। দেখেছিলাম, বড় গিন্নী স্বামীর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তখন সধবাদের মাখানো বরণের সিঁদুরে তাঁর সিঁথি কপাল লালে মাখামাখি। কী যেন বলেছিলেন, শুনতে পাইনি। নিজের লালপাড় শাড়ির আঁচল তুলে স্বামীর চোখ মুছিয়ে দিয়েছিলেন। যেন মা মুছিয়ে দিয়েছিল ছেলের চোখ। রানী মুছিয়ে দিয়েছিলেন রাজার চোখ। কত লোক সেখানে, সে দৃশ্যে কারুর লক্ষ্য ছিল না।

সঙ্গে সঙ্গে বড় রায়ের রাঙা মুখে বিব্রত হাসি। তাড়াতাড়ি নিজের গায়ের কাপড় টেনে নিজে নিজেই মুছেছিলেন। পরমুহূর্তেই হঠাৎ বড়গিন্নী চমকে একটু সরে স্বামীর পায়ের ধুলো নিয়েছিলেন। মনে হয়েছিল, পা ঠেকেছে বুঝি। বড় রায় বলে উঠেছিলেন, 'থাক, থাক।'

বড় গিন্নী তারপরে কী বলেছিলেন শুনতে পাইনি। দেখেছিলাম, বড় রায় হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছিলেন। আসতে গিয়ে আমার সঙ্গে চোখাচোখি। ভেবেছিলাম, কথা বলবার অবকাশ পাবেন না। গত রাত্রে পুজো শুরু হওয়ার সময় থেকে পাননি। যেন কিসের ঘোরে ছিলেন।

কিন্তু থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। হাত ধরেছিলেন। তখন ছোঁয়াছুঁয়ির নিষেধ শেষ। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'দেখছ তো বাবা!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

তখন হঠাৎ একবার প্রতিমার দিকে তাকিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'এইটুকুই বাবা, আর কিছু না। ব্যস্, শেষ হয়ে গেল। এই একটা দিন সারা বছরের মধ্যে। কী দিয়েই বা কী হয়, কিছু কী আর আছে আমাদের। আচ্ছা বাবা, দেখ, দেখ। এইবার বিসর্জন —মৌলীক্ষার মাঠে চলো।'

বলতে বলতেই এগিয়ে গিয়েছিলেন। মনে হয়েছিল গলাটা যেন কোন্ গহনে ডুবে যাচ্ছিল। নীল চোখ দুটো আবার টলটলিয়ে উঠছিল। পুজোদালানে তখন প্রচণ্ড চিৎকার, 'সাবধান হে!'...চালচিত্র সহ প্রতিমা থর্‌থর্ করে কাঁপছিল। প্রতিমাকে চালির ওপর তোলা হচ্ছিল।

কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম নিশ্চুপে, এক আতুর ভাবে। বড় রায়ের কথাগুলো বাজছিল কানে। মনে হয়েছিল, যা বলে গেলেন সে কথাগুলো শুধু কথা না। তার গভীরে আরো কিছু। রাজা রাজবসন্তের অধস্তন পুরুষ, পশ্চিমের বেলাশেষের আকাশে তাকানো পাখির মতো কী যেন বলে গিয়েছিলেন। হয়তো দিন যায়, রাত্রি আসে—এই কথা বলেছিলেন।

জয়ধ্বনি ক্রমেই বাড়ছিল। প্রতিমা আসন থেকে সরছিল। তেমনি দাঁড়িয়ে ছিলাম।

তারপরে সেই যে বলে ষষ্ঠেন্দ্রিয় চকিত হয়, আমার তেমনি হয়েছিল। মনে হয়েছিল, কে যেন আমাকে দেখছে, আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমি পিছন ফিরে তাকিয়েছিলাম। দেখেছিলাম, লাল মাটির এক ছোট ঢিবির ওপরে সুষি দাঁড়িয়ে।

চোখ ফেরাতেই চোখ মিলেছিল। সুষি চোখ নত করেছিল। একটু হয়তো হেসেছিল। কেন জানি না, মনে হয়েছিল, বড় রায়ের মুখের ছায়া যেন ওর মুখে পড়েছে। সেই চোখের জল এই চোখেও যেন টলটলানো।

প্রতিমা যাত্রা করেছিল। আমি পিছনে পিছনে গিয়েছিলাম। সুষিও এগিয়ে এসেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, 'মাঠে যাবেন?'

বলেছিলাম, 'হ্যাঁ। সেখানেই তো বিসর্জন?'

'হ্যাঁ। মাঠের কাছে যে পুকুর আছে, সেখানে।'

'কেন, মাঠের কাছে তো নদী আছে?'

'তাতে আর জল কতটুকু। প্রতিমা ডুববে না।'

মনে হচ্ছিল, নিজের জোরে চলছি না। ভিড়ের ঠেলায় আপনিই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। দাঁড়াবার উপায় ছিল না। ঢাকের শব্দ ছাপিয়ে মাঝে মাঝে হাঁক শোনা যাচ্ছিল, 'সাবধান—সাবধান হে।' ঢাকের শব্দ, জয়ধ্বনি, সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষের মত্ত মিছিল, সেই সবকিছুর মধ্যে কোথা থেকে যেন ক্ষ্যাপা গোবিনের গলায় গান বেজে উঠছিলঃ

'অই হে, আমি এই ভয়ে মুদি না আঁখি।
নয়ন মুদিলে পাছে, তারা-হারা হয়ে থাকি।
অহে, যখন থাকি শয়ানে তখন এই ভয় মনে,
না হেরে হারাই পাছে, চাহিয়ে ঘুমায়ে থাকি।'

এদিক-ওদিক চোখ ফিরিয়েছিলাম। ক্ষ্যাপা গোবিনকে দেখতে পাইনি। সুষি তাকিয়েছিল সামনের দিকে। ভিড়ের ওপারে যেখানে প্রতিমা দেখা যাচ্ছিল। চালির ওপরে মানুষের কাঁধে প্রতিমা থরথর কাঁপছিল, দুলছিল। কিন্তু মনে হয়েছিল, সুষি যেন প্রতিমার দিকে চেয়ে অন্য কিছু ভাবছিল। সেই আওয়াজই দিয়েছিল সে। হঠাৎ চোখ তুলে তাকিয়ে বলেছিল, 'ক্ষ্যাপার গান শুনতে পাচ্ছেন?'

গানেতে শ্রবণ ছিল সুষির। বলেছিলাম, 'পাচ্ছি।'

সুষি বলেছিল, 'ও কিন্তু কাঁদছে।'

'ক্ষ্যাপা গোবিন্?'

'হ্যাঁ।'

বলতে বলতেই থেমে গিয়েছিল সুষি। পাশে সরে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'যাবে না?'

'না, মাঠে আমরা যাই না।'

'কেন?'

'মেয়েরা যায় না।'

মেয়েরা যাচ্ছিল। সাঁওতাল বাউরি মেয়েরা। অন্তঃপুরের মেয়েদের মৌলীক্ষার মাঠে যাত্রা নিষেধ। সুষির কথার ভাবে সেই ইঙ্গিত ছিল। তবু জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন?'

সুষি বলেছিল, 'বড় মাতালের ভিড়। বিসর্জনের সময় যখন প্রতিমা মাঠে পাক দেয় তখন তরফে তরফে মারামারি লেগে যেতেও পারে।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'নিজেদের মধ্যে?'

'হ্যাঁ। তা ছাড়া—।'

কথা শেষ করেনি সুষি। কী যেন সে বলতে চেয়েছিল, বলতে পারেনি। আমার

চোখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে বলেছিল, 'দেখে আসুন।'

আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি। স্রোতের টানে হারিয়ে গিয়েছিলাম। স্রোত নয় হে, প্লাবন। ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। গ্রামের বাইরে, উৎরাইয়ের ঢলে গড়ান লাগতেই ভিড় ছড়িয়ে গিয়েছিল। মৌলীক্ষার মাঠ ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে। পশ্চিমের দিগন্তে, যেখানে আকাশের গায়ে পাহাড়ের রেখা, সেখানে রক্তের গোলার মতো সূর্য। যেন একখানি নরম কোমল শান্ত আর বিষণ্ণ রক্তিম মুখ। আকাশ লাল, মৌলীক্ষার প্রান্তর লাল, তালের পাতায় পাতায় লাল। আর মানুষ লাল, সকলই রক্তাভ।

দেখেছিলাম, প্রতিমার চালিতে হাত রেখে বড় রায়, ছোট রায় সকলেই এক মত্ত ঘোরে ছুটেছেন। মাঠ প্রদক্ষিণ করে চলেছেন দৌড়তে দৌড়তে। অন্যান্য তরফের প্রতিমারও সেই প্রদক্ষিণ আর ছোটার বেগ। সুষি ঠিকই বলেছিল, প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজনা। যখনই এক তরফের প্রতিমার কাছে আর এক তরফের প্রতিমা এগিয়ে আসছিল, তখনই হুংকার বাজছিল, লাঠি উঠছিল, 'খবরদার, যেতে দাও।' সেই বেগে ছুটেছিল ঢাকীরাও।

কিন্তু লক্ষ্য করেছিলাম, সাঁওতালিরা ক্রমে নাচে মেতে উঠেছিল। সেই গুচ্ছে, দলে দলে মেয়েদের সারির মুখোমুখি পুরুষদের সারি। প্রথমে দেখেছিলাম শতে শতে, তারপরে সহস্রে। শত শত গুচ্ছে, সহস্রের নাচ। মেয়েদের শরীরগুলো হাড় দিয়ে গড়া ছিল না যেন। অই কি বইলব হে, নাগরিক নজরে জগৎ-জোড়া বিস্ময়। মেয়েদের হাঁটু যখন সামনে, কটি তখন পিছনে। যখন কটির দোলন সামনে, তখন উঁচা পাহাড় বুকে ঢেউ খেয়ে চলে পিছনে। তারপরে যখন বুক এগিয়ে আসে তখন ফুল জড়ানো খোঁপার ভারে মাথা হেলে যায় পিছনে। যেন সাপিনীর দাঁতে বিষ, ছোবলে উদ্যত, এবার ফণা পিছনে।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত এমনি যখন হিলহিলানো, তখন দেখ পদক্ষেপের গোনা গাঁথা মাপ। শরীরে তিন মোচড়ে তিন ঢেউ, পায়ে পায়ে তিন ধাপ এগনো আর পিছনো, পুরুষদেরও তাই। মাদল বলো, বাঁশী বলো, রসের ধারায় মত্ত বলো, পদক্ষেপে ত্রুটি ছিল না। যেন মুখোমুখি নাগ-নাগিনী পেছিয়ে যায়, এগিয়ে আসে। এগিয়ে যখন আসছিল, মনে হচ্ছিল, মুখোমুখি ধাক্কা লেগে যাবে। কিন্তু স্পর্শ পর্যন্ত ছিল না। কেবল দুঁহু দোঁহার কটি বুক ছুঁতে গিয়ে না ছুঁয়ে পিছিয়ে যাচ্ছিল। দুজনে দুজনের নিশ্বাস মাখামাখি করে ফিরে যাচ্ছিল।

মেয়েদের গলা তখন খুলে গিয়েছিল। ভাষা বুঝিনি। গানের বচনের ভাব ছিল তাদের চোখমুখের ছটায়। তাদের হাসির ঝরায়, চোখের ঝিলিকে। মেয়েরা গান করছিল। পুরুষেরা মুখে শব্দ করছিল, হিস্ হিস্! হিস্ হিস্!...

মলুটির নিশিডাকের শেষ ঘোর আমার বাকী ছিল। মৌলীক্ষার মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল, আমি দুলছি। নাচের তালে তালে আমি দুলছি, মাঠ দুলছে, আকাশ দুলছে। মাদলের বোল, বাঁশীর কাঁপানো সুর, মেয়েদের গান, পুরুষের হিস্ হিস্, সব মিলিয়ে আমার চিরকালের জগৎ কোথায় মনে করতে পারিনি। যে জগতে অনেক নাচ ছিল, গান ছিল, হাসি ইশারা সব কিছু ছিল। কিন্তু সে নাচ গান রূপে ছিল। মৌলীক্ষার প্রান্তে দেখেছিলাম অরূপের খেলা। আমি ফিরে গিয়েছিলাম সেই কোন্ হিসাবহীন অতীতে। যবে সভ্যতার আলোতে ঝাঁপ খেয়ে পড়েনি মানুষ। বাস প্রকৃতির প্রাকৃত অঙ্গনে। যে অরূপ আমার রূপে-ভোলা চোখের সীমা পেরিয়ে রক্তে ছড়িয়েছিল চুঁইয়ে চুঁইয়ে। ইন্দ্রিয়ের দরজা পেরিয়ে কোন্ এক দূর লোকের রহস্যে ভাসিয়ে দিয়েছিল। যেখানে আমার চির দেখা মানুষের ও-পিঠে আর এক মানুষ

লীলা করে। যেখানে মানুষের আপন হাতের নিয়ম নেই। জগতের অমোঘ নিয়মে যেথায় সে প্রাণী মাত্র।

কখন ঢাকের শব্দ কমে আসছিল, খেয়াল করিনি। কখন প্রতিমার প্রদক্ষিণ শেষে বিসর্জন শুরু হয়েছিল জলাশয়ে, চেয়ে দেখিনি। কখন দূর পাহাড়ের আড়ালে রক্তের গোলা ডুবে গিয়েছিল, আকাশের রাঙা ঝলকে কালো ছায়া পড়তে শুরু করেছিল, চোখে পড়েনি। দেখেছিলাম, হেথা-হোথা এক-একটা মশাল জ্বলে উঠছিল। আর নাচ আর গান, মাদলের বোল, বাঁশীর সুর।

দেখেছিলাম, যেন মৌলীক্ষার মন্দিরের গায়ে পুরাণের কুশীলবেরাও নাচের তালে তালে দুলছে। নাচের তালে তালে সুঠাম দেহের নাচ। উদ্ধত বুকের কম্প, গর্বিত কটির ঝম্প, ব্যাকুল বাসনার আর্তি, সবে মিলে নাচ নাচ নাচ।

তারপরে যেন চেতনার শেষ রেশটুকুও মুছে গিয়েছিল। অই, ওহে, পবিত্রতার এমন অহংকার আর কোথাও দেখিনি। আমার চোখ থেকে সভ্যতার ঠুলিটা কে তুলে নিয়েছিল। দেখেছিলাম, প্রকৃতি নিরাবরণ। মানবসন্তান যেখানে মুখ দিয়ে প্রথম অমৃতপানে পৃথিবীতে চিৎকার করেছিল, সেই অমৃতভাণ্ড স্তন মুক্ত আকাশের নিচে। সৃষ্টির উৎসমুখ সকল উন্মুক্ত, মৃত্তিকার মত, মৃত্তিকার মুখোমুখি। পুরুষও তাই। বস্ত্র সে ছেড়ে ফেলেছিল। সৃষ্টির প্রক্রিয়া-আবেগে প্রকৃতির মুখে তার ঘন বর্ষণের ধারায় গভীর চুম্বন। সৃষ্টির কারণে তার ধরিত্রীর বুকে কৃষিকাজ। যেন মানুষের সুখের শ্রম।

ছায়া ছায়া আঁধারে দেখেছিলাম, নগ্ন প্রকৃতির বুকে নগ্ন মানব-মানবী। লীলা করে দুহুঁ দোহাঁ কুহরে সীৎকারে। হাসিতে, ঝঙ্কারে, আকর্ষণে, আলিঙ্গনে। এক না, একাধিক, শতেক যুগলে। রূপে না, অরূপে। যা চোখের সীমায় শুধু থাকেনি, দৃষ্টির ওপারের অসীমে, বিস্ময় শিহরণ ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল অচেতন চেতনার ঘোরে। রূপে যা অবিশ্বাস্য বলে জেনেছিলাম, অরূপে তা-ই বিশ্বাস্য হয়ে জেগে উঠেছিল। মৌলীক্ষার মাঠের আঁধারে সৃষ্টির নগ্ন খেলা চলেছিল। মনে হয়নি, প্রার্থনা ছিল, তা-ই আত্মদান। যেন যে যাকে চেয়েছে, তাকে নিয়ে সেই তার উৎসব।

উৎসব যা কিছু করো, ওহে মানুষ, ধরিত্রী উর্বরা হোক, সেই তোমার পূজো। পূজার আচার অনুষ্ঠান, যা কিছু সকলই সৃষ্টির ক্রিয়ায়। যে ক্রিয়া বৃষ্টিধারার অনুকরণে ক্রিয়ায়। যে-ক্রিয়া বৃষ্টিধারার অনুকরণে বীজবপনের ভঙ্গিতে, মৃত্তিকার গভীর স্তরে প্রবেশের অক্লান্ত আনন্দ শ্রমের প্রক্রিয়ায়। সে-ই তার আদিম কামনা, ধরিত্রী তুমি গর্ভবতী হও, শস্য দাও। যে মতো তোমার ক্রিয়া, সেই মতো আমার অনুষ্ঠান। হে মা, সেই অনুষ্ঠানে আমি সন্তান উৎপাদন করি।

ওপরে অসীম আকাশ, নিচে গণমিলনের আসর। মৌলীক্ষার মন্দিরের গায়ে তখন যেন দেখেছিলাম পুরাণের নরনারীরা একই অনুষ্ঠানে লিপ্ত। সকলের এক প্রার্থনা।

কতক্ষণ কেটেছিল, জানি না। বুকের কাছে দু' হাত রেখে আমার অচিন খোঁজার দ্বারে নিশ্চুপ দাঁড়িয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, পশুবলির চিৎকারে, ঢাকের দগরে, সময় যেমন বন্দী হয়েছিল আগে, তখন যেন মহাকাল মহাবেগে ছুটেছে। বিশ্ব-সংসার সকলই তার রথের রশিতে বাঁধা। তার প্রবাহে চলেছে।

'এই যে বাবা, সবাই তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। চলো, বাড়ি চলো।'

বড় রায় আমার গায়ে হাত দিয়েছিলেন। হাত ধরেছিলেন। সেই স্পর্শেও আমার চেতন ধমক খায়নি। তাঁর আকর্ষণে গ্রামের দিকে ফিরেছিলাম। দেখেছিলাম, অন্ধকারে মৌলীক্ষার মাঠ তখনো যেন কী এক ঢেউয়ে দুলছে। আর নক্ষত্রগুলো সেই মাঠের বুকেই ঝিকিমিকি করছে।

বড় রায়কে কোনো কথা জিজ্ঞেস করিনি। গ্রামটাকে শ্মশানের মতো স্তব্ধ নিশ্চুপ মনে হচ্ছিল। কিংবা আমার ভিতরটাই সেরকম স্তব্ধ হয়েছিল। বড় রায় একবারও আমার হাত ছাড়েননি। একেবারে বাড়িতে ঢুকে ছেড়েছিলেন। বাতি নিয়ে সামনে এগিয়ে এসেছিল সুষি। চোখে তার অনুসন্ধিৎসা, অপলক চেয়ে ছিল আমার দিকে। বড় রায় তাকে দক্ষিণের ওপরের ঘরে আলো দিয়ে আসতে বলেছিলেন। আমাকে বলেছিলেন একটু বিশ্রাম করে নিতে।

সুষি ডেকেছিল, 'আসুন।'

আমি আচ্ছন্নের মতো ওকে অনুসরণ করেছিলাম। গোবিনের মোটা গম্ভীর নিচু গলা শোনা যাচ্ছিল, 'মা আমাকে অভয় দিলি না। জগদম্বা নাম ধর হর অঙ্গনা।'...

'এই যে স্যার, বোলপুর এসে গেছে।'

চমকে ফিরে তাকালাম। মলুটি না, রেলগাড়ি। ইস্টিশন বোলপুর। চমক খেয়ে চেয়ে দেখি সামনে অতুলদাসের মুখ। বাঙলার মসনদের সিরাজদ্দৌলা। রেলের কিলিনার। বাইরে চোখ ফেরাতেই, অ। কী ব্যাপার হে, ইস্টিশন লোকে লোকারণ্য। ছাতিমতলার মেলার যাত্রী সব।

মনে হলো, রেলগাড়ির তাবত লোক, গাড়ির ঘর খালি করে নেমে এল। কেউ আর কোথাও যাবে না। সকলেরই যেন বোলপুরে গন্তব্য, গতি। যত অ-বোল বলো, সব হেথাতে। ঝোলাঝুলি নিয়ে আমিও তখন ইস্টিশনের দাওয়ায়। কিন্তু মলুটির ঘোর তখনো মনে। আমার প্রথম দেখা রাঢ়ের কীর্তন, তখনো যেন আখরের পৌনঃপুনিক বোলে বাজছে। মনের নজর পড়ে আছে মৌলীক্ষার মাঠে। সেই সূর্য-ডোবা আলোছায়া প্রান্তরে, যেখানে অরূপের খেলা খেলে নরনারী জীবন্ত মিথুন মূর্তিতে, বন্ধকাম লীলায়।

তারপরেও মলুটিতে বারেক গিয়েছি। দেখেছি সব, তবু প্রথমের তুলনা যেন নেই। সেই দেখা, সেই এক দেখা, যখন বিচার ছিল না আচরণ দর্শনে। তারপরে যা দেখেছি, শুধু দেখেছি। প্রথম যা দেখেছিলাম, সেই স্বপ্ন আঁকা চোখে। দেখেছি কি দেখিনি, সত্য না মিথ্যা, বিস্ময়ের আবেগে দেখা, সেই দেখাটা সত্য হয়ে আছে আজও। অনুসন্ধিৎসা বিচার-বিশ্লেষণ, যত প্রকার প্রকরণে দেখা, তার কোনো দাগ নেই মনে।

'ওদিকে না, এদিকে আসুন। ওপারে যেতে হবে স্যার পোল পেরিয়ে।'

তখনো সিরাজদ্দৌলা, ভিড়ে হারিয়ে যায়নি, ছেড়েও যায়নি। বরং আবার হাত বাড়িয়ে বলে, 'দিন না, একটা কিছু আমার হাতে দিন।'

না না, তা-ই কি কখনো হয়। বটে, আমার হাতে বোঝা, কাঁধে বোঝা। বোঝা সকলই আপন। বাহক না পেলে তা আপনিই নেবো, সিরাজের ঘাড়ে তা চাপাতে পারি না। বলি, 'না না, চলুন, ঠিক আছে। কুলি-টুলি—।'

আহ্ যা বলছে, তাই শুনুন না কেন স্যার। মিছে প্যাচাল কেন। এ তো আর লুট কাড়াকাড়ি না। যে যেখানে যার বাজনদার, তাকে সেখানে তাই বাজাতে দাও। অতুলদাস কিলিনার সিরাজ তেমনি করে হেসে বলে, 'কুলিটুলি মেলাই আছে, কিন্তু প্যাসেনজার দেখেছেন কত! কলকাতার গাড়িও তো এসেছে ওপারে। দিন, একটা দিন আমাকে।'

হ্যাঁ স্যার, না দেন তো, এমনি করেই নেবো। বাঁধানো বাঙলার মসনদখানি আলখাল্লা সদৃশ গরম কোটের যে পকেটে ঢুকেছে, সেটিকে বলতে পারো, হাত ভর এক গর্ত। এখন সেই পোশাকটির সকল বোতাম খোলা। দেখতে যদি বা মনে হয়,

তবু মনে করো না, যেন সঙের ঝালঝোম্পা। লম্বা লম্বা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া আতেলা চুলে ঝাঁকানি দিয়ে, একটা ঝোলা হাত থেকে টেনে নেয় সে। পা বাড়িয়ে দেয়, লাইন পেরনো পোলের সিঁড়ির ধাপে। তার পাশেতেই, সীমানা পাঁচিলের ধারে, সাইকেল রিকশাওয়ালাদের ডাকাডাকি। আমাদের দরকার নেই, আমরা যাবো ওপারে।

বোঝা খালাসে যে স্বস্তি পাইনি, এমন কথা বললে জিভ খসে যাবে। আর একথাও ঠিক, কলকাতার গাড়িও ইস্টিশনের ভিন্ দাওয়াতে দাঁড়িয়ে। সেই কারণেই লোকে লোকারণ্য দেখেছিলাম। ইতিমধ্যে অতুলদাসের স্বর বদলেছে, হাসির রকম-খানিও ভিন্ জাতের। পোলের ওপর যাওয়া-আসার ভিড়। তার মধ্যেই সে বলে, 'দেখুন স্‌সার, মানুষের ধর্ম হলো মানুষকে দেখা, না কী বলেন।'

'তা তো বটেই।'

'আপনার বাকসোটা আমি একটু হাতে করে বয়ে দিলে, হাতে তো আমার আর ফোস্‌কা পড়ে যাবে না।'

সেইজন্যেই মানুষের ধর্মের কথা। তবে আর আপনি এত লজ্জায় পড়েন কেন স্‌সার। তা না হয় পড়ব না, তবে পোলের এই এত ভিড়ে, যেখানে গোঁত্তা দিয়ে কাত হয়ে ঠেলে চলতে হচ্ছে, সেখানে মানুষের ধর্মের বচন ঠাওরানো একটু কষ্টসাধ্য, এই আর কি। তা হোক, তবু শুনুন, 'সময়ে আপনারটা আমি নেবো, আমারটা আপনি, না কী বলেন।'

বটেই তো। কিন্তু সেই তো ব্যাজ, অতুলদাসের মতন অমন উদার নজর পেলাম কোথায়। হাত বাড়িয়ে যে পরের বোঝা নেবো, হাতে মনে তেমন তাগদ পাইনি। তাই লম্বা কোট পরা ঝালঝোম্পায় ঠেলে চলা সিরাজের চলার চালখানি দেখলাম। তোমার ঠোঁটের কোণে একটু হাসির বাঁক লাগতে পারে। কিন্তু দেখেছ, যেন ঘাড় সোজা, মাথা তোলা, দরবারের পায়চারির চাল।

হয়তো আরো কিছু বলত, তার আগেই এক হাঁক শোনা গেল, 'এই যে ওত্‌লে, এ গাড়িতে এলি?'

ওপারে সিঁড়ির রেলিঙের বাইরে, একরাশ মানুষ। হাত বাড়িয়ে ডাক দিচ্ছিল, 'রিকশা চাই নাকি বাবু। এই যে বাবু, আমি বলেছি, আমি।'

সেই ভিড়ের মাঝখান থেকে ওত্‌লে ডাকের হাঁক বেজেছে। তারপরেই দেখ, অতুলদাসের মুখে হাসি। যার সঙ্গে হাসাহাসি, তাকেও দেখ। বীরভূমের মফস্বল শহরে খেটে খাওয়া যোবার মতন চেহারাখানি। গায়ে একখানি জামা, বুকের বোতাম খোলা। শীত লাগে না বুঝি! পরনের ময়লা কাপড়খানি হাঁটুর ওপরে তোলা। হাসির বেবাকটুকুই বন্ধু দরশনে খুশি। অতুলদাসের তা না। হাসির ধাচধোচ ঘোচঘাচ একটু ভিন্ জাতের। সেই দরবারি দরবারি। সেইভাবেই, একটু ঘাড় নেড়ে জানান দেওয়া, 'হ্যাঁ, ওত্‌লেই বটে, এ গাড়িতেই এল।' আওয়াজ দেয় অন্য কথায়, 'তোর গাড়ি আছে নাকি রে নিতাই?'

নিতাই জবাব দেয়, 'আছে।'

তার আগেই, ভিড় করা তিন চাকার গাড়ির চালকদের মধ্যে একজন পুছ করে, 'ক্যানে, তুই যাবি নাকি?'

পুছ করার সঙ্গে সঙ্গেই দু'-চার গলায় হাসির রোল বাজে। ব্যাপারটা যেন একটু কেমন কেমন। অতুলদাসের দিকে একবার আড় নজরে চাই। না, এত সহজ লয় হে, হাজার হাজার লোকের সামনে আসরে পালা করি। অমন দু'চার চিপটেনিতে আমাকে ঘায়েল করা যায় না। জবাব দেয়, 'না, এই ইনি যাবেন।'

ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখিয়ে, রেলিঙের ওপর দিয়েই আমার চামড়ার বাক্‌সো

এগিয়ে দিয়ে বলে, 'এটা নে রে নিতাই, বাবুকে নিয়ে যাবি।'

ভিড়ের ভিতর থেকে নিতাইয়ের হাত এগিয়ে আসে। আমার ঝোলা চলে যায় তার হাতে। তারপরে অতুলদাস আমার কাঁধের ঝোলাটার দিকেও হাত বাড়িয়ে বলে, 'দিন সংসার, ওকে দিয়ে দিই।'

তা দেবো কিন্তু অই দেখ হে, নগর-কুটিল মন আমার। ভাবি, ঝোলাঝুলি যে-হাত করে কার হাতে দিই, কিছু তো জানি না। মূলে হাভাত হবো না তো। জিজ্ঞেস করি, 'ওর গাড়ি কোথায়?'

অতুলদাস অনায়াসে হাসে। বলে, 'আছে, বাইরে ভিড়ের মধ্যে আছে, দিয়ে দিন-না।'

আমি নাবাবার আগেই সে কাঁধ থেকে ঝোলাটা নিয়ে বাড়িয়ে দেয় নিতাইয়ের দিকে। তখন আবার একজনের গলা শোনা যায়, 'লেতাইয়ের কপাল ভালো, ওতলে প্যাসেনজার ধরিয়ে দিলো। আমাদিগের এক-আধটো হবে না হে!'

আবার একটু হাসির রোল বাজে। তা বলে তুমি হেসো না হে। মনে মনে বলো, 'লোকগুলো বড় ব্যাদড়া তো।' তবে কিনা, তেমন বিষ গরলের ঝাঁজ নেই, মজা-খোরদের মজা। তার মধ্যে যেটুকু তেতোর আভাস, সেটুকু রসের তিক্ততা। অতুলদাস হেসে বলে, 'কত লিবি, লে না ক্যানে, প্যাসনজার তো মেলাই। আমার দিতে লাগবে না।'

হ্যাঁ, এত সহজে মচকাতে পারবে না। তবে যতক্ষণে বলা, ঘটনা ততক্ষণ না। ঠেলা বাঁচিয়ে কোনোরকমে ঝোলা চালান দিতে যতক্ষণ। তারপরেই ধাক্কায় ধাক্কায় একেবারে সিঁড়ির নিচে। তখন এদিকে চাপ, ওদিকে চাপ। যাবে কোথায় যাদু, দাঁড়াও। এর নাম ছাতিমতলার মেলা।

কিন্তু ই কী রকম মেলার যাত্রী হে! এতখানে এত মেলা দেখে এলে, এমনটা তো কোথাও দেখিনি। এমন নগর ছানিয়া, নাগরিয়া চালের যাত্রী, আর কোথায় দেখা যায়! অই যে সেই কী বলে, সড়কের নাম চৌরঙ্গী, কলকেতার বুকের হারের লকেট, যাত্রীবৃন্দ অনেক যেন সেই লকেটের খুলে পড়া ঝিকিমিকি গ! ইঙ্গবঙ্গ মিল মেশানো, মাথাতে টুপি, মুখেতে চুরুট, কোটপাতলুনের ছড়াছড়ি। গলায় গলায়, সেই কী ভাষায় বলে 'কন্ঠলেঙ্গুটি', তার নানাপ্রকার বাহার। তার সঙ্গে মেলাই দিশী ধুতি-চাদর চোগা-চাপকানও আছে। কিন্তু দেখ, সেথাও বেজায় নগর ঝলকানো ঝলক। মুখেতে ধূমপানের নল, হাসির জাত আলাদা, ভাষাতে দিশী-বিদেশী চিবিয়ে ছাড়া বাত।

ছাতিমতলার মেলার এত ঝলক, এই দূরের রাঢ়ে, রাজধানী ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে! না, এমন মেলার যাত্রী আর কোথাও দেখিনি।

কেবল কি যাত্রী নাকি, যাত্রিনীরা? দেখ এসে, রঙ-বাহার কাকে বলে। ধলীর মাথায় মীনারের মতন খোঁপা, কালীর চুল ঘাড় ছাঁটা, ফাঁপিয়ে দোলে বাতাসে। এমন ঝলক দেওয়া কাঁচস্বচ্ছ শাড়ি, তার ওপরে গরম জামার কী চোখ-ভোলানো শ্রীছন্দ। চোখের কালো ঠুলি যদি খোলা পাও, দেখ কাকে বলে কাজল-আঁকা, নয়ন প্রসাধন। কাকে বলে বিম্বোষ্ঠা, রঙে রাঙিয়ে। তার সঙ্গে চলন-বলন-হাসি, ঝকঝকানো মেয়ে-ঝোলার দোলদোলানি, ই বাবা গ, চলো সব ছাতিমতলায় যাই। না জানি সে মেলা কেমন!

তবে কি না, এর সঙ্গে সর্বপ্রকার পাবে। দেখ, এদিক ওদিক, দু' চার দশ ইস্টিশন টপকে আসা স্থানীয় মানুষ, নরনারী, তাদের দেখলে চেনা যায়। ঘর গৃহস্থির ছাপ, জামা-কাপড়ে, চোখমুখে, কথায়-বার্তায়। আগামীকাল সাতুই পৌষ, এদের আগাম

আগমন। এরাও মেলার যাত্রী, কিন্তু মেলার আগেই মেলা দর্শন করে দূর নগরের নাগরিক নাগরিকাদের দেখে। যেন অবাক কৌতূহলে অচিন দেখা দেখছে।

এদের মধ্যেই দেখলে চিনবে মেলার দোকানদারদের। কুলিদের মাথায় মাল চাপিয়ে চলেছে কেউ। কেউ আপন হাতে মাথায় পশরা নিয়েছে। হয়তো কেউ আসে বর্ধমান থেকে এক গাড়িতে, কেউ শিউড়ি থেকে আর এক গাড়িতে। তাদের বড় ব্যস্তত্রস্ত ভাব। সময় নেই, সময় নেই। পশরা নিয়ে বসবার একটা জায়গা চাই তো। তার একটা বিলিব্যবস্থা আছে তো। এদিক ওদিক ছড়ানো ছিটানো দুই-চারি রাঙামাটি-রঙ আলখাল্লা পরা না পাবে, এমন না। কারুর আছে বাঁয়া একতারা, কারুর দোতারা গলে। কারুর মাথায় রাঙা পাগড়ি, কারুর কেশে বাঁধা চূড়া। এরা বৈষ্ণব না বাউল, কে জানে। গাজীর কথা মনে পড়ে যায়। আরো পড়ে, কেন কি না, এক দুই পিকিতিও চোখে পড়ে যে। অর্থাৎ প্রকৃতি। গেরুয়া ছাপানো কাপড় তাদেরও অঙ্গে। ভিড়ের মধ্যে আরো আছে, সাঁওতালী আদিবাসী নরনারী। দেখে মনে হয়, সকলেই মেলায় যায়।

ইস্টিশনের দাওয়ার খাঁচা থেকে যখন কোনোরকমে বেরিয়ে এলাম, দেখি অতুলদাস আমার হাত ধরে আছে। ভিড় ঠেলে টেনে নিয়ে যায়। তিন চাকার যান বিস্তর। আমি চাই নিতাইকে। যার কাছে আমার সব। তবে ভয় নেই, তোমার নজরে পড়বার আগেই, ডাক শোনা যায়, 'এই যে, ওতুলে ইদিকে।'

অতুলদাস আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'কার বাড়িতে কোথায় যাবেন বলুন তো।'

বন্ধুর নাম করি। নিতাই বলে ওঠে, 'আর বলতে হবে না, আপনি ওঠেন, সে-বাবু আমার জানাশোনা।'

না হওয়াটাই তো আশ্চর্য। আমি উঠে বসি। অতুলদাস বলে, 'ভাড়া যেন বেশী লিস না নিতাই।'

নিতাই হেসে বলে, 'সে তোকে বলতে হবে না। মেলার সময় বাবুরা এসেছেন। মেলার মতন দেবেন।'

বলে আমার দিকে চেয়ে হাসে। অতুলও হাসে। বলে, 'তা হলে স্‌সার আসবেন কিন্তু। মঙ্গলবার আমাদের যাত্রা।'

'নিশ্চয়ই আসব।'

নিতাই গাড়ি ঠেলে। অতুল তার ঝালঝোপ্পার হাতা সুদ্ধ হাত তোলে। বিদায় দেয়। আমিও হাসি। কিছু বলি না, কিন্তু সিরাজদ্দৌলাকে মনে হয় ভাঙাচোরা মুখ একখানি, চোখের কোল বসা, ধুলা-মাখা আলখাল্লা পরা একজন বাউল, এই সকল হাসি কথার মাঝখানে, ওর চোখে কোথায় যেন একটা পরম খোঁজার আর্তি। যে-আর্তি যেমন গানে ভঙ্গিতে ঢাকা পড়ে থাকে, হঠাৎ চোখে পড়ে না, সেই মতো। জানি না, সে কিলিনারের সংসার-জীবনের অসহায়তা, না কি শিল্পীর হাহাকার। সব মিলিয়ে, কেমন একটা প্রাণ-উদাসী নিশ্বাস পড়ে। করুণা করব, তেমন সাহস নেই। মমতা বোধে বাধা কী। আর মনে হয়, কত না কিঞ্চিৎ আমি। কারুর জন্যে কিছু করতে পারি না। তাই কেবল ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়ে থাকি। অতুলদাস হারিয়ে যায়, রিকশার মিছিলের আড়ালে।

মিছিল ছাড়া বলব না। সামনে পিছনে অগুনতি রিকশা। তার মধ্যে আছে বোলপুর শহরের অন্যান্য যানবাহন। লরী বাস গরু-মহিষের গাড়ি। দেখে বোঝা যায়, বেচাকেনার বাজার ছোট না। দূরান্তের মানুষের আনাগোনা এখানে। শহরের মানুষেরা দেখছে দূরের মেলার যাত্রীদের। সব থেকে বেশী, নগর যাত্রী-যাত্রিনীদের, যাদের ছাঁটে কাটে বেশভূষাতে, পৃথিবীর বাজারে প্রকাশ, গতকালের প্রথম নমুনা। অঙ্গরাগে

প্রসাধনেও তাই। বলো, দূর রাঢ়ের চোখে, হাঁ করে অবাক হয়ে দেখবার বস্তু কি না।

তুমি দেখ, তা বলে সে কি দেখে! সে যায় ছাতিমতলার অঙ্গনে। কে জানে, সাধকের পীঠভূমিতে সে কেন যায়। কেন চলে সেই মরমীয়ার ঠাঁই। যেখানে গান বেজেছে ধ্যান থেকে। প্রাণের জন্ম হয়েছে কাব্যের তপস্যায়। যেখানে 'আলো আলো' ডাক ভারী আঁধার যাতনায়। হয়তো কেবল উৎসবে, তোমার মতন। কেবল মাতনে, কৌতূহলের অবাক বানের ঢেউ খেলাতে।

ঠেক খেতে খেতে, কিছু উত্তরে আসার পর, একটু ফাঁকা। তবু নগর চালের কোঠাবাড়ি, বায়স্কোপের ঘর পাবে। আবার লাল মাটিতে গোড়া রাঙানো ছোটখাটো বেণুবন, অন্যান্য গাছপালা, মাটির কুটির, মাঠ, জলাশয়, দু' পাশে ছড়ানো ছিটানো। তারপরে ডাইনে, পূবের প্রাঙ্গণে দেখ, মেলার সাজগোজ। অস্থায়ী চালাঘরের চালবেড়া, নানাখানে নানা রঙের সামিয়ানা, বড় বড় ঘেরাটোপে ঘেরা, কী যেন ব্যবস্থা সেখা। খেলা কি শিল্প, কে জানে। তবে মেলার সেই যে, নানা যাদু, সাপ পশু পাখির খেলা, চোঙা মুখে ডাকাডাকি, যন্ত্রে বাজানো গানের তারস্বর, তাও শোনা যায়। নীল আকাশের গায়ে দেখ নাগরদোলা এখনো কেমন ঠেক খেয়ে আছে। তবু যেন কলরবের মাঝে, বাজে তালপাতার বাঁশী। রিকশা বেঁকে যায় বাঁয়ে, এক লোহ-দরজার খোলা পাল্লার ভিতর দিয়ে।

যেন রঙ বদলে যায়, ভাব বদলে যায়। মনের মধ্যে সুর বদলে যায়, দৃষ্টিতে এক চমক খাওয়া চমকে. সহসা নতুন কাজলমাখা নিবিড়তায় স্বপ্নবৎ লাগে। রাঙা পথের দু' ধারে, গাছের নিবিড় ছায়া। রোদ এসেছে তার ফাঁকে ফাঁকে পশ্চিমের ঢলে যাওয়া বেলা থেকে। যতই কেন না-চিনি তবু আম জাম শাল জারুল চিনি। তারা সকলে মেশামিশি করে. কোথাও যে এমন রমণীয় হয়ে ওঠে, দেখিনি। অরণ্য দেখেছি। তার রূপ আলাদা। কিন্তু ছাতিমতলার সীমানায়, বাঁ দিকে মোড় খেয়ে. যেন এলাম এক স্বপ্নরাজ্যে। আপনভোলা এক গভীর গহনে। চোখ ফিরিয়ে যেখানে আমলকীর চিরল চিরল পাতা চিনতে ভুল হয় না। যেখানে মেলার কোলাহল দূরে, স্তিমিত ; মানুষের ভিড় আরো দূরতর, এই শীতের অবেলায়, শুনিয়ে দিলো হঠাৎ ময়ূরের কেকা। রূপকথার দেশ নাকি! পাখি ডাকে চিকচিক পিক পিক। এই মৃদুতর শীতের বাতাসে কোনো পাখি শিস দেয়। আর এতক্ষণের সকল ধূলা-ধোঁয়ার গন্ধ ছাড়িয়ে, নিশ্বাসে নিশ্বাসে যেন কী এক বিচিত্র গভীর গন্ধ। প্রকৃতির গন্ধ, শিরায় শিরায় প্রবাহে দেয় নিবিড় স্নিগ্ধ মদিরতা।

পথ কোথা দিয়ে বেঁকে যায়। ছায়া নিবিড়তা ঘনিয়ে আসে আরো। বন যেন নিবিড়তর, প্রকৃতির গন্ধ হয়ে আসে ঘন। কামিনী বকুল যত অ-ফুল গাছ, শীতে যত অমুকুলিত বন, যেন শীত সীৎকারে ডেকে ডেকে বলে, 'মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল, তাহা বুঝিতে পারো তুমি? শোননি কানে, হঠাৎ গানে কহিল, 'আহা আহা' সকল বনভূমি।'

আর আমার বুকে বেজে যায়ঃ

দুলিয়ে দিল সুখের রাশি,
লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি,
দুলিয়ে দিলো জনম-ভরা ব্যথা অতলা।

কেন বলি, তা জানি না। কেন ফিরি পথে পথে, কিসের সন্ধানে, সেই অচিনের নাম জানি না। ওহে, আমি তেমনি, জানি না, সাধকের ধ্যানস্থানে, মরমীয়ার লীলাভূমে, কেন আমার সুখ দুলে ওঠে। লুকানো হাসি হাসতে, জনমভরা ব্যথা বেজে যায় কেন।

মনে হলো, ছাতিমতলার দীক্ষা দিনের যে মেলা দেখতে এসেছি, তার প্রথম মেলা

এই দেখা। এই গাছপালা বন আকাশ, রাঙা মাটি, ছায়া নিবিড়, পাখির ডাক, এই প্রকৃতি মেলা। কেন হে, এই ভাবি মনে, ঋষি কেন এই ঠাঁই বেছে নিয়েছিলেন। এই ঠাঁইয়ে কান পেতেছিলেন আসন, নমস্কারে নত, আর উচ্চারণ, 'আনন্দং, অনন্তং, শুভং।'... এই প্রকৃতির মধ্যে কি দেখা মিলেছিল নিরবয়ব-এর, নির্বিকার-এর, একমাত্র-এর! কোন্ পাতার শ্যাম চিকনে ছিলেন ঋষির 'সর্বব্যাপী।' কোন্ ফুলেতে ছিলেন সেই 'নিত্য।' এই আকাশেই দেখেছিলেন নাকি 'অনন্ত-স্বরূপ। যখন সকল তর্ক শেষ, যখন যুক্তি যুক্তিহীন, সকল ব্যাখা অসীমে হারানো, তখন কি তা-ই এই ঠাঁই সেই ধ্যানে বসা 'জিন প্রেমরস চাখা নহী', অমৃতরস পিয়া তো ক্যায়া হুয়া?' তখনই কি এখানে এসে সেই প্রেম বন্দনা, 'যে প্রেমরস চাখেনি, সে অমৃতরস খেলেই বা কী।' প্রেম দাও, 'ঋষির' যবে এই ডাকডাকি, প্রেম দাও, তখন কি তা-ই 'মহর্ষি!'

যেন মনে হয়, সেই প্রেম থেকে শুরু মরমীয়ার। মরমীয়ার সৃষ্টি যত, সব প্রেমে বেজেছে।

'এই যে বাড়ি, বাবু!'

সামনে বাগান, শীতের নানান ফুল। খানে খানে ঘাস, খানে রাঙা মাটি। মাধবী বিতান আর টগরের ঝাড়, যূঁইয়ের লতানো কেয়ারি, পাশে হাসনুহানা। জামের ছায়ায় নিবিড়, শালের ছায়ায় ঢাকা। ডাক দেবার আগেই বন্ধুর সাড়া। তিনি একজন শান্তিনিকেতনের কর্মী। তবে যে একাল-ঘেঁড়োবৃত্তি নিয়ে ভাবুবে, এমন নিবিড় নিকেতনে, মনোহর ঠাঁইটিতে ঝোলাঝুলি নিয়ে একলা ঠাঁই নেবে, সে গুড়ে বালি। কেন হে, তুমি কি একলা বন্ধু। দেখ, দরজা খুলে দিয়েছে। বাসাখানি যাত্রীতে ভরপুর। নরনারী, ভরাভরি, হাসি গানে সবাই আকুল। আমাকে দেখে সবাই যেন অনেকদিনের চেনা, এমনি করে ডাক দিলো, 'আসুন আসুন।'

তার ভিতর থেকে বন্ধুপত্নী মিষ্টভাবে ডাক দেন, 'ভিতরে আসুন।'

তা যাবো, মুহূর্তে মনে হলো, মেলা লেগেছে, হেথা সবখানে বনে বনে, বনের নিকেতনেও।

বন্ধু-নিকেতনের জম-জমাটি আসরে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা মনে ছিল না। বিশ্রাম তো পরের কথা। আমার মতন কেবল যে বাইরের লোকেরা এসেছেন, তা না। এবার যাঁরা স্নাতকোত্তর, সেই ছেলেমেয়েদের ভিড়ও কম না। আশ্রমের দীক্ষান্তে শিক্ষান্তে এবার যাঁরা বিদায় নেবেন, যাবেন জীবনের পথে, সেইসব নবীন-নবীনারা এসেছেন কেউ কেউ। যাঁরা বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর ঘনিষ্ঠ সীমায় নিবিড় হয়ে ছিলেন এতকাল। বন্ধুর কর্ম এখানে এক দপ্তরে, তদীয় পত্নীর এক শিল্প-শিক্ষাভবনে। বিদায়ীদের এতকালের নিবিড়তা, সেই কারণে না। হেথা কারণের নাম প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-ভালবাসা। তাই বিদায়ের সময় যত ঘনিয়ে আসে, মোচড় দিচ্ছে তত। কোথায় দিচ্ছে, তাই ভাবো মনে।

এখন এই পড়ন্ত বেলায়, পৌষ মাসের ছ' তারিখে বিদায় নিতে আসেনি কেউ। এ হলো বিদায়ের পূর্ব পর্ব সকল। গানে গল্পে কেবল স্মৃতিচারণ। অনেক দিনের অনেক কথা। অচিন মানুষ, কান পেতে শুনি তার মধ্যে অনেক সুখদুঃখের বারতা। কবে কোন্ চড়ুইভাতির আসরে কত হাস্যকর ঘটনা ঘটেছিল, কবে খোয়াই ধরে এগিয়ে কোপাইয়ের কলকল ধারায় বেলাশেষের ভ্রমণে কতটুকু সুখে দুলেছিল, ব্যথা বেজেছিল, সেইসব স্মৃতিচারণ। কবে কঙ্কালীতলার পথে কী মজা লেগেছিল, কবে অজয় দর্শনে গিয়ে কী বিপদ ঘটেছিল, সেইসব স্মৃতিচারণ। বন্ধুগৃহের মেলায়, এক ধারে বিদায়ীদের এমনি স্মৃতিচারণের মেলা। বলো, স্মরণোৎসব।

আর এক দিকে, আমার মতন বহিরাগতদের আগমন। তারা কেউ বাজে হাস্যে,

কেউ হাঁকে। বন্ধু ও বন্ধুপত্নী অভ্যর্থনা করেন, আসুন, আসুন। সব কিছু আছে। তবে, ওহে ছাতিমতলার যাত্রী, এক দিকেতে শিকড় নামিও না, খানে খানে ছড়াও। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ো। নইলে, ফাঁকি পড়ে যাবে অনেক কিছু। মেলার এক দিকে দেখে কি চোখ ভরে, না মন ভরে! তবু সেই কোন্ দূর উত্তর-পশ্চিমের দেশ পাঞ্জাবের বিদায়ী মেয়েটিকে তার বন্ধুরা সবাই যখন গান গাইবার জন্যে ধরে, তখন অবাক মানি তার মুখে মরমীয়ার বাংলা গানের সুরে, 'তবু মনে রেখ...।'

গৌরী মেয়ে, টিকলো নাক, বড় বড় ফাঁদের নীল নীল ভাবের চোখ, একটু যেন রাঙা রাঙা ছোপের খোলা চুল দেখলে মনেতে আন্দাজ পাবে, সে মেয়ে বাংলার না। অথচ গান শুনে, সুর স্বরে উচ্চারণে আন্দাজ পাবে না, সে মেয়ে কোন্ সীমার। তখন তোমার মন আওয়াজ দেবে, রূপে যাই হোক, অরূপে তার খেল্। সেখান থেকে দেখলে মনে করবে, সে মেয়ের বুঝি জন্ম কর্ম সকলই বাংলায়। তাই সে সীমার ধরায় নেই, সে অসীমা।

কিন্তু, তাই কি সব কথা গান দিয়ে শেষ করতে পারে! দেখ, হঠাৎ গান থেমে যায় গলার কাছে, সুর বেধে যায় বুকের কাছে। সহসা, সবার মাঝে চোখ হয়ে যায় দরিয়া। কান্নার বেগে গান হরণ। বাকী বিদায়ীদের মধ্যেও যেন হঠাৎ তারই ছোঁয়া লাগার আশঙ্কা। সবাই চুপ, স্তব্ধ।

আহ্, অমন করলে কী হয়! বন্ধু অমনি হেঁকে ডেকে ওঠেন, 'আহা, কী ছেলে-মানুষ দেখ, গানটাকে মাটি করলে। এমন সুন্দর ধরেছিলে। কেউ তো পালিয়ে যাচ্ছে না। আবার যখন খুশি, তখনই তো আমাদের দেখা হতে পারবে।'

বলে গলা খুলে হাসি।

তাই বুঝি! অই মশায়, দাঁড়ান গ. আওয়াজেই মালুম পাওয়া যাচ্ছে, হাসিটা তেমন যেন প্রাণের ঝরায় ঝরছে না। টুকুস কাষ্ঠ-কাষ্ঠ লাগছে। শুধু তাই না, হাসতে গিয়ে পত্নীর দিকে তাকানোর লক্ষণটিও তেমন ঝরঝরানো না। একটু বিষাদ-ছায়া-ছায়া।

পত্নী যেতে চাইলেন তার ওপর দিয়ে। মেয়েটির গায়ে হাত দিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে হেসে প্রায় ধমকের সুরে বলেন, 'কী পাগল মেয়ে রে বাবা। ওরকম করলে কিন্তু আমি খুব রাগ করব। চোখ মোছো, গানটা আবার ধরো, আমি আসছি।'

বলতে বলতে সরে গিয়ে পর্দা তুলে পাশের ঘরে যান। হ্যাঁ, একটু জলদে যান, নইলে আপনার চোখের জল ধরা পড়ে যাবে। আপনার চোখের ধোয়া কাজল সকলের চোখে পড়ে যাবে। তখন আপনার পাগলামি কে দেখবে। আপনার ওপর কে রাগ ঝরাবে।

কিন্তু তেমন হাওয়া বেশীক্ষণ থাকে না। থাকলে চলে না। তাই হাওয়া ঘোরাবার দল নতুন সুরে নতুন গান জুড়ে দেয় গুনগুনিয়ে। গৃহকর্তা অতিথির পরিচর্যায় ব্যস্ত হন। হোক পড়ন্ত বেলা। এসব নিয়ে এখনই বসে পড়লে হবে না। স্নানাহার, তৎসঙ্গে কিঞ্চিৎ ক্লান্তি মোচন চাই। অতএব বন্ধুর নির্দেশে আমাকে যেতে হয় গৃহের অন্য সীমানায়। স্নানাহার ক্লান্তি মোচনের সীমানায়।

সেখান থেকে শুনতে পাই, অন্য ঘরে হাসি বেজে উঠেছে। তবু, গলায় ঠেক খাওয়া, গান থেমে যাওয়া ছোট ঘটনাটি ভুলতে পারি না। হয়তো এই আশ্রমে ওরা এসেছিল কাঁদতে কাঁদতে, আজ যাবেও তাই। আসার সময় হয়তো মনে হয়েছিল, চলেছে নির্বাসনে, অচেনা অপরিচয়ে, ভয়ে সংশয়ে। হয়তো ছেড়ে কিছু যায় না, নিয়েই যায় কিছু। তবু আজ ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে ভেসে ওঠে অনেক কিছু। অনেক মুখ, অনেক আলো-কালো দিন, প্রকৃতির বিচিত্র লীলা। ছাতিমতলার যে প্রকৃতিকে এই

মাত্র দেখে এলাম, এক মুহূর্তে। এখানে কেবলই কি অধ্যয়ন, কেবলই শিক্ষা কী! আর কিছু না! আর একটি জন্মের কাহিনী, ইতিহাস কি নেই! আর একটি মনের, আর একটি প্রাণের জন্মের, যার সঙ্গে জড়ানো রয়েছে নানা ঘর, নানা লোক, বন-বনান্তরের স্মৃতি!

হয়তো আজ শান্তিনিকেতনের ঘরে ঘরে এই পূর্ব পর্বের পালা চলেছে। এক দেখেই বহুকে চেনা যায়। তবেই বলো, মেলা কেবল ঝলকে না, অলখেও বটে, যাকে বলে অলক্ষ্যে। ছাতিমতলার মেলা, এও এক মেলা।

কিন্তু স্নানাহার যদি বা সারা গেল, ক্লান্তি মোচনে অরুচি। যা নেই, তা মোচনের কী কথা। বন্ধু জিজ্ঞেস করেন, 'তবে, ঘরে, না বাইরে?'

বলি, 'হাতছানিটা তো বাইরেই দেখছি।'

'আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। বেলা এখনো একটু আছে, চলুন এ বেলাতেই বেরিয়ে পড়া যাক। আপনার সাধ ছিল এখানকার গুণীজন দর্শনের। মেলার কাজে অনেকেই ব্যস্ত, তবু দেখা যাক, কতজনের দেখা মেলে।'

এমন উৎসাহী বন্ধু পেলে উৎসাহ বাড়ে। অতএব, তৎক্ষণাৎ বাইরে। পথে পা দিয়ে আবার চোখের রঙ বদলে যায়, মন ভুলে যায়। শীতের বিকাল সোনালী বলে জানি। শান্তিনিকেতনের সেই সোনালীতে আরো যেন কী মিশেছে। ব্যাখ্যা করতে পারব না। ছায়াতে রহস্য থাকে। আলোতেও এমন রহস্য আর দেখিনি। মাটিতে আকাশের প্রতিবিম্ব, নাকি আকাশে মাটির, ধরতে পারি না। সকলেই যেন সোনায় সোনায় মাখানো। শালের পাতায় যত লালের আভা, সে জানবে, শীতে। নতুনের পথ ছেড়ে দিতে, এখন তার ধুলায় যাবার দিন। তাই দেখি, লাল হয়ে আসা শালের পাতায় পাতায়, একেবারে নিষ্পত্র গোলকচাঁপার ডালপালায়, সবখানে সোনা মাখামাখি। শুকিয়ে আসা আমের পাতায়, জাম আমলকী স্বর্ণচাঁপার পাতায় পাতায় সোনালী ঝিলিক। একেবারে সোনালী বলব না, এ সোনায় রাঙা রাঙা ছায়া। এ যেন যাবার বেলা রাঙিয়ে দিয়ে যাওয়া। যে যাওয়াতে লাজে লাজানো সুখের বালাই। কেবল যেন নিশ্চুপ অপলক চোখে ব্যথায় চেয়ে থাকা। সহসা বেজে ওঠে ব্যথায় যেমন, নির্বাক মুখে লাগে ব্যথার রক্তাভা। সব মিলিয়ে এ শুধু শীতের এক লালে সোনায় মাখামাখি না। এর নাম ছাতিমতলার বিকাল। আর একটু বলি, শান্তিনিকেতনের বিকাল।

বন্ধু এদিকে দেখান চীনাভবন, ওদিকে হিন্দী। বলেন—নানা ভবনের কাছাকাছি আছে পিয়ারসন পল্লী, এন্ড্রুজ পল্লী।

মরমীয়ার প্রাণে যবে 'বলাকা'-র পাখা মেলেছিল, 'ফাল্গুনী'-র ছন্দে বেজেছিল দোলা, তখন আর এক স্বপ্ন কর্মযজ্ঞের সাধনায় রূপ নিতে চেয়েছিল, তার নাম বিশ্বভারতী। রূপ নিতে চায়নি কেবল, সৃষ্টিঘরের ঘন্টায় তখন যুগের এক নতুন তাল বেজে উঠেছিল। রূপ পেতে চলেছিল। আর অরূপ ঝরার দুই প্রবাহে মরমীয়া যেন ভেসে চলেছিলেন, যে প্রবাহের এক নাম মানুষ, আর এক নাম ঈশ্বর। টান লেগেছিল যেন দুই স্রোতের ধারায়। সেই দুয়েতে কোথায় যে এক বাঁধাবাঁধির খেলা, চাওয়া পাওয়া, ভালবাসাবাসি, প্রেম পীরিতি, ছোঁয়াছুঁয়ির লীলা, পারাপারের সেই সাঁকোটাই নানা রূপে দেখেছিলেন তিনি। দেখেছিলেন বনের সবুজে, আকাশের নীলে, রৌদ্রে মেঘে, ফুলে ফুলে, ফলে আর শস্যের মাঠে, পাখিপাখালির ডাকাডাকিতে, পতঙ্গের রহস্যগুঞ্জনে। সেই সাঁকোর নাম প্রকৃতি। তাঁর ঈশ্বর মানুষ। দুই ধারাতে পারাপার প্রকৃতির সাঁকো ধরে।

দুই প্রবাহের টানে তাঁর চলনও সেই সাঁকোতে। মরমীয়ার সাধ, তিনি যাবেন মহাসাগরে। যেখানে সকলের মিলে মিলনলীলা। এইখানে দাঁড়িয়ে মনে হয়, রয়েছি

সেই মহাসাগরের এক উপকূলে। শান্তিনিকেতনে সেই বিশ্বভারতের মিলামিশের মেলা। এখানে সকল ভুবন ভবনের নামে নামে, কানে কানে। গাঁয়ের নামের স্মৃতিতে।

রাস্তা চলে গিয়েছে পুবে পশ্চিমে। লাল সড়কে বাঁক লেগেছে পশ্চিমে, সোজা-সুজি সবুজ মাঠ শেষ রোদের সোনায় মোড়া। পুবেতে লোহার ফটক, যে পথ দিয়ে এসেছিলাম। তার ওপারে মেলা। এখানে ওখানে, সব পথে লোকচলাচলের বাড়াবাড়ি। মেলা জমতে শুরু করেছে।

রাস্তা পেরিয়ে বন্ধু নিয়ে চললেন নানা কাননের মাঝে। দু' পাশে আমলকীর সারি। দেখি, লাল পথের ওপর ফল পড়ে আছে। নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে তুলে নেবো না, তেমন নির্লোভ হতে শিখিনি। সামনে এক নানা রঙের ঝিলিকি ঝলক-হানা গৃহ। ফটক পেরিয়ে চোখে পড়ে টালির ছাদ। নানা রঙের কাচের চৌকায় সাজানো দেওয়াল। নানা ছাঁদে লোহার ফ্রেমের নানা কারুমিতি। তার গায়ে লাগানো, আর এক দিকে, দূর থেকে যেন দেখি রথের মত চূড়া নিয়ে উঠেছে এক অংশ। বন্ধু বলেন, উপাসনার মন্দির।

তারপরে যাই ছাতিমতলায়, যেখানে পাথরের বেদী পাতা রয়েছে। ধ্যানী যেখানে আসন পেতেছিলেন, যে আসনের গায়ে লেখা আছে মন্ত্রের বাণী। দুই বৃদ্ধ ছাতিম, তাদের ঘিরে পাকা আসন পাতা। এইখান থেকে শান্তিনিকেতনের শুরু। এইখানে বসে, 'আগে চাখি প্রেম, পরে অমৃত' এই সাধনার শুরু। যার অলখ দুয়ার থেকে সেই মহাসাগরের প্রেম-দুয়ারের যাত্রা।

দেখি, ছাতিমের পাতায় পাতায় লাল-সোনার প্রলেপ। তার ছায়ার কোলে কোথায় কারা কী যেন কথা বলে। কথা বুঝি না, ডাক শুনি, পিক্ পিক্, কিচির কিচির। এমন না যে, সবাই মিলে সমবেত গায়। যেন একা একা, আচমকা, ক্ষণে ক্ষণে কী বলে ওঠে। হেথা হোথা দু'-একটি শুকনো পাতা ঝরে পড়ে। ছাতিমের গোড়ার দিকে চেয়ে, কী বলব হে, হঠাৎ যেন শিরায় শিরায় কিসের এক শিহরণ খেলে যায়। থির নিস্তরঙ্গ প্রাণ কেমন ছলছলিয়ে যায় তরঙ্গে। সহসা এক ছবি ভেসে ওঠে চোখে। এই ছাতিমের মতো প্রাচীন গম্ভীর এক মানুষ যেন ধ্যানে বসে আছেন। যাঁর দৃষ্টি বন্ধ না। যেন ছলছল দু' চোখ ভরা বিস্ময়, মুগ্ধতা, আনন্দে টলটল করে। সে ঋষির সকল কিছুতেই ধ্যানের রূপ দেখা।

সেখান থেকে আমবাগানের পথ ধরে যাই সেই পুরনো দোতলা বাড়ির সামনে। বলো, তপোবনের সেই প্রথম কুটির। ঋষির নিবাস। লাল উঠোনের মাঝখানে শিল্পীর বিচিত্র ভাস্কর্য। উত্তর দিকে লাল কাঁকর ছড়ানো পথের দু' পাশে গাছ। দেখি, তার মধ্যে আমলকীই শুধু। ফিরতে গিয়ে, আমগাছের এক নিচু ডালে দেখি, তিনি বসে আছেন, একেবারে ভুঁয়েতে পুচ্ছ ঠেকিয়ে। কৃষ্ণের মাথায় যার শোভা, সেই শিখিপুচ্ছ ধুলায় হে! কিন্তু কিছু বলতে পারবে না, আপন পুচ্ছ নিয়ে কর্তা যা খুশি তাই করবেন। চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ, তেমন একটা ভয়-চকিত চাহনি না। তবে, কে-ক্ বলে ডাকটি না শুনিয়ে ছাড়বে না।

বুঝতে পারি, আশ্রমের সীমানায় ঢুকে প্রথম কোথা থেকে এই ধ্বনি বেজেছিল। ইনিই বাজিয়েছিলেন। কেন, এই শীতে কি বর্ষার তপস্যা! ঘরে এই রাঙা মাটি ভিজবে, গাছে গাছে ঘাসে ঘাসে ঝিরিঝিরি ঝরবে, আর আকাশ জুড়ে কালো মেঘে সৌদামিনী হাসি হানবে। ময়ূরের চোখেতেও সেই দিনের ধ্যান নাকি।

তবে বর্ষা না পড়লেও এ পাখি ডাকে। মনে পড়ে যায়, ছোটনাগপুরের সারণ্ডার গভীর অরণ্যে, আগুনে জ্বালানো শীতের রাত্রে সারা রাত কেকাধ্বনি শুনেছি। দিনের বেলা দেখেছি, নির্ভীক বনময়ূরের চলাফেরা।

ঘুরে ঘুরে বন্ধু দেখান সেই ছোট বাড়িখানি, যেখানি মরমীয়া নিজের বাসা করেছিলেন। এখন কোনোটাই আর বাসগৃহ না, কাজের ঘর। দেখতে দেখতে নানা কথা শুনি। বন্ধু পুরনো দিনের কথা বলেন। তাঁর নিজেরও শোনা কথা সেসব। হয়তো কেতাবেও পড়েছেন। বলেন, কতটুকু জায়গা নিয়ে প্রথম কবে ধ্যানী এসেছিলেন। ছাতিমগাছ দুটিকে ঘিরেই প্রথম পত্তন। ওই যে দক্ষিণে, যেখানে নিচু বাঙলা, আরো পরে জলাশয়, তার ওপারে ভুবনডাঙা গ্রাম। সেই গ্রামে থাকত তখন শুধু ডাকাতদল। অমন সুন্দর নাম, কিন্তু গ্রামের অধিবাসীরা সব ডাকাত। সেই কথাটিই বোঝো তাহলে, নামে কামে অমিল বড়। যেমন-তেমন ডাকাত না। তাদের যে সর্দার ছিল, তার হাতে নাকি লাঠি তলোয়ার সমান চালে খেলত। রণ-পা চড়ে এক রাত্রের মধ্যে সে-ই বর্ধমান গিয়ে ডাকাতি করে নাকি ভোররাত্রে ঘরে এসে শুয়ে পড়ত।

তবে সে-ই শেষ না। সেই সর্দার ডাকাতি করে ধরা পড়েনি। ধরা পড়েছিল ধ্যানীর কাছে। যে ধরাতে শাস্তির থেকে আনন্দ বেশী। ঋষিবাক্যে কেবল ডাকাতি ছাড়েনি, সারা জীবনটা তারপরে ভুবনভাঙার ডাকাত সর্দার এই নিকেতনের নানান কাজে থেকেছে। শুধু সর্দার না, ভুবনভাঙার সব ডাকাত ডাকাতি ছেড়ে মাঠে নেমেছিলেন হাল বলদ নিয়ে। ডাকাত তখন কৃষক।

বন্ধু দেখিয়েছিলেন উত্তরায়ণ গৃহ। তার উত্তরে শ্যামলী। উত্তরায়ণের পিছনের বাগানে গাছের ডালে নানান কলাকৌশলের কারুমিতি। যে গাছের কথা ছিল আকাশ উচে হাত বাড়ানোর, সে তার দেহ নিয়ে ডাইনে বাঁয়ে সমান্তরাল। নানা জাতের, নানা গাছে, ডালপালাতে জড়াজড়ি। আম-পেয়ারায় মেশামেশি, তার চেহারা আলাদা, পাতাও যেন অন্যরকম। সে ফলের নাম কি, কে জানে। আমপেয়ারা নাকি! সেখানে ছোট জলাশয়, তাকে ঘিরে বিচিত্র বীথি ও কুঞ্জ। তার পাশে নতুন ভবন, বিচিত্রা। বন্ধুর কথা শুনে বুঝতে পারি, কেবল বিচিত্রা না, রবীন্দ্র বিচিত্রা। মরমীয়ার যত কিছু হাতে ছোঁয়া বস্তু, তাঁর যত কর্ম, যত ঘরে-বাইরে পরিচয়, সব কিছুর মেলা সেথায়। আশা আছে, দেখতে পাবো পরে।

বেলা যখন পড়ে যায়, সোনালী চলে যায়, লালের ওপর ছায়ার আঁধার পড়ে লাল গাঢ়তর হয়, তখন খেয়াল পড়ে, আমরা গুণীজন দর্শনে বেরিয়েছিলাম। সেই গুণীজন, যাঁরা মরমীয়ার ঠাঁইয়ে থেকে মরমীয়ার ধ্যানের অংশে নিজেদের প্রকাশ করেন।

তা দর্শন কম মেলেনি। নায়ক, চিত্রকর, ভাস্কর, শিক্ষক, সাহিত্যিক। যত ঘরে গেলাম, সকল ঘরেই অতিথির ভিড়, আমার বন্ধু বাড়ির মতোই। সব ঘরেতেই মেলা।

সেদিন রাত্রি হয়ে যায় অনেক। মেলা দেখব পরের দিন। রাত পোহাবার পরেই প্রথম যাত্রা ছাতিমতলায়। প্রথমে উপাসনা, প্রার্থনা, তারপরে অন্য কিছু।

সাতুই পৌষ। সকালবেলার প্রথম শুরু ছাতিমতলায়। গম্ভীর উচ্চরবে প্রথম উচ্চারিত স্তোত্র। রোদ উঠেছে সবে। এ রোদ কাল বিকালের না। এ রোদে কাঁচা সোনার ছটা। কাঁচা সোনার ছটা লেগেছে, ছাতিমের ছায়া পেরিয়ে দুর্বা ঘাসে, লাল কুচো পাথর ছড়ানো ভুঁয়ে। লেগেছে আশেপাশে, আমবাগানে, শাল-সেগুনের পাতায় পাতায়। ছাতিমের ছায়াতলে বেদী। সেখান থেকে উচ্চারিত হয় স্তোত্র। সুরে গাম্ভীর্যে, রবে যেন কোন্ দূর দিনের স্মৃতি নিয়ে আসে মনে। দূর কালের ছবি জাগিয়ে দেয় চোখে। তখন মনে হয়, ছাতিমতলা ঘিরে এত চিত্রবিচিত্র মানুষের ভিড় থেকে চোখ সরিয়ে নিই। নত দৃষ্টি কিম্বা ঊর্ধ্বে চেয়ে থাকি, যেখান থেকে উঠেছে ডাক, যেখানে ছড়ায়। মনে করি, না যেন বলি, দাও ফিরে সে অরণ্য। তবু কেন ছবি

ভাসে তপোবনের। তবু কেন মনে হয় একবার যাই সেথা, যেথা বনস্পতিচ্ছায়ে ঋষি বন্দনা আবৃত্তি করেন। যেন সবুজ পাতায় পাতায়, রোদে রোদে, আকাশে, মহাশূন্যে সেইসব পৌঁছায়। আর দূরে দূরে কৃষক-রাখালগণে সেই সুরে কান পেতে পশু নিয়ে চলে, যাদের গলায় বাজে দূর ঘণ্টাধ্বনি। পাখি সব করে রব, কাননে কুসুমকলি ফোটে। আর উঠানের হরিণী সংকেত পায়, এবার খাবার সময়, কান পাতে ঋষিবালা মানবী মায়ের পায়ের শব্দে। দানা দাও এই কথা জানায় অন্যে, কেকারবে পুচ্ছ নাড়া দিয়ে।

যখন হাটে-বাটের লেনাদেনায় শ্রমে-ঘামে ফিরি, তখন ভুলে যাই এমন ভারত ছিল। সে ভারতের প্রয়োজন আছে কিনা, সে কথা পুছ করো না। কালের দাগ নিয়ে নিয়ে চলে অধরা পৃথিবী। তবু এক মন থাকে—এক মন, আপনাকে আগের দেখায় দেখতে তার সাধ। পূর্বপুরুষের সেই ভারতলীলায়।

স্তোত্র শেষ হয়। উপাসনার বাণী উচ্চারণ করেন আচার্য। একটু নিচে বড় বেদীতে আসন নিয়েছেন সঙ্গীত ভবনের গুণীজনেরা। সঙ্গে তাঁদের শিষ্য-শিষ্যারা। লাল কুচো পাথর ছড়ানো ভুঁয়ে আসন নিয়েছেন অতিথিরা, আশ্রমিক সংঘের বড় ছোট নর-নারী, বালক-বালিকারা। আর সব আমার মতন, যারা ছড়িয়ে আছে ঘিরে।

তার মধ্যেই দেখ, কত লয়ে কত কথা, কত সুরে হাসি। ওই দেখ গাছতলাতে তামাকের নল চিবিয়ে চিবিয়ে গলায় লেঙ্গুটি বাঁধা যুবা যুবতীর কানে গুনগুন করে। হোথা দেখ সুবেশ-সুবেশাদের কী যেন হাসিখুশির ভিন্ জটলা। এখানে সকলের ডাক, সবাই আসে। সবাই আপন ভাবেতে আছে, যার যেমন ভাব। তুমি থাকো স্ব-ভাবে!

উপাসনার পরে সমবেত গান। নানা গালায় এক সুরেতে সব নতুন রূপে ফোটে। কাঁচা সোনার রোদ যেন চকিত হয়ে ওঠে। ঠান্ডা বাতাসে পাতায় পাতায় দোলা লেগে যায়।

বন্ধু সংবাদ দেন, আগে এই অনুষ্ঠান হতো উপাসনা-মন্দিরে। ক্রমে মানুষের ভিড়ে মন্দিরের অনুষ্ঠান এসেছে গাছতলায়, মাঠের বিস্তৃতিতে। আরো সংবাদ, আগে মেলা যায়নি, রাস্তার ওপরে পূর্ব আর দক্ষিণ পল্লীর মাঠে। আগের মেলা ছিল, উত্তরায়ণের পুব গাঁয়ের মাঠে, যার এক দিকে বাঁক খেয়ে চলে গিয়েছে শ্রীনিকেতনের রাস্তা, আর এক দিকে কোপাইয়ের ধারে। সেই মাঠের দক্ষিণে বটের তলায় ছিল বাউল সমাবেশ। এখন সকলই অন্যখানে।

গানের শেষে প্রথম যাই বিচিত্রা-তে। রবীন্দ্র-বিচিত্রা যাকে ভেবেছি। মরমীয়ার নানা লীলা, নানান খেলার চিহ্ন এখানে। প্রিয়জনের দেওয়া নানা স্মৃতি-উপহার, ব্যবহারের নানান জিনিস, বরণ-সংবর্ধনার পদক, পান্ডুলিপি, চিত্র, আর দেশ-বিদেশে দিগ্বিজয়ের অনেক ছবি। তবু তার মধ্যে যেখানে তিনি ঘনিষ্ঠ রূপে, সেইসব পারিবারিক ছবি। যার ভিতর দিয়ে এই দর্শকের চোখে আর মনে থেকে যায় গভীর বিস্ময়, পরম কৌতূহল। হয়তো আগেও অনেক দেখেছি, আবার দেখি আর বিস্ময় আর কৌতূহলে এই কারণে বারেবারেই দুলি, যখন ভাবি এই মানুষে সেই মানুষ ছিল। এই রূপেতে সেই অরূপ ছিল, লক্ষ্যেতে আলেখ। দেহরূপের এই খাঁচাতেই সেই অচিন পাখির যাওয়া-আসা ছিল। যে পাখির নাম প্রাণপাখি না, কেবল অচিন পাখি। যে পাখি আলেখেতে ঝলক দেয়, তার নাম সাধকের সাধন, যার প্রসাদ নিয়ে ফিরি আমরা, নানান উপচারে, চারু কারু একাকারে।

আমি তাঁর সাধনে সাধতে চেয়েছি। আমার মতো এই জগতের অনেকে চেয়েছে। যারা চেয়েছে, তারা সবাই আমার মতন এমনি করে চেয়ে থাকবে মরমীয়ার দিকে, যাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এমনি পরম কৌতূহলে আর বিস্ময়ে।

বিচিত্রা থেকে বেরিয়ে এবার মেলায়। বন্ধু হাতে-বাঁধা সময়ের কাঁটা দেখিয়ে বলেন, 'বেলা অনেক হয়েছে, এবার ঘরে ফেরা যাক। শীতের বেলা, এমনিতেই ছোট।'

সেইজন্যেই ঘরে যাবো না। শীতের এই সোনার বেলা বড় যে ছোট। মেলায় মানুষের উৎসব, শীতের ছোট দিনে রোদের উৎসব। আমি যাবো না যাবো না যাবো না ঘরে। কিন্তু বন্ধুকে আটকাতে চাই না। আমি তাঁর একলা অতিথি না। অভ্যাগত আরো আছেন গৃহে, তদুপরি গৃহিণী আছেন সেথায়। রৌদ্রে আর মানুষে মাখামাখি করে ঘুরে বেড়াতে বলতে পারি না তাঁকে। বলি, 'আপনি ঘরে যান, আমি একটু মেলা ঘুরে আসি।'

বন্ধুর তা ইচ্ছা নয়, বাধা দিতেও সঙ্কোচ। জিজ্ঞেস করেন, 'পথ চিনে ফিরতে পারবেন তো?'

সামান্য তো পথ, রাস্তার এপার-ওপার মাত্র। একবার দেখলে ভুল হবার কোনো কারণ নেই। হেসে বলি, 'তা পারব।'

বন্ধুও সেটা আন্দাজ করতে পারেন। তা-ই হেসে বলেন, 'পথ তেমন দূরের নয়, বাঁকাচোরাও খুব বেশী নয়, তবে নতুন তো।'

কেবল বন্ধুর কথার সুরে না, কাচে ঢাকা চোখের দৃষ্টিতে অস্পষ্ট এক ইঙ্গিতের ঠাট্টা। জবাব দিই, 'নতুনকে চিনে নিতে চেষ্টা করব।'

ভিন্ পথে হাঁটা ধরে মনে মনে ভাবি, ঠিক ঠিকানায় চলতে পেরেছি কবে! ভুল ঠিকানায় আনাগোনা চিরদিন, ঘুর-পথে ঘুরে মরছি সেই শুরু থেকে। আসলে, ঠিকানার গোলমাল কোনো গোলমাল না। কিসের সন্ধান, কার খোঁজে ফেরা, যদি জানা থাকত, ঠিকানা মিলত আপনি আপনি।

মেলার পথ চিনিয়ে দিতে হয় না। মেলাই পথ চিনিয়ে নিয়ে যায়। লোক চলার ঢল দেখলে বোঝা যায়, মোহানা কোথায়। লোক-সাগরের ঢেউ কোথায় খেলছে। কিন্তু এ তোমার সেই মেলা না হে। প্রথম দর্শনেই ঠেক খেতে হয়। এ মেলার রকমসকম আলাদা। ছাতিমতলার মেলা বলেই বোধ হয়। দেখ, চারদিকেতে শহুরে সাজগোজের ভিড়। সেই যাদের দেখেছিলাম ইস্টিশনে, তাদের মতন নরনারী, নানা সাজে ঘোরা-ফেরা করছে। তবে মন গুণে ধন। দেখ, এই বিচিত্র দেখেও মনে রঙ লেগে যায়। সাজেতেই কেবল মানুষ না, কাজেতে তার চিন-পরিচয়। সবাই যে এই দূর রাঢ়ের মেলায় বেশ প্রাণের ভেলায় ভাসছে, হাসছে, তা বোঝা যায়।

কেবল তো তাদের দেখলে হবে না। এমন পসরা সাজিয়ে বসা পসারী পসারিণী বা কোথায় দেখেছ! এই যে দেখো, ডাগর চোখো, ধুতিপাঞ্জাবি-পরা যুবা দোকানদার আপন হাতে বিকোয় বসে আপন হাতে গড়া পুতুল। এই পুতুল গড়ার শিক্ষা তার এই আশ্রমেই, শিল্প ভবনে। ওই যে তন্বী হেসে ভাষে ক্রেতার চোখে চেয়ে, বাটিকের চোখ জুড়ানো কাপড় দেখিয়ে, সেও আশ্রমিক সঙ্ঘের। কেবল যে সব আশ্রমিক সঙ্ঘের পসরা সাজানো চারদিকে, তা না। বাইরের থেকেও, অনেক পসরা নিয়ে এসে বসেছে, এমন অনেক পসারী পসারিনী। নানা জেলা, নানা রাজ্যের, বিচিত্র কারুকলা শিল্প, গ্রামীণ, প্রাচীন, অতীতের ভুলে যাওয়া নানান বস্তু। কার্পাস রেশম বলো, সেলাইয়ের নানা কারুমিতি, পুতুল মুখোশ বলো, মাদুরের সূক্ষ্ম বোনা নানা জিনিস, তারই মধ্যে পিতল কাঁসার কারিগরি, কাঠের বিচিত্র শিল্প, সবই সাজানো থরে থরে।

ক্রেতা-ক্রেতীদের চোখ দেখলে বুঝবে, সব কিছু হাত ভরে নিয়ে নিতে চায়। কেবল তো এ রাজ্যের মানুষ না, ভারতের নানা রাজ্যের মানুষ। নানা ভাষা ভাষে নানা রূপে। কেবল ভারতের নাকি। নজর করলে দেখবে, সাত সমুদ্রের ওপারের নরনারীও মেলায় এসেছে। গোরা গোরীরাও মেলার নানা পসরার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হাত

ভরে, ঝোলা ভরে কিনছে নিচ্ছে।

তার মধ্যেই দেখতে পাবে সাঁওতাল শিল্পীটি ভুঁয়েতে চোখ-ধাঁধানো পসরা সাজিয়ে বসে আছে। পসরা সাজিয়ে বসে তো নেই, ফাঁদ পেতে বসে আছে। রুপো না, কিন্তু রুপোলী ধাতুতে গড়ে এনেছে নানা সাঁওতালী গহনা। গলার হার, কানের দুল, হাতের বালা, নাকের বেসর, নাকছাবি, নিতম্বের মেখলা, কটির ঝাপটা, পায়ের নূপুর, মল, বন্ধনী। আরো এনেছে, নানা চুলের বিনুনির অলংকার, খোঁপার কাঁটার ফুল। সেখানে যে কেবল বিচিত্র বর্ণবাহার প্রজাপতির মতন, কিশোরীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তা নয়। তন্বীরাও ভুঁয়েতে আঁচল লুটিয়ে বসে পড়েছে। কিনেকেটে ঘরে গিয়ে সাজ, সে বড় বালাই। তখন-তখনই নানা অলংকারে সেজে মেলা-প্রাঙ্গণে বিচরণ। একে দেখে ওর আশা মেটে না, ওকে দেখে এর। ওরা অলঙ্কারের নিক্কণে নিক্কণে বাজে, হাওয়ায় 'সুন্দরী রাধে আওয়েবনি।' ...'আমার গোপন কথা, শুনে যা ও সখী।'...

ওরা যে সবাই আশ্রমিক সংঘের মেয়ে, তা না। বাইরেরও অনেক। যা দেখবে, সবই ওদের জন্যে। আর যে নারী ঘরনী, তার জন্যেও থরে থরে অনেক কিছু সাজানো। তবে কেবল যে রুপোলী ধাতুর গহনা-ঝলক, তাও না। পুঁতির মালা কি কেউ পরবে না। পাথরের রঙবাহারী হীরা-পান্নার ঝলক দেওয়া অলংকারগুলো পড়ে থাকবে নাকি। মোটেও তা ভেবো না। সবখানেতেই প্রজাপতিগুলোর ছুটোছুটি। যেন গাছে গাছে, কচি পাতায় পাতায় ঝাঁপ দিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। তা-ই বলি, কেবল তো সাজিয়ে বসা নয়, ফাঁদ পেতে বসা। যা ধরবার, সে তা ধরে নিয়ে পুঁজি করছে। কিন্তু সবই ভুঁয়েতে না, তার জন্যেও চোখ-ঝলকানো দোকান সাজানো আছে। সেখানেও পসারী পসারিনী আছে। তোরা কে নিবি কত, নিয়ে যা। কেবল কি সাজবাহারে চলে! পেটের ধান্দা নেই নাকি! তাও পাবে, তবে সেই যে খাজাগজা জিলিপি, পাঁপড় আর তেলেভাজা, কচুরি আর পুরি, সে এ তল্লাটে না। এখানে পাবে অন্য জিনিস, সেই যে রুটির মধ্যে নানান খাদ্য, যার নাম স্যান্ডউইচ, যার নাম চপ কাটলেট, ওমলেট, তা পাবে। দেখ, এখানেও রাজধানীর ঝলক, দোকানের গায়ে লেখা আছে, কফি হাউস। ভিতরে যাও, দেখবে নাগরিক নাগরিকা কাকে বলে। যার নাম লাঞ্চ ডিনার, তার ব্যবস্থাও পাবে। কাগজে পড়ে দেখ, তোমার জন্যে লেখা আছে খানার নাম পরিচয়। সব রকমের বন্দোবস্ত আছে।

এমন জায়গায় চেনাশোনা লোক পাবে না, তা হতে পারে না। দেখ, রাজধানীর সাংবাদিক সাহিত্যিকের জটলা, কবিদের গোল টেবিল, শিল্পীদের তর্কের আসর। আরো পাবে, যাঁদের বলে বড় বড় মানুষ, কেতাবিতে আওয়াজ দিয়ে বলো, ভি আই পি, তাঁদের ভারিক্কী বৈঠক।

তবু দেখতে দেখতে থমকে দাঁড়িয়ে যেতে হয়। দেখি, এমনি এক নগর সাজের পান-ভোজনালয়ে নরনারী সবাই ছুটে যায়। ছোটার রকম দেখি, পড়ি কি মরি। কেন, কী আশ্চর্য লীলা সেথায় ঘটে, কার পিছনে ছোটে এমন করে। অই হে, কী বইলব, দেখি একটা বায়স্কোপের ছবির মানুষ, রক্তেমাংসে জ্যান্ত চলে বেড়াচ্ছে। উটি এক বায়স্কোপের তারা। দেখি, মেয়েদের চোখে ঝিকিমিকি, ছেলেদের চোখে ঝলক লাগা। কেউ মেলায় হাত, কেউ দেয় কাগজ বাড়িয়ে, নামের সহি চাই। ছাতিমতলার মেলায়, নগরের নাগরিয়া উৎসবের আর কী বাকী!

এখানে সবাই আসে, সকলের লীলা। ছাতিমতলার মেলার ছবির সেইটুকু সৌন্দর্য। আর, মানুষ একেতে না, বহুতে। বহুর এই বিচিত্রে মানুষ দেখার নেশা লেগে যায় চোখে। সেই নেশাতে দেখি, আর নেশার দোলা লেগে যায়। যদি মন

বাঁকাত যাও, তবে তোমার মুখই বাঁকা। তফাত যাওয়াই সহজ, কাছে থাকতে পাওয়া দুর্লভ। রকমে রকমে দেখব বলেই আসা। সেই দেখাতেই চোখ ভুলে যায়, মন দুলে যায়। আজ আমিও এই মানুষের সাগরপারের শরিক।

তবে ঠেক খাবো না, দেখতে দেখতে যাবো। চেনা-শোনাদের দেখতে দেখতে, হাত তুলে, হাসি দিয়ে যেতে যেতে, অচেনাতে যাই। আরো অনেক মানুষে, অচিন মানুষের খোঁজে। কিন্তু, হঠাৎ একেবারে জিভে জল এসে যাবার মতন খাবার দেখে ঠেক খাই, অবাকও হই। দেখি ক্ষীরের পিঠে, চন্দ্রপুলি, ছানার পায়েস, রসবড়া সাজিয়ে বসে আছে এক পসারিনী। যাকে বলে সম্পন্ন বধূ, তা-ই, পসারিনী হেসে হেসে রসিকদের খাওয়াচ্ছেন।

কিন্তু চোখের ক্ষুধা মেটাই আগে, মনজঠরে ভরাই। রসনা ও জঠর, তারপরে। তবে, না দেখে দুর্নাম করা কেন। খাজা গজা জিলিপি, ঝোল ভাত তরকারি, সব ভোজনেরই ব্যবস্থা আছে।

দেখতে দেখতে যত যাই, টান দক্ষিণে। মেলা সেই দিকেই টেনে নিয়ে যায়। যত যাই, কানে একটা বাজনা ভেসে আসতে থাকে। তারপরেই শুনতে পাই, 'এমন মানব-জনম আর কী হবে। অ ভোলা মন, মন যা কর, ত্বরায় কর, এই ভবে।'...

দরাজ গলার স্বর শুনে বুকটা যেন বহুদিনের হারানো চেনাকে খুঁজে পাওয়ার চমকে ধকধকিয়ে ওঠে। চেয়ে দেখি, সুমুখে এক খড়ের চাল ঢাকা মস্ত দাওয়া। সেখানে কোমরে বাঁধা বাঁয়া, বাঁয়ের দিকে ঘেঁষে, গেরুয়া আলখাল্লা পরা এক মানুষ। ডান হাতে তার একতারা। আবার বাঁ হাতের কব্জিতে বাঁধা ঘুঙুর। বাঁয়াতে তাল পড়লেই, ঘুঙুরে ঠিনঠিনিয়ে যাচ্ছে। মুখে তার অল্প অল্প পাতলা দাড়ি, গোঁফখানিও সেইপ্রকার। বোঝা যায়, গায়কের বয়স বেশী না। চোখ দুটি ডাগর, টিকলো নাক, একহারা রোগা, কিন্তু শ্যাম রঙের জেল্লা দেখ একবার। গেরুয়া বসনে এ বিবাগী নবীন। তাকে ঘিরে আছে আরো কয়েকজন। সকলেরই এক পোশাক, কেবল চেহারায় আর বাজনার যন্ত্রে আলাদা। কেউ বাজায় দোতারা, কেউ ডারা ডুপ্‌কি খঞ্জনি। কেবল প্রেমজুরিতে আঙুল গলিয়ে ঝনক ঝনক বাজাচ্ছে এক মেয়ে। মেয়েই বলতে হবে, বয়স যদি কুড়ি-বাইশ হয়, তবে বেশী। রঙেতে সেও শ্যামা, কিন্তু চোখ দুটি যেন হরিণীকে হার মানানো। ফাঁদে যত বড়, ভাবে তত স্নিগ্ধ মধুর। পরনে তার লালপাড় শাড়ি, জমিন বুঝি রাঢ়ের মাটিতে ছোপানো। কিন্তু কপালে সিঁথেয় সিঁদুরের ঝলক।

এদের যে চিনি, তা না, তবু সেই এক গানের কলির মতো মনে হয়, 'তুমি কে, পাগল পারা হে। বহুদিনের চেনা বলে মনে হতেছে।' আরো অনেক দেখব বলে যেতে গিয়ে দেখি, পা চলে না। এই সমাবেশের দাওয়ার কাছে পা গেঁথে গিয়েছে।

আলখাল্লা পরা ডাগরা গায়ক তখন নিজের দিকে দেখিয়ে, অন্যদের গেয়ে বলছেঃ

কত ভাগ্যের ফলে না জানি
ভোলার মন রে, পেয়েছ এই মানবতরণী।
এখন—বেয়ে যাও (অই রে ভোলা) ত্বরায় এই ধরায়
যেন ভরা না ডোবে।
এমন মানবজনম আর কী হবে।...

অমনি সবাই গলা মিলিয়ে, জয় গুরু জয় গুরু ধ্বনি দিতে দিতেই মাথায় পাগড়ি বাঁধা, দোতারাওয়ালা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। আলখাল্লায় ঝাপটা দিয়ে, বাজনা বাজিয়ে নাচতে থাকে। কেবল যে নবীন বিবাগীর দল, তা না। বয়স্ক বিবাগীরাও আছে। বিবাগী বলি এই কারণে, গেরুয়া দেখে। কিন্তু রাঢ়ের বাউলদের চিনতে

অসুবিধা নেই। বয়স্ক বাউলদের সঙ্গে দু-একজনা বয়স্কা বাউলানীও আছে। তখন আমার মনে পড়ে গাজীর কথা। ভাবি, এরা কি সেই পিকিতি নাকি হে।

শ্রোতার সংখ্যাও কম না। তবে রকমে সব মিল-মেশানো। গ্রামীণ শহুরে, সব রকমের আছে। ধুতি-পাঞ্জাবি কোট-পাতলুন, ক্ষারে কাচা জামাকাপড়ের ওপরে সুতির চাদর জড়ানো, নিতান্ত গামছাখানি কাঁধে নিয়েও কেউ কেউ বসেছে। এক না, অপরও আছে, শ্রোত্রীদেরও সেই প্রকারের ভাগাভাগি।

নিচে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ শুনতাম, জানি না। হঠাৎ কাঁধের ওপর হাতের ছোঁয়া পড়তে ফিরে দেখি, এক সৌম্য প্রৌঢ়। মাথার চুলে ধূসরতা, অথচ উলটা টানায় বড় বড় চুলে এমন একটা উস্‌কোখুস্‌কো ভাব, বিবাগী বিবাগী লাগে। গায়ে একটি মোটা পশমের জামা, তার ওপরে কম্বলের মতো একখানি চাদর। রঙটি রোদে-পোড়া গৌর, চোখে-মুখে হাসির থেকে ভিতরে যেন রসের ছলছলানি বেশী। তার চেয়েও দীপ্ত যেন বুদ্ধির ঝিলিক। গোঁফদাড়ি নেই, মুখে একখানি বিঘতখানেক লম্বা চুরুট। নিচু স্বরে, যেন রহস্য হেসে বলেন, 'ভায়া, এখানে কেন, আসরে চলুন।'

অবাক হলেও বলি, 'নিশ্চয়, কিন্তু আপনাকে তো চিনলাম না।'

মহাশয়ের চোখে যেন রহস্য নিবিড় হয়। বলেন, 'না চিনলে কি, ডেকে নিতে পারি না?'

বলার ঢঙে নিজেই লজ্জা পাই। তাড়াতাড়ি বলি, 'না না, তা কেন, নিশ্চয়ই পারেন।'

'তবে তো ভায়া আর কোনো কথা নেই। এখানে রসিক ডাকে রসিককে। দেখলাম কিনা, দাঁড়িয়ে শুনছেন। তাই ভাবলাম, ডেকে নিয়ে বসি। চলুন বসি গিয়ে, তারপরে অন্য কথা।'

এর পরে আর কথা চলে না। দাওয়ায় উঠে আসরে গিয়ে বসি। তিনি বসতে বসতে হাসিতে রহস্য নিবিড়তর করে আবার বলেন, 'অচেনাতেই চেনাচিনি। ঠিক মিলে যাবে, দেখবেন, বসুন।'

বসতে না বসতেই দেখি, এদিক ওদিক থেকে কয়েকজন 'জয় গুরু জয় গুরু' বোলে বেজে ওঠে। এমন কি, ডাগরা গায়ক গান থামিয়ে, কপালে হাত ঠেকিয়ে, মাথা নিচু করে আওয়াজ দেয়, 'জয় গুরু, জয় গুরু।' দিয়ে আবার কালো কালো ডাগর চোখ দুটি ঘুরিয়ে হাসে। কাকে এমন সংবর্ধনা, কাকে এত আত্মীসুয়তা দেখানো। পাশে চেয়ে দেখি, আমার প্রৌঢ় সঙ্গীকেই। তিনিও কপালে হাত ঠেকিয়ে সবাইকে সেই বাক্যেই বোল দেন, 'জয় গুরু, জয় গুরু।'

দিয়ে মহাশয় একবার আমার দিকে চেয়ে হাসেন, চোখ ঢুলুঢুলু করে। কথা বলবার অবকাশ পান না, তার আগেই ওঁর পাশে বসা আলখাল্লাধারী কাঁচা-পাকা চুলদাড়ির মাঝখানে পাকা টসটসে মুখে ঝকঝকে চোখে চেয়ে বলে, 'ইটি কে বটে গ অচিনবাবু? বিটা নাকি?'

'বিটা?' প্রৌঢ় মহাশয় চোখ কপালে তুলে তাকান বুড়ো বাউলের দিকে, আবার তাকান আমার দিকে। তারপরে গেরিমাটিতে ছোপানো থান পরা, হাতে খঞ্জনি বৃদ্ধার দিকে চেয়ে বলেন, 'অই শোনো গ রাধা দিদি, তোমার বুড়ার কথা শোনো। একে দেখিয়ে বলে, আমার বিটা নাকি। গোপী দাদার আর তল জ্ঞান নাই দেখছি।'

মহাশয়ের সঙ্গে বুড়ীও ফোকলা দাঁতে হাসে। দুজনেরই নজর ঘুরে ফিরে আমার দিকে। বুড়া বাউল গোপী দাদার ধন্দ যে আমাকে নিয়ে তা বুঝতে পেরেছি। তারপরে বুড়ী ভ্রূকুটি কোপে বুড়ার দিকে চায়। যেন যুবী কটাক্ষ করে যুবাকে। বলে, 'নতুন দেখলে নাকি অচিনবাবুকে! না বিইয়ে কানাইয়ের মা?'

গোপী বাউলের মুখখানি যেন আঁতুড়ের ছেলে, টুকটুকিয়ে চায়, নজরে গোলমাল। তার রাধার মুখের কথা শুনে প্রায় হইচই করে ওঠে, 'অই অই, জয় গুরু জয় গুরু, ভুলে গেছি, অচিনবাবুর বে-থা নাই।'

মহাশয় আবার হেসে ওঠেন, যাঁর নাম অচিনবাবু। অচিন, এমন নাম কখনো শুনিনি। তাও কিনা তাঁর সঙ্গে আবার বাউলদের দাদা-দিদি পাতানো। ছাতিমতলার মেলায় এ মানুষটি কে?

ওদিকে গান চলেছে সমান তালে, অচিনবাবু গলা নামিয়ে বলেন, 'বে-থা নাই মানে কিন্তু 'নাই' না গ দাদা।'

বুড়া অমনি দাড়ি কাঁপিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে, ঘাড় দুলিয়ে বলে, 'জয় গুরু, জয় গুরু, তাই কখন হয়। 'নাই'-এতে 'হ্যাঁ' বিরাজ করে, যেমন কামেতে প্রেম, অমাবস্যায় পুন্নিমা, টানোতে উজান।'

বলে বুড়া দু চোখ কুঁচকে যেন কী রহস্যের ইশারা করে। অমনি অচিনবাবু একেবারে হাত বাড়িয়ে দেন বুড়োর পায়ের কাছে, বলেন, 'বাহ্ বাহ্, গোপী দাদা, পায়ের ধুলো দাও।'

বুড়া তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে দিয়ে বলে, 'অ ধু-র, ই কী করে বলো দিকিনি, এত বড় একটা মানুষ, যখন-তখন পায়ে হাত দেয়।'

'এমন কথা বললে যে হাত মানে না। কিন্তু অই বড়মানুষ কথাটা আর ব'লো না, খুব রাগ করব।'

বুড়াও দাড়ি দুলিয়ে হাসে। বলে, 'বড়মানুষ মানে কী আর হোমরাচোমরা বইলছি। তুমি হলে বড়মানুষ গ, যারে বলে জাত মানুষ।'

অচিনবাবু চোখ কপালে তুলে, জিভ কেটে হাত কপালে ঠেকান। বলেন, 'আরে বাপ্‌রে বাপ্। আর ব'লো না দাদা।'

আর বলে না বুড়া। দেখ, তবু বলে, দু'জনাতে চোখে চোখে হাসে নিশচুপে ভাষে। আবার রাধার সঙ্গে চোখাচোখি হতে সেও সাদা কেশের মাথাখানি দোলায়, চোখ ঘোরায়। এ হলো রস-রহস্যের কথা, নিজেদের মধ্যে চলে, অপরের ব্যাজ। কামেতে কোথায় প্রেম, অমাবস্যায় পূর্ণিমা আর জোয়ারে উজান, তা তুমি বুঝবে না। তার মধ্যে কোথায় কোন্ রসের ধারা খেলে যায়, তা দেখ এদের চোখে মুখে। তার বেশী দেখতে পাবে না।

তা না পাই, আমি বেশী দেখি অচিনবাবুকে। ওঁর গায়ে তো আলখাল্লা নেই, গেরুয়া নেই, লম্বা কেশে পাগড়ি নেই। সাজপোশাক, কথাবার্তা, মায় হাতের চুরুট-খানিও দেখে মনে হয়, ঘরানা আলাদা। অথচ, এই মানুষদের সঙ্গে এত বোঝাবুঝি কেমন করে, যেন ভাবের এক ঘরেতেই বসত। কেবল, তা-ই না, চোখে মুখে এমন মুগ্ধতা, যেন ভাবের ঘোরে দোল-দোলানো। দেখি, ঠোঁট নেড়ে নেড়ে কী যেন আওড়ান, বোধ হয় বুড়ার সেই কথাগুলোই। গোরা মুখে রেখায় রেখায় আঁকিবুকি অনেক। কপালের কাছ থেকে চুল উঠতে উঠতে অনেক পিছনে গিয়েছে, তবু পাতলা ধুসর চুলে, এখনো উলটো টানে, কেমন যেন একটা রূপের ঝলক দিচ্ছে। চোখ দুটি ডাগর, কিঞ্চিৎ ঢুলুঢুলুও বটে, তবে চোখের চারপাশে কালির একটা অস্পষ্ট ছাপ। তার কার্যকারণ বিচারে যেও না, কারণ সব মিলিয়ে এ মুখ দেখে ভোগী সুখী বলতে পারবে না। কেন যেন মনে হয়, এ মুখেও সেই কাঁদন-ভরা হাসির ছিটা লাগানো। নাকি আমার চোখের ধন্দ কে জানে!

আমাকে দেখিয়ে বুড়া আবার পুছ করে, 'তা ইটি কে বইললে না তো।'

'বন্ধু।'

বলে অচিনবাবু আমার দিকে একবার চোখের কোণে তাকিয়ে হাসেন। আবার বলেন, 'অবিশ্যি সময়মত হলে আমার বিটাও এত বড়টিই হতো, এত বড় বিটাও তো দাদাই হয় বটে, না কি বলো।'

বুড়া বলে, 'নিশ্চয়, তা বটেই তো, বিটা বড় হলে বাপ-বিটাতে সমান। আবার মা-বিটিতেও তাই।'

বলে বুড়া রাধার দিকে চোখ ঘুরায়, রাধাও চোখ ফিরিয়ে যেন শত শত খড়কের মতো রেখায় ভরা মুখখানিতে হাসি ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু গানের সঙ্গে খঞ্জনিতে তাল রাখে ঠিক।'

অচিনবাবু আবার বলেন, 'দেখি, দূরে দাঁড়িয়ে গান শুনছেন, আসরে ডেকে নিয়ে এলাম। আমাকে আবার বললেন, 'আপনাকে চিনতে পারলাম না তো।' আমি বললাম, না চিনলে কি ডেকে নিতে পারি না। এখানে রসিক ডাকে রসিককে।'

'জয় গুরু। ভালো, ভালো বইলেছ। এখানে রসিক ডাকে রসিককে। তা তোমার রসিকের বয়স কাঁচা বটে, চোখ দুখানির ভাব দেখেছ?'

বুড়া আমার দিকে তাকায়, অচিনবাবুও। লজ্জা পেতে গিয়ে একটু অবাক হয়ে চাই। চাইতে গিয়ে চোখ ফেরাতে হয়। অচিনবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলেন, 'দেখিনি আবার, কালো বেড়ালের চোখ গ গোপীদাদা, কালো বেড়ালের চোখ।'

রসকে বুড়া হেসে কেশে একাকার। মুখ দেখ, যেন দুষ্টু ছেলেটা মাথা দুলিয়ে হাসে। বলে, 'হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ অ বাবা, জয় গুরু, জয় গুরু।'

অচিনবাবুও দেখি সেই রকম হাসেন, আর টেরে টেরে তাকান আমার দিকে। আবার বলেন, 'ঠিক বলিনি গোপীদাদা!'

'যথাথ ভাই যথাথ। তোমার চখ ফাঁকি যায়! আবার দেখ, কেউটে কিলবিলানো চুল থুপি থুপি রয়েছে। কালো বেড়ালের থেক্যেও যেন সি কালো চিতার কথা মনে আসে, ই কালো চিতায় ধইরলে পরে মাইরবে গ আঠার ঘা, অ তোর এক কলসীর নয় ছিদ্দির বন্ধ কর গা যা।'

অচিনবাবু অমনি আবার হাত বাড়ান, 'বাহ্ গোপীদাদা, বাহ্।'

'আ, ধু-র, তোমার হাত সরাও দিকিনি।'

বলেও হাত ধরাধরি করে দু'জনে হাসে। রাধা বুড়ীও দেখি আমার দিকে চেয়ে চেয়ে ফোকলা দাঁতে হাসে। এদিকে কানা রইল ঘোলায় পড়ে। না-হয় বয়সে অচিন-বাবুর থেকে কাঁচা-ই, কিন্তু চোখের ভাবে কালো বেড়াল হতে গেলাম কেন। কালো চিতার বা মর্ম কী। লজ্জা পেলেও অবাক হয়ে চাই, চেয়ে চেয়ে নিশ্চুপে জিজ্ঞেস করি।

কিন্তু সে জবাব কে দেয়। দু'জনেই হাসাহাসি করে, চেয়ে চেয়ে দেখে। অচিনবাবু আবার বলেন, 'তাহলে ঠিক দেখেছি দাদা!'

'নিশ্চয়।'

'আসতে গিয়ে দেখি, একেবারে তন্ময় হয়ে শুনছে, আশেপাশে খেয়াল নেই। আবার দেখি, গোকুলের গান শুনতে শুনতে চোখে ভাব, ঠোঁটে ভাব।'

'হবেই তো, গোকুলের কথা মনে পইড়্যাছিল য্যা।'

অই হে, আবার দেখ দুটির কি দুষ্টু হাসির খিসখিসানি। কিন্তু এমন করে ঘোলায় পড়ে থাকা যায় নাকি! নাকি এত শোনা যায়। জিজ্ঞেস করি, 'কী বলছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

বুড়া বলে ওঠে, 'বইলছে—লালিতে, বেড়ালের চখেতে আগুন, এ বেড়াল মানুষ করে খুন।'

আবার হাসির ঢেউয়ের দোলা। অচিনবাবু বলেন, 'আর গোপীদাদা বলছে—এ চিতা রঙে কালো, থাকে কালো, কালাকাল যে মানে না, ঝোপ বুঝে কোপ মারবে যখন, মরবে তখন, মরার কথা জানবে না।'

আবার হাসি, বুড়া প্রৌঢ়ের কাশি জড়ানো চাপা গলায়। তারপরে বোধ হয় বুড়ার একটু দয়া হয়, বলে, 'বুঝলেন না গ রসিক বাবা, অই যিনি বেড়াল, তিনিই চিতা, বাস করেন ব্রজেতে। তা আপনাকে দেখে সি ব্রজের বেড়ালের কথা মনে পড়ে যেছে।'

চোখ ফেরাতে গিয়ে দেখি, অচিনবাবু তাকিয়ে সেই রহস্য নিবিড় চোখে হাসছেন। বলেন, 'লজ্জা পাবেন না ভায়া, আপনার মধ্যে একটু ভাবের কারবার আছে তাই বলছিলাম আর কী। আসুন, চলবে?'

বলে গরম পাঞ্জাবীর পকেট থেকে চুরুট বের করে দেন। কেবল বয়সের বড়ত্ব না, অত বড় জিনিসটা দেখে হঠাৎ হাত বাড়াতে সঙ্কোচ হয়। তাড়াতাড়ি বলি, 'থাক না, আমার কাছে সিগারেট আছে।'

'তা তো থাকবেই, যার যাতে মৌতাত। তবে নেশাখোরদের একটা বদ স্বভাব কি ভায়া, নিজের মৌতাত পরকে আস্বাদ করিয়ে সুখ পায়। আপনার যদি ভালো লাগে, তবে একটা নিন।'

অমনি গোপী বাউল আওয়াজ দেয়, 'আমাদিগের অচিনবাবুর তাইতে সুখ।'

ঘাড় দুলিয়ে হাসেন অচিনবাবু। বলেন, 'হ্যাঁ।'

হাত বাড়িয়ে নিই। মন্দ কী, রাঢ়ের এই পৌষের দিনে, খড়ের চালের ছায়ায়, ঠাণ্ডায় জমবে ভালো। মুখের কাছে তুলে ধরতে অচিনবাবু নিজেই দেশলাই জ্বালিয়ে ধরেন। তখন আবার বুড়া ঘাড় নাড়িয়ে, দাড়ি কাঁপিয়ে হাসে। বলে, 'একটু বেমানান লাগছে যে গ অচিনবাবু, অত বড় জিনিসটা অমন কাঁচা মুখে।'

'সে কি গ গোপীদাদা, নেশাতে হলো রসের শোভা, এখানে দেখতে শোভার কথা কী।'

'তা বটে, তা বটে।'

দু'জনেই চোখে চোখে চেয়ে হাসে। তখন আমি সঙ্কোচে হেসে বলি, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'একটা কেন ভায়া, হাজারটা হোক না, কী কথা?'

'আপনার নামটা অদ্ভুত, এরকমটা এর আগে শুনিনি।'

অচিনবাবু হেসে বলেন, 'অদ্ভুত করেছে লোকে, আসলে আমার নাম হলো অচিন্ত্য মজুমদার। ছিলাম অচিন্ত্য হয়েছি অচিন, তা সে যখন থেকে এই শান্তি-নিকেতনে পড়াশোনা করছি, তখন থেকেই ওই নাম।'

'ও, আপনি বুঝি এখানেই থাকেন?'

বুলি একটু ভিন্ ধরনের, শুনলে টের পাবে। বলেন, 'একদা ছিলাম, শিশু থেকে যৌবনে পড়া পর্যন্ত পড়াশোনাটা এখানেই হয়েছিল। বলতে পারেন, গুরুগৃহে যাপন। ছেলেবেলায় এসেছিলাম পাঠ ভবন থেকে, বিদ্যাভবন অর্থাৎ ইউনিভারসিটির পড়া শেষ করে আর এক জীবনের পথে। এখন যে কোথায় থাকি, ঠিক করে বলাই মুশকিল, আপাতত এসেছি লখনউ থেকে। চাকরি করি সরকারী, বিশ্রাম নেবার কথা তিন বছর আগেই, কর্তারা ছাড়েননি। তবে সেখানেই থাকি, এ সময়টা এখানে না এসে থাকতে পারি না। আসলে—।'

কথা থামিয়ে চুরুটে বারেক টান দেন, ধোঁয়া ছেড়ে ধোঁয়ার আড়াল থেকে নিজের মনেই হাসেন একটু। কথার খেই ধরে আবার বলেন, 'আসলে প্রথম জীবনে ফিরে

আসা। না-হয় বলতে পারেন ওপারেই বসত, এ পারে মাঝে মাঝে ঘুরে যাওয়া। আরো যদি বলেন, তাহলে বলতে হয়, একদা জীবন যৌবন দুই-ই ছিল, সেটা মনে করতে আসা...।'

যেন আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, না বলে শুধু হাসলেন। এবার দেখ মুখের রেখার ভাঁজে ভাঁজে কত হিজিবিজি লেখা। গূঢ় ভাষায় কত অক্ষর হাসি-হাসি মুখখানিতে কেঁপে কেঁপে যায়। ঢুলুঢুলু চোখের আনমনা দৃষ্টিতে যার ভাষা সে-ই পড়ে, তোমার কাছে দুর্বোধ্য। কেবল এইটুকু মনে হয়, এই হাসির ওপারে কোথায় যেন তারের ওপরে ছড়ের টানে ঢেউ খেলানো সুর বেজে যায়। যেমন সহজেতে অসহজের ঘূর্ণি খেলে। সেখানে অচিনবাবুর অচিন খেলা করে।

ডাগরা বাউল তখন বাঁয়াতে ডুপ্ ডুপ্ শব্দ তুলে কোমর দুলিয়ে গাইছে,

মানুষ ডোবে, মানুষ ভাসে,
মানুষ কাঁদে মানুষ হাসে,
মানুষ যায়, মানুষ আসে।
কেবল কর্ম প্রকাশিতে।
অ ভোলা মন, মানুষে মানুষ আছে...

কয়েকজন জয় গুরু ধ্বনি দিয়ে ওঠে। অচিনবাবু বলেন, 'এই তো একমাত্র কথা। তা ভায়ার—।'

আবার ঠিক্, কথা শেষ করতে পারেন না। ডাগর বাউল তার আগেই হাঁক দিয়ে ওঠে, 'অই গ অচিনবাবু, অই একখানা চাই কিন্তু।'

বলে দু' আঙুল ঠোঁটে ছুঁইয়ে ধূমপানের ভঙ্গি করে। অমনি অচিনবাবু ধমকে ওঠেন, 'ধু-র, বাউল আবার চুরুট খাবে কী রে। তোরা খাবি গাঁজা।'

অমনি সকলের হাসি। সেখানে অনেক যুবা কবি-সাহিত্যিকেরও ভিড়। দেখলে চিনতে পারবে। সবাই কলম বাগিয়ে ধরে গান লিখে নিচ্ছে। সকলেই হাসাহাসি করে। বুঝতে পারি, এ আসরে অচিনবাবু পালের গোদা। এর মধ্যেই সকলের চেনা মানুষ তিনি। সকলের মুখ দেখলে বুঝতে পারি। বাউলদের তো কথাই নেই। বুড়া বাউলের পায়ে হাত দিতে যান, ছোকরাকে করেন তুইতোকারি। এ তো ঘরের ঘরী, দলের দলী না হলে হয় না।

ডাগরা বাউল পাগড়ি ঝাঁকিয়ে তাকায় সেই ডাগরী মেয়ের দিকে। বলে, 'অই লও, শুইনছ গ তোমার অচিনদার কথা।'

ডাগরী মুখ ফিরিয়ে টানা-টানা ভুরুতে আরো টানা দিয়ে হাসে অচিনবাবুর দিকে চেয়ে। অচিনবাবু বলেন, 'তা কি মিথ্যা বলেছি নাকি গ বিন্দু।'

মেয়ে একবার তাকায় বাউলের দিকে, আবার অচিনবাবুর দিকে। কালো চোখের তারা ঘুরিয়ে বলে, 'জিগেস করেন ক্যানে, গাঁজা কী বস্তু। কথা আপনি ঠিক বইলেছেন দাদা, বাউল ক্যানে চুরুট খাবে।'

ততক্ষণে বাঁয়াতে তাল লেগেছে, একতারাতে বঙ্‌বঙ্। পাশের মানুষের দোতারাতেও সুর বেজে ওঠে। ডাগরা আগে বলে, 'তবে গাঁজার কথাই শোনেন, গাঁজাকে ছোট কইরতে পারবেন না গ।'

বলেই যেন ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে সবাইকে ডাক দেয়, আর গায়,

'অ ভাই, এইস প্রেমের গাঁজা খাবে কে।'

প্রথমে অচিনবাবুই হাঁক দিয়ে ওঠেন, 'হরি বোল্! হরি বোল্!'

ডাগরা বাউল এক পাক ঘুরে চোখ আধবোজা করে গায়,

'অ হে, ধইরেচে নেশা, ঘুচবে বাসা,
লও আশয় ধম্মো কলিকে,
অ ভাই, এইস প্রেমের গাঁজা খাবে
রাগেরো খরসান দিয়ে
মধুর রসের জল মিশায়ে
গোলাপ ভক্তি নিচে থুয়ে,
রিপুকে কাট প্রেম-কাটারিতে।'

আবার অচিনবাবু হরিধ্বনি দিয়ে ওঠেন। ডাগর বাউল নাচে ধিতাং তিতাং। গেয়ে বলে,

'কিন্তুক, কলকেয় দিও ঠিকরে
লইলে পড়ে যাবে ঠিকরে,
ঠিক ছাড়া হয়ো না ভাই
কাজের কথা বলি তোমাকে।'

অচিনবাবু বলেন, 'বল্ বল্ শুনি।'

ডাগরা চোখ ঘুরিয়ে দু' হাতে কলকে ধরার ভঙ্গি করে গায়,

'সাঁপিখানি করে লয়ে
কলকের তলাতে দিয়ে
প্রেমের গাঁজা খাও পিয়ে হে
নিষ্ঠা দম রেখে গুরুরো পদে।'

অমনি অচিনবাবু দাঁড়িয়ে উঠে ধ্বনি দেন, 'হরি বোল্! হরি বোল্!'

বলে জামার ঝোলা পকেট থেকে বের করেন কাঠের বাক্স। তার ভিতর থেকে মুঠো করে তোলেন অনেকগুলো চুরুট। হাত বাড়িয়ে বলেন, 'এই নে, এই নে, জবর শুনিয়েছিস।'

সভাসুদ্ধ হাসির লহর। ডাগরী বিন্দু বলে, 'হার মানলেন নাকি গ দাদা?'

'হার মেনেই তো জিতলাম, না হলে কি গান বেরুতো তোর পুরুষের।'

অমনি ডাগরীর চোখের পাতায় লজ্জা, নত করে হাসে। আবার ডাগরার দিকে চায় আড়ে আড়ে।

অচিনবাবু বলেন, 'এবার তোর আর গোকুলের গলায় গান শুনব, ধর।'

অচিনবাবুর কথা শুনে শ্রোতার দলে আওয়াজ ওঠে, 'সাধু সাধু, সাধু সাধু।' কেবল সেইটুকুতেই সব না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যাত্রার পালার মতন জয়ধ্বনি দেয়, 'জয় অচিনদার জয়।' অন্যে কেউ বচন দেয়, 'অচিনদা নইলে এসব হয় না।'

এক যুবা বলে ওঠে, 'আমি তো কখন থেকে ভাবছি, অচিনদার আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন।'

অচিনবাবু জবাব দেন, 'কী করি বলো। সকালবেলা পুরনো বন্ধুরা অনেকে এলেন। আমি গেলাম কারুর কারুর বাড়িতে। এই দেখাশোনার পালাতেই যা একটু দেরি হয়ে গেল। তাও তো সরকারী বেসরকারী ভি আই পি, এক্জিবিশনের দ্বারোদ্ঘাটন, ওসব কোনোরকমে কাটিয়ে এসেছি। পৌষ মাসে আসার কারণ ওসব তো নয়। নতুন পুরনোর একটু দেখা শোনা, আর এই আসরটিতে এসে বসা। ওরে, এই তো সবে শুরু, খুব দেরি করিনি।'

বলে আবার আওয়াজ তোলেন, 'ও গোকুল, ও বিন্দু, তোরা ধর গো ত্বরা করে।'

যাদের সঙ্গে যেমন কথা। অচিনবাবুর কথার এদিক ওদিক পাবে না। যেন গানের ভাষায় ভাসেন। চেনা-শোনাদের মধ্যে এমনি কথা। আমরা যারা অচেনা, তারা এঁদের

দিকে চেয়ে খুশি মনে হাসি।

ওদিকে দেখ, বিন্দু কেমন লাজে লাজিয়ে যায়। এ কেমন বাউল প্রকৃতি হে। দেখি, ডাগর চোখের কালো তারায় যেন গৃহস্থের যুবতী বধূ হাসতে ব্রীড়াময়ী। লাল-পাড়ের ছোপানো শাড়িতে একটু ঘোমটা টেনে দেয়। তবু, সিঁদুরের টিপ কাঁপিয়ে, চোখের কোণ দিয়ে বারেক দেখে অচিনবাবুকে, বারেক পুরুষ গোকুলকে।

গোকুলেরও সেই দশা। ডাগর বাউলের আলখাল্লা টান-টান, কোমরে বাঁধন জোর কষা। বুকের ছাতি দেখ, যেন লোহায় পেটানো। পেটের কাছে এক ছিটে মাংস নেই। সে একবার বিন্দুর দিকে চেয়ে হাসে, আবার অচিনবাবুর দিকে। দুটিতে বড় লজ্জায় পড়েছে।

তখন বিন্দু বলে, 'আমরা তো পলায়ে যেইছি না, আর সবাইকে বলেন না ক্যানে।'

অচিনবাবু বলেন গোপীদাস বাউলকে, 'এই দেখ তো গোপীদাদা, বাদ যাবে নাকি কেউ, সবাই গাইবে, সবাইকেই বলব। তোরা দু'জনে শোনা না একখানা।'

গোপীদাস বলে, 'এতে আবার কথা কী আছে। বইলছেন, গাও।'

আরো কয়েকজন ঘাড় নাড়ে। অচিনবাবু হঠাৎ আমাকে দেখিয়ে বলেন, 'আমার এই ছোকরা বন্ধুকে তোমাদের গান একটু শোনাতে চাই। গোপীদাদা বললে কিনা, ইটির চোখ নাকি একটু কেমন চিতাবাঘের মতো।'

বুড়ো তাড়াতাড়ি দাড়ি কাঁপিয়ে বলে, 'আর তুমি যে বইললে কালো বেড়ালের মতন।'

অমনি গোকুল বিন্দুর দল সবাই হাসিতে বেজে ওঠে। সবাই, কেউ সোজায়, কেউ তেরছায় চায়। আর আমি ভাবি, ই কি বিপদে ফেলেন গ অচিনবাবু। প্রীতি ও সম্মান বুঝতে পারি, কিন্তু এতটা তার যোগ্য নই! দশজনের সামনে লজ্জায় পড়তে হয়।

অচিনবাবু হাসতে হাসতে আমার পিঠ চাপড়ান, তারপরেই হঠাৎ হেঁকে ওঠেন, 'না না না, ওরে বিন্দু, তোর ওই চোখে এ চিতা শিকার করিস না। চোখ ফেরা, চোখ ফেরা।'

বিন্দু তৎক্ষণাৎ ঘোমটায় একটু টান দেয়, সলজ্জ হেসে আওয়াজ করে, 'আহ্ কী কথা গ।'

আবার সবাই হাসে। অচিনবাবু হাসেন গোপীদাসের দিকে চেয়ে। যেন বুড়ো প্রৌঢ়া দুটিতেই ছেলেমানুষি বিটলেমিতে মাতে। আর আমার শ্রবণে আগুন। মহাশয়ের উপহাসের ধাত বড় কড়া। বড্ড বেকায়দায় ফেলে দেন।

আসর কিন্তু বেশ জমজমাট। সবাই মেলার হাসি হাসে। অচিনবাবু আবার আমার পিঠে চাপড় মেরে গলা নামিয়ে বলেন, 'ভায়ার রাগ-টাগ হচ্ছে না তো।'

এবার আমারও একটু মুখ খুলতে ইচ্ছা করে। বলি, 'রাগ নয়, অনুরাগই বলতে পারেন, তবে বড্ড লজ্জা করছে।'

তিনি দু' হাত দিয়ে আমার দু' কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন, 'আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে অনুরাগও পেয়েছি। যাক, আর লজ্জা দেবো না। কিন্তু ভায়া—'

এই পর্যন্ত বলে গলা আর একটু নামান। কানের কাছে মুখ এনে বলেন, 'বলেছি কিন্তু সত্যি। তোমাতে আমাতে কথা, বলো তো, বিন্দুর চোখে চিতা শিকার হয় কি না হয়।'

বলে উঠি, 'শতবার।'

'হরিবোল!' হাসতে হাসতে তিনি আবার কাঁধে চাপড় দেন। ইতিমধ্যে বাজনা বেজে ওঠে। একতারাতে বঙ্‌বঙা, বাঁয়াতে ডুগডুগ। তার ওপরে বাঁ হাতের কব্জিতে

গোকুলের ঘুঙুর বাঁধা আছে। সেখান থেকেও শব্দ বাজে, ঝুমঝুম ঝুমঝুম।

কিন্তু অচিনবাবু হরিবোল ধ্বনি দিয়ে, ধূসর কেশে ঝাঁকি দিয়ে, ঘাড় কাত করে তাকাল বিন্দু-প্রকৃতির দিকে। বিন্দুও দেখি, ঠোঁট টিপে হাসে। চোখের কোণ দিয়ে তাকায় অচিনবাবুর দিকে। এই চোখে চোখে চাওয়াচায়িতে যে কোন্ রসের ধারা বহে, বুঝতে যদি চাও, মন ধুয়ে এসো গিয়ে। প্রাণ সাফ করে এসো। তবে, অচিনবাবুর ছোকরা বন্ধুর মনেতে গোল। সে চোখ ফিরিয়ে রাখে, পাছে বিন্দুর তেরছা নজর বিন্ ইচ্ছেতেও তার ওপরে হেনে যায়। তাতে শিকার করা হবে কিনা জানি না, পুরুষটা কুঁকড়ে যেতে পারে।

অচিনবাবু আবার হাঁকেন, 'কই গ বিন্দু, হাতে যন্তরখানি ধরো।'

বিন্দু মুখে জবাব দেয় না, ঠোঁট টিপে হাসে। মুখ না ফিরিয়েই ঘাড় নেড়ে জানায়, ধরবে। তারপরে গোকুলের দিকে চেয়ে দুটিতে হাসাহাসি করে। সেই হাসিরই এক টুকরো বিন্দু আর একজনাকে ছুঁড়ে দেয় একটু। সে-ও এক ডাগরা বাউল, সেই দোতারাওয়ালা। গোকুলের থেকে তার বয়স বেশী না। চেহারায় হরে-দরে গোকুলের কাছাকাছি। তবে কি না, তার নয়া গোঁফদাড়িতে যেন একটু বেশী চাকন-চিকন। সন্দ লাগে, এ বাউলের চোখেতে যেন একটু কাজলের টান লেগেছে। পাগড়িটি একেবারে চূড়ো হয়ে উঠেছে, প্রায় যেন শিখিপুচ্ছের মতো, বেঁকে দাঁড়িয়েছে ছোট একফালি।

বিন্দু তার দিকে চেয়ে হাসতেই সে ঘাড় দুলিয়ে দোতারায় আঙুল বুলায়। সুরের তরঙ্গ বেজে ওঠে। তখন অচিনবাবু বুড়া গোপীদাসকে জিজ্ঞেস করেন, 'এ বাবাজীটিকে নতুন দেখছি। কার বিটা?'

গোপীদাস বলে, 'আমাদিগের কারু বিটা লয়। ছেল্যাটো এসেছে পাকিস্তান থেকে, অই কী বলে তোমার সি উত্তর দেশ থেকে। আমাকে বাবা বাবা বলে, আমিই লিয়ে এসেছি। গত সনের জয়দেবের মেলায় দেখা হয়েছিল। থাকে সেই হুগলির কোথায়, চিঠিপত্তর লেনাদেনা করে। তা ভাবলাম, ইখানেতে একবারটি ঘুরে দেখে যাক, তা-ই লিয়ে এসেছি। গায় ভালো, বাজায়ও ভালো। বিন্দু গোকুলের সঙ্গেও জয়দেবেতেই চেনাশোনা।'

জয়দেবের মেলা হলো কেন্দুবিল্ব গ্রামে, যার ডাক নাম কেঁদুলি। বাউল বলে, 'জয়দেবের মেলা, জয়দেবেতে যাবো।' বাউল বলে, 'জয়দেব পরম বাউল—পদ্মাবতী পরমা প্রকৃতি।' 'যে মানুষ গোঁসাই বিরাজ করে'। জয়দেব সে-ই মানুষ। অতএব বলো, কেঁদুলি বলে কী কথা হে। বলো, জয়দেব জয়দেব। সাধো, পদ্মাবতী। সে-ই দুয়েতে খেলেছে খেলা, মণিপুরে, যেথায়, 'তিন শো ষাট রসের নদী, বেগে ধায় ব্রহ্মান্ড ভেদি, সেই নদীতে প্রাণ বান্ধিলে মানুষ ধরা যায় রে।' জয়দেব সেই নদীতে প্রাণ বেঁধেছিলেন, বাউলের এই বিশ্বাস, পরে জেনেছি।

অচিনবাবু বলেন, 'বাজায় যে ভালো, সে তো প্রথম থেকেই শুনছি। ভঙ্গিটিও বেশ সুন্দর।'

বুড়া বলে, 'হ্যাঁ, বয়স কাঁচা কিন্তু মনে মনে বেশ মজে আছে। মনে হয়, ছেল্যাটোর ওপর গুরুর কিরপা আছে।'

অচিনবাবু কেবল গুরুর কৃপা দেখেন না। বলেন, 'তবে কিনা গোপীদাদা, তোমার সেই চিতা-চিতা ভাবখানি কিন্তু আছে।'

বুড়া অমনি হেঁ-হেঁ করে হেসে বলে, 'জয় গুরু জয় গুরু। তোমার কী কথা হে অচিনবাবু!'

তারপর চোখ ঘুরিয়ে বলে, 'তা সিটিও জানবে, খাঁটি বাউলের ধম্মো গ। চিতা না হলে কি শিকারের সাধন সাধা যায়। সেই গানেতেই তো আছে, চিতা শোষে কুম্ভকে,

ঝাঁকোড়ে মদন কুহকে, হাড়েতে দাঁত বসিয়ে রক্ত খায়, ছিটা গন্ধ পাবে না।'

অচিনবাবুও অমনি বুড়ার মতোই আওয়াজ দেন, জয়গুরু জয়গুরু।'

বলে দু'জনাতে চক্ষে চক্ষে চায়, যেন কী এক রসের ধারা আনাগোনা করে। কান পেতে শুনি চোখ চেয়ে দেখি, কিন্তু ধারা ধরতে পারি না, ভাসতে পারি না। আমার দিকে চেয়ে অচিনবাবুও সে কথা বুঝতে পারেন। তাই বলেন, 'ভায়া নিত্য কথায় তত্ত্ব ভাবে, বোঝা একটু কঠিন। পরে বুঝিয়ে দেবো।'

না বুঝলেও ক্ষতি নেই। অবুঝ বোঝার মধ্যে যে এক ভাবের খেলা আছে, আমি সেই ভাবেতে আছি। যা শুনছি, যা দেখছি, তার মধ্যে গূঢ় রসের ধারা কোথায়, জানি না। মুক্ত রসের মাঝেও এক খেলা খেলছে, আমি তাতেই মজে যাচ্ছি।

অচিনবাবু আবার জিজ্ঞেস করেন, 'উত্তর দেশের এই বাবাজীটির নাম কী গোপীদাদা?'

'সোজন।'

অচিনবাবু বলেন, 'সোন্দরের মতন নাকি? সুজন বলো।'

'ওই হলো আর কী। আমাদিগের কথা তো জানো।'

দু'জনেই হাসাহাসি করে। অচিনবাবু আবার বলেন, 'তাহলে সুজন বাবাজীর গান শুনতে হয় এর পরে।'

'শুনবা বইকি, গলাখানি যেমন দরাজ, তেমনি মিঠা। তবে, একটু টান আছে, জমুনের টান।'

'উত্তর দেশের টান?'

'হ্যাঁ।'

ওদিকে তখন বাজনা জমে উঠেছে। বিন্দু তার সামনে রাখা ঝোলায় তখন হাত ঢুকিয়েছে। তারপরেই কালো নিটোল একখানি হাত একেবারে মাথার ওপরে তোলে, যেন কালো চিকণ চিকুর হানা কালনাগিনীর ফণা উঠল উঁচুতে। হাত ঝাঁকি দিতেই ঝনঝনিয়ে বেজে ওঠে বাজনা। দেখ, তার তালেতে, গেরুয়া ছোপানো জামাখানি সহ যেন অঙ্গের লাবণ্যখানিও বেজে ওঠে। আর সাদা দাঁতের ঝিলিক দিয়ে, কালো তারায় হানে একবার অচিনবাবুকে। অর্থাৎ দেখেন গ অচিনদাদা, যন্ত্র হাতে নিয়েছি।

কিন্তু তাইতে কি অচিনবাবুকে হার মানানো যায়। তিনি হেসে উঠে হাঁকেন, 'ওরে মেয়েটা শোন—প্রেমজুরিতে প্রেম বাজে না, প্রেমেতে প্রেমজুরি বাজে।'

এবার গোকুলই ধ্বনি দিয়ে ওঠে, 'জয়গুরু, জয় সাঁই।'

তখন আর বিন্দু না বলে পারে না, 'আপনার সঙ্গে কি কথায় পারার যো আছে।'

অচিনবাবু বলেন, 'কাজে পারলেই হবে।'

আবার সেই কথা, কথা কইতে জানলে হয়, কথা ষোল ধারায় বয়। এখানেও সেই কইতে জানার বহা-বহি। সবাই শ্রুতি মুখে হাসে।

গোকুল গান ধরে দেয়,

'অহে বল না, কেমনে করি শুদ্ধ সহজ প্রেম সাধন।
আমার, প্রেম সাধিতে ফেঁপে উঠে—
ফেঁপে উঠে হে কাম নদীর তুফান,
কেমনে করি শুদ্ধ সহজ প্রেম সাধন।'

এই পর্যন্ত গেয়ে, কেবল বাজনা বাজতে থাকে। গোকুল নাচে ঘুরে ঘুরে, চোখ ঘুরিয়ে অচিনবাবুর দিকে। তার সঙ্গে দোতারা নিয়ে নাচে উত্তরের সুজন। বিন্দুর মুখে হাসি নেই, কিন্তু কেমন যেন ভাবে ঢল ঢল। দু' হাত বুকের কাছে নিয়ে, দু'-হাতে বাজায় প্রেমজুরি, ঝিপ্ ঝিপ্ ঝিনঝিন। অচিনবাবু গোকুলের দিকে আধবোজা

চোখে চেয়ে কেমন যেন এক ভাবের ইশারা করেন।

বিন্দুর গলা বেজে ওঠে। কোকিলের ডাক শুনেছি সপ্তমে, বেহালার সুর শুনেছি উচ্চ টংকারে। কোন্‌টি যে তার গলায় ফুটলো, বুঝতে পারি না। কোকিলের কথা আগে মনে আসে। মুখের কাছে যন্ত্র নিয়ে, যান্ত্রিক আওয়াজ না। এ যেন গাছে বসে পাখির শেষ রাগিণীতে ডাকঃ

'অ ভোলা মন, প্রেম রতন ধন পাওয়ার আশে
তিবিনায় ঘাট বাঁধলাম কষে।'...

সঙ্গে সঙ্গে গোকুল, সেই গলাতে গলা মিলিয়ে দেয়,

'কাম নদীর এক এক্কা এসে
হায় হায়, যায় ছাঁদন বাঁধন।
করি কেমনে শুদ্ধ সহজ প্রেম সাধন।'

এ যেন সাধা গলায় সুর সাধা। গলায় গলায় মিল না কেবল। একবার দেখ, কেমন চোখে চোখে মিল। সুরে টান দিতে গিয়ে, বিন্দুর ভুরু একটু বেঁকে যায়, নজর দূরের দিকে। তারপর হঠাৎ হঠাৎ মিলে যায় গোকুলের সঙ্গে। বারেক সুজনের সঙ্গে। আর উত্তরিয়া সুজন যেন পেখম খোলা ময়ূর। দোতারা বাজিয়ে, পাক দিয়ে দিয়ে ফেরে গোকুল বিন্দুকে।

সাবাই তন্ময় হয়ে শোনে, তালেতে শরীর দুলিয়ে শোনে। লিখনে যারা গান লেখে, তাদের নজর কেড়ে নেয় তিনটিতে, বেচারীদের কলম চলে না। মন ভেসে যায়, চোখ ভেসে যায় তার আগে আগে। বুড়া ধ্বনি করে, 'জয় গুরু' আর অচিনবাবু বলে ওঠেন, 'হায় হায় হায়।'

এখন বিন্দু এদিকে ফিরে চায় না। সেই আবার একই সপ্তমের টানায় ধরে,

'বলব কি সে প্রেমের কথা,
কাম হইল প্রেমের লতা'...

গোকুল ধরে,

'কাম ছাড়া প্রেম যেথা সেথা
নাই রে আগমন।'

এবার গোপীদাস আর রাধা প্রকৃতি, দুই বুড়া বুড়িতে একসঙ্গে ধ্বনি দিয়ে ওঠে, 'জয় গুরু, জয় গুরু।' আর অচিনবাবুই অবাক করেন বেশী। একেবারে গোকুল বিন্দুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে, ধরতাইয়ে সুর দেন, 'করি কেমনে শুদ্ধ সহজ প্রেম সাধন।'

তাঁর গান শুনে সকলেরই মাতন লাগে বেশী। গায়ক-গায়িকা দু'জনেই ফিরে তাকায়। কিন্তু যদি ঠিক দেখে থাকি, অচিনবাবুর গোরা মুখে যেন কেমন এক লালের ছোপ ধরে গিয়েছে। চক্ষু ছলছল। সেখানে চোখ ঘোরানো হাসির ঝিলিক আর নেই।

আর আমি দেখি গায়ক-গায়িকা গান করে না শুধু। যেন চোখে চোখে আর কিছু ভাষে। সেই ভাষাটা বুঝতে পারি না, তাই ভাবি: গেরুয়া ছোপানো আলখাল্লা, জড়ান এই বাউল বৈরাগীরা এ কোন্‌ কথা বলে, 'কাম ছাড়া প্রেম যেথা সেথা, নাই রে আগমন।' অথচ এমন করে বলে। এমন সুরে সুরে, হেসে হেসে, এমন স্পষ্ট করে, যেন কাম, কাম না, প্রেমের আর এক নাম। অধর কথা, ধরতে পারি না, কেবল তানে মানে লয়ে মজে, অবাক হয়ে শুনি, আর মনের মধ্যে কোথায় যেন, এক নাম-না-জানা সুর বেজে যায়। বিন্দু আবার ধরে,

'পরম গুরু প্রেম পীরিতি
কাম গুরু হয় নিজ পতি।'...

গোকুল গায়,

'অ ভোলা মন রে আমার, কাম ছাড়া প্রেম
পাই কি গতি
তাই ভাবতেছে লালন।
করি কেমনে শুদ্ধ সহজ প্রেম সাধন।'...

আবার জয়গুরু জয়গুরু, হরিবোল বেজে ওঠে। অচিনবাবুর গলায় যেন স্বপ্নের আবেশ। বলেন, 'থামিস না গোকুল, আজ মাত করেছিস ভাই। এ গান তোর বাবার মুখে ছাড়া আর শুনিনি।'

আর আমার মনে হয়, জীবনের কী এক অরূপ খেলার আসর এখানে জমেছে। অরূপ খেলার আসর তো আর এমনি এমনি জমে না। ভাবের ভাবী না হলে কি ভাব জমে! রস না থাকলে, কী পিয়ে আর রসিক হে। এখানে গায়ক-গায়িকা আর শ্রোতায় মিলে অরূপ খেলা জমেছে। ছাতিমতলার মেলায় এখানে, বাউল আসরে, সকলের ভাব লেগেছে। যারা গায়, তাদের। যারা শোনে, তাদেরও।

ভূমি বিনে গাছ জন্মে না। দেহ বিনে প্রাণের আশ্রয় নেই। এখানে তেমনি, শ্রোতা মাতায় গায়ক-গায়িকাকে, তারা মাতায় শ্রোতাদের। গোকুল-বিন্দু একের পর এক গান গেয়ে যায়। ততক্ষণে গোপীদাস একজনাকে ডেকে একটু ছিলিম সাজাতে বলে।

গোকুল-বিন্দুর গানের সব হিসাব দিই এত আমার স্মৃতিশক্তি নেই। তবু স্মৃতি খুঁটে দু'এক কলি স্মরণ না করে পারি না। যেমনঃ

'সে ফুল মিলতে পারে
মালীর বাগানে
আমার গোঁসাই বই
আর কে জানে।'

স্মৃতি কি কেবল কথার স্মরণে। দর্শনের পটে আঁকা পড়ে রয়েছে যা, স্মরণ সেই কারণেও। বিন্দু যখন এই কলি কয়টি গেয়েছিল, তখন সে গোকুলের দিকে চেয়ে হেসেছিল। আর গোকুল কেমন ঘাড় বাঁকিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে, ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে হেসেছিল,

'সে ফুলে যায় না ভমর
গন্ধে অমর
দগ্ধ ভমরী সনে।'...

কথার মর্ম বোঝা দায়, নর-নারীর ভাবের মর্ম বুঝি। মনে হয়েছিল যেন চোখের সামনে ইশারায় ইশারায় কথা কয় ডাগর-ডাগরী। কথা বুঝতে পারি না, তবে দুয়ের মাঝে যে এক পরম লেনা-দেনা চলছিল তা বুঝতে পারি। বাউল বৈরাগী বুঝি না, দেখেছিলাম, গোকুলের চোখ-মুখের ভাবেতে পুরুষ, হাতে-পায়ে ভঙ্গিতে পুরুষ। আর বিন্দু এক মেয়ে। কখনো লাজে লাজানো ডাগর চোখের পাতা ভারী। হাসি চাপতে গিয়ে প্রেমজুরি দু'খানি মুখের সামনে এনে মুখ আড়াল করা।

কেবল কী তা-ই! সুজন মাঝে মাঝে দোতারা সহ নিচু হয়ে দু'এক কথা কী যেন বলছিল বিন্দুর কানের কাছে। তখন শ্যামাঙ্গিনীর মুখখানি রক্তছটায় ঝলকায়নি। লজ্জাদ্যুতির রঙ সে মুখে আলাদা। একবার তো প্রেমজুরি তুলে বিন্দু সুজনকে মারার ভঙ্গি করেছিল। মনে আছে তখন গোকুল ভিন্ন গানের ভিন্ন কথার আওয়াজ দিচ্ছিল,

'অ ভোলা মন, রতির ঠিক না হইয়িলে
সতীর কিরপা হবে না
রতির ঘরে পতি বাঁধা,
একবার খুঁজে দেখ না।'

ওদিকে যখন এই চলেছে, তখন দেখ অচিনবাবুকে। ক্ষ্যাপা বাউল আর কাকে বলে। কেবল যে গলা ছেড়ে ধ্বনি তা না, মাঝে মাঝে যেন ভাবের রসে ডুব ডোবানো।

এদিকে হাতে হাতে কলকে ঘোরে, 'আয় ভাই, কে খাবি প্রেমের গাঁজা।' গোপীদাস আমাকে কলকেটি দেখিয়ে ডগডগে চোখে ইশারা করে, চলবে নাকি। টুকুস ইচ্ছে যে না হয় তা বলতে পারি না। তার আগেই অচিনবাবু হাত তুলে গোপীদাসের হাঁটুতে চাপড় মারেন, 'আর চিতা মজিও না।'

পর পর পাঁচখানা গানের পর গোকুল-বিন্দু থামে। রাঢ়ের পৌষালী শীতেও দেখ বিন্দুর শ্যামা মুখে ঘামের বিন্দু। গোকুলের পাগড়ির নিচে দিয়ে ঘাম ঝরে।

কিন্তু থামবার যো কোথায়। অচিনবাবু সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ তোলেন, 'এবার সুজন ধরো, তোমার গান শুনব।'

এখানে সবাই ধনী, কিন্তু কৃপণ না। সুজন দোতারার তারে আঙুল থামায় না। সে অচিনবাবুর দিকে ফিরে মাথা নিচু করে দোতারাটাই কপালে ঠেকায়, নমস্কার। প্রণাম। অচিনবাবু বলেন, 'জয় গুরু।'

'তবে, সুজন কিন্তু একলা।'

বলতে বলতে সুজন হাসে। বিন্দুর দিকে তেরছা চায়। বিন্দু সঙ্গে সঙ্গে প্রেম-জুরি দেখিয়ে ঘাড় কাত করে বলে, 'তাল দেবো।'

গোকুল বলে, 'আমিও দেবো, ধর ক্যানে।'

আবার শোনো, অচিনবাবুও বলেন, 'জানা পদ হলে ধরতাইও দেবো।'

সুজন আবার তেমনি করে নমস্কার করে। আসর দেখে বোঝা যায়, সবাই মজে আছে। আগের থেকে লোক বেড়েছে অনেক। এমন কি, শহরের হ্যাট-কোট রঙ-মাখাদের ভিড়ও লেগেছে। বায়স্কোপের তারা ফেলে বাউলের আসরে! জয় গুরু, জয় গুরু।

সুজন দোতারায় সুর তোলে, কিন্তু তার সব তাল যেন বিন্দুর প্রেমজুরিতে। বিন্দু থেকে চোখ সরে না তার। কেন হে, হোথা কি সিন্দুর অশেষ নাকি। প্রায় অন্তর্যামীর মতো অচিনবাবু আমার গায়ে একটু ঠেলা দিয়ে সুজনকে দেখিয়ে হাসেন। বিন্দু দেখে, দেখে দেখে হাসে আর বারে বারেই গোকুলের দিকে চায়। গোকুলও মিটিমিটি হাসে, ঘাড় দোলায়।

সুজনের গলা একটু মোটা, একটু বেশী মেঠো মেঠো, যেন বাতাসে দোলা উদাসী। অথচ গলার কাজে, ঢেউ দোলানিতে কেমন একটা অনায়াসের হালকা ভঙ্গি। দুয়ে মিলে যেন একটা ঘর-বাহিরের খেলা। যে উদাসী চলে যায় তেপান্তরের বুকে, ডাক দিয়ে যায় সে ঘরের আঙিনায়। সে গান ধরে,

'মেয়েকে না চিনতে পেরে
ঘটল বিষম দায়
মেয়ে সর্বনাশী জগৎ ডুবায়
মেয়ে ভজতে পারলে পারে যাওয়া যায়।'

এবার প্রথম আওয়াজ ওঠে গোকুলের গলায়, 'বলিহারি গোঁসাই।'

ধ্বনি দিতে গোপীদাস বাদ থাকে না, অচিনবাবুও না। শ্রোতা-শ্রোত্রীদের মধ্যেও যেন কেমন একটা ঢেউ খেলে যায়। অনেকেই আরো এগিয়ে আসতে চায়। আমি

ভাবি, সুজন বাউল বেছে বেছে গান ধরেছে মনোহরণ। সে গান কোথায় যায়, বচন দেয়া কোথায়। এ যেন পালা জমে ওঠে।

সুজন নাচতে জানে ভালো। দোতারা টেনে নামিয়েছে কোমরের কাছে, বেঁকে বেঁকে ঘোরে। বেশী লাফালাফি করে না। অচিনবাবুর দিকে ফিরে বলে, 'পদ কি জানা আছে বাবু গোঁসাইয়ের?'

অচিনবাবু চোখে একটু ইশারা করে বলেন, 'না। তোমার কাছে শিখব।'

সুজনের আবার নমস্কার। তারপরে বিন্দুকে একবার দেখে আবার গান ধরে,

'মেয়ে যাকে পর্শ করে
পাঁজরাকে ঝাঁজরা করে
(যেমন) কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরে।
মন, মন রে—মেয়ে কটাক্ষ বাণ হানে যারে
তার—মাথার মণি খসে যায়।
মেয়েকে না চিনতে পেরে,
ঘটল বিষম দায়।'

এবার গোপীদাসের গলা সব থেকে জোর শোনা যায়, 'জয় সোজন, জয় সোজন।'

সুজনের আবার নমস্কার। কিন্তু বাউল সোজাসুজি কটাক্ষ হানে বিন্দুকে আর ঘাড় নাচিয়ে নাচিয়ে যেন পুছ করে কিছু।

বিন্দু হাসতে গিয়ে চোখ মেলায় গোকুলের সঙ্গে। গোকুল হাসে ঢুলুঢুলু চোখে।

অচিনবাবু গলা নিচু করে আমাকে বলেন, 'ব্যাটা জবর চিতা বলে মনে হচ্ছে। কী রকম বুঝছ ভায়া?'

অচিনবাবু অনেকক্ষণ থেকেই আর আপনিতেই নেই। অথচ এখনো আমার নাম-পরিচয় কিছুই জানেন না। অবিশ্যি তার দরকারই বা কী। 'এখানে রসিক ডাকে রসিককে।' নাম-পরিচয় প্রয়োজন কী। বলি, 'চমৎকার।'

'কোন্ দিক দিয়ে?'

প্রশ্ন একটু জটিল লাগে। তবু সহজ জবাব দিই, 'যেদিক দিয়েই বলুন।'

'বেশ বলেছ, বেশ বলেছ ভায়া।'

ওদিকে সুজন আবার ধরেছে,

'সেই ভয়েতে স্বয়ং শংকর
রাখলেন মেয়ে বুকের ওপর
ওরে ভাই—জয়দেব আদি নব রসিক—আর
ছয় গোস্বামী
মাতল মেয়ের সাধনায়।
...ঘটল বিষম দায়।'...

এবার গোপীদাস অচিনবাবুর থেকেও, আর এক নতুন গলা জোরে বেজে ওঠে, 'ও অচিনদা, এবার এদের ছাড়ুন, এখন আর নয়।'

অচিনবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ফিরে তাকাই। দেখি, গেরুয়া পাঞ্জাবির ওপর সাদা পশমী চাদর জড়ানো চশমা চোখে মাঝবয়সী ব্যক্তি। আসরের ভিড় ঠেলে একেবারে আমাদের কাছাকাছি।

অচিনবাবু প্রথম নজরে যেন চিনতে পারেন না। তারপরে বলে ওঠেন, 'ওহো, তুমি? কেন, কী ব্যাপার?'

আগন্তুক ব্যক্তি বলেন, 'গোপীদাসদের কয়েকজনকে আজ আমার ওখানে খেতে বলেছি। বেলা তো অনেক হলো।'

'কই, সে কথা তো গোপীদাদা একবারও বলেনি।'

বলে অচিনবাবু তাকান গোপীদাসের দিকে। রাধা বৃদ্ধা বলে, 'ভুলে যেছে গ।'

আগন্তুক ব্যক্তি তখন ডাক দিয়ে তাড়া দিচ্ছেন, 'কই, গোকুলদাস, সুজনদাস, চলুন চলুন, অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

আসর মাত করা যেমন কথা আছে, তেমনি আসর পাত করাও কথা হয়। সেরকম ব্যাপারই ঘটে। যে ক'জন নিমন্ত্রিত উঠে দাঁড়ায় তাদের মধ্যে আসল লোকেরা সবাই রয়েছে। গোপীদাস, রাধা, গোকুল, বিন্দু, সুজন। তাদের সঙ্গে আরো দুজন। তার মানে সবাই, বাকী কেউ নেই।

অচিনবাবু মুখখানি বিকৃত করে বলেন, 'এই তোমাদের শান্তিনিকেতনের লোকদের দোষ। দিলে তো আসরটা মাটি করে!'

ইতিমধ্যে আসর ভাঙতে আরম্ভ করেছে। বিন্দু কাছে এসে বলে, 'ক্যানে গ অচিনদাদা, নিজের কি ভোজন সেবন নাই।'

'আরে ভোজন সেবন তো নিত্যি তিরিশ দিন আছে রে বাপু। এ জিনিস তো নেই।'

গোপীদাস বলে, 'এই তো যাবো আর আসব, সেখানে গিয়ে তো বসে থাকব না।'

তখন আগন্তুক হেসে বলেন, 'আপনিও চলুন না অচিনদা।'

'না', ও তোমার শান্তিনিকেতনী ভাব আমার ভালো লাগে না। আসলে তো নিয়ে গিয়ে খান পঞ্চাশ গান লিখে নেবে এদের কাছ থেকে।'

আগন্তুক আবার হেসে বলেন, 'দাদা নিজেও তা-ই, শান্তিনিকেতনের বাইরে না।'

তবু বিফলমনোরথ ভাব যায় না। অচিনবাবু বলেন, 'আমার কথা বাদ দাও, সরকারী আমলা, এখন ঘাটে পা বাড়িয়ে বসে আছি।'

আগন্তুকের সঙ্গে নিমন্ত্রিতেরা রওনা দেয়। বিন্দু তখনো অচিনবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে। বলে, 'ও বেলা দেখা হবে তো?'

অচিনবাবু বলেন, 'নিশ্চয়ই। আমার এই ভায়ার সঙ্গে তোদের আলাপ করিয়ে দেবো, আর এখন দু'জনে আলাপ করব।'

বিন্দু আমার দিকে চায়। চোখের দিকে চেয়ে, 'আমাদের গোঁসাইয়ের ভালো লেগেছে তা?'

অচিনবাবু অমনি চোখ পাকিয়ে বলেন, 'অ বাবা, ভায়াকে আমার একেবারে গোঁসাই?'

বিন্দুর ডাগর চোখের চাহনি আর গোঁসাই শব্দে আমারও শ্রবণে একটু ঝলক লেগে গিয়েছিল। চোখে মুখে কতটা, নিজে দেখতে পাইনি।

আমার জবাবের আগেই বিন্দু আবার বলে, 'গোঁসাই গোঁসাই লাগছে কি না!'

'বুঝেছি, তার মানেই চিতা।'

বিন্দু আর একবার তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসে। আমি বলি, 'খুব ভালো লেগেছে।'

অচিনবাবু বলেন, 'আচ্ছা যা এখন, ও বেলাতে হবে।'

বিন্দু ওর শরীরের লাবণ্যে ঢেউ তুলে চলে যায়। অচিনবাবু বলেন, 'চলো ভায়া, এবার তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করা যাক।'

শূন্য বাউল-আসর ছেড়ে বাইরে এসে আলাপের প্রথম ধ্বনি, 'ভায়ার কি চা কফি কিছু চলবে?'

বলি, 'আপত্তি নেই।'

'চলো তাহলে, নিরিবিলি দেখে বসা যাক।'

মেলায় কোথায় নিরিবিলি পাওয়া যায় জানি না। তবু পাওয়া যায়। কেতা-

জায়গার দোকানে না গেলে নিরিবিলিও মেলে। অচিনবাবু তাই উত্তরে যান না; দক্ষিণে পদক্ষেপ করেন। কয়েক পা গিয়েই এক দোকানে ঢোকেন। কফির কথা বলে আসন নিয়ে বসে আলাপের দ্বিতীয় ধ্বনি, 'ভায়ার নামটি কী?'

নাম বলি। কী যেন বলতে গিয়ে তাঁর ভুরু কুঁচকে যায়। নজর সজাগ করে চোখে চোখ রাখেন। গোরা মুখখানি জোড়া। হিজিবিজি রেখায় জিজ্ঞাসা। বলেন, 'মানে?'

নামের মানে জানা থাকলেও মানে বলতে হবে কেন জানি না। তার দরকারও হয় না। তিনি নিজেই জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি সেই লেখক নাকি?'

এই প্রশ্নে বড় ব্যাজ। ওটা একটা মোট কথা। তাই নিয়ে আলাপের ইচ্ছা নেই। জবাব দিই, 'ওই আর কী।'

'ওই আর কী মানে? তুমি তো বড় পাজী ছেলে হে! এতক্ষণ কথাটা বলনি।'

এ কি যেচে বলার কথা! হেসে বলি, 'জিজ্ঞেস করেননি তো, তা-ই বলা হয়নি।'

'থামো হে ছোকরা।'

প্রায় ধমক দিয়ে মুখের দিকে তাকান। দেখি ওঁর চোখে কৌতুকের ঝিকিমিকি, তার সঙ্গে একটু বিস্ময়ের ঝিলিক। বলেন, 'তা-ই তো বলি, চিতা-চিতা কি আর এমনি মনে হয়েছে। দূরে দাঁড়িয়ে গান শোনার লক্ষণ দেখেই বুঝেছিলাম রসিক-দাসিক ভাব। এখন তো দেখছি, বিন্দুর কথাই ঠিক, অ্যাঁ? খাঁটি গোঁসাই একেবারে। আরে, বলবে তো।'

বলেই আমার কাঁধে এক চাপড়। এবার হেসে-খুশে বাজেন, 'বাহ্, এ না হলে আর দৈব। ঠিক মীনটিই ধরেছি।'

ঘাড় বাড়িয়ে আরো বলেন, এই অধমের রচিত তুচ্ছ দুই-চারি কেতাবের নাম। মনে মনে বলি, 'বড় ব্যাজ, বড় ব্যাজ!' জীবনের পাতায় পাতায় ফিরছি। কী কারণে, কিসের সন্ধানে, তা জানি না। শুধু এইটুকু জানি, এ পাতা পরম পাতা, বইয়ের পাতা না। কে লিখছেন বসে এই পাতা, সে লেখকের নাম জানি না। জগৎ প্রকৃতি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে এখন সেই পরম পাতায় পাঠ চলছে। কাগজের পাতার কথা থাক। সেখনে আমার ভিন্ পরিচয়। আমি যে কত দুর্বল, অক্ষম, আতুর, কাগজের পাতায় কেবল তারই লিখন। সেথায় আপনাকে না চেনার কান্নাকাটি। সেথায়, লেখক হতে চাওয়ার বিড়ম্বনা।

আজ যখন পরমের পাতায় ফিরি, তখন সে পাতার কথা থাক। কিন্তু শোনে কে! অচিনবাবু আওয়াজ দিয়েই চলেন। তুচ্ছ কথাই উচ্চে ভাষেন। গৌরব দান করে গরব করেন। বলেন, 'চমৎকার। ঠিক মানুষটিই মিলেছে। নাও, এবার কফি খাও। কিন্তু হ্যাঁ হে, তুমি তুমি করছি বলে কিছু মনে করছ না তো।'

'বড় আনন্দ পাচ্ছি।'

আবার আমার ঘাড় ধরে ঝাঁকানি দেন। বলেন, 'ছোঁড়া একেবারে রামপ্রসাদে। তা উঠেছ কোথায়?'

বন্ধুর নাম বলি। পুরো উচ্চারণ করার আগেই বেজে ওঠেন, 'ও, আচ্ছা, ওদের বাড়িতে উঠেছ। ভেবেছিলাম, সকালবেলাই ও বাড়িতে একবার ঢুঁ মেরে আসি। তা আর হয়ে উঠল না। তুমি গিয়ে বলো, অচিনদার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তাহলেই বুঝবে।'

সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। ছাতিমতলায় ঘরে ঘরে তাঁর আসর যে বেশ জমজমাট, বাউলের আসরে কথাবার্তাতেই তা বুঝতে পেরেছিলাম। বলি, 'নিশ্চয়ই বলব।'

অচিনবাবু নিজের মনেই আমার বন্ধু ও বন্ধুপত্নী সম্পর্কে বলেন, 'বড় ভালো ছেলে-মেয়ে দুটি।'

এমনভাবে বলেন, যেন আমার বন্ধু দম্পতি সত্যি ওঁর কাছে দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। আবার জিজ্ঞেস করেন, 'আগে এসেছ কখনো?'

'না।'

'এই প্রথম? তাহলে খুবই ভালো লাগবে।'

বলতে বলতে অচিনবাবু অন্যমনস্ক হন। বাইরের লোকের ভিড়ে দৃষ্টি মেলে দেন। কিন্তু বুঝতে পারি, লোক দেখেন না। অন্য কিছু, বোধ হয় নিজেকেই দেখেন। তখন জিজ্ঞেস করি, 'এখানকার সঙ্গে আপনার অনেকদিনের সম্পর্ক, না?'

চোখ ফিরিয়ে চেয়ে হাসেন। বলেন, 'আর কোথাকার সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলো! তবে গোলমালটা তো জীবনে আগাগোড়াই। অসম্পর্কের দরজায় দরজায় ফিরছি, সম্পর্কের দরজাটাও এখন বন্ধ হয়ে গেছে বলে মনে হয়, এই আর কী।'

শোনায় সহজ, কিন্তু তেমন সহজ কথা নয় যেন। বলে হেসে একটা চুরুট ধরান। ধরিয়ে আবার বলেন, 'তবে তাতে খুব একটা দুঃখ লাগে না। এ শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আর সম্পর্ক কতটুকু। এখন সবই অচেনা। চেনা যারা আছে, তাদের সকলেরই বয়স হয়েছে, অবসর নিয়েছে। ছেলেমেয়ে নাতিনাতনী সব মিলিয়ে আমার সঙ্গে এমন একটা মস্ত ফারাক যে, তারা তাদের অচিনকে চিনতেই পারে না। তাদের কাছে শান্তিনিকেতন হয়ে গেছে আদর্শজীবিকা-গৃহস্থজীবনের মিলমিশ মাখামাখি করা এক জায়গা। আমার ঘর নেই, গৃহস্থও নই। তোমাদের ভাষায় আমাকে কী বলা যাবে, কনফার্মড্ ব্যাচেলর?'

বলে হাসেন। নিবু নিবু চুরুটে টান দিয়ে দিয়ে ধোঁয়া বের করে আবার বলেন, 'কনফার্মড্ কিনা বলতে পারব না, তবে ব্যাচেলর।'

হেসে আমার চোখের দিকে তাকান। ওঁর বড় ফাঁদের চোখে একটু লালের আভাস। সেখানে কেবল যে কৌতুকের ঝিলিক তা বলতে পারি না। সেই যে কাঁদন-ভরা হাসির কথা বলেছি, কেবলই যেন সেইরকম লাগে। এই চোখের আলোর ওপারে কী যেন ছলছল টলটল করে।

কফির পাত্রে চুমুক দিয়ে নিজেই আবার বলেন, 'কাউকে একটু পেলে কথা বলতে ইচ্ছে করে খুব। মেতে থাকতে ভালো লাগে। কেমন ভালো লাগে, কাদের ভালো লাগে, একটু আগে নিজের চোখেই দেখলে। ওখানে সাহস করে মুখ খুলতে পারি, হাসতে পারি, হাসাতে পারি। সবাই যতটুকু চায়, যতক্ষণ, তারপরে যে অগাধ সময়, তখন তো একেবারেই একলা। তাই বলছিলাম, কাউকে পেলে কথা বলতে ইচ্ছা করে খুব। কিন্তু বলতে চাইলেই বা শুনছে কে! ভাঁটা পড়া রক্তের কথা, তিন কাল পেরিয়ে যাওয়া মানুষের কথা কি কেউ শুনতে চায়?'

'আমার শুনতে ইচ্ছা করে।'

অচিনবাবু চোখ তুলে হাসেন। আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বলেন, 'ধন্যবাদ ভায়া, ধন্যবাদ। তাছাড়া তুমি তো শুনতে চাইবেই। যে শোনে সে-ই তো শোনায়। তোমাকে বোধ হয় একটু বুঝতে পারি। মানে তুমি ব্যক্তিটিকে না, সত্তাটিকে।'

শুনি আর আমার মনের কোথায় যেন একটা অজানার তীর বিঁধে টনটনিয়ে যায়। একটা উদ্বেগ তার সঙ্গে। ভাবি, এ মানুষের যেন মাটিতে পা নেই। এ মানুষের পাখাও নেই ওড়বার। এ মানুষ আছেন কোথায়। কোন্ সংসারের অচিন পথে ছুটে বেড়াচ্ছেন!

নিজেই আবার বলেন, 'সেইজন্যেই বলছিলাম, অন্য সব পরিচয় বাদ দিই, সরকারী

চাকরির জোয়াল প্রায় সারা জীবনই কাঁধে রয়েছে, আজও ছাড়াতে পারিনি, তবু আসলে বোধ হয় আমি একটা মস্ত বাউন্ডুলে। কেন তা বলতে পারিনে। সকলের ভাগ্যে তো সব কিছু হয় না। আমার আর দশজন বন্ধুর মতো আমি হতে পারিনি। সেটা আমারই দুর্ভাগ্য। এখন তাদের দিকে তাকিয়ে দেখি, তারা এক রাজ্যে, আমি আর-এক। তারা ফিরে চায় না, তাদের সময় বা ইচ্ছা কোনোটাই নেই। আমি দূর থেকে, বলতে পারো, অনেকটা অবাক হাবাগোবা ছেলের মতো হাঁ করে তাদের দিকে চেয়ে থাকি।'

বলতে বলতে আমার চোখে চোখ পড়তে থমকে যান। যেন হঠাৎ লজ্জা পেয়েই হেসে নিবন্ত চুরুটে আগুন জ্বালেন। আর আমার যেন বুকে নিশ্বাস আটকায়। যত অস্পষ্ট কথাই হোক, সেই অবাক হাবাগোবা হাঁ করে চেয়ে থাকা ছেলেটাকে আমি যেন দেখতে পাই। আমি দেখতে পাচ্ছি, সংসারের যে সীমানায় সে ছেলেটি যেতে চেয়েছিল, অথচ যাওয়া হয়নি, সেই দিকে সে চেয়ে আছে। চোখে তার করুণ আর্ত দৃষ্টি। বুকে তার অচিন পানীয়ের তৃষ্ণা মাথা কুটে মরে। কিন্তু তার চুল হয়ে গিয়েছে ধূসর, মুখে পড়েছে হাজার হিজিবিজি রেখা। এখন সে চুরুট মুখে নিয়ে কেবলই আগুন জ্বালে, নেবে আবার আগুন জ্বালে।

জানতে ইচ্ছা করে, কেন। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচ হয়। পাছে এমন কোথাও হাত পড়ে যায়, যেখানে সামান্য স্পর্শে বিষের ব্যথা লাগে বা আগুন জ্বলে যায়।

জিজ্ঞেস করেন, 'ভায়াকে বিরক্ত করছি না তো?'

তাড়াতাড়ি বলি, 'মোটেই না।'

বলেন, 'সেইজন্যেই বলি আর কি—তখন বলছিলাম না, বছরে একবারই এখানে এ সময়ে না এসে পারি না। আসলে ঘুরেফিরে নিজেকেই দেখতে আসা। জীবনে প্রথম চাকরি তাও এখানেই করেছি। সামান্য কিছুকাল, তারপরেই বাইরে চলে গেছলাম। মনে হয় জীবনের আসলটা সব এখানেই পড়ে আছে, তা-ই একটু ঘাঁটতে আসা।'

বলে হাসতে হাসতে পানীয়ের পাত্রে চুমুক দেন। বুঝতে পারি, প্রসঙ্গ বদলাতে চান। তা-ই বলেন, 'এবার তোমার কথা বলো।'

আমার কিছু বলবার নেই, কেবল শোনবার। অচিনকে চিনবার সাধ আমার। বলি, 'আমার কোনো কথা নেই।'

'সবই তো লিখে বলো, তা-ই না?'

বাউল আসরের দরাজ হাসি বাজে আবার। বলি, 'তাও তো বলতে পারি না। চেষ্টা করি মাত্র।'

উনি বলেন, 'তা হলেই হবে।'

জিজ্ঞেস করি, 'কতকাল আগে এসেছিলেন এখানে?'

'হিসাব করে বলা মুশকিল। সাল তারিখ নিজেরই মনে নেই। ইজেরের ওপরে একখানি জামা গায়ে দিয়ে এসেছিলাম। নিয়মমাফিক হাতেখড়িটা দেশের বাড়িতে পণ্ডিত মশাইকে দিয়েই করানো হয়েছিল। বিদ্যালয় বলতে শান্তিনিকেতনকেই চিনি। বিদ্যালয়ের পাঠ শুরু এখানেই। তবে আবার বলি, এই শান্তিনিকেতনে না। তখন এমন অমিল বিস্তর।'

হঠাৎ আমার চোখের সামনে একটি মূর্তি ভেসে ওঠে। মাথায় চুল, মুখে দাড়ি, গায়ে আলখাল্লার মতো জামা, শালবীথির রৌদ্রছায়ায় দাঁড়ানো এক ছবি। বলি, 'আপনারা তো তাঁর সময়ের লোক, মানে রবীন্দ্রনাথের?'

'নিশ্চয়ই। আমরা গুরুদেবের ছাত্র।'

বলতে গিয়ে যেন ওঁর মুখে ঝলক লেগে যায়। বলেন, 'আমরা তাঁর কাছে পড়েছি, তাঁকে দেখেছি, আমরা যে সব সময়ে তাঁর কাছে কাছে রয়েছি, এটা কখনো ভুলতে পারতাম না। আর সেই অহংকারটাও কোনোদিন গেল না। হ্যাঁ, অহংকারই বলতে পারো।'

তাতে তুমি যা খুশি তা-ই ভাবো, অচিনবাবু সজোরে চুরুট টানেন। আর আমার কাছে এই মানুষই যেন এক বিস্ময় হয়ে ওঠে। বাঙলা দেশের সে-ই যে একদল ছেলেমেয়ে, যাদের মুখ ফিরেছে আজ পশ্চিমে, মুখে অস্তছটার রক্তাভা, ঠিক সেই দল আর ফিরে আসবে না। আমার সামনে যিনি বসে, তিনি সেই দলেরই একজন।

আবার বলেন, 'তবে বুঝতেই পারছ, তাঁকে আমরা আর কতটুকু পেতাম। বিশ্ব-জোড়া লোকের ভিড়, নিজের কাজের শেষ নেই, তাঁকে কতটুকু ধরা যায়। তবু সে আর-এক শান্তিনিকেতন। আজ দেখছ বোতাম টিপলে বাতি জ্বলে, কল ঘোরালে জল পড়ে, চারদিক আলোয় ভরা। মস্ত বড় বোলপুর স্টেশন, মেলাই গাড়ি যাতায়াত করছে, স্রোতের মতো লোক আসছে, মোটরগাড়ি সাইকেল-রিকশা ছোটাছুটি করছে। মনে আছে, বাবা এসে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। ছোট্ট একটা গ্রামের স্টেশন, নিঝুম, ভিড় গোলমাল নেই। এক গাছতলার ছায়ায় গুটিকয় গরুর গাড়ি ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। দড়িতে বাঁধা বলদগুলো ল্যাজ নাড়িয়ে মাছি তাড়াচ্ছে, খড় চিবুচ্ছে। আর কোনো যানবাহন নেই, সেই একটি গরুর গাড়ি ভাড়া করেই বাবা নিয়ে এসেছিলেন। সন্ধ্যা হলে কেরোসিন তেলের আলো। এখনকার চোখে মনে হবে, অন্ধকার। প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডেকে যায়, ঝিঁঝির ডাকে শান্তিনিকেতনের সেই প্রকৃতিকে অন্যরকম লাগত।'...

বলেন, আর দেখি একটি মানুষ কোথায় ফিরে যান। যেন তাঁর মুখের হিজিবিজি রেখা মুছে যায়, চুলের ধূসরতা মুছে যায়। যেন তাঁর মুখে স্বপ্নের ছায়া, তাঁর গলায় স্বপ্নের সুর। আমি সেই সুরের কল্পনায় আর-এক শান্তিনিকেতনকে দেখি।

অচিনবাবু আবার সেই স্বপ্নের ওপার থেকে সেই সুরে ভাষেন, '"আলোর নাচন পাতায় পাতায়, তাই তো ভালো লেগেছিল।" লাগেনি কেবল, তখন "বেসেছিলেম ভালো।"'

সহসা তাঁর মুখে যেন রক্ত ছুটে এল। কেবল মুখে না, চোখেও। থমকে গিয়ে নিচু মুখে কী যেন ভাবেন এক মুহূর্ত। তারপরে একেবারে যুবকের মতো সোজা দাঁড়িয়ে বলেন, 'আর নয় ভায়া, চলো বেরুই।'

আমার মনে হলো, কোথায় যেন কী এক সুর বেজে উঠছিল। সহসা সে বাঁক ফিরে যায় অন্য পথে, শব্দহীনে হারিয়ে যায়। আমি ওঁর মুখ থেকে চোখ সরাতে পারি না। উনি পকেটে হাত দিয়ে আমার দিকে চেয়ে আবার ডাকেন, 'ওঠো হে।'

বলি, 'তা উঠছি, কিন্তু মনে হলো বাউল আসরের মতোই এ আসরটাও ভেঙে গেল আচমকা।'

অচিনবাবু হো হো করে হাসেন। বলেন, 'তা-ই নাকি?'

বলে হঠাৎ নিচু হয়ে স্বর নামিয়ে বলেন, 'তবে একবার যখন বেজেছে, পরেও বাজবে। ও-বেলা বাউল আসরও আবার বসবে, তোমার সঙ্গে দেখাও হবে। চলো, একটু মেলা ঘুরে বেড়াই।'

তিনি পকেট থেকে পয়সা বের করেন। আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলি, 'না না, আপনি কেন, আমি দিচ্ছি।'

'থামো হে ছোকরা। তুমি আমাকে ডেকেছ, না আমি তোমাকে?'

'আপনি।'

'তবে?'

বলে পয়সা মিটিয়ে দেন। বাইরে আসি, তখনো অচিনবাবুর পদক্ষেপ দক্ষিণেই। জিজ্ঞেস করি, 'ওদিকেও কি মেলা আছে?'

'আরে আসল মেলা তো ওদিকেই হে।'

মিথ্যা না। ছাতিমতলায় যে মেলাটা নেই ভেবেছিলাম, দেখলাম এদিকে সে-ই মেলা। এখানে অন্য পসার, অন্য পসারী পসারিনী। এখানে বাঙলা দেশের সেই চির-চেনা শিল্পীরা নিজেদের শিল্প সাজিয়ে বসেছে। যাদের নাম কামার, কুমোর, ছুতোর। এখানে পাবে কোদাল কাস্তে শাবল কাটারি বঁটি জাঁতি কুরুনি। এখানে পাবে হাঁড়ি কলসী মালসা, ছাপের পুতুল, মানতের ঘোড়া। এখানে পাবে কাঠের তৈরি দরজা, শিক বসানো জানালা, মাঠে জল দেবার লোহার ডোঙা। বর্ষায় মাঠে কাজ করবার জন্যে মাথা ঢাকার টোকা, হুঁকো, কলকে, মায় চাঁছাছোলা ঢেঁকিও।

এ আর এক মেলা। এখানে ক্রেতা-ক্রেতীও তাই আলাদা। গ্রামীণ মাঠের মানুষ, ভিন্ন গৃহস্থী। ধান কাটা শেষ, লবাত হয়ে যেইছে, এখন পাখিরা ঘর বানাবার কুটো-কাটির খোঁজে। বাসা গোছাবার জিনিসপত্রের সন্ধানে।

ছাতিমতলার মেলায় সব আছে। এই তো সেই মেলা, চিরদিনের মেলা। মেলা তো কেবল মেলা না। ঘরের বাইরে চরব খাবো, সব এক ঠাঁই হয়ে দূর দূর থেকে এসে কেনাকাটা করে আবার দূরদূরান্তে চলে যাবো।'

এই তো সেই মেলা, নাগরদোলা, বাজীকরদের খেলার তাঁবু, সার্কাসের পশু, অজগরের মাছ খাওয়া, এক মানুষের তিন মাথা, আগুন-জ্বালানো মেয়ে, যার গায়ে কাঠি ছোঁয়ালেই চিকচিক করে ফুলকি জ্বলে ওঠে।

শুধু কি তাই। ওই দেখ না, গ্রামের বালারা কেমন করে চুড়িওয়ালীকে ঘিরে ধরেছে। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, সাজাও সাজাও আমাকে, সাজাও গো। ওই তো কপালের টিপ, পাথরের আঙটি, ফুলেল তেল, তরল আলতা, পতিসোহাগী সিঁদুর।

কিন্তু রোদ যেন অনেক ঢল খেয়ে গিয়েছে। হাতের ঘড়ি তুলে দেখতে গিয়ে চোখ কপালে ওঠে। ছি ছি ছি, বেলা তিনটে!

থমকে দাঁড়াতে দেখে অচিনবাবু হাঁকেন, 'কী হলো?'

'তিনটে বাজে!'

'তা কী হয়েছে?'

'বন্ধু বসে থাকবেন কিনা জানি না, খাবার কথাই ভুলে গেছি।'

'বাঃ, চমৎকার! আর আমি ভাবছি, তুমি বুঝি খেয়ে-দেয়েই বেরিয়েছ।'

তারপরে হেসে বলেন, 'তবে এসেছ তো মেলায়। ঘাবড়াবার কী আছে? চলো, না-হয় মেলাতেই খাবে।'

আমি বলি, 'সেটা হয় না। একবার যাওয়া দরকার।'

'তবে চলো, তোমাকে দিয়েই আসি।'

দু'জনেই উত্তরের দিকে ফিরি। ফিরতে গিয়েই হঠাৎ একটা চেনা মুখ যেন ঝলকে ওঠে। এগিয়ে যাবার জন্যে দু' পা বাড়িয়েও আর একজন মুখোমুখি থমকে দাঁড়ায়। চোখ থেকে চোখ সরায় না। তার অবাক মুখে হাসি ফুটি ফুটি করে। তার সঙ্গে আরো কয়েক সঙ্গী ও সঙ্গিনী। অতএব তাদেরও দাঁড়াতে হয়, অচেনা চোখে তাকায়।

কয়েকটি মুহূর্ত মনের অন্ধকারে ঝিলিক হেনে যায়। আমি বলি, 'আপনি দিদি—?'

'চিনতে পারলেন? কিন্তু ঝিনি না, কারণ চিঠিতে তাই লিখেছিলাম, জবাব পাওয়া যায়নি। যদিও কথা দিয়েছিলেন। আমার নাম অলকা চক্রবর্তী।'

হাসির চেয়ে ওর মুখে ভার বেশী। আমি যেন কেমন থতিয়ে যাই, বিব্রত লাগে।

তবু হাসি। আর অচিনবাবু বলেন, 'চলি, ভায়া, বাউল আসরে দেখা হবে। তবে বেলা কিন্তু অনেক।'

এদিক ওদিক, দু'দিক মিলিয়ে হঠাৎ কেমন ধাঁধায় পড়ে যাই। এদিকে যখন একজন চোখের ছিলায় টান দিয়ে অভিযোগে ভাষে, পোশাকী নাম শোনায়, অন্য দিকে তখন অচিনবাবু হাত তুলে আচমকা বিদায় নেন। না বলে পারি না, 'আপনি চললেন?'

ততক্ষণে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছেন। ফিরে তাকিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, জয়গুরু জয়-গুরু। ও-বেলা যেন দেখা হয়।'

বলতে বলতে চলে যান। যাবার আগে ঝিনির—থুড়ি, 'আমার নাম অলকা চক্রবর্তী'—সেই অলকার দিকে একবার নজর হেনে যান। মনে হয়, ওঁর বড় চোখের ফাঁদে একটু দুষ্টু ছেলের ঝলকানি। যেন একটা ইশারার ঝিলিক।

কিন্তু এদিকে দৃষ্টিবন্ধনে আছি। অলকা চক্রবর্তী চোখ নামায়নি। ফিরে তাকিয়ে দেখি, ওহে, এ দৃষ্টির নাম কী, আমি জানি না। বিব্রত লজ্জায় হাসতে হয়। অপরাধ করেছি, সন্দেহ নেই। একটি চিঠি আমার চোখের সামনে ভাসছে। যার সুরটা এমনি, 'শ্রদ্ধাস্পদেষু, আশা করি ভুলে যাননি। তথাপি প্রথমেই নিজের নামটা বলি, আমার নাম ঝিনি, ওরফে অলকা চক্রবর্তী, পিতার নাম শ্রীব্রহ্মনারায়ণ চক্রবর্তী, আমাদের দেখা হয়েছিল...।'

নোনা দরিয়ায় জলযানে যে নাগরিকাকে দেখেছিলাম, সেই নাগরিকাই। চোখের কালো ঠুলি এখন হাতে। ব্যাগ ঝুলছে হাতে গলিয়ে কনুইয়ের কাছে। চুলে অশ্বপুচ্ছ বাঁধুনি নেই, এলো খোঁপায় জড়ানো রুক্ষ চুলের চূর্ণ কপালে, গালের কাছে। তাতে রাঢ়ের রাঙা ধুলার আভাষ। রাঙা ধুলা সেই ক্যাঙলা। নাগরিকার সারা গায়ে মুখে ছড়িয়ে আছে, তাই কাজল এখন বাসী লাগে, ঠোঁটের আর কপালের হালকা রাঙা রঙও কেমন বাসী-বাসী। ঠিক যেন গোধূলির আকাশের মতো রঙ, রেশমী শাড়িতেও সেই ভাব। নিরাভরণ তেমনি, কেবল সোনার শিকলিতে জড়ানো ঘড়িটা ছাড়া।

কিন্তু দৃষ্টিতে যত নালিশ থাক, ভুরু বেঁকে থাকুক, সঙ্গে আরো লোক আছে, নাগরিকা সেই কথাটা ভোলে নাকি। তাদের চোখে কৌতূহল, ভুরুতে অবাক বাঁকানি। অতএব অপরাধে হাসা যায়। হেসে কবুল করি, 'হ্যাঁ, চিঠিটা পেয়েছিলাম, মানে—।'

কথা শেষ করা যায় না। কাছাকাছি থেকেই নিচু স্বরে অলক ভাষে, 'থাক, আপনার এই হাসি আর কথা থেকে আপনাকে বোঝা যাবে না।'

গলা তুলে বলে, 'আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুদের আলাপ করিয়ে দিই। ইনি সুপর্ণাদি, অধ্যাপিকা; লিলি ঘোষ, আমার বন্ধু; রাধা চ্যাটার্জি, বন্ধু; নীরেন হালদার, আমাদের নীরেনদা, ইস্কুলের হেডমাস্টার; শুভেন্দু ব্যানার্জি, বন্ধু।'

সকলের পরিচয় দিয়ে অলকা আমার পরিচয় দেয়। নমস্কার বিনিময়, একটু হাসি। সকলেই জানান, অলকার মুখে তাঁরা আমার কথা আগেই শুনেছেন। সেটা এমন কিছু বলবার কথা না। কেবল ভাবেন না শুভেন্দু ব্যানার্জি—বন্ধু। কিন্তু তারপরে যে প্রসঙ্গ উঠতে যায়, বড় ব্যাজ ব্যাজ। তবু সাহিত্যের কথা শুনতে হয়, বলতে হয় দু'-এক কথা। জিজ্ঞেস করি, 'কোথায় উঠেছেন?'

নীরেনদা বলেন, 'এই তো কাছেই, দক্ষিণ পল্লীর এক বাড়িতে আমরা উঠেছি। আপনি কোথায়?'

বলি, 'দিকের কথা বলতে গেলে তো পশ্চিম পল্লী বলতে হয়।'

সুপর্ণাদি বলেন, 'তার মানে, আশ্রমের দিকে।'

নীরেনদা ভারী মানুষ, মাথা-জোড়া টাক। খদ্দরের গেরুয়া পাঞ্জাবির ওপরে গরম আলোয়ান। কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ। সুপর্ণাদি রোগা রোগা, বয়স—অনুমানে বলি,

চন্দ্রিশের কাছে। রাধা, লিলি তাদের বান্ধবীর বয়সী, পোশাকে-আশাকে তিনজনেরই মিল কাছাকাছি। সুপর্ণাদি, সেই অনুপাতে ছিমছাম, গম্ভীর। শুভেন্দু পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাহেব। চুলেতে ঢেউ-খেলানো সামনে, চোখের কালো ঠুলি একবারও খোলেনি। সরু কালো গোঁফ জোড়াটি যেন তলোয়ারের মতো ধারালো। লম্বা, সুঠাম, সুন্দরকান্তি যুবা। এখন রোদের তাপে কোট উঠেছে হাতে। সাপের মতো মসৃণ তার কণ্ঠলেঙুটি, রঙেতে বাহার। তার বুকে ঝিলিক হানে জড়োয়া কাঁটা।

নীরেনদা বলেন, 'আমরা এসেছি এক বন্ধুর খালি বাড়িতে। তা চলুন না, আমাদের বাড়িটা দেখে আসবেন, এই তো কাছেই। এখান থেকে দু' মিনিট।'

আমন্ত্রণে নিরুপায়। সূর্য চলেছে অনেক ঢালুতে। তাড়াতাড়ি বলি, 'পরে আসব।'

'ও কথাটা বলবেন না।'

কথার পিঠেই ঠেক। অলকা ভাষে। চেয়ে দেখি, হালকা রাঙা টিপখানি বারেক কেঁপে যায়। ঈষৎ বক্রতা সেই ঠোঁটে। বলে, 'জানলেন না কার বাড়ি, কোন্ বাড়ি, পরে আসতে পারবেন তো?'

এ যেন ঠিক অলকা না, ঝিনি ঝিনি লাগে। একটু রোষ-রোষ ভাব, চোখের তারায় কিঞ্চিৎ খর টানের ঝিলিক। দর্শন পড়া মেয়ে, এ দার্শনিককে তুমি এত সহজে বচনে মেরে যাবে, তা হয় না। দর্শন হলো যুক্তিসিদ্ধ।

তখন রাধা চ্যাটার্জি তার ঘাড়ছাঁটা চুলেতে ঝটকা মেরে বলেন, 'ও, তার মানে না আসবার ফিকির করেছেন?'

অলকা তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, 'অমন কথা বলিসনে, কথা তো দিয়ে যাচ্ছেন, পরে আসবেন বলে।'

আর লিলি বলে, 'তারপরে আর দোষও দেওয়া যাবে না, কারণ বাড়িঘরের ঠিকানাই তো ওঁর জানা নেই।'

নীরেনদা হা হা করে হেসে ওঠেন। সুপর্ণাদিও। লিলি রাধাও খিলখিলিয়ে বাজে। অলকা না। শুভেন্দুর গম্ভীর মুখে ঈষৎ হাসি খেলে।

সুপর্ণাদি বলেন, 'তোমরা সবাই মিলে ওঁকে এরকম করলে হবে কেন।'

তাড়াতাড়ি জুড়ে দিই, 'বাড়ির ঠিকানাটা তো আমি জিজ্ঞাসা করতামই।'

'আর সেটাই হতো ঠিক যে, তারপরেও আপনার আসবার অবকাশ হতো না।'

অলকার কথা শুনে লিলি রাধাই আবার বেজে ওঠে। নীরেনদাও। তিনি বলেন, 'কিন্তু যাই বলো, এ অসময়ে ওঁকে নিয়ে যাবে, বেলাও অনেক হয়েছে। আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?'

প্রায় অসহায়ের মতো বলি, 'না। আর আমি তো বন্ধুর বাড়িতে এসেছি। ওঁরা এবার হয়তো একটু ভাবছেন।'

তখন সুপর্ণাদি নিজেই দক্ষিণ পল্লীর বাসার ঠিকানা দিয়ে বলেন, 'তাহলে আর এখন কিছু বলব না, কিন্তু আসা চাই।'

রাধা বলে ওঠে, 'আমরাও খাওয়াতে পারতাম আপনাকে।'

আমি বলি, 'তোলা রইল।'

'সত্যি, কথা শুনলে একটুও অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না।'

অলকার কথাতেও হাসি বেজে ওঠে। সে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'আপনারা এগোন সুপর্ণাদি, আমি আসছি।'

সবাই একটু ঠেক খায়, আমিও। নীরেনদা বলেন, 'বুঝুন এবার, এদের ঘাঁটানো কি চাট্টিখানি কথা! কথা দিয়ে কথা না রাখা।'

বলে হেসে চলতে চলতে আবার বলেন, 'তবে ঝিনি, বেশী দেরি ক'রো না। তুমি

না, ওঁরও কারিও না।'

একে একে নমস্কার বিনিময়। নীরেনদাদের দল চলে যায়। রাধা আর লিলি দু'-একবার ফিরে ফিরে চায়, হাসে।

অলকা বলে, 'আপনাকে দাঁড় করিয়ে রাখব না, চলুন এগিয়ে দিয়ে আসি।'

অবাক হয়ে বলি, 'কোথায়?'

'যেখানে উঠেছেন, সেখানেই।'

'কেন মিছিমিছি এত বেলায়, অত দূরে—'

'মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি, আপনার খুব খিদে পেয়েছে।'

'আপনার পায়নি?'

অলকা ঘাড় ফিরিয়ে চোখ তোলে। ওর চোখে যেন ঘনিয়ে আসা ছায়া, অথচ কোপে ঝিলিক দেয়। বলে, 'পেয়েছে। তবু ছেলেদের পাওয়ার সঙ্গে, মেয়েদের একটু তফাত আছে। কষ্ট হবে না।'

ই দ্যাখ হে, কলকেতার বিদ্যাদিগ্‌গজ মেয়ে কেমন কথা বলে। রাঙা ধুলায় মাখামাখি, নাগরিকাকে কেমন যেন বৈরাগিনী দেখায়। মুখখানিও শুকু-শুকু। মেয়েদের সহ্যশক্তি বেশী জানি, তবু আমাকে এতখানি পথ পেঁছে দিয়ে, আবার একলা ফিরবে, পুরুষের প্রাণে তা-ই বা সহ্য হয় কোথায়। বলি, 'মনে হচ্ছে, অনেকক্ষণ বেরিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, সেই সকালে। কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে গেছলাম শ্রীনিকেতনে।'

'খুব পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে।'

'আপনার থেকে বেশী নয়।'

অগত্যা নিজেকে যখন দেখতে পাচ্ছি না। তবু না হেসে পারি না। আর একজনের ভারী মুখে হাসি-হাসি ভাব, কিন্তু হাসি নেই। অতএব, এই চলাতে ঠেক দিতে হলে যে প্রস্তাব দিতে হয়, তা-ই দিই, 'তাহলে, আমরা কোথাও বসি।'

'কোথায়?'

'কোনো চা-কফিখানায়।'

অলকার চোখের তারায় বিঁধিয়ে দেখার ধার। জিজ্ঞাসা আর খোঁজাখুঁজি। বলে, 'খিদের জন্য কষ্ট হবে না?'

এবার বাত দিতে ছাড়ি না, 'বিশ্বস করলে বলতে পারি, মেয়েদের থেকে বেশী না।'

'কিন্তু না-খাওয়া লোকের সঙ্গে বসে কথা বলতে, মেয়েদের বড় অস্বস্তি।'

'ছেলেদেরও।'

অলকার ছায়া ঘনানো, অথচ খর তারায় এবার যেন একটু তরঙ্গ চলকে ওঠে। আবছা রাঙা ঠোঁট দুটো টিপে রাখে। হাসি বড় বেইমান যে। বলে, 'কিন্তু একটু কথা ছিল যে।'

'শুনতে চাইছি তো।'

'রাগকে বড় ভয় লাগে।'

'কার রাগকে?'

'যারই হোক, রাগ রাগই।'

'আমারও ভয় লাগে।'

আবার ঠোঁটে ঠোঁটে টিপুনি। বেইমান, ছড়িয়ে পড়িস না ঠোঁট ভাসিয়ে। বলে, 'রাগ করছেন না তো?'

ঘাড় নেড়ে বলি, 'আমি করিনি।'

অলকা আবার চোখের দিক চায়। চোখে তার সেই খোঁজাখুঁজির বিঁধ বেঁধানো।

boiRboi.net

বলে, 'হয়তো অল্প আলাপে, একটু বেশী দাবী হচ্ছে।'

সত্যি কি, এত মাপজোকের বিচার আছে তোমার মনে। বরং, চিঠির কথা মনে করে, তখন থেকে মনে মনে থতিয়ে আছি। বলি, 'আমার তা মনে হয়নি।'

'তাছাড়া, আপনার খিদে বাদ দিলেও বন্ধুরা অপেক্ষা করবেন।'

'অপেক্ষার থেকেও, একটু চিন্তা করবেন হয়তো। সেটা পরে সামলে নেওয়া যাবে।'

'তবে কোথায় বসবেন চলুন।'

বেশী দূরে যাবার দরকার ছিল না। পা বাড়ালেই সরাইখানা। অচিনবাবুর সঙ্গে যেখানে বসেছিলাম, সেই নিরিবিলিতেই যাই। কফি চেয়ে, বসি।

অলকা বলে, 'শুধু কফি এত বেলায়? একটু খাবার নিলে হতো।'

'আপনি খাবেন?'

'না, এখন আর আমার এসব শুকনো খাবার ভালো লাগছে না। আপনি খান।'

'আমার সত্যি ইচ্ছে করছে না।'

অলকা আবার চোখের দিকে তাকায়। টেবিলের উলটো দিকে বসে, হঠাৎ বুঝি খেয়াল হয়, গোধূলি-রঙ রেশমী শাড়ি বুকের থেকে কিনার নিয়েছে। আর ডাগর করে কাটা দুপুর-রঙ জামায় তার লজ্জা শিউরে যায়। আঁচল ঘুরিয়ে টেনে দেয় বুকে। চোখের পলক নত হয়।

আমি জিজ্ঞেস করি, 'আপনার বাবা কেমন আছেন? আর—।'

কথা শেষ হবার আগেই, অলকার টানা চোখে অবাক চমক খেলে। বলে, 'আপনার মনে আছে তাঁদের কথা?'

এবার অবাক চমক আমার। বলি, 'সে কি! মনে থাকবে না কেন?'

অলকা একটু হাসে। এ সেই বেইমান হাসি না, একটু ছায়াবিধুর। বলে, 'এতক্ষণ কিছু বলেননি তো, তাই ভাবলাম, ভুলে গেছেন। তাঁরা কিন্তু আপনার কথা বলেন।'

আর একবার বিব্রত হয়ে পড়ি, অপরাধী মনে হয় নিজেকে। তাঁদের কথা হয়তো প্রথমেই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। কিন্তু ওহে, টুকুস সময়ও তো চাই। নানা আন কথাতেই যে সময় চলে গিয়েছে। আমি বলি, 'প্রমাণ দিতে পারব না হয়তো, কিন্তু আপনার বাবাকে আমি ভুলিনি। আপনার মাকেও না।'

অলকার নজরে বাঁক লেগে যায়। চোখ তুলে চায়। যেন কিছু জিজ্ঞেস করে। তারপরে আবার ঠোঁট টিপে চোখ নামিয়ে নেয়। বলে, 'অবিশ্যি, জানি না, ব্রহ্মনারায়ণ চক্রবর্তীর মতো লোক কেমন করে এত মুগ্ধ হন। প্রায়ই বলেন, "ছেলেটি বড় ভালো" আর মা বলে, "একটু গুমোর নেই।" দু'জনেরই দেখি আপনাকে বেশ মনে আছে।'

আমার চোখের সামনে সেই মুখখানি ভাসে। যাঁর মাথায় দু'-চার গাছি খাড়া-খাড়া শিরিঙে মতো চুল, নকল দাঁতে ঢেউ খেলানো, ভ্রূকুটি মুখে রোখা রোখা ভাব। কিন্তু চোখে ঢাকা কাচের ওপারে যাঁর বিটলে হাসি চিকচিক করে। তাঁর পাশে, কপালে সিঁথেয় সিঁদুর ডগডগানো সধবা। প্রাচীন নাকছাবিতে ঝলক দিয়ে যিনি ব্রহ্মনারায়ণকে হানেন। নোনা গাঙের বুকে ভেসে যাওয়া, ফিরে আসা, তার মাঝে অনেক কথা মনে পড়ে যায়।

প্রতিজ্ঞা করে তাঁদের কথা মনে রাখিনি। মন-স্বভাবের স্রোতে তাঁরা আছেন। বলি, 'তাঁদের মতো ভালো নই, কিন্তু মনে আছে।'

'মিথ্যুক বলব না আপনাকে।'

বলেই অলকার ঠোঁটের কোণে যেন হাসিতেই একটু ধার খেলে যায়। আবার বলে, 'ওঁরা প্রায়ই বলেন, আপনাকে কেন একটা চিঠি দিয়ে খবর নিই না। আমি বলি শীগগিরই নেবো।'

যেন মুখে আমার ধারালো ধারে কোপ লেগে যায়। এবার ভাষো হে কথার কারিগর। কয়েক পলক চোখ ফেরাতে ভুলে যাই। অলকা হাসে। হাসিতে রেশমী আঁচল ঝরে যায়। বলে, 'একটু মিথ্যে কথা বলেছি। ভেবেছিলাম, জবাব পেলে তাঁদের জানাব। আপনিই বলুন, না জানিয়ে ভালো করিনি?'

ইতিমধ্যে কফি এসে যায়। বেইমান আমার হাসিও। লজ্জাতেও সে মুখে ফোটে। বলি, 'না, মানে—।'

'কফি খান।'

'হ্যাঁ।'

ধরা পড়া চোর যেন তাতেই মুক্তি পায়। তবে এত সহজে না। অলকা আবার বলে, 'আপনার হাসি দেখলে, কথা শুনলে ঠিক কিছু বোঝা যায় না, তা-ই আবার জিজ্ঞেস করি, 'সত্যি চিঠিটা পেয়েছিলেন, নাকি চাপা দেবার জন্যে বললেন?'

মাথা নেড়ে তাড়াতাড়ি বলি, 'না, না, সত্যি পেয়েছি।'

'তবে জবাব দিলেন না কেন?'

কেন দিইনি। সচ্ বলো হে, পথ-চলার লোক। তোমার কি কেবল মুখের কথা। কাজের কথা নেই? কিন্তু কাকে সাক্ষী মানব, নিজেকে ছাড়া। সেখানে তো এক কথা, 'জবাব দেবার কথা ভাবতে ভাবতেই দিন চলে গেছে! কারণে না, অকারণেই জবাব দেওয়া হয়নি।'

অলকা কফির পাত্রে চুমুক দিয়ে যেন সরস হয়ে ওঠে। ওর শ্যাম চিকণ মুখে এখন যেন, রোদ চলকানো গাঙের টলটলানি। বলে, 'আমি বলব?'

ওর মুখের দিকে তাকাই। অলকা বলে, 'আমার বাবা-মাকে মনে রাখলেও আমাকে মনে রাখতে পারেননি, তাই জবাব দিতেও পারেননি, এই তো?'

'না না, আপনি—।'

'কিন্তু আমার মনে ছিল, চিঠিতেই তার প্রমাণ।'

'নিশ্চয়ই।'

ওহে, এ কি ডাকিনী দার্শনিকা গো। দেখি, তার চোখের তারা কৌতুকে আর বিদ্রূপে নিবিড়। তাড়াতাড়ি বলতে যাই, 'তাকে আমার মনে ছিল।' তার আগেই গুম্ফিত থেকে ছুরি আসে, বলে, 'অনেক চিঠি পান, তা-ই জবাব দিতে ক্লান্তি, না?'

'না না, তাও নয়।'

'তবে—তবে কি—?'

হঠাৎ অলকার গলার স্বর বদলে যায়। যেন স্বর গলা থেকে বুকে নেমে যায়। মুখের হাসি উধাও। শ্যাম চিকণ রাঙা ধুলো মাখা, চূর্ণ চূর্ণ চুল ছড়ানো মুখের ভাব বদলে যায়। নিচু স্বরে বলে, 'আমার চিঠিটা আপনার খুব খারাপ লেগেছিল?'

অলকার মুখের দিকে তাকাই। কথা বলতে কয়েক মুহূর্ত দেরি হয়ে যায়। অলকাই আবার বলে, 'হয়তো ফিলজফি পড়তে গিয়ে, আপনাদের মতো লোককে চিঠি লিখতে শিখিনি। বাবা-মায়ের মতো তাঁদের মেয়েটিও হয়তো—হয়তো মুগ্ধ হয়েছিল, তা-ই কী লিখতে কী লিখেছি, না জেনে কাব্য করেছি—'

'অলকা দেবী।'

'সেজন্যে ক্ষমা করবেন। আজ আপনাকে এমন আচমকা দেখেছি যে, সবটাই আমার আচমকা হয়ে গেল, সেজন্যেও ক্ষমা চাই।'

অলকা উঠে দাঁড়ায়, মুখ তার অন্য দিকে ফেরানো। উঠে দাঁড়াতে ভুলে যাই, কথা বলতে ভুলে যাই। ব্যক্তি ও পরিবেশ বিশেষে সামান্য যে কত অসামান্য হয়ে উঠতে পারে, জেনেও জানিনি। সত্যিই তো, কত চিঠিরই জবাব দেওয়া ঘটে না। নিজেও কত

জবাব পাই না। কিন্তু পথ চলার লেনাদেনায় এমন পরিস্থিতি হয়নি।

বুঝতে পারি, অলকা ব্যাগ থেকে রুমাল নিয়ে ঝাপসা চোখ পরিষ্কার করে। আরো কয়েক মুহূর্ত পরে, মুখ না ফিরিয়েই বলে, 'এমন কিছু কথা নয়। এটুকু বলার জন্যে আপনাকে কষ্ট দিলাম। হয়তো পরে লজ্জা করবে, তবু—।'

কথা শেষ না করে সে ফেরে। মুখে টেনে আনা হাসির ছটা, কিন্তু চোখ ভেজা-ভেজা রাঙা। বলে, 'আর দেরি করাব না, চলি। পয়সাটা—।'

'আমি দেবো, কিন্তু অলকা দেবী—।'

'না, না, তখন অমনি করে বলেছিলাম বলে সত্যি অলকা চক্রবর্তী নই। আমি ঝিনি-ই।'

'শুনুন ঝিনি—।'

ঝিনি হেসে ওঠে সত্যি। বলে, 'সত্যি কী অদ্ভুত যে কথা না আপনার। কিন্তু এখন কিছুই শুনব না। ও-বেলা আসব।'

বলে সে চলে যায় সরাইখানার বাইরে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতেও ভুলে যাই, ও-বেলা সে কোথায় আসবে। হয়তো ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না, কিন্তু আমার কিছু বলার ছিল।

ঝিনি মোড় বেঁকে যাবার আগে আর একবার ফিরে চায়। হাসে, দেখে মনে হয় নীল আকাশে রোদের মতোই। তারপর হারিয়ে যায়।

ঝিনির মুখের নীল আকাশে রোদের ঝলক দেখলেও আমার ভিতরটা ঝলকায় না। সেখানে তখনো বিনা মেঘে ঝড়ে বাড়ি-খাওয়া ঠেক চমক। মুখ থুবড়ে পড়া হকচকানি। দিকে দিকে আঁধার, নজর চলে না, শ্রবণও অবশ। কী ঘটে গেল কিছু বুঝতে পারি না যেন। কেবল চোখের সামনে একটি মেয়ে, এখনো যেন পুরো চেনা না। যেন দূরকালের চেনা-চেনা। তার স্বভাব থেকে উপচে-পড়া কিছু আচরণ। আর কিছু কথা। যে কথার সম্যক উপলব্ধি এই মুহূর্তে নেই।

সরাইখানার লোক এসে খালি কফির পাত্র তুলে নিয়ে যায়। সেটুকু বাহ্যজ্ঞান ছিল। পয়সা মিটিয়ে বাইরে এসে মেলার মধ্য দিয়ে বন্ধুর বাড়ির দিকে এগোই। কিন্তু কিছু কিছু কথা নিঃশব্দে আমার শ্রবণে বাজতেই থাকে। 'হয়তো ফিলজফি পড়তে গিয়ে আপনার মতো লোককে...।' কেমন করে মানব হে। এমন কথা কি মেনে নেওয়া যায়। বিশ্ব-সংসারে চলতে গিয়ে রীতির কাছা অনেক এঁটেছি। তাতে আসল রূপের খোলতাই কিছু হয়নি। ভিতরখানি ভরা তো এক আটপৌরে প্রাণে। বিদুষীর কথা মানব কেমন করে।

আরো কথা বাজে, 'বাবা-মায়ের মতো তাঁদের মেয়েটিও হয়তো—হয়তো মুগ্ধ হয়েছিল, তাই কী লিখতে কী লিখেছি, না জেনে কাব্য করেছি।' না, না, বড় ব্যাজ, বড় অস্বস্তি, ভারি বাধা লাগে। বিদুষী বহুত দূর, কারুকেই এমন অসম্মানের অহংকার নেই। তার চেয়েও বেশী ঝিনির গলার স্বর ডুবে যাওয়া বুকের ভিতরে। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা।

না না, নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বাঁচি না। ধিক্কার পথ-চলাকে। ধিক্কার মনকে। ঝিনির কাছে, এমন অপরাধ কখন, কবে থেকে করে বসে আছি। তারপরে, '...সত্যি অলকা চক্রবর্তী নই। আমি ঝিনি-ই।' নিশ্চয়ই। সে অলকা চক্রবর্তীর মতো দাঁড়ায়নি এসে। যায়নি। ঝিনির মতো সব কিছু। সে ঝিনি, সন্দেহ নেই। তবু সব মিলিয়ে আমার মনের কোথায় ঠেক খেয়ে যায়। এক অবাক অবুঝ সুর বেজে যায়। তার সঙ্গে নিজের অন্যায়বোধের কাঁটাটা খচখচিয়ে ওঠে। ছাতিমতলার মেলায় এ কি লাগে বিষম গোল!

কিন্তু দৃষ্টিতে, স্বরে, কথায় এত যে নালিশ, সব কি সত্যি? মেলার লোক দেখি

না, মেলা দিয়ে হেঁটে যাই। এক বিদুষীর মুখ ভাসে, তার ওপর দিয়ে খেলে যায় অনেক হিজিবিজি অক্ষর। অক্ষরগুলো পড়তে চেষ্টা করি, তাই স্মৃতি দিয়ে নজর করি। তবু স্মৃতির নজরে সব দেখতে পাই এমন না। স্মৃতির চোখে তত ধার নেই। কালির লেখা মাঝে মাঝে ঢেউ দিয়ে ওঠে।

'...দেখছি, দৈব বলে একটা জিনিস সত্যি সত্যি আছে। নইলে আপনাকে তো নতুন করে বলার কিছু নেই, দক্ষিণের নদীনালায় ছড়ানো সেই অঞ্চলটা প্রাচীনকালে আর্যরা বরাবরই পরিহার করেছেন। মুঘল সরকারের কাছে সুন্দরবনের এলাকা ছিল "দোজাখ্"। মানে—নরক। কাউকে নির্বাসন দিতে হলে সেখানে পাঠানো হতো। এখন অবশ্যি সোনা ফলছে। তবু আমাদের যমের দ্বারও তো দক্ষিণেই শুনতে পাই। আর সে-ই পথে দক্ষিণে লঞ্চে করে গোসাবায় যেতে যেতে যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ভাবতেই পারিনি। সেইজন্যেই অবাক লেগেছে বেশী।...আপনার সঙ্গে দেখা হবার কথা কোনো পত্রিকার অফিসে। কোনো প্রকাশকের ঘরে। আর আপনিও সেইরকম। একটা কাপড়ের ঝোলা কোলের কাছে নিয়ে কথা বলতে বলতে চলেছেন এক ফকির দরবেশের সঙ্গে। তার সঙ্গে হাসছেন, কথা বলছেন, গান শুনছেন। আমি তো প্রথমটায় ভেবেছিলাম আপনিও বোধ হয় আমাদের মতো আত্মীয়-বাড়ির যাত্রী, নয় তো—বিদেশ থেকে গৃহগামী।...আশা করি ভুল বোঝবার কোনো কারণ নেই, সত্যি কিন্তু ভেবেছিলাম আপনি সেই অঞ্চলেরই অধিবাসী। হয়তো কলকাতায় চাকরি করেন, দেশের বাড়িতে একটু দেখা করতে যাচ্ছেন। কিংবা, সেই অঞ্চলের কোনো ইস্কুল-মাস্টার হবেন। নিদেন কোনো মনোহারী দোকানের মালিক। ধান-চালের কারবারীদের সঙ্গে ঠিক মেলানো যায় না, তা নইলে বোধ হয় তাও ভাবতাম।...

'তারপরে যখন জানাজানি হলো, আ ছি ছি, আমি তো মনে মনেই জিব কেটেছিলাম। কী যে লজ্জা করছিল না! তার ওপরে বাবার ওইরকম কথাবার্তা।...আচ্ছা, বাবাকে আপনার কেমন লেগেছে? ও-রকম মানুষ হয়? আপনি তো সংসারে কত লোক দেখেছেন, আমার বাবার মতো একটা লোক দেখেছেন?...

'আচ্ছা, সেসব কথা থাক এখন, যতই অবাক হই আর লজ্জা পাই, মনে মনে এত খুশি হয়েছিলাম। আমি মনে মনে কল্পনা করতাম, গোঁফ-দাড়ি না থাক, আপনি একটা মস্ত দশাসই বয়স্ক লোক! তার পরিবর্তে দেখলাম একেবারে অন্য মানুষ! যাই বলুন, অতটা তা বলে ভাবিনি। আপনার লেখার সঙ্গে চেহারার একটুও মিল নেই। পরে মায়ের সঙ্গে এই নিয়ে আমার কথা হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা মা-মেয়ে একমত। মা-ও তো আপনার বই পড়েছেন। মায়ের ভাষায় আপনি হলেন, "ও তো একরত্তি ছেলে!"...

'...আর ওভাবে আপনাকে দেখতে পেয়ে ভালোই হয়েছিল। আপনি যেন একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন।'...

কী বিড়ম্বনা হে, এমনি অনেক কথাই ঝিনি লিখেছিল। এই যে চোখের কুলায় ভাসে নাগরিকাটির মুখ। অথচ যেন নাগরিকা না, বড় আটপৌরে কথায় ভাবে, হাসে সটান সটান, সোজা সোজা, চাপা-স্মৃতির চোখে আরো দেখি অনেক অক্ষর চাপা নেই। যা মনে আসে তা-ই ভাষে। তরঙ্গিয়া ওঠে এই মুখের ওপর।

'ভাগ্যিস, একটু নমস্কার, দুটো কথা, একটি নামসই, এইটুকুর মধ্য দিয়েই পরিচয়ের শুরু আর আলাপের শেষ হয়নি। তাহলে কী বিশ্রী হতো বলুন তো? সেখানে আপনি তখন অন্য মানুষ। আপনি বুঝি প্রায়ই এরকম বেরিয়ে পড়েন? আপনার কী মজা! আমিও যদি পারতাম! আমার খুব ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে এমনি বেরিয়ে পড়ি। আপনাকে দেখে যেমন মনে হচ্ছিল, সেই নদী, ভেড়ী, বাঁধ, দিগ্‌বিসারি

ধান ক্ষেত, মিঠে রোদ-ঝরা আকাশ, সবকিছুর মধ্যে আপনি যেন ডুবে গিয়েছেন, অন্য এক রাজ্যে চলে গিয়েছেন, কোথাও আপনার কোনো বাধা নেই, আমারও খুব ইচ্ছে করে সব কিছু থেকে এমনি করে ছুটে যাই। কিন্তু সংসারটা আমাদের সে অধিকার দেয়নি...বাবা তো খালি সেই কথাটাই বলেন, "অচেনা অজানা জায়গায় ওরকম একটা মুসলমান ফকিরের সঙ্গে ছেলেটা রয়ে গেল কী করে? প্রাণে একটু ভয় ডর নেই?" সত্যি, আমিও ভাবি, আপনার কী একটু ভয় হলো না? বিশেষ করে বাদা অঞ্চলকে লোকে এমনিতেই ভয় পায়। খুন-ডাকাতি তো ওসব জায়গায় লেগেই আছে।...এসব কি কেবল লেখার রসদ সংগ্রহের জন্যে? নাকি মন মানে না তা-ই? আমার কিন্তু মনে হয়েছিল, আপনি মনের তাগিদেই গিয়েছিলেন।

'...রাগ করছেন না তো, এত কথা লিখছি বলে। আপনার সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে আপনি রাগ করবেন না। তা-ই এত কথা লিখছি। ওভাবে আপনাকে দেখে আলাপ হয়ে মনে হলো, আপনাকে আসল রূপে দেখা গেল। সব থেকে ভালো লেগেছে আরো আপনার সঙ্গীটির জন্যে। ভারী আশ্চর্য, অমন তো কতই আমরা পথে-ঘাটে দেখি, তা বলে কি সঙ্গী করে নিই নাকি! ওটাই বোধ হয় আপনাদের বিশেষত্ব। আপনার গাজীকে আমার খুব ভালো লেগেছে। গান আরো ভালো লেগেছে, ওইরকম গান আমি আর কখনো শুনিনি। আপনার জন্যেই সেটা সম্ভব হয়েছিল।...

'...বাবার তো সবটাতেই বাড়াবাড়ি। আসলে কী জানেন, গাজীর গান বাবারও খুব ভালো লেগেছিল। গাজী লোকটাকেও বাবার খুব ভালো লেগেছিল। ভালো না লাগলে বাবা কারুর সঙ্গে ওরকম করে অত কথা বলেন না। তবে, আমার বাবার সহজে কিছু ভালো লাগে না। তা-ই ভাবি, আপনি কী জাদু জানেন, জানি না, আমার বাবা তো একেবারে মুগ্ধ। নইলে, আমার দাদার কথা ভুলেও যখন তিনি উচ্চারণ করেন না, আপনাকে অবলীলায় সব বলে ফেললেন। বাইরের কোনো লোকের কাছে বাবাকে অতটা আর্ত আর করুণ হয়ে উঠতে কখনো দেখিনি। আর আমরা মা-মেয়েই বা কম কী। আপনার সামনে চোখের জলটুকু চাপতে পারলাম না। আপনি দেখছি, লোক সুবিধের নন।'...

তাইতে বড় অবাক মানি এখন। ঝিনির সঙ্গে আমার দু'বার দেখা। সেই দক্ষিণের গাঙের বুকে, আর এই রাঢ়ের ছাতিমতলার মেলায়। দু'বারেই চোখের জল দেখতে হলো। কেন হে, বিদুষীর বুক আকাশে কেবল কি মেঘ ছড়ানো নাকি। খালি যে ঝরে। তবু মনের বচন, লিখনে দেখি, নাগরিকার বয়ানে ভাষে।

'...সত্যি, আপনাকে এখন হিংসেই হচ্ছে। বাবা-মা দু'জনেই, দেখছি, আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাবার কোনো বন্ধুবান্ধব এলেই, আপনার প্রসঙ্গ একবার উঠবেই। বলেন, 'ভারী ভালো ছেলে।' শুনে হাসবেন না যেন, বাবা বলেন, 'একেই বলে কবি আর শিল্পী।' আমি যদি বলি, 'বাবা, উনি কবি নন, গদ্য-লেখক।' তা হলেই বাবা বলবেন, 'ওই হলো, কবি আর লেখক একই কথা। দেখেই বোঝা যায়, রসিক ছেলে, সব বোঝে-টোঝে। তোদের এই ছোকরাদের মতো মাথায় এক রাশ উড়ু উড়ু চুল, ঘরের মধ্যে ম্যানম্যান প্যানপ্যান করছে, তা নয়।' বাবাকে কিছু বোঝানো যায় না। বাবার কথাবার্তা এইরকম। এর থেকেই বুঝে নিতে হবে। তবে, সেই এক কথা, অচেনা-অজানা বাদার ঘাটে গঞ্জে ওভাবে রাত কাটিয়ে দেওয়াটা কিছুতেই ওঁর ভালো লাগছে না। আমার মায়েরও সেই কথা। জানি না, আপনার মা-বাবা দু'জনেই আছেন কি না, আছেন বলেই মনে করি। তাঁরা হয়তো আপনাকে চেনেন, বোঝেন, তা-ই ভয় পান না। আমার মা-বাবার খুব ভয়। আপনি বলে নয়, অন্য কোনো ছেলেকে ভালো লেগে গেলে ওঁরা তাকেও এভাবেই বলতেন। আমার মা তো বলেছেন, আপনি নাকি খুব মিশুকে মিষ্টি

ছেলে, একটুও গুমোর অহঙ্কার নেই। বুঝতেই পারছেন, আপনি আর এখন এঁদের কাছে বাইরের পোশাকী পরিচয়ে নেই।...

'...হ্যাঁ, আমিও তাই বলতে চাই। ব্যক্তিগত অধিকার যদি না-ও থাকে, না-হয় একজন বাঙালী সাধারণ মেয়ে হিসাবেই বলছি, রাত-বিরেতে অমন দূরে অজানা জায়গায় না-হয় না-ই কাটালেন। বিপদ-আপদের কথা কিছুই তো বলা যায় না।...

'...রোজই জিজ্ঞেস করছেন, আপনাকে কোনো চিঠিপত্র দিয়েছি কিনা। বাবা-মা দু'জনেই। সাধ করে কি আর এত দিনে লিখতে বসেছি! দেখছেন তো, কত বড় চিঠি হয়ে গেল। হয়তো আপনার পড়বার ধৈর্যও থাকবে না। তবু, একটু কষ্ট করে পড়বেন। আপনার প্রতি অবিশ্বাস আমার একটুও নেই, তবু বাবা-মাকে বললাম না যে, আপনাকে চিঠি লিখছি। ধরুন, কোনো কারণে আপনি হয়তো জবাব দিলেন না, বা আপনি হয়তো বাইরে কোথাও চলে গিয়েছেন। তাহলে আমি এঁদের কাছে বড় বেকায়দায় পড়ে যাবো। আর কিছুই না, এঁদের বয়স হয়ে গিয়েছে, আর আপনাকে খুব ভালো লেগেছে। জবাব না পেলে মনে মনে কষ্ট পাবেন। তাই ভাবছি, আপনার জবাব এলে, সেটাই তাঁদের হাতে তুলে দেবো।

'...না, আমন্ত্রণটা কেবল মায়ের নয়, বাবার এবং আমারও। একদিন আসুন না আমাদের বাড়িতে। কলকাতা থেকে খুব বেশী দূরে তো থাকেন না। যাতায়াতও আপনার নিয়মিত। এলে সবাই খুব খুশি হবেন। আমাদের বাড়ির ছাদ থেকে আদি গঙ্গা দেখা যায়। সব মিলিয়ে আমাদের এখানকার ছবিটা আপনার খুব শহুরে লাগবে না। আপনি যেখানে থাকেন, বোধ হয় সেখানকার সঙ্গে কিছু মিল খুঁজে পাবেন।...

'...না, আর বিরক্ত করব না। জবাবের প্রত্যাশায় রইলাম। ইতিতে পোশাকী নামটা লিখতে চাইনে, এখন সেটা অর্থহীন লাগছে। নমস্কার নেবেন। ইতি—ঝিনি'

কখন যেন মোড় নিয়ে আশ্রমের সীমানায় ঢুকেছি। মেলা পেরিয়ে এসেছি নিরালায়। কিন্তু চলতে গিয়ে যেন ঠেক খেয়ে যাই। স্মৃতির চোখে এত লেখা স্পষ্ট দেখতে পাই, তবু তার জবাব কেন দিইনি। একে কেবল অবিচার বলো না। বলো, অন্যায়। বলো, অসহবত। বলো, অশালীনতা।

তবু, এই কি তোমার জবাব হে?

নিজেকে পুছ করে বাঁ দিকে মোড় নিতে যাই বন্ধুর বাড়ির পথে। আমার মন টানে ডাইনে। দৃষ্টি চলে যায় আমলকির সারি পেরিয়ে ছাতিমের ঝাড়ে। আর দেখ, সহসা যেন আমার মনের এত জিজ্ঞাসাবাদের অন্ধকারে একটি আলোর ঝিলিক হেনে যায়। জবাব আমার ভিতরে ভাষে, এক উদাসী হাসিতে। অবিচার অন্যায় অসহবত অশালীন কিছু না। জানি, ব্রহ্মনারায়ণ চক্রবর্তী একজন স্নেহে উপচানো বাবা। চোখের ওপারে অগাধ কান্না থমকে থাকা, দিশেহারা চোখে চেয়ে থাকা এক মা তাঁরই গৃহিণী। বড় ভাগ্য হে, তাঁদের ভালোবাসা পেয়েছিলাম। আর কিছু প্রীতি, এক যুবতী বিদুষীর।

জীবনে জোয়ার কত আসে, ভাঁটায় কত নামে। পলির স্তরে থেকে যায় অনেক কিছু। হারায় না। সেখানে প্রকৃতি তার আপন হাতে কাজ করে যায়। এই যাওয়া-আসার কূলে পলি ছানব না। হাত দিয়ে ঘাঁটব না। যা কিছু সব আমার দুই কূলের মৃত্তিকায় থাক। সেই তো জীবনের নিয়ম। নিরন্তরে চলি হে, যাওয়া-আসার অশেষে। যা পেয়েছি, তাই নিয়েছি। যা গিয়েছে, তা যাবে। চলাচলের এই নিয়মে কেউ যেন ঠেক না খেয়ে থাকে।

একদিন ব্রহ্মনারায়ণ আর তদীয় গৃহিণীর মন চলাচলের পলিতে তুমিও ঢাকা পড়ে যাবে। ঝিনিরও তাই। আজকের রাগ অভিমান কান্নাটা কিছু না। চলাচলের

খেয়ার মোড়ে বাঁকাবাঁকি নেই। এখন যে জোয়ারের ভরাভরি, তা-ই উপচায়। যদি নিষ্ঠুরতা মনে হয় তবে বলো, তবু এই-ই তো সত্যি।

জীবনের পুছ-জবাব অন্যখানে অন্য সুরে ব্রহ্মাণ্ডের তালে বাজছে। সেথায় লেখা-লেখির কারণ অকারণ। অতএব আপনা বাঁয়ে চলো।

বাগানের দরজায় হাত দিয়েছি কি না দিয়েছি, বন্ধুর উদ্বিগ্ন স্বর বেজে ওঠে, 'এখুনি যাচ্ছিলাম মেলায় হারানো মানুষের খোঁজ করা অফিসে। সেখানে কিছু না হলে সোজা থানায়। ব্যাপার কী?'

লজ্জিত হয়ে পড়ি। বিব্রত হয়ে বলি, 'একটু দেরি হয়ে গেল।'

'একটু? সর্বনাশ! আপনার একটু আর বেশী কাকে বলে জানি না। বেলা চারটে বেজে গেল!'

তাড়াতাড়ি অচিনবাবুর নাম করি। বন্ধু তৎক্ষণাৎ উদ্বেগে হেসে বলেন, 'আরো সর্বনাশ। অচিনদার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে যে এর মধ্যে আসতে পেরেছেন, তা-ই যথেষ্ট। তাহলে "একটু দেরি"ই বলতে হবে।'

কিন্তু বন্ধুর বাড়ি নিঝুম। গৃহিণী অতিথি কাউকেই দেখি না। জিজ্ঞেস করতে বলেন, 'বেবাক মেলায় চলে গেছেন। গৃহিণী আপনার দায়িত্ব আমাকে দিয়ে গেছেন। তাঁরাও বোধ হয় আপনাকে খুঁজছেন।'

আরো লজ্জিত হয়ে পড়ি। বন্ধু সেদিকে তাকিয়েই দেখেন না। বলেন, 'আসুন, খাওয়াটা সেরে নিন। দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই চোকেনি।'

'তা চোকেনি, তবে একটু স্নানটা সেরে আসি।'

'মাথা খারাপ নাকি আপনার! এই শীতের অবেলায় এখন চান? আর এই দেশে? একটু হাতে মুখে জল দিয়ে আসুন, তার বেশী নয়।'

মিছে নির্দেশ পরামর্শ না। শীতের স্থানে যেটুকু সুখ, তার সময় চলে গিয়েছে সূর্যের ঢল খাওয়া আকাশের ঢালুতে। অতএব হাতে মুখে জল দেওয়াই সাব্যস্ত।

বন্ধু বললেন, 'কপাল আপনার খারাপ। একে খিচুড়ি, তরকারি আর মাত্র লবাত। তাও এখন ঠান্ডা।'

তা হোক, ক্ষতি নেই। কিন্তু লবাত আবার কী। জিজ্ঞেস করি, 'লবাতটা কী?'

'মিঠাই। খেজুরি গুড়ের পাটালি, তার নাম লবাত।'

চোখেও দেখা হলো। নলেন কিনা জানি না, তবে পাটালি। রঙটা একটু যা কালো মানুষের গায়ের মতো। কিন্তু তার আগে অবাক মানি মহাপ্রাণীটির কাতরতায়। ই কী দ্যাখ হে, ঠান্ডা খিচুড়ি তরকারি পেয়েও মহাপ্রাণীটির রসনায় কী সুখ! কোথায় ছিল জঠরের এত বুভুক্ষা, জানতে পারিনি। বন্ধুর দুঃখ প্রকাশ মিছে। এর নামই মহাপ্রাণী, তাকে তৃপ্ত করি পরম পরিতোষে।

বন্ধুকে দেখে মনে হয়, বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত। তাঁকে বলি, 'আপনি গিয়ে দলে যোগ দিন।'

'আর আপনি? এখন বেরোবেন না?'

'একটু বিশ্রাম করতে চাই।'

'উচিত। অচিনদার কাছ থেকে এসে এবার সেটা খুবই উচিত। তাহলে বিশ্রামের পর এখানেই চা খেয়ে আপনি বেরোবেন। আমরা তাহলে কোথায় থাকব আপনার জন্যে?'

'যেখানেই হোক, মেলাতেই। খুঁজে বের করে নেবো।'

বন্ধু মনে মনে পা বাড়িয়ে ছিলেন। ভৃত্যকে আমার ভার দিয়ে মেলায় দৌড় দিলেন। আর তাকে আটকে রাখার জন্যে মনে মনে নিজেকেই হানি।

খাওয়া শেষ হতে না হতেই, মনে হয়, রাঢ়ের আকাশে আঁধার নেমে আসে। বিশ্রাম করতে গিয়ে একটু তন্দ্রার ঘোর লাগে। সেটুকু ভেঙে যাবার পর দেখি, ঘরে আলো, বাইরে অন্ধকার। ঘরের কোণে ঝিঁঝি ডাকে, দূরে মেলার মানুষ। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরোই। বাউল আসর আমার গন্তব্য।

সেখানে যখন পৌঁছুই, দেখতে পাই, স্বয়ং গোপীদাস আসরে। একতারা হাতে, আর কিছু নেই। ভাঙা-ভাঙা গলায় গাইছে,

'যেজন প্রেমের ভাব জানে না,
তার সঙ্গে কিসের লেনাদেনা।'...

হঠাৎ মনে হয়, গানটা যেন জানা-জানা। শোনা-শোনা। কোথায় শুনেছি। ভাবতে ভাবতেই চোখের সামনে গাজীর মুখ ভেসে ওঠে। আর দেখি, গোপীদাস আমাকে দেখে ঘাড় দুলিয়ে ডাকে। চোখের ইশারা করে এক দিকে। ইশারার লক্ষ্যে লক্ষ্য করে দেখি, কী অবাক হে, অচিনবাবু বসে আছেন আসরের সামনে। তাঁর পাশে শ্রীমতী অলকা—না, ঝিনি চক্রবর্তী।

একা ঝিনি না, তাদের গোটা দলটাই অচিনবাবুকে ঘিরে বসে আছে। কী ভাবে, কোন্ পন্থায় আলাপ পরিচয়, সে চিন্তা বৃথা। মেলার মানুষ, মেলায় আলাপ, সেটা এক কথা। এখানে সবাই সবার চেনা। আলাপ করে নিলেই হলো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আসল কথা আলাদা। এখানে অচিনবাবুর খেলা। ও-বেলা বিদায় নেবার আগে ঝিনি আর ঝিনির দলকে এক লহমায় দেখে রেখেছিলেন। আসরে তাদের দেখতে পেয়ে কাছে ডেকে নিতে তাঁর দেরি হয়নি।

দেখছি, তাঁর এক পাশেতে ঝিনি, আর এক পাশেতে রাধা। পিছন ঘেঁষে মাস্টার-মশাই নীরেনদা। সুপর্ণাদি লিলি শুভেন্দু কাছাকাছি, সামনাসামনি, ঘিরে বসে আছে। গোপীদাসের চোখের ঘূর্ণিতে অনেকেরই নজর আমার দিকে। নীরেনদাই হাত তোলেন আগে। তারপরেই রাধা। ঝিনির সঙ্গে চোখাচোখির অবকাশেই দেখি অচিনবাবুর মুখ এগিয় যায় তার কানের কাছে। কী যেন বলেন। তৎক্ষণাৎ ঝিনির মুখ লাজে লাজানো। দৃষ্টি নামিয়ে মুখ ফেরায়। গোপীদাস তখন একতারাটা তুলেই আমাকে ডাকে। আর তার রাধা বৃদ্ধা প্রকৃতিটি ভাঙা ভাঙা চড়া সুরে গাইছে,

'দ্যাখ, উল্লুকের হয় উরধো লয়ান
সে দ্যাখে না সূয্যের কিরাণ।'

গোপীদাস তখনই তার বুড়ো শরীর চকিতে পাক দিয়ে কাশি-ভরা মোটা গলায় যোগান দেয়,

'আর পিঁপড়েতে পায় চিনির মম্ম,
রসিক হয়িলে যাবে জানা
যেজন প্রেমের ভাব জানে না
তার সঙ্গে কিসের লেনাদেনা।'

ওদিকে, আসরে, গোকুলের পাশে বিন্দু, তাদের পাশে সুজন। কেউ চুপ করে বসে নেই। গোপীদাসের গানের সঙ্গে গোকুল তার ডুগিতে আর ঘুঙুরে তাল দিয়ে চলেছে। বিন্দু বাজায় প্রেমজুরি। সুজনের দোতারার তারে তরঙ্গ খেলে যায়।

আমি ততক্ষণে আসরের দাওয়ায় উঠে জায়গা নেবার ফিকির করি। অচিনবাবু এতক্ষণে হাত তুলে ডাকেন, 'ইদিকে এসো হে। পথ চেয়ে আর কাল গুনে এতক্ষণে দেখা পাওয়া গেল।'

ইতিমধ্যে গানটা শেষ হয়। গোপীদাস আসরের মাঝখান থেকেই বলে, 'একটু ঠাঁই করে দাও, বাবাজী বইসবে কুথা?'

অচিনবাবু ধমকের সুরে বলেন, 'বড় যে দরদ দেখি বাবাজীর ওপর।'

গোপীদাস তেমনি বড় বড় লাল চোখ দুটি ঘুরিয়ে বলে, 'তুমার থেকে বেশী লয়।' বলে আমার দিকে ফিরে চোখের পাতা নাচায়। অচিনবাবু আর সে কথার জবাব না দিয়ে সরে বসে জায়গা করবার চেষ্টা করেন। বলেন, 'দেখি ভাই অলকা, সবাই একটু সরে সরে বসি।'

অই হে, এর মধ্যে 'ভাই অলকা' হয়ে গিয়েছে। তা নইলে আর অচিনবাবু কেন। কিন্তু আমার সংকোচ লাগে। বলি, 'আপনারা বসুন, আমি এদিকেই বসছি।'

'আজ্ঞে না। মজিয়ে মজিয়ে এখন ফারাকে ফারাকে থাকবে, তা হবে না। গুটি গুটি চলে এসো দিকিনি এখানে।'

এই হলো অচিনবাবুর কথা। আরো দশজনা আছেন। এ মানুষকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। বচন কোথা থেকে কোথায় যাবে, বলা যায় না। ওদিকে নীরেনদা, সুপর্ণাদি, রাধা লিলি ঝিনিতেও হাসাহাসি লেগেছে। শুভেন্দুর মুখেও হাসি। তার চেয়েও যেন কৌতুক চোখে যেন অবাক ভাবটাই বেশী। কয়েকজনকে পেরিয়ে কোনোরকমে অচিনবাবুর পাশে গিয়ে বসি। আমার এক পাশে রাধা, এক পাশে অচিনবাবু। অচিনবাবুর অন্য পাশে ঝিনি।

বসতে না বসতেই অচিনবাবু বলেন, 'খুব দেরি করে আসোনি, কী বলো অলকা?'

ঝিনি বলে, 'আমি তো ভেবেছিলাম, এত দেরিতে ফিরেছেন, বোধ হয় আজ আর আসতেই পারবেন না।'

'তবু সবাই মিলে গুটি গুটি বাউল আসরে এসে পড়েছ।'

অচিনবাবুও চোখ ঘোরান। রাধা বলল, 'বাউল গান শুনতে।'

'সেই তো। কী যেন বলে না, সেই "কথা পড়ল সবার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে।" ভাই রাধে, বাউল সভায় তো লোকে বাউল গান শুনতেই আসে, এর আর বলাবলির কী আছে?'

বলে ঝিনির দিকে ফিরে সাক্ষী মানেন, 'না কী বলো অলকা।'

ঝিনি তাড়াতাড়ি বলে, 'বটেই তো।'

কিন্তু বলতে যেন গলায় কাঁপুনি লাগে ঝিনির। হঠাৎ লজ্জা পেয়ে মুখে একটা রঙের ছোপ লেগে যায়। ঠোঁটের কোণে টিপুনি লাগে, বাঁক খায়। মুখ ফিরিয়ে নেয় একেবারে অন্য দিকে। দেখে চেনা যায় না, এ মেয়ে বিদ্যাবতী নাগরিকা। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয় রাধার। সে হেসে আবার ঝিনির দিকেই চায়।

পিছন থেকে নীরেনদা বলে ওঠেন, 'খালি গান শুনতে আসিনি। আপনাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের জন্যেও এসেছি।'

অচিনবাবু তাঁর দিকে ফিরে বলেন, 'তা-ই নাকি? সেও খুব ভালো কথা।'

ওঁর বলার ভঙ্গিতেই কেমন যেন হাসির ঘরে চাবির দম দেওয়া। সবাই হেসে ওঠে। ইতিমধ্যে আবার একতারা বাঁয়া প্রেমজুরি আর দোতারায় বাজনা বেজে ওঠে। গান শুরু হবার আগেই অচিনবাবু হঠাৎ আমার দিকে ফেরেন। মুখখানি গম্ভীর করে ভুরু কুঁচকে প্রায় ধিক্কার দিয়ে বলে ওঠেন, 'কিন্তু ছি ছি ছি, তুমি যে এরকম, তা জানতাম না।'

বলেই এমনভাবে মুখ ঘুরিয়ে নেন, আমার বুক ধড়াসে যায়। উদ্বেগে বলে উঠি, 'কেন বলুন তো? কী হয়েছে?'

'ছি ছি ছি, সে কি বলবার কথা? নাঃ, তুমি লোক সুবিধের নও।'

হঠাৎ কী অন্যায় ঘটেছে, বুঝতে পারি না। অবাক উদ্বেগে অচিনবাবুর মুখের দিকে চাই। তিনি তখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। জিজ্ঞেস করতে যাবো, তার আগেই

গোপীদাস ভাঙা ভাঙা গলায় গেয়ে ওঠে,

'হেঁ হেঁ হেঁ, যে ভাব গোপীর ভাবনা।'...

কথায় বলে, নিজের বুকে আঙুল দেখিয়ে, 'মানে, গোপী। এই গোপী—গোপীদাসের ভাবনা।'

বলে হাসতে হাসতে, কাশতে কাশতে একটু সামলে নিয়ে আবার ধরে,

'যে ভাব গোপীর ভাবনা,
সামান্যের কাজ নয়, সে ভাব জানা।'

রাধা বৃদ্ধা ধরে,

'বৈরাগ্যভাব বেদের বিধি
গোপিকাভাব প্রেমের নিধি।'

দু'জনে একসঙ্গে গায়,

'ডুইবে থাকে নিরবধি
তাতে রসিক জনা।
যে ভাব গোপীর ভাবনা।'

জয় গুরু জয় গুরু আওয়াজ বাজে। বিন্দুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়। সে হাসে। কিন্তু আমার মনটা থমকে থাকে। যদি বা দেখি, অচিনবাবুর মুখ তেমন রাগে ভারী নয়, বরং মিটিমিটি হাসি, গানের সুরে ঘাড় দোলে, তথাপি তাঁর ধিক্কার ভুলতে পারি না। ধিক্কারের কারণ বুঝি না। অপরাধের বৃত্তান্ত জানা নেই। সবাই যেন গানে মজে আছে। আমার মনটাই আঁকুপাঁকু করে।

এক সময়ে গোপীদাসের গান শেষ হয়। সে বসে পড়ে। লক্ষ্য করে দেখি তাদের সামনে বড় এক মালসায় আগুন রয়েছে। গোকুল সেই আগুন থেকে আগুন তুলে কলকে সাজতে উদ্যোগী।

অচিনবাবু বলে ওঠেন, 'নাও, এবার প্রেমের গাঁজায় বিশ্রাম। তবে আমরাও উঠি।'

গোপীদাস বলে, 'রাগ করো ক্যানে। দম না দিলে কি দমের মানুষ চইলতে পারে? তুমিও দম দাও।'

গান থামতে আসর একটু আলগা হয়ে যায়। ঝিনি বলে ওঠে, 'আমরাও একটু চা খেয়ে আসি।'

নীরেনদা বলেন, 'তা-ই চলো।'

আমি অচিনবাবুকে জিজ্ঞেস করি, 'আপনিও যাচ্ছেন?'

জবাব আসে ঝিনির কাছ থেকে, 'হ্যাঁ। আপনিও তো যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে।'

এক পলকের জন্যে ঝিনির ও-বেলার মুখ আমার মনে পড়ে যায়। আর মনে পড়ে যায় ওর কথা, 'ও-বেলা আসব।' ও তাহলে বাউল আসরে আসবার কথাই বলেছিল। এখন ওর চোখে ক্ষোভের ছাপ নেই। অভিযোগের ছায়া নেই। চোখ-ভাসানো জলের বদলে যে হাসিটি ফুটে আছে, তাতে একটা লজ্জা-মাখানো লুকোচুরি ভাব। বোধ হয় ও-বেলাতে ওর নিজের কথা ভেবেই ভাবান্তর।

এদিকে অচিনবাবু ঝিনির কথায় আওয়াজ দেন, 'সে কথা আবার বলতে হবে নাকি! আমাদের সঙ্গে ছাড়া ও যাবে কোথায়।'

লিলি বলে ওঠে, 'বলা যায় না। অন্যত্র যাবার কথা থাকতে পারে।'

'আছে নাকি হে?'

অচিনবাবু যেন ধমকে বাজেন। বলি, 'না, কোথাও যাবার নেই!'

এ সময়ে হঠাৎ সবাইকে যেন একটু সচকিত করে দিয়ে শুভেন্দু তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। সুপর্ণাদি ডেকে ওঠেন, 'শুভেন্দু!'

শুভেন্দু যেন শুনতে পায় না। দাওয়া থেকে নেমে পড়ে সে। সুপর্ণাদি যেন অবাক হয়ে তাকান ঝিনির দিকে। রাধা লিলি চোখাচোখি করে। ঝিনিই এবার ডাক দিয়ে ওঠে, 'শুভেন্দু!'

শুভেন্দু ফিরে দাঁড়ায়। তার মুখ গম্ভীর, কেমন একটা অনিচ্ছার বিরাগ ভাব। ফিরে বলে, 'বলো।'

ঝিনি জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'বাড়ি।'

'কেন?'

'ভালো লাগছে না।'

নীরেনদা তাড়াতাড়ি উদ্বেগে জিজ্ঞেস করেন, 'শরীর খারাপ করেছে নাকি?'

'হ্যাঁ, শরীরটা তেমন ভালো লাগছে না। আমি চলি।'

বিশেষ কারুর দিকেই না তাকিয়ে কোনোরকমে একবার ঝিনির সঙ্গে চোখাচোখি করেই সে ফিরে যায়। কয়েক মুহূর্ত সকলেই একটু ঠেক খায়। সকলেই একবার ঝিনির মুখের দিকে চায়। ঝিনিও যেন একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে। উচ্চারণ করে, 'আশ্চর্য!'

নীরেনদা বলেন, 'একটু মেজাজী ছেলে তো!'

ঝিনি বলে, 'কিন্তু সেটা এখানে কেন?'

অচিনবাবু এতক্ষণ হাতের চুরুটটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ বলেন, 'আমি অবিশ্যি কিছুই জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি, সংসারটাই এরকম। সে যে কেবল সুরে বাজে, তা নয়। বেসুরেও বাজে।'

তাঁর বলার ধরনে সকলের মুখেই কিঞ্চিৎ হাসি দেখা দেয়। ঝিনির মুখে একটু হাল্কা ছোপের আভাস লাগে। নীরেনদা বলে ওঠেন, 'ঠিক, খুব ঠিক কথা।'

অচিনবাবু আবার বলেন, 'বেঠিকের তো কিছু নেই নীরেনবাবু, এ আমরা সবাই জানি। আরো জানি, সুরে আর কতটুকু বাজে। বেসুরের মধ্যেই তো বেশী চলছি। তা আমি বলছিলাম, শুভেন্দুবাবুর এ ব্যাপারে যদি কিছু বিহিত করা যায়, সেটা করা যেতে পারে।'

আবার সবাই চুপ। বিহিতের সন্ধান যেন কারুর জানা নেই। আমি ঝিনির দিকে তাকাই। কেন জানি না, আমার মনে একটু সন্দেহ, বিহিতের খোঁজ ওর জানা আছে। ঝিনির ডাকে শুভেন্দুর ফিরে দাঁড়ানো, যাবার আগে একবার তাকিয়ে যাওয়া, কোথায় যেন একটা খেই ধরিয়ে দেয়। ঝিনিও হঠাৎ চোখ তোলে। চোখাচোখি হতে আবার ওর মুখে একটু ছোপ ধরে যায়। দূরের দিকে চেয়ে বলে, 'বিহিত করার কিছু আছে বলে মনে হয় না আমার। লিলি একবার যাবি নাকি?'

লিলি অবাক হয়ে বলে, 'কোথায়? শুভেন্দুদাকে ডাকতে? অসম্ভব, আমি পারব না ভাই।'

রাধা বলে, 'তোর তো সম্পর্কে দাদা।'

'তা হোক। তোদের তো বন্ধু।'

ঝিনি বলে ওঠে, 'এত কথার কী দরকার। আমরা যেমন যাচ্ছিলাম, তেমনি যাই না কেন।'

নীরেনদা বলেন, 'হ্যাঁ, সেই ভালো। চলো আমরা যাই। আমি বরং একবার ঘুরে আসি বাড়ি থেকে। তোমরা কাছেপিঠেই থেকো।'

নীরেনদা চলে যান। অচিনবাবু হাত বাড়িয়ে সবাইকে সামনে এগোবার ইঙ্গিত করে বলেন, 'অগত্যা। মাস্টার মশাই যা ভালো বুঝেছেন, ঠিকই বুঝেছেন।'

ঝিনি রাধা লিলি আর সুপর্ণাদিদের দলটা একটু এগিয়ে এগিয়ে চলে। বুঝতে পারি, তাদের মধ্যে শুভেন্দুর বিষয়ে আলোচনা চলছে। আমি অচিনবাবুর সঙ্গে একটু পিছনে পিছনে। বলতে ইচ্ছা করে, মন গুণে ধন না, পথ গুণে ধন। পথের কোথায় যে কোন্ মোড় কোন্ বাঁকে ফেরে, কোথায় তার কতখানি আঁকাবাঁকা বন্ধুর, কত ভাঙা-চোরা কোন্‌খানে, কে জানে! তার কোন্ কোন্ সীমানায় অন্ধকার জমাট, কোথায় আলো কতটুকু, না চললে তার হদিস মেলে না। তবু বলতে গেলে এই ভাবি, ঠেক না খেয়ে চলে যাবো। স্বচ্ছ জলে ডুব দেবো, ঘোলায় পড়ব না। ভাঙাচোরা এড়িয়ে যাবো, আঁকাবাঁকায় যাবো না। আলো দেখে নিশেন করব, অন্ধকারে যাবো না।

এইটি তোমার বাসনা। সংসারে সহজ পথ দেখলে কবে। তোমার মন, আর পথের মেজাজ আলাদা। পথ তো কেবল মৃত্তিকার বুকে দাগ-কাটা জায়গা না। এ পথের আর-এক নাম জীবন-চলাচলের সড়ক। তাই মেঘ এসে চুপি দেয় মনে। বিমর্ষ লাগে, ভার বোধ হয়। আর এই হাওয়া-বন্ধ গুমোটের মধ্যে চিকুরে যেন জিজ্ঞাসায় ঝিলিক হানে, 'কেন, কেন।'

তার চেয়ে নিজেকে নিয়ে মোড় ফিরি। এবার না-হয় সঙ্গ বদলাই। এত লোক, এত কথা, এত হাসি, এত বাতি। ওই সীমানায় যাই। এ পথে গুমোট। পথের গুমোট পথেই থাক। আমি ভাসি গিয়ে অন্য তরঙ্গে, অন্য মানুষদের ঠিকানায়।

ভাবতে ভাবতেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। অচিনবাবুও দাঁড়ান। অবাক না হয়ে সহজ গলাতেই বলেন, 'ভুল করো না হে। সংসারে সব রকমেই চলতে হয়, এটা তোমাকে বোঝাবার কিছু নেই। চলো, চলো।'

আবার বলতে হয়, এঁর নাম অচিনবাবু। অবাক হয়ে তাকাই ওঁর মুখের দিকে। এ মানুষ অন্তর্যামী নাকি। না কী, থামতে দেখেই মনের কথা টের পেয়েছেন! অথচ আমি যখন বিমর্ষ, মন ভার ভার লাগে, ওঁর মুখে তখনো মিটিমিটি হাসি। হিজিবিজি রেখা গোরা মুখখানিতে যেন রহস্যের নানা সুতোয় ঝিকিমিকি করে। আমাকে চেয়ে থাকতে দেখে বলেন, 'কী, ঠিক বলেছি? সরে পড়তে চাইছিলে তো?'

দ্বিধায় জড়িয়ে জবাব দিতে যাই, 'মানে—।'

'আহা, সে কথা বলতে হবে কেন হে। পালানোই তো আমাদের অভ্যাস। তার মধ্যে আবার তোমাকে দেখেই বুঝেছি, তুমি একটা সেরা পলাতক।'

তাড়াতাড়ি বোঝাতে যাই, 'না, না, মানে—।'

'আবার মানে দেখায়, এ ছোকরাকে নিয়ে তো পারা যাবে না দেখছি।'

অচিনবাবু ধমকে বাজেন, কিন্তু সুরেতে হাসি। বলেন, 'তোমার সাহিত্যিকের ভাষায় কী বলবে তা জানি না। তোমার মনের আসল কথা তো হলো, "ধেত্তীর তোর নিকুচি করেছে, এদের কাছ থেকে কেটে পড়ি।" তাই তো, না কী?'

এমন নির্যস সত্যি বললে অস্বীকার করি, জিভে এত পালিশ নেই। তা সেই সত্যিটাকে নিজের ভাষায় যেমন করেই বলি। অন্য তরঙ্গে ভেসে যাবার আসল কথা তো এটাই। তাতে আমি 'পলাতক' হয়ে যাই কিনা জানি না। মনে মনে পথ চলার গতি চেয়েছি। ঠেক খেতে চাই না। বলি, 'আসলে কী জানেন, ওঁদের নিজেদের ব্যাপারের মধ্যে থেকে হয়তো ওঁদেরই বিরক্ত করব।'

'সাব্বাস!'

বলেই অচিনবাবু আমার কাঁধে হাত রাখেন। বলেন, 'একেই বলে কথাকার। তা না হলে আর এমন যুক্তি যোগাতে পারো? কিন্তু দেখ, আমিও কথা বলতে পারি। মুখ যখন খুলিয়েই দিলে, তাহলে বলি, এদের ব্যাপারটা তো তোমাকে বাদ দিয়ে নয়।'

আমি কিছু বলতে যাবার আগেই হাত তুলে থামিয়ে দেন। আবার বলেন, 'দৃষ্টি

থাকলে, নিশ্চয়ই বুঝেছ শুভেন্দুর হঠাৎ এত শরীর খারাপ হলো কেন, বাড়ি যাবার তাড়া কেন। মেয়েদের খালি ভালো লাগলেই চলে, ভালোবাসলেই চলে? মন বোঝাবুঝির দায় নেই? তা যদি নেই, বাছা এঁড়ে লাগা ছেলের মতো চলে যাও যেথায় খুশি। মন জয়ের মজদুরি যদি না করতে পারো, তবে এখানে কিলিয়ে কাঁটাল পাকাতে পারবে না।'

বলেই মুখ নামিয়ে নিচু স্বরে বলেন, 'আর শুভেন্দু যাকে কিলিয়ে পাকাতে চাইছে, সে যে অলকা, সেটাও আশা করি বুঝতে পেরেছ।'

অস্বীকারের উপায় নেই। স্বীকার করার দায় নিতে চাই না। শুভেন্দুর চলে যাবার মুহূর্তের ঘটনাই সে কথা বুঝিয়ে দিয়েছিল। তবে আমার জবাবের প্রত্যাশা অচিনবাবুর নেই। তিনি তেমনি স্বরেই বেজে চলেন, 'তার ওপরে, কাঁটালটি যদি পাকা হয়, তবে তো কথাই নেই। কিল দিলেই সে ছটকে ছিটকে যাবে। না কী বলো হে ভায়া?'

প্রশ্ন শুনে চমকাই। জবাব দিতে গিয়ে থমকাই। এ প্রসঙ্গে যেতে চাই না। কোথায় যেন সংকোচে আড়ষ্ট লাগে। অকারণে অচেনার গায়ে হাত দেওয়া।

তোমার তা মনে হতে পারে, অচিনবাবুর হয় না। বলেন, 'অতএব দেখতেই পাচ্ছ, শুভেন্দুর জন্যে আসল জায়গায় কোথাও একটু থমকায়নি। সবাই ঠিক আছে। এর পরে তোমার কথার জবাব হলো, যে মেয়েটিকে দুপুরবেলা কাঁদিয়ে গেছ, সে যে এখন একটু হাসতে চাইবে, এটাই তো স্বাভাবিক।'

প্রায় বিষম খেয়ে চমকে তাকাই। অচিনবাবুর চোখে যেন কেমন এক উদাস হাসি। অথচ উদাস না। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ঢুলুঢুলু ভাব করেন। আমি ভাবি, এত খবর এর মধ্যেই পেলেন কেমন করে। অন্তত এ ক্ষেত্রে একজন মুখ না খুললে জানবার উপায় ছিল না।

অচিনবাবুর চোখ থেকে চোখ সরাবার আগেই তিনি আবার বলেন, 'তা হলেই বুঝতে পারছ, তুমি এদের ব্যাপারে নেই, সেটা ঠিক নয়। বরং আমি তো বলি, তুমিই কাণ্ডটা ঘটালে।'

'আমি?'

'তবে কি আমি? এই বুড়ো অচিন মজুমদার?'

বলে এমনভাবে ভুরু টানেন, চোখের কোণে তাকান, আর গলার ভাঁজে দুষ্টু হাসি হাসেন, হাসি সামলানো দায় হয়। তবু হাসতে গিয়ে কোথায় যেন ঠেক লেগে যায়। বিব্রত বিস্ময়ে বলি, 'কিন্তু দেখুন, তা তো আমি চাইনি।'

'তোমার চাওয়াতেই কি সব হবে?'

'না, তা—।'

আমার কথা থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'তুমি পালালেই কি সব মিটে যায়?'

এ কথার হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারি না। অচিনবাবু আবার বলেন, 'সবাই আপন ভাবে চলে, কাউকে দোষ দিতে পারি না। পালাবে কেন, তুমি তোমার ভাবে চলো। পালানোটাই সহজ এখানে, না পালিয়ে সহজে চলো, সেটাই ভালো। একটা মুখে অন্ধকার দেখেছ। বাকী মুখের আলো কি কিছুই নয়?'

অচিনবাবুর চোখের দিকে চেয়ে মনে হয়, দৃষ্টির ওপারে যেন এক না-বলা কথার ইশারা। যে ইশারা আলোকে ঝিলিকে দেখা যায় না। যে ইশারা গভীর, গম্ভীর, নিশ্চুপ, অথচ নিরন্তর চলে। বুঝতে পারি, সহজের কথা যত সহজে বলেন, সহজে চলা তত সহজ না। পালানোটা ভুল, সে কথা বুঝি। তবু মনটা কেমন খচখচিয়ে মরে। সহজের পথে অসহজের ঘূর্ণি লাগবে না তো? পালাব না, হে সহজ, তোমার

অলক্ষ্যের জটিল ধাঁধায় টেনে নিও না। পথ চলাতে অন্ধকারের বিড়ম্বনা, সে বড় ব্যাজ।

ঝিনিদের দলটা আমাদের আগে আগে চলেছে। আমরা তেমনি পিছনে। আমাদের চার পাশে নানা পসারের বিকিকিনি। নানা মানুষের নানা দিকে যাওয়া-আসা, কল-কলানি। লক্ষ্য করেছি, রাধা আর লিলি কয়েকবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেছে। ওদের চোখমুখের হাসি বলে দেয়, এখন আর শুভেন্দুর কথায় ওরা নেই। ওরা তিন সখীতে কী যেন বলাবলি করে। চুড়ির রিনিঠিনির মতো হাসিতে বাজে। ওদের চলার ভঙ্গিতে, ছাঁদেও যেন সেই হাসির তালে দোল দোলানো। থেকে থেকে রাধা লিলি ফিরে ফিরে চায়। ঝিনি একবারও ফেরে না। তবু মনে হয়, রাধা লিলির চাহনি আর হাসি ঝিনির চোখেমুখেও ঝলকাচ্ছে। কেবল সুপর্ণাদি চলেছেন দোকান পসার আর মানুষ দেখতে দেখতে। বয়স আর মন নিয়ে তিন সখী থেকে তিনি এখন সঙ্গে থেকেও আলাদা।

অচিনবাবুর দৃষ্টি সামনে। কিন্তু বিশেষভাবে কোনো কিছুর ওপরে না। তাই মনে হয়, তাঁর দৃষ্টি মনের ভিতরে। সেইদিকে চোখ রেখেই হঠাৎ বলে ওঠেন, 'মেয়েটি বড় ভালো। ওর বাইরের পোশাকটা আর ডিগ্রির কথা শুনলে কেউ ভাবতে পারবে না, ও এত সহজ। নইলে—।'

বলতে বলতে হঠাৎ থমকে যান। আমার দিকে ভুরু কুঁচকে অবাক হয়ে তাকান। তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, 'ইস, ছি ছি ছি, একেবারে ভুলে গেছি। তোমার সঙ্গে যে আমার কথাই নেই হে। আমি যে তোমার ওপর ভীষণ রাগ করেছি।'

সেই প্রসঙ্গটা এবার হঠাৎ আমারও মনে পড়ে যায়। বাউল আসরে তিনি আমাকে ছিছিক্কার দিয়ে উঠেছিলেন। কেন, তা জানা হয়নি। অসহায় বোধ করি, অবাক হয়ে বলি, 'হ্যাঁ, তখনো বলছিলেন। কিন্তু কী করেছি, বলুন তো?'

অচিনবাবুর এখনকার মুখ আলাদা। ওঁর হিজিবিজি মুখের রেখায় হঠাৎ যেন ভারী রাগ দেখা দেয়। কিন্তু মন দিয়ে দেখ, এ রাগ কপট। রাগের ওপারে যেন কেমন একটু অনুরাগের রঙ লাগানো। রুক্ষু স্বরে বলেন, 'কী করনি, তাই বলো। তোমার সম্পর্কে আমার একটু অন্যরকম ধারণা ছিল। কিন্তু তুমি যে এরকম, এহ্, ছি ছি ছি।'

আসল কথায় বাজেন না। আন কথাতেই, কথা শেষ করে চোখ পাকিয়ে তাকান। আবার তিন সখীর দিকে একবার তাকিয়ে বলেন, 'এতক্ষণে বুঝলাম, কেন ওরা বারে বারে ফিরে ফিরে চাইছে।'

আমি কেবল ধাঁধার জটায় পাক খেয়ে যাই। অপরাধ কী, প্রসঙ্গ কী, তার নাগাল পাই না। তবু জিজ্ঞেস করি, 'কেন চাইছেন ওঁরা বলুন তো? কী বলাবলি করছেন ওঁরা?'

'ওরা বলাবলি করছে, আড়ি দিয়েও আবার তোমার সঙ্গে কথা বলছি কেন। না না, তোমার সঙ্গে আমার আর কথা নেই।'

প্রায় ওঁর পায়ে ধরতে ইচ্ছা করে। এ কী অসহায়তা দেখ। জিজ্ঞেস করি, 'কিন্তু কী অপরাধ করেছি, তা বলুন।'

অচিনবাবু চোখ পাকিয়ে বলেন, 'তোমার অপরাধ, তুমি অহঙ্কারী।'

অহঙ্কারী! এ অপবাদ তো শত্রুতেও দেয় না আমাকে। বলি, 'অহঙ্কারী?'

'হ্যাঁ, আর মিথ্যুক।'

'মিথ্যুক?'

'হ্যাঁ। ভাগ্যিস জানতে পেরেছি, তাই। আমি তোমার ঠিকানাও নেবো না, তোমাকে কোনোদিন চিঠিও লিখব না।'

আর বলবার দরকার হয় না। কোথাকার কথা কোথায় এসেছে, এবার বুঝতে

পারি। চিঠির প্রসঙ্গ অচিনবাবুর কানে উঠেছে। আমার মনে কেবল এই ধাঁধা, ওঁর সঙ্গে ঝিনির এত কথাবার্তা কখন হলো। দু'জনাতে এত বলাবলি কেমন করে হলো। কয়েক ঘণ্টার তফাতে দেখছি, আমার মানুষ আর আমার নেই। তিনি এখন ভিন্ দলের দলী। আমিই পর। তিনি এখন ঝিনিদের শরিক। এখন মনে পড়ে, ঝিনির কান্নার কথাও তাঁর গোচরে এসেছে। আর এই তো একটু আগেই শুনলাম, অমন মিষ্টি আর সহজ মেয়ে তিনি আর দেখেননি। এ যে দেখি, আমে দুধে মাখামাখি, আঁটি গড়াগড়ি যায়।

তবে এক বেলাতে এটুকুও বুঝেছি, ভাবের এমন ইন্দ্রজাল অচিনবাবুর অচিন লীলাতেই আছে। সহজেই সহজ আনে। সহজেই সহজ ধরে। ঝিনি সেই সহজে ধরা দিয়েছে। দিয়ে দু'জনে দু'জনের ভাবের ভাবী হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি বিব্রত লজ্জায় বলি, 'আসলে কী জানেন—।'

'আরে রাখ হে তোমার আসল নকল। তুমি মানুষ চেন না।'

সে কথা শিরোধার্য। তেমন অহঙ্কার যেন কোনোদিন না করি। যে আপনাকে চেনে না, সে কেমন করে মানুষ চিনবে। যার আপন পথের ঠিকানা জানা নেই, যে আপন খোঁজার রূপ চেনে না, সে ভিন্ মানুষের কী চিনবে। বলি, 'তা ঠিক।'

তাতে অচিনবাবু শান্ত হন না। রুষে বলেন, 'হাজার বার ঠিক। আমি বলব, তুমি ওকে শুধু অসম্মান করনি, ওকে মিথ্যেবাদী করেছ, ওর অহঙ্কার চূর্ণবিচূর্ণ করেছ।'

অচিনবাবুর মুখের গাম্ভীর্যে এখন আর কপটতা নেই। কিন্তু চিঠির জবাব না দিয়ে অসম্মানিত করতে চাইনি। কী অহঙ্কার যে চূর্ণ করেছি, তাও জানি না। অবাক হয়ে বলি, 'উনি কি তাই বলেছেন আপনাকে?'

'উনি বলবেন কেন। ওঁর কথা থেকেই বোঝা যায়।'

'কিন্তু ওঁর অহঙ্কারের কথাটা বুঝলাম না।'

'কেন, এত মানুষ দেখেছ, এটুকু বোঝনি, একটি মেয়ের একটা মেয়েত্বের অহঙ্কার থাকে। তোমার কথা সে তার বন্ধুদের বলেছে। তোমার জন্যে সে তার বাবা-মাকে মিথ্যে কথা বলেছে।'

সে অপরাধ মনে মনে আগেই স্বীকার করেছি। অস্ফুটে বলি, 'জানি।'

অচিনবাবু আমার দিকে একবার তাকান। তারপরে মুখ ফিরিয়ে বলেন, 'তার চেয়ে বড় কথা, তুমি ওকে দুঃখ দিয়েছ।'

সে কথাও অনস্বীকার্য। তাই চুপ করে থাকি। অচিনবাবু আমার কাঁধে হাত দেন। আমার চোখের দিকে তাকান। দেখি ঈষৎ লাল চোখ দুটি প্রীতি-স্নেহে চিকচিক করে। বলেন, 'একটা ভালো মেয়েকে দুঃখ দিলে একটু লাগে, তাই এত কথা বললাম। ওর মনটা ভাবো, যেমনি প্রথম আলাপে বুঝেছে, তোমাকে আমার একটু ভালো লেগেছে, অমনি আমাকে সব বলে দিয়েছে। তাতে বোঝা গেল, বিদ্যা বুদ্ধি যা-ই বলো, একটি সুন্দর হৃদয় তার চেয়ে অনেক বড়। সে আর যাই হোক, ছলনা জানে না।'

বলে আবার আমার চোখের দিকে তাকান। ওঁর চোখে যেন কিসের এক অস্পষ্ট জিজ্ঞাসা। যে জিজ্ঞাসায় জড়ানো একটি অচেনা হাসি। আমি বলি, 'অন্যায় হয়ে গেছে।'

অচিনবাবু বলেন, 'আর সেটা হয়েছে, তুমি ওকে চিনতে পারনি।'

অবাক হয়ে তাকাই। কী চেনার কথা বলছেন উনি। তার কোনো জবাব নেই, কেবল একটু হাসেন আমার চোখের দিকে চেয়ে। তারপর মুখ ফিরিয়ে নেন। আমার ঠেক লেগে যায় মনে মনে। কোন্ সংকেতে, কোন্ দিকেতে কী দেখান এই বয়স্ক অভিজ্ঞ রসিক প্রাণের মানুষ! পথ চলি আপন খোঁজার ফেরে। সেখানে সেই চেনাটাই দায়,

যে চেনাতে পথের গতি হারিয়ে যায়।

অচিনবাবু হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন, 'আর যেও না, সামনের ঘরেই ঢোকো।'

মেয়েরা দাঁড়ায়। তাদের সামনেই এক চা-কফির ঘর। তেমন ভিড় নেই। মেয়েরা ভিতরে ঢুকেও বসে না। অচিনবাবুর দিকে তাকায়। আমরা এগিয়ে যেতে ঝিনি বলে, 'বসুন অচিনদা।'

এই শোনো, এর মধ্যে আমার অচিনবাবু এদের অচিনদাও হয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেন, 'বসছি। তোমরা বসো। সুপর্ণাদি বসুন।'

বলেই রাধা আর লিলির দিকে চেয়ে মুখখানা গম্ভীর করেন। বলেন, 'তোমরা ভাবছিলে আড়ি দিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলছিলাম? মোটেই না। যা-তা শুনিয়ে দিচ্ছিলাম।'

রাধা লিলি হেসে ওঠেন। সুপর্ণাদি নিঃশব্দে হাসেন। কিন্তু ঝিনির অবাক চোখে একটু উদ্বেগের ছায়া। সেদিকে চেয়ে অচিনবাবু হাত তুলে বলেন, 'আরে না না, তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। মিথ্যুককে মিথ্যুক বলেছি, এই যা।'

তাঁর কথার ভাবে রাধা লিলি আবার হেসে ওঠে। ঝিনির মুখে একটু রঙ ধরে যায়। ও আমার দিকে একবার চেয়ে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নেয়। বলে, 'অচিনদা, আমি কিন্তু আপনাকে দক্ষিণের গল্প বলেছি, নালিশ কিছু করিনি।'

'তুমি নালিশ করবে কেন। একে আমার যা বলার ছিল, বলেছি। এখন বসো।'

আমাকে ডেকে বললেন, 'বসো হে।'

বসতে গিয়েও একেবারে চুপ করে থাকতে পারি না। প্রায় কারুর দিকে না তাকিয়েই বলি, 'হ্যাঁ, অন্যায় তো একটা হয়েই গেছে।'

অচিনদা বলে ওঠেন, 'কবুল?'

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাই। তিনি বলেন, 'বেশ, ক্ষমা চাওয়ার পাঠ এখন থাক, ওটা অন্য সময় হবে।'

রাধা লিলি আমার দিকে চেয়ে হাসে। সুপর্ণাদি আমাকে বলেন, 'আমাদের মেয়েটাকে কষ্ট দিয়ে আপনিও রেহাই পেলেন না।'

ঝিনি বলে ওঠে, 'আহা, কষ্ট আবার কী। এ প্রসঙ্গ থাক, আর নয়।'

ঝিনি লজ্জা পাচ্ছে, বোঝা যায়। প্রসঙ্গান্তরে যেতে চায়। মনে মনে আমারও সেই প্রার্থনা। তবু রাধা চোখে ঝিলিক হেনে বলে ওঠে, 'মিটমাট যাই হোক, সেই পুরনো চিঠির জবাব দিতে হবে।'

আমি বলি, 'তাও দেবো।'

ঝিনি হেসে ওঠে। ওর সঙ্গে চোখাচোখি করে রাধা লিলিও হাসে। অচিনদা জিজ্ঞেস করেন, 'কী হলো?'

জবাব দেয় ঝিনি, 'না—মানে ওঁর কথা শুনলে একটু অবিশ্বাস করা যায় না কিনা, তাই।'

সকলের হাসির মধ্যেই অচিনদা বলে ওঠেন, 'চিতা, চিতা ভাই, চিতা বাঘের চলাফেরা টের পাবে না। তখন বললাম না, গোপীদাদা ওর নাম দিয়েছে, কালো চিতা।'

লিলি বলে ওঠে, 'আর আপনি দিয়েছেন, কালো বিড়াল।'

সকলের হাসিতে কফিখানাটাই খিলখিলিয়ে বেজে ওঠে। আমিও বঞ্চিত হই না। কফির কাপ এসে পড়ে সামনে। চুমুক দিতে গিয়ে ঠেক খাই। হঠাৎ এক সাঁওতাল পুরুষ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হেঁকে ওঠে, 'অই, তু অচিনবাবু কী না, অ্যাঁ?'

অচিনদা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন এক মুহূর্ত। কাঁচা-পাকা ঝাঁকড়াচুলো, গায়ে ধোকড়া একটা কম্বল সাঁওতাল পুরুষটির দিকে একটু তাকিয়ে থেকে অচিনদা

বলে ওঠেন, 'আরে তুই বরহম না?'

'হুঁ রে হুঁ, তো চিনতে পারলি? আমাদের উদিক্‌খে যাবি না?'

'যাবো। তুই আয় না এখানে?'

'না, ভিত্‌রে যাবো না। তু আয় কেনে।'

অচিনদা উঠে দাঁড়ান। এমন ব্যাকুল, এমন হাসির ঝলক মুখে, মনে হয় কত দিন পরে যেন প্রাণের বন্ধুর দেখা পেয়েছেন। আমরা সবাই অবাক হয়ে দেখি, তিনি দোকানের বাইরে গিয়ে সাঁওতাল পুরুষটিকে জড়িয়ে ধরেন।

আবার না, বারে বারে ফিরে ফিরে বলতে হয়, এর নাম অচিনবাবু। নইলে এমন দৃশ্য দেখতে পেতে না ছাতিমতলার মেলায়। এক গোরা বয়স্ককে জড়িয়ে ধরে কালো সাঁওতালী। তাও কি, দেখ একবার, দামী পশমী জামা আলোয়ানের সঙ্গে কি না ধুলোয় মাথা ছেঁড়া কম্বলের জড়াজড়ি। এর সঙ্গে আরো খবর যোগ করো, গোরা বয়স্ক অচিনবাবু লখ্‌নৌ থেকে সোজা এসেছেন নিজের বিলাতী হাওয়া গাড়িতে। চাকরির বিনিময়ে তাঁর মাসিক মূল্য বত্রিশ শো টাকা। যাকে জড়িয়ে ধরেছেন, তাকে দেখলে বোঝা যায়, বিহান থেকে তার দিন কাটে মাঠে। সাঁঝবেলাতে ঘাটে পা ধুয়ে সে ঘরে ফেরে।

বলবে, এমন বহিরাঙ্গনের দামাদামির বিচার কেন হে। কারণ ঘর নিয়ে যে মন। নিচুতে না, উঁচুতে না, মাঝখানে যে মধ্যবিত্তের মন, তার সেই ছোট জায়গাটাই আগে নাড়া খেয়ে যায়। তাই অবাক লাগে। তারপরে উঁচু নিচু মাঝখানের ঘর না, তার বাইরে, সে-ই এক, যার দ্বিতীয় নেই, প্রাণে প্রাণে জড়ানো দেখে, নিজের প্রাণের ভিন্ স্রোতের বাঁধ খুলে যায়। তখন কেবল অবাক লাগে না। টলটলিয়ে ওঠে মুগ্ধ রসের ঢেউয়ে।

একবার মুখ ফিরিয়ে সঙ্গীদের দিকে ফিরতে যাই। প্রথমেই চোখ পড়ে যায় ঝিনির দিকে। চোখ পড়তে চোখাচোখি হয়ে যায়। সে তখন আমার দিকে চেয়ে কেন, কে জানে। একটু যেন লজ্জা পেয়ে যায়। বলে ওঠে, 'অদ্ভুত!'

অবাক খুশিতে বেজে ওঠে রাধা, 'কে, অচিনদা তো? সত্যি।'

লিলি বলে, 'দেখেছ, ওঁর খাতিরের লোক সব আলাদা।'

আমি আবার চোখ ফিরিয়ে অচিনদাকে দেখি। দেখি, তখন আর বরহম সাঁওতাল একলা না। পাশে দাঁড়িয়ে তার কাছাকাছি বয়সের এক সাঁওতালনী। সেও যেন হেসে হেসে অচিনদাকে কী বলে। আর উনি হেসে হেসে জবাব দেন। তারপর পকেট থেকে কী নিয়ে বরহমের হাতে গুঁজে দিতে যান। সে হাত ফিরিয়ে নেয়। শুনতে পাই, বলে, 'না রে না, তুই চল ক্যানে। উ আমি চাই না।'

অচিনদা বলেন, 'তুই চল না। সব নিয়ে-টিয়ে গিয়ে বোস, আমি যাচ্ছি।'

রাধা বলে, 'কী দিচ্ছেন?'

লিলি বলে, 'মনে হচ্ছে টাকা দিচ্ছেন যেন।'

আমি আবার এদিকে চোখ ফেরাই। ঝিনিও সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে চায়। তার চোখেও জিজ্ঞাসা। যার জবাব আমার জানা ছিল না। তারপরে হঠাৎ ঝিনি যেন কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারে না। চোখ নামিয়ে নেয়।

জিজ্ঞেস করি, 'কিছু বলছেন?'

ঝিনি চোখ তুলে বলে, 'আপনার মুগ্ধতা দেখছি।'

বলি, 'আমিও আপনাদেরটা দেখছি।'

'আপনার সঙ্গে আমাদের একটু তফাত আছে।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'যথা?'

ঝিনি বলে, 'বুঝিয়ে বলতে পারছি না। কেবল মনে হলো, আপনি একবারে আত্মহারা।'

তবু অবুঝের মতো চেয়ে থাকি। কথার ঠিক জায়গা ধরতে পারি না। ঝিনি আবার বলে, 'ছেলেমানুষের মতো। যেন আপনিও পারলে, লোকটাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরতেন।'

দার্শনিকরা কল্পনা করে কি না জানি না। দার্শনিকারা করে, ঝিনি তার প্রমাণ নইলে এত বাড়িয়ে বলবে কেন। অচিনদার বন্ধু আর বন্ধুত্ব দেখে মুগ্ধ হয়েছি বটে। বরহম সাঁওতালকে জড়িয়ে ধরতে চাইব কেন। বন্ধু হলে ধরতাম। অমন খোলা প্রাণের আকাঙ্ক্ষায় আর মুগ্ধতায় আমার মন ভেপেছে।

আমরা যখন কথা বলি, তখন বাকীদের খেয়াল অচিনদার দিকে। ঝিনি আবার বলে, 'আপনার সেই গাজীর কথা আমার মনে পড়ছে।'

জিজ্ঞেস করবার অবকাশ পাই না, অচিনদা আর বরহমকে দেখে কেন গাজীর কথা তার মনে পড়ে। অচিনদার ধমক শোনা যায়, 'নিবি না তা হলে?'

ফিরে চেয়ে দেখি, বরহম তখন পেঁছিয়ে গিয়েছে অনেকখানি। তার বোঁচা নাক, কালো মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি। সাঁওতালনীরও সেই রকম। বরহম নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়ে জানায়, নেবে না। বলে, 'তুই আয়, আমরা যেয়ে বসি।'

অচিনদা বলেন, 'ঠিক থাকবি তো?'

'হুঁ রে হুঁ, মিছা ক্যানে বইলব?'

'তো যা, তোরা যা, আমি একটু বাদে যাচ্ছি।'

বরহম ঘাড় কাত করে, সাঁওতালনীকে নিয়ে চলে যায়। অচিনদা আসেন। মুখে তাঁর টেপা টেপা হাসি। এসে বসতে না বসতেই রাধা জিজ্ঞেস করে, 'ও কে, অচিনদা!'

সুপর্ণাদি বলে ওঠেন, 'আগে কফিতে চুমুক দিতে দাও, ওটা ঠান্ডা হয়ে গেল।'

যাঁর যেদিকে নজর। কফির পাত্রে চুমুক দেবার আগে অচিনদা বলেন, 'ছেলেবেলার বন্ধু।'

এক চুমুকে কফির পাত্র শেষ করে, চোখ ঘুরিয়ে হেসে বলেন, 'দেখছ তো কীরকম বন্ধু? এখনো ভেবে দেখ, আমার সঙ্গ করা চলবে কি না।'

তাঁর কথায় সবাই হেসে বাজে। তিনি চুরুটে আগুন জ্বালেন।

লিলি জিজ্ঞেস করে, 'আপনার ছেলেবেলার বন্ধু মানে? আপনি কি এদের সঙ্গে ছিলেন নাকি ছেলেবেলায়?'

'তা, একরকম তা-ই বলতে পারো। সঙ্গে না থাকলেও কাছাকাছি তো ছিলাম। আমরা ছিলাম আশ্রমে, ওরা ছিল কোপাইয়ের ধারে। ওরা যখন কোপাইয়ের ধারে গরু চরাত, আমরা তখন ছেলেবেলায় অনেকবার সেখানে গিয়েছি। তবে এইটুকু বলতে পারো, সব ছেলেরাই কি আর কোপাইয়ের সাঁওতাল ছেলেদের সঙ্গে ভাব করত? তা করত না, আমার মতো দু' একজনের সে রোগ ছিল। রোগটা যে কেমন, বুঝতেই পারছ, এখনো দেখা হলে আগের মতোই ছেলেমানুষি করতে ইচ্ছে করে।'

কথা বলতে বলতে ওঁর চুরুট নিবে যায়। আবার আগুন জ্বালেন। আর সেই, আগুনের আলোয় দেখি, ওঁর মুখের হিজিবিজি রেখায় তরঙ্গের দোলা। রাধা বলে, 'আপনারা বেশ মজায় ছিলেন।'

অচিনদা বলেন, 'মজা? তা একরকম বলতে পারো। আমাদের যুগের শান্তি-নিকেতনের সঙ্গে এ যুগের অনেক তফাত। তুমি যাকে মজা বলছ, আমাদের কাছে সেটাই ছিল খাঁটি চেহারা, ওরিজিনাল। তবে তর্ক আসতে পারে, সে কথা থাক, সময় তার কাজ করে যায়। তার ওপরে কারুর হাত চলে না। তবে কি না, "ওর অন্তর্ধান

...হেরি তব রূপ চিরন্তন। অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার পরম আগমন।" হারিয়ে ...র পিছনেও কিছু জেগে থাকে। সময় চলে যায় ঠিকই, তার ওপারেও কিছু ... যায়। কেবল যে চোখ বুজলেই তা দেখতে পাই, তা নয়। মাঝে মাঝে বরহমের ... কেউ কেউ পুরনো সুরে ডেকে ওঠে, সামনে এসে দেখা দেয়।'

সবাই এমন নিবিষ্ট হয়ে শুনি, কখন যেন, মেলার এই কফি ঘরে স্তব্ধতা নেমে আসে। আমি আবার দেখি, সেই মানুষকে। যে মানুষ হাবাগোবা ছেলেটির মতো অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছেন। ইতিমধ্যে আমরা সবাই চোখাচোখি করি। সকলেরই যেন এক উৎসুক বিস্ময়। সকলেরই চোখে যেন রূপকথা শোনার আবেশ।

কিন্তু নৈঃশব্দ্যই চমক দিল অচিনদাকে। হঠাৎ বলেন, 'এই দেখ, বকে চলেছি। এবার ভাই আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবো। আবার কাল—।'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই ঝিনি যেন ব্যাকুল উদ্বেগে বলে ওঠে, 'এত তাড়াতাড়ি?'

অচিনদা অমনি চোখ ঘুরিয়ে বলেন, 'খুব তাড়াতাড়ি বুঝি?'

ওঁর ভুরু তুলে, চোখ ঘোরানোর মধ্যে যেন কী এক ইশারা খেলে যায়। এমন করে বলেন, বাকীরা যখন হাসে, ঝিনির ডাগর চোখ দুটি তখন হঠাৎ লাজে লাজিয়ে যায়। মুখ নত করে। কিন্তু রাধা ওর ঘাড় অবধি ফাঁপানো চুলে ঝটকা দিয়ে বলে, 'খুব তাড়াতাড়ি তো হচ্ছে। আপনি এখুনি চলে যাচ্ছেন কেন। সেরকম কথা তো ছিল না।'

লিলি বলে, 'তাছাড়া, আমাদের তো আবার বাউল গান শুনতে যাবার কথা।'

অচিনদা বলেন, 'আহা, সবাই তো আর চলে যাচ্ছে না। তোমরা রয়েছ, একেও রেখে যাচ্ছি।'

বলে, আমার দিকে একবার চোখের ইশারা করে দেখান। তারপরে ঝিনির দিকে তাকান। আমার চোখাচোখি হয় রাধা লিলির সঙ্গে। সবাই হাসি। কিন্তু মনে মনে জানি, অচিনদা পথ চলার কোন্ দিকেতে ইশারা দেন। নিত্য উধাও পথের ধারে, কোন্ বাগিচা রচেন। কী ফুল ফোটান।

রাধা ওর ছেলেমানুষি মিঠে মুখখানি গ্রীবার বৃন্তে দুলিয়ে বলে, 'তা জানি, তবু একটু থাকুন।'

সঙ্গে সঙ্গে ঝিনি বলে ওঠে, 'আর তা নইলে আমরাও আপনার সঙ্গে যাই।'

অচিনদা প্রায় চমকে উঠে বলেন, 'অ্যাঁ বল কী? নাঃ, এ মেয়েটা দেখছি সত্যি সেই "যোগিনী হয়ে যাবো সেই দেশে, যেথায় নিঠুর হরি।"

আবার হাসি বেজে ওঠে। কিন্তু লিলি বলে ওঠে, 'না না, সত্যি, আমরা সবাই মিলে আপনার সঙ্গে যাবো।'

অচিনদা খলখলিয়ে হেসে বলেন, 'সর্বনাশ, এ কাদের নিয়ে বেরিয়েছেন সুপর্ণাদি? এ তো সব দেখছি বাউল বৈরাগিনী। কাল মানে না, লোক মানে না, স্থান মানে না, বলে সঙ্গে চলে যাবে?'

লক্ষ্য করেছিলাম, সুপর্ণাদি বারে বারেই বাইরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। হেসে বলেন, 'আমি ওদের নিয়ে বেরোইনি। ওরাই আমাকে নিয়ে বেরিয়েছে।'

বলে, সস্নেহে তাকান তিন সখীর দিকে। অচিনদা বলেন, 'কিন্তু আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে এ সময়ে তো তোমাদের নিয়ে যেতে পারব না ভাই। তাহলে এসো, সবাই মিলে আর এক পাত্র করে কফি খাই, গল্প করি।'

ইচ্ছা নেই, তবে অগত্যা। আবার কফির অনুমতি হয়। ঝিনি জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাবেন?'

'বরহমদের আড্ডায়।'

'কোপাইয়ের ধারে?'

শুনেই রাধা উচ্ছ্বাসে আর উল্লাসে বেজে ওঠে, 'ইস, কী সুন্দর! আমাদেরও নিয়ে চলুন না।'

অচিনদা ততক্ষণে হাসতে আরম্ভ করেছেন। বলেন, 'উঃ, এ কী কলকাত্তাইয়া পাগলীদের পাল্লায় পড়েছি দেখ। আরে বোকা, কোপাই কি এখানে নাকি? আমি কি বরহমদের আস্তানার কথা বলেছি? আমি বলেছি, ওদের আড্ডায় যাবো একটু। এখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে, সেখানে তোমাদের নিয়ে যেতে পারব না।'

সকলেরই মুখে ছায়া ঘনায়। জমাটি আসর হঠাৎ ভাঙার হতাশা। ভাঙবার আগেই গরম কফির উষ্ণতা যেন জুড়িয়ে যায়।

ঝিনি আবার জিজ্ঞেস করে, 'এই মেলার মধ্যেই তো?'

'না। তাহলে আর তোমাদের নিয়ে যেতে বাধা কী ছিল। আমি যাবো উত্তরের খাল পেরিয়ে।'

বলে, চুপচাপ কয়েকবার কফির পাত্রে চুমুক দিয়ে আবার বলেন, 'অথচ এককালে পৌষ মেলায় বরহমরা ছিল অনেক বড় শরিক। মেলাটা ছিল, ওদেরই অনেকখানি।'

এবার আমার বেজে ওঠার পালা। বলি, 'হ্যাঁ, ওরা তো শুনেছি দল বেঁধে আসে, নাচে, গান করে।'

আমার কথায় অচিনদা ঘাড় দুলিয়ে সমর্থন জানাতে জানাতে, তারপরে উল্টো-দিকে নাড়াতে থাকেন। বলেন, 'কিন্তু আর ওদের এ মেলায় দেখতে পাবে না। স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দলিলেও ওদের উৎসবে আমন্ত্রণের নির্দেশ ছিল। কিন্তু ওরা আসে না, আসবে না কোনোদিন।'

কেন, তা জিজ্ঞেস করবার দরকার হয় না। অচিনদা নিজেই বলেন, 'বোধ হয়, বছর আট-দশ আগেও এসেছে। উত্তরায়ণের সামনে নয়া পোস্টাফিসের রাস্তার ধারে যে মাঠ, সেখানে ওরা নিজেরা নাচে গানে মেতে থাকত, সবাইকে মাতিয়ে রাখত। কিন্তু সেই চিরন্তন ট্র্যাজেডি, শহরের মানুষেরা কোনোদিন তাদের চোখ থেকে শহরের ঠুলিটা খুলতে পারেনি।'

সকলেই উৎসুক জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে। অচিনদা ঝিনির দিকে চেয়ে বলেন, 'তোমার দর্শন পড়া আছে, তুমি জানো নিশ্চয়ই, আমরা যাদের আদিবাসী বলি, তাদের কতগুলো আদিম বিশ্বাস আছে। ছেলেমেয়েদের খোলাখুলি মেলামেশাটা ওদের বিশ্বাসেরই অঙ্গ। অথচ দেখ, আমরা সভ্য শহুরে লোকেরা তার জন্যে আন্দোলন করি। আমরা সমানাধিকারের কথা বলি, ওদের বলতে হয় না, কারণ ওটা ওদের জীবনধারণ, সমাজ-সামাজিকতার মধ্যে পড়ে। অতএব উৎসবে অনুষ্ঠানে, ওরা মেয়ে-পুরুষেরা, একসঙ্গে হাত ধরে নাচে, গান করে, পান করে। কিন্তু আমাদের শহুরে সভ্য মানুষের মুশকিল হলো, তারা পয়সা দিয়ে নাচ দেখে। একটু হয়তো শুনতে কটু লাগবে, তারা বাঈজীর বাড়ি যায়, মুজরো দেয়, টাকা ছোঁড়ে। আকাশের তলায়, প্রকৃতির সাজে সাজানো মাতঙ্গ মাতঙ্গিনীর নাচ দেখেনি কোনোদিন। তাই মেলা দেখতে আসা, ছিঁচকে শহুরে লোকদের চোখের সেই নোঙরা চশমাতে কেবল লোভ। সহজলভ্য ভেবে তারা সাঁওতাল মেয়েদের গায়ে হাত বাড়াতে গেল। তার পরিণতি যা হয়, তাই হয়েছিল। প্রতিবাদ আর সংঘর্ষ। সেই থেকে মেলার উৎসব থেকে ওরা বিদায় নিয়েছে।'

কথা শেষ করে, অচিনদা কফির পাত্রে চুমুক দেন। অপরেরা তাও ভুলে যায়। সকলেরই মুখে ক্ষুব্ধ বিষণ্ণতা। আমার চোখে ভেসে ওঠে মলুটি গ্রামের মৌলীক্ষার

মাঠ। কালী পূজার ভাসানে যেখানে দেখেছিলাম, আদিম বিশ্বাসের অপরূপ লীলা। হয়তো এই ছাতিমতলার মেলায়, মৌলীক্ষার মাঠের মতো, নিরাবরণ পুরুষ প্রকৃতির গণমিল হতো না, কিন্তু সহস্রের নাচের দোলায় তরঙ্গায়িত মাঠ ভেসে ওঠে চোখে।

ঝিনি যেন ইংরেজীতে কী বলে ওঠে, খেয়াল করি না। অচিনদা বলেন, 'ঠিক বলেছ, আমরা সবাই পিতৃতান্ত্রিক নগর সভ্যতার চোখে দেখি।'

রাধা তো অল্পেতেই বাজে। বলে ওঠে, 'কতগুলো নোঙরা লোকের জন্য আমরা বঞ্চিত হয়েছি। লোকগুলোকে তীর ধনুক দিয়ে ওরা মেরে ফেলতে পারেনি?'

অচিনদা বলে ওঠেন, 'আর তাহলে আমরাই যে আবার কাঁদতে বসতাম গো। যাদের মারত, তারা তো সব আমাদেরই ভাই ছেলে স্বামী।'

নাগরিকা রাধা ওর ঘাড়-ছাঁটা চুলে ঝাপটা মারে। বলে, 'ভাই ছেলে স্বামী না ছাই।'

রূপে বেশবাসে বোঝা যায় না, রাধা এমনি ভাষণ করতে পারে। ওর কথা শুনে ফোঁসানি দেখে সবাই হাসে। অচিনদা আমাকে বলেন, 'কী হে, তুমি যে বড় উদাস হয়ে পড়লে।'

বলি, 'উদাস না। আপনার কথা শুনে, দৃশ্য মনে পড়ে গেল।'

'সাঁওতাল নাচের? কোথায়?'

'মলুটি গ্রামে। রামপুরহাট থেকে যেতে হয়।'

বিসর্জনের সেই সন্ধ্যেবেলার কথা বলি। সেই নাচের অনুষ্ঠানের শেষ মুহূর্তের কথা যখন বলি, সকলের চোখে যেন একটা দ্বিধার বিস্ময়। কেবল অচিনদা ছাড়া। আর ঝিনি যেন চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ লজ্জা পেয়ে যায়।

রাধা বলে ওঠে, 'সত্যি?'

ওর বিস্ময়ের তীব্রতায়, দৃষ্টির জিজ্ঞাসায় আমিও প্রায় লজ্জা পেয়ে যাই। লিলি বলে, 'সত্যি নয় তো মিথ্যে বলছেন নাকি?'

রাধা যেন হঠাৎ কেঁপে উঠে বলে, 'না, আমি বোধ হয় দেখতে পারতাম না।'

সবাই হাসে। ঝিনি চোখ তুলতে গিয়ে আবার লজ্জা পায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলে, 'আশ্চর্য!'

অচিনদা বলে ওঠেন, 'আর একেই বলে তক্ষক।'

বলে, আমার দিকে ইশারা করে দেখান। বলেন, এদিকে শব্দাশব্দি নেই, ওদিকে সব দেখে শুনে তক্ষকটি হয়ে বসে আছেন।'

সবাই খিলখিলিয়ে বাজে। অচিনদা আবার একটু গলা নামিয়ে বলেন, 'তা, সেখানে ওসব দেখে, ভায়ার কোনো গোলমাল হয়নি তো?'

তাঁর প্রশ্নের ঢঙে, সবাই আরো জোরে বেজে ওঠে। আমি বলি, 'না। তবে এত অবাক কখনো হইনি। মনে হয়েছিল হাজার হাজার বছর আগের ভারতবর্ষের এক রূপ দেখলাম। এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয়?'

অচিনদা পিঠে হাত দিয়ে বলেন, 'ঠিক, ঠিক বলেছ।'

সুপর্ণাদি হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা, আপনার মনে কোনো বিকার আসেনি?'

আমি বলি, 'না সুপর্ণাদি। মনে প্রশ্ন এসেছিল। তার জবাবও আমি পেয়েছি। শুনেছি কোনারকের মন্দিরের মূর্তি দেখে নাকি অনেক রুচিবাগীশ ভদ্রলোকের রুচিতে আঘাত লাগে। আমার লাগেনি। আমি দেখেছিলাম, বিশ্বসংসারের এক চিরন্তন রথ, স্বাস্থ্য আর আয়ুর আকাঙ্ক্ষায় সৃষ্টির লীলা করে চলেছে। আর মলুটির সাঁওতালদের সেই গণ-মিলনের ছবি যেন, কোনারকের মন্দিরের গায়ের জীবন্ত রূপ।'

'অপূর্ব!'

অচিনদা আমার পিঠে চাপ দেন। বলেন, 'তোমার কথার জন্যে বলছি না, তোমার দেখার নজরের কথা বলছি। বুঝলে অলকা, এ হলো অন্য চোখের কথা। তোমার ফিলজফিতে, তুমি একমত তো?'

ঝিনি বলে, 'ফিলজফির কথা জানি না, কিন্তু এক মত।'

অচিনদা তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন, 'অতএব, আর নয়। ওহে, পয়সাটা নিয়ে যাও।' বলে, তিনি পকেটে হাত দেন। আমিও দিই। আর একই সঙ্গে ওরা তিন সখীতে কুটুস কুটুস ব্যাগ খুলে ফেলে। অচিনদা ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলেন, 'কী হলো? সবাই যেন একেবারে মুখিয়ে ছিলে মনে হলো। দেখুন তো সুপর্ণাদি, এদের ডেঁপোমি দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।'

তারপরেও আর হাত তোলার সাহস কারুর থাকে না। সুপর্ণাদি স্নিগ্ধ হেসে বলেন, 'ছেলেমানুষ তো।'

পয়সা দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়াতেই আমিও দাঁড়াই। অচিনদা বলেন, 'কী হলো?'

সঙ্কোচে জিজ্ঞেস করি, 'আমি গেলে আপনার অসুবিধে হবে?'

অচিনদা তাঁর কোঁচকানো ভুরুর তলা থেকে একটু লাল লাল চোখে ঝলকে একবার সবাইকে দেখে নেন। তারপরে বলেন, 'তুমি যাবে মানে, এঁদের—।'

তাঁর কথা শেষ হয় না। হঠাৎ ঝিনি উঠে দাঁড়ায়। দেখি কখন সহসা বায়ু কোণে মেঘ জমে গিয়েছে। ঘন গরজনের আভাস, ঝঞ্ঝার ঝিকিমিকি। বলে, 'না না, উনি কেন মিছিমিছি ওঁর অসুবিধে করে থাকবেন। আমাদের কোনো দরকার নেই ওঁকে।'

আমিই যেন বিব্রত লজ্জায় অধোবদন। অচিনদাকে কী বলব, বুঝতে না পেরে, তাড়াতাড়ি ঝিনির দিকে ফিরি। এই তো, এত কথা, এত হাসি। এই তো মুহূর্ত আগেও ঝিনি এত 'একমত'।

তবু—তবু কখন, কোন্ মুহূর্তে চিকুর হেনে গেল বায়ু কোণে।

আমি কিছু বলবার আগেই ঝিনি আবার বলে ওঠে, 'বুঝতেই তো পারছেন অচিনদা, আমাদের সঙ্গে থাকতে ওঁর ভালো লাগছে না। তাছাড়া নীরেনদা অনেকক্ষণ গেছেন, এখনো এলেন না। শুভেন্দুর জন্যে আমার একটু ভাবনা হচ্ছে। আমিও আর থাকতে পারব না, চলি। আবার দেখা হবে।'

বলেই, পা বাড়িয়ে দেয়। দিয়ে পিছন ফিরে ডাকে, 'আসুন সুপর্ণাদি। রাধা লিলি আয়।'

কী বা বলিহারি দেখ, ঝিনির ডাকে সবাই দেখি, সুড়সুড়িয়ে উঠে যায়। রাধা লিলি, এমন কি সুপর্ণাদির ঠোঁটের কোণেও একটু হাসি দেখা দেয়। তবে বড় সন্তর্পণে। 'যাচ্ছি' বলে সবাই বিদায় নেয়। কেবল সুপর্ণাদি অচিনদাকে বলেন, 'আজ বড় বেগতিক দেখছি।'

অচিনদা গলা নামিয়ে বলেন, 'কিংবা এটাই হয়তো গতিক।'

সুপর্ণাদি হেসে চলে যান। আর অচিনদা আমার দিকে প্রায় দুর্গা প্রতিমার অসুরের মতো চোখ পাকিয়ে রুক্ষে তাকান। প্রথম কেবল উচ্চারণ করতে পারেন, 'বদ ছোকরা!'

আমি কিছু বলতে যেতেই হুমকে ডাকেন, 'চোপ! দেখাচ্ছি তোমাকে, চলো।'

অচিনদা এমনভাবে হুমকে 'চোপ' বলেন, মনে হয়, হাত বাড়িয়ে মারতে আসেন বুঝি। কিন্তু মারেন না, হাত বাড়িয়ে পিছু ধাওয়ার ইশারা করে, নিজেই রেগে ধেয়ে যান। যেভাবে শাসালেন, এর পরে কী দেখাবেন, কে জানে। তবে পিছু ধাওয়ার ইশারা তো না, হুকুম। অতএব হুকুমদারের মতো পিছু পিছু চলি।

তবু, ঝিনির মুখটা মনে পড়ে বারে বারে। কানে লেগে থাকে ওর কথাগুলো।

অচিনদার সঙ্গে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল, তা-ই বলেছিলাম। বরহমদের ভাবনা আমার মাথায়। মনেতে কৌতূহলের ঝিকিমিকি, যাবো তাদের আড্ডায়। আর কিছু না। আর কিছু ভাবিনি। কিন্তু একমাত্র কথায় যে ঝিনির মুখে মেঘ ডেকে এনেছি, তা জানিনি। পূর্বাভাসেও এমন বার্তা ছিল না, অচিনদাকে ছেড়ে, অন্য দলে থাকব। এ যে দেখি, পুরনো অপরাধ ভঞ্জন করতে গিয়ে, নতুন অপরাধের কলঙ্ক মিলে যায়। অথচ উপায় কী করি।

তবে, কেন, সেই জবাব কে দেবে। কেন অপরাধী হই, ঝিনি কেন অপরাধী করে পথ চলার এই বিহঙ্গের কিচির-মিচিরে, যখন পাখায় লাগে রঙের ঝলক, হাসিতে ঝরে ফুলঝুরির রঙবাহার, তখন আলো কেন নেভে। মুখের হাসি নিভিয়ে, এই অন্ধকারের দুঃখ কেন। দুঃখে এমন বিরাগ দিয়ে, এমন তীব্র দাহে বেঁধা কেন। এমন কথা কখন ভেবেছি, আমাকে ঝিনিদের দরকার আছে, যে-কথাটা ওকে সরোষে জানাতে হয়, আমাকে ওদের দরকার নেই। ওদের সঙ্গ আমার ভালো লাগে না, সে কথা বা কখন ভেবেছি। শুভেন্দুর জন্যে ওর ভাবনার উদ্বেগে বাধা দেবার কথা তো ভাবিনি কখনো। ঝিনি আর থাকতে পারবে না, এমনভাবে বলে গেল, যেন পথ আটকে দাঁড়িয়েছিলাম।

ছাতিমতলার মেলায়, এই জনারণ্যের মাঝখানে চলতে চলতে, একটু না হেসে পারি না। মন-টাটানো হাসি। ভুলি কেন, কেবল অমৃত পান করে যাবো। আমার কূলে কূলে কেবল অমৃত। তিক্ত রসের স্রোত কি কেবল তোমার ছোঁয়া বাঁচিয়ে বহে যায়। আপন না জেনে, অলক্ষ্যে কখন সে পাত্র তুলে নাও, অমৃতের আমেজে তা খেয়াল থাকে না। একটু যদি জ্বালা ধরে, ধরুক। "জ্বলিস্‌ যদি দিবা নিশি, তবেই আলো দেখবি।" এমন গানের মতো ভাববো না। তবু, পিছন ফিরে, পথের যে-আলোতে টান লাগে, সেই আলোতেই চলে যাবো হেথা, এই পথ চলাতে মানের কথা মনে রাখব না। অপমান গায়ে মাখব না। ঝিনির ওপরে রাগ আসে না, ওকে নিয়ে আমার বৈরাগ্যের কথাই বা কী। অতএব, সেই ভালো, সেই ভালো।

ঝিনিকে বুঝতে পারি না, বলব না। বিদুষী বলে একটু অবাক লাগে। সংসার আমার মনের অবাক দিয়ে বানানো না। যেমন 'যা নাই ভান্ডে, তা নাই ব্রহ্মান্ডে' তেমনি সংসারের স্ব-ভাবেতেই অবাক বিরাজ করে। যা অসম্ভব ভাবি, জগতে তার সবই সম্ভব। অসম্ভব ভাবি কেবল, আপনার মনের ছক দিয়ে।

বেশ, সেই ভালো, সেই ভালো। ঝিনি বাজে, ঝিনির মতোই। বাজবেও। ওর মনের তারে তারে হয়তো এমনি সুরই বাঁধা আছে, হাত লাগলে তা এমনি করেই বাজে। তার কার্যকারণ অতীত জানি না। খুঁজতে যাওয়া আরো বিড়ম্বনা। অতএব, আপন পথে, আপনাতে চলি। তিক্ত ঝাঁজের রস ছিটিয়ে, ঝিনির যেথায় মন, সেথায় থাক।

কিন্তু, অচিনদা কি থামবেন না। একবার ফিরেও দেখবেন না, তাঁর পিছু ধাওয়ার হুকুম পালন হচ্ছে কি না! কাঁধ ঝুঁকিয়ে সেই যে চলেছেন আর থামবার নামটি নেই। রেগে আছেন জানি। না হয়, একবার রেগেই তাকিয়ে দেখুন। সার্কাস ম্যাজিক নাগর-দোল্লা, গ্রামীণ মেলার সীমানা পেরিয়ে, নাগরিকদের নগর ঝলকানো মেলাও পেরিয়ে যান। কারা যেন অচিনদার নাম ধরে ডাকাডাকি করে। সবাইকেই, হাত তুলে, ঘাড় দুলিয়ে, কথা না বলে, ব্যস্ত মানুষ এগিয়ে চলে যান। যেন, থামবার উপায় নেই।

মেলা পেরিয়ে দেখি, পশ্চিমে হাঁটা দেন। কেন জানি না, মনে করেছিলাম, বরহমদের আড্ডা বুঝি পুব দিকে। একেবারে বাঁধানো সড়কের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে ভাবি, ঘরে ফিরে যান নাকি? আমার ওপর গোসা করে, আসল যাত্রাই নাস্তি না তো!

বড় সড়কে পড়ে, আশ্রম সীমানার দিকে যান না। উত্তরে হাঁটেন। আমার উপায় নেই, জেলের পিছনে কেলে হাঁড়ি। লোক চলাচলের ভিড় সবখানেই, সব পথেতেই। তার মধ্যেই দেখি, ডান দিকে, হাসপাতালের পথের ধারে, এক বিলাতী মোটর গাড়ির কাছে থমকে দাঁড়ান। ডাক দেন, 'বিরিজ!'

ডাক দিতে না দিতেই, রাস্তার পাশ থেকে একজন ছুটে এসে আওয়াজ দেয়, 'জী হুজুর।' বিরিজ যার নাম, তাকে দেখে সন্দেহ হয়, সে গাড়ির চালক। ছুটে এসে গাড়ির দরজা খুলে ধরে। অচিনদা বলেন, 'না, উঠব না। গাড়ির ভিতর থেকে বড় ঝোলাটা দাও তো।'

আমি যে কাছেই দাঁড়িয়ে আছি, তা যেন দেখতেই পান না। মুখের ভাব সেই দুর্গাপ্রতিমার অসুরের মতোই। তবে, বিরিজের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, একটু অন্যরকম। বিরিজ প্রায় করেল পুতুলের মতো হুকুম পালন করে ভিতর থেকে একটা কাপড়ের ঝোলা বের করে দেয়। কী আছে, কে জানে, তবে খালি ঝোলা না। সেটা হাতে নিয়ে, অচিনদা বলেন, 'তুমি বাড়ি চলে যাও। আজ রাত্রে আর কোথাও যাবো না। গাড়ি তুলে দিয়ে, তুমি খেয়েদেয়ে, শুয়ে পড়গে।'

বিরিজ শিরোধার্য করে জবাব দেয়, 'জী।'

কিন্তু সেদিকে আর তখন অচিনদার ধ্যান নেই। হঠাৎ দখিনমুখো একটা খালি সাইকেল রিকশা দেখে, হাত তুলে ডাক দেন, 'এই দাঁড়া দাঁড়া, এদিকে আয়।'

ব্যাপারের কিছু সুলুক সন্ধান পাই না। নিজের যন্ত্রযান থাকতে কেন মানুষের টানা তিন চাকা ডাক দেন, কে জানে। রিকশাওয়ালা রিকশা নিয়ে কাছে আসতে, মুখ এগিয়ে নিয়ে তার মুখ দেখেন। উস্‌কো খুস্‌কো চুল কালো লোকটা দাঁত দেখিয়ে হাসে। বলে, 'ভালো আছেন বাবু?'

'তা আছি। তুই কে?'

'আমি তো লরোত্তম, বোলপুরের সাঁকোর ধাঁরে—।'

অচিনদা বলে ওঠেন, 'গদাধরের বিটা?'

'হুঁ হুঁ, চিনতে পাইরলেন?'

'তা পেরেছি। এখন চল্‌ তো।'

বলেই, সেই লাল লাল চোখে, ঘুরুন দিয়ে, আমার দিকে তাকান। হাত তুলে বলেন, 'ওঠো।'

যথা আজ্ঞা। এখানে পুছ্‌পাছ্‌ চলবে না জানি। রিকশায় উঠে বসি। লরোত্তম, অর্থাৎ নরোত্তম জিজ্ঞেস করে, 'কুথা যাবেন?'

'যমের বাড়ি।'

বলে রিকশায় উঠে নির্দেশ দেন, 'ঘুরিয়ে নে, খালের দিকে চল্‌।'

নরোত্তম হাসতে হাসতে গাড়ি ঘোরায় উত্তরে। উত্তর-পশ্চিমা হাওয়ার ঝাপটা খেয়ে চলতে থাকে। সে ঝাপটা মুখে এসে লাগতে মনে হয়, চামড়া চড়চড়িয়ে যায়। যেন ছুরি দিয়ে কাটে। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, কোথায় চলেছেন। কেবল যে ভরসা পাই না, তা-ই না। কৌতূহলের মজাটা মনে মনেই চাখি। দেখি, কোথায় গন্তব্য। কিন্তু একটি কথা না। অচিনদার দৃষ্টি সামনের দিকে। ভুরু দিয়ে যেন চোখ ঢাকা।

খালের সাঁকোতেই শেষ বাতি। তারপরে নিবিড় অন্ধকার। খালের জলের ধারা একবার চিকচিকিয়ে উঠতে না উঠতেই, রিকশা গড়িয়ে নেমে যায়, আর ঝনঝনিয়ে বাজে। শান্তিনিকেতনের পাকা মসৃণ রাস্তা আর নেই। এ সেই রাঢ় বীরভূমের খোয়াইয়ের বুক চিরে রাস্তা। যে রাস্তায় মাটি বালি কাঁকর পাথর ছড়ানো। পদে পদে উঁচু-নিচু। তিনটে মানুষকে নিয়েও যেন, রিকশাটাকে ধরে লোফালুফি নাচা-

নাচি করে।

আলোর সীমানা পেরিয়ে আসতেই, ঘুটঘুটে অন্ধকারের গ্রাসে যেন অন্ধ হয়ে যাই। সামনে, আশেপাশে, কিছুই চোখে পড়ে না। কেবল, দু'পাশের খোলা মাঠ থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ার ধারালো নখে ছিন্নভিন্ন হই। দাঁতে দাঁত চাপতে হয়। অথচ বয়স্ক প্রৌঢ় আমার পাশে বসে, স্থির নিশ্চল, কোনো বিকার টের পাই না।

জানি না, দু'পাশের এই খোলা তেপান্তরকে খোয়াই বলব কি না। কে জানে, কোপাই কত দূরে। মলুটির পথে দেখেছি, বর্ষার জলে ক্ষয়ে যাওয়া, কাঁকর ছড়ানো নদীখাতের নাম খোয়াই। যে-নদীখাতে বর্ষার পরে আর জল থাকে না। কেবল, দিকে দিকে, উঁচু-নিচু ছোট বড় কাঁকর ছড়ানো গিরিমালার মতো দিগন্ত বিস্তৃত। লাল তার রঙ, বৈরাগ্যের গেরুয়ার প্রলেপ লাগানো, আর বালির বিস্তৃতি। থেকে থেকে, হেথা হোথা, হঠাৎ জলের রেখা চিক চিক করে।

কোপাই, বর্ষাতে বড় ভয়ংকর শুনেছি। ভয়ংকরী না, সে-ই তার যৌবনের কাল। তার খোয়াইয়ের বিস্তৃতি যে কতদূর, কে জানে। রিকশা যে-ভাবে নেমে, লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, তাই ভাবি, এ হয়তো খোয়াইয়ের বুক চিরে রাস্তা। ডাইনে, বাঁয়ে, সবই শূন্য লাগে। কোথায় যে আকাশ নেমেছে, কোথায় এ বিস্তৃতির সীমা বুঝতে পারি না। কেবল, কুয়াশাহীন আকাশ দেখি, তারায় ভরা।

কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ অচিনদা চমকে উঠে বলেন, 'এহ্, বড় ভুল হয়ে গেছে, টর্চলাইট আনা হয়নি।'

নরোত্তম জিজ্ঞেস করে, 'যাবেন কুথা?'

'বাঁশ ঝাড়ে।'

শোনো এবার কথা! এ হচ্ছে, অচিনবাবুর কথা। আলোর সীমানা ফেলে এসে এই শীতের থাবায় আঁচড়ানো অন্ধকারে তেপান্তরে, এখন আওয়াজ দিচ্ছেন, গন্তব্য বাঁশঝাড়ে। কে জানে, সেই বাঁশঝাড় কোথায়, এ মুলুকের কোন্খানে। আমার মনটা যেন কেমন একটু উথালি-পাথালি করে। এবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, সে বেণুবন কোথায়, কেনই বা সেখানে?

নরোত্তম কিন্তু বেশ সহজেই আওয়াজ দেয়, 'অ! অই উইটা তো?'

বলে ডান হাত তুলে পুবদিকে দেখায়। তখন অন্ধকারে একটু নজর সরেছে, সয়ে এসেছে। তাকিয়ে মনে হলো, আকাশের নিচে, তেপান্তরের বুকে, দ্বীপের মতো কালো এক ঝুপ্সি। অন্ধকারের বুকে, আর এক প্রস্থ যেন কালো পোছড়া। আর কিছু যখন চোখে পড়ে না, তখন ওটাই বোধহয় বাঁশঝাড়।

অচিনদা বলেন, 'হ্যাঁ, ওটাই। কিন্তু এত অন্ধকারে তো অসুবিধা হবে। তুই দাঁড়া নরোত্তম, আর যাসনে। এখান থেকেই হাঁটতে হবে।'

নরোত্তম রিকশা দাঁড় করায়। কাছে-পিঠে কোথাও একটা আলো নেই। ছাতিম-তলার মেলার যাত্রীও চোখে পড়ে না এ-পথে। তার ওপরে, এই মাঠের বুকে, অন্ধকার বাঁশঝাড়ে গমন, ই কী কথা হে!

নরোত্তম রিকশা থেকে নেমে বলে, 'এক কাজ কইরতে পারি বাবু। আমার গাড়ির বাতিটা লিয়ে, আপনাদের পথ দেখিয়ে লিয়ে যাই। না হলে, যেতে লারবেন।'

অচিনদা তৎক্ষণাৎ আওয়াজ দেন, 'ঠিক বলেছিস। তোর গাড়ির বাতিটাই খোল্। তাছাড়া তুই-ই আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবি, তোকে থাকতেও হবে। কিন্তু তোর রিকশা রাখবি কোথায়!'

'সে হবে বাবু, রাস্তার ধারে নামিয়ে রেখে দিচ্ছি। গরুর গাড়ি-টাড়ি এসে পড়তে পারে।'

'কিন্তু গাড়ি চুরি করবে না তো কেউ?'

নরোত্তম হাসে। বলে, 'না বাবু। এখান থেকে আর রিকশা কে চুরি করবে।'

বাতিটা খুলে সে অচিনদার হাতে দেয়, বলে, 'বাতিটা একটু ধরেন বাবু, গাড়িটা নামাই।'

বাতি তো না, একটু লালের আভাস মাত্র। তাও, বাতাসে তিরতির করে। তবে কি না, এ ঘোর আঁধারে, তাও একটু-আধটু, খাল রাস্তা দেখা যায়। উঁচু-নিচু মালুম দেয়। নরোত্তম-রিকশাটা রাস্তার ধারে, একটা গর্তের মতো জায়গায় নামিয়ে দেয়। অচিনদা বাতি হাতে, রাস্তা থেকে নামতে নামতে, একবার আমার দিকে ফিরে তাকান। তখন সেই অসুরের মতো বিকট ভাব নেই বটে, তবে গম্ভীর। কিন্তু চোখে যেন একটু রহস্যের ঝিকিমিকি। ডাক দেন, 'এসো হে। সাবধানে এসো, পড়ে-টড়ে যেও না, ঢালু আছে।'

সেটা লক্ষ্য করেছি। সাবধান না হয়েও উপায় নেই। পড়লে যে কোমল ধরিত্রীর বুকে পড়ব, সে আশা নেই। পদক্ষেপেই জানা যাচ্ছে, কাঁকরে পাথরে, এ মৃত্তিকা বড় কঠিন। নরোত্তম রিকশা রেখে অচিনদার হাত থেকে আলোটা নিয়ে, আগে আগে যায়। অচিনদা আমার পাশে পাশে। পথ বলে ঠিক কিছু আছে বলে মনে হয় না। উঁচু-নিচু ঢেউ খেলানো পাথুরে মাটির এখানে ওখানে ঘাস গজানো। তার মাঝখানে, পায়ে চলা পথের একটা চিহ্ন চোখে পড়ে।

অচিনদার মুখের দিকে বারেক তাকাই। বিশেষ কিছু দেখা যায় না। শেষ পর্যন্ত যেন আমি না, আমার ভিতর থেকে অন্য কেউ জিজ্ঞেস করে ওঠে, 'আমরা ওই বাঁশঝাড়ে যাচ্ছি, না?'

'হ্যাঁ।'

ছোট জবাব। তবু জিজ্ঞেস করি, 'কিন্তু এখানে এ সময়ে—?'

কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে ওঠেন, 'ভয় হচ্ছে?'

'না, তা নয়, তবে এই অন্ধকারে, লোকজন কেউ নেই, তা-ই।'

'দেখা যাক, কী আছে না আছে। গেলেই দেখতে পাবে।'

অতএব, কথা থাক, চলো অন্ধকারের পাথার পারে। অচিনদার এক হাতে সেই ঝোলা। গায়ে ভারী পশমী চাদর। তবু, চলেন যেন অনায়াসে। শীতের হাওয়া কিছু না, উঁচু-নিচু আর একটি ক্ষীণ লাল বলয়ের আলো তাতেই বেশ স্বচ্ছন্দ। আবার পরিষ্কার কথায়, নিচু স্বরে গান ভাঁজেন, 'চোরা যায় চুরি করতে গায়ে দিয়ে প্রেমাবলী।' প্রেমাবলী সম্ভবত নামাবলীর ফের। গুনগুন করতে করতে, হঠাৎ থেমে বলেন, 'এদের কী বলে জানো তো?'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কাদের বলুন তো?'

প্রায় খেঁকিয়ে বলেন, 'বুঝলে না? ওই যে সব চোরারা প্রেমাবলী গায়ে দিয়ে চুরি করতে যায়। এদের বলে, শঠ, প্রবঞ্চক।'

এখন এই শীতের দারুণ পথে, প্রেমাবলী গায়ে দেওয়া চোরের ভাবনা তেমন মনে আসে না। তবু সায় দিয়ে বলি, 'তা ঠিক।'

'তা ঠিক মানে?' আবার সেই হুমকোনি, 'তা ঠিক মানে কী। তুমিও তো তা-ই।'

'আমি?'

'নয়?'

অন্ধকারেও টের পাই তিনি আমার দিকে ফিরে চান। বলেন, 'প্রেম না জেনে প্রেমের হাটের বুলবুলো! তুমি কী রকম লেখক।'

খেয়াল করতে সময় পাই না, এ গানের কলি কোথায় যেন শোনা ছিল। তবু না

জেনে বুলি দিয়েছি কোথায়, জানি না। ছাতিমতলার এই সীমানায়, আমি তো লেখকের পরিচয়ে চলি না। তার ওপরে রকম কেমন, কবে বা তা জানতে পেরেছি।'

অচিনবাবু থামেন না। বলেন, 'অত করে বললাম তোমাকে তখন। তবু জেনেশুনে মেয়েটাকে কষ্ট দিলে।'

'কষ্ট?'

'না, খুব আনন্দ দিয়েছ, তাই ফরফরিয়ে চলে গেল। আমার সঙ্গে না আসতে চাইলে তোমার কী হতো?'

তাড়াতাড়ি বলি, 'না, আসলে আমি—।'

'আরে দূর তোমার আসল। তোমার আসল-নকল রাখো। তুমি ওদের সঙ্গেই থাকলে না কেন?'

'সে কথাটা ভাবিইনি।'

'চমৎকার। এত দেখেশুনেও ভাবতে পারলে না!'

প্রায় অসহায়ের মতো অচিনদার দিকে ফিরে তাকাই। তাঁর অবয়বটাই শুধু দেখতে পাই। মুখের ভাব দেখতে পাই না। কথা মনে আসে অথচ বলতে পারি না।

অচিনদাই আবার বলেন, 'এ কি তোমার নীতিবাগীশ মনের বিচার নাকি?'

মনে মনে বলি, তা-ই যদি হয় দোষ কোথায়? পথ চলার নীতি না হয় না থাকুক। সংসারের নিজেরও তো কিছু নীতি আছে। তাকে লঙ্ঘন করি কেমন করে।

নিজের কথার জবাব তিনি নিজেই দেন, 'তা-ই যদি বলো তোমার থেকে ওর নীতিবোধ কম নাকি!'

সে কথা ভাবতে দ্বিধা লাগে। ঝিনি যে সমাজ পরিবার পরিবেশের মেয়ে, সেখানে নীতিবোধ কমের কথা নেই। তার ওপরে ঝিনির নিজের একটা পরিচয় আছে। বলি, 'সেটা কী করে বলি বলুন।'

অচিনদা বলেন, 'তা যদি বলো, তা-ই বা মানব কেন, বলতে পারো?'

হঠাৎ যেন অচিনদার গলার ঝাঁজ চলে যায়। এই খোয়াইয়ের বুকে, অন্ধকারের পাথারে, আকাশের নিচে তাঁর গলায় বাজে যেন এক নৈরাশ্যের বিধুরতা। বলেন, 'মন বলে কি কিছু নেই?'

বলি, 'নিশ্চয়ই আছে।'

মনে মনে বলি, মন আছে চিরন্তনে। কিন্তু অচিনদা যেন আমার কথা শোনেন না, নিজের কথারই খেই টেনে চলেন। বলেন, 'তোমরা কী বলো, ভাবো, সব হয়তো জানি না। কিন্তু নীতি দিয়ে কোনোদিন ব্রজের বাঁশী থামানো যায়নি। যার মন নিয়ে যমুনার জল উজানে গিয়েছে, তাও কখনো থামানো যায়নি। নীতি দুর্নীতি পাপ সব সেখানে তুচ্ছ।'

অবাক অসহায় হয়ে বলি, 'আর সমাজ-সংসার!'

অচিনদা হঠাৎ আমার কাঁধে হাত রেখে বলেন, 'তার মধ্যেই সে নিত্যকালে বহে। সমাজ-সংসারকে বাদ দিতে চেয়েছে কে! সমাজ-সংসার আছে বলে কি আর সব বাদ! যমুনা কি আকাশে না মাটিতে? আর এ কথাই বা ভাবলে কেন, ঝিনির মতো মেয়ে সমাজ-সংসার ভুলে যাবে। ওর কি কোনো রুচি নেই, বোধবুদ্ধি নেই!'

কিন্তু অচিনদা কেন এমন করে বলেন। জীবনের অনেকখানি যিনি দেখেছেন, যাঁকে দেখে মনে হয়েছে, মুখের হিজিবিজি রেখায় এ সংসারের অনেক নিষ্ঠুর আঁচড় লেগেছে, যাঁর চোখের ওপারে হাসিকে দেখেছি যেন কাঁদন ভরা, তিনি কেন এমন করে বলেন। বলি, 'কিন্তু অচিনদা—।'

অচিনদা বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, 'ভয় পাও, না? পাছে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ো,

তা-ই না?'

এ কথার জবাব দিতে পারি না হঠাৎ। হয়তো নানা আলো-আঁধারে সে-ই আমার ভাবনা। অচিনদা নিজেই বলেন, 'সেটাও তোমার ভুল। ওকে চিনতে পারনি বলে ভয় পেয়েছ। মেয়েটার মধ্যে কোথায় একটা গোলকধাঁধার যন্ত্রণা আছে। হয়তো চাঁদের মতো অনেক দাগও আছে। কিন্তু বেঁধে অপমান করার মতো মন আর রুচি নয়, এটুকু জানি।'

বলতে বলতে আমাকে আর একটু নিবিড় করে জড়িয়ে বলেন, 'ওকে যদি একটু কাছে আসতে দাও, প্রীতির লেন-দেন করো, ঠকবে না, বুঝলে। আমাকে ভুল বোঝার কোনো কারণ নেই তোমার।'

আমি অবাক নির্বাক হয়ে অচিনদার দিকে তাকাই। অচিনদা হঠাৎ আমার কানের কাছে মুখ এনে যেন চুপি চুপি বলেন, 'জেনো, নারী নর সকলেরই একটাই মন, রূপে আলাদা। কিন্তু তাকে ছোট করে দেখো না। হয়তো দেখবে অলকাও তোমাকে কোনো মন্ত্র দিয়ে যাবে, একদিন সে তোমার কাছে গুরুর মতো জেগে উঠবে। তোমার তো অজানা থাকবার কথা নয়, "ও তোর অথিক গুরু পথিক গুরু গুরু অগণন।"[১] ওকে শুধু শুধু কষ্ট দিও না।'

অচিনদা চুপ করে যান। আমি যেন কেমন আবিষ্ট হয়ে পড়ি। অচিনদার কথাগুলো যেন আর কথা নয় কেবল। তার মধ্যে এই সংসারের সীমায় বসে যে অসীমে মন দোলা চলা করে, সেখানকার বার্তা বহে আনে। এখন অচিনদা আমার কাছ থেকে একটু সরে চলেন। আর গুনগুনিয়ে বাজেন, 'ও মন, ফিরি করে যা আপনারে। নগদ হিসাব পরে করিস, ধ্যানের হিসাব কর না রে।'...

শুনি আর মন যেন কোন্ অলক্ষ্যের স্রোতে ভেসে যায়। তবু বারে বারে ঠেক খায় এই পথ চলাতে। কিসের সন্ধানে ফিরি জানি না। কিন্তু অন্ধকারের সীমায় যেতে চাই না এইটুকু জানি।

এই সময়ে সহসা বাঁশঝাড়ের ফাঁকে যেন আলোর বিন্দু দেখতে পাই। আর তারই সঙ্গে মানুষের অস্পষ্ট গলা। সামনে তাকিয়ে দেখি, বাঁশঝাড়ের মাটি ঢিবির মতো উঁচুতে উঠে গিয়েছে।

বাঁশঝাড়ের মাটি যেখানে ঢিবির মতো উঁচুতে উঠে গিয়েছে, নরোত্তম বাতি হাতে, সেই উঁচুতেই আরোহণ করে। আলোর ইশারা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। গলার স্বর আরো স্পষ্ট। অচিনদা আমার হাত টেনে ধরেন। একটু বাঁক নিয়ে ওপরে উঠতেই দেখি, জয় ভোলা মন! একেবারে তকতকে উঠোনের মতো পরিষ্কার জায়গা। চারদিকেতে বাঁশঝাড়ের ঘেরাও। মাঝখানে লাল মাটির পরিচ্ছন্ন বিস্তৃতি। ঝাড় ঘেঁষে, একদিকে এক পাতার ঘর। এর নামই বোধ হয় ঝোপড়ি। তার সামনে কিছু হাঁড়ি কলসী, একেই বলে কেঁড়ে। এক জায়গায় এক টিমটিমে লণ্ঠন, আর এক জায়গায় কেরোসিনের লম্ফ। মাঝখানে কাঠকুটোর স্বল্প আগুনের শিখা। তারই থরথরানো আলোয় যাদের কিম্ভূত ছায়া কাঁপে, তাদের সকলের সামনেই একটি করে কেঁড়ে। হাতে একটি করে মাটির ভাঁড়। গন্ধে যদি পেট ঘুলিয়ে ওঠে, তা হলেও জানবে, হেথায় রসের আসর জমেছে। বিলিতি কথায় সেই কী যেন বলে, 'পাব' না আর কিছু, এও সেই প্রকারের যেন। রাস্তা থেকে খোয়াইয়ের মাঠ পেরিয়ে বাঁশঝাড়েতে পানশালা। তবে কি না এমন আর জন্মে দেখিনি। কেবল যে অবাক মানি, তা না। একটু অচিন অজানার, আঁধার রাতের শিউরোনি লাগে। ই কুথা লিয়ে এলেন গ অচিনদা। পরিচয়টা এখনো যে পিছনে ফেলে আসা ভদ্দরলোকের ছেলে। প্রাণটি অটুট নিয়ে ফেরা হবে তো।

আমরা গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই, অভ্যর্থনার উল্লাস বেজে ওঠে। বরহম

দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে উঠে, হাত বাড়িয়ে বলে, 'এস্যাছিস্?'

অচিনদা খেঁকিয়ে বলেন, 'তুই কি ভেবেছিলি আসব না?'

'হুঁ হুঁ, তু কি মিছা বুইলবি? ত, ক্যানে রাস্তা থেকে হাঁক দিলি না। বাতি দিয়ে যেতাম।'

অচিনদা সকলের মুখের দিকে দেখতে দেখতে বলেন, 'হ্যাঁ, তাড়ি গিলে সব ভোম্ হয়ে বসে আছ, আমি অন্দুর থেকে চেঁচিয়ে মরব, কেউ শুনতেও পাবে না। ওটা কে রে, শরত না?'

অমনি মাঝবয়সী সাঁওতাল একজন দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'হুঁরে, চিনতে পারলি?'

'তুই চিনতে পারলি?'

অচিনদার কথা শুনে সবাই হাসে। শরত তার পাশের কালো স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়ে বলে, 'আর একে?'

স্ত্রীলোকটির বয়স অনুমান করা একটু শক্ত। লণ্ঠন লম্ফ আলোয় দেখি, শীতের বালাই নেই। একটি মাত্র সুতি জামায় আর মোটা শাড়িতে কালো শক্ত পুষ্ট শরীর। হাতে রসের ভাঁড়। চকচকে চোখে একটু লজ্জা লজ্জা ভাবের হাসি। অচিনদার দিকেই চেয়ে আছে।

অচিনদা বলেন, 'তোর বউ তো।'

সে জবাব কেউ দেয় না। সবাই মিলে হাসাহাসি করে। তার মানে বুঝতে হবে, ঠিক বলা হয়েছে। হাসির মানে এই না যে, ভুল হয়েছে। এ মানুষদের হালচালের ধরতাই একটু ভিন্ রকমের। অতএব বরহমও তার মেলায় দেখা বউটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তবে ইটো কে বল্ দেখি?'

অচিনদা বলেন, 'তোর মুণ্ডু।'

সকলেই হেসে বাজে। কেবল যে এই দু' জোড়া, তা না। জোড়াবিহীনও জনা চারেক আছে। তাছাড়া আছে বুড়ো শুণ্ডি নিজে, পানশালার মালিক। কেবল একজনের জুটি কে, বুঝতে পারি না। যে বসে আছে বুড়ো শুণ্ডির কাছ ঘেঁষে। এ সেই কষ্টিপাথরে কাটা কালো যুবতী। মনে তো হয়, বুঝি সাঁওতালনীই হবে। এ যে কালোতে আলো, তা না। কালোতে আগুন। আগুন তার লাল ফুলফুল জামায়। যেথায় বুকের ঔদ্ধত্যকে সামনে দিয়ে বাঁক নিয়ে বসেছে মন্দিরের মূর্তির ভঙ্গিমায়। এক হাতে কলসীর গলা জড়িয়ে ধরে, যেন বড় আদরে তুলে নিয়েছে বাঁ উরুতের ওপর। ডান পা ছড়ানো। চুলে বাঁধন আছে, তবু কপালের এক পাশে ভেঙে পড়েছে। লম্ফর লাল আলোয় মনে হয়, টানা চোখে তরল আগুনের স্রোত বহে যায়। ডান হাতের ভাঁড়ে চুমুক দেয়, আর ফিক্-ফিক্ হাসে। এমন আসর আর কখনো দেখিনি।

সকলেরই একটু টলমল ঢুলুঢুলু ভাব। সবাই হাসে। সবাই অচিনদাকেই বেশী দেখে। কিন্তু ভাবি, অচিন্ত্য মজুমদার এই আসরে আসেন কেমন করে। এ মানুষের কি স্থান কাল পাত্র বলে কিছু নেই! সমাজের প্রতিষ্ঠার, বিত্তের যে সীমা থেকে তাঁর আবির্ভাব, সেই সীমার পথ কি এমন আশ্চর্য বাঁশঝাড়ে এসে ঠেকে!

বুড়ো শুণ্ডি উঠে বলে, 'এস গ অচিনবাবু, আলোর কাছে এসে বসো।'

অচিনদা সেদিকে এগোতে এগোতে বলেন, 'আসব তো, আমার জিনিস রেখেছ?'

বুড়ো ফোঁকলা দাঁতে হেসে বলে, 'তা আর না রাখি। বরহম এসে বুইললে, তুমি আসছ। পুরো এক কলসী রেখে দিয়েছি।'

সর্বনাশ, অচিনদাও কি এখন এই আসরে, রসের কেঁড়ে নিয়ে বসবেন। তাহলে আমি কোথায় যাই। এখন বলতে ইচ্ছা করে—আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায়

চড়তাম না। কেন, তখন যে বড় সাধ হয়েছিল, বরহমের আস্তানায় যাবো। অচিনদার সঙ্গে। এখন এত হাঁসফাঁস আঁকুপাকু কিসের!'

অচিনদা বলেন, 'ভালো জিনিস তো?'

বুড়ো বলে, 'খারাপ কোনোদিন দিয়েছি? তুমি হলে পুরনো লোক।'

শোনো কথা। এর পরেও তুমি ভাববে, এ লোক বিলাতী গাড়িতে বেড়ায়। মাইনের কথায় লোকে বলে, তিন হাজারি মনসবদার! বাঁশঝাড়ের বুড়ো শুণ্ডি বলে কিনা পুরনো লোক। কত পুরনো! সেই পড়ুয়া বেলা থেকে নাকি। অচিনদা গিয়ে তার পাশ ঘেঁষে বসতেই বরহম শরতরাও এগিয়ে যায়। বউয়েরাও বাদ যায় না। বউ কলসী ভাঁড়, সব নিয়ে অচিনদাকে ঘিরে বসে। শুণ্ডি একটা কলসী এগিয়ে দেয় অচিনদার দিকে। আর আমি যেন এক হারিয়ে যাওয়া ছেলে। কার কাছে কোথায় যাই ভেবে পাই না।

বরহম তাড়া দেয়, 'কই, আমাদিগের পাওনাটো দে।'

অচিনদা বলেন, 'দিচ্ছি রে দিচ্ছি।'

বলে এবার আমার দিকে ফিরে ডাকেন, 'কই হে, এসো, তুমি যে অচেনা লোকের মতো দূরে দাঁড়িয়ে রইলে।'

বরহমই তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে আমাকে ডাকে, 'হ্ঁ হ্ঁ, আয় না রে ছোকরা বাবু, বিটিছাওয়ালের মতো দূরে দাঁড়িয়ে রইলি ক্যানে।'

মুরগী যেমন ভয়ে ভয়ে পা ফেলে এগোয়, তেমনি ত্রাসে ত্রাসে এগিয়ে যাই। জবাইয়ের ছুরি যেন পাশে ঝিলিক হানে। বরহমই জিজ্ঞেস করে, 'ইটো কে?'

আমার কথাই বলে। অচিনদা বলেন, 'বন্ধু।'

শরত বলে, 'ছোকরা বন্ধু ধরেছিস্।'

'হ্যাঁ, নষ্ট করব বলে।'

কথা শুনে, আমিই লাজিয়ে যাই। বাকীরা হাসে। বরহম তার ওপরে তাল দেয়, বিটা ছেলেকে আর তুই কি লষ্ট কইরবি। উয়াদের লষ্ট করবে বিটিছেলে।'

'চুপ কর।' ধমকের সুরে বাজেন অচিনদা। বলেন, 'খালি ওই এক নষ্টই শিখেছ, না? কই হে, বসো না আমার কাছে।'

বরহমই সরে গিয়ে জায়গা করে দিয়ে বলে, 'হ্ঁ হ্ঁ বস।'

অগত্যা, তবু একবার বলি, 'এখানেই, মানে—।'

অচিনদার এখন অন্য রূপ। প্রায় ধমকে ওঠেন, 'তবে কি অন্ধকার মাঠে গিয়ে বসবে? কেন, বরহমদের আড্ডায় আসতে চেয়েছিলে তো, এসো। আড্ডায় বসো। এবার বুঝতে পারছ তো, মেয়েদের কেন নিয়ে আসা যায়নি। ব্যাপারটা তো জানে না, খালি যাবো যাবো করে।'

তা বটে, মেয়ে তো দূরের কথা। জলজ্যান্ত ছেলে হয়ে, আমার বায়ু জন্মে যাচ্ছে। মেয়েদেরও নিয়ে আসার ভূত যে ওঁর মাথায় চাপেনি, তাই অনেক ভাগ্য। অচিনদার চোখের দিকে আর একবার তাকাই। চোখে একটু ইশারা করে পাশে ডাকেন। সেই ইশারায় ভরসা দিয়ে ঠোঁটের কোণে একটু হাসেন। ধুলার কথা ভাবতে গেলে চলে না। এখানে বাঁশঝাড়ের এই পানশালায় লাল ধুলাতেই ধুলোট জমেছে। অতএব, যতটা সম্ভব অচিনদার গা ঘেঁষে বসি। তবু গোটা দিনের পরিচয়। বাকীরা তো এই মুহূর্তের। অচিনদা রাখলে আছি, নইলে গিয়েছি। এখন তো আর একলা পারানির কোনো কথা নেই। আমার প্রাণের ভাঙা নৌকার মাঝি এখন অচিনদা।

অচিনদা জিজ্ঞেস করেন, 'লোক বড় কম লাগছে। আর কেউ নেই?'

জোড়া-হীন চারজনও কাছে এসে বসেছে। বরহম বলে, 'তুই আসবি, কেউ জানে

নাই তো কী হবে। আর দু'-চারজন আছে ইদিক-উদিক।'

অচিনদা বলেন, 'তা, তাদেরও ডাক, আর বাকী থাকে কেন। আর ইটি কে, চিনতে পারছি না তো?'

বুড়ো শুণ্ডির অন্য পাশে আগুন-কালো মেয়েটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন। শুনে আবার সবাই হাসে। যেন হেসেই আছে, কারণ বোঝো বা না বোঝো—কারণ আছে বইকি। অকারণে এত হাসি, কারণের কারণেই। রক্তে যে কারণদেবীর খেলা। অচিনদার কথা শুনে কালো মেয়েটিও হাসে। শব্দ তার অল্পই, শরীর কাঁপে বেশী। চোখে যেন চিকুর হানাহানি, অবিশ্যি হাসিতে।

বরহমের বউ জবাব দেয়, 'চিনতে লারলি? ই তো মাংরি রে, আমার বিটি।'

'অ!'

বরহম তাড়াতাড়ি ঘাড় দুলিয়ে জানায়, 'হ্‌'য় হ্‌'য় হ্‌'য়।'

অচিনদা জিজ্ঞেস করেন, 'জামাই কোথায়? বিয়ে হয়েছে তো?'

বরহম হাত ছুঁড়ে বলে, 'সি কুথা যেইয়ে বসে রয়েছে, গোসা হয়েছে।'

স্বামী রাগ করে কোথায় গিয়ে বসে আছেন, গিন্নি এখানে রসের কলসী কোলে নিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে বসে আছেন। মাটির ভাঁড়ে ঢালছেন, ঢুকুঢুকু খাচ্ছেন। এ সব রীতি বুঝতে যেও না। হেথায় গোঁসা-পীরিতের রঙ-রীতি আলাদা। মাংরির দিকে চেয়ে দেখি একবার। মুখ ফিরিয়ে ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছে। দিয়ে বার-কয়েক ঢোক গেলে। গিলতে গিলতে ভাঁড় এগিয়ে দিয়ে বলে, 'আমাকে টুকুস দে বাবু।'

অচিনদা বলেন, 'দেবো দেবো। তারপরে আবার মারামারি দাঙ্গা বাধিয়ে দিস না বাপু।'

বলে অচিনদা তাঁর ঝোলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একেবারে লেবেল-আঁটা বোতল বের করেন। অমনি কার কার যেন জিবে ঝোল টানার শব্দ বাজে। শুনতে পাই, কে যেন বলে, 'বেলাতি।'

রহস্য এবার একটু একটু পরিষ্কার হয়। আসল উৎসবের উপকরণ তা' হলে এ-ই! এক না, দুই দুই বোতল বেরোয় ঝোলা থেকে। যেন ঝাঁপি থেকে দু'-দুটো কালনাগ ফণা তুলে ওঠে। অবাক হয়ে অচিনদার দিকে তাকাই। অচিনদা বলেন, 'কী হে ভায়া, খুব খারাপ লাগছে তো এবার?'

খারাপ-ভালো বিচারের অবকাশ কোথায়। তার আগে যে মন আর চোখ ধাঁধিয়ে যায়। পথচলার এই সবুর বিহনে এমন বিচিত্র তো আর দেখিনি। বলি, 'খুব অবাক লাগছে।'

'এইসব দেখে তো?'

'এ সবের থেকে আপনাকে দেখেই বেশী।'

'নীতিবাগীশের মতো একথা ভাবছ না তো, অচিনদার মতো লোক টাকা দিয়ে এ লোকগুলোকে অন্য কিছু না দিয়ে এ সব খাওয়াচ্ছে?'

ভাবিনি। ওঁর কথা শুনে ভাবতে ইচ্ছা করে। যদি ভাবি, তার মধ্যে নীতি-বাগীশতার কথাই বা আসবে কেন। যে কথা উনি বলেন, সে কথাটাই তো আগে মনে আসে। বোতলের মুখ খুলতে খুলতে নিজেই আবার বলেন, 'আমার বন্ধু বান্ধবরাও দু'-চারজন এ রকম বলেন কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি।'

জবাবটা ঠিক আসে না, চুপ করে থাকি। অচিনদা নিজেই একটু হেসে বলেন, 'তা যদি মনে হয় তোমাকে দোষ দেবো না ভায়া। শুধু ক্ষমা চাইব।'

অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি বলি, 'না না, ক্ষমা চাইবেন কেন।'

'নিজের এই প্রকৃতির জন্যে। এর চেয়ে ভালো আর হতে পারলাম না। এ সবের

ওপরে আর যেতে পারলাম না। সংসারে কিছু কিছু অন্যায় আছে, যেগুলোকে একটু ক্ষমাঘেন্না করে চলতে হয়, সেই রকমই করো। কিন্তু এখন এই যে বছরে একবার আসি, ওদের সঙ্গে একটা রাত্রে খানিকক্ষণ থাকি, তখন আর মেঠাই-মন্ডার কথা মনে থাকে না। ওরাও আমার কাছে তা চায় না। একদা এই বাঁশঝাড়ে ওদের কাছে হাতেখড়ি হয়েছিল, এখনো ওদের কাছেই একটা দিনের এক সময়ে এখানে আসি।'...

অচিনদা কথা বলেন, আর তাঁর হিজিবিজি গোরা মুখের ছাঁদ যেন বদলাতে থাকে। যেন নিজের মধ্যে নিজেই ডুবে যান। সেই রূপকথা বলার স্বপ্ন যেন অন্য রূপে দেখা দেয়। আমার কথা ফুরিয়ে যায়। আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে ভুলে যাই।

কথা থামিয়ে অচিনদা বোতল থেকে সবাইকে একটু একটু ঢেলে দেন। সবাই মাটির ভাঁড় এগিয়ে ধরে। এমন কি বুড়ো শুন্ডি আর বরহমের মেয়ে মাংরিও। অচিনদা হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলেন, 'নাও হে, একটা পাত্র নাও।'

অবাক চমকে বলি, 'আমি?'

'নয় কেন? এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে?'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই বরহম চেঁচিয়ে ওঠে, 'হঁয় হঁয়, আজ খেতে হয়। ই কি যে সে দব্য?'

সঙ্গে সঙ্গে মাংরি একটা মাটির ভাঁড়, আলগোছে ছুঁড়ে দেয় আমার কোলের ওপর। এ কি বিপদ দেখ হে। বিদেশ-বিভূঁই, অচিন অজানা, খোয়াইয়ের মাঠের ধারে বাঁশঝাড়ে খোয়ার দেখে যাও। যাতে পৃথক ফল না হয় তার জন্যে এখানেই বেতাল বেহুঁশ হয়ে থাকে। প্রায় করুণ আর্ত চোখে অচিনদার দিকে তাকাই।

অচিনদা পরম স্নেহে হাসেন। বলেন, 'ভয় লাগছে? আচ্ছা, তা' হলে থাক্।'

বলেই হাঁক দেন, 'কই রে, নরোত্তম কোথা গেলি?'

একেবারে পিছন থেকে উদ্বেগ-ব্যাকুল গলা যেন কঁকিয়ে ওঠে, 'না না, উটি লারব বাবু। উ আমি খেতে লারব।'

অবাক হয়ে ফিরে দেখি, সত্যি সত্যি জোয়ান ছোঁড়া কালনাগ দেখছে যেন। এ যে দেখি আমার থেকেও এককাঠি সরেস। চোখ জুড়ে ভয়, ঘন ঘন হাত নাড়ে। আমি মনে মনে ভাবি, আহা থাক না বেচারা। এ সবে অরুচি, ভয়-ডর পায় যখন, থাক।

বুড়ো শুন্ডি ভুরু কুঁচকে বলে, 'ক্যানে রে, আঁ? তুই না একা বইসে এক লাগাড়ে দু' কলসী খাস?'

নরোত্তম ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, 'তা হক, উ বেলাতি আমি খেতে লারব, গা ঘুলায়।'

এবার বোঝো ভয় কোথায়! আমি ভাবি ছেলেমানুষ, ও-সব শেখে-টেখেনি। আসলে উঁয়ার বেলাতিতে ভয়। মূলে উনি এক ঠাঁইয়েতেই দু' কলসীর খদ্দের।

অচিনদা বলেন, 'তুমি একেবারে খাঁটি দিশি দেখছি, এতে তোমার গা ঘুলোয়।' বলেই প্রায় হুমকে ওঠেন, 'নিয়ে আয় একটা পাত্র।'

কাকে বলেন গ! তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'মাইরি বইলছি বাবু, হাত জোড় করে বইলছি, উ আমার হবে না।'

সত্যি প্রায় আতঙ্কে জোয়ানের চোখ ছলছল। এর থেকে আর বেচারি কেউ হয় না। এখন আবার মনে হয়, আহা, থাক না বেচারা। ময়ালের গ্রাস ভালো, তবু কেউটের ছোবল সইবে না। ভাবটা প্রায় সেই রকমেরই। দেখে মনে হয়, আর বেশী বললে দৌড় মারবে। সেটা কোনোদিক থেকেই সুবিধার হবে না। অচিনদাও সেটাই অনুমান করেন বোধ হয়। তা হলে বহুদূর হাঁটতে হবে। অতএব, অচিনদার শেষ বক্তব্য, 'ব্যাটা, তোর দ্বারা কিস্সু হবে না। তবে তাড়ি খেয়েই মরো গে।'

এবার নরোত্তমের মুখে একটু স্বস্তির হাসি দেখা দেয়। বড় শান্তি বোধ করছে। অচিনদা একবার আমার দিকে চেয়ে ঠোঁটের কোণে হাসেন।

বুড়ো শুণ্ডি অচিনদাকে বলে, 'তুমি লিলে না?'

'হবে হবে, আমার দ্রব্য তো তুমিই রেখেছ। তোমরা খাও।'

সবাই এক এক চুমুকে রেচকের ঝাঁঝালো কাঁচা পানীয় গলায় ঢেলে দেয়। ধরহম চাপা শব্দ করে 'আহ্!' আর শরতের বউ গিলেই মুখে কাপড় চেপে ধরে। সকলেরই বেশ ঝাঁজ লেগেছে বোঝা যায়। সকলেই একটু-আধটু শব্দ করে, মুখ কোঁচকায়। বুড়ো শুণ্ডি বলে, 'বড় মজার জিনিস।' মাংরি ঘনঘন ঢোক গিলছে, যেন তার মুখ রসে ভেসে যাচ্ছে। এবার রেচকের কাঁচা আরক, বোতলটা তুলে ধরে অচিনদাও গলায় ঢেলে দেন। প্রৌঢ় মানুষটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। কী আশ্চর্য, কোথায় এসে কোথায় বসে কী করছেন। এখনো এত ধকল সয়?

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলেন, 'রাগ করছ না তো ভায়া?'

জবাব দিতে যাই, তার আগেই বলেন, 'আমার এক বন্ধু বলে, "অচিন বছরে একবার আসো, তা তোমার এসব সাঙ্গপাঙ্গদের একদিন বেশ করে মাংস-ভাত খাইয়ে দিলেই পারো। এ সব কেন?"'

কথা শুনতে খুল ভালো, কিন্তু কী জবাব দেবো, বুঝতে পারি না। যেন বলতে চায়, 'ভালো করতে পারি না মন্দ করতে পারি, কী দিবি তা দে।' সেটাই আমার কলঙ্ক। ওদের সারা বছরের একটা দিনের কয়েক ঘণ্টা কী মন্দ করতে পারি। বাড়ি-ঘরদোর পুজো-পার্বণের ব্যাপার নয় যে বসিয়ে খাওয়াব। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে একটু আড্ডা দিয়ে যাওয়া। তা এদের সঙ্গে তো ব্রিজ খেলে কফি খেয়ে আড্ডা দেবার অর্থ হয় না। যার যাতে মৌজ, তা' ছাড়া নিজের কথাটাই মনে রাখতে হবে তো। যেমন রামকেষ্ট ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন, 'বাবা, যা খাচ্ছ তারই ঢেকুর তুলছ?' তার মানে বঙ্কিমচন্দ্রের খাবারে গরহজম। যা ভাবেন তাই ওগরান। আমার রামকেষ্ট বন্ধুদেরও সেই কথাই বলি, 'আমি যা আমি তা-ই। নিজেকে আর হজম করতে পারলাম কই।' সত্যি, আপন নিয়ে এমনভাবে কাল কেটে গেল। পরের কথা আর ভাবতে পারলাম না।'...

অন্য দিকে বরহমরা হাত বাড়ায়, 'দে বাবু।'

'হ্যাঁ, এই যে।'

বলে অচিনদা আবার জনে জনে ঢেলে দেন। আমি দেখি হিজিবিজি গোরা মুখে সেই স্বপ্নের ভর। তবে, কেবল যেন রূপকথার না। এই স্বপ্নের ঘোরে যেন কী এক সুর বেজে যায়। সবাইকে দিয়ে আবার নিজের গলায় ঢালেন। তারপরে বলেন, 'বিভূতি বাঁড়ুজ্জের আরণ্যক পড়েছ?'

'পড়েছি।'

'তা হলে জানো, এক জায়গায় লেখক আক্ষেপ করছেন, নিবিড় অরণ্য কেটে সেখানে কয়েক বিঘা ফসল বোনা দেখে। বলতে চেয়েছেন, এই অরণ্যের শরীর কেটে এই ফসলটুকু না ফলালে মানুষের এমন কী ক্ষতি হতো। প্রথম যখন পড়েছিলাম, ভেবেছিলাম আন্‌সায়েন্টিফিক। খুবই অবৈজ্ঞানিক উক্তি। এখন কিন্তু ভাবি, প্রেমে কী না হয়। অরণ্যে যাঁর প্রেম, তিনি তো ওরকমই বলবেন। আমারও সেই রকম, আমি যে এমনি করে বসে এই আসর ভালবাসি।'...

বলতে বলতে থেমে আবার সকলের শূন্যপাত্রে ঢেলে দেন। যাদের দেন তারা এখন নিজেদের মধ্যে নানা কথায় নানান হাসিতে ব্যস্ত। বোঝা যায়, তাদের রক্তে নতুন জোয়ার লাগে। অচিনদা আবার আমাকে কী যেন বলতে যান। তার আগেই

বরহম হেঁকে ওঠে, 'অই, তু খেলি না?'

অচিনদাকে বলে। সেদিকে ঠিক নজর আছে। অচিনদাও ঢালেন। তারপরে বলেন, 'সেবার এই শেষ বছরের পরীক্ষা সামনে। এই বাঁশঝাড় দূর থেকে দেখেছি। বরহমদের চিনতাম, ওদের যাতায়াত করতে দেখেছি। কেন, তাও জানতাম। আর পানের ব্যাপারটা যে নিজেদের কারুর মধ্যে তখন দেখিনি তা নয়। আমরা তখন বিদ্যাভবনের ছাত্র, কিছু পালক-টালক গজিয়েছে—অর্থাৎ তোমরা যাকে এম-এ ক্লাসের ছাত্র বলো, সেই রকম বয়স। পরীক্ষার শেষ বছরেই হঠাৎ একদিন বিকেলবেলায় এই বাঁশঝাড়ে এসে উঠেছিলাম। পান করতে নয়, তার জন্যে এখানে আসার দরকার ছিল না। সেদিন একটা নিশির ঘোর আমার। অনুভূতিগুলো যেন সব মরে গেছে। আশ্রম থেকে কখন হাঁটতে হাঁটতে কোপাইয়ের ধারে চলে গেছি, নিজেরও যেন সাড় ছিল না। শরৎকাল এসে গেছে। খোয়াইয়ের এখানে ওখানে কোপাইয়ের ধারে ধারে কাশের দোলানি। কোপাইয়ে তখনো জল কম না। কিন্তু সে-সব চেয়ে দেখেছিলাম বলে মনে পড়ে না। খালি পায়ে চলাফেরা করা অভ্যাস ছিল আমাদের, খালি পায়েই বেরিয়েছিলাম। ঠিক কী বললে তোমাকে বোঝাতে পারি জানি না। বোধ হয় অনেকটা সাপের কামড়ের মতো, বিষে অচৈতন্য।'

বলে একটু হাসেন। আবার বলেন, 'অবিশ্যি সাপের কামড় কোনোদিন খাইনি, তা-ই জানি না। ওটা উপমা, তবে কামড় একটা খেয়েছিলাম।'...

বলতে বলতে আবার ঢেলে দেন। কখন দ্বিতীয় বোতল খোলা হয়ে যায় টের পাই না। বরহমদের অস্থিরতা বাড়ে। ইতিমধ্যে কখন আরো দু'টি জোড়া এসে ভিড়েছে। বোধ হয় কলসী আর ভাঁড় নিয়ে জুটি জুটি বসেছিল কোল-আঁধারে। সকলেরই কেমন যেন এক দোলা চঞ্চলতা। গলার স্বর চড়ে। তার মধ্যেই একটি মেয়ে-গলার গুনগুনানি শোনা যায়।

অচিনদা নিজের গলায় ঢেলে বলেন, 'সেখান থেকে ফিরে হাঁটতে হাঁটতে কখন এই বাঁশঝাড়ে এসে উঠেছিলাম। তখন এই বরহম ওর বউকে নিয়ে এখানে বসেছিল। আমাকে দেখে হাত ধরে বসালো। ওদের সঙ্গে খেতে লাগলাম, যেন কোনো জ্ঞান নেই। ওই যে বললাম বিষে অচৈতন্য, সেই রকম। জীবনে যা ভাবিনি কোনোদিন, তাই করলাম। তারপরে সেই রাত্রে আর বাঁশঝাড় থেকে ফেরা হয়নি। আসলে বিষের পুরিয়াটা ছিল বুকেই—মানে বুক-পকেটে।'

বলে আমার ঘোর-লাগা কৌতূহলিত অবাক মুখের দিকে চেয়ে হাসেন। মনে হয় ওঁর চোখ দুটো দেখতে পাই না। কোথায় যেন ঢাকা পড়ে গিয়েছে। কেবল অন্ধকারে ক্ষীণ স্রোতরেখার মতো কী যেন দেখা যায়। মুখটা একটু এগিয়ে নিয়ে এসে বলেন, 'তোমাকে একটা বস্তাপচা গল্প শোনাব, শুনবে?'

আমি স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বলি, 'শুনব।'

ইতিমধ্যে বরহম শরতের দল কখন দাঁড়িয়ে পড়েছে খেয়াল করিনি। দেখি, ওদের পুরুষেরা একদিকে, মেয়েরা আর একদিকে, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গিয়েছে। দাঁড়িয়ে না, ওদের দোলানি শুরু হয়ে গিয়েছে। উভয় পক্ষ সারি সারি। আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে মলুটির—মৌলীক্ষার মাঠের ছবি। এখানে, এই বাঁশঝাড়ে তার আর এক রূপ। এখানে আগে থেকে কোনো আয়োজন ছিল না। কোনো বিশেষ উৎসবের অনুষ্ঠান নেই।

এখানে মেয়েদের গলায় গলায় গান বেজে ওঠে প্রাণের আপন ধ্বনিতে। পায়ে পায়ে নাচ লেগে যায়, প্রাণের দোলাতে। উৎসবের হেতু খোঁজায় নেই কেউ। এ আঙিনায়, উৎসবের প্রাণ আপনি এসে ধরা দেয়। এমন দিনে যাদের আসর জমে

ওঠার কথা ছাতিমতলার মেলার আঙিনায়, আজ তারা সেখান থেকে দূরে। তাদের কয়েকজনের উৎসব লেগে যায় বিনা আয়োজনে। এখানে দূর ছড়ানো মাঠ নেই, বাঁশঝাড়ের ঘের। শুণ্ডি বুড়ো উসকে দেয় কাঠ-কুটোর আগুন। টিমটিমে লণ্ঠন আর লম্ফর লাল আলো। সেই আলোতে মানুষ কাঁপে, ছায়া কাঁপে। বাঁশঝাড়ের ঝুপসি ঝুপসি কালোতে, আগুনের আলোর ছিটায়, সকলই যেন কোনো দূর কালে টেনে নিয়ে যায়।

ওদের গানের ভাষা বুঝি না। সুরের উত্থান-পতনে ঘুরে ফিরে একটা সুরই বাজে। যেন ঝিঁঝির ডাকের মতো, প্রকৃতির স্পন্দনে বাজে। কেবল একটা কথাই বুঝতে পারি। গানের মধ্যে, একবার করে 'অচিনবাবু' উচ্চারিত হয়। শুনে অচিনদা ঘাড় দুলিয়ে হাসেন। হাত তুলে বলেন, 'আচ্ছা রে, আচ্ছা।'

আমার দিকে ফিরে বলেন, 'ওরা বলছে, আমার মতো এমন মানুষ কোনোদিন দেখেনি। আমি মাটির পাত্র নই, ভেঙে যাই না, খাঁটি পিতলের জিনিস।'

বলে আবার হাসেন। কথা কন, হাসেন, কিন্তু সেই ঘোর লেগে থাকে মুখে। স্বপ্নঘোরের ওপার থেকে, এপারে আওয়াজ দেন। এদিকে শুণ্ডি বুড়ো একটি মাটির কলসী বসিয়ে দিয়েছে অচিনদার সামনে। সঙ্গে একটি ভাঁড়। বুড়ো ঢেলে ঢেলে দেয়, অচিনদা চুমুক দেন। এমন আজব পান দেখিনি কখনো।

একদিকে নাচ গান দোলা চলে। এখন আর বরহমের বউকে প্রৌঢ়া মনে হয় না। মেয়ের থেকে মা কম যায় না। সুরের দোলায় সকলেই এক, ফণা তোলা সাপিনীর আঁকাবাঁকা ঢেউ। নরোত্তম বসেছে একটু দূরে, অন্ধকার ঘেঁষে। একটা সহবত বলে কথা আছে তো। শত হলেও কলসী ভাঁড় নিয়ে বসেছে। একেবারে অচিনদার সামনাসামনি বসে কী করে। আর জোয়ানটি দু'চোখ ভরে নাচ দেখছে।

বরহম একবার অচিনদাকে হেঁকে ওঠে, 'তুই লাচবি না?'

অচিনদা বলেন, 'না বাবা, আমার কোমরে আর অত জোর নেই।'

তারপরে দূরের অন্ধকারে চোখ মেলে দেন। যে মানুষের যে মুখ দেখেছিলাম মেলার প্রাঙ্গণে এখন আর সে মুখ নেই। এ যেন অন্য এক মুখ। কেবল রক্তের লাল না, আগুনের আলোয় রাঙা হিজিবিজি মুখটা এখন যেন কেমন মসৃণ দেখি। আমার দিকে না৷ তাকিয়েই বলেন, 'বুক পকেটের বিষের পুরিয়াটা আসলে যে চিঠি, সে কথা বোধ হয় তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।'

বলে মুখ ফিরিয়ে তাকান। তাকান, কিন্তু আমি ভাবি, সেই ডাগর চোখ দু'খানি কোথায়। কেবল দুটি চিকচিকে বিন্দু ছাড়া কিছুই যেন দেখতে পাই না। নজরের ভাব বুঝি না। তবে বুক-পকেটের বিষের পুরিয়া যে চিঠি, তা বুঝতে পারিনি। সেই কৌতূহলের নিরসনে নতুন কৌতূহলে মন চকিত হয়।

অচিনদা বলেন, 'চিঠিটা সেইদিনই এসে পৌঁছেছিল কলকাতা থেকে। চিঠির বক্তব্য ছিল, "তোমার প্রস্তাব নাকচ হয়েছে। তোমার বংশকৌলীন্য তেমন জোরালো না, পাস করে বেরিয়ে অর্থকৌলীন্যেও যে তুমি খুব উঠতে পারবে, সে বিশ্বাস অভিভাবকদের নেই। তা ছাড়া, তুমি ভালো নও, তুমি যে প্রেম করো। আমাদের পরিবারে শিক্ষা-দীক্ষা আধুনিকতা যতই থাকুক, কিন্তু এ কথা কেউ ভুলবে না, তুমি আমাকে খারাপ করেছ। কেননা, আমার মধ্যেও যে তুমি প্রেমের বিষ ঢুকিয়েছ। তুমি খারাপ, তুমি খারাপ। তাই তো ওখানকার আত্মীয়দের ওপরেও ভরসা করা গেল না। কলেজের পড়া সাঙ্গ হবার আগেই আমাকে কলকাতায় নিয়ে আসতে হলো। তোমার আওতায় থাকলে আমার সর্বনাশ। তুমি খারাপ, তুমি যে বিষের মতো খারাপ। তোমার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করাও যায় না, কারণ

কথা পাঁচ কান হবে, তাই যেখানে তুমি আছ, সেখান থেকে নিঃশব্দে আমাকে সরিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে। আমার এত বড় ক্ষতি তাঁরা চোখ চেয়ে দেখবেন কেমন করে। আমার এত বড় অধঃপতন তাঁরা সইবেন কেমন করে। তাই আমার বিয়ে স্থির হয়ে গেছে। যাঁর সঙ্গে স্থির হয়েছে, তিনি সাহেবদের কলেজ থেকে পাস করেছেন, তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পেয়েছেন, তিনি সব দিক থেকেই তোমার থেকে বড়। আমি ভাবি, বাহুবলেও কি তিনি তোমার থেকে বড়?"

অচিনদা একটু থামেন। একটু যেন হাসতে চেষ্টা করেন, ঠোঁট দুটো বাঁকা দেখায়। ওদিকে গানের রব উঁচুতে উঠেছে। নাচের তাল দ্রুত। আর আমার চোখের সামনে, সব ছাপিয়ে ভাসে এক অচেনা অজানা মুখ। কেন জানি না, দেখি তার অলকে কুসুম নেই, শিথিল কবরী। চোখেতে কাজল নেই, কিন্তু সজল দিঠি না। জল এসে থমকে আছে চোখের কূলের ওপারে। ব্যথার চেয়ে যেন বেশী দেখি ঠোঁটের কোণ বিদ্রূপে বাঁকা। অথচ সে যেন উদাসিনী। কখন বুঝি কেঁপে যায় ঠোঁটের কোণের বাঁকখানি।

অচিনদা যেন ঠেক খেয়েছিলেন। ঠেক কাটিয়ে আবার বলেন, 'চিঠিতে আরো লেখা ছিল, যার মোদ্দা কথা, "পুরুষের বাহুবলের কথা ছাড়া, আর কী ভাববো। সমাজ সংসার পারিবারিক সম্মান, সব কিছুর মাঝখানে, আমি সে-ই তো অবলা। বিষ যদি খেলাম, একেবারে মরণ হলো না কেন। এখন যে জ্বলে যাচ্ছি, তাই মরণের কথা মনে আসছে, তাই পুরুষের বাহুবলের কথা মনে আসছে। সভ্যতা আধুনিকতা সংস্কারের ওপরে উঠতে পারল কোথায়। তাই বাহুবলের কথা বলতে ইচ্ছা করে। অথচ সভ্যতার এমনই ছলনা, বাহুবলকে নাকি তার বড় ঘৃণা। কিন্তু কী করি, অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহে সে-ই দিন, মাঝখানে শুধু কার্তিক মাসটুকু। সামনে তোমার পরীক্ষা, সে কথাও ভুলতে পারছি না। তা-ই এখন কেবল, এক জপ, এক তপ, তোমাকে খালি বলছি, অচিনদা, তুমি খারাপ, খুব খারাপ, বিষের মতো খারাপ। যে বিষেতে মরণ নেই, সে বিষ কেন দাও। এখন তুমি যা বুঝবে, তাই করবে। তবে তোমার কোনো ক্ষতি ক'রো না। ইতি—"'

অচিনদা চুপ করেন। আমি বলে উঠি, 'ইতি—?'

অচিনদা যেন একটু অবাক হন। তারপরে হাসির মতো শব্দ করে বলেন, 'ও, নামটা জিজ্ঞেস করছ? সেটাও আমাদের কালের মতোই, নীরজা।'

শুঁড়ি বুড়ো ভাঁড় এগিয়ে দেয়। অচিনদা হাত নাড়েন, আর চান না। এখন চেতন ব্রহ্মের আর কোনো রসের দরকার নেই। এখন যে রস প্রাণের ভিতর থেকে, স্মৃতির কলস গড়িয়ে মাতাল করেছে। এখন আর অন্য রসে দরকার নেই। ঝাঁজ তিক্ততা মাদকতা এর চেয়ে তীব্রতর আর কী দেবে।

নাচ গান তখনো চলে। যেন বরহমরা নিজেরা চালায় না। তাদের রক্তের মধ্যে কে যেন চালিয়ে যায়। অচিনদা একটা চুরুট ধরান। ধরিয়ে বলেন, 'সেইজন্যেই বলছিলাম, একটা বস্তাপচা গল্প শোনাব তোমাকে।'

জিজ্ঞেস করি, 'বস্তাপচা কেন?'

'প্রেমের গল্প বলে। এমন প্রেমের গল্প তোমরা কত শুনেছ। তুমি সাহিত্যিক, কত লিখছ, কত রকমের বিচিত্র চমকপ্রদ প্রেমকাহিনী। তোমাদের যুগে হলে কী হতো জানি নে, আমাদের যুগের কাহিনী নিতান্তই বস্তাপচা।'

শত মুখে শোনা কথার এই বিচার আমার জানা নেই। সমালোচক হওয়া যে আমার ভাগ্যে ঘটেনি। চিঠির কথা না, বিষের পুরিয়ার কথা যতটুকু শুনেছি, তাতে এ যুগ সে যুগের কথা মনে আসেনি। তাজা পচার বিচার আসেনি মনে। কেবল,

সেই দুটি চিরপ্রাণের কথা মনে হয়েছে, যাতে কোনোদিন পচন ধরে না। যার কোনো সেকাল-একাল নেই। তাই না বলে পারি না, 'কেবল তো রূপের হেরফের।'

অচিনদা চুরুটে টান দিয়ে বলেন, 'সেটাই কি কম নাকি হে। নইলে রূপ লাগি আঁখি ঝুরে কেন। নইলে, জনম অবধি হম রূপ নেহারলুঁ, নয়ন না তিরপিত ভেল, কেন? তোমরা তো তোমরা, দেখ স্বয়ং গুরুদেব পর্যন্ত, পঞ্চশরের শর বেঁধানো খেলা জমাতে শিলং-এর পাহাড়ের রাস্তায় নায়কের গাড়ি বিকল করে দেন, চমকে দেখি নায়িকাও সেখানে। আমার গল্পের শুরু থেকে শেষ অবধি সেরকম কোনো ঝলক চমক নেই।'

বিষের নীলে আর হুল ফোটে না। তবু দেখ, অচিনদা আপনার হুলে আপনাকে বিঁধতে চান আরো। হয়তো ব্যথা যেখানে গভীর, সেখানে একটু আত্মবিদ্রুপের দহন থাকে। আসলে, অচিন-নীরজার সহজের মধ্যেই গভীরতায় অনেক বেশী ডুবেছিল। বনে গিয়ে কাঁদার চেয়ে ঘর করার সহজে যে কাঁদে, সেটা দেখা যায় না। কিন্তু বনে গিয়ে কাঁদা থেকে এ কাঁদাটা অনেক গভীরে বেঁধানো। আটপৌরে ঘর-কন্নাতে সাজিয়ে কিছু দেখানো যায় না। কিন্তু সেখানে জীবনের লীলা চলেছে অহরহ। ঘটনার চমক যদি অচিনদার না থাকে, তাতে আসলের ক্ষতি হয় না। বরং বেশী গভীর মনে হয়। শুধু পত্রের বাচনিকে যতটুকু শুনেছি, তাতেই যেন মনের কোথায় একটা বন্ধ মুখের ধারা খুলে যায়। একটু যেন ব্যথা ধরার টনটনানি। কাঠের আগুনের আলোয় অচিনদার মুখ আর গলা শুনে আমিও কল্পনার ছবি দেখি।

তবু কথা থেমে যায়, তাই বলি, 'কী আছে না-আছে, তা জানব কেমন করে। গল্পটাই তো শোনা হলো না এখনো।'

অচিনদা আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে আস্তে চাপড় মারেন। বলেন, 'তা বটে। সেই চিঠিটাই জীবনে একটা পর্বের শেষ চিঠি। সেই চিঠি আসবার আগে মনের মধ্যে অনেক রকমের গুনগুনানি ছিল। মৌমাছির যেমন মধুর আশা, যেন অনেক আহরণ করে চাকে জমিয়ে রেখেছি। সেই পূর্ণিমার দিনের আশা, যেদিন মধুক্ষরায় জীবন ভেসে যাবে। তার আগে পর্যন্ত নীরজার যে ক'টি চিঠি পেয়েছি, কোনোটাতেই আমার নাকচ হয়ে যাবার সংবাদ ছিল না। বিয়ের পাত্র, দিনক্ষণ স্থির হয়ে যাবার কোনো কথা ছিল না। তখনো আশা, আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার যোগ্যতাও এসে যাবে। তখন আমাকে আর নাকচ করে কে।'

বলে হাসেন না কি ঠোঁট উল্‌টে একটু হাসির মতো শব্দ করেন, বুঝি না। বলেন, আসলে কী জানো, তখন মস্তিষ্ক জুড়ে অনেক স্বপ্ন। আদর্শের ঠাসবুনোটে মাথা ভরা। বেশী জটিলতা মনে আসত না। ভয় করতে শিখিনি একটুও। কোনো বিষয়ে ভয় ধরলে তো আত্মরক্ষায় সাবধান হতে হয়। যে জন্যে মৌমাছির কথা বলছিলাম। সে কি আগে থেকে জানতে পারে, শুক্লপক্ষের শেষ দিনে তার চাক-ভরা মধুর দিকে কখন মানুষের হাতে আগুনের মশাল এগিয়ে আসছে। তাই ওর চিঠিটা আচমকা একেবারে বিষের তীরের মতো বিঁধেছিল। এমনই বিভ্রান্ত যে, কোপাইয়ের ধারে ধারে কখন এই বাঁশঝাড়ে এসেছিলাম, জানতে পারিনি। এই যে দেখছ বরহম, ও তখন কাঁচা জোয়ান। ওর বউকে মনে হয়েছিল এই মাংরির থেকেও ঝলকানো। আলাপ ওদের সঙ্গে আগেই। সেই দিন সংলাপ-প্রলাপের পালা। ওরা খাচ্ছিল, আমাকে ডেকে বসালে, আমিও খেতে লাগলাম।'

একটু থামেন। আমি একবার বরহমের দিকে তাকাই। দেখি, তখন আর সে মুখোমুখি নয়, বউয়ের দুই কাঁধে দুই হাত রেখেছে। দু'জনেরই শরীর টলমল, পায়ে বেতাল লেগেছে। ওদের পুরনো বন্ধুর কথা আমি শুনছি। যে কথা ওরা

হয়তো কোনোদিন জানতে পারেনি। জানতে পারেনি, একদা বিকালে ওদের বন্ধু কেন এখানে এসেছিল। বরহম এখনো বউকে নিয়ে নাচে। অচিনদা আজও যেন বাঁশঝাড়ের সেই মানুষটাই আছেন। আর আমি রাঢ়ের শীতে আঁচড়ানো রাত্রে বসে জগৎ-সংসারের অপরূপ দেখি। এই অপরূপের চাবিকাঠি কার হাতে, কে জানে। কে খোলে, কে দেখায়, জানি না। এখন যেন নিজেকে নতজানু মনে হয়। মনে হয়, বুকের কাছে দু' হাত আমার। এখন যেন আমার ভিতরে কে বলে, নমি নমি নমি, জীবন হে, নমি নমি নমি।

অচিনদাও বোধ হয় বরহম দম্পতিকেই দেখছিলেন। হয়তো একই কথা ভাবছিলেন। আমি ওঁর দিকে তাকাতে যেন খুব সহজ ভাবেই বলেন, 'পরের দিনই চলে গেলাম কলকাতা। কেন যে গিয়েছিলাম, তা ঠিক করে বলতে পারি না। চুপ করে থাকতে পারছিলাম না। এখানে বসে থাকতে পারছিলাম না। তখন মাথার মধ্যে একটা কথারই ঘুরপাক, বাহুবল। কী বলতে চেয়েছে নীরজা বাহুবলের কথা বলে! ওকে উদ্ধার করে নিয়ে আসব ওদের বাড়ি থেকে? ওকে হরণ করে নিয়ে আসব? পরীক্ষার চিন্তা মাথায় উঠে গিয়েছিল।

'কলকাতায় আমার নিজের আত্মীয়ের বাড়ি ছিল। বাবা মা বরাবর দেশের বাড়িতেই থাকতেন। আত্মীয়দের অবাক করে দিয়ে সেখানে উঠলাম। কৈফিয়ত হলো, একটু দরকারে হঠাৎ কয়েক দিনের জন্যে আসতে হয়েছে। কিন্তু কলকাতা গেলে কী হবে, কোনোদিন তো নীরজাদের বাড়ি যাইনি। ঠিকানা দেখে বাড়ি চিনে নিতে ভুল হয়নি। তারপর? নিজেকে যে কী রকম হতচ্ছাড়া মনে হয়েছিল, সে কথা এখন বলে বোঝাতে পারব না। বাড়িটাই না-হয় চিনলাম, ঢুকব কেমন করে, সেটাই তো ভাবনা। বাহুবলটা প্রকাশ করব কোথায়।' বলে হঠাৎ হেসে ওঠেন অচিনদা। খানিকক্ষণ ধরে ফুলে ফুলে হাসেন। আমি যেন কেমন স্থির নিশ্চল হয়ে যাই। আমার বুকের মধ্যে দুরু দুরু করতে থাকে। হাসি যখন থামে, দু' হাত দিয়ে সারা মুখটা মোছেন। বলেন, 'আসলে অপমানের ভয়ে ঢুকতে পারছিলাম না। নীরজার বাবার সঙ্গে শান্তিনিকেতনেই পরিচয় হয়েছিল, অতএব চেনা লোক। তবু তাঁর কাছে গিয়ে আরজি পেশ করতে গেলেই যে একটা প্রচন্ড গোলমাল লেগে যাবে, বুঝতে পারছিলাম। হয়তো তার ধাক্কা গিয়ে শান্তিনিকেতনেও লাগতে পারে। তাই কেবল, বাড়িটার আশেপাশে দু' দিন ধরে টহল দিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য, কোনোরকমে নীরজার সঙ্গে যদি একবার দেখা হয়ে যায়। সে কি একবার বাইরে বেরুতে পারে না! একবার কী ছাদেও উঠতে পারে না!

'তখন তবু ওরকম ভাবতে পেরেছিলাম। এখন ভাবি, অমন পাগলের মতো সেদিন একটা বাড়ির দরজার কাছে কেমন করে দু'দিন দাঁড়িয়েছিলাম। ভেবে দেখেছিলাম, একমাত্র নাটকের নায়কের মতো বাড়িতে ঢুকে চেঁচিয়ে বলতে পারতাম, "নীরজা, আমি এসেছি।" তারপরেই ওর বাবার আবির্ভাব, বিতাড়ন, গর্জন, প্রতি-গর্জন, নীরজাকে আহ্বান, সে এক কাপড়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু মুশকিল হলো, জীবনে মনে কোথাও অমন নাটুকে রুচি ছিল না।

'শেষ মুহূর্তে যখন স্থির করে ফেললাম, ওদের বাড়ি যাবো, শান্তভাবে ওর বাবার সঙ্গে দেখা করব, তখনই মনে পড়ে গেল, ওদের বাড়িতে একটা টেলিফোন আছে। তোমাদের এখনকার মতো অটোমেটিক নয়, কলকাতার ম্যানুয়েল লাইন তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ। গাইড দেখে, পি-কে দিয়ে ওদের নম্বরটা খুঁজে বের করেছিলাম। ওর বাবার নামেই ফোন ছিল। তবে কিনা ভায়া, তোমাদের যুগ নয়, আগেই বলেছি। অপারেটারের কাছে নাম্বার চেয়ে জিভটা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। গলায়

এক ফোঁটা স্বর ছিল না, দরদরিয়ে ঘাম ঝরছিল। "হ্যালো" বলে যিনি ফোন ধরেছিলেন, তিনি যে নীরজার বাবা, তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলাম। তিনি তিনবার জিজ্ঞেস করবার পরে আমি হঠাৎ বলে উঠেছিলাম, অমুক কথা বলছি, একটু নীরজাকে ডেকে দিতে হবে।

'বলেই, একটা প্রচন্ড চিৎকারের ভয়ে রিসিভারটা জোরে চেপে ধরেছিলাম। কিন্তু বুঝলে ভায়া, সংসারটা বড় ঘোরালো, মানুষ তার চেয়ে ঘোরালোতর। তিনি এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে, একটু অবাক হয়ে, ভারী মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কে, আমাদের শান্তিনিকেতনের অচিন্ত্য নাকি?" তখন আমারই যেন একটু বেকুব অবস্থা। বললাম, "হ্যাঁ।" তিনি তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত শান্ত শালীনভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি কলকাতায় এসেছ নাকি? কবে এলে?" তার জবাব দিলাম। তিনি খুব চিন্তিত হয়ে জানতে চাইলেন, "এই পরীক্ষার সময় তুমি কলকাতায়, আপদ-বিপদ কিছু ঘটেনি তো?" বললাম, "সে রকম কিছু না, নীরজার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইছিলাম।" তখন যেন কেমন একটু সাহস ফিরে আসছিল। তিনি বললেন, "ও, আচ্ছা তুমি একটু ধরো, আমি দেখছি খুকুনি কোথায়, একটু ধরো।"

'খুকুনি হলো নীরজার বাড়িতে ডাকা নাম। ও নামে ডাকবার অধিকারটা সে পরিবারের বাইরে আমাকেই দিয়েছিল। অনেক দিন পরে সেই নামটা শুনে যেমন মনটা টলমলিয়ে উঠছিল, তেমনি ওর বাবার ব্যবহারে বিস্ময়ে প্রায় অবশ হয়ে গিয়েছিলাম। সে যেন আগুনের ভয়ের কাছে জলের মতো মনে হয়েছিল। ঝড়ের বদলে শান্ত স্তব্ধতা। নীরজার চিঠির সঙ্গে যেন তাঁর কথা, গলার স্বরের কোনো মিল ছিল না। কিন্তু সময় চলে যাচ্ছিল, কতক্ষণ গিয়েছিল, খেয়াল করিনি। তবে বেশ খানিকক্ষণ। একসময়ে হঠাৎ মনে হয়েছিল, তাই তো, কেউ ধরে না যে। ছেড়ে দিলো নাকি? যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছি, তখন ওপারে খট্ করে একটা শব্দ হলো, আর আমার শরীরে মনে ঝঙ্কার দিয়ে বেজে উঠল, "হ্যালো।"

'শুনেই চিনতে পারলাম, নীরু—নীরজা, কিন্তু গলার স্বরটা বড় নিচু, ভেজা ভেজা। যেন সেইমাত্র কেঁদেছে ও। বলে উঠলাম, "আমি অচিন, আমি এসেছি।"'

বলতে বলতে অচিনদা আবার ফুলে ফুলে হেসে উঠলেন। যেন কী এক হাসির গল্প বলছেন। হাসতে হাসতেই আস্তে একটু কেশে নিয়ে বললেন, 'আমার সেই বলার ভঙ্গিটা মনে করে তারপরে একলা একলা অনেক দিন হেসেছি। আমি আসলে ভুলেই গিয়েছিলাম, টেলিফোনের নিভৃতিটা আসলে নিভৃতি নয়। নীরু যেখান থেকে কথা বলছে, সেই ঘরে ওর বাবা মা দাদা ওকে ঘিরে আছেন। আমার কথা বলার যেমন স্বাধীনতা, ওর তা নেই। কিন্তু জবাবে ও কী বলেছিল জানো? যেন প্রায় অবাক হয়ে কোনোরকমে জিজ্ঞেস করেছিল, "কেন?" কেন? আমার হাত কেঁপে গেল, গলাও। মুহূর্তে যেন অন্ধকার দেখলাম। এ কোন্ নীরজা কথা বলছে আমার সঙ্গে? আমি আবার বলে উঠলাম, "আমি, আমি অচিন বলছি, আমি তোমার জন্যে কলকাতায় এসেছি।" কয়েক মুহূর্ত কোনো জবাব নেই। আমি আবার বলে উঠলাম, "নীরু, তুমি বাহুবলের কথা লিখেছ, আমি তাই এসেছি।" একটু পরে ওপার থেকে শব্দ এল, "ও!" যেন নীরজা বড় ক্লান্ত, অসুস্থ, দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারছে না। তারপরেই হঠাৎ বলে উঠল, "তুমি আমাদের বাড়িতে এস একবার।" বলেই লাইনটা ছেড়ে দিলো। আমি রিসিভারটা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কোন্ কথা থেকে যে কোন্ কথা হলো, কিছুই বুঝতে পারলাম না। নীরজাকে যেন অচেনা লাগল একটু পরেই, হঠাৎ খেয়াল হলো, ও আমাকে ওদের বাড়ি যেতে বলেছে। মনে হতেই রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। মনে হলো,

নাকচ নয়, আমার আশা আছে। নিশ্চয়ই আছে, নইলে নীরু ওদের বাড়ি যেতে বলবে কেন। দেরি না করে তখনই আমি ওদের বাড়ি চলে গেলাম। এখনো চোখের সামনে ভাসছে, দু' দিকে দুটো গ্যারাজের মাঝখানে গেট। গেটটা খোলাই ছিল। ঠেলে ভিতরে ঢুকে সামনে বারান্দাওয়ালা একতলা বাড়ি। দরজা জানালা সবই ভিতর থেকে বন্ধ। বারান্দার দু' পাশে আরো দুটো ঘরের দরজা, সেগুলোও বন্ধ। সামনের দরজার গায়েই ঠকঠক করে টোকা দিলাম। তখন শুধু কানে বাজছে, "তুমি আমাদের বাড়িতে এস একবার।" নীরু ডেকেছে, আর আমার ভয় নেই, কাউকে আমার ভয় নেই। শুধু ভাবছি, দরজা খুলেই নীরজা আমাকে বলবে, "অচিনদা, আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল।" একবারও ভেবে দেখিনি, কোথায় নিয়ে যাবো।

'দরজা খুলছে না দেখে আবার টোকা দিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল। নীরজা নয়, বুঝতে পারছ, ওর বাবা। আমাকে দেখেই সাদরে ভিতরে ডাকলেন, "এসো, এসো, অচিন, এসো বসো।" চিনতেন তো আমাকে আগে থাকতেই। ব্রিটিশ আমলের সরকারী অফিসার, তাদের ব্যাপারই আলাদা। গায়ে গাউন, পরনে পায়জামা, ঢিলেঢালা আরামে সকাল কাটাচ্ছিলেন। আপ্যায়নটা একটু বেশী বেশী মনে হলো, তার ওপরে, বুঝলে ভায়া, বাঙাল তো আমি। ঘরের সাজগোজের ঝকমকে কেতাকায়দা দেখে কেমন যেন মিইয়ে যেতে লাগলাম। আমি একটা সোফায় বসতে উনিও বসলেন। বললেন, "একটু চা দিতে বলি, কেমন?" আমি বললাম, "না, থাক। না।" আমার লক্ষ্য তখন বাড়ির ভিতরের দিকের দরজায়। কিন্তু সেখানে এত মোটা পর্দা যে, কিছুই দেখা যায় না। ভিতরের দিকে জানালাগুলো খোলা, কিন্তু সেখানেও সেই মোটা পর্দা। সবই এত চুপচাপ, বাড়ির ভিতরে লোক আছে বলে মনে হয় না।

'নীরজার বাবা বললেন, "না, না, থাকবে কেন, একটু চা খাও।" বলে চাকরকে ডাকলেন। চাকর এসে পর্দা সরিয়ে চায়ের হুকুম নিয়ে চলে গেল। এক পাশে পিয়ানোর ওপরে টাইমপিস ঘড়ি। সেখানে টিকটিক শব্দ ছাড়া কিছু নেই। আমি কিছুই বলি না। একটু পরে উনি জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কলকাতায় কোথায় উঠেছি। পড়াশুনা কেমন চলছে। পাস করলে কী করব, এইসব নানান সাতসতেরো, যার অর্থ হলো সময় কাটানো। আসল কথায় কেউ নেই। ইতিমধ্যে চা এসে গেল, তার সঙ্গে কিছু টা-ও বটে, তবে খেতে ইচ্ছে করল না। চা-টাই কোনোরকমে শেষ করলাম। তারপরে দেখলাম, ভদ্রলোকের মুখের আকৃতি আর রঙ বদলাতে লাগল। হঠাৎ বললেন, "তোমার কথা আমি সব শুনেছি, মানে খুকুনিকে নিয়ে যেসব কথাবার্তা হয়েছে। দেখ, তুমি বোকা নও, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, আমাদের মনোভাব বুঝতে তোমার কোনো অসুবিধে হওয়া উচিত নয়। তোমাকে আমি সমবেদনাও জানাচ্ছি, কেননা খুকুনিও একটু দোষ করে ফেলেছে, তোমাকে ভুল বোঝার অবকাশ দিয়েছে, আসলে ব্যাপারটা একেবারেই অসম্ভব।"

'অসম্ভব শব্দটাকে এমন করে বললেন, যেন তারপরে আর কোনো কথাই থাকতে পারে না। আমি তখন ঘামতে আরম্ভ করেছি, কথা বলতে পারছি না। অপমান আর প্রত্যাখ্যানের এই চেহারাটা আমার দেখা বা জানা ছিল না। চেঁচামেচি করলে, তাড়িয়ে-টাড়িয়ে দিলে, তবু যা হোক, তখনি কিছু বলতে পারতাম। তিনি সেই সুযোগে আমাকে আরো বুঝিয়ে যেতে লাগলেন, এসব ভাবনা ছেড়ে, ভালোভাবে লেখাপড়া শেষ করে নিজের কেরিয়ার গড়ে তুলি যেন। কত ভালো মেয়ে আমার জীবনে তখন আসবে, তখন নাকি আমি নিজেই এসব কথা মনে করে লজ্জা পাবো, হাসব।'

বলতে বলতে সত্যি অচিনদা হেসে ওঠেন। কে যেন কাঠের আগুন উসকে

যেন। একটা বড় শিখা দপ করে জ্বলে ওঠে। পশ্চিমা বাতাসে কাঁপে থরথর। মনে হয়, নাচের আসর ঝিমিয়ে গিয়েছে। সবাই যেন নেই। কারা কোথায় নাচতে নাচতে হারিয়ে গিয়েছে বাঁশঝাড়ের অন্ধকারে। আমি দেখি, আগুনের আলো কাঁপে অচিনদার মুখে। তিনি হাসেন আপন মনে। এখন বোধ হয় আর শ্রোতার কথা ওঁর মনে নেই। আর নিজে নিজেই যে বলেন, 'তা হ্যাঁ, হাসি বইকি, এখন হাসি, খুব হাসি, তবে লজ্জা পাই কিনা, বুঝতে পারি না।'

হঠাৎ একটু থামেন, তারপরে ঘাড় নেড়ে বলেন, 'না, লজ্জা পাই না। কী পাই, তা জানি না, তবে হাসি। তারপরে তিনি যখন কথার পাট একেবারে চুকিয়ে দিতে চাইলেন, "অতএব এটা সম্ভব নয়, বুঝতেই পারছ" তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?" তিনি শক্ত মুখে ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন। কিন্তু রাগ করলেন না, হেসে ফেললেন, বললেন, "তা হলে আর তোমাকে এতক্ষণ কী বললাম। যেসব কারণে সম্ভব নয়, সবই তোমাকে বলেছি।"

'কিন্তু আমার যুক্তি অন্যরকম। তাই বললাম, "কিন্তু নীরজার তো আপত্তি নেই।"

'তিনি আবার গম্ভীর হলেন, মুখ আরো শক্ত হলো। আমার মনে হলো, বাড়ির ভিতরের জানালা এবং দরজার পর্দার কাছে কে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে আড়ালে। অর্থাৎ কথাবার্তার শ্রোতা ছিল। নীরজার বাবা এবার কঠিন গলায় বললেন, "জানি, সে লজ্জার কথাটাও জানি। কী করে এরকম ঘটল, জানি না; তবে এ বাড়িতে ছেলেমেয়েদের আপত্তি-সম্মতিই বড় কথা নয়, অভিভাবকদের কথাই কথা। আর, খুকুনির বিয়ের কথাবার্তা অনেক আগে থেকেই অন্য জায়গায় পাকা হয়ে আছে, এখন এসব কথা নিরর্থক। আর...।" এই পর্যন্ত বলে তিনি থামলেন। শক্ত মুখে বারেবারেই মুঠি পাকাতে লাগলেন। আসলে তিনি রাগ চাপছিলেন। তারপরে মুখ খুললেন, "আর তারপরেও যদি এটা নিয়ে কোনোরকম বাড়াবাড়ি করো, তাতে আর কিছু লাভ হবে না। আমাদের পরিবারের কিছু দুর্নাম হবে, লোকে নানান কথা বলবে। তা হলে আমিও ব্যাপারটা ছেড়ে দেবো না, বুঝতেই পারছ—ফ্যামিলি স্ক্যান্ডাল মেনে নিতে পারি না কিছুতেই। তবে তোমাকে এটুকু বলতে পারি, তোমার সঙ্গে খুকুনির বিয়ে কোনো মতেই হতে পারে না, এইটুকু ভেবে অন্তত তুমি গোলমাল করে কোনোরকম কেচ্ছাকেলেঙ্কারি ক'রো না।" বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আবার বললেন, "তুমি বসো, আমি খুকুনিকে ডেকে দিচ্ছি।"

'তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি অবিশ্যি তারপরেও নীরজাকে দেখতে পাবো, আশা করিনি। এবার হয় যুদ্ধ, নয় পশ্চাদপসরণ। কিন্তু উনি নিজেই খুকুনিকে ডেকে দিচ্ছেন বলায় আমার ক্ষোভ বেড়ে উঠতে পারল না। তিনি যেন আমাকে চমকে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, আর আমি—আমি যেন এক অপরূপ দর্শনের আশায় দরজার দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। বুকটা ধড়ক-ধড়ক করতে লাগল। প্রতিটি পল যেন বিরাট, শেষ হতে চায় না। পর্দার নিচে দিয়ে, ওপাশে কেউ কেউ যাতায়াত করছে মনে হলো।

'সময়ের হিসাব দিতে পারি না, দেখলাম পর্দা উঠল, নীরজা ঢুকল। ঢুকে দরজার কাছেই দাঁড়াল। একবার আমার দিকে তাকাল, তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে নিলো। দেখলাম, ওর চোখ তখনো লাল। নাকের ডগা লাল। সমস্ত মুখটা ভার, এই মাত্র চোখ মুছে এসেছে যেন। একটা বাসী বিনুনি পিঠে এলানো, জামা-কাপড় তেমন ফিটফাট নয়, বোধ হয় শুয়ে ছিল বা বসে ছিল। ওরকম অবস্থায় ওকে একবারই দেখেছিলাম, যেদিন ওকে শান্তিনিকেতন থেকে নিয়ে আসে, তার আগের

দিনের শেষ দেখায়।

'আমার চেতনা ছিল না যে, দরজা-জানালার পর্দার ওপারে অনেক শ্রোতা, অনেক সাক্ষী। আগেকার মতোই, কাছে যাবার জন্যে আমি ব্যগ্র। আমি উঠে দাঁড়ালাম, কোনোরকমে ওকে একবার ডাকতে পারলাম। তার জবাবে ও আমার দিকে না তাকিয়ে দরজা আর জানালার দিকেই চকিতে একবার দেখে নিলো। তখনই আমি টের পেলাম, ওখানেই সবাই রয়েছে। নীরজা পায়ে পায়ে কাছে আসতে আসতে বলল, "বসো।"

'বসতে বলল, কিন্তু ওর গলার স্বর খুব স্থির নয়। চোখও পরিষ্কার নয়, একটু যেন ঝাপসা মতোই। আমি যন্ত্রচালিতের মতো বসলাম। ও একটু দূরে বসল, বসেই রইল চুপ করে। আমি থাকতে পারলাম না, বলে উঠলাম, "তুমি আমাকে বাহুবলের কথা লিখেছিলে, আমি তাই এসেছি।"

'তার জবাবে ও মুখ না তুলেই আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে লাগল। সেইভাবেই বলল, "লিখেছিলাম, কিন্তু তা সম্ভব নয়।" বলে ও আমার দিকে তাকাতেই ওর চোখে জল এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দু' হাতে মুখ ঢেকে কাঁপতে লাগল।'

অচিনদা থামলেন। এখন আর হাসেন না। কোন্ দিকে তাকিয়ে আছেন, বুঝতে পারি না। ভুরুর ঢাকায় চোখ দেখতে পাই না। এখন যেন অনেকটা ভাবলেশহীন মুখে নিবে যাওয়া চুরুটে বার কয়েক টান দেন। ওদিকে মনে হয়, নাচের আসরটা আশেপাশের অন্ধকারে চলে গিয়েছে। জীবন কেন বিচিত্র, তার জবাবে শুনি, অচিনদা যখন নীরজার কান্নার কথা ভাবেন, তখন বাঁশঝাড়ের কোথায় যেন রঙ্গিণীর খিলখিল হাসি বেজে ওঠে। বুড়ো শুণ্ডি ঝিমোয়। মাংরি বা কোথায়! নরোত্তমকেও দেখি না। অথচ টের পাই, সবাই যেন আশেপাশেই আছে।

অচিনদা নেবানো চুরুট আর ধরাবার চেষ্টা করেন না। বলেন, 'ইচ্ছে হলো, উঠে নীরুর কাছে যাই। পারলাম না, কারণ মনে হলো, অনেক চোখ আমাদের দেখছে। কোনো দিন তো কারুর সামনে ওর কাছে গিয়ে হাত ধরিনি। আর, সাহিত্যিক ভায়ার অজানা নেই, ছেলেরা কখনো কাঁদে না। তবে নিরুর ঘাড় নাড়া, কেঁদে ওঠা দেখে, কথা শুনে, হঠাৎ যেন বুঝতে পারলাম, ঝড়ে আমার দুয়ার ভাঙা, বুক-জোড়া অন্ধকার। তবু ডাক দিলাম, "নীরু।"

'ডাক শুনে নীরজা একটু স্থির হলো। আঁচলে চোখ মুছলো। একবার কোনোরকমে আমার দিকে তাকাল। মুখ নিচু করেই বলল, "কথাটা লিখেছিলাম এক মন নিয়ে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, তার পরিণতি ভালো হবে না। তোমার ভীষণ ক্ষতি হবে।"

'আমি যেন একেবারে অসহায় ছেলেমানুষের মতো বলে উঠলাম, "তা হলে কী হবে নীরু?" ও চুপ করে রইল। আমি আবার বললাম, "তুমি আমাকে আসতে বললে, মনে করেছিলাম, তবে বুঝি সব শুভ।"

'নীরজা ঘাড় নেড়ে বলল, "না। ওরা টেলিফোনেই তোমাকে সব কথা বলতে চেয়েছিল। আমি তা পারিনি। আমি তোমাকে চলে আসতে বলেছি হঠাৎ, তাতে এরা খুশি হয়নি। কিন্তু আমি—আমি একবার না ডেকে পারলাম না।"

'জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?" নীরজা একটু চুপ করে থেকে আমার দিকে তাকাল। আমার চোখের দিকে। তারপরে বলল, "আমার সুখ-দুঃখের কথা জিজ্ঞেস করো না, হয়তো এই শেষ কথা, এই শেষ দেখা।" কথাটা শোনা মাত্র বাতি যেন একেবারে নিবে গেল। এখন বলতে পারি ভায়া, তখন কথা শেষ, বেহাগের সুর বেজে উঠেছে, এবার বিদায়। কিন্তু ব্যাপারটা তো তেমন সোজা নয়। নীরজার চোখ ভেসে গিয়েছে, আমার যে কোথায় ভাসছে জানি না। কতখানি হারিয়েছি, তার হিসাবও জানি না।

তখন ভাব অ-ভাবের মাঝে একটা আচ্ছন্নতা। কেবল এইটুকু বলতে পারি, নীরুর ওপর রাগ হয়নি, ওকে দোষ দিয়ে নালিশের কথা মনে আসেনি, ওর মন সম্পর্কে অন্যায় কিছু মনে হয়নি। কারণ ওর মন ছোট, এ আমি বিশ্বাস করি না। কেন জানি না, তখন গুরুদেবের মুখখানি একবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।'...

অচিনদা চুপ করেন। ওঁর চোখ বোজা। ভুরু ওপর দিকে টেনে তোলা। আমি স্থান কাল পাত্র ভুলে যাই। চেয়ে থাকি নিমেষহারা চোখে। অচিনদার গলা বেজে ওঠে, 'ভিতরের দরজার পর্দাটা একবার দুলে ওঠে। যেন কেউ ঢুকতে এসে ফিরে গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। আর একবার ইচ্ছে করল, ওর কাছে যাই, পারলাম না। মনের জোরের অভাবে নয়, দূষিত চোখগুলোকে করুণা আর উদারতা দেখাতে দিতে ইচ্ছে হলো না। বললাম, "নীরু, হয়তো শেষ, তবু আছি, জেনো। চলি।"

'আমার কথা শুনে ও যেন চমকে উঠল। ঝাপসা ভেজা চোখ নিয়েই চমকানো ভাব নিয়ে তাকাল। বলল, "চলে যাচ্ছ?"

'আমি তখন উঠে দাঁড়িয়েছি। বললাম, "হ্যাঁ, যাই। দুপুরের গাড়িতেই ফিরব।" বলে দরজার কাছে যেতে যেতেও মনে হলো, কী কথা যেন বলা হয়নি। পুরুষের মন তো, একটা কী যেন তার মনের মধ্যে থেকে যায়। তাই আর একবার ফিরে তাকিয়ে বললাম, "নীরু, চিঠিতে যে লিখেছ, 'তুমি বড় খারাপ, বিষের মতো খারাপ'", এখনো তা-ই আছি তো?

'কথাটা শুনে নীরু স্থির থাকতে পারল না। আবার দু' হাতে মুখ ঢেকে ফেলল, ফুলে ফুলে উঠে চুপি চুপি গলায় বারে বারে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।"...দরজা খুলে পথে বেরিয়ে এলাম, সবই একটু ঝাপসা লাগছিল। কিন্তু বুকের মধ্যে কোথায় যেন ভরে ভরে উঠল, হাসির ভরা নয়, কিন্তু সেও যেন এক সুখের ভরা। কানে বাজতে লাগল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ"। সেই দিন দুপুরেই ফিরে এসেছিলাম শান্তিনিকেতনে। কিন্তু ভায়া, এখন রাত্রি দুপুর, এর পরে আর বস্তাপচা গল্প জমবে না। নরোত্তমের খোঁজ করতে হয়।'

অচিনদা কথা শেষ করেই, ফস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালেন। নিবে যাওয়া চুরুটে দেন আগুন। দু' গালেতে ঢেউ তুলে জোরে জোরে টানেন। কিন্তু আমি যেন দিশাহারা বিভ্রান্ত। যেন কার হাত ধরে চলেছিলাম অচিনের অন্ধকারে। সহসা হাত ছেড়ে যায়। পথ হারিয়ে ঠেক খেয়ে যাই, ধন্দে পড়ি। পথের কোন্ সীমানায়, কোন্ দূরত্বে আছি, টের পাই না। তাই অচিনদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

রাত দুপুরের হিসাব কে মনে রেখেছে হে। অচিন-নীরজার সংবাদ যেখানে এসে ঠেক খেয়ে গেল, সেখানে আমি পথহারা। সংবাদের শুরু শুনিনি। শেষ পেয়েছি বলেও মনে হয় না। অন্তরা শুনিয়ে গায়ক থামেন। শ্রোতা এখন আপন দায়ে অস্থায়ী আর আভোগের লাগি উৎকর্ণ। এখন তার স্থানকালের হিসাব নেই।

কিন্তু অচিনদার মুখে আবার সেই আগের মানুষ জাগেন। মিটি মিটি হেসে, হাত তুলে, কব্জির ঘড়ি দেখান। বলেন, 'আর নয়, চলো এবার ফেরা যাক।'

আমি বলি, 'কিন্তু শুরু আর শেষ পেলাম না।'

অচিনদা হাসেন। কেন যেন মনে হয়, উনি আমার কাছে এসেছেন আরো। অনেক বেশী চেনা, অনেক অন্তরঙ্গ। সময়, তুমি অক্লান্ত যাও। বয়স, তোমার বিবেচনা নিয়ে বিদায় হও। অচিন প্রৌঢ়ের কোনো বয়স নেই। আমি দেখি, বহু দিনের চেনা এক বন্ধু আমার সামনে। বলেন, 'গল্প-লিখিয়েদের নিয়ে এই মুশকিল। তাদের মাঝখান দিয়ে কিছু বোঝানো যাবে না, শুরু চাই, শেষও চাই। কিন্তু ভায়া, আমি তো গল্প-লিখিয়ে নই। ওসব ধরতাই আর শেষ জানি না।'

আমি বলি, 'কিন্তু এদিকে যে মন মানে না।'

অচিনদা জোরে হেসে উঠে আমার পিঠে চাপড় দেন। আমার কথার জবাব না দিয়ে হাঁক দিয়ে ডাকেন, 'কই রে, তোরা সব গেলি কোথায়?'

প্রথম জবাব দেয় বুড়ো শুন্ডি। ঝিমুনি কাটিয়ে বলে, 'এই তো আছি।'

বলে সে কাঠ খুঁচিয়ে আগুন উসকে দেয়। নরোত্তম অন্ধকার থেকে আলোয় উদয় হয়। দেখি, তার পিছু পিছু মাংরি। ক্যানে, ই দুটোতে কুথা ছিল হে। নরোত্তমের চোখে রসের ঝিকিমিকি। তবু রক্ষে, হাত পা টলোমলো না। সে-ই যে আমাদের সারথি।

মাংরি বলে নরোত্তমকে, 'কী রে, লাচ শিখবি না?'

বলে, হাসে খিলখিল করে, আগুনের যেমন শিস কাঁপে তেমনি শরীর কাঁপিয়ে। নরোত্তম যেন জ্বরো স্বরে জবাব দেয়, 'আর না, বাবুদের লিয়ে যেতে লাগবে না!'

অচিনদা বলেন, 'ও বাব্বা, এর মধ্যে আবার লাচ শেখাশিখিও হচ্ছিল। তা বাবা, লিয়ে যেতে পারবে তো?'

নরোত্তম বলে, 'অই কী বলেন গ বাবু, তা আর পারব না!'

মাংরি গিয়ে আবার বুড়ো শুন্ডির পাশে বসে। আর একদিক থেকে এগিয়ে আসে বরহম। অচিনদাকে বলে, 'চললি?'

অচিনদা উঠতে উঠতে বলেন, 'তবে কি সারা রাত এই জঙ্গলে বসে থাকব নাকি!'

বরহম বলে, 'খালি তো উই খোকাবাবুটার সঙ্গে কথা বুইললি। টুকুস লাচ করলি না, গান করলি না।'

অচিনদা বলেন, 'আবার হবে।'

আমিও উঠি। বরহমের তখন জিভ ভারী, তবু কথায় পেয়েছে। বলে, 'আবার কবে হবে! আর কি তুই আসবি! বুইললি, ছেলেটাকে লষ্ট করবি, তাও করলি না, শুকনা মুখে লিয়ে যেইছিস্।'

অচিনদা একবার আমার দিকে চেয়ে হাসেন। বলেন, 'আরে, ওর কি কিছু আছে যে নষ্ট করব, এ ছেলেটা একেবারে পাক্কা নষ্ট।'

এবার আওয়াজ দেয় মাংরি, 'অই, মিছা ক্যানে বুইলছিস, লষ্ট মানুষ অইরকম লাগে না।'

তার জবাব দেয় বুড়ো শুন্ডি, 'মাংরির হাতে দিলে দেখতে, কেমন লষ্ট করতে পারে।'

বলে সে হাসে। তার চেয়ে জোরে, খিলখিলিয়ে বাজে মাংরি। আর মাংরির বাবা স্বয়ং বরহম ঘাড় দুলিয়ে বলে ওঠে, 'হুঁয় হুঁয় হুঁয়।'

অচিনদা নকল কোপে ভুরু কুঁচকে তাকান মাংরির দিকে। আমি অবাক লজ্জা মানি। কেমন কথা, কত সহজে সবাই ভাবে। আবার বাপ বলে হুঁয় হুঁয়। অচিনদা মুখ ফিরিয়ে বরহমকে জিজ্ঞেস করেন, 'এরা সব কোথায় গেল? শরৎ, তোদের বউয়েরা?'

বরহমের শরীরে একটা দোলা লাগে। হাতের ঝাপটা দিয়ে মাতাল ভঙ্গিতে বলে, 'আ দুর, অই উখানটোয় সব ঘুমাচ্ছে।'

'তবে যা বাবা, তুইও গিয়ে ঘুমো, আমি চলি। এসো হে। চল রে নরোত্তম।' অচিনদা পা বাড়ান। বরহম টলতে টলতে এগিয়ে আসে, 'না, তুই অখন যাস না। বস ক্যানে, রস খাবো না তোর সাথে?'

অচিনদা না থেমেই বলেন, 'খুব হয়েছে, আজ আর না।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। বরহমও সঙ্গে সঙ্গে এগোয়, বলে, 'না না, অই

অচিনবাবু, একটু থাক, যাস না। দুটো কথা হলো না, তুই হাসলি না, কাঁদলি না। একবারটো কেঁদে যা, আমরাও কাঁদব, পিতি বছরের মতন।'

আমি অবাক হয়ে অচিনদার দিকে তাকাই। অচিনদা বলেন, 'বাজে কথা, মাতালের প্রলাপ, ওসব শুনো না।'

তবু আমার মনে ধন্দ লাগে। প্রলাপ বটে, তবু কথার মধ্যে কেমন একটা ঘটনার সংকেত ফোটে যেন।

বরহম প্রতিবাদে গোটা শরীর নিয়ে ঢলে পড়ে, 'অই, বাজে বুইলছিস ক্যানে। তুই কাঁন্দিস না? আমরা কাঁন্দি না?'

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে অচিনদা বলেন, 'যা এখন যা। মাতাল হলে সবাই সব করে।'

বরহম তেমনি বলতে থাকে, 'তুই কত কথা বলিস, কত কাঁন্দিস, অই অচিনবাবু।'

বলতে বলতে সে অচিনদার একটা হাত টেনে ধরে। অচিনদাকে দাঁড়াতে হয়। নরোত্তম হুকুমমাত্রই বাতি জ্বালিয়ে গিয়েছিল। সে আমাদের আগে আগে। আমি দুই বন্ধুকে দেখি। দেখি, এখন আর অচিনদার হাসিটি তেমন এড়িয়ে যাবার ভোলানো হাসি না। বলেন, 'আরে, খালি কাঁদলে কি কাঁদা হয়! মনে মনে কাঁদা হয় না?'

বরহম একটু ভাবে, তারপরে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলে, 'হুঁয় হুঁয়। মনে মনে হয়। তবে তুই চলে যেইছিস!'

'হ্যাঁ।'

বলে অচিনদা একবার বরহমের হাতটা ধরেন। ওদিক থেকে বুড়া শুন্ডি বলে, 'আবার এস গ অচিনবাবু।'

'আসব।'

বরহম অচিনদার হাতটা ছেড়ে দেয়। ঘাড় নাড়িয়ে বলে, 'আচ্ছা, যা। আবার এক বছর পরে আসিস। ই বাবুটোকে লিয়ে আসিস।'

বলে সে আমার পিঠে একটু চাপড়ে দেয়। জিজ্ঞেস করি, 'তোমরা বাড়ি যাবে না?'

'না। কাল সক্কালে চলে যাবো।'

অচিনদা এগিয়ে চলেন। আমার দিকে ফিরে আবার বলেন, 'মাতালের কথা।'...

মনে মনে বলি, তা জানি না। অচিনদা কেবল বরহমকে মাতাল বলেন, না নিজেকেও, বুঝি না। কেবল এইটুকু বুঝতে পারি, অচিনদা ওদের সঙ্গে বসে কথা বলেন, হাসেন। ওরাও হাসে। অচিনদা কাঁদেন, ওরাও কাঁদে। ছবিটা মনে মনে আঁকি আর মনে মনে জিজ্ঞেস করি, কী বলে কাঁদেন অচিনদা। সেই ছবিটাও আমার একটু চাক্ষুস করতে ইচ্ছা করে।

বাঁশঝাড়ের আড়াল ছাড়িয়ে ঢিবির নিচে নেমে আসতেই উত্তর-পশ্চিমা হিমেল হাওয়ার থাবা ঝাঁপিয়ে পড়ে। গালে গলায় আঁচড়িয়ে দেয়। তবু অন্ধকার যেন অনেক সহনীয়। নরোত্তমের আলোর চেয়ে চোখের জ্যোতি কাজ করে অনায়াস।

অচিনদা যেন নতুন করে কিছু শুরু করেন না, এমনি সহজ গলায় বলেন, 'শুরুটার মধ্যেও এমন কিছু নেই যে, তোমাকে চমকে দিয়ে অবাক করে দিতে পারি। আমরা সেকালের লোকেরা এখনো বলি, প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে। মেয়ে-পুরুষ নিজেরা পেতে রাখে বলে বিশ্বাস হয় না। কে পেতে রাখে তাও জানি না। বিষয়টাকে যদি প্রকৃতিঘটিত মনে করি, তা হ'লে বলতে হয়, ফাঁদ পাতা যার কাজ, সে-ই পেতে রাখে। ধরা যাদের পড়বার, তারা ধরা পড়ে। তবে হ্যাঁ, ফাঁদের চেহারাটা নানাখানে নানারকম। আমাদের ফাঁদের রঙটা ছিল সবটুকু লাল। কারণ, তখন হেমন্তকালের শেষ, শীতের প্রায় আরম্ভ। শান্তি-

নিকেতনের শীতের আরম্ভ যারা দেখেছে—দেখেছে বলতে শুধু চোখের দেখাই বলি না, যে দেখাটা মরমের ভেতর অবধি কাজ করে সেই দেখার কথা বলছি, সে আর জীবনে কখনো তা ভুলতে পারবে না।

'যাই হোক, ফুল-ফলের কথা বলছি না, কিন্তু সব মিলিয়ে এত লাল অন্য সময়ে বোধ হয় দেখা যায় না। লাল মাটিতে তখন ধুলোর ছড়াছড়ি সবখানেই, মাঠে-ঘাটে-পথে, গাছের গায়ে গায়ে, পাতায় পাতায়, বাড়ি-ঘরের দেওয়ালে, বেড়ায়। তার ওপরে তখন খেলার মাঠের ওপারে পশ্চিমের কোণে সূর্য লাল টকটকে। বলতে পারো সময়টা বিকেল। একে তো লাল মাটির ধুলোয় সব রাঙা, তার ওপরে লাল সূর্যের ছটায় সবই আরো বেশী লাল। সেইজন্যেই বলছিলাম, ফাঁদটার রঙ ছিল লাল। রূপের সঙ্গে শব্দের কথাটাও আসে। বোধ হয় একটু বেশী করেই আসে। যদিও রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর, তবু এ প্রসঙ্গে তোমাকে একটা কথা শুনিয়ে রাখি। তোমরা, হালের লেখকরা, কীভাবে ভাবো সবটা জানিনে, গুরুদেব একবার বলেছিলেন, যদি দৃষ্টি আর শ্রবণ, দু'টোর কোনো একটা আমাকে হারাতে হয়, তবে আমি দৃষ্টিটাকেই ছাড়তে রাজী আছি, কিন্তু শ্রবণকে নয়। তার মানেই বুঝতে পারছ, বাণীর জগতেই এ মানুষের কাব্যের সংসার পাতা ছিল, শব্দ যেখানে নিত্য-অনিত্যের খেলায় লীলা করেছে। এ মানুষ কখনো গান না বেঁধে পারেন? সুর দিয়ে গান না গেয়ে পারেন?

'কিন্তু এসব কথা থাক। সামান্যের মধ্যে অকারণ এসব অসামান্যের আমদানি করা মিছে। এ আমার একটা দোষের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। যা বলছিলাম, ফাঁদের লাল রঙে শব্দ যেগুলো ছিল, তার মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ছে, গলা খোলবার আগেই গলার আড় ভাঙবার জন্যে একটা কোকিলের অস্পষ্ট ভাঙা-ভাঙা ডাক। জানিনে, কখনো সেরকম ডাক শুনেছ কিনা, বলতে পারো, ভেতরের আবেগটা গলায় তখনো ভালো করে ফোটেনি। সবেরই একটা সময় আছে তো। পাখিদের তখন ঘরে ফেরার সময় হয়ে এসেছে, তবে দল বেঁধে ডাকাডাকি আরম্ভ হয়নি, দু'চারটে হঠাৎ হঠাৎ শিস্, পিকপিক কিচকিচ গাছের ঝুপনিতে, ঝাড়ে। একটু ভালো করে কান পাতলে ঝিঁঝির ডাক শোনা যায়।

'ঘরে যাবার আগে একলা-একলা শেষ পাক দিয়ে ফিরছিলাম রেল-লাইনের দিক থেকে। তখন নতুন সিগারেট খাওয়া শিখেছি। তবে আশ্রমের বাইরে বিকেল-সন্ধ্যেয় ঘুরে বেড়াবার সময়ে এক-আধটা। পকেটের মধ্যে সেটা খোঁচাচ্ছিল বলে খেয়ে ঢোকবার মনস্থ করলাম। আদি বাড়ির দক্ষিণে ফটকের কাছ থেকে খানিকটা বটতলার দিকে এগিয়ে ঠোঁটে সিগারেট চেপে যেমনি দেশলাই জ্বালতে যাবো, পেছনে পায়ের শব্দ। চমকে সিগারেট নামিয়ে ফিরে তাকাতেই দেখলাম, ডোরাকাটা শাড়ি-পরা এক মেয়ে। বিকেলে বাঁধা চুল, একটু লম্বা মুখে ডাগর দু'টো চোখ। চোখ দু'টিতে কৌতুকের ঝিকিমিকি, পাছে হাসি ছিটকে পড়ে তাই মুখে হাতে চাপা। আমার মুখে তখনো ধরা-পড়ে-যাওয়া চমকের ভাবটা যায়নি। কয়েক মুহূর্ত সেই অবস্থায় থেকে মেয়েটি আমার সামনে দিয়েই এগিয়ে গেল। যাবার সময় কাছাকাছি আর একবার আমার মুখের দিকে তাকাতেই হাসি সে ধরে রাখতে পারল না, খিলখিল করে বেজে উঠল। তার ডোরা শাড়ি-পরা শরীর বেঁকে গেল হাসিতে। কয়েক হাত গিয়ে আবার ফিরে তাকাল, আবার হাসি, তারপরে বাঁয়ে মোড় নিয়ে অন্তর্ধান। ব্যাপারটা বোধগম্য হয়ে যখন নিজেকে ঠাট্টা করে হেসে ফেললাম, তখন পাখিদের কিচিরমিচির শুরু হয়ে গেছে। চোখ আর মনের সবখানে জেগে রইল শুধু একটি মুখ।

'তোমাদের ভাষায় এটাকে যদি একটা গল্পের শুরু বলা যায়, তবে সেটা যে

বস্তাপচা, তাতে সন্দেহ নেই। আরো সন্দেহ নেই, কারণ প্রেম বলে একটা ব্যাপার, তার মধ্যে কত কিছু থাকে, কত কথা, কত বিচিত্র তার গতিবিধি, রীতি, কিন্তু আমাদের ফাঁদে পড়ার প্রাথমিক আচরণে দেখা গেল, চোখাচোখি হলেই কেবল হাসি। নীরজা তখন বোধ হয় নবম শ্রেণীর ছাত্রী—তোমাদের গল্পের আসরে যে মেয়েরা, নায়িকার পোস্ট পাবার একেবারেই অযোগ্য। ম্যাট্রিক পাস করে আমার তখন কলেজের শিক্ষা চলছে। দেখাদেখি চোখাচোখি হলেই কেবল হাসাহাসি। নীরজার মুখে রঙ লেগে যায়, লজ্জায় অন্য রকম হয়ে যেতো, তার নামই জানাজানি। আমার মুখের রঙ কতখানি বদলাত জানিনে, তবে কান-টান গরম হয়ে উঠত, বুকের কাছটায় রক্ত যেন ছলাত ছলাত করে আছড়াত।

'এ সব কেমন করে ঘটেছিল তা বলতে পারব না। প্রথম দিকে বলতে পারো, দেখাদেখি চোখাচোখি করাটা, লেখাপড়া করতে, চলায়-ফেরায় আপনা-আপনি যতটুকু হতো ততটাই সম্বল। তারপরে দেখা গেল দুই মন, দুই প্রাণ তাতে তৃপ্ত নয়, নিজেদের ইচ্ছে আর চেষ্টা এসে যোগ দিল, কেমন করে একটু নিরিবিলিতে বেশী দেখাদেখি চোখাচোখি হয়। সে ইচ্ছে আর চেষ্টাও সফল হলো, কিন্তু কাছাকাছি যাওয়া নয়। একটু দূর দূর থেকেই, "নয়নে নয়ন দিয়া" তাতেই ভায়া, "যৌবনের বনে মন হারাইয়া" যায়, আর "গায়ে আমার পুলক জাগে, চোখে লাগে ঘোর; হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে রাঙা রাখির ডোর।" এমন একটা প্রেমোপাখ্যানকে তোমরা এক কথাতেই ঠোঁট উলটে নাকচ করে দেবে; এখন আমিও তাই দেবো। কিন্তু আমার যে তখন, "আমি যে আর সইতে পারিনে, সুর বাজে মনের মাঝে গো, কথা দিয়ে কইতে পারিনে।"

'তৃতীয় ধাপটা তোমাদের আধুনিকদের কাছে সব থেকে হাস্যকর মনে হবে, কিন্তু আমাদের সময়ে সেটাই অনেকখানি। শুরু হলো পত্রালাপ। পত্রালাপের গতিবিধি এখনকার আমলের গোয়েন্দাদেরও হার মানায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অনেক লোমহর্ষক ঘটনায় দেখলাম, কবরখানায় দলিল রেখে পাচার হয়েছে, ফিল্মের রীল রেখে দিয়েছে পাচারের জন্য সামান্য একটা নিরীহ পার্কের রেলিং-এর ফুটোর মধ্যে, তেমনি করেই লক্ষ লক্ষ ডলার মার্ক পাউন্ড রুবল। কিন্তু তার বহু আগেই ছাতিমের গুঁড়ির গর্তে, অমুক জায়গায় শালের চিড়-খাওয়া ফাটলে, অমুক জায়গায় নিচু আমগাছের মাঝখানে, নয়তো নিতান্ত কোনো ঝোপেঝাড়ে আমরা অন্য দলিল পাচার করেছি, আর সে স্পটও খুবই নিরীহ, নিতান্তই চোখের তৃষ্ণায় আর কাব্যের দৌলতে তার পরিচয়। অবিশ্যি আগের চিঠিতেই জানাজানি থাকত, পরবর্তী ডাকঘর কোথায় হবে, কোন্ গাছে, কোন্ ঝোপে, আর সেটা উভয় পক্ষ থেকেই। সেইজন্যেই বোধ হয়, যুদ্ধ আর প্রেম কোনো লিখিত-কথিত রীতিনীতির মধ্যে নেই। সে পত্রালাপের বয়ান যদি শোনো, মাঝরাত্রে এ খোয়াইয়ের মাঠে পাগলের মতো হেসে উঠবে। প্রথম দিকে তো কেবল কবিতার ছড়াছড়ি, নিজের কথার চেয়ে উদ্ধৃতিতেই ঠাসা, প্রাণ খুলে নিজেদের মনের কথা বলতেও যে লজ্জা! তখন কেবল বন্দীদশার কান্নাকাটি, কাছে যাবার আকুলতা। তাতেই বছর ঘুরে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বছরও ঘুরে যেতো, কিন্তু—।'

অচিনদা হঠাৎ থামেন। এক মুহূর্ত থেমেই আবার যেই শুরু করেন তখন ওঁর গলার সুর বদলে যায়। বাঁশঝাড়েও যে স্বর শুনিনি, সেই স্বর বেজে ওঠে। হঠাৎ যেন কেমন চুপিচুপি ভয়-পাওয়া ব্যগ্র গলায় বলে ওঠেন, 'কিন্তু সে কথাটা বলতে এখনো কেমন যেন হয়ে যাই, গলার স্বর ঠিক থাকে না। এমন কি ওই বরহমের কথাই সত্যি হয়ে যাবে, ভেউ ভেউ করে কাঁদতে আরম্ভ করব। তখন তুমি এই

বুড়োকে নিয়ে ভারী গোলমালে পড়ে যাবে ভায়া।'

বলেই সত্যি সত্যি কাঁদেন না, কাশি পাওয়া গলায় হা হা করে হেসে ওঠেন। শুনতে যতই ভারী লাগুক, এ হাসি যেন আমাকে বিঁধে যায়। অচিনদার দিকে ফিরে তাকাই। ওঁর মুখ দেখতে পাই না। কিন্তু যেখানে এসে থামেন, তার ওপারের অন্ধকারে তখন আমার আপন খোঁজাখুঁজি। আমার ব্যগ্র চোখের দৃষ্টি সেখানে আতুর হয়ে ফিরে মরে। তাই মুখ ফুটে আপনি বেরিয়ে যায়, 'তবু?'

'তবু?'

অচিনদা প্রায় হুমকে ওঠেন যেন। বলেন, 'খুবই প্রাণঘাতী লাগছে যেন, অ্যাঁ? আমি কাঁদি-মরি যাই হোক, শুনতেই হবে, না? অলকা আর আমিই তোমাকে ঠিক বুঝেছি। কপট আর নিষ্ঠুর। আসলে নিজের তৃপ্তিটুকু নিয়ে সরে পড়া। আর লেখক যখন পাঠক হয়, সে পাঠকের জাত আলাদা, তাও জানি। এখন রস নিঙড়ে না বের করলে শান্তি নেই।'

তাড়াতাড়ি বলি, 'না, না অচিনদা, আমি—।'

'তুমি থামো হে ছোকরা। তুমি নতুন কিছু নও।'

'তা ঠিক।'

'সত্যি?'

বলে হেসে আমার কাঁধে হাত রাখেন। বলেন, 'বলব হে, তোমাকে বলব বলেই মুখ খোলা। আর এই মুখ খোলার মুখে—হ্যাঁ, এ একটা সুখ বলতে পারো, যদি একটু কাঁদিই, না-হয় কাঁদবই। তবে অতটা গড়াবে না। আসলে পত্রালাপের বন্দীদশা থেকে যেদিন প্রথম ছাড়া পেয়ে দু'জনে কাছাকাছি হয়েছিলাম, সেদিনটার স্মৃতি বড় বেশী উতলা করে তোলে। এমন উতলা আর কোনোদিনের স্মৃতিই করে না, কেন; তা বলতে পারিনে ভায়া।

'শুরুর অংকটা এই একটি দিনের কথাতেই শেষ করব, বাকিটা রেখো তোমার কল্পনার মধ্যে। দ্বিতীয় বছরটাও ঘুরে যেতে গিয়ে বসন্তোৎসব এসে গেল। সেবার নতুন গান, নতুন পালা। এই যদি তোমার প্রথম আগমন হয়, তবে বসন্তোৎসবের চেহারা তুমি জানো না। শান্তিনিকেতনের অধিকাংশ উৎসবই প্রকৃতির সঙ্গে মেলানো, সবগুলোকেই বলতে পারো ঋতুর উৎসব। আমবাগানের যেখানে সবাই আসে, সভা বসে, সেখানে আলপনা ছবি আবীরের ছড়াছড়ি। সন্ধ্যে হতে-না-হতেই বাতির আয়োজন। আমাদের সকলের কাজ, সকলেই ব্যস্ত। নীরজা আলপনা দিয়েছিল মেয়েদের সঙ্গে। চুলে তেল দেয়নি, বাসন্তী রঙের শাড়ি পরেছিল। সন্ধ্যেবেলা সকলের মাঝখানে ওকে একটু আবীর ছোঁয়াতে গিয়েই বন্দীশালার গারদে ভাঙন ধরেছিল। তারপরে সমস্ত ব্যাপারটা বলতে পারো নিশি পাওয়ার মতো। নীরু যেখানে বসেছিল, সেখান থেকে কেবলই আমাদের চোখে চোখ পড়ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, সেদিন লজ্জা আর হাসির চেয়ে যেন অন্য কিছু আমাদের মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল।

'চাঁদের সেটা কত বড় কারসাজি, তুমি হয়তো কল্পনা করতে পারছ না। যে চাঁদ সেদিন আদি বাড়ির পাশ ঘেঁষে পূব কোণ ঘেঁষে উঠেছিল, তার বর্ণনা দিতে পারি সে ক্ষমতা আমার নেই। মনে হলো, আমবাগান থেকে আমলকীবনে দুটো কোকিল ডাকাডাকি করছে। গান শুরু হবার আগেই দেখলাম, নীরু মেয়েদের কাছ থেকে উঠে চলে গেল। চোখের পাতা ফেলতে ভুলে গেলাম। বুকের কাছে যেন রক্তের উথালিপাথালি ঢেউ। দেখলাম, সে আস্তে আস্তে দক্ষিণের ছায়ায় ছায়ায় চলে যাচ্ছে। বলতে পারো চৌর্যবৃত্তি। কিন্তু স্থির থাকা দায়। নীরজা যদি এমন সাহসে বুক বাঁধতে পারে, আমি তবে কোন্ বসন্তোৎসবের শরিক। আমিও তবে চলি। বন্ধুদের

চোখ ফাঁকি দিয়ে ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে গেলাম। একেবারে নির্জনে, সভার বাতির সীমানার বাইরে, কেবল আঁধারের ছায়ায় এক গাছতলায় আবিষ্কার করলাম ওকে। কাছে গিয়েও দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। গান তখন শুরু হয়েছে। একবার ডাকতে চাইলাম, দেখলাম গলায় স্বর নেই। শরীরও প্রায় বিকল, তবু কাছে গিয়ে ওর একটা হাত ধরলাম। ঠান্ডা ভেজা-ভেজা হাত, কিন্তু নিশ্বাস পড়ছে ঘনঘন। আমি ওকে কাছে টেনে নিতেই বুকের কাছে নুয়ে পড়ল। সেবারে সেই আমার বসন্তোৎসব, "বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল উতলা।" এর বেশী আর কিছু বলতে পারিনে।'

অচিনদা চুপ করেন। আর আমি, আমার যুগের দূর-পারের কোনো এক অন্য-লোকে ডুবে যাই। আমার কাছে তখন আর জানাচেনা ব্যক্তির ঘটনা মূল্যহীন। তখন যেন সেকাল-একালের সময় ছাপিয়ে একটা চির সময়ের সুরে বেজে ওঠে,

আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে
তোমার আমার মেলা,
দূরে কাছে ছড়িয়ে গেছে,
তোমার আমার খেলা।

অচিনদা আমাকে টেনে থামান। বলে, 'দাঁড়াও হে, ওকে এখন গাড়িটা ঠেলে তুলতে দাও। এবার রাস্তায় উঠতে হবে।'

চমক লাগে না। টান লাগতেই দাঁড়িয়ে যাই। দেখি সামনে উঁচুতে রাস্তা। নরোত্তম ওপরে উঠে বাতি রেখে রিকশা টেনে তুলছে। অচিনদার দিকে তাকাই। তাঁর বুকের দিকে। সেই বুকে, এক বসন্তোৎসবের সন্ধ্যায়, আমগাছের ছায়ায় এক ফুল ফুটেছিল। এখন সেখানে শূন্য। সে কথা বলতে গিয়ে উনি কাঁদেননি জানি। কিন্তু এখনো বুকে গন্ধ, এখনো স্পর্শের অনুভূতি। এ মানুষের কাঁদবার সময় কোথায় এখন। এ মানুষ হয়তো এখনো কেবল খুঁজে খুঁজে ফেরে।

নরোত্তম রিকশা রাস্তায় তুলে ডাকে, 'আসেন বাবু।'

অচিনদার সঙ্গে গিয়ে রিকশায় উঠে বসি। নরোত্তম নিজের জায়গায় বসে রিকশা চালাতে পারে না। তাকে দু' হাতে জোরে ঠেলে চালাতে হয়। ফেরবার পথ চড়াইয়ের মতো উঁচু। অচিনদাই জিজ্ঞেস করেন, 'কী রে, নামব নাকি? ক্যানেলের ধার পর্যন্ত হেঁটে যাই চল।'

নরোত্তম বলে, 'না বাবু, বসেন, লিয়ে যাবো ঠিক।'

এখন সে হয়তো তা পারে। দ্রব্যভারে এখন রক্ত তার টগবগানো। রসের উত্তাপে উষ্ণ। তা না হলে এই খোয়াইয়ের খোলা দিগন্তে, নিশীথে, পৌষ বাতাসের ছোবলানিতে দুটো মানুষসুদ্ধ রিকশা চড়াইয়ে টেনে তোলা সহজ ছিল না। এখন তার বুকে পাঁজরায় জবর তেজ হে। ক্যানে কিনা, মাংরির কাছে যে লাচ শিখছিল, সে কথাটাও ভুললে চলবে না।

কিন্তু এসব হলো বাহির দুয়ারের ঢেউ ছলছল। আমার ভিতর দুয়ারের খোলা স্রোতে জল চলন্তা। সেখানে টানের রীতি আলাদা, আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। অথচ ঘূর্ণিধাক্কায় ঠেক খেয়েছি। শুরুর অঙ্কটা এক দিনের ছবিতেই অনেক কল্পনার লাগাম খুলে দিয়েছে। অনেক দুপুর-সন্ধ্যার নিরালা নির্জনে, পাখি-ডাকা ঝোপে-ঝাড়ে যেন দুটি ছেলেমেয়ের অনেক কূজন শুনেছি। হাসিতে কাঁদনে উদ্বেগে বেয়াকুল প্রাণের প্রেম থরথর। তারপর সন্দেহ, জিজ্ঞাসা, সাবধান, শাসন, বিচ্ছিন্নতা। তবু ভিতর দুয়ারের চলন্তায় 'শেষ' পাওয়ার টান লেগেছে। থির থাকতে পারি না। তাই জিজ্ঞেস করি, 'আর শেষ?'

অচিনদা ঘাড় নেড়ে বলেন, 'কী নেই-আঁকুড়ে তুই! এবার আভোগ চাই। কিন্তু

"শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?"'

বলে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলেন। দুঃখে না বিবাগে, বুঝতে পারি না। তাই অবাক হয়ে ফিরে দেখি। অচিনদার মুখ সামনের দিকে। মুখের ভাব বুঝি না। তবে 'তুই' ডাকেতে আমার যেমন মন তরতরিয়ে যায়, মনে হয় তেমনি ওঁরও কোথায় যেন চোখের জল-গলানো হাসির জোয়ার ভেসে যায়। মনে মনে ওঁর কথাই আওড়াই। কিন্তু অর্থ কী! কথা কোন্ ধারাতে বহে!

সেই বহমানতা থেকেই আপনি ভেসে ওঠে, 'তা হলে তো আর এক কিস্যা বলতে হয়। সেটা তোমাদের সাহিত্যের ভাষায় বোধ হয় অ্যান্টি-ক্লাইমেকস্ বলে। এখনকার যুগে ওসব চলে কিনা জানিনে, তবে আমাদের যুগে ভাষা—সব কিছুতেই প্রচুর ক্লাইমেকস্ অ্যান্টি-ক্লাইমেকস্-এর ছড়াছড়ি। তোমার ভালো লাগবে কী?'

'লাগবে।'

'তা বটে। মাতালের যেমন একটু খেলেই আরো লাগে।'

এর পরে আর কথাকারের গৌরব করতে ইচ্ছা করে না। গৌরব দিই অচিনদাকে। বলেন, 'তবে শোনো, মাতালের নেশাই যোগাই। আমার চাকরিটা যে একটু উঁচু, লম্বা ঘাড়ে গর্দানে, বুঝতেই পারছ। এর চাপে পড়লে অনেকেরই যমপেষ হয়ে মারা পড়ার ভয়। তবে আমি তো নেহাত অচিন্ত্য মজুমদার, আমার সবই সয়। এই ধরো, বছর তেরো আগের কথা বলছি, তখন আমি কলকাতায় পোস্টেড। পদাধিকারবলেই ছোট বড় মাঝারি, অনেক অফিসারেরই আমি প্রায় বিধাতা। আর আমি মনে করি, সাধারণ কেরানী কর্মচারী নিয়ে তবু একরকম চালিয়ে যাওয়া যায়; কিন্তু এই যে একটি পদ, "অফিসার"—এটা আমার কাছে প্রায় অভিশপ্ত বলে মনে হয়। এদের সঙ্গে ঠিকমত চলা, যাকে বলে ট্যাকল্ করা, বড় ভয়ংকর ব্যাপার। কার যে কখন পান থেকে চুন খসে, বোঝবার উপায় নেই। তা সেসব কথা যাকগে, নানা কারণে একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসার কয়েকদিন আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি আমার থেকে দু' চার বছরের বড় হবেন।'

বলতে বলতে একটু থামেন। ক্যানেলের ধারে আলোটা ক্রমে স্পষ্ট হয়। নরোত্তম তখনো হেঁটে হেঁটে ঠেলে চলে। অচিনদা হঠাৎ আরম্ভ করেন, 'হ্যাঁ, ভদ্রলোকের চেহারাটি সুন্দর, কথাবার্তায় মনে হতো রুচিসম্পন্ন, একটু বেশী গম্ভীর। অফিসের ব্যাপারে একটু অসন্তুষ্ট ভাব। কথা দিয়েছিলাম, সুরাহা হয়ে যাবে। ভদ্রলোকের নাম মৃণ্ময় চৌধুরী। ছুটির পরে অফিস থেকে বেরোবার সময় এক-আধ দিন দেখেছি একটা কালো রঙের ভকসল্-এ করে বাড়ি যান। তখন আমি কলকাতায় মাত্র কয়েক মাস এসেছি। সব খবরাখবর নিয়ে উঠতে পারিনি।

'একদিন অফিস থেকে বেরিয়ে দেখি, চৌধুরী বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁর গাড়ি আসেনি। জিজ্ঞেস করতে বললেন, ওঁর গাড়ি কারখানায় গেছে। একটু ভিড় কমলে ট্যাক্সিতে যাবেন'। আমার তো জানো, বাড়ি ফেরার কোনো তাড়া নেই। অধিকাংশ দিনই আমার বেরোতে অনেক দেরি হয়ে যায়। প্রায়ই হোটেল থেকে খানাপিনা সেরে একেবারে গানবাজনা শেষ করে ফিরি। কোনো কোনো দিন দু-একজন বন্ধুর বাড়িতে আড্ডা। চৌধুরীকে বললাম, আমি ওঁকে পৌঁছে দিতে পারি। শুনে ভদ্রলোক যত আপ্যায়িত, তত সংকুচিত। বললেন, "আপনাকে আবার কষ্ট দেবো, স্যার।"

'আমি বললাম, "আপনি দিতে চাইলেই কষ্ট লাগবে, তার কোনো মানে নেই। প্রস্তাব তো আমার নিজের, আপনার কোনো অসুবিধে নেই তো?"

'ভদ্রলোক অতিরিক্ত মাত্রায় বিব্রত আর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "না, না স্যার, মোটেই না। আমি আপনার জন্যেই বলছিলাম।"

'বললাম, "তবে চলুন।" গাড়িতে উঠে বললাম, "ড্রাইভারকে আপনার ঠিকানাটা বলে দিন একটু।" তিনি ঠিকানা বললেন, শুনলাম আলিপুর। তোমাদের আজকাল-কার নিউ আলিপুর নয়, সেকালের সাহেবপাড়া। পথ চলতে যেটুকু কথাবার্তা হলো, অধিকাংশই অফিসের। তবে তিনি যে মানুষ হিসেবে আমার সম্পর্কে একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করেন, সেটাও জানিয়ে দিলেন। হয়তো আমার পদের জন্যেই ওরকম উচ্চ ধারণা, কেননা তা ছাড়া আর কোনো কারণ ছিল না। আমি একটু মাথা নাড়িয়ে না না বলে বিনয় করলাম। একসময়ে ওঁর বাগানওয়ালা ছোট সুন্দর বাড়িতে গিয়ে পেঁছুলাম। সব দিকেই বেশ ঝকঝকে চকচকে, একটু বেশী নিঝুম, চুপচাপ।

'চৌধুরী আমাকে কিছুতেই ছাড়লেন না, দয়া করে দু' মিনিটও যদি বসে যাই তবে নাকি তিনি কৃতার্থ হন। দু' মিনিট বসে কৃতার্থ করতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। গাড়ি থেকে নেমে গাড়িবারান্দা থেকে উঠে ওঁর সঙ্গে বাইরের ঘরে গেলাম। ঘরে ঢুকেই একটু থমকে যেতে হলো, একজন মহিলা একটি সোফায় বসে উল বুনছিলেন। বিনা বিজ্ঞপ্তিতে প্রবেশ, মহিলাও একটু অবাক হয়ে তাকালেন। চৌধুরী তখন আমাকে ডাকলেন, "আসুন, স্যার। ইনি মিসেস চৌধুরী, আমার স্ত্রী। ইনি মিঃ মজুমদার, আমাদের ডিরেক্টর, নতুন এসেছেন।"

'অতএব হাত তুলে নমস্কার। মহিলাও তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়েছেন। নমস্কারও করলেন। চৌধুরী যে খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন আমার আসাতে, মনে মনে উত্তেজনা বোধ করছেন, তা বুঝতে পারছি। তিনি কোনো দিকে লক্ষ্য করবারই সময় পেলেন না। স্ত্রীকে বললেন, "নীরজা, এক মিনিট কথা বলো, আমি ভেতর থেকে আসছি।" আমাকেও বললেন, "কিছু মনে করবেন না, স্যার, এখুনি আসছি। আপনি বসুন।"

'বলতে বলতেই ভদ্রলোক ভেতরের পর্দা সরিয়ে উধাও হলেন। আর আমি সেই যে জোড় হাত তুলেছি, তার জোড় ভাঙতে ভুলে গেলাম, চোখ ফেরাতেও ভুলে গেলাম। আমার মুখোমুখি যিনি তাঁর অবস্থাও প্রায় তথৈবচ।'

বলে অচিনদা থামলেন। আমি থাকতে না পেরে বলে উঠি, 'তারপর?'

অচিনদা তবু চুপ। সামনের দিকে তাকিয়ে যেন ধ্যানে নিরীক্ষণ করেন সেই দৃশ্য। খালের ধারের আলো তখন অস্পষ্টভাবে পড়েছে তাঁর মুখে। আস্তে আস্তে ওঁর ঠোঁটের কোণে হাসি ফোটে। বলেন, 'নামটা চৌধুরীর মুখে আগেই শুনেছি। চেয়ে দেখলাম, প্রায় নিটোল, চিবুকের কাছে এসে পাতার মতো একটু লম্বা একখানি ফর্সা মুখ। বয়স যদি চল্লিশের কাছাকাছি হয়, কেননা আমার বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ, সেই হিসেবেই বলতে হয়, সামনের মুখখানিতে বয়সের স্রোতটা যেন কোথায় থমকে রয়েছে। অথচ তরুণী যুবতী বলতে যেমন বোঝায় ঠিক তাও নয়। কী যে, তা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। ওরকম কিছু বলে সেই মুখের ব্যাখ্যা আমি করতে পারি না, কেবল এইটুকু মনে হলো, তার মুখে যেন এক বালিকার ভাব। চোখে একটু কাজলের আভাস। ঠোঁটে পানের রঙ নিঃসন্দেহে, ঠোঁট রাঙানোর রঙ দিয়ে ঠিক ওরকম রঙ করা যায় না। যাকে বলে বিদুষী, তা নয়। তার চেয়ে যেন বেশী, একটি চতুর বুদ্ধিমতী মুখ, যা তার টানা চোখের ফাঁদে ছিল। লম্বায় বেশী নয়, গড়নে একটু দোহারার ভাব। নিজের চোখের দেখায় বলতে ইচ্ছা করে, চোখে মুখে টল-টলানো কেমন একটা রহস্যের ছায়া সেই মুখে। উক্তি যদি একটু বাড়াবাড়ি হয়, ক্ষমা করো ভায়া। বড় খোঁপাটির কাছে ঘোমটা ভাঙা। আমার মনে হলো, যেন অনেক দিনের চেনা একটা ছায়া এখনো স্পষ্ট। নামটা তার আগেই আমার কোথায় যেন বিঁধে গেছে। কোথায় যে একটা উলটো স্রোতের টান লেগে গেছে বুঝতে পারলাম

না। এত জোর টান যে, কেঁপে যাবার মতো।

'একটু পরেই প্রায় অস্পষ্ট গলা শোনা গেল, "তুমি—মানে—আপনি... !"

'আমি তখন ভাবছি, ম্যাজিস্ট্রেট কেন কলকাতায়, আমার বিভাগের চৌহদ্দিতে? তাই তো শুনেছিলাম, সে হয়েছিল ম্যাজিস্ট্রেট-পত্নী। অবিশ্যি সরকারী চাকরিতেও জাতবদলের অনেক পালা চলে। তবু কলকাতার বুকে যাকে একবারও ভাবতে পারিনি, বরং প্রায়ই একটা ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠত, কোনো এক মফস্বল শহরের ম্যাজিস্ট্রেটের বাঙলো, সেখানে এক গরবিনী পত্নী সংসারের কাজে ব্যস্ত, একটি মা, তার ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে সাজাতে ছুটোছুটি করছে, সংসারের নিবিড়তায় এক গৃহিণী চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। আলিপুরের এক বিলিতী কটেজের কথা কল্পনায় আসেনি। তুমি-আপনির ধাঁধা দেখে আমাকেও মুখ খুলতে হলো, "অচিন্ত্যকুমার মজুমদার। ভীষণ অবাক হয়েছি, এভাবে ঠিক—।"

'চোখ থেকে চোখ সরাবার সময় কেউ পাইনি। জবাব এল, "আমি ঠিক ভেবে পাচ্ছি না। এখনো যেন—।" ওর কথা শেষ হলো না। আমারও না। তার মাঝখানেই চৌধুরীর আবির্ভাব হলো। এতক্ষণে ভদ্রলোকের চোখে পড়ল, ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। একটা অন্য কিছুর গন্ধও যেন পেলেন। বললেন, "কী ব্যাপার, মনে হচ্ছে আপনারা পরিচিত?"

'সেই প্রথম অবাক হওয়াটাকে এক লহমায় ভাসিয়ে দিয়ে নীরজা হেসে উঠল। বলল, "তাই তো। উনি তো শান্তিনিকেতনে ছিলেন, আমাদের পরিচয় অনেক দিনের। উনি তো আমাদের অচিনদা।"

'আমি যেন কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। 'নীরজার অচিনদা'র পরিচয়টা ওর স্বামীর কাছে তেমন ভালো লাগবে কিনা বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু পর-মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম, অচিনদার বিষয় চৌধুরী কিছুই জানেন না। তিনি নতুন খুশির উত্তেজনায় বলে উঠলেন, "তাই নাকি! আশ্চর্য যোগাযোগ তো! মিঃ মজুমদারকে নতুন পরিচয়ে পেলাম বলে মনে হচ্ছে।"

'নীরজা ওর চোখের তারায় কেমন একটু ঝলক দিয়ে হেসে বলল, "বসো, অচিনদা। অবাক হয়ে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। এভাবে দেখা যখন হয়েই গেছে।"

'ওর কথার ভাবে চৌধুরী হেসে উঠলেন। আর আমার মনে হলো, এ যেন ঠিক সেই নীরজা নয়। এখন সে কথা বলে একটু ধীরে ধীরে। কিন্তু তার চোখে মুখে রঙে ছায়ায় কেমন একটা চকিত ভাব। ঠিক মেলানো যায় না। গলার স্বর বদলে গেছে। বদলানোর ভাবটা যে কেমন, তাও ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারিনে, কেমন একটা রহস্যের আমেজ-ধরানো মিঠে। একটু বোধ হয় প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছি, কিন্তু কোনো উপায় নেই ভায়া। কনুই-ঢাকা জামায়, ঢাকাই শাড়িটা যে ভাবে সে ঘুরিয়ে পরেছে, তাতে কল্পনায় দেখা ম্যাজিস্ট্রেট-গিন্নী ছেলেমেয়েদের মা-কে কোথাও খুঁজে পেলাম না। বললাম "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বসব, কিন্তু অবাক হওয়ার ধাক্কাটাই সামলাতে পারছি না যে।"

'বলতে বলতে বসলাম। চৌধুরী কেবল খুশি বা উত্তেজিত নন, আচমকা একটা বিশেষ উপরি পাওনা হয়ে গেলে, লোকে যেমন একটু বেসামাল হয়ে পড়ে, সেইরকম অবস্থা ওঁর। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, "কই, কখনো তো তুমি ওঁর কথা বলোনি। শান্তিনিকেতনের এত লোকের কথা বলেছ, এ নামটা কখনো শুনিনি।"

'আমি আবার অবাক হয়ে নীরজার দিকে চোখ তুলতে গেলাম। নীরজা হেসে ওর স্বামীকে বললে, "কোনো কারণে ওঁর প্রসঙ্গ ওঠেনি, তাই বলা হয়নি। যদি জানতাম, ইনিই তোমাদের সেই বিধাতা মিঃ এ. কে. মজুমদার, তাহলে নিশ্চয়ই

লতাম।" বলে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল। এই চোখ, এই হাসি, আম-বাগানের বসন্তোৎসবের আলোয় দেখা সেই হাসি আর চোখ নয়। অথচ প্রৌঢ় বয়সে মনে হলো, নদীতে ভাদ্রের কোটালের মতো টেনে নিয়ে যায়।

'নীরজার কথা থেকে এও বুঝতে পারলাম, আমার কথা চৌধুরী কিছুই জানেন না। সম্ভবত বিশেষ যত্নেই সেসব গোপন রাখা হয়েছে, আর সেটা বোধ হয় ভালোই হয়েছে। নইলে নীরজা আর মৃন্ময় চৌধুরীর জীবন হয়তো সুখের হতো না। ভুল বোঝাবুঝি হওয়াটা আশ্চর্যের কিছু ছিল না। চৌধুরী বলে উঠলেন, "স্যার, পুরনো একটা পরিচয় যখন পাওয়া গেছে, একটু সময় থাকতে অনুরোধ করি।"

'নীরজা ভুরু বাঁকিয়ে একটু মিঠে শাসানির ভাব করে বলল, "অনুরোধ মানে? উনি এখন আর তোমার এক্তিয়ারে নন। আমি তো অনুরোধ করতে পারব না, আমি দাবি করব। আমি যেতে না দিলে অচিনদা যাবে কেমন করে!"

'চৌধুরী খুশিতে ডগমগ হয়ে হেসে উঠলেন। চৌধুরীর এত খুশির কারণ আশা করি বুঝতে পারছ?'

'যদি চাকরি করতে তা হলে আরো ভালো বুঝতে পারতে। তবে সেসব কথা আমি ভাবছিলাম না, দেখছিলাম আর শুনছিলাম, কত সহজে নীরজা তার দাবি ঘোষণা করছে। তারপরেই, এত বড় একটা ডিরেক্টরের সামনে তার সাবর্ডিনেট অফি-সারকে বলে উঠল, "আর দেখ বাপু, অচিনদাকে তুমি অফিসে গিয়ে স্যার স্যার করো, আমার সামনে বাড়িতে অন্ততঃ করো না।"

'তখন আমাকেই তাড়াতাড়ি বলে উঠতে হলো, "নিশ্চয়ই।"

'চৌধুরী খুশি আর উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে ঘাড় হেলিয়ে ধন্যবাদ জানালেন। নীরজা তখন শুধু কথায় নয়, সারা গায়ে, ভাবে-ভঙ্গিতে যেন ছেলেমানুষ হয়ে উঠেছে। বললে, "জানো অচিনদা, চৌধুরীর মুখে তোমার কথা শুনেছি। তোমার রূপগুণের কত প্রশংসা, কয়েক দিনই এসে বলেছেন, দিল্লী থেকে আমাদের এক ছোকরা কর্তা এসেছেন, এখনো তাঁর বিয়ে হয়নি। সত্যি অচিনদা, এখনো বিয়ে হয়নি?"

'নীরজার চোখের দিকে তাকাতে গেলাম, পারলাম না। বললাম, "না, সেটা এখনো হয়ে ওঠেনি। কিন্তু চুলে পাক ধরে যাবার পরেও যে আমি ছোকরা আছি, এটা বুঝতে পারিনি।" চৌধুরী সঙ্কোচে রাঙা হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি বললেন, "আপনি আমাদের থেকে অনেক জুনিয়র নিশ্চয়।" বললাম, "সামান্য দু-এক বছর হতে পারে।"

'কিন্তু আমি দেখছিলাম, নীরজা যেন আমার প্রতিটি রন্ধ্রকে তার টানা চোখের কালো তারার হাঁতড়ে দেখছে। ওর সেই দৃষ্টির সঙ্গে আমি চোখ মেলাতে পারছিলাম না। ও বলল, "ছেলেদের বিয়ে না হলে, তারা ছোকরাই থেকে যায়। চুলে তোমার পাক ধরেছে বটে, বিয়ের বয়স যায়নি।"

'বললাম, "তাই নাকি। তা পঁয়তাল্লিশ বছরের ফোঁপরা ঢেঁকিকে দিয়েও যদি কাজ চালাবার কথা চিন্তা করো, তা হলে কিছু বলবার নেই। তবে, মরা গাছে আর ফুল ধরানো যাবে না।"

'নীরজা সে কথা মানল না। হাসিঠাট্টার মধ্যে এক-আধটুকু বাদানুবাদের পর সে এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করল, এবার আমার একটা বিয়ে না দিয়ে সে ছাড়বে না। আমি প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্যে জিজ্ঞেস করলাম, "বাড়িটা যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে, তোমাদের ছেলেমেয়েরা কোথায়?"

'কথাটা খুব স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞেস করেছিলাম। নীরজা তাড়াতাড়ি বললে,

"সে পাট এখনো তোলা আছে। তোমরা একটু বসো, আমি চায়ের ব্যবস্থা করি।" বলে ও তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল। দেখলাম, চৌধুরীর মুখে একটু বিষণ্ণ হাসি, একটু অস্বস্তিও। বললেন, "আমাদের ছেলেমেয়ে কিছু হয়নি।"

'আবহাওয়াটা একটু ভারী হয়ে উঠল। আমি কথাটা ভাবতেই পারিনি। কিন্তু নীরজার কথাগুলোই আমার কানে বাজতে লাগল, "সে পাট এখনো তোলা আছে।" কথার মধ্যে কেমন একটু রহস্য আছে। যেন, হবে, কিন্তু হয়নি। হয়তো ব্যথা থেকেই এরকম ঠাট্টা। জানি না, তার কোনো বিদ্রূপ ছিল কি না।'

খালের সাঁকোর ওপর এসে অচিনদা থামেন। আলোয় এখন ওঁর মুখ পরিষ্কার দেখা যায়। আরক্ত ভাব আছে, কিন্তু দেখ, আবার যেন সেই অবুঝ, হাবাগোবা ছেলেটির ভাব এসেছে মুখে। একটু হেসে জিজ্ঞেস করেন, 'বস্তাপচাতেই জমজমাটি, না কী বলো হে ভায়া। বেশ জমেছে তো?'

সে জবাব আর মুখ ফুটে দিতে ইচ্ছা করে না। মনে মনে বলি, 'কী ছার গল্প লিখি। সংসারের আসল গল্পকারেরা কোথায় কী বেশে যে ঘুরে বেড়ান, দেখতে পাই না। অচিনদার কাছে কলম বন্ধক। চিরদিন যেন এমনি শুনে যেতে পারি। কিন্তু তেরো বছর আগে আলিপুরের কোনো এক গৃহের বসবার ঘরে মজুমদার আর চৌধুরীর মাঝখানের নিঃশব্দে ঠেক খেয়ে থাকতে পারি না। জিজ্ঞেস করি, 'তারপর?'

নরোত্তম এবার উঠে বসে রিকশা চালায়। অচিনদা বলেন, 'তারপর—"অনেক হলো দেরি, আজো তবু দীর্ঘ পথের অন্ত নাহি হেরি।"'

ঝাপসায় দাঁড়িয়ে হাঁতড়ে ফিরি। তাই আবার জিজ্ঞেস করি, 'কেন?'

অচিনদা যে কোথায় হারান, কোথায় ডোবেন, দেখতে জানি না। বুঝতে পারি না। সেই হারানো গভীর থেকে স্বর ভেসে ওঠে, কারণ, "এখন এল অন্য সুরে অন্য গানের পালা, এখন গাঁথো অন্য ফুলে অন্য ছাঁদের মালা।" আগেই বলেছি ভায়া, শেষ নাহি যে...। আলিপুরে সেই সন্ধ্যায়, আর একটা শুরু বলতে পারো। চা পর্বের পরেই নীরজা ছেড়ে দেয়নি। চালচুলোহীন বাউণ্ডুলে সাহেবকে সে তার কুঠিতে যেতে দিলে না। হোটেলের খানাপিনা নাচাগানায় ঠোঁট উলটে বললে, "অভক্তি!" ক্রমে চৌধুরী সাহস করে নিবেদন করলেন, আমার যদি আপত্তি না থাকে, তবে পানীয় নিয়ে বসা যেতে পারে। চৌধুরীর পানাভ্যাস আছে। আমার তো সূর্য পাটে গেলেই ছোঁকছোঁকানি ধরে। অতএব, বসা গেল। নীরজা ঢাকাই শাড়িতে কোমড়ে বেড় দিয়ে মুখে গুঁজল পান, তার সঙ্গে সুগন্ধি জর্দা। একবার রান্নাঘরে, আর একবার আমাদের মাঝখানে, দু'দিকে সমান তাল দিয়ে চলল। কথা কমই বললে। কিন্তু কথা শোনায় এক, তার অর্থ আর এক। চোখের তারা ঘুরিয়ে চোখের কথাই বেশী বললে। তা শোনা যায় না বটে, কাজ এত বেশী, নেশাটা কিছুতেই জমতে চাইল না, কোথায় যেন কী একটা বিঁধেই রইল।

'অনুমান করতে পারছ নিশ্চয়ই, এক দিনেই এই পালা শেষ হলো না, শুরু হলো মাত্র। আর কলকাতার আমলাসমাজের ব্যাপার, যে জানে, সে-ই জানে। ক্রমে ক্রমে রটে গেল বার্তা, বড় কর্তার সঙ্গে মিসেস চৌধুরীর চলছে। এই "চলছে" শব্দ বড় মারাত্মক। কতরকমে যে তাকে চালানো যায়, তার ইয়ত্তা নেই। অবিশ্যি এটা সত্যি, নীরজাই তখন আমার পরিচালিকা। সে তখন আমার ঘরে-বাইরে। তার জন্যে চৌধুরীর মুখে যে ছায়া ঘনাল, তা মোটেই নয়। তাঁর সংসারে, আমার মতো একটি নতুন শরিক পেয়ে তিনি খুশিই হলেন যেন। সন্দেহ অবিশ্বাস এসে যে তাঁকে বিচলিত করেছে, আজ পর্যন্ত তা বুঝতে পারিনি। লোকের কথায় যে তিনি কখনো

কান দিয়েছেন, তাও মনে হয়নি। বরং আমার সঙ্গে যে নীরজার একটা পুরোনো ঘটনা ছিল, সেটাও জানতে পেরেছিলেন। তার জন্যে কখনো কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। চৌধুরী-মনের রহস্যের খোঁজ তুমি করো, ভায়া। আমি কিছুই জানিনে। কেবল জানি, এখন আমি আর চৌধুরী বসে গল্প করি—বরং বলা যাক, সুর ধরি, গান করি, আমাদের মাঝখানে বসে নীরজা তাল দেয়।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এখন মানে?'

'এখন মানে, এখনো। চৌধুরী বদলি হয়ে এখন আছেন এলাহাবাদে। আমি লক্ষ্ণৌতে। অবিশ্যি, ওঁর বদলির বিষয়টা ওঁর ইচ্ছেতে আমার দ্বারাই হয়েছে। এখন ছুটিছাটায় আমি যাই এলাহাবাদে, নইলে ওরা আসে লক্ষ্ণৌতে। যদি বলতে পারতাম, এলাহাবাদ আর লক্ষ্ণৌয়ের দুটো সংসার নীরজা চালায়, তা হলেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়। কিংবা বলা যায়, এখন তিনজনের একটাই সংসার...।'

হঠাৎ থেমে বলেন, 'নরোত্তম, ডাইনে চল, বাবুকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

তারপরে একটু ঠোঁট বাঁকিয়ে ভাষেণ, 'শেষ পেলে কি, ভায়া?'

জবাব দিতে পারি না। শীত নিশীথের ঝিঁঝি ডাকা নিঃশব্দে বন্ধুর ঘুমন্ত বাড়ির সামনে রিকশা এসে দাঁড়ায়। আমি চুপচাপ নামি। অচিনদার দিকে চোখ তুলতে গিয়ে চমকে যাই। দেখি, তাঁর হিজিবিজি মুখে রেখার কাঁপন লেগেছে। চুপিচুপি স্বরে বলেন, 'এই অশেষের পালা আর সইতে পারি না, ভায়া।'

সঙ্গে সঙ্গে মোটা গলায় আদেশ করেন, 'চল রে, নরোত্তম। কাল দেখা হবে, ভায়া।'

নরোত্তম রিকশা ঘুরিয়ে চলে যায়।

আমি অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে থাকি। যে গেয়ে যায়, সে গেয়ে যায়। নিশির ঘোর লাগে অন্যজনে। আমি সেই অন্যজন। ছাতিমতলার এই সীমানায়, ঝিঁঝি-ডাকা প্রহর বহে। কী যেন এক গন্ধ দিকে দিকে, যার নাম জানা নেই। দূরের মেলা এখন নিশ্চুপ। আমার কানে বাজে শেষ কথা কয়টি 'এই অশেষের পালা আর সইতে পারি না ভায়া।'

অচিনদা আর্তনাদে বাজেননি। কিন্তু এক আর্তস্বরের ধ্বনি, আমার প্রাণে বাজে আখরের সুরে সুরে। একবারও বুঝতে পারিনি, সকাল থেকে যার সঙ্গে এত কথা, সকলই তীর-বেঁধা পাখির ডাকাডাকি। সেই উপকথাটা মনে পড়ে যায়। পাখিটা যতই কাঁটার গায়ে বুক চাপে, রক্ত ঝরে, ততই ডাকে। সেই ডাক গান হয়ে যায়। শেষের পালার এমন অ-শেষ একবারও ভাবিনি। চোখের সামনে ভাসে, পান খাওয়া ঠোঁট। রহস্যের আমেজ ধরানো চোখ। ঢাকাই শাড়ির আঁচল বিছিয়ে বসা এক নারী। কে জানে, কোন্ ঋতু লেগেছে এখন গায়ে। তাঁর দু' পাশে দুই পুরুষ। দুই চোখের তারায় দুই বাঁধা। সেই দুই তারাতে কী যে কথা, জানা যায়নি। নিঃশব্দ সেই কথার রহস্যে, কান পেতে চলে দুইজন। মুখে তাঁদের রেখা আঁকা পড়ে যায়। চুল বেবাক শাদা। তবু চলে নিরন্তর, উৎকর্ণ, কী কথা! কী যে কথা।

আমবাগানের বসন্তোৎসবের যাত্রা, ধায় নিরবধি। হাতছানি দিয়ে নিয়ে যায় কালান্তরে। আমি ভাবি, কোন্ নিয়তি, কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল এ. কে. মজুমদারকে। কে নিয়ে গিয়েছিল হে, অ-দেখার দেখায়। না পাওয়ার পাওয়ায়। অ-ধরার ধরায়। আজ অ-শেষের পালা সইতে পারা যায় না। শেষ করাও যায় কি? করতে গেলে টান লেগে যেখানটা ছিঁড়বে, সে-জ্বালা কি সইবে!

মানুষের এই অবস্থার নাম কী, কে জানে। কেবল, ভয়ে যেন শিউরে যায় বুক। সেই, হিজিবিজি রেখায়, হঠাৎ কাঁপন লাগা মুখখানি আবার দেখতে ইচ্ছা করে।

ফিরে তাকাই। কেউ নেই, ছাতিমতলার সীমানায় নিশীথের গাছপালা নীরব। অন্ধকারের পথ বিজন।

তবু যেন দেখতে পাই, কে চলে যায়, দূরের অস্পষ্ট আমবাগানের দিকে। দৃষ্টিতে তার বোধ নেই, বুদ্ধিও নেই যেন। সেই এক হাবাগোবা ছেলেটির মতো মুখ করে যে চেয়ে আছে, এপার থেকে ওপারে।

তোমার বুক যদি টনটনায়, তবু দেখ, সেথায় যেন কিসের এক হাসির জোয়ার লাগে। আমার পথ চলাতে, কী যে খুঁজি, ফিরি কিসের সন্ধানে, তার হদিস জানি না। তবু, এই অন্ধকারের নিরালায় দাঁড়িয়ে মনে হয়, কী এক রতন যেন আমার রূপ-সাগরে দোলা দেয়। খুঁজে পাবার জিনিস না সে। অ-খোঁজে দেখা দিয়ে যায়। যা পাইনি, তার নাম জানি না। যা পাই, তা-ই নিয়ে যাই পরম ধন বলে।

সহসা, এই অন্ধকার বিজন নিশীথে যেন কার আবির্ভাব ঘটে। আমি দেখতে পাই না, অনুভব করি। চোখের ঝাপসায়, হাত জোড় হয়ে আসে বুকে। নিজের কথা, নিজের বুকে কান পেতে শুনি, এই মানুষে, সেই মানুষ আছে। তাকে নমস্কার।

ঘুম ভাঙে, এক ঝাঁক পাখির ডাকাডাকিতে। তারপরে, কেবল চোখ না, মস্তিষ্ক থেকে ঘুম ছুটতে, বুঝতে পারি পাখি না, ছেলেমেয়েদের হট্টগোল। কেবল তো চায়ের জল না। কী রক্ত জমানো ঠাণ্ডা হে। এই ভোরে একটু গরম জল না হলে কি চলে। অতএব, দাসদাসীর মুখ চেয়ে কি বসে থাকা যায়। হাত লাগাও সব আপন আপন।

সেই হাত লাগাবার আওয়াজ পাই গরম শয্যায় শুয়ে। বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর গলা শুনতে পাই। সকলেই ব্যস্ত, সকলেরই তাড়া। টের পাই, কেউ কাটে দাড়ি, কেউ মাজে দাঁত। শুনি, কেউ হাসে, কেউ করে গান।

মনে পড়ে যায় কাল রাত্রে গেটে হাত দিতে শব্দ হয়েছিল। বাতি জ্বলে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে। বন্ধুর আবির্ভাব অচিরাৎ। মুখে অবাক উৎকণ্ঠা। আবার অচিনদার নাম শুনেই সব অবাক উৎকণ্ঠার নিরসন। বন্ধুর পীড়াপীড়িতেও আহারে রুচি আসেনি। তখন দেহে মনে কেবল শয্যা শয্যা।

শুয়ে থাকা চলে না। বন্ধুর ডাক পড়ে, 'এবার প্রস্তুত, আর দেরি নয়।' ঘরে ঘরে ধোয়া-মোছা সাজসজ্জা। যার শেষ হয় সে-ই দৌড় দেয় ঘরের বাইরে। কেউ কারুর জন্যে বসে নেই। ডাক পড়েছে উপাসনার মন্দিরে।

লেট লতিফের দুর্গতি। তৈরি হয়ে আমি যখন মন্দিরের সীমায়, তখন স্তোত্র, প্রার্থনা শেষে সমবেত গান বেজে উঠেছে। ধরায় এখন আলো। পূর্বপল্লীর গাছপালা ছাড়িয়ে রোদ এসেছে এই প্রাঙ্গণে।

তারপরে আমবাগানে সমাবর্তন উৎসব। গান বেজে ওঠে, 'আমাদের শান্তি-নিকেতন, আমাদের শান্তিনিকেতন।'...এবার দেখ, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। কেবল যে পাঞ্জাব সিন্ধু বোম্বাই গুজরাট দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ, তা না। কেমন কালা-ধলায় পাশাপাশি হাসাহাসি মিলমিশ। এর নাম, বিশ্বভারতীর প্রাঙ্গণ। আজ আটই পৌষ। আজ বর্তমান আর প্রাক্তন আশ্রমিকদের কোলাকুলি। আজ কৃতীদের ডাকাডাকি, কৃতিত্বের ঘোষণা। তার প্রতীক স্বরূপ আচার্য তাঁদের হাতে তুলে দেন ছাতিমের পল্লব। শ্রীজওহরলাল এখন ভারতের প্রধান রাজপুরুষ নন। এখানে তাঁর পরিচয়, আচার্য। পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সংবর্ধিত করেন। ভারতীর অঙ্গনে ভাষেণ ভিন্ন কথা, বিদ্যা শিক্ষা মানবধর্ম, বিপুল ভারত কথা। শুনে মনে হয় যেথাকার মানুষ সেথায় আছেন, অন্যখানে তাঁর লীলা নেই।

উৎসব শেষে জনসমুদ্রের স্রোত চলে নানা দিকে দিগন্তরে। সব থেকে বড় স্রোত

ধায় মেলার প্রাঙ্গণে। আমিও সেই স্রোতে ভাসি। লক্ষ্য বাউল সমাবেশ।

আশ্রমের সীমানা পেরিয়ে রাস্তার ওপারে মেলা। সেখানে পা দেবার আগেই পাশ থেকে ডাক শুনতে পাই, 'শুনুন।'

পাশ ফিরে দেখি, ঝিনি। নীল রেশমী শাড়ির ওপরে হাতে বোনা উলের জামা। দক্ষিণ পল্লীতেও যে শীত হানা দেয়, তার প্রমাণ ঝিনি, লাল রেশমী রুমালে মাথায় ঘোমটা দিয়ে গলায় বেঁধে জড়িয়েছে। তবু রুক্ষ চুলের গোছা একেবারে ঢেকে রাখতে পারেনি। ঢাকা ছাড়িয়ে কপালের কাছে এসে পড়েছে। ঠোঁটে নেই রঙ, চোখে নেই কাজল। তবু কেন যেন হালকা লালের একটা টিপ আঁকা কপালে। এ যেন বৈরাগ্যের মধ্যে হঠাৎ একটু রঙের ছোঁয়া লাগানো। আর এইটুকুতেই হঠাৎ দেখলে মনে হয়, লাল কাপড়ে ঘোমটা টানা একটি বউ। মুখে তার হাসি নেই, ভঙ্গিতে জড়তা। একটা লজ্জা পাওয়া বিব্রত ভাব। কী যেন একটা থমকে থাকা আড়ষ্টতা বন্ধ ঠোঁটের কোণে।

অনুমানে ফিরে চাই আশেপাশে। কিন্তু রাধা লিলি সুপর্ণাদি শুভেন্দু নীরেনদাকে দেখি না। মনে মনে অবাক মানি। গতকালের ঘটনা মনে পড়ে যায়। ঝিনির দিকে চেয়ে, কিছু বলতে গিয়ে ঠেক খাই। দেখি, কী একটা কষ্টের ছাপ ওর মুখে। কেবল বিব্রত লজ্জা না। জিজ্ঞেস করি, 'আপনি একলা নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'ওঁরা সব কোথায়, আপনার সঙ্গীরা?'

'জানিনে।'

এতক্ষণ নত মুখ। এবার হঠাৎ মুখ তোলে ঝিনি। চোখ তুলে বলে, 'আপনাকে খুঁজছিলাম।'

'তাই নাকি!'

আবার নত মুখ। একটু রঙ বদলায়। এক মুহূর্ত, আবার মুখ তোলে। বলে, 'হ্যাঁ। খুব ব্যস্ত আছেন?'

বলি, 'না, ব্যস্ত আর কী। মেলায় চলেছি।'

'কোপাইয়ের ধারে যাবেন?'

মেলা ছেড়ে কোপাইয়ের ধারে! ঝিনির দিকে চেয়ে দেখি কাজলহীন চোখে জিজ্ঞাসু সংশয়। অচিনদার কথা মনে পড়ে গেল। বলি, 'সবাইকে না বলে যাবেন, খুঁজবে না?'

'না।'

কেন, সে কথা জিজ্ঞেস করতে পারি না। ঝিনির চোখের দিকে চেয়ে মনে হয় কোথায় যেন এক সহায়হীন ব্যগ্র ব্যাকুলতা থমকে রয়েছে। কতটুকু জানি ওকে, কতটুকু বুঝি! তবু এই প্রথম দক্ষিণের স্রোত ভেঙে রাঢ়ের ধুলায় দাঁড়িয়ে একটা যেন কষ্ট লাগা কাঁটা ফুটে যায়। আর হঠাৎ ওর বাবা-মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। যাঁদের স্নেহের মেয়েটি এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে আছে। বলি, 'চলুন যাই।'

আবার ঝটিতি একবার রঙ বদলায় মুখের। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিকে ঘোরে। ভিড়ের মধ্যে খালি রিকশার অভাব নেই। দুজনেই একটায় উঠে বসি। গন্তব্য বলে দিতেই তিন চাকার গাড়ি ছোটে ভেঁপু ফুঁকতে ফুঁকতে। খাল পেরিয়ে যখন খোয়াইয়ের লাল রাস্তায় পড়ি, তখন মনে হয়, ঝিনি অনেকক্ষণ তাকিয়ে আছে মুখের দিকে। মুখ ফিরিয়ে চাই। তারপরে ডানদিকের খোয়াই মাঠের মাঝখানে বাঁশঝাড় দেখিয়ে বলি, 'গতকাল রাত্রে অচিনদার সঙ্গে ওই বাঁশঝাড়ে গিয়েছিলাম।'

ঝিনি তাকিয়ে একটু অবাক হয়। শব্দ করে, 'ও।' তারপরেই আবার নিজের

মধ্যে ডুবে যায়। পথে গ্রামের লোকের যাওয়া আসা। রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করতে জানা যায় সামনের গ্রামের নাম গোয়ালপাড়া। রাঢ়ের গ্রাম, মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। মাঝে মধ্যে পাকা ইমারত। তেলেভাজার দোকান, গেলাসে খচমচ্ করে চামচ নাড়ানো চা। মুদি দোকানের বেচাকেনা। গৃহস্থের ঘরের দরজায় ভাই কাঁখে বোন, ওখানে বাঁধা গরুটা খড় চিবোয়। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যায় উঠানে মরাই। এখানে সেখানে এখনো ধান ঝাড়াইয়ের কাজ চলেছে।

সবই চোখের উপর দিয়ে চলে যায়, কেউ কথা বলি না। বলি বলি করে বলা হয় না। কাল রাত্রে অচিনদার সঙ্গে কেন যেতে চেয়েছিলাম সেই কথাটা বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু দৃশ্যের পর দৃশ্য বদলে যায়। চোখ টেনে নিয়ে যায় অন্যত্র। বিমনা হয়ে পড়ি। ভাবি, ঝিনিরও সেইরকম।

এক সময়ে গ্রাম ছাড়িয়ে খোয়াইয়ের তেপান্তর ভেসে ওঠে। চলায় লাগে ঢল। রাস্তা বাঁক খেয়ে নেমে গিয়েছে নিচে। দূরে গেরুয়ার উঁচু-নিচু বিস্তৃতির বুকে একটা বাঁকা নীল রেখা চোখে পড়ে। সহসা পশ্চিমে ঘুর লাগাতে বাতাসের ঝাপটা লাগে। ঝিনির লাল রেশমী রুমালের ঝালর এসে পড়ে আমার মুখে। আমার চোখ ঢেকে দেয়। সরাতে গিয়ে শুনি রিকশাওয়ালা বলে, 'হুই কোপাই।'

রুমাল সরাতেই দেখি, ঝিনি আমার দিকে চেয়ে। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, 'শুভেন্দুবাবুর খবর ভালো তো?'

ঝিনির ভুরু যেন বারেক অবাকে লতায়। কোপাইয়ের কূলে এসে হঠাৎ এমন কথা শুনবে বলে যেন আশা করেনি। আসলে আমার হঠাৎই মনে পড়ে যায়, ঝিনির কাল সন্ধ্যার উদ্বেগের কথা। আমার দিকে ঝিনি পালটা প্রশ্ন ফেরায়, 'ওর কী হয়েছে?'

বলি, 'কাল ওভাবে চলে গেছলেন হঠাৎ। আপনার দুশ্চিন্তা ছিল। নীরেনদা চলে গেছলেন।'

তবু চোখ থেকে চোখ সরাতে ঝিনির দেরি হয়। একটু পরে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'ভালোই আছে।'

রিকশা প্রায় জলের ধারে এসে দাঁড়ায়। রিকশাওয়ালা বলে, 'এই হলেন কোপাই। পায়ের পাতা ডুবিয়ে ওপারে চলে যান। এখন জল নাই।'

তারপরে বাঁ দিকের বাঁশঝাড় দেখিয়ে বলে, 'হুই উখানে পিঁকিক হয়, দাদা দিদিমণিরা আসেন।'

সংবাদ যাবতীয় জুটে যায়। তবে পিঁকিক মানে পিক্‌নিক বুঝতে হবে, এইটে একটু মনে রাখবেন বাবু, ক্যানে কি না, সবাই ওই বলে।

পাদুকা রিকশাতে রেখেই নামি। ঝিনিও নামে স্যান্ডেল রেখে। নদীতে, সাঁওতাল মেয়েপুরুষ কেউ কেউ হাঁটুজলে বুক ডুবিয়ে চান করে। গরুর গা ধোয়ায়। ছোট ছেলে একটা জলেতে জল ছিটায়। ওপারে একটা পীচ-বাঁধানো সড়ক। জিজ্ঞেস করি, 'ও রাস্তাটা কোথায় গেছে!'

'এঁগে, কসবা, পানরুই, উষাগেরাম হয়ে একেবারে শিউড়ি।'

কিন্তু ঝিনির তেমনি নতমুখ। মুখের সেই ভাব। কোপাইয়ের তীরে এসে কোপাই দেখে না। চোখ তুলে একবার তাকিয়ে আবার মুখ ফেরায়। জিজ্ঞেস করি, 'কোন্‌দিকে যাবেন?'

'যেদিকে খুশি।'

এমন কথা ছিল না। কোপাই দেখতে আসার ডাক ওর নিজের। এখন ওর খুশিতেই চলা।

হঠাৎ শুনতে পাই, 'ওদিকটায় যাই।'

যেদিকে ওর চোখের নির্দেশ কোপাই সেদিকে পুবে বেঁকে চোখের বাহিরে। পাড় ধরে ধরে যত এগিয়ে যাই কোপাইয়ের ধারা তত নিচে নামে। পাড় উঁচু হয়ে হয়ে ওঠে। এ হলো খোয়াইয়ের রঙ্গ। সে চড়াইয়ে ওঠে, নদী বহে নিচে। কিন্তু রূপেরও নানা রঙ্গ এদিকে। যত এগোই জল তত গভীর। স্রোতে ভারী টান। মুরলী বাঁশের ছেউটি ঝাড় ছড়ানো ছিটানো এখানে ওখানে। যাকে বলে এমনি বাঁশ, এ তা না, এর নাম এক দেশেতে তল্‌দা, আর দেশের মুরলী। এ বাঁশের লাঠি হয় না, ঘরের খুঁটি হয় না, না হয় ছিটে বেড়া। এ বাঁশে বেড়া হয় আর হয় বাঁশী, যার নাম মুরলী। এ বাঁশের বাড় কখনো আকাশ ছোঁয় না, মোটা হয় না। এর নাম কিশোরী বেণু। তাই বলি মুরলী বাঁশের ছেউটি ঝাড়। এখন পাতাগুলি টুনটুনি পাখির মতো রঙ, আকারেও টুনটুনির মতো। তাই, টুনটুনিরা পুচ্ছ নাচিয়ে মুরলীর ঝোপে নেচে নেচে বেড়ায়। পিকপিক শিস দেয়।

আশেপাশে আরো নানা গাছ। শাল শিমুল আম জাম কেন্দু। শালে শিমুলে পাতা নেই। পায়ের নীচে শুকনো পাতা ভাঙে। কোথায় কোন্ গাছে ঘুঘু ডাকে। আরো কোন্ কোন্ পাখিরা ডাকে ঝোপে ঝোপে, হয়তো দোয়েল শ্যামা। মনে হয়, এলাম যেন এক জনহীন বনে, যেখানে মানুষের পা পড়েনি কোনোকালে। ছায়া-নিবিড়, ঠাণ্ডা তাই বেশী। কোপাই এখানে কৃষ্ণকালোয় মেশানো গভীর। কোথায় যেন বাজে কলকল।

ঝিনি থমকে দাঁড়ায় আমার আগে। আমিও তা-ই। জিজ্ঞেস করতে যাই কথা, তার আগেই সে ফেরে। রেশমী রুমালের ঘোমটা খোলা, ঘাড়ে ভেঙেপড়া। মুখ নত, বাঁ চোখের ওপরে এক গুছি চুল। মুখ নিচু রেখেই হঠাৎ বলে, 'আমাকে ক্ষমা করবেন।'

ক্ষমা! কারণ কী, কী অপরাধে! অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করবার আগেই ঝিনির গলা যেন বহু দূর থেকে আসে, 'কাল আমার অন্যায় হয়ে গেছে। কী লজ্জা যে করেছে, সারাটা রাত প্রায় ঘুমোতে পারিনি। নিজেকে একটু চাপতে পারি না...।'

কথা শেষের আগেই যেন স্বর ডুবে যায়। কথা হারিয়ে যায়। কাঁপন লেগে যায় ঠোঁটে। অবাক ধন্দে চেয়ে দেখি, কাজলহীন চোখ দুটিতে জলের রেখা চিকচিক করে। তাড়াতাড়ি বলি, 'না না, তা কেন। অন্যায় তো আমারই হয়েছে, আমি বুঝতে পারিনি।'

আমার কথা শেষ হয় না। তার আগেই ঝিনির মাথা নড়ে ওঠে। গলার স্বর আসে কোপাইয়ের পাতাল থেকে, জলে চলকানো রুদ্ধ; 'না না না, মিথ্যে বলবেন না, আমি জানি, আমি—আমি কি বিশ্রী ব্যবহার করেছি। আমি কেন ওরকম করে...।'

আবার স্বর ডুবে যায়। আর সহসা পিছন ফিরে দু' হাতে মুখ ঢাকে। কী বলি কিছু বুঝতে পারি না। কেবল ডাক দিতে পারি, 'ঝিনি, শুনুন।'

শ্রবণ নেই এখন, শুনবে কে। এখন নিদ্রাহীন রাতের যত দমিত কথা, এমনি জলে ভেসে যায়। পাথার পারে ভাসে। তবু পাখি ডাকে পিকপিক। বাতাসে আওয়াজ দেয় শুকনো পাতা যত। কোপাই বাজে যেন কোথায়, কলকল করে। ঝিনির গ্রীবা জড়ানো লাল রেশমী রুমালে যেন তরঙ্গের দোলা।

তবু বলে যাই, 'যদি একবারও বুঝতে পারতাম আমার সঙ্গ আপনাদের ভালো লাগবে, তাহলে কখনোই যেতে চাইতাম না। আসলে—।'

ঝিনির ভেজা স্বর শোনা যায়, 'অচিনদার সঙ্গে যেতেই আপনার ভালো লেগেছিল।'

'না, তখন ভালো-মন্দর বিচার করিনি।'

'তা হোক, তবু আমি কেন অমন করে বলতে গেলাম। আমি কেন রাগ করতে গেলাম।'

'ক্ষতি কী। রাগও তো হয় মানুষের।'

'আপনাকে তা জানাতে গেলাম কেন।'

সে জবাব কি আমার দেবার। রাগ যার, মনও তার। সে কেন রাগ জানায় সে-ই জানে। আমার যে জানতেও ভয় করে। আমার বলতে দ্বিধায় বাজে। পথের মাঝে হঠাৎ এ কোন্ অভিনয়, বেড়া ঘেরে।

তবু বলি, 'রাগ হয়েছিল তা-ই জানিয়েছেন।'

তখনো ভালো করে চোখ মোছা হয়নি। ঝিনি ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে ভেজা আরক্ত চোখে একবার তাকায়। সহসা মুখে একটু লাল ছুঁয়ে যায়। যেন ওর রেশমী রুমালের ঝলক লাগে। মুখ ফিরিয়ে বলে, 'আপনার কথা শুনে আপনাকে একটুও বুঝতে পারি না।'

আমি যে এত দুর্বোধ্য, কোনোকালে জানা ছিল না। ওর কথাই জিজ্ঞেস করি, 'মিথ্যুক বুঝি?'

'তার চেয়ে বেশী।'

'সেটা কী?'

'যাকে বলে ছলের ছলী।'

কী একটা সুর যেন ঝিনির গলায়। কৌতুক মেশানো বুক চলকানো গলায় ঢেউ দেওয়া। ঝিনি কোন্ ধারাতে বহে, কোন্ ঢলেতে নামে। পথের ধুলা পায়ে আমার। পায়ে নিয়েই ফিরব। ঝিনি মোড় ফেরে না কেন। জিজ্ঞেস করি, 'কেন?'

ঝিনি ফিরে দাঁড়িয়ে তাকায়। বলে, 'শুভেন্দুর কথা তখন জিজ্ঞেস করলেন কেন?'

বলি, 'কাল ওঁর অমনি করে চলে যাওয়াটা ভুলতে পারিনি, তা-ই।'

'কেন গেছল জিজ্ঞেস করেননি তো একবারও!'

'অল্প পরিচয়ের বাধায়।'

'বুঝতে পেরেছিলেন?'

বোঝাবুঝিতে যেতে চাই না। ঝিনি কেন জিজ্ঞেস করে। জবাব না দিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে বাঁকে হারানো কোপাইয়ের দিকে চাই। ঝিনিও জবাব না দিয়ে দৃষ্টি ফেরায়। একটু পরে বলে, 'ডেকে নিয়ে এলাম বলে রাগ করেছেন?'

রাগ করিনি। পথ চলাতে আপন পরের দুঃখের দায়ী হতে চাইনি। সে কথা বলতে পারি না। বলি, 'না।'

'কিন্তু ক্ষমা পেলাম কি না, জানতে পারলাম না।'

বলি, 'তাহলে সেটা আমাকেও জিজ্ঞেস করতে হয়।'

ঝিনি ফিরে তাকায়। ওর দু' চোখের লজ্জায়, হাসির ছটা ঝিকিমিকি। আরো যেন কিছু, ওর ঠোঁটের কোণের টিপুনিতে। হয়তো, রুমালের রঙের ছটাই মুখে লাগে। মুখ ফিরিয়ে কাছেই খানিকটা ঘাস দেখিয়ে বলে, 'ওখানে বসবেন একটু?'

ঝিনির চোখের দিকে চাই। ঝিনি পায়ে পায়ে ঘাসের কাছে যায়। পা গুটিয়ে বসে, মুখ ফিরিয়ে চায়। আমি ওর কাছে গিয়ে বসি। নিচে দিয়ে কৃষ্ণকালো কোপাই বহে যায়। কোথায় যেন কলকল করে বাজে। পাখিরা ডাকে শিস দিয়ে দিয়ে।

দূরের পাকা সড়কের ওপার থেকে হাওয়া আসে। ঝিনির চুল ওড়ে, ঘাড়ের কাছে রুমালে যেন একটি রক্তিম আলো তিরতিরিয়ে কাঁপে। গাছের ফাঁক দিয়ে ঝিলিমিলি রোদ এসে পড়েছে ওর গায়ে। যেন রোদের ঝালর দিয়ে জড়ানো হয়েছে ওকে। আমিও সেই রোদের একটু অংশ পেয়েছি।

ঝিনি কেবল পোশাকে নাগরিকা না, প্রসাধনেও। হাতের নখগুলো দীর্ঘ, প্রতিটি সিজিল মিছিল কাটা, হালকা গোলাপীতে রাঙানো। সেই নখ দিয়ে ও একটা একটা

ঘাসের ডগা ছেঁড়ে। নোয়ানো বাঁকানো ঘাড়ে, ওর মুখের এক পাশ দেখা যায়। মন যে ওর ঘাসে নয়, বোঝা যায়। টিপে রাখা ঠোঁট দুটোতে ঢেউ খেলে। কী যেন ভাবে, কী যেন বলি বলি করে, যে কথা ঠোঁটের তটে এসে উপচে পড়তে চায়। তবু বলতে পারে না। তারপরে হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে চায়। একটু লাজানো হাসির ঝিলিক খেলে যায়। মুখের রঙ বদলায়। আবার মুখ নামিয়ে নেয়। নদীর ওপারের রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি আওয়াজ দিয়ে চলে যায়।

এখন আমার কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত। এই হাসি, এই ব্রীড়া, এই বলি বলি মুখের ওপরে, একটি জিজ্ঞাসা, যাতে ওর বন্ধ কথা সরে। তাই তো উচিত। কিন্তু উচিত বাজে অনুচিতের সুরে। জিজ্ঞেস করতে পারি না। তাতে যদি ওর কথা না সরে, সেই ভালো। সংসারে কিছু কথা অব্যক্ত থাকুক, না বলা থাকুক, সেই ভালো। বলো যদি, পথে চলার পায়ে ধন্দ লাগে, তা-ই কাঁটা। ঝিনির এই হাসি-দৃষ্টির ওপারে যে ছবিটি ভাসে, সে যে একেবারে ঝাপসা অচেনা তা না। তবু অবাক মানি, ঝিনির মতো মেয়ে কেন এমন রূপে ফোটে। এমন সুরে বাজে।

এখন ওর মুখে ছায়া নেই। চোখেতে নেই ছলছলানি। মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করে, 'কী ভাবছেন?'

'কোন্ বিষয়ে?'

ঝিনি আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলে, 'এই এইসব দেখে?'

বুঝতে পারি, ঝিনি ওর নিজের আচরণের কথাই বলছে। তবু, না-বুঝে থাকতে চাই। বোঝাবুঝির দায় নিতে চাই না। সে যেন এক কথার ফাঁদে ধরা দেওয়া। জিজ্ঞেস করি, 'কোন্ সব?'

ঝিনি ঘাড় ফিরিয়ে এক মুহূর্ত আমার দিকে চেয়ে থাকে। বলে, 'এই যে এখানে দেখা হওয়া অবধি আপনাকে কেবলই বিরক্ত করছি।'

'বিরক্ত করবেন কেন?'

'নয় বুঝি?'

বলতে গিয়ে একটু হাসির ছটায় ঝিলিক দিয়ে কপট বিস্ময়ে চোখের ফাঁদ বড় করে। একটু ঘাড় হেলিয়ে দেয়। দেখে মনে হয়, আমার কম কথা, অ-ভাবব্যঞ্জক ভাবকে ওর একটুও রেয়াত নেই। জোয়ারে যেমন স্রোত আপন বেগে চলন্তা, ও তেমনি প্রবাহিনী। অবাক যতই মানি না কেন, তবু সেই অবাকের গায়ে একটু যেন রঙের ছিটা লেগে যায়। যেন আমাকেও ভাসিয়ে দিতে চায়। বলে, 'তবে বুঝি ভয় ধরিয়ে দিয়েছি?'

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই আমি আরো বেশী অবাক হয়ে বলে উঠি, 'ভয়? কিসের ভয়, কেন?'

ওর চোখে কৌতুকের বান ডেকে যায়। চোখে যে ওর কাজল নেই, সে কথা আর মনে হয় না। ঠোঁটে রঙ নেই, তা আর মনে হয় না। টানা কালো চোখ দুটিতে হাসি আর কৌতুকের ছটায় মনেরই অঞ্জন লেগে যায়। ঠোঁটে মনের রক্তাভা। শব্দ করে হাসে না, কিন্তু ওর রেশমী শাড়ি টলটলিয়ে ওঠে, তরঙ্গিয়া যায়। ওর ঝকঝকে সাদা দাঁতে হাসি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। বলে, 'আমি বুঝি কিছু বুঝি না?'

আমি ওর চোখের দিকে চেয়ে চোখ সরিয়ে নিতে যাই। ও আবার বলে ওঠে, 'আমি কিছু দেখতে পাই না বুঝি?'

জিজ্ঞেস করি, 'কী?'

এখন ওর হাঁটুর ওপরে কনুই। কনুইয়ের ওপর গাল পেতে মুখ ফেরানো আমার দিকে। রুক্ষু চুলের গোছা, গালের কাছে এসে পড়েছে। চোখ রাখে আমার মুখের

ওপরে। বলে, 'আপনার অবস্থা। আপনার চোখ-মুখের ভাব।'

জবাব না দিয়ে, একটু আড়ষ্টভাবে হাসি। ঝিনির দৃষ্টি চলে যায় অন্য দিকে। বলে, 'আমি বুঝতে পারছি, আপনি মনে মনে অবাক হচ্ছেন, রাগ করছেন, বিরক্ত হচ্ছেন, আর একটু একটু ভয়ও পাচ্ছেন বোধ হয়।'

কথাগুলো একেবারে মিথ্যা না। তবু মুখ ফুটে স্বীকার করতে বাধে। ঝিনি জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু কেন, তা বুঝি না।'

এই কথা বলেই সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে ঝিনি আমার দিকে চায়। জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, আমাকে কি খুব অস্বাভাবিক লাগছে?'

একেবারে অস্বীকার করার উপায় কী। সংসারের স্ব-ভাবপ্রবাহে তাকে একটু উজানী টানের মনে হয় বইকি। কিন্তু ওর মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে যদি সে কথা আমাকে জিজ্ঞেস করে, তাহলে সত্যি বলতে বাধে। তাই বলি, 'অস্বাভাবিক লাগবে কেন?'

ঝিনি আবার হেসে ওঠে, শরীরে তরঙ্গ তুলে। বলে, 'আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করলে বুঝি আপনাকেও করতে হবে। আমি জানি, আমাকে ঠিক স্বাভাবিক মনে করতে পারছেন না আপনি। তাই, ওরকম করে বলছেন। সত্যিই তো, মনে করবেনই বা কেন। আমি নিজে তো বুঝি।'

কথার শেষে ওর ছোট একটা নিশ্বাস পড়ে। আমি জিজ্ঞেস করি, 'কী বোঝেন?'

ঝিনি বলে, 'এই আমার আচরণ ব্যবহার। বলছিলাম আপনাকে, সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। আপনাকে ওরকম করে বলে গেলাম। আপনি হয়তো তেমন করে গায়েও মাখেননি। কিন্তু আমি ছটফটিয়ে মরেছি।'

হঠাৎ একটু হেসে নিয়ে বলে, 'আপনাকে ছোবলাতে গিয়ে নিজেই ছোবল খেয়ে মরেছি।'

তাড়াতাড়ি বলে উঠি, 'না, না, তা কেন—।'

'তা-ই। ওটা আমার নিজের ব্যাপার তো, আমি তা-ই জানি। কাল দুপুরে আপনার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে নিজের সব কথাবার্তাগুলো যতই ভাবছিলাম, ততই আপনার মুখটা আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল। রাধা লিলি সুপর্ণাদি নীরেনদার কথাও মনে পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু—।'

আমি অবাক জিজ্ঞাসু চোখ তুলে ওর দিকে তাকাই। ও কথা থামিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

আমি ঘাড় নেড়ে বলি, 'কিছু না। বলুন।'

ঝিনি আমার চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে বলে, 'কিছু বই কি। হয়তো আপনাকে অনেক চিনি না। তবে একটু তো বুঝি। আপনি ভাবলেন, শুভেন্দুর নামটা কেন বললাম না।'

বলে একটু হাসে। আমার প্রতিবাদের আগেই ঘাড়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'আপনার চোখ দেখেই বুঝেছি। আপনি কী ভাবছেন, তা জানিনে, কিন্তু ওর নামটা ইচ্ছে করেই বলিনি। কেন, সে কথা পরে বলব, ওকে ঠিক এদের সঙ্গে জুড়তে পারিনে। ও একটু আলাদা।'

বলতে বলতে ওর ভুরু জোড়া একবার একটু কুঁচকে ওঠে। মুখ ফিরিয়ে এক মুহূর্ত অন্য দিকে চেয়ে থাকে। ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে রাখে। তারপরে জিজ্ঞেস করে, 'ঠিক বলিনি?'

বেঠিক যে না, তা ঠিক জানি। সঙ্গীদের সকলের নাম করতে গিয়ে, একজনের নাম উহ্য রাখলে আপনা থেকেই জিজ্ঞাসা জাগে। ভিন্ন বৈচিত্র্যের কৌতূহল লাগে। বলি, 'না, ঠিক মানে, নামটা না শুনে একটু ভাবছিলাম।'

ঝিনি হাসতে হাসতেই টুকটাক করে কয়েকগাছি ঘাস ছিঁড়ে ফেলে। হালকা গোলাপী নখের সঙ্গে সবুজ ঘাসের রঙে যেন একটা ছেঁড়াছিঁড়ির খেলা। বলে, 'যে কথা বলছিলাম। নিজের ব্যবহারের কথা মনে করে ওদের কথাও আমার মনে পড়ছিল। কিন্তু, কী জানি কেন, আমার একটুও লজ্জা করেনি। রাত্রে সব কথা ভাবতে ভাবতে রাধা লিলিদের দু-একটা ঠাট্টার কথা মনে পড়ছিল। এমন কি অচিনদার কথাও। তাতেও আমার একটু লজ্জা করেনি। আমি মিথ্যে কথা বলতে পারিনে। আমি ছলনা করতে পারিনে। তাই আমার লজ্জাও করেনি। তাছাড়া, আমার সঙ্গীরা আমাকে সবাই ভালোবাসে। এমন কি, অচিনদাও।'

বলে ঝিনি একটু থামে। আমার দিকে তাকায় না। আশেপাশে, ঘাসের ওপর আঙুল দিয়ে যেন বিলি কাটতে থাকে। তারপরে, গালের চুলে আস্তে একটা ঝটকা দেয়। আমার দিকে চেয়ে বলে, 'আপনি তো ওরা নন। অথচ যা কিছু, তা আপনাকে নিয়েই। আপনার মুখটা তাই বারেবারে মনে পড়ছিল, ছটফটিয়ে মরছিলাম।'

যেন আরো কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়। মুখ ফেরাতে গিয়ে আবার হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে, 'একটা কথা বলব?'

গম্ভীর না, ঝিনির চোখে যেন, "ব্যাকুল নয়নে ভাবের খেলা।" বলি, 'বলুন।'

ঝিনি ঘাড় কাত করে। তাতে ওর মুখ সরে যায় দূরে। কিন্তু নীল রেশমী শাড়ির ছোঁয়া আসে ঘনিয়ে। বলে, 'জীবনের সব কিছু কি যুক্তি দিয়ে বিচার করা যায়?'

'করতে পারলে ভালো।'

ঝিনি কথা না বলে চোখের দিকে চেয়ে থাকে। আমি আবার বলি, 'করতে পারা উচিত।'

ঝিনি বলে, 'লেখকরা বুঝি তাই করেন?'

আমি বলি, 'লেখকদের কথা বলতে পারি না। সব মানুষের কাছে সংসারের সেটাই দাবি।'

'সংসারের দাবিই সব? মনের দাবি বলে কিছু থাকবে না?'

সে কথা কি বলতে পারি। এ দুয়ের দাবিতে মেলে না বলেই দুয়ের হাতাহাতি। দুয়েতে তাই বিবাদ। মনে সংসারে লড়াই নেই, এমন মানুষ কোথায় আছে, কে জানে। হয়তো আছে কোটিকে গোটিক। কোটির কথা বলো। মনে সংসারে লড়াইয়ের টান ভাঁটাতেই, এ জীবন চল্‌কে চল্‌কে উঠছে। তাই রূপ-অরূপের অশেষ খেলা নিরন্তর বহে। তবু বলি, 'সব কথার যে ঠিক জবাব জানি, তা বলতে পারি না। তবে, দুয়ে মেলাতে পারলে ভালো।'

'মেলে কী?'

ঝিনির ব্যাকুল চোখের দৃষ্টি আরো দূর-বিন্ধ হয়ে ওঠে। ওর এই চোখের দিকে চেয়ে এক কথাতে 'হ্যাঁ' বলতে পারি না। চুপ করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিই।

ঝিনি চোখ ফিরিয়ে চায়, কোপাইয়ের ওপারে বেণুবনের দিকে। যেন নিজেকেই নিজে বলে, 'আমি তো কখনো মেলাতে পারলাম না।'

আমি জবাব না দিয়ে, চুপ করে থাকি। ঝিনির গলায় এমন একটা সুর বেজে ওঠে, যেন মনের কোথায় একটা চির আতুর স্থানে গিয়ে সেই সুর বিষণ্ণ করে দেয়। একটা ব্যথা ধরিয়ে দেয়। কেন ফিরি দিকে দিকে, প্রান্তে প্রান্তে, রাঢ় বঙ্গের পথে মেলায়, কখনো তার হদিস পাইনি। মেলাতে পেরেছি বলে, নাকি মেলাতে পারিনি বলে। তার চেয়ে নিজেকে আরো জিজ্ঞেস করি, নাকি মেলাবার জন্যেই?

তার চেয়ে আরো ভালো, এ প্রসঙ্গ থাক। পথ চলার এই দেখাতে এমন কথায় কী মিলবে। ঝিনিকে তা বলতে পারি না। জানি, ঝিনিও তা মানতে রাজী না।

কোপাইয়ের বাঁকে, জল কলকলিয়ে বাজে। ছেউটি বেণুর ঝোপে ঝাপে, গাছ-গাছালির ঝুপসি ঝাড়ে পাখিরা ডেকেই চলে। ঝিনির দৃষ্টি এখনো ওপারের বেণুবনে। যেন সেখান থেকেই হঠাৎ ওর গলা ভেসে আসে, 'লোকে বলে, এই জানো, সেই জানো, সব কিছু জানো। কিন্তু নিজেকে জানার কথাটা কেউ বলে না। কত রকমের যুক্তি দিয়ে, কারণ দিয়ে ভেবেছি, সেই গোসাবা যাওয়া-আসার পথে কতটুকুই বা একজনকে দেখা, কতটুকুই বা তাঁকে চেনা। তবু—তবু, গায়ের এক একটা দাগ যেমন সারা জীবনেও মেলায় না, মনেরও বোধ হয় সেইরকম। একটা কী ধরে যায়, একটা কী লেগে যায়, কিছুতেই সেই একটা কিছুকে সরানো যায় না, মেলানো যায় না। বুদ্ধিতে কুলোয় না, যুক্তিতে পাই না, এমন কি কোনো আশাও নেই...।'

কথা শেষ না করেই ঝিনি আমার দিকে তাকায়। আমিও চোখ ফিরিয়ে রাখতে পারি না। ওর দিকে চেয়ে চমকে উঠি। মুখে ওর ছায়া ঘনায়নি। যেন একটা কিসের ঝলকে ঝলকানো। অথচ ওর চোখে জল এসে পড়েছে। তবু নিচু স্পষ্ট গলাতেই বলে, 'কে জানত, আবার এখানে এসে দেখা হয়ে যাবে। জানতাম না, কিন্তু কেন জানিনে, রোজ মনে হতো, কোথাও না কোথাও একবার দেখা হবেই। হবেই হবে। হলোও তাই। চিঠির জবাব না পেয়ে একলা একলা অনেক দিন চোখ মুছেছি। কিন্তু সেটা বোধ হয় আসল জল নয়। কাল আপনাকে দেখে তাই আর সামলাতে পারলাম না।'

কথা থামিয়ে, ঝিনি হঠাৎ একটু হাসে। অথচ ওর চোখের কোণে বড় বড় দুটি জলের ফোঁটা চিকচিক করে। ও মোছে না। বলে, 'আমার লাজলজ্জা কিছু নেই আর, না?'

বলে আবার হাসতে যেতেই জলের ফোঁটা গালে নেমে আসে। ওর দিকে তাকিয়ে আমার কষ্ট হতে থাকে। আমার জিভের ডগায়, হাতের সীমায়, সংসারের কঠিন ছায়া দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুই বলতে পারি না, কিছু করতে পারি না।

ঝিনি যেমন করে গাল কপাল থেকে রুক্ষু চুলের গুছি সরিয়ে দেয়, তেমনি স্বাভাবিকভাবেই গলার রেশমী রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নেয়। তারপরে আমার দিকে আবার চোখ তুলে বলে, 'কেন এমন হয়, বলতে পারেন!'

অন্তত এইটুকু সত্যি বলতে পারি, এই 'কেন'-র কারণ আমি জানি না, বুঝি না। তাই ঘাড় নাড়ি। ঝিনি আবার জিজ্ঞেস করে, 'যিনি লেখেন, তিনিও বলতে পারেন না? তিনি তো মানুষের মন চেনেন?'

'মানুষের মন চেনাটা কোনো কথা নয়, নিজেকে চেনাটাই চেনা। যে নিজেকে কিছু চেনে, সে অন্যকেও কিছুটা চিনতে পারে। আসলে, যা দেখি তা নিজের চোখেই। বিচার নিজের মনেই। নিজেকে দিয়েই পরকে চেনা যায়।'

ঝিনির শরীরে বাঁক লাগে। গ্রীবাতে ঢেউ লাগে. মুখ অনেকখানি এগিয়ে আসে। নিচু গলায় যেন কিসের আবেগ চলকানো সুর। জিজ্ঞেস করে, 'নিজেকে দিয়ে কি আমার কথা একটু বলা যায় না?'

ওর চোখের দিকে চেয়ে কেমন যেন অসহায় বোধ করি। বলি, 'নিজেকে তেমন চিনলাম কবে।'

ঝিনি তেমনি গলায়, আবার জিজ্ঞেস করে, 'তবে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাই। ও যেন আরো নিবিড় হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এতে কি অপরাধ হয়?'

সহসা জবাব দিতে পারিনে। ওর মুখের দিকে বিব্রত অবাক চোখে চেয়ে থাকি।

ওর গলা আরো নিচু হয়। যেন অনেক দূর থেকে বাতাসে ভেসে আসে, 'যার কোনো কারণ যুক্তি কিছুই জানিনে, তার জন্যে কি কোনো অন্যায় অপরাধ হয়?'

চোখ সরাতে পারি না। বলি, 'আমি তা জানি না।'

'আমিও তো জানি না।'

যেন এক আর্ত স্বর বাজে ওর গলায়। নুয়ে পড়ে সহসা। আর মুহূর্তে আমার পায়ে কিসের স্পর্শ লাগতেই চমকে উঠি। চোখ নামিয়ে দেখবার আগেই টের পাই, ঝিনির হাত আমার একটা পা চেপে ধরেছে। ওর মুখ ভেঙে পড়েছে ওর বুকের কাছে। আমার পায়ে রাখা ওর হাতের ওপর তাড়াতাড়ি হাত রাখি। ডাক দিই, 'শুনুন।'

ও যে আমার কথা শুনতে পায়, তা মনে হয় না। কেবল আস্তে আস্তে মাথা নাড়ায়। কিছু বলে না। আমি আবার ডাকি, 'শুনুন।'

ওর অস্পষ্ট গলা শোনা যায়, 'কী?'

তারপরে আস্তে আস্তে মুখ তোলে। দেখি, ওর চোখ ভেজা ভেজা, কিন্তু টলটলানো না। বরং মুখের রঙ রোদ-লাগা জবার মতো হয়ে গিয়েছে। তেমনি অস্পষ্ট অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'রাগ হচ্ছে?'

'না।'

'ভয়।'

'না।'

'তবে একটু এমনি করে বসে থাকি।

আমি মনে করতে পারি না, এ সেই অলকা চক্রবর্তী, দর্শন শাস্ত্রের বিদুষী, নিখুঁত নাগরিকা। এ যেন আর কেউ, অন্য কোনো মেয়ে। যার পরিচয় আমার জানা নেই। অথচ তার চোখের জলের গভীর থেকে একটি নম্র লাজানো হাসিতে সুখ-দুঃখের খেলা খেলে।

কিন্তু রাগ করিনি, ভয় পাইনি সত্যি। শুধু বিব্রত সংকোচে আড়ষ্ট হয়ে থাকি। এতখানি সইতে পারি না। তা-ই ডাকতেই হয়। পাছে ওর আবেগে চমক লাগে, তেমন করে ডাকি না। ওর ভাবেতে সুর মিলিয়ে ডাকি, 'ঝিনি দেবী!'

'উঃ!' যেন আচমকা কাঁটা বেঁধা খোঁচানিতে আর্ত রবে সোজা হয়ে বসে। তারপরে চোখের জল না মুছেই ভুরু বাঁকিয়ে হেসে ওঠে। বলে, 'কী অদ্ভুত যে আপনার কথা—"ঝিনি দেবী।" ঝিনি আবার কখনো দেবী হয় নাকি! একে বলে গুরুচণ্ডালী দোষ।'

তাড়াতাড়ি শুধরে নিতে যাই, 'তাহলে অলকা—।'

'না, দেবী জুড়ে দেওয়া চলবে না। ঝিনিতে নয় অলকাতেও নয়।'

বলতে বলতে গলা থেকে রুমাল খুলে অনায়াসে চোখ আর গাল মুছে নেয়। ছোট মেয়ের মতো, রুক্ষ চুলে একটা ঝাপটা দিয়ে বলে, 'আর অলকা বলাও আপনার নিষেধ, সে কথা আগেই বলেছি, চিঠিতে যে জন্যে ঝিনি লিখেছিলাম। এর পরে ঝিনির নাম ধরে যদি "তুমি" না বলতে পারেন তাহলে আর কথা বলে দরকার নেই।'

বলে এমন ভাবে অন্যদিকে ঘাড় ফেরায়, যেন এ-দু'দিনের যা কিছু এত কথা, হাসি-কান্না, সব এক কথাতে নাকচ। দেখ তো এবার সেই দক্ষিণের দরিয়া থেকে এই রাঢ় পর্যন্ত দেখা মেয়েটিকে চিনতে পারো কি না। আমি তো পারি না। বিদুষী বলো, নাগরিকা বলো, সকল ভেদাভেদের জট পেরিয়ে সে-ই এক মেয়ে। সে-ই এক চিরদিনের মেয়ে। যে-রূপেতেই আবির্ভাব হোক সে-ই এক রূপ-অদ্বিতীয়া। যে অদ্বিতীয়া রূপেরও কোনো শেষ নেই। বৈষ্ণব কবির মতো, এক নায়িকার রূপের কথা বলি না। বলি, সেই বহুর মধ্যে এক-এর কথা, যাকে জনম থেকে দেখেও নয়ন তৃপ্ত হলো না।

কিন্তু অতৃপ্ত নয়নের সামনে এই রূপ দেখে যে আমার চলায় লাগে ঠেক। গলায় বাক্‌রুদ্ধ।

তবু, আপাতত কৌতুকবোধেই ঝিনির দিকে তাকিয়ে থাকি। জবাব খুঁজে পাই না। ঝিনি আবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। দেখি ওর আয়ত চোখে বাঁকিয়ে চাওয়ার ঝলকানি। ঠোঁটের কোণের হাসিতেও কী এক অচিন কথার স্ফুরণ। না, না, একে আমি আগে কখনো দেখিনি। এ সেই প্রকৃতি, যার সবটুকু জুড়ে উদ্যত পঞ্চশর ফুলধনুর টঙ্কারে। চোখের দিকে তাকিয়ে বলে 'কবুল?'

বলি, 'কবুল।'

'ভয়ে ভয়ে?'

'নির্ভয়ে।'

'গলায় তবু যেন কেমন শোনাচ্ছে।'

'কেমন?'

'গম্ভীর গম্ভীর।'

'ওটা স্বরের দোষ।'

ঝিনি হেসে ওঠে। আস্তে অথচ হাসির বেগে, শব্দ বেজে ওঠে। যেন ঠিনঠিনিয়ে কার হাতের চুড়ি বেজে ওঠে দূর থেকে। তারপরে হঠাৎ হাসি থামিয়ে কোপ কটাক্ষে চায়। তবু নাসারন্ধ্র স্ফুরিত—কাঁপে থিরিথিরি। ঠোঁটের কোণে টিপে রাখা একটি দ্যুতি ফুটি ফুটি করে। বলে, 'স্বভাবের দোষ নয় তো?'

হেসে বলি, 'তাও হতে পারে।'

'চমৎকার। কেন এমন করে কথা বলতে শিখিনি।'

'কেমন করে?'

'লেখকের মতো করে।'

'কেন?'

'সবই যেন কলমে লেখার মতো, একেবারে তৈরি।'

'তা কেন, আমি তো—।'

কথা শেষের আগেই আবার হাসি। বলে, 'বুঝতে পারিনে তো। মনে হয় সবই যেন সত্যি। শুনে কি কেউ বুঝতে পারবে এ শুধু কথার কথা।'

'কথার কথা কেন?'

'তবে খাঁটি সত্যি!'

এবার হাসি চাপা দায়। বলতে যাই, 'মিথ্যে হবে কেন।' তার আগেই ঝিনি আবার বেজে ওঠে, 'দায়ে পড়ে বুঝি সারাদিন অনেক মিথ্যে কথা বলতে হয়।'

তাড়াতাড়ি বলে উঠি, 'না না, তা কেন হবে।'

ঝিনি চুপ। শুধু ঘাড় কাত করে চোখে চোখ রাখে। ওর চোখের খোঁজাখুঁজির ঝিলিক দেখে আমার হাসিতে বেগ লাগে। কিন্তু হাসতে ভরসা পাই না। ও বলে, 'সত্যি, বড্ড মিথ্যেবাদী বলতে ইচ্ছে করে।'

'বেশ তো, তা-ই বলো।'

ঝিনির দৃষ্টি নেমে যায়। মুখ একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে বলে, 'না। তাহলে যে আর একটুও আশা থাকে না।'

কোনো জবাব দিতে পারি না। হয়তো, ঝিনির নিশ্বাস পড়ে না। বাতাস লাগে ঝোপে ঝাড়ে ঘাসে পাতায়। শুকনো পাতা ঝরে, ওড়ে। মনে হয়, যেন কোনো গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। কোথায় যেন, দু'-একটি গলার স্বর শোনা যায়। অস্পষ্ট ভাঙা-ভাঙা, ছাড়া-ছাড়া। কাছে না দূরে, বোঝা যায় না। কোথা দিয়ে কে

চলে যায়, কে জানে। আমি ঝিনির দিকে একবার চেয়ে কোপাইয়ের ওপারে তাকাই। ঝিনি এক জলধারা, আপন বেগে এক টানে চলে। আমি যত ভাবি, ভিন্ স্রোতে যাই, তা হয় না। তাকে ফেরাতে পারি না।

তবু এবার ফেরার কথাই বলতে হয়। একটু চুপ করে থেকে বলি, 'এখন তাহলে ফেরা যাক।'

ঝিনি ফিরে চায়। তারপরেই আবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিছু বলে না। যেমন ছিল, তেমনি থাকে। সেই ভাবেই জিজ্ঞেস করে, 'আমাকে কী মনে হলো?'

কিছু না ভেবেই বলে ফেলি, 'ভালো।'

ঝিনি আবার ফিরে চায়। একটু যেন হাসেও। অবিশ্বাস আর বিষণ্ণতার হাসি। একটু আগের ঝিলিক ঝলক এখন আর নেই। বলে, 'এত উদাসীন কেন? আমার সম্পর্কে কি একটু কিছু জানতেও ইচ্ছা করে না?'

এমন করে বলে না, যাতে চমক লেগে যায়। যদি বলতে পারতাম, এ মেয়ে বড় নিলাজ পরাণী, নাগরিকা না, নাগরী, তাহলে আমার কথা ফুরাত। নটে গাছ সেখানেই মুড়োত। কিন্তু কেমন করে জানি না, নিজের কথা শোনাতে চায়, তবু নির্লজ্জ মনে হয় না। যেন এক বিষাদ শালীনতার প্রকাশ। নাগর। বলতে গেলে জিভ খসে। স্বৈরিণীর দায়হীন নির্বিকার রঙ্গ ওর মধ্যে দেখিনি। কেবল ক্ষণেক সুখের আগুনে কিছু ছাই ছিটিয়ে রেখে যাওয়ার মাতঙ্গিনী ছুট দেখিনি। তা-ই, ঝিনি চমক লাগাতে না চাইলেও, মনের কোথায় একটা চমক লেগে যায়। মনে হয়, যা আমার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, তা নিজে থেকেই থমকে দাঁড়ায়। এতক্ষণে মনে হয় কেবল একটা ধারাকে, একটানা চলে যেতেই দেখছি। তার আঁকাবাঁকা পথের সন্ধান একটুও জানতে পারিনি। এখন ওর দিকে চেয়ে হঠাৎ মনে হয়, অনেক কথা শুনেছি কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী কথা শোনা হয়নি। যে কথা এত কথার সৃষ্টি করেছে।

তাড়াতাড়ি বলি, 'জানতে ইচ্ছা করে।'

আবার ওর চোখের কোণে একটু ঝিলিক দেখা যায়। ঠোঁটের কোণে একটু দ্যুতি। তারপরে এক মুহূর্ত কী যেন ভাবে। কী যেন বলি-বলি করে। তারপরে বলে, 'আপনার কথা শুনে তো সত্যি-মিথ্যে বুঝতে পারিনে। কিন্তু আমার বলতে ইচ্ছে করে।'

তারপরে আবার একবার নিচু হয়ে ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে, 'জানেন আমি বিধবা।' হয়তো ভয়ংকর কোনো কথা নয়। কিন্তু অজানার চমকের কাছে সবটুকু সেই রকম। সেই দক্ষিণের দরিয়া থেকে এই রাঢ়ের কোপাইয়ের ধারে। কখনো একবারও এমন কথা মনে হয়নি। তা-ই, কেবল চমকে ফিরে তাকাই না, হঠাৎ যেন কোথায় একটা কী বিঁধে যায়। কে মারে, কোথা থেকে মারে, খুঁজে পাই না। বিঁধে যাওয়ার স্বরূপ বুঝতে পারি না, কতখানি বাজে। এমন একটা কথা নিয়েও ঠাট্টা করবে তেমন মেয়ে না। তবু যেন বিশ্বাস করতে পারি না। কথা বলতেও পারি না। কেবল চেয়ে থাকি ওর দিকে।

ঝিনিও তৎক্ষণাৎ আর কোনো কথা বলে না। চোখে ওর জল পড়ে না। কেঁদেও ভাসায় না। কথা শুরু করেও কথা বলতে যেন বাধে। তেমনি বলি বলি ভাবে, নিচু মুখে, ঘাসের গায়ে হাত বুলিয়ে যায়। আর আমি যেন নতুন করে আবার ওকে দেখতে থাকি। আর একবার ওর চব্বিশ পঁচিশের শরীরের দিকে তাকাই। শরীরে বৈধব্যের কোনো দাগ লাগে কি না, জানি না। কিন্তু দক্ষিণের দরিয়ায় যে মেয়েকে দেখেছিলাম, কোথাও তার টোল টুটানো দেখি না। স্বাস্থ্যে ওর তেমনি

ঔদ্ধত্যের থেকে দীপ্তি বেশী। নম্র অনম্রের খেলাখেলি বন্ধুর অঙ্গে। কূলে কূলে জোয়ার-তরঙ্গের ছপছপানিতে, ধরা অধরায় টল টল করে। তাকে ঘিরে, এখনো সেই বেশবাসের রঙ রাঙানো। কেবল আজ সকালেই একটু রঙ-বিবাগী দেখেছি। কিন্তু তার ভিতর থেকেও আর একজনকে ফুটে উঠতে দেখেছি। পঞ্চশরের ফুল-ধনুর ছিলায় যার টান। যে লক্ষ্যভেদের সীমায় দাঁড়িয়ে আমি হাত জোড় করে আছি। এর মধ্যে আমি কোনো বৈধব্য আবিষ্কার করতে পারিনি।

সহসা ওর বাবা-মায়ের কথা আমার মনে পড়ে যায়। ওর মৃত দাদার কথা, হেনরির কারাবাস। ব্রহ্মনারায়ণ চক্রবর্তীর পারিবারিক জীবনের বিষাদ অন্ধকারে এ অন্ধকারতম সংবাদ শুনিনি।

এতক্ষণ পরে, ঝিনি চোখ তুলে চায়। আমি জিজ্ঞেস করি, 'সত্যি?'

ওর ঠোঁটে আবার একটু হাসি দেখা দেয়। বলে, 'এ নিয়ে কি কোনো মেয়ে মিথ্যে বলতে পারে?'

তাড়াতাড়ি বলি, 'না, না, তা নয়। কিন্তু মাত্র মাস দুয়েক আগে যখন দেখা হয়েছিল তখনো শুনিনি।'

'কে বলবে?'

বলতে বলতে ঝিনি আবার একবার চোখ ফিরিয়ে নেয়। সেইভাবেই বলে, 'বাবা-মা আজও কিছুই জানেন না।'

অবাক মানি, কথা বলতে পারি না। বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়। সংসারে এত বিস্ময়! এত অবিশ্বাস্য কথা কে কবে শুনেছে! বলি, 'বুঝতে পারলাম না।'

ঝিনি তেমনিভাবেই বলে, 'তাঁরা বিয়ের কথাও জানতেন না, তা-ই এ কথাও জানেন না।'

তবু তেমনি অবাক চোখে নির্বাক বিভ্রান্তি নিয়ে চেয়ে থাকি ঝিনির দিকে। ওর কথার ওপারে কী ঢাকা পড়ে আছে, দেখতে পাই না। বুঝতে পারি না। ঝিনি মুখ ফিরিয়ে, আমার চোখের দিকে একবার চায়। তারপরে ওর কথায় যেন কুয়াশার রোদ পড়ে। বলতে থাকে, 'সে কথা তখন বাবা-মাকে বলতে পারিনি...।'

যে কথা ছিল ওর নিরালায় নির্বিঘ্নে বেড়ে ওঠা, নিষ্পাপ বনফুলের পাপড়ি ঢাকা মনে। কুয়াশা সরে যায়, আমি শুনতে থাকি। দু' বছরের বড় এক ছেলে ওর সহপাঠী, কেন তাকে ওর ভালো লেগেছিল সে প্রশ্ন আমার নেই। সহপাঠী হয়েও সে যে ঝিনির মতো পড়াশুনা করা ছেলে, তাও না। কলকাতায় অনাত্মীয় স্বজনহীন ঘরে, পুরনো বিশাল অট্টালিকায় ছিল তার বাস। ঝিনির কৈশোরে সে পক্ষিরাজের পিঠে চেপে ঝনঝনিয়ে আসেনি রাজপুত্রের মতো। মনোহরণ রূপ ধরে সে ভোলায়নি। ক্রুদ্ধ, বিরক্ত, বিরাগী এক প্রাচীন বংশের বেগহীন রক্তধারার নিঃসঙ্গ দুর্বল শিশু। অপচয়ের একটি অবশিষ্ট মাত্র যেন। তার জীবনের চার পাশে সংসারে সবাই যখন স্বার্থান্ধ, কুটিল, স্বার্থপরের বেশে, যৌবনের প্রথম পর্বেই যখন সকল অন্ধকার তখন ঝিনির মধ্যে আলোর আবিষ্কার। ঝিনির কথায়, 'ওর অসুখী অবিশ্বাসী গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে কারুর কথা বলতে ইচ্ছা করত না। সবাই ভাবত, ও হাসতে জানে না, মিশতে জানে না।'...

কিন্তু, সংসারে এমন মানুষ আছে, সে যেন কোনো দূরে, আড়ালে পড়ে থাকা এক জলাশয়ের মতো। অন্য স্রোতের বেগ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে না এলে সে মিশতে পারে না। তার হাসিটা দশজনের থেকে তফাত। সে ছিল সেই রকমের মানুষ। যাদের হাসির চাবিকাঠিটা সামনাসামনি পড়ে থাকে অবহেলায়। কারুর চোখেও পড়ে না। সেটাও তার অভিমান ছিল। কিন্তু, 'ও যে কী সুন্দর হাসতে পারত, হাসাতে পারত,

যারা চোখে দেখেনি, তারা বিশ্বাস করতে পারবে না। আসলে ও ছিল ভীষণ দুষ্টু, হাসকুটে, কত রকমের বুদ্ধি যে ওর মাথায় খেলত! একেবারে একলা ছিল তো, সেজন্যে ও নিজেকে যত দেখত, অন্যকেও তাই। ও নিজেকে যত ঠাট্টা করত, অন্যকে নিয়েও ততটা। কে কেমনভাবে চলে ফেরে, হাসে, কার কী মনের ভাব, নিখুঁত বলত। ওর এসব ব্যাপার কেউ জানত না। ওর মধ্যে যে ওরকম একটা ছেলে আছে, কেউ টের পেতো না।'

আর সে ছিল একেবারে ছেলেমানুষ। বয়সটা তার কিছু না। ছেলেমানুষের যেমন পড়ায় মন বসে না, অথচ বুদ্ধি আর পারদর্শিতা থাকে, তারও সেইরকম ছিল। পড়া পরীক্ষা, সবকিছুই যতক্ষণ তার ভালো লাগে ততক্ষণ। অন্য সব বিষয়েই সে এত ছেলেমানুষ ছিল, তাকে সামলানো দায়। একটু একরোখা ছেলেমানুষের মতো। যা চাই, তা তাকে পেতে হবে। কিন্তু তার চাইবার মানুষ ছিল না। তার কাছে পাবার মানুষ ছিল বেশী। তাই যখন সে চাইবার মানুষ খুঁজে পেল, তার কাছ থেকে সে সবকিছু ছেলেমানুষের মতো জোর করে আদায় করেছে।

বলতে বলতে ঝিনির মুখে হাসি ফোটে। দৃষ্টি ওর কোপাইয়ের ওপারে, আসলে অন্য এক জগতে। বলে, 'ও এমনভাবে চাইত, এখুনি এই করতে হবে। এখুনি এই এনে দিতে হবে। আর আমি যেন কেমন হয়ে যেতাম। ওর কোনো কথার অবাধ্য হতে পারতাম না। অথচ ও যে হুকুম করে কিছু বলত তা নয়, যেমন ছেলেমানুষেরা হেসে, পা দাপিয়ে, খুনসুটি করে বলে, তেমনি করে বলত। আমি কখনো কখনো বিরক্ত হতাম, রাগ করতাম, তবু ওর কথা না শুনে পারতাম না। আমার নিজের মনটাই টনটনিয়ে উঠত...ঠিক তেমনি করেই ও একদিন বিয়ের কথা বলল। বাবা-মায়ের ইচ্ছে তো দূরের কথা, ওর আর আমার কথা যেসব বন্ধুরা জানত, তাদের একটুও ইচ্ছে ছিল না। তাদের কাছে ও ছিল অসুখী, অস্বাভাবিক, স্বাস্থ্যহীন। তারা কেউ ওকে বুঝত না, তা-ই। বাবা-মায়ের কাছে সেটা তো ছিলই। আমাদের সমাজে জাত বর্ণের কথাও তো কেউ ভোলে না। সেদিক থেকেও ওর সঙ্গে আমাদের অমিল ছিল। সাহস করে তাই কখনো বলতে পারিনি।'...

তবু বিয়ে হয়েছিল। শানাই বাজিয়ে ছাঁদনাতলায় না। সম্ভবও ছিল না। আইনের আশ্রয়ে, কাগজ-কলমের সই সাবুদে। সাক্ষী ছিল তিনজন। আজ ছাতিমতলার মেলায় যারা তার সঙ্গী, সেই রাধা, লিলি আর শুভেন্দু।

তখন ঝিনি মনে করত, একদিন বাব-মাকে, দাদাকেও বলবে। তখনো দাদার সেই দুর্ঘটনা ঘটেনি। সবাইকে বলে ঝিনি স্বামীর সংসারে যাবে। কিন্তু দুর্ঘটনা যখন ঘটল, তখন পর পর দুটো। আগে দাদা, তারপরে সে। মাঝখানের সময়ের পরিধি ন' মাস। তার মধ্যে কোনো কথা বলা যায়নি। সংসার করতেও যাওয়া হয়নি। দাদার মৃত্যুর পরে সেকথা আর কখনো উচ্চারণের সাহস হয়নি। এখন ঝিনির কষ্ট, সেই দিনের অপেক্ষা, কবে বলতে পারবে।

ঝিনি নিচু মুখে, যেন ঘাসের সঙ্গে মুখোমুখি করে, ঘাড় নাড়িয়ে একটু হাসে। বলে, 'এখন হয়তো আপনি বুঝতে পারছেন, আজ শুভেন্দু আমার কাছে কী চায়।'

বলে ও আমার মুখের দিকে চায়। কিন্তু আমি তখনো ওর পিছনের জীবনসীমায় পড়ে আছি। যা শুনেছি তার সবখানি যেন মন দিয়ে ঠিক ধরতে পারিনি। তবু বলি, 'পারি।'

ঝিনি বলে, 'এর জন্যে শুভেন্দুকে আমি খুব দোষ দিই না। হয়তো ওর দিক থেকে ও ঠিক। কিন্তু আমি পারি না। কেন পারি না তাও জানিনে। পারলে হয়তো ভালো হতো। কোথায় যে ছিটকে পড়েছি, মনে হয়, আমি যেন ওদের থেকে আলাদা।'

ঝিনি চুপ করে। আমি এক আশ্চর্য বিধবা দেখি। বৈধব্যের স্পর্শ যার নেই। বরং যার জীবনের চারপাশে এক ভিন্ যমুনার জলস্রোতের টান। আমি যেন দেখি, শূন্য কলসী কাঁখে অভিসারে চলে এক চির অভিসারিকা। তার যৌবনে যে বেজেছে প্রেমজুরির ঝনক ঝনক, তা-ই শুনি কথায় হাসিতে।

দেখি, পোড়ারমুখী কলঙ্কিনী রাই আঁধার ছেড়ে প্রেম-যমুনায় যায়। কিন্তু ওর এই যাতনাজাত আলো সইবে কে। যাত্রা ওর অনেক দিনের, কলসী ওকে ছাপা-ছাপি করতে হবে। সেই ঘাটের ঠিকানা কে জানে!

তথাপি দেখ, মনের চমক ঘোচে না। যে বিবাহ-বৈধব্য সংবাদ শুনেছি, তার মর্ম বুঝি না। সংবাদের মধ্যে যে ঘটনা, তা-ই কখনো সব না। নদী কেবল তরঙ্গে বহে না। তার ,তলে স্রোতের ধারা বহে কোন্ টানে, কে জানে। তা-ই জিজ্ঞেস করি 'তারপরে?'

ঝিনি ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করে, 'কীসের তারপরে?'

পাল্টি জিজ্ঞাসায় হঠাৎ জবাব দিতে পারি না। কেবল ওর চোখের দিকেই চেয়ে থাকি। ঝিনিও একটু তাকিয়ে থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। কী যেন ভাবে। তারপরে বলে, 'জানিনে। খালি এইটুকু বলতে পারি, ওকে আমার মনে পড়ে। কিন্তু আমি যেন নিজেকেই চিনতে পারিনে। তখনকার সেই "আমি"-কে। কেন যে ওর এত বাধ্য হয়েছিলাম, কেন যে কেবলই ওর কাছে কাছে থাকতে ইচ্ছে করতো, কখনো বুঝে উঠতে পারিনি। ভালোবাসা?'

যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করে। নিজের কাছেই জবাব চায়। একটু চুপ করে থাকে। বলে, 'জানিনে। তাও জানিনে। সব ঘটনা যেন ভালো করে মনে করতেও পারিনে। ওকে যত মনে পড়ে, ঘটনার কথা তত নয়। যেন একটা আবছা ঝাপসা মতো কিছু। কী যেন ঘটেছিল, কী যেন হয়েছিল। মনে মনে অনেক খুঁজি, কিছু একটা খুঁজে পাইনে। তারপরে তো আর কিছু জানিনে।'

বলে ঝিনি আমার দিকে চায়। চোখে আর ঠোঁটে এমন এক হাসি, যেন আমাকেই জিজ্ঞেস করে, কিছু জানা আছে কিনা। দেখে এমন অসহায় লাগে, হঠাৎ আবার একটা কষ্ট বিঁধে যায়। চোখ ফিরিয়ে চাই কোপাইয়ের ওপারে। মনে মনে আবার বলি, কলঙ্কিনীর আসলে সে-ই যাত্রা। চিরদিনের অ-ভর কলসী, ভরতে চলেছে। শূন্য কলসীর শব্দ থাকে, বয়ান থাকে না। তার এক বয়ান, 'ভরতে চলেছি।' 'তারপরের' কথা সে কী বলবে।

'আমি খারাপ, না?'

কথা শুনে চমকে ফিরি। মুখের দিকে চেয়ে বলি, 'না তো!'

ঝিনি হেসে মুখ নামায়। তার আগেই একটু রঙের ছোপ লেগে যায় মুখে। তবু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে। শুভেন্দুর অপরাধ কী? তার আগে বলো, ধন না, বিত্ত না, দান গ্রহণ-বর্জন না। একে বলে, মন গুণে ধন দেয় কোন্ জন। সেখানে কে অপরাধী, কে নয়, তার কোনো বিচার নেই। এখানে হেতু-সেতু কার্য-কারণে অ-বন্ধন। বন্ধন চলে না।

আমি ঝিনির দিকে দেখি। যত বিব্রতই হই, যত আড়ষ্ট লাগুক, সহসা যেন মনেতে কী এক সুর বেজে যায়। বিস্ময় যত লাগে, মুগ্ধবোধের টানে ভেসে যাই, তার চেয়ে বেশী। কেন পথে পথে ফিরি, কিসের সন্ধানে, তার নামধাম জানি না। কিন্তু এ যেন এক অচিন চেনার কূলে দাঁড়িয়ে প্রাণ গলে যায়। মানুষ চিনি কতটুকু, দেখি কতখানি। তার বন্ধ দরজার চাবি নিয়ে ফিরি না। কুলুপের হদিস জানা নেই। কার হাতে চাবি, কে খোলে, কেমন করে, কে জানে। যখন খুলে যায়, তখন মুগ্ধ

প্রাণে দু'চোখ মেলে চেয়ে থাকি। আর কী খুঁজি, জানি না, এইটুকুই পাওনা।

মানুষ দেখতে বেরিয়েছি, সে হলফ আমার নেই। কিন্তু আমার চোখের কূলে জুড়ে তার মেলা। আমার সকল আস্বাদনের স্বাদে স্বাদে ভাসা। যেন, আপনি সুরা হয়ে নেশা ধরিয়ে দেয়, ভাসিয়ে নিয়ে যায়; মনে হয়, এই পরম পাওনা।

ঝিনি কেন বলেছে, সে ভাবনা ওর। আমার ফেরা এই পাওনা পাথায় নিয়ে উড়ে যাওয়া।

ঝিনি হঠাৎ ফিরে তাকায়। সাজানো মুখে ভুরু তুলে বলে, 'কী?'

বলি, 'কিছু না। এবার ফেরা যাক?'

'তাড়া আছে বুঝি?'

তাড়া আমার না। মাঝ-আকাশ ধরতে যাওয়া সূর্যের তাড়া। হাতে-বাঁধা ঘড়ির তাড়া। কিন্তু সে কথা ঝিনিকে বলা বৃথা। ওর ওঠবার কোনো লক্ষণ নেই। কেবল একবার ঘড়ির দিকে তাকাই। সেটা লক্ষ্য করে ও বলে, 'ওটা তো চিরদিনই দেখতে হবে, এখন থাক না। কিন্তু আমার কথা শুনে কী মনে হলো বললেন না তো।'

বলি, 'এমন আর কখনো শুনিনি।'

'খুব খারাপ, না?'

'এর খারাপ ভালো জানি না।'

'তবে?'

বলতে গিয়ে বাধে। তবু বলি, 'কষ্ট হয়।'

ঝিনি মুখ ফিরিয়ে নেবার আগে একবার আমার চোখের দিকে তাকায়। একটু চুপ করে থাকে। তারপরে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'চলুন যাই।'

কিন্তু ওর চোখ দুটো এখন টলটল্যানো। যদিও বিমর্ষতা নেই, বরং একটু যেন রঙ ছোঁয়ানোই। তারপরেই হঠাৎ কোপাইয়ের ওপারে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কিসের ধোঁয়া উঠছে ওখানে বলুন তো?'

তেমন গভীর বন না যে, বলি, দাবানল। বাঁশঝাড়ের ওপার থেকে ধোঁয়া উঠছে। বলি, 'কেউ হয়তো আগুন দিয়েছে।'

'দেখতে যাবেন?'

'কিন্তু এখানে জল গভীর, পার হওয়া যাবে না।'

ঝিনি ধোঁয়ার দিকে চোখ রেখে আমার আগে আগে চলে। যে পথ দিয়ে এসেছিলাম, সেই দিকে যেতে যেতে বলে, 'যেখান দিয়ে সবাই পার হচ্ছে, সেখান দিয়ে পার হওয়া যাবে।'

বলে আমার দিকে চেয়ে ছোট মেয়ের মতো হাসে। এই মাত্র টলটলানো চোখ দুটোতে যেন কেমন এক কৌতুক আর অনুরাগের ছটা। লাল বড় রুমালটা এখন ওর হাতে জড়ানো। আবাঁধা চুল ছড়ানো ঘাড়ে পিঠে। প্রায় ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, 'যাবো কিন্তু সত্যি।'

পাছে আপত্তি করি, তা-ই এই ভঙ্গি। কাকে ফেরাব। অবুঝকেও বোঝানো যায়। নোঙর-ছেঁড়া নৌকা ফেরানো যায় না। কিন্তু লোকসমাজের গাঙে ঝিনি সে নৌকার যাত্রী করেছে আমাকে। ওকে বোঝাই কেমন করে। ফেরাই কেমন করে।

ঢিবির ঢালুতে পা দিতেই হঠাৎ যেন হাসির ছটায় সুর-ভরানো অবাক গলা ভেসে আসে, 'অই গ দিদিমণি, কুথা যাচ্ছেন গ!'

প্রথম ঠেক লাগে ঝিনির পায়ে। তারপরে আমার। কোপাইয়ের ওপারে, কাঁকুরে মাটি যেখানে ধাপের মতো নেমেছে জলে, ঘাটের মতো হয়েছে, সেখানে দেখি বিন্দু, বাউল গোকুলের প্রকৃতি, কাঁসার বাসন মাজে। তার কাছে বসে সুজন বাউল মাটির

হাঁড়ির পিছনে লাল মাটি লেপে। তার শক্ত পেটা কালো শরীরে একটি মাত্র গেরুয়া উড়নি। এক টুকরো কাছাহীন গেরুয়া কাপড়। চুল চুড়ো করে বাঁধা।

বিন্দুর গায়ে একমাত্র লালপাড় গেরুয়া শাড়ি। ঘাড়ের কাছে চুল আলগা করে বাঁধা। দু'জনেরই চোখে অবাক কৌতুকের ছটা। হাসিতে ঝিকিমিকি দাঁত।

ঝিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা এখানে কী করছ?'

বিন্দু আর সুজন একবার চোখাচোখি করে হাসে। বিন্দু জবাব দেয়, 'বোন-ভোজন কইরছি গ দিদিমণি। আসেন ক্যানে।'

সুজন আমার দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ডাকে, 'বাবাজী আসেন। বাবা মাও এখানে রয়েছে।'

অর্থাৎ গোপীদাস আর রাধা বৃদ্ধা। ঝিনি আমার দিকে চায়। ওর চোখে মুখে রীতিমত উত্তেজনার ঝলক। শরীরে লাগে তরঙ্গ। বলে, 'চলুন যাই।'

এমনিতেই ওকে সামলানো দায় ছিল। এখন তো কথাই নেই। এতক্ষণে ধোঁয়ার রহস্য ফাঁস। বাঁশঝাড়ের আড়ালে বাউলদের বনভোজনের আসর জমেছে। কিন্তু, যতদূর জানি, এরা ছাতিমতলার মেলায় নিমন্ত্রিত অতিথি। সেখান থেকে এরা বনের মধ্যে কেন?

ইতিমধ্যে ওপার থেকে বিন্দুর আবার ডাক আসে, 'আসেন দিদিমণি।'

দিদিমণির পায়ে লাগে পাগলা হরিণীর বেগ। সে ঢালু বেয়ে কোপাইয়ের জলের দিকে যায়। ওপার থেকে সুজন হেঁকে ওঠে, 'আহা, করেন কী, করেন কী দিদিমণি, এখান দিয়ে আসতে পারবেন না। এখানে যে ডুব জল।'

বিন্দু তার কালো অঙ্গের নিটোল হাসিতে টোল খেলিয়ে বাজে। বলে, 'জলে ডুববেন না গ দিদিমণি।'

সুজন বলে ওঠে, 'আর যদি ডুবসাঁতার জানেন তো আলাদা কথা।'

বলে চোখের কোণে চায় বিন্দুর দিকে। বিন্দু বলে, 'যে ডোবে, তার আবার ডুবসাঁতার জানলেই বা কী! আপনি আসেন গ দিদিমণি, উই উদিক দিয়ে ঘুরে আসেন।'

কথায় যেন রহস্যের আলো-কালোর খেলা। বিন্দু আমার দিকে চেয়ে একটু ঠোঁট টিপে হেসে বলে, 'বাবাজী, দিদিমণিকে নিয়ে ঘাটের পথ দিয়ে আসেন।'

ঘাটের পথে লোকচলাচলের পথ। পায়ের পাতা ডোবানো জল, যেখান দিয়ে মানুষ পশু যানবাহন, সব পারাপার করে। যেখানে আমাদের রিকশা রয়েছে।

ঝিনির চুল ওড়ে, শাড়ি ওড়ে। পিছন ফিরে আমাকে ডাক দেয়, 'আসুন।'

তারপরে ঢালু দিয়ে ছুটে নেমে যায় ঘাটের দিকে। ভয় লাগে, খোয়াইয়ের পাথরে হোঁচট খেয়ে দুর্ঘটনা না ঘটায়। কিন্তু ডেকে সাবধান করে ওর এই বেগ থামানো যাবে না। নিজে যে পিছ-পা হবো, তারও উপায় নেই। অথচ দেখ, এ যাত্রায় আমার মনে দিকশূলের ধন্দ। সে কথা কে বোঝাবে ঝিনিকে। ঘাটের কাছে জলেতে পায়ের পাতা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ঝিনি। পিছন ফিরে আবার আমাকে ডাকে, 'আসুন।'

কাছে গিয়ে দু'জনে পাশাপাশি পার হয়ে যাই। আমাদের রিকশাটা পড়ে রয়েছে। চালকের পাত্তা নেই। কোপাইয়ের কূলে এসে সেও যেন দিনযাপনের কাজের কথা ভুলে গিয়েছে। নদী পেরিয়ে আমরা ডান দিকে যাই। সুজন বিন্দুরও তখন হাতের কাজ শেষ। সুজনের ধোয়া হাতে মাটি লেপা হাঁড়ি। বিন্দুর হাতে ঝকঝকে মাজা কাঁসার থালা বাটি।

বিন্দুর ঠোঁটে তেমনি টেপা হাসি। চোখে ছটার ঝিকিমিকি। আমাদের দু'জনের

দিকেই তাকিয়ে ডাক দিয়ে চলতে থাকে। চলা না, যেন নাচের তরঙ্গে দোলে। ঝিনিকে বলে, 'বেড়া কইরতে এসেছিলেন বুঝি?'

ঝিনি আমার দিকে একবার দেখে নিয়ে বলে, 'হ্যাঁ।'

বিন্দু আর সুজন চোখাচোখি করে হাসে। বিন্দু বলে, 'দুটিতে এসেছেন, বেশ কইরেছেন।'

বিন্দুর কথায় ইঙ্গিত অস্পষ্ট না। তার কথার ছটাতেই ছোপ লেগে যায় ঝিনির মুখে। তবু বলে, 'কোপাই দেখতে এসেছিলাম।'

বিন্দু তার ডাগর চোখে ভারী তাজ্জব হয়ে চায়। বলে, 'কোপাই দেখলেন কুথা গ?'

আমি অবাক, ঝিনিও তাই, বলে, 'কেন, এই যে নদী।'

বিন্দু বলে ওঠে, 'অ মা গ, ই কী কোপাই ন্যাকি? ই তো যমুনা গ দিদিমণি। যমুনার ধারে এইসেছেন বলেন।'

বলে সে চোখের কোণে আমাকে দেখে। হাসিতে বেজে ওঠে খিলখিলিয়ে। সুজন হেঁকে ওঠে, 'ভালো হে ভালো। যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনে, পরবাহিনী!'

মুহূর্তেকের মধ্যেই বিন্দুর কোপাই-যমুনার ইঙ্গিত বুঝতে পারি। সে যে কেবল বাউল প্রকৃতি, তা না। মেয়ে যে ডাকিনী তা অনুমান করেছিলাম। কিন্তু এতটা বুঝতে পারিনি। তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আমার মুখের রঙ বদলে যায়।

ঝিনি তখনো ধাঁধায় দোলে। বিন্দুর কথা বুঝতে না পেরে ভুরু তুলে আমার দিকে চায়। এক মুহূর্ত পরেই হঠাৎ ওর মুখেও ছোপ লেগে যায়। সাজানো মুখের চকিত ছটায় চোখের পাতা বুজে যায়। কোনো কথা বলে না। আর আমি হাসতে গিয়েও হাসতে পারি না। কেবল দেখি সবাই এক বগ্‌গায় চলে। কিন্তু কোথায় চলে, তা জানে কিনা কে জানে। আমার সেই চলাতে ঠেক। সেই চলা যে অন্ধ পথের যাত্রা। হাসির ছটায় অন্ধকারের ভার।

এদের সে কথা বোঝাবো কী করে। অচিনদাকেই বোঝাতে পারিনি। উলটে বিন্দু গুনগুনিয়ে সুরে বাজে, 'সখি, রাই চাতকী, যথা তথা যমুনা ভাসায়।'...

ঝিনির নত মুখ তবু পদক্ষেপে বেতালা। হঠাৎ হোঁচট লাগতেই বিন্দু ওর আঁচল চেপে ধরে। বলে, 'দেখবেন গ দিদিমণি।'

কী আশ্চর্য দেখ, ঝিনি ওর আঁচল ধরা বিন্দুর হাতটা অনায়াসে ধরে। বলে, 'দিদিমণি নয়, ঝিনি দিদি।'

'বেশ, ঝিনি দিদি, আমার ঝিনি দিদি।'

বলে বিন্দু চোখ ঘুরিয়ে একবার আমাকে দেখে। আবার বলে, 'গোঁসাইয়ের এমন মুখখানাতে হাসি না থাইকলে ভালো লাগে না গ।'

তার কথা শুনে হাসি পায়। সুজন বলে ওঠে, 'তা যদি বললে বিন্দু, তাহলে জানবে, খাঁটি গোঁসাইদের হাসি হলো মনমনা।'

তাই শুনে বিন্দু আর একবার আমার দিকে চায়। সুজন হেঁকে ওঠে, 'কাকে নিয়ে এসেছি দেখ বাবা।'

বাঁশঝাড়ের আড়ালে আসতে আসতেই সুজনের হাঁক। বনভোজনের জায়গাই বটে। উত্তর পশ্চিমে উঁচু ঢিবি, বাতাস আটকে দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণ দিকে বেণুবন, মাঝখানে দুর্বা-ছাওয়া ফাঁকা জমি। শুকনো পাতার ছড়াছড়ি। পুব দিকে দুই চারি নানা গাছের মধ্যে বাবলা আশশ্যাওড়ার ঝোপজঙ্গল। বনভোজনের জায়গাখানি রোদে মাখামাখি।

এক দিকে উনুন করে মাটির কড়ায় রান্না চাপিয়েছে রাধা বুদ্ধা। আর এক দিকে ছেঁড়া ময়লা সতরঞ্জি পাতা। তার ওপরে ঝোলাঝুলি, বাঁয়া, ডুপ্‌কি, একতারা,

দোতারা। গোপীদাস পাতলা কাঁথার মতো কী একটা গায়ে দিয়ে বসে আছে। গোকুল পাশ ফিরে শুয়ে ছিল। শব্দ পেয়ে ফিরে চায়। তাড়াতাড়ি উঠে বসে। সবাই একযোগে অভ্যর্থনা করে, 'জয় গুরু, জয় গুরু। আসেন গ আসেন।'

তার আগে দেখ, গোপীদাসের কাঁচা-পাকা চুলদাড়িতে ঢাকা মুখের হাসিখানি। তার নয়ন দু'খানি কেবল ডাগর না, চাহনিখানিও এই বয়সে বিলক্ষণ বিটলেমিতে ভরা। সেই চোখে কৌতুকরঙ্গ, আবার ভুরু কাঁপিয়ে তির্যকে হানে। প্রথমে একখানি হাসি দেয়, 'হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ।'

তারপর হাসতে গিয়ে কাশি। কাশতে কাশতে কোমরের আলগা কষি কষতে কষতে দাঁড়ায়। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে। একবার আমাকে দেখে, আবার ঝিনিকে। বলে, 'আসেন গ, আমার গোঁসাই মানিক আসেন। আমার চিতা-বাবাজী আসেন। অই গ বিন্দু, অ রাধে, গোঁসাই দিদিকে বসতে দাও।'

বলে খ্যাক্‌খেকিয়ে হাসে। রাধা বৃদ্ধা মাটির কড়া নামিয়ে তাড়াতাড়ি কাছে আসে। বিন্দু ওদিকে ছেঁড়া শতরঞ্জি হাত দিয়ে ঝেড়ে দেয়। বলে, 'বসেন ঝিনি দিদি।'

গোপীদাস ঝিনির দিকে চোখ ঘুরিয়ে চেয়ে হাসে। বলে, 'কী সোন্দর নাম, ঝিনি দিদি। প্রেমজুরির ঝিনিঝিনি। হেঁ হেঁ হেঁ।'

যেন একটা খুশির হাওয়ার দোল লাগে। কোপাইয়ের ধারের বন-নিরালায় এক উৎসবের তরঙ্গ। ঝিনিকে গোঁসাইদিদি বলতে কী বুঝিয়েছে, জানি না। কিন্তু গোপীদাসের চোখের নজর, হাসির রকম বড় সহজ ভাবের না।

ঝিনির মুখে রাঙা ছোপ পাকা হয়ে গিয়েছে। তা আর যাবার না। ওর টানা চোখ দুটি খুশি-লজ্জায় ঝিলিক ঝলকানো। একবার আমার দিকে চায়। তারপরে শতরঞ্জির দিকে এগিয়ে যায়। সেই প্রথম গোকুল বলে, 'বসেন, বসেন।'

গোপীদাস মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তা হাঁ গ সোজন, মেলার মানুষ ইখ্যানে পেইলে কুথা হে।'

সুজন বলে, 'ওঁয়ারা দুটিতে বেড়াতে এসেছিলেন।'

'অই, অই।'

গোপীদাস খুশিতে আওয়াজ দিয়ে ওঠে। সুজন আবার বলে, 'তা বাবা, বিন্দুকে ঝিনি দিদি বললে, কোপাইয়ের ধারে বেড়াতে এসেছেন। আর বিন্দু বললে, কোপাই কোথায় দেখলেন গ ঝিনি দিদি, এ যে যমুনা নদী।'

গোপীদাসের বুড়ো হাড়ে ভেলকি। অমনি এক লাফ, আর আকাশ ফাটিয়ে ডাক, 'জয় গুরু, জয় গুরু। ধন্যি বিটি গ তুই বিন্দু, ধন্যি বিটি।'

হাসির হররা লাগে। ওদিকে গোকুল বিন্দু চোখাচোখি করে হাসে। গোপীদাস আমার হাত টেনে ধরে বসায়। প্রায় ঝিনির পাশাপাশি। হুশ করে নিশ্বাস ফেলে বলে, 'আঃ, আমার অচিনবাবু নাই, বইলব বা কারে, দেখাই বা কারে।'

বলে চোখ দুটো আধ-বোজা করে আমার দিকে চায়। ঝিনি চকিতে একবার আমার দিকে চায়। গোকুল বিন্দু সুজন, সবাই হেসে ওঠে।

এই হাসির মুখে ভিন্ কথা বলি, সে সাহস নেই। এই উৎসবের রঙ্গে বাধা দিই, সে ক্ষমতা নেই। বরং দেখি, গোপীদাস দাড়ি কাঁপিয়ে হাসে আমার দিকে চেয়ে। আর একটু একটু ঘাড় নাড়ে। রাধা বৃদ্ধা ওদিকে রান্না দেখতে যায়। আর গোপীদাস হঠাৎ সুর ধরে দেয়,

'অ ভোলা মন, মন চিতা তোর
ধ্যানে থাপটি মারে।

করে রে অধরা শিকার, ধরার ঘরে
ভাণ্ডেতে চাঁদ লখে রে।'...

সুজন গোকুল একসঙ্গে 'জয় গুরু' ধ্বনি করে। ওদিক থেকে রাধা বৃদ্ধা ফোকলা দাঁতে হাসে। বলে, 'ঠিক বইলছ গোঁসাই।'

বিন্দু ওদিকে সুজন গোকুলের মাঝখানে খিলখিলিয়ে বাজে। হাসিতে খানখান শরীর এক বাঁকে ছোঁয় গোকুলকে, আর বাঁকে সুজনকে।

গোপীদাসের গানের কথা সঠিক বুঝি না। কিন্তু অচিনদা আর তার আমাকে চিতা বলে ঠাট্টার কথা মনে পড়ে যায়। তার চোখের দিকে চোখ রাখতে পারি না। তার দাড়ি কাঁপে, ভুরু নাচে, চোখে ঊর্ধ্বনেত্র চাহনি। দেখে আড়ষ্ট লাগে, লজ্জা করে। চোখ নেমে যায়। গোপীদাস ঘড়ঘড়ে গলায় তেমনি করেই আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান করে,

'এ চিতা দেখলে চেনা যায় না গ,
লয়ন ঢুলু গোঁফ ধসানো রে।
পীত বসনে ঢাকা দিয়ে, মোহন হে'ইসে
বড় ল্যাজ বিশিষ্ট থাকে রে।'...

এদিকে সুজন গোকুলের হাততালি লেগে গিয়েছে। বিন্দুর প্রেমজ্বরিতে ঝিনি-ঝিনি। আর গোপীদাস যেন চোর ধরা দারোগার মতো আমার দিকে চেয়ে ঘাড় নাড়ে। হাঁক দিয়ে 'ভোলার মন'-কে ডেকে নতুন কথার সুর জোড়ে,

'এ চিতা চলে, বঙ্ক নালে, অমবস্যা পুন্নিমেতে
আওয়াজ করে না রে।
শিকার করে, চুপিসারে, তখন দেখ ঊর্ধ্ব লয়ান
শিকার ধ্যানে ধ্যান আবেশ রে।'...

গোপীদাস কোমর ঘুরিয়ে পাক মারে। তারপরে ধপাস করে বসে আমার সামনে। ঝিনিকে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন লাইগল গোঁসাইদিদি।'

ঝিনির গলায় যেন মিঠে লজ্জায় সুধা উপচানো। বলে, 'সুন্দর।'

বিন্দু বেজে ওঠে হাসিতে। গোপীদাস বলে, 'লাইগতে হবে, লাইগতে হবে। যেমন চিতা, তার তেমনি গান। জয় চিতাবাবাজী!'

আবার হাসি বাজে সকলের। আর আমার দিকে চেয়ে গোপীদাস চোখ ঘোরায়। তার অর্থ বুঝি। কিন্তু আমার কথা বলতে পারি না। কেবল অসহায় হয়ে একবার ঝিনির দিকে তাকাই।

গোপীদাস এবার ভিন্ সুরে বাজে, 'অই গ বিন্দু, রাধা তো খালি তরকারি রাঁধে। এবার ডালে চালে হাঁড়ি বসা। বাবাজী আর দিদির সঙ্গে খাবো।'

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠি, 'না, না, তা হবে না।'

ঝিনিও বলে ওঠে, 'খাওয়া থাক, অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

গোপীদাস ভুরু তুলে চোখ ঘুরিয়ে একবার আমাকে দেখে। আবার ঝিনিকে। তারপর রাধার দিকে চেয়ে বলে, 'অই, ই দুয়েতে যে এক দেখি গ!'

এতক্ষণে গোকুল আবার মুখ খোলে, 'এক সুরেতে বাজে।'

সবাই হেসে ওঠে। তার মধ্যে সব থেকে হাসি-কাশির চড়া সুর গোপীদাসের। বলে, 'কিন্তুক, হলে বড় সুখ পেতাম।'

ঝিনি বলে, 'কাউকে বলে আসিনি তো।'

গোকুল আবার মুখ খোলে, 'তাই কি আবার কেউ বইলে আসে?'

আসরের প্রথম থেকেই যেদিকে ঢাল লেগেছে, সব সেদিকেই বহে। ঝিনি মুখ

নামিয়ে নেয়। আমি জিজ্ঞেস করি গোপীদাসকে, 'কিন্তু মেলা ছেড়ে আজ এখানে কেন?'

গোপীদাস মাথার চুলের ঝুপসিতে আঙুল চালিয়ে বলে, 'আজ তো কী সব হচ্ছে উখানে, ইল্লি দিল্লি থেকে মন্তীর কত্তারা সব এইসেছেন। তাই ভাবলাম কী যে, এ বেলাটা কোপাইয়ের বনে যেয়ে, চালে ডালে ফুটিয়ে খেয়ে আসি।'

সরল উক্তি। সাতে নেই, পাঁচে নেই। তোমরা থাকো গিয়ে মন্ত্রী কর্তা নিয়ে। সেখানে আমাদের আসর নেই। তার চেয়ে নদীর ধারে, বনের নিরালায় একটু কাটিয়ে আসি। আগুন জ্বালো, পাক করো, ভোজন সারো এখানেই।

আবার চোখ ঢুলুঢুলু করে বলে, 'ঘাটে-বাটেই তো কাটে বাবাজী। খাঁচায় থাকতে পারি না। তা হ্যাঁ বাবাজী, এ মেলার পরে যাওয়া হবে কুথা?'

আমি বলি, 'ইচ্ছা আছে নানুর যাবো।'

গোপীদাস যেন অবাক হয়ে যায়। সকলের সঙ্গে চোখাচোখি করে। তারপরে বলে ওঠে, 'জয় গুরু, জয় গুরু। মনের কথা কইলেন যে গ। আমরাও তো ফিরতি পথে নানুর হয়ে যাবো।'

'তাই নাকি?'

'হু° বাবাজী।'

বিন্দু বলে ওঠে, 'সে বেশ হবে। আর ঝিনিদিদি যাবে না?'

ঝিনির মুখে ছায়া ঘনায়। বলে, 'জানিনে। আমার সঙ্গে লোক আছে তো। বলতে পারিনে।'

কথা শেষের আগেই সে একবার আমার দিকে চায়। আমি তাকাই গোপীদাসের দিকে।

গোপীদাস বলে, 'ক্যানে বাবাজী, দিদিকে লিয়ে আপনি আসেন। অমন গুরুর থান কি না দেখে যেতে আছে?'

হেসে বলি, 'ওঁর সঙ্গে যে লোক আছে।'

বিন্দু বলে, 'সবাই যাবে, তাতে কী।'

ঝিনি বলে, 'দেখা যাক।'

বলে সে উঠে দাঁড়ায়। আমিও দাঁড়াই। গোপীদাস বলে, 'ও বেলা আবার মেলায় দেখা হবে।'

রাধা বৃদ্ধা ছাড়া সবাই একটু এগিয়ে আসে আমাদের সঙ্গে। গোপীদাস সহসা পিছন থেকে গেয়ে ওঠে, 'দুয়ে যুগল, একে হেরি, মরি মরি।'...

ঝিনির মুখের পাকা ছোপ আরো গাঢ় হয়। কিন্তু চোখ হঠাৎ টলটলিয়ে ওঠে। আমি কথা বলতে পারি না। পিছনে শোনা যায়, 'জয় গুরু, জয় গুরু।'

নদীর ঘাটে এসে দেখি, রিকশাওয়ালা স্বয়ং আসনে অধিষ্ঠান করেছে। আমাদের দেখে লাফ দিয়ে নামে। বলে, 'আই দ্যাখেন, আমি ভাবি কি যে, বাবুরা বুঝি চলে গেছেন। কুথা গেছিলেন?'

নদী পেরিয়ে এসে বলি, 'ওপারে।'

'আর আমি দেখতে না পেয়ে, একে তাকে শুধাচ্ছি, কেউ বইলতে লারছে। খালি বলে, আপনারা চলে গেছেন। তাই কি হয়! বাবু দিদিমণির জুতা পড়ে রইল আমার গাড়িতে, চলে যাবেন ক্যানে।'...

তার মুখের দুশ্চিন্তা আর হতাশায় আলো ফোটে। সংশয় থেকে অসংশয়ে এসে এখন কেবল বকবকিয়ে চলে। আমরা রিকশায় উঠে বসি। সে টেনে নিয়ে ওঠে। চড়াইয়ে টেনে তুলতে কষ্ট। বালি কাঁকর পাথুরে মাটি বড় নির্দয়, অ-বন্ধুরতা কোথাও পাবে

না। নেমে হাঁটতে চাইলেও চালক গররাজী। সে বীর বা দয়ালু না। তার কাজ সে করে। যাত্রীর করুণা তার বালাই।

ঝিনি কোনো কথা বলে না। একটু আগেই ওর চোখ ভিজে উঠেছিল। এখন শুকনো। রোদে বাতাসে শুকায়, নাকি মনের রহস্যে, তা জানি না। এখন ও রোদের ঝলকে ভুরু বাঁকিয়ে এদিক-ওদিক চোখ ফেরায়। কিন্তু ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি লেগে আছে। মুখের ভাবে যেন একটু লাজ-লাজ। লাল রেশমী রুমালখানি গলায় বেড় দিয়ে, বুকের কাছে জামার দু' পাশে গুঁজে দিয়েছে। আসবার সময়ে পাশাপাশি বসার মধ্যে হয়তো কোথাও ওর কিঞ্চিৎ আড়ষ্টতা ছিল। কিংবা বলি, একটু সাবধানতা। এখন যেন সে চেতনা নেই। বড় অনায়াস, নিবিড়, গভীরে ধরা-ধরা। তাই এখন আড়ষ্ট যে কে, সে জানি আমি আমার মন।

আমিও কোনো কথা বলি না। সামনের পথে চেয়ে থাকি। মাঝে মাঝে অবাক লাগে, আমগাছের অকাল মুকুল দেখে। কাঁঠালের ডালে কচি এঁচোড় দর্শনে। কিন্তু আসলে আমার শ্রবণ ভরে গোপীদাসের গান বাজে। তার মুখ আমার চোখে ভাসে। সব মিলিয়ে কেমন একটা তালে বাজানো খুশির সুরের আমেজ। অথচ একটা দীর্ঘ-শ্বাসের বাতাস যেন বুক-জোড়া। উদাস বৈরাগ্যের হাতছানিতে ভেসে যাবার মতন।

মনে ভাবি, গোপীদাসের মনপ্রাণ এত ভরা কিসে? ধুলি আলখাল্লায়, ধুলি জটায়, ধুলো গায়ে, ঝোলায় একতারা বাঁয়া প্রেমজুরিতে, মাঠেঘাটের বাটে বাটে ফেরায়, কোন্ নেশাতে ভরপুর! এমন না যে, চাঁদির জেল্লায় ঝকমকানো দৌলতের টাটে বসে মৌজ করে। চোখে তো দেখি, ফৌত ফতুর মানুষ সব, চালচুলো নেই। তবু যেন প্রাণ ভরা, বুক ভরা, মুখে ভুবনমোহন হাসি। দুনিয়ার সব পাওনা ঝোলায় তুলে যেন এখন নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছে। মনকে ডাকে 'ভোলা' বলে, 'মনের মানুষ' ডেকে বেড়ায়। না বুঝি সেই মন। না চিনি সেই মনের মানুষ।

জীবনধারণের চাপাচাপিতে পা গুনে চলি। পদে পদে হিসাব-নিকাশ। পান্তা আনতে নুন ফুরালে চোখে অন্ধকার দেখি। উদ্বেগে ছুটোছুটি করি। কোনো রূপেই নয়ন ভোলে না। কোনো পাওয়াতেই মন ভোলে না। জনপদে নগরে প্রাসাদে ইমারতে, কেবল হারাই হারাই, সদা ভয়ে ফিরি। কেবল সোনায় দানায়, ভোগের ভাগে-চক্রে পাক খাই। তাতে যখন হাঁফ লাগে, শ্বাস বন্ধ মরি-মরি, তখন ছুট লাগাই। মনে করি, রূপ ছেড়ে অরূপ দেখে আসি। যা পাই না, তার আসল-নকল বিচার করে আসি। কী পাই না, তার সন্ধানে যাই।

কিন্তু দেখ, কায়ার যেমন ছায়া, মন তেমনি পিছু ধাওয়া করে। যে মনের দিবানিশি হারাই হারাই, চাই চাই, হিসাব-নিকাশ মাপজোক বিচার। ওদের ঝোলায় কী ধন আছে? কোন্ রূপের নেশায় মৌত হয়ে অরূপের সীমায় বসে আছে? জীবনের কি দায় নেই? মরণের কি ভয় নেই?

এমন মন পায় কোথায়? দেয় কে?

প্রান্তর ছাড়িয়ে, গ্রাম পেরিয়ে, অনেকখানি এসে পড়েছি। হঠাৎ মনে হয়, ঝিনি যেন অনেকক্ষণ ধরে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। ফিরে তাকাই। চোখাচোখি হতেই ও তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নেয়। মুখের রঙে একটু গাঢ় ছোপ লাগে। ঠোঁটের কোণে হাসি।

কিছু জিজ্ঞেস না করে মুখ ফেরাতে যাই। ঝিনি জিজ্ঞেস করে, 'কী ভাবছেন?'

অকপটেই বলি, 'গোপীদাসের কথা।'

'কী কথা?'

'ওদের জীবন, আচার-আচরণের কথা। ওদের কিছুই বুঝি না। কী চায়, কী

করে। অথচ যেন কিসের নেশায় আছে।'

ঝিনির গলায় হঠাৎ যেন কিসের এক আবেশ লেগে যায়। বলে, 'ওরা সাধক। সাধনার মধ্যে আছে।'

অবাক হয়ে ঝিনির দিকে চাই। এ যেন আর এক ঝিনি। বিদুষী না, নাগরিকা না, রঙ ছোপানো মুখে, চোখের ঝিলিকে, মেয়ের মন জানানো প্রাণলীলা না। এও যেন এক বাউলানী কথা বলে! জিজ্ঞেস করি, 'কী সাধে, কিসের সাধন?'

ঝিনির চোখে কেমন এক নিবিড় চাহনি। বলে, 'সে কথা সাধকরাই জানে।'

আমি বলি, 'কিন্তু এ কেমন সাধন? গান গেয়ে পথে পথে ফেরা, যেন কেমন এক ভাবের ঘোরে আছে! জীবনের আর কোনো তাগিদ নেই?'

'কিসের তাগিদ?'

ঝিনির প্রশ্ন শুনে হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারি না। আমার কথা কি সত্যি ও বুঝতে পারে না? বলি, 'কই, আমি তো এরকম পারি না! এমন করে জীবন কাটানোর সাহস তো আমার হয় না!'

ঝিনি বলে, 'ওদের যদি এটাই সাধনা হয়! হয়তো, এমনি করে চলা ফেরা গাওয়া। এ জীবনের সবটাই সাধনা। তাহলে আর ভাবনা কিসের, সাহসের কথা কিসে আসবে।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'এমনি চালচুলোহীন অবস্থায়?'

'এ-ই যদি সাধন হয়, তবে চালচুলো দিয়ে কী হবে। ওরা তো এই রকমই। আসলে ঠিক থাকলেই হলো।'

'আসল কী?'

'তা আমি জানিনে। ওরা তো বলে, মনের মানুষ।'

আমি ভুলে যাই, কার সঙ্গে কথা বলছি। জিজ্ঞেস করি, 'মনের মানুষ কী?'

ঝিনি চুপ করে থাকে, কোনো জবাব দেয় না। দেখি, সে আমার চোখের দিকে চেয়ে আছে। আমার চোখ পড়তেও সে চোখ সরায় না। কেমন এক বিহ্বল আবেশ চোখে। আমি আবার জিজ্ঞেস করবার আগেই ও জবাব দেয়, 'আমি জানিনে, ওদের মনের মানুষ কে। খালি মনে হয়, ওদের মতো করে মনের মানুষ সাধি।'

ছোট একটা নিশ্বাসের সঙ্গে ওর গলায় যেন কী এক সুর বেজে ওঠে। আমি শুনি, কথা সেই এক টানে বহে। দেখি, সেই এক মেয়ে, অন্য রূপে ফোটে। আমার ভাবেতে ঠেক লাগে। কিন্তু কী যে মোহের মায়া ঝিনির গলায়, রূপে যে কী এক অপরূপ জাগে, এ পথ যেন তার রঙ বদলায়। মনে হয়, এ কোনো কুসুমকানন, কুঞ্জগলি পথ। আফোটা ফুলগুলো ফুটে ফুটে ওঠে, গন্ধে বিথারে, ভোমরা গুনগুন করে। কোপাইয়ের খোয়াইয়ের রাস্তা, সেই চিরদিনের বাঁশী বাজানো, ধেনু চরানো, কদম্বের ডালে ডালে ফুল দোলানো, যেন নীপবনপথ হয়ে ওঠে। আর যমুনার জলশাড়ি পরে, কে যেন চলে সেই পথে। তার প্রাণের সাধের কথায় ফুল ফুটে ফুটে ওঠে।

কিন্তু সেই চলাতে আমার পা মেলে না। সেই সাধাতে বাঁধা আমার বেড়ি। সে কথা আমার কথা। বলা বে-এক্তিয়ার। কেননা, ঝিনি যে আপন রসে ফোটে। নিজের গন্ধে জাগে। সবই ওর স্বধর্ম। তুমি আপন খোঁজায় থাকো।

তবু আমি তাকাতে পারি না। চোখ ফেরাই দূরে। বাতাসে শীত, রোদে তাপ লাগে। সূর্য ঢলেছে পশ্চিমে। রিকশাওয়ালা থেকে থেকে জোর নিশ্বাসের চাপে একটা সুরে ভেঁজে বলে, 'লতুন—লতুন পায়রাগুলোন...।'

সে যে কী গান, তা জানি না। চোখের সামনে সাঁকো জেগে ওঠে। ঝিনি চোখ সরিয়ে নেয়। আবার অন্য সুরে বলে, 'আপনার সেই বসিরহাটের গাজী যা সাধে, এরাও

তাই সাধে, মনে হয়।'

একটু অবাক হই। গাজীকে যে ঝিনির এতখানি মনে আছে, ভাবিনি। বলি, 'কিন্তু ওর ঘর-সংসার আছে।'

ঝিনি বলে, 'থাকতে পারে। এদেরও হয়তো সেরকম আছে। কিন্তু ওদের ভাব-ভঙ্গি, কথাবার্তা, সব যেন একরকম। সবাই যেন এক সাধনাই সাধছে।'

গাজীর কথা মনে পড়ে যায়। তার শেষ কথাগুলো মনে আছে। তবু, তার মধ্যেই মনে হয়, সেও যেন তার ঝোলাতে কী এক পরম রতন নিয়ে বসে আছে। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, আপন ভাবে বিভোর।

ঝিনি আমার দিকে চেয়ে, হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কেন বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান?'

বলি, 'সেটা আলাদা।'

'কেমন আলাদা?'

'আমি বাউল দরবেশ নই।'

'তা জানি। তবু?'

'থাকতে পারি না বলে।'

'কেন?'

ঝিনি আমার চোখের দিকে চেয়ে থাকে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিই। ঝিনি যেন রহস্যের সুরে বেজে ওঠে, 'তার মানে, জানতে।'

ঝিনি আমার মনে চমক লাগিয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করি, 'কী জানতে?'

ওর চোখে তেমনি এক নিবিড় রহস্যের ঝিলিক। বলে, 'কী জানি! সে কথা কি আপনার মুখ থেকে আমি বের করতে পারব?'

হঠাৎ কোনো কথা বলতে পারি না। ঝিনিকে যেন মনে হয়, ও জাল ফেলে ফেলে চলে, মীন ধরবে বলে। ও যখন আপন সুরে বাজে, তখন বুঝতে পারি। এখন যেন ওর হাতের আঙুল ভিন্ন যন্ত্রে, ভিন্ন তারে সুর খোঁজে। এখন বুঝতে গিয়ে নিজেকেই সরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে। নিজেকেই অবুঝ লাগে। বলি, 'হয়তো তাই। কিন্তু আমি জানি না।'

'আমি জানি।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কী?'

ঝিনির ভ্রূভঙ্গিতে, চোখের তারায় যেন রহস্য আরো ঘনীভূত হয়। বলে, 'কতটুকু পাওয়া হলো, তা-ই জানতে।'

'সেটা কী?'

'যা নেবার জন্যে ফেরেন।'

'কী নিতে?'

'তা জানিনে। মনে হয়, সকলের চোখের আড়ালে কী যেন নিয়ে নিয়ে চলে যান।' হঠাৎ একটু থেমে বলে, 'চুরি করে।'

অবাক হলেও ঝিনির কথায় আমার যেন টনক নড়ে যায়। সহসা কিছু বলতে না পেরে হেসে উঠি। আমার হাসির মুখেই ঝিনি আবার বলে ওঠে, 'কিন্তু দিতে কিছুই চান না। আপনি শুধু নিতেই জানেন, দিতে জানেন না।'

আবার হেসে তাকাতে গিয়ে চমকাই। ঝিনির মুখে অন্ধকার নামেনি। বিষাদ মেখেছে। জিজ্ঞেস করি, 'কী দিতে জানি না?'

'তাও জানেন না? কথা শুনে তো কিছু বোঝা যায় না। তবু বলতে ইচ্ছে করে, 'আপনি বড় মিথ্যুক।'

এই একটি অপবাদ সারা জীবনে কখনো ঘোচে না। ঘুচবে না বোধ হয়। আর মুহূর্তেই আমার মনে হয়, এ সেই মেয়ে! সেই মেয়েটিই! রহস্য না, কথা না, শুধু সেই মেয়েটি। যে ফোটে আপন রূপে গন্ধে। এখন যে ওর চোখের কোণ চিকচিক করে, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে ওঠে, তবু ভুরুর বাঁক ঘোচে না, এসকলই একান্ত ওর আপন রূপ, নিজের গন্ধ।

হঠাৎ চমকে উঠি, বাজখাঁই গম্ভীর গলা শুনে, 'এই রিকশা, দাঁড়া।'

রিকশাওয়ালা অবাক হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দিকে ফিরে চায়। দেখি, রাস্তার ধারে বিলিতি মোটরগাড়ি। তার ভিতরে চালকের জায়গায় অচিনদা। পিছনে বসে রাধা আর লিলি।

হাসতে গিয়ে থমকে যাই। অচিনদা তাঁর লোমশ ভুরু কুঁচকে একবার নিজের হাতের ঘড়ি দেখেন। ঠিক সেই ভাবেই আমার দিকে চেয়ে বলেন, 'রিকশার ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে নেমে এসো।'

ঠিক যেন চোর-ধরা দারোগা। ঝিনিকে আঙুল তুলে ডেকে বলেন, 'তুমি নেমে এসো।'

বলে তিনি পিছনের আসনে রাধা লিলির দিকে একবার তাকান। ওরা গম্ভীর, ঠোঁট টেপা। তবু ওদের চোখে ঝিকিমিকি। ঠোঁটের কোণে কাঁপুনি। ঝিনি একবার আমার দিকে চায়। ঝটিতি ছটার ঝলক লাগে ওর মুখে। বাধ্য বালিকাটির মতো সুড় সুড় করে নেমে যায় রিকশা থেকে। মোটরের দরজা খুলে রাধা লিলির পাশে গিয়ে বসে।

আমি ততক্ষণে পকেটে হাত দিয়েছি। সাঁকো পেরিয়ে কখন যে ছাতিমতলার সীমায় এসে পড়েছি, খেয়াল করিনি। ঝিনির কথার চমকে গমকেই নজর হারিয়ে গিয়েছিল। পয়সা মিটিয়ে রিকশা থেকে নেমে আসি। আর কী আমার কপাল দেখ হে, রিকশাচালকটি পর্যন্ত আমার দিকে এমন করে তাকায়, যেন ধরা পড়া চোর দেখছে। ওর চোখের কথা যদি পড়তে পারো তো দেখ, এই চুরি ধরার মধ্যেও যেন রসের গন্ধ পেয়েছে। মান-ইজ্জত আর রইল না।

অচিনদা তাঁর পাশের দরজা খুলে দেন আমার জন্য। আমি উঠে বসে দরজা বন্ধ করতেই আওয়াজ ওঠে। অচিনদা গাড়ি ঘুরিয়ে নেন। তিনি যে ওস্তাদ চালক, চালনা দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু একটি কথাও বলেন না। ভুরু কুঁচকে সামনের দিকে চেয়ে, সোজা দক্ষিণে। তারপরে বাঁয়ে ঘুরে, মেলা পাশে রেখে এগিয়ে যান। কী অস্বস্তি দেখ। পিছনে তিন সখীতে কী করছে, মুখ ফিরিয়ে দেখতে পারি না। অচিনদা ফিরেও তাকান না। কিছু দূর গিয়ে ডান দিকে ঘুরে এক ছায়াভরা লাল রাস্তায় চলেন। আর তখনই তাঁর গলার আওয়াজ বাজে, 'ক'টা বেজেছে, সে খেয়াল আছে?'

তাড়াতাড়ি হাত তুলে ঘড়ি দেখে বলি, 'পৌনে দুটো।'

অচিনদা মুখ কুঁচকে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলেন, 'থাক, সেটা আপনি না বললেও আমি জানি। তা সেই সকালে বেরিয়ে পৌনে দুটোতেই যদি ফিরতে হয়, সেটা বলে যেতে কী হয়েছিল। এদিকে ললিতা বিশাখারা যে হেদিয়ে গেল সখীর জন্যে।'

তখন পিছন থেকে তাড়াতাড়ি ঝিনির গলা শোনা যায়, 'অচিনদা, ওঁকে আমিই ডেকে নিয়ে গেছলাম।'

অচিনদা ঠোঁট উলটে বলেন, 'আরে, সে কি আমি জানিনে! তুমি ডেকে নিয়ে যাবে না তো কি, এই মেনীমুখো তোমাকে ডেকে নিয়ে যাবে!'

সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে রুদ্ধ হাসির দুই-চারি নিক্কণ বেজে ওঠে। রাধা লিলি,

নিঃসন্দেহে। কী সব অপবাদের কপাল দেখ। এখন সব দোষই আমার। এমন কি, আমি মেনীমুখোও বটে। অচিনদা তেমনি গলাতেই আবার বাজেন, 'ও কি কাউকে ডাকতে পারে। ওকে ডাকলে, ও সুড়সুড়িয়ে যায়।'

পিছনে আবার রুদ্ধ হাসির টুংটাং। কিন্তু এও মিথ্যা অপবাদ। আসলে, অচিনদা ঘটনায় যে-রঙ দিতে চান, তাইতে আমার বিরাগ। সে কথা বলবে কে এখন।

অচিনদা একবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকিয়ে নেন। বলেন, 'কী গো দূতীগণ, তোমাদের বলেছিলাম কি না, দুটির কাউকেই যখন দেখা যাচ্ছে না, তখন একসঙ্গেই কেটেছে।'

আহা, এবার ভাষা শোনো। কেটে পড়াও শুনতে হলো। পিছনে তেমনি হাসির তরঙ্গ। ইতিমধ্যে ঘেরা বাগানের ছোট দরজার কাছে গাড়ি থামে। একতলা বাড়ি। বাড়ির সামনের বারান্দার রোদে নীরেনদা আর সুপর্ণাদি বসেছিলেন। নীরেনদাই প্রথম ব্যস্তত্রস্ত হয়ে এগিয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করেন, 'পেলেন?'

অচিনদা গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলেন, 'যাবে কোথায়?'

কেন, আমরা কি হারিয়ে গিয়েছিলাম, না পালিয়েছিলাম! নীরেনদা হাসেন। সুপর্ণাদিও বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসেন। ওরা তিন সখীতে নামে। আমিও নামি।

নীরেনদা আমার দিকে চেয়ে ডাকেন, 'আসুন।'

অচিনদাকে জিজ্ঞেস করেন, 'কোথায় পেলেন?'

অচিনদা বলেন, 'মাঝ পথেই।'

তাঁর বলার ধরনে নীরেনদা জোরে হেসে ওঠেন। সুপর্ণাদিও মুখে আঁচল চেপে হাসিতে কাঁপেন। ঝিনি বলে, 'আমরা কোপাই দেখতে গেছলাম।'

আমি যোগ করি, 'সেখানে গোপীদাসরাও ছিল দেখলাম। রান্নাবান্না করছিল।'

অচিনদা ভুরু তুলে বলেন, 'ও, গাঁজাখোরগুলো সেখানে গেছে। তাই গোটা দলটাকেই সকাল থেকে দেখতে পাইনি।'

গাঁজাখোর! আসলে অচিনদা প্রেমেই বাজেন। ওঁর বাউল বন্ধুরা যে প্রেমের গাঁজা খায়। আমার হঠাৎ চোখ পড়ে রাধা লিলির দিকে। রাধা ডাকে, 'আসুন, বসবেন।'

আমি জিজ্ঞেস করি, 'খুব দুশ্চিন্তা করছিলেন বুঝি? অনেক হয়রান হতে হয়েছে নিশ্চয়?'

প্রায় ক্ষমা চাইবার মতো করেই বলি। রাধা লিলি চোখাচোখি করে হাসে। লিলি গলা নমিয়ে বলে, 'না, না, চিন্তা আমরা একটুও করিনি, খোঁজাখুঁজিও করিনি। আমরা বুঝতেই পেরেছিলাম, ঝিনি আর আপনি কোথাও গেছেন। আসলে, অচিনদাই মতলব দিলেন। বললেন, 'চলো, দুটোকে খুঁজে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসি।'

নীরেনদার সঙ্গে অচিনদা বারান্দায় যান। আমরা কয়েকজন এক স্বর্ণচাঁপার ঝাড়ালো ছায়ায়। রাধা চোখ ঘুরিয়ে বলে, 'তা বলে ভাববেন না যে, একটুও দুশ্চিন্তা হয়নি। শত হলেও আমাদের বন্ধুটি তো যুবতী।'

লিলি ঝিনিকে একবার দেখে যোগ দেয়, 'রূপসীও।'

'এবং বিদুষী।' রাধা জুড়ে দেয়।

ঝিনি ছোপ ধরা মুখে লজ্জিত নিচু স্বরে বলে, 'ধ্যাৎ, কী সব বলছিস।'

সে কথায় কান না দিয়ে, রাধা আবার বলে, 'আর আপনিও—।'

লিলি বলে ওঠে, 'মেনীমুখো। অচিনদাই বললেন।'

রাধা—'তায় যুবক।'

লিলি—'এদেরই ভয় বেশী।'

রাধা—'তাই একটু ভাবনা হবে বই কি!'

সেই যে কথায় বলে, কোথায় খাপ খুলেছ। আমার সেই দশা। এখানে আবার মুখ খোলার সাহস করি আমি!

ঝিনি অমনি সাজানো স্বরে, হেসেই বলে, 'কী রে, কী আরম্ভ করলি তোরা!'

তার আগেই, স্বর্ণচাঁপার তলায়, সখীদের গলায় হাসি বেজে ওঠে। বারান্দা থেকে অচিনদা বলেন, 'রসের কেঁড়েটা সব ওখানেই সাবড়ে দিলে? আমাদেরও এক-আধ পাত্তর দাও।'

রাধা বলে, 'শাসন করছি।'

অচিনদা বলেন, 'অ, তাই এত হাসি। শাসন হচ্ছে কি না!'

রাধা প্রায় হুকুমের স্বরে ডাকে, 'আসুন। একটু চা খেয়ে যান।'

আপাততঃ বিনা প্রতিবাদে যাওয়াই ভালো। সবাই মিলে বারান্দায় যাই। সুপর্ণাদি রান্না দেখতে চলে যান। আমি প্রায় ভয়ে ভয়ে বলি, 'এত বেলায়, এখন না হয় চা থাকত।'

রাধা অমনি বলে ওঠে, 'শুনেছেন অচিনদা, চায়ের বেলায় এত বেলা।'

অচিনদা বলেন, 'হুম, কোপাইয়ের ধারে নিয়ে যাও, সেখানে বেলা হয় না।'

নীরেনদা প্রায় ছেলেমানুষের মতো হেসে ওঠেন। কিন্তু অচিনদাই আবার ভিন্ সুর ধরেন, 'তবে, এই বেলা দুটোয়, চা-টা থাক ভাই। ওটা ও-বেলার জন্যে তুলে রাখো। এখন তোমরা চান খাওয়া-দাওয়া করো।'

লিলি বলে, 'না, খেয়ে যেতে হবে।'

অচিনদা ঘাড় নাড়েন, 'উঁহু, এভাবে নয়। অন্য জায়গায় খাবার নষ্ট হবে। তবে এর কথা বলতে পারি না, দেখ যদি রেখে খাওয়াতে পারো।'

ঠেলার চোটে যেমন বাবা বলায়, তেমনি কথার চোটেই হাসি ঝরায়। আমার চোখ পড়ে যায় ঝিনির দিকে। তার চোখে সেই ইচ্ছা, থাকা-খাওয়ার নিমন্ত্রণ। আমি তাড়াতাড়ি বলি, 'আমার বন্ধুদের কিছু বলে আসিনি। ও-বেলা আসব।'

অচিনদা বলে ওঠেন, 'আরে সে তো আমরা না বললেও আসবে জানি।'

আবার হাসি। কিন্তু জানি, অচিনদাকে কিছু বোঝাতে পারব না। বিদায় নেবার আগে, একবার জিজ্ঞেস করি, 'শুভেন্দুবাবুকে দেখতে পাচ্ছি না।'

নীরেনদা একটু বিরক্ত হতাশ সুরে বলেন, 'ও ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে।'

ইচ্ছা না থাকলেও ঝিনির সঙ্গে আবার আমার চোখাচোখি হয়ে যায়। তারপরে অচিনদার সঙ্গে গিয়ে গাড়িতে উঠি। রাধা লিলি ঝিনি সবাই বাগানের ছোট দরজার কাছে দাঁড়ায়। রাধা বলে ওঠে, 'অচিনদা, ও-বেলা ওঁকে ধরে নিয়ে আসবেন।'

'নিশ্চয়ই।'

ঝিনির চোখের দৃষ্টি কোনো কিছুই মানতে চায় না। গাড়ি এগিয়ে যায়। অচিনদা নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'জীবন মরণ পরশরতন কাঁচের সমান ভেল।'

বলে, একটু হাসেন। আবার বলেন, 'ভালোমন্দ জানিনে। নদী বহে, সেটাই স্বাভাবিক। তাই ভালো লাগে।'

জানি, এ কথা কেন বলেন। কিন্তু বলতে পারি না, সে নদী যদি যাত্রীর পথ ভাসিয়ে দিতে চায়, তবে বড় বিড়ম্বনা।

অচিনদার গাড়ি এসে দাঁড়ায়, আমার বন্ধুর দরজায়।

সবুরে চলো মন। সবুরে ধন মিলবে।

নিজেকে বলি। নিজেকে বুঝসুঝ করাই। কিন্তু কী বা আমার ধনের প্রত্যাশা!

boiRboi.net

আমার বুকে বাজে, আমি সেই মামুদ গাজী না। আমি গোপীদাস সুজন গোকুল বাউল না। আমার ঝোলা ধুলার না। পরম পাওয়ার রতন নেই আমার ঝুলিতে।

তবু আমার পথ চলার যে ধন, সে সোনাদানা না। মনের ঝোলা ফাঁক করে রেখেছি। বড় গহীন, আঁধারের আঁকাবাঁকা ঝুলি। যদি সেথায় মন মোহরে ভরতি হয়ে, টুকুস জেল্লা লাগে, সেই এক প্রত্যাশা।

কিন্তু ভরে কই? ভরি ভরি করে, মন দোল দুলিয়ে ওঠে। তারপরেই দেখ, নানা ধ্যাজ। ভারী ঠেক। কাউকে কিছু বোঝানো গেল না। দশই পৌষের এই সকালে চলেছি নানুরের পথে। চন্ডীদাস নানুরে। এক কথাতে বলি, মন চলো যাই চন্ডীদাসে। চলো যাই রজকিনীর পাটে। সেই রামা, নাম যার রামী, তার প্রেম-শ্রীপাটে। যেথায় বাশুলি দেবীর থানে বসে, কবি রচে রাধাকৃষ্ণ প্রেমবিরহ গান। তত্ত্ব যার রসের প্লাবনে ভাসে, মোহ রস বোঝে সেই রসিকা রজকিনী।

কী রহস্য দেখ, পরমা শক্তি দেবী বাশুলি ভজে দ্বিজ। অথচ শিল্পীরূপে গাহে গান, হাসে কাঁদে মরমীয়া ধ্যানে, রাই কালা নামে। তাই শুনে, অবশ বিবশ হৈয়া থাকে রজকিনী। কী রহস্য, কী রহস্য! রসের রসিক না হলে পরে, অরসিকের ধন্দ সার। আমি সেই অরসিক। আমার ভারী ধন্দ। তাই চলি চন্ডীদাসে। ছুটি রজকিনী পাটে।

কিন্তু সেই যাওয়ার পথে মনে বড় ঠেক। আর এক ধন্দ। ভেবেছিলাম একলা ছেড়ে সঙ্গী ধরব। গোকুল বিন্দুদের সঙ্গে যাবো। তবে কি না, তুমি করো থিতু। আলামাটি চাল করে আর একজনে। তাঁর নাম অচিনদা। এ বড় ভারী মোগল। সঙ্গে খানা না খাইয়ে ছাড়বেন না। নানুরের যাত্রায়, আমাকেই তিনি সঙ্গী করেছেন। নিজের গাড়ি, নিজেই চালিয়ে নিয়ে চলেন। বেতনভোগী চালক পড়ে থাকে ছাতিমতলায়। উনি যন্ত্রের লাগাম ধরে বলেন, 'আরে দূর, অমন পনর-বিশ মাইল নিজেই চালিয়ে যাবো।'

তা যাবেন, কিন্তু ঝিনি রাধা লিলিকেও সঙ্গে না নিয়ে যান কেমন করে। তার ওপরে ইনি আবার অচিনবাবু তো! গোপীদাসেরাই বা কেন মোটর-বাসে যাবে? ওরা মোটে তো পাঁচজন। যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় ন' জন। একেবারে অব্যর্থ কথা। গাড়িতে একেবারে ঠাসাঠাসি ন' জন। এমন কিছু একেবারে ঘাড়ে মাথায় গোঁজাগুঁজি না। এ বিলিতি গাড়ির খোঁল ফাঁদ, সবই বেশ বড়। জায়গার অকুলান হয়নি ।

অচিনদা চেয়েছিলেন, সামনের আসনে গোপীদাসদের নিয়ে বসবেন। সেটা হাত জোড় করে, নিরস্ত করা গিয়েছে। তাঁর সঙ্গে বসেছে, ঝিনি রাধা লিলি। পিছনে বাউলকুলের সঙ্গে আমি। সুজনের কোল চেপে গোপীদাস। রাধার কোলে বিন্দু। গোকুল আমার পাশে, বড় আড়ষ্ট। ওরা আমার আরাম দেখতে গিয়ে নিজেরা নিজেদের কোলে চেপেছে। তার দরকার ছিল না। গাড়ি বেশ বড়। তবুও। বললে বলে, 'আমাদের এরকম অভ্যাস আছে বাবাজী, কিছু ভাববেন না।'

ওদিকে দেখ, একখানি প্রকান্ড চুরুট মুখে দিয়ে শিঙে বাজিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলেন অচিনদা। শহর পেরিয়ে কখন গ্রামের পথে এসে পড়ি। যাত্রা পুবে, একটু উত্তরে পাক দিয়ে। গাড়ির সামনে, চারজনের গায়ে মোহর-রঙ রোদ। রোদের জেল্লা, ধানকাটা মাঠে, তাল শালের পাতায়। মাঝে মাঝে গ্রাম আসে। কখনো যাই গ্রামের ওপর দিয়ে। কখনো গ্রাম পড়ে থকে দূরে, মাঠের ওপারে। ত্বরায় যাই চন্ডীদাসে।

কিন্তু যেমন করে যেতে মন চেয়েছিল, তেমন যাওয়া হয় না। পাখা ঝাড়া দিয়ে, উড়ে যাবো সেই ছিল সাধ। এখন দেখ, ডানায় যেন কিসের এক টান লাগে। মনের ডানা তার নাম। টানের ফেরে, ফিরে ফিরে দেখি, কেবল ঝিনি। ওকে দুষি না। আপন

করম দোষ। ঝিনি যায় আপন ভাগ্যে। আমার যদি ডানায় টান লাগে, সে আমার ভাগ্য। অচিনদা সুদ্ধ নেচে উঠলেন। আর, বোঝাবো কাকে! অতএব, তা-ই চলো।

আমার তো যাত্রা! আমার ফেরা নেই। অচিনদাদের যাত্রা, ফেরার কথা জেনে মেনে। নিজেকে তাই বুঝ-সুঝ করাই, মন ব্যাজারে লাভ নেই। সবুরে ধন মিলবে। না জানি, কিসের সন্ধানে ফিরি। না জানা যে ধনের আশায় পথ চলা, তা মেলে না সবুর বিহনে। এখন তো ভাবি, এ যাত্রাই বা মন্দ কী। এখন তো যেন, এই চলাতেই কী এক সুর বেজে যায়, তাল লেগে যায়। মন ওঠে দোল দুলিয়ে। এমনি করে, সবাই মিলে যাওয়াও এক ভাগ্য। এখন দেখি, পথ চলাতে এটুকুই আনন্দ।

অচিনদার সামনে, গতকাল মুখের কথা খসাতে পারিনি। বলবার আগেই তাঁর ধরতাই, 'শুনেছি, শুনেছি, তুমি নানুর যাচ্ছ কাল। তবে তুমি একলা যাচ্ছ না, আমরাও যাচ্ছি।'

'আমরা' শুনেই হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। প্রশ্নের আগেই, অচিনদা বলেছিলেন, 'আমি যাচ্ছি, আমার সঙ্গে ঝিনি রাধা লিলি। তুমিও আমাদের সঙ্গে।'

আর কিছু কি শুনতে চাও? যাও, ফতোয়া পেয়ে গেছ, এবার গিয়ে তলপি-তলপা বাঁধো। তা না হয় হলো। কিন্তু মতলবটি তৈরি হলো কখন?

বুঝে নাও মনে মনে। এক সময়ে নিশ্চয় তৈরি হয়েছে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, দলের বাকিরা বাদ থাকছেন কেন? ওঁর জবাবও পরিষ্কার। শুভেন্দু তো এমনিতেই বক্রগতি! দল বেঁধে ঘোরাঘুরিতে তার অরুচি। নীরেনদা আর সুপর্ণাদি, এ যাত্রায় নিজেরাই নিজেদের বাতিল করেছেন।

কিন্তু আমার মনে ঠেক ঠেকা। ইতিমধ্যে আমার মতলব যে তৈরি হয়ে গিয়েছিল গোপীদাসের সঙ্গে! রাত পোহালে বোলপুর থেকে প্রথম মোটর-বাস ধরে তাদের সঙ্গী হবো। সে কথা বলতেই, অচিনদার প্রস্তাব, তাদেরও সঙ্গে নেওয়া হবে।

অগত্যা উপায় কী? সেই কথাই শিরোধার্য, রাত্রে একবার যাত্রার আসরে ঝিনি বলেছিল, 'নানুর যাচ্ছি বলে আপত্তি আছে?'

অবাক হয়ে বলেছিলাম, 'আপত্তি থাকবে কেন?'

'একসঙ্গে যাওয়া তো, তা-ই।'

'তাতে কী হয়েছে?'

ঝিনি জবাব না দিয়ে চোখের দিকে তাকিয়েছিল। আমি হেসে চোখ ফেরাবার আগেই, বলে উঠেছিল, 'কিছু না, না?'

সে কথা আর নতুন করে ঝিনিকে কী বোঝাব! যে যার আপন ফেরায় ফেরে। কোনো জবাব দিতে পারিনি। ঝিনি আবার বলেছিল, 'নানুর পর্যন্ত তো? আর তো নয়? সেখান থেকে আমরা ফিরে আসব, আর আপনি—।'

ও কথা শেষ করেনি। চেয়ে দেখেছিলাম ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আসরে তখন লুৎফা বেগমের বিলাপ চলেছে।

এই সেই যাত্রা। এখন আর সে ভাবনা মনে আসে না। এখন, নিখিলের এ আনন্দ-ধারায় ধুইয়ে দাও, মনের কোণের মলিনতা সব দীনতা ধুইয়ে দাও। মন চলো যাই চণ্ডীদাসে। এক কবির ঠাঁই ছেড়ে, আর এক কবির থানে।

ছাতিমতলার গতকালের অনুষ্ঠানে, তার আর এক পরিচয়। গতকাল ছিল, হবিষ্যান্ন গ্রহণের দিন। শান্তিনিকেতনের জ্ঞানী গুণী সংগঠক কর্মচারী, সকল মৃতদের স্মরণে, হবিষ্যান্ন। এমন আর কোথাও দেখিনি। কেবল মনে হয়েছিল, এই তো ভারত। এই তো ভারতরীতি। আত্মীয়-আত্মজনে ছেড়ে যায়, তার স্মরণে হবিষ্যান্ন।

পৃথিবীর এক দেশেতেই এই রীতি। এই রীতিতে তার আত্মপরিচয়।

ব্যক্তির মৃত্যুর বিশেষ দিনের, দিন ক্ষণ নেই। নয়ই পৌষ, সবাইকে স্মরণ। ঘরে ঘরে যদি হবিষ্যান্ন না হয়, চলে এসো শান্তিনিকেতনের পাকশালায়। এ অনুষ্ঠান বহিরাগতদের জন্য না। শান্তিনিকেতনের নিজের সীমায় বাঁধা। আমার আশ্রয়দাতা বন্ধু, সঙ্গী করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

হবিষ্যান্নের আসরে গিয়ে প্রথম মনে পড়েছিল তাঁকে, যাঁর দীক্ষাদিনের স্মৃতি সাতুই পৌষ। দেখ, কঠিন সংসারের এই বাস্তবে বাস করি। তথাপি চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল, এক ধ্যানী প্রসন্ন মুখ। যেন নিবিড় স্নিগ্ধ দুই চোখ মেলে, জীবিতদের দেখেন। যেন আম ছাতিমের পাতায় পাতায়, অজস্র সেই চক্ষু। আমলকির রোদ লাগা ঝিলিকে যেন সেই চোখের হাসি। ঝিরিঝিরি পাতার বাতাসে, ঋষির নিশ্বাস। সকল প্রাচীন প্রবীণ মহীরূহে, তাঁরই দেহের আকার।

এই স্মরণ-ভোজনে, বুক দুলিয়ে, চোখে জল আসেনি। মনে পড়েছিল, আত্মানুসন্ধানের কথা। এক যাত্রীকে দেখতে পেয়েছিলাম, ভারতের প্রান্তে প্রান্তে যিনি ফেরেন, বলেন, 'আমার আঁধার হৃদয় আলো করো।' যিনি ভাষান্তরে ডাক দিয়ে ওঠেন, 'অ যাঁ ন শুদ, কে চেরা আমদম, কুজা বুদম; দর্দ ও দরেল্, কে গা ফিল্ জে কারে খে শতনম।...প্রকাশ হলো না যে, কোথায় ছিলেম, এখানে কেন এলেম; দুঃখ ও পরিতাপ যে, আপনার কাজ আপনিই ভুলে রয়েছি।' যাঁর চোখে ধারা বিগলিত বুকের মধ্যে আতুর ধ্বনি, 'কতদিন, আর কতদিন, আমি সেই দিনের নিমিত্ত অপেক্ষা করিব, যে দিন তোমার সম্মুখে আমি পরিপূর্ণ আনন্দময় হইব...।'

ভারতের পথে পথে, পাহাড়ে কন্দরে নদীতে, লোকালয়ে মন্দিরে মন্দিরে, যিনি পরিপূর্ণ আনন্দময় হয়ে এসে বসেছিলেন এই রাঢ়ের ছাতিমতলায়। তখন আপন মন্দিরে ভরা। জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তির কাটাকাটিতে কেবল রক্তই ঝরেছে। তারপর সেই রক্তে ফুটেছিল এক ফুল, নাম তার প্রেম। 'জিন প্রেম রস চাখা নহী, অমৃতরস পিয়া তো ক্যা হুয়া?'...আর সেই জন্যেই 'মতলুব হাসিল ন হুয়া, রো রো মুয়া তো ক্যা হুয়া? ছাতিমতলায় এসে, সেই ডাক শেষ হয়েছিল,

য়া রব, আঁ শমে শব-অফরোজ
জে কাশানা-এ-কীস্ত?
জানে-মা সোখৎ, বে-পুসীদ্
কে জানানা-এ-কীস্ত?

'যে দীপ রাত্রিকে দিন করে, সে দীপ কার ঘরে? আমার তো প্রাণ দগ্ধ হলো, জিজ্ঞেস করি, তা প্রিয় হলো কার?'...তারপরে। রাঢ়ের এই লাল মৃত্তিকার নিবিড় সবুজের ছায়ায়, পাখি ডাকার সুরে উচ্চারিত হয়েছিল,

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

গতকাল হবিষ্যান্নে বসে সেই সন্ধানীর কথা মনে পড়েছিল। মহর্ষিকে যেন, কী এক অলক্ষ্যের লক্ষ্যে, স্পর্শহীনের স্পর্শে, অনুভব করেছিলাম।

জীবন মন কী বিচিত্র দেখ। মহর্ষির সঙ্গে তাঁর পুত্রের স্মৃতি না কেবল, আপন মৃত আত্মজনদের কথাও মনে পড়েছিল। যেন, মৃত আপন জন্মদাতার উপস্থিতি আমার হবিষ্যান্নকে এক অমৃতের স্বাদ দিয়েছিল।

তখন মনে হয়েছিল, স্থানের সীমায় না হে, অসীম বিশ্বের সকল মৃত আত্মার স্মরণে এই হবিষ্যান্ন গ্রহণ করি। মহাম্যানবের সাগরতীরে বসে এই আর এক ভারত-প্রাণ প্রকাশ।

গতকালের শেষ অনুষ্ঠান ছিল আমার, বাঙলার মসনদ যাত্রা। ছাতিমতলার পথে আমার সহযাত্রী লোকো শেডের 'কিলিনার' অতুলের গুণ রসের আস্বাদন।

সন্ধ্যাবেলা, বাউল আসর থেকে বিদায় নেবার কালে জিজ্ঞাসা শুধু একজনের চোখেই ছিল। ঝিনি জিজ্ঞেস করেছিল, 'রাত্রে কী করবেন?'

যাত্রার কথাটা বলতে চাইনি। হাসি ঠাট্টার ভয় ছিল। তারপরে অচিনদার সামনে সাহসও ঠিক পাচ্ছিলাম না। হয়তো এক কথাতেই নাকচ করে দেবেন। আইন-কানুনের নিষেধ না। ইচ্ছা করলে অচিনদাকেও তুমি নাকচ করতে পারো। কিন্তু অচিনদা প্রেমে বাজেন। জেনেশুনে তাঁকে নাকচ করি, মন তেমন শুকনো খাতে বহে না। তাই বলেছিলাম, 'কাল সকালেই বেরোতে হবে কিনা। তাই ভাবছি আর বেরোব না।'

অচিনদা হুমকে উঠেছিলেন, 'কাল সকালে কোথায়?'

কথাটা যে জেনেশুনেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, পরের কথাতেই তা বোঝা গিয়েছিল। তখনই তাঁর আপন মতলব ঘোষণা করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে পরেও কথা শেষ হয়নি। বলেছিলেন, 'কাল সকালে বেরোতে হবে বলে এই সন্ধ্যেবেলাতেই ঘরে গিয়ে ঢুকতে হবে কেন। চলো, এখন সবাই মিলে দক্ষিণপল্লীতে যাই।'

বলে লোমশ ভুরুর তলায় একবার ঝটিতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন ঝিনির দিকে। রাধা আওয়াজ দিয়ে উঠেছিল, 'সেই ভালো।'

কিন্তু আমার ভালো না। আমার ভাবনা, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে যাত্রার আসরের সামনে গিয়ে বসতে হবে। বলেছিলাম, 'না, মানে আসলে—।'

অচিনদার সেই এক ধমক, 'অনেক আসল-নকল তো চেনালে। একবার ঝেড়ে কাশো দেখি। এই রাত করে কোপাই-খোপাইয়ের ধারে যাবে নাকি?'

জবাব দেবার আগে অবাক হয়ে দেখেছিলাম, ঝিনির চোখে যেন আলোর ঝিলিক খেলে যায়। চকিত উত্তেজনা আর কৌতূহলে মুখের রঙ বদলে গিয়েছিল। কোপাইয়ের ধারে যাবার কথা শুনে ওর মন নেচে উঠেছিল।

আমিই ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিলাম, 'না, না, সেখানে যাবো না।'

'তবে কোথায়?'

দারোগার জেরা চোরকে। অতএব স্বীকারোক্তি, 'আজ একটু যাত্রা দেখব ভাবছিলাম।'

লিলি একেবারে ছোট মেয়ের মতো হাততালি দিয়ে উঠেছিল, 'ইস, কী মজা! আমরাও যাবো।' রাধারও তা-ই। ঝিনির চোখ একবার অবাকে ঝলকেছিল। তারপরে ওর চোখেও নতুন কৌতূহল আর উত্তেজনার রঙ লেগেছিল।

অচিনদা হতাশায় মাথা নেড়েছিলেন। আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এটা একেবারেই বাউন্ডুলে। শান্তিনিকেতনে এসেও যাত্রা দেখতে চায়। তাও যদি কোনো ভালো দলের যাত্রা হতো।'

বলেছিলাম, 'না, সেজন্যে নয়, একটা—।'

অচিনদা বলে উঠেছিলেন, 'নতুনত্বের স্বাদ, কেমন? যার অর্থ সেখান থেকে যতটুকু রস পাওয়া যায়, সবটুকু একেবারে শুষে নিয়ে যাবে।'

ঝিনি চোখের কোণে চেয়েছিল। ঠোঁটের কোণে হাসি টিপে রেখেছিল।

অচিনদা আবার বলেছিলেন, 'তবে, এ যাত্রা কি ভালো লাগবে। শুনেছি, বোলপুরেরই কারা নাকি করবে।'

আমি বলেছিলাম, 'সেজন্যেও নয়। আজকের পালায় যে সিরাজ সাজবে, তাকে কথা দিয়েছি কিনা।'

অচিনদা যেন একেবারে বাক্‌রহিত হয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় অবাক রাগে আমার

দিকে তাকিয়েছিলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপরে তিন সখীর দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'শুনেছ? উনি সিরাজকে কথা দিয়ে বসে আছেন। কে সিরাজ, কোথায় আলাপ হলো এর মধ্যেই, আমরা তার কিছুই জানিনে। উনি দিব্যি সব ঠিক করে রেখেছেন।'

ওরা তিন সখীতে হেসে উঠেছিল। ওরকম করে বললে কিছু বলা যায় না। অচিনদা আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কি মন্ত্র জানো?'

বলেছিলাম, 'না, আসবার সময় ট্রেনে আলাপ হয়েছিল। যে সিরাজ করবে, সে অণ্ডালে চাকরি করে। একসঙ্গেই এসেছি, তাইতেই জানাশোনা।'

অচিনদা আবার ওদের দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'বোঝো এবার।'

ঝিনি ঝটিতি একবার আমার দিকে চেয়ে অচিনদাকে বলেছিল, 'যাত্রার ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের কাছে চেপে যাওয়া হয়েছিল।'

অচিনদা তৎক্ষণাৎ বেজে উঠেছিলেন, 'চাপবেই তো ভাই। মজা যা লোটবার তা উনি একলাই লুটবেন। আমরা কে?'

বলেছিলাম, 'তার জন্যে নয়। আপনাদের ভালো লাগবে কিনা, জানি না তো, তাই।'

রাধা বলে উঠেছিল, 'না হয় মশাই একবার বলেই দেখতেন। চেপে যাচ্ছিলেন কেন?'

বটেই তো। মনে মনে বলেছিলাম, 'ঘাট হয়েছে।'

অচিনদা বলেছিলেন, 'সিরাজদ্দৌলার নেমন্তন্ন যখন, তখন তো যেতেই হবে। আমরা সবাই ওর পিছু পিছু গিয়ে বসব। এবার তাহলে সবাই তৈরি হয়ে আসা যাক।'

যাত্রার আসর নিয়ে মনের মধ্যে চিরদিনের এক সংশয় ভয়। দেখেছিলাম, এ বয়সেও সেটা যায়নি। ভয় ছিল, ঠিক জায়গায় গিয়ে বসতে পারব তো? তাই কোনো-রকমে খাওয়া সেরে অনেক আগেই চলে গিয়েছিলাম। বাউল আসরের অদূরেই যাত্রার আসর বসেছিল। কিন্তু গিয়েই চমকে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখেছিলাম, আমার রেলগাড়ির সহযাত্রী অতুল দাস, বাঙলার মসনদের সিরাজ, স্বয়ং আসরে শতরঞ্জি পাতছে। তার সঙ্গে আরো কয়েকজন।

দেখেই মনে হয়েছিল, ঝাঁকড়াচুলো অত বড় মাথাটা বোধ হয় ক্ষারে কাচা হয়েছে। চুলের ভারেই মুখখানি শীর্ণ। চোখের কোল বসা। পরনে একটা লুঙ্গি, গায়ে একটা ময়লা সুতির চাদর। একটু পরেই যে লোক কিনা বাঙলার মসনদে নবাব হয়ে বসবে।

মনে মনে হাসতে গিয়েও ঠেক খেয়েছিলাম। শিল্পীকে এ দু'দিন অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে নিশ্চয়। তারপরে ঘরেতে দানাপানির কি হাল, কে জানে। চেহারাকে দোষ দিতে পারিনি। অতুলদাস শিল্পীকে দেখে কেমন একটা মন-টাটানো মুগ্ধ বোধে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম।

ইতিমধ্যে ভিড় জমতে শুরু করেছিল। সেই আসরে চোখে পড়ার মতো দেখেছিলাম স্থানীয় বাসিন্দাদের, নরনারীর আগমন। গিন্নীর কোলে কাঁখে ছেলে, তবু ঘোমটা সরে না। কর্তা বিড়ি কামড়ে ধরে আগেই এক হাতের হ্যারিকেনটি নিবিয়ে দিয়েছিল। আর এক হাতের চটের থলিটা কোথায় পেতে বসা যায়, নজরে সেই ঘোঁতঘাতের লক্ষণ। সকলের জন্য তো আর শতরঞ্জির আসন না। পালার আসরের জন্য আর বাদকদের জন্যে শতরঞ্জি। বাদ বাকি সব বসে যাও ভায়া দাওয়া জুড়ে।

তার মধ্যেই চোখ পড়েছিল রঙীন সুতোর ফুলতোলা সুতোর চাদর জড়ানো একটি রোগা রোগা বউ, এক পাশে দাঁড়িয়ে। তার কোলে এক শিশু। আর এক শিশু তার কোমর জড়িয়ে ধরে পা দাপাচ্ছে। চিৎকার করে ডাক দিচ্ছে, 'অই বাবা, বাবা গ!'

বাবা যে কে, তা বুঝতে পারিনি। কেউ জবাব দিচ্ছিল না। তারপরে একবার স্বয়ং

সিরাজ হুমকে উঠেছিল, 'দুত্তোরি তোর বাপের নিকুচি করেছে। বইলছি যে, দাঁড়া, সব পাতা-টাতা হক, তা পরে বইসবি। তা লয়, খালি বাবা বাবা।'

বটে, স্বয়ং সিরাজেরই ছেলে! অই হে, উনি কি তবে সিরাজপত্নী নাকি? দেখেছিলাম, বউটি তখন ছেলের হাত ধরে চোখ পাকিয়েছিল। রোগা-রোগা মুখখানি, তাতে একটু হিমানী পাউডারের স্পষ্ট ছোপ। কপালে সিঁদুর, ঠোঁটে পানের দাগ। সধবার যেমন বেশবাস হয়। সেই তো কথা, তোমরা সবাই শিল্পীকে দেখবে। ঘরের মানুষ দেখবে না? তোমরা তো নগদ হাততালি বা দুয়ো দিয়ে যাবে। তারপরেও কোনো এক নির্জন নিশীথে ঘরের কোণে বসে এক দম্পতি কথা বলবে। পুরনো দিনের কথা। তখনো এই রাত্রের স্মৃতি হয়তো কথা হয়ে বাজবে, 'অই গ, তোমার মনে আছে, সেই একবার মেলাতে সিরাজ সেইজ্জেছিলাম!'

'এই যে বড়দা।'

মোটা কিন্তু মিহি ভরাট গলা বেজে উঠেছিল একেবারে কানের কাছে। এক মুহূর্তের আন্ চিন্তায় লক্ষ্য করিনি, অতুলদাস কখন আমাকে দেখতে পেয়েছে। চিনতে পেরেছে। তবে নতুন সম্বোধন কি না। তা-ই চমক। আজ পর্যন্ত কারুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হবার সৌভাগ্য হয়নি। অতুলদাসও এর আগে বড়দা বলে ডেকেছিল কি না, মনে করতে পারিনি।

কথা বলতে এক পলকের দেরি। তার মধ্যেই আবার বেজে উঠেছিল, 'সেই গাড়ির দাদা তো?'

মোট কথা, যে কোনো একটা দাদা হতেই হবে। বলেছিলাম, 'এই যে।'

তৎক্ষণাৎ হাত ধরে বলেছিল, 'মনে আছে তবে? আসেন আসেন, বসেন। দ্যাখেন না, কারুর পাত্তা নাই। ইদিকে সময় হয়ে এল।'

বলে হাত ধরে টেনেই নিয়ে গিয়েছিল। আসরের সীমা বরাবর, শতরঞ্জি দেখিয়ে বলেছিল, 'এখানে বসেন।'

বলেই সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে এক ধমক, 'অ্যাই দ্যাখ, কোথায় বইসতে আইসল। আয়, এই এখানে বস। এইস, তুমিও এইস, বস।'

আমার থেকে হাত দুয়েক পিছনে শতরঞ্জির ওপরেই স্ত্রী-পুত্রকে জায়গা নির্দেশ করেছিল। নির্দেশ মাত্র স্ত্রী সেখানে গিয়ে বসেছিল। কোলেরটিকে বাগিয়ে ধরেছিল। বড়টির বোধহয় মনঃপুত হয়নি। মায়ের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল গোমড়া মুখে। কিন্তু সেদিকে তখন অতুলদাসের নজর দিতে গেলে চলছিল না। আমার সামনে এসে ঠোঁট টিপে একটু হেসেছিল। তার মধ্যে লজ্জা গাম্ভীর্য, সবই ছিল। জানিয়ে দিয়েছিল, 'মানে পরিবার।'

তা বুঝেছিলাম, পরিবার মানে গিন্নি। আর একবার তাকিয়ে দেখেছিলাম সিরাজ-পত্নীকে। বেচারি আন্ পুরুষের চোখ পড়তে লজ্জায় পড়ে, একটু ঘোমটা টেনেছিল। আমি আমতা আমতা করে বলেছিলাম, 'আমার সঙ্গে আরো দু' চারজন আছে। এখানে বসলে অসুবিধা হবে না তো।'

'কিছু না। আমি বলছি, আপনি বসেন। যারা আসবেন, তারাও বসবেন। একটা হারমনিয়া, পাখোয়াজ, ডুগি-তবলা, ফ্লুট, পাইপ বাঁশী আর ব্যায়লা, পাঁচটা লোক। খুব হয়ে যাবে, বসেন।'

সম্ভবত স্বয়ং সিরাজের খাতিরেই কেউ কেউ অধমকে তাকিয়ে দেখেছিল। আর বাদকদের পুরো হিসেবের পরে সে যখন আমাকে বসতে বলেছিল, তার ওপরে কথা থাকতে পারে না। অনেকের যে চক্ষুশূল হয়নি তা নয়। যাত্রার আসরে অমন জায়গায় বসবার সৌভাগ্য ক'জনার হয়!

কিন্তু অতুলদাসের দাঁড়াবার ফুরসত কোথা হে। এদিক থেকে কারা ডাকে। ওদিক থেকে সাজঘরের ডাক। অতএব ব্যস্ততার মধ্যেও একটি বিনীত হাসি ফুটেছিল, চোখের কোলে, গালের ভাঁজে ভাঁজে।

'হেঁহেঁহেঁ, দেখেছেন তো, কোন্ দিকে যাই। ইদিকে সময় হয়ে এল। পালা যা হবে তা বুঝতেই পারছি, ক্ষমা ঘেন্না করে নেবেন। এখন তাহলে চলি।'

আমিই তখন বিব্রত, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি যান।'

ঠিক যেন কুর্নিশের ভঙ্গিতে একটা হাত উঠেছিল কপালে। কোমরে একটা ঢেউ। প্রায় নাটকীয় প্রস্থানের মতো দাওয়ার নিচে চলে গিয়েছিল। নিচেই এক কোণে চট ঘিরে সাজঘর। সেখানেই চটের আড়ালে অন্তর্ধান। তারপরে বাদকেরা বাদ্য নিয়ে এসে বসেছিলেন। জনসমাগম হতেও দেরী হয়নি। অচিনদা এসেছিলেন তাঁর বাহিনী নিয়ে। যে বাহিনীতে ঝিনি রাধা লিলি ছাড়াও, নীরেনদা আর সুপর্ণাদি ছিলেন। যাকে বলে, আসর জমানো লোক, অচিনদা তা-ই। তিনি এসে বসতে না বসতেই আমার দিকে আর কেউ ফিরে চায়নি। এমন কি বাদকেরাও সমীহ করে তাকিয়ে ছিল। সরে বসে জায়গা দিতে গিয়ে দেখেছিলাম, ঝিনি পাশে এসে বসেছিল। পর পর তিন সখী।

প্রথম বাজনা বেজে উঠতেই, সেই ছেলেবেলার ধকধকে উত্তেজনায় থরথরিয়ে উঠেছিলাম। সে বাজনা কেবল শ্রবণে মনে বাজেনি। রক্তে বেজেছিল। তিন ঘন্টির পর, প্রথম আবির্ভাবেই নর্তকী। ধিন ধিন করে, কোমর বাঁকিয়ে নেচে নেচে গান করেছিল। গানটা যেন শোনা শোনা। মনে হয়েছিল, শহরের পাড়ায় পাড়ায়, কলের গানে শুনেছি! তারপরেই সিরাজদ্দৌলার আবির্ভাব। আমার চেনা মানুষ, অতুলদাস। তবে ওসব চেনাশোনা ছাড়ো। সামনে তখন নবাব সিরাজদ্দৌলা। টকটকে রঙ করা মুখ, লাল গাল, লাল ঠোঁট, কাজল টানা চোখ। বাঁকা সিঁথির ঝাঁকড়া চুল তখন আর ক্ষারে কাচা কাকের বাসা না। রীতিমতো পাট করা। গোঁফের ঠাট দেখে মনে হয়েছিল, তার চেয়ে নবাবী কিছু হয় না। সেই সঙ্গে ন্যাপথলিনের গন্ধে আসর ভরে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই পোশাক থেকে আসছিল। যাকে বলে, খাঁটি নবাবী পোশাক। কী তার জেল্লা ঝলক!

আসরে প্রবেশ মাত্রই সে আমার দিকে তাকিয়েছিল। ভেবেছিলাম, তখুনি চোখ ফিরিয়ে নেবে। কিন্তু তা-ই যদি বুঝে থাকো, তাহলে ভুল। সে আমার দিকে ঠায় তাকিয়ে বলে যাচ্ছিল, 'মাতামহ আমাকে এত্তেলা দিয়েছেন। জানি না, নবাব আলীবর্দী এখনো হয়তো ভাবছেন, আমাকে মসনদে বসালে আমি তা রক্ষা করতে পারব কী না। কিংবা আরো কোনো গূঢ় চক্রান্ত এর মধ্যে থাকতে পারে। এই প্রাসাদের প্রতি কক্ষে কক্ষে এখন ষড়যন্ত্র চলেছে, লক্ষ্য সেই মসনদ, বাঙলা বিহার ওড়িশ্যার মসনদ...।'

কিন্তু কী বিপদ, আমি অস্বস্তিতে মরছিলাম। আমার দিকে তাকিয়ে কেন। যতবারই চোখ ফিরিয়ে চোখ তুলতে যাচ্ছিলাম, ততবারই সেই চোখাচোখি। নবাবের স্বগতোক্তি করার লক্ষ্য কি আর কেউ হতে পারত না। তখন আমার আরো লজ্জা, নবাবের ঠায় তাকানো দেখে, ঝিনি লিলিরাও আমার দিকে তাকাচ্ছিল। এমন কি, অন্য দর্শকেরাও। অন্যদিকে চোখ ফিরিয়েও স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। উঠে যাবো কি না ভাবতে ভাবতেই আলীবর্দীর আবির্ভাব হয়েছিল। তবে রেহাই। তার আগেই অচিনদার নিচু স্বরের মন্তব্য, 'লেখকের দিকে চেয়ে সিরাজ বোধহয় প্রেরণা সংগ্রহ করছে।'

ফলে রাধা বেজে উঠেছিল খিলখিল করে। ওরকম একটা গম্ভীর পরিবেশ প্রায় মাটি হবার যোগাড় হয়েছিল। আর লজ্জা অস্বস্তিতে মরেছিলাম আমি। তবে পালা জমাতে দেরী হয়নি। আর কসম খেয়ে যদি বলো, তাহলে বলতে হবে, অতুলদাস একাই একশো। তার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারেনি। হাততালি যত সব তার কপালেই। হোঁতকা মোটা মীরজাফর কিংবা ক্লাইভ সাহেব বা গজচোখো লুৎফা, কেউ সিরাজের

মতো না। তবে যদি কথাবাত্তার একটু-আধটু ভুল ভেরান্তি পেয়ে থাকো, সেটা নিজ গুণে ক্ষমা করে নিও। কিন্তু লোকোশেডের কিলিনারকে সে একবারও মনে করতে দেয়নি। অচিনদার মতো লোকও মাঝে মাঝে বাহবা দিয়ে উঠছিলেন। আর সিরাজের পরাজয়ের পরে লুৎফাকে নিয়ে চলে যাবার সময়ে পিছন ফিরে দেখেছিলাম অতুল-গিন্নিকে। দেখেছিলাম, ঘোমটা টেনে দেবার কথা তার মনে নেই। গায়ের চাদর খুলে গিয়ে রোগা শরীরটা দেখা যাচ্ছিল। দুই ছেলেই কোলের কাছে ঘুমে অচেতন। তাদের দু'জনের গায়ে মায়ের দু' হাত। চোখের ধারায় জল গলছিল গাল বেয়ে। নবাবের দুঃখে না স্বামীর কষ্টে, কে জানে। সে যেন আর এক লুৎফা। তারপরে সিরাজের হত্যার দৃশ্যের তো কথাই নেই। অতুল-গিন্নি তখন আঁচলে মুখ ঢেকে বসেছিল। এত বড় অকল্যাণ সে চেয়ে দেখবে কেমন করে।

ভারি একটা খুশির মধ্যেও মন টাটিয়ে উঠেছিল। কেন কে জানে। সিরাজের মরণে কি অতুল কিলিনারের আর্তনাদ শোনা গিয়েছিল, 'আর না, আর মেরো না, খোদার দোহাই, মহম্মদী বেগ, আমাকে আর আঘাত করো না...!' তখন মনে হয়েছিল, সত্যি সিরাজের মৃত্যু দেখছি। অতুলদাস খাঁটি শিল্পী।

পালার শেষে তার সঙ্গে একবার দেখা না করে ফিরতে পারিনি। যদি মেডেল দিতে পারতাম, ভাল হতো। উপায় ছিল না। আড়ালে ডেকে, সংকোচে লজ্জায় একটা দশ টাকার নোট দিয়েছিলাম হাতে। সে কি হাত টানাটানি। ভালো লেগেছে, সেই যথেষ্ট। তবে একটা মেডেল পেলে, ঘরে রেখে দিতে পারত। চোখে পড়লে, দাদার কথা মনে পড়ে যেত। বলেছিলাম, 'তার যখন উপায় নেই, আপনি একটু মিষ্টি কিনে খেলে খুশি হবো।'

তখন দশ টাকার নোটটা ভাঁজে ভাঁজে একটুখানি করে পকেটে রেখেছিল। বলেছিল, 'ভাগ্যে এই লোকের দেখা পেয়েছিলাম। তবে কেবল মিষ্টি খাবো না, ভাত তরকারি সব খাবো।'

বলে, মুখের অজস্র ভাঁজে হেসেছিল।

পথ চলি, খুঁজে ফেরার তত্ত্ব নাম কিছুই জানি না। কিছু পাই, যে-পাওয়ানা কখনো খুশিতে ভরা। কখনো অবাকে ঝলকানো। কখনো চোখের জলে ভেজানো। কখনো কষ্টে টনটনানো। কখনো বিষাদের নিশ্বাসে ভরা। কখনো বা এই সব দিয়ে মাখামাখি। তারই এক পাওয়ানা অতুলদাস। ঝোলায় ভরে এই পাওয়ানা নিয়ে যাই। এখন তার শেষ কথা কয়টি কেবল মনে পড়ে, 'আর কি কখনো এই মানুষের দেখা পাবো।'

আমারাও তো সেই কথা। আর কি কখনো এই মানষের দেখা পাবো। আমার যে সেই গানের মতন লাগে, 'এই মানুষে, সেই মানুষ আছে, যেথায় গোঁসাই বিরাজে।'...

হাসিতে চমক লাগে। সবাই প্রায় একসঙ্গেই হাসে। তার মধ্যে গোপীদাস বেশী বাজে। ফিরে তাকাতে বলে, 'সত্যি নাকি চিতে বাবাজী, ধ্যানেতে আছেন?'

সামনের আসন থেকে ওরা তিন সখীতে ফিরে ফিরে চায়। আমি অবাক হয়ে বলি, 'কিসের ধ্যান?'

গোপীদাস বলে, 'তা যদি বুইঝতে পারব, তবে আর ভাবনা কী ছিল। দেখছি কি না, চিতে বাবাজীর কথাবাত্তা নাই। এক মনে চুপচাপ।'

বলি, 'ভাবছিলাম।'

অচিনদা গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন, 'কী ভাবছিল সে কথা আর জিজ্ঞেস করো না।'

এ কথা শুনেও সবার হাসি। গোকুলদাস তার ডুপ্‌কির বুকে এক আঙুলেই

বোতলের ছিপি খোলার মতন শব্দ করতে থাকে। তার মধ্যেও তাল আছে। তবে পাপের মন বলে কি না জানি না, সুজন বিন্দুর চোখাচোখি মিটিমিটি হাসিতে যেন কেমন এক রঙের খেলা। ওরা যেন, দুয়েতে অন্য কোথাও আলাদা। এটা ওদের কী খেলা, কে জানে। গোকুলদাস বা এমন নিস্পৃহ কেন। না হয় তারা স্বামী-স্ত্রী না। দু'জন, দু'জনের পুরুষ প্রকৃতি তো। এই উদাসী উদার মনের তল বিথার কে জানে!

গোপীদাস বলে, 'তবে নানুর বুল্যে কথা, গুরুর তীথে যাওয়া। তায় আবার আমাদিগের চিতে বাবাজী নেকেন পড়েন। ওঁয়ার তো ধ্যান হবেই।'

সে ধ্যানে ছিলাম না। কিন্তু বলা বৃথা। রাধা বৃথা আওয়াজ করে, 'জয়গুরু।'

গোপীদাস গুনগুনায়, 'বাউলের গুরু চন্ডীদাস, আমি তাঁর দাসানুদাস।'

এবার গোকুল আওয়াজ করে, 'জয়গুরু।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'চন্ডীদাস কি বাউলদের গুরু নাকি?'

গোপীদাসের দাড়ির ভাঁজে, চোখ ভরে, যেন এক মুগ্ধ রহস্যের হাসির ঝলক। কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, 'যেমন তেমন গুরু লয় বাবাজী, পরম গুরু। সহজের পাঁচ রসিক। রসিক সবাই হয় না। বাউল কয়, ভবেতে আছেন পাঁচ রসিক, বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি আর শ্যাখর রায়।'

বলে, আর প্রতি নামে নামে, বারে বারে কপালে হাত ছোঁয়ায়। কেবল যে, সে-ই ছোঁয়ায়, তা না। রাধা বৃন্ধা, গোকুল বিন্দু সুজন, সবাই কপালে হাত ছোঁয়ায়। সকলেই একবার উচ্চারণ করে, 'জয়গুরু।'

ভক্তি কাকে বলে, জানি না। এদের সকলের মুখ দেখে মনে হয়, কী এক ভাবের খেলায় টলটলানো। যেন স্থান কালের দিশায় নেই। এমন যে একটা বিলিতি গাড়ির খোলে বসে যায়, তাও যেন মনে নেই। বাউল-বৈষ্ণবের তফাত কোথায় কতখানি জানি না। তফাত আছে শুনেছি। কিন্তু গোপীদাস পরম গুরু রসিক বলে যাঁদের নাম করে, তাঁরা সবাই কৃষ্ণপ্রেমিক শুনি। রাধা কৃষ্ণ নামের কবি। বাউল ঘরানায় তাঁদের মেলবন্ধন কোথায় জানি না। গোপীদাসের শ্যাখর রায় বোধহয় বৈষ্ণব পদকর্তা রায় শেখর। সকলেরই তো গাঁথা কথা এক। বাউল যেমন রহস্যে ভাসে, মনের মানুষ ডেকে বেড়ায়, এ'দের গানে তা শুনি না।

না শুনি, না-ই শুনি। আমি কেন ফাঁপরে পড়ি। কার সাধনের কোথায় কী মেলবন্ধন, তা জেনে আমার লাভ কী। তার চেয়ে শুনে যাই।

গোপীদাস তখন আমার দিকে চেয়ে, ঘাড় নেড়ে, ঘড়ঘড়ে গলায় সুর দিয়ে বলে,

'অই রে ভজা, ভজবি যদি,
ভজ্গা রসিকে।
রসিক থাকে রসের ঘরে
অলখে ঝলকে।'

বলে, বিট্লে ছোঁড়ার মতো, গোপীদাস চোখ পিটপিট করে। দাড়ির ভাঁজে হাসে। আবার বারেক চোখ ফিরিয়ে সকলের দিকে চায়। ঝিনির দিকে চোখ পড়তে, ইশারায় আমাকে দেখায়। ঝিনির দৃষ্টি চকিতে একবার আমার দিকে ঘুরে যায়। মুখে রঙের ছোপ লাগে। কিন্তু আসনের পিঠে ঝুঁকে পড়ে, গোপীদাসের দিকেই চেয়ে থাকে। ওর সখীরাও তা-ই।

ওদিক থেকে অচিনদা বলে ওঠেন,

'বিজোড়ে নাই, জোড়ে রসিক
রসের আস্বাদ করে

রাধা বিনে কৃষ্ণ নাই
অধরা ধরে।'

'অই শুন, অই শুন।'

গোপীদাস আমার দিকে চেয়ে, আঙুল দিয়ে অচিনদাকে দেখায়। খকর খকর কেশে, আবার তেমনি চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, ঘড়ঘড়ে গলায় সুর দিয়ে গায়,

'বিল্বমঙ্গলের রসের চিনি
দেয় চিন্তামণি
চন্ডীদাসের রসের ধ্যানে
রামী রজকিনী।'

অচিনদাসহ, বাউলজনেরা সবাই যখন 'জয়গুরু' বলে আওয়াজ তোলে, গোপীদাস তখনো গায়,

'জয়দেবে দেয় রসের সিন্ধু
পরকিতি পদ্মাবতী
লছিমা দেয় রসের সন্ধান
জানেন বিদ্যাপতি।'

আবার যখন জয়গুরু আওয়াজ ওঠে, তার মধ্যেই অচিনদা বেজে ওঠেন, 'আর রাধা দেয় রসের সন্ধান, পায় গোপীদাস।'

যেমনি বলা, অমনি শুনি, গোপীদাস হেঁকে ওঠে, 'মরে যাই হে, মরে যাই।'

বলতে বলতেই তার শরীর যেন কেঁপে ওঠে, সুজনের কোলের ওপর থেকে, সহসা ঝুঁকে পড়ে একেবারে রাধা বৃদ্ধার পায়ে ধরে। সেই হাত কপালে ছোঁয়ায়। জিভ বের করে জিভে ছোঁয়ায়। তার চোখমুখ আরক্ত হয়। চোখ ছলছলিয়ে ওঠে।

রাধা বৃদ্ধারও সেই দশা। দেখি, তারও চোখ ভেসে যায়। কথা বলতে পারে না, ফাটা ফাটা শীতার্ত ঠোঁট কাঁপে থরথরিয়ে। সে তাড়াহুড়ো করে না। ধীরে সুস্থে, নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে গোপীদাসের পায়ে ছোঁয়। জিভে মাথায় ঠেকায়।

পরমুহূর্তেই দেখি, গোকুল বিন্দুর পায়ে হাত দেয়। ওদিক থেকে, সুজনের হাতও বিন্দুর পায়ে স্পর্শ করে। গোকুল সুজন নিজেদের দিকে চেয়ে, যেন সম্মোহিতের মতো হাসে। বিন্দু তাড়াতাড়ি দুজনের দুই হাত তুলে নিজের কপালে ছোঁয়ায়। ওদের হাতে নিজের পায়ের ধুলা সে নিজের জিভেই ছোঁয়ায়। তার চোখ বুজে যায়। চোখের কোণে জল চিকচিক করে।

গোপীদাস নিচু স্বরে উচ্চারণ করতে থাকে, 'কিরপা কর হে গুরু। তুমি বাপ মা, তুমি স্বামী, তুমি পত্নী। তুমি পুরুষ, তুমি পরকিতি...।'

তার দুই হাত বুকের কাছে। সে যেন মন্ত্র ভাষে। কেউ কোনো কথা বলে না। সকলেই চুপচাপ। অচিনদা সামনের দিকে অপলক চেয়ে, চালিয়ে চলেন। তাঁর মুখের ভাব দেখতে পাই না। ঝিনির চোখও বুঝি ভেসে যাবে, এই সন্দেহ লাগে। তার চেয়ে বেশী, ওর চোখ মুখ যেন মুগ্ধ বিস্ময়ে আচ্ছন্ন। রাধা আর লিলি বিস্ময় কৌতূহলে সকলের মুখের দিকেই চায়।

আমার মনের সুর কাটে না। নতুন সুরে বাজে। নাম-না-জানা সেই সুরে, কেমন এক আলো-কালোর ধন্দ দোলে। যা ঘটে যায়, তার অর্থ বুঝি না। কিন্তু এমনি করে পায়ের ধুলা কাড়াকাড়ি, চোখের জলে ভাসাভাসি, তারপরে নীরব নিশ্চুপ সব মিলিয়ে কোথায় কিসের তরঙ্গ বহে যায়। ভিন্ন দুনিয়ার মানুষ আমি, ভিন্ ভাবেতে থাকি। এই মানুষদের বুঝি না। এদের ভজন পূজন রীতি প্রকরণ, কিছুই জানি না। তবু দেখ, এরা কেবল যে বিশ্বাসেই আছে তা না। যেন মন ভরে এক কিসের তরঙ্গ। সেই

তরঙ্গে ভাসে। এরা পরস্পরের পায়ে ধরে, পরস্পরের জিভে ঠেকায়। তারপরে চোখের জলে হাসে। বুঝি না বুঝি, মানি না মানি, মিথ্যার ঘরে এমন ভাবের খেলা খেলে না। এ সত্যের স্বরূপ কী, কে জানে।

হঠাৎ স্পর্শে চমক লাগে। দেখি গোপীদাস হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধ ছোঁয়। বলে, 'বাবাজী, কিছু বুইঝতে পারলেন গ?'

ঘাড় নেড়ে বলি, 'না।'

বুড়া কেশো গলায় হাসে। বলে, 'অই, বুইঝবেন কেমন করে। চিতে বাবাজী কি গুরু ধইরেছেন?'

অবাক হয়ে বলি, 'গুরু?'

'হাঁ, গুরু। গুরু তো বাবাজী অনেক। ইথে গুরু, বিথে গুরু, প্রাণের গুরু অন্যথায়। আসল গুরু পেতে হলে আগে গুরু ধরতে হয়, বুইঝলেন না?'

দেখি আবার তার চোখে সেই রহস্যের হাসি। ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে কথা বলে। বুঝতে পারি না, তা-ই চেয়ে থাকি চুপ করে। আর গোপীদাস যেন কোনো এক জগৎ থেকে ভিন্ সুরে বাজে, 'বাবাজী, পদ্মাবতীর চরণে বইস্যে, জয়দেব ছিচরণ চারণ চক্কোত্তি। রজকিনির পাটে বইস্যে, চণ্ডীদাসে ভজেন, "তুমি রজকিনি, আমার রমণী, তুমি হও মাত্‌রি পিত্‌রি। তিসন্ধে যাজন, তোমারি ভজন, তুমি বেদমাতা গায়ত্তিরি।" বুইঝলেন ক্যানে বাবাজী, গুরু কেমন হয়। কালাচাঁদের বয়ান শোনেন নাই গ, "রাধে তুমি সি আমার গতি। তোমার কারণে, রসতত্ত্ব লাগি, গোকুলে আমার স্থিতি।" সেই গুরুর কথা বইলছি বাবাজী।'

বলতে বলতে ভুরু তুলে একবার ঝিনির দিকে চায়। ঝিনির মুখে রঙ লাগে। কিন্তু তার আয়ত চোখের দৃষ্টি গোপীদাসের দিকে।

গোপীদাসের কথা শুনে, কী বুঝি না বুঝি, তাই কী জানি? এইটুকু শুধু শুনি, চণ্ডীদাস রামীর পূজা করেছিলেন। রাধা, কৃষ্ণের গতি। কিন্তু ঘরছাড়া এই চলার পথে গুরুতত্ত্বের ধরতাই পাই না। কেবল দেখি, গোপীদাসের ভুরু নাচে, ঝিনির দিকে চেয়ে চেয়ে। ঝিনির মুখে শুধু রঙ লাগে না। চোখে যেন নানা আলোর খেলা। গোপীদাসের দিকে চেয়ে যেন কী খোঁজে। কী যেন দেখে। আর রাধা লিলি বা কী বোঝে কী জানে। ওরা ঠোঁট টিপে হাসে।

গোপীদাস আবার আমার কাঁধে ঠুকুস ঠুকুস চাপড়ায়। প্রায় যেন চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে, 'হাঁ বাবাজী, বুইঝতে পারলেন?'

না বুঝলেই বা ক্ষতি কী। সংসারে বাহিরে সব জানা, সকলের না। না হয়, এই তত্ত্ব না-জানা থাক। তবু ঘাড় নাড়তে হয়। আর গোপীদাস কেশো গলায় টিটকিরি দিয়ে হাসে। বলে, 'বাপ গুরু, তার এক শিক্ষা, মা গুরু, তার এক শিক্ষা, লয় ক্যানে বাবাজী, আঁ? আর ইস্কুলের মাস্টরবাবু আর এক গুরু, তারও আর এক শিক্ষা। রসের শিক্ষা, কে দেবে গ বাবাজী, সিটি বলেন ক্যানে।'

চোখের জিজ্ঞাসা চোখেই থাকে। কথা বলতে পারি না। বিন্দু ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে চায়। লাল পাড়ের ঘোমটা খসিয়ে তার রুক্ষু চুলের গোছা গাল ঢেকে দেয়। ছড়ার মতন করে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলে,

'গুরু করব শত শত, মন্তর করব সার
যার সঙ্গে মন মিলবে, দায় দিব তার।'

বলে গোকুলদাসের দিকে চেয়ে হাসে। গোকুলদাস ঘাড় নাড়িয়ে সায় দেয়। বিন্দু মুখ ফিরিয়ে চায় সুজনের দিকে। বিন্দুর দিকে চেয়ে সুজনের চোখের পলক পড়ে না। যেন চোখের আলোয় দেবীর আরতি করে। বিন্দুর চোখও যেন আবেশে ভরে যায়।

গোপীদাস আওয়াজ দেয়, 'অই অই, যথাথ্থ বইলছে বিন্দু। "ঘরে গুরু বাইরে গুরু, গুরু পাথারে। গইনচি কত, আগোনা সি, হিয়ায় বাস করে।" তার মধ্যে যে রসের গুরু, তারে কই প্রেমের গুরু। বুইঝলেন তো বাবাজী, প্রেমের গুরু। পীরিতি যার নাম। উটি না বুঝলে বেবাক বুজরুক। পীরিতি বইলে, ই তিন আখর, বিদিত ভোবন মাঝে।'

ওদিক থেকে অচিনদা বেজে ওঠেন, 'সেই সঙ্গে তোমাদের সেই গানের কলিটাও বাতলে দাও, যে জন প্রেমের ভাব জানে না, তার সঙ্গে কিসের লেনাদেনা?'

গোপীদাস বলে ওঠে, 'আহা, সি জন্যেই তো, বাবাজীকে গুরু ধইরতে বইলছি। নইলে ভাব বুইঝবেন কেমন করে।'

অচিনদা বলেন, 'চিতায় তো ধরে না, গুরু শিকার করে।'

সবাই হেসে ওঠে। গোপীদাস চায় ঝিনির দিকে। ঝিনির চোখ আমার দিকে। আমি ভাবি, দরিয়ার স্রোত চলে, সেই এক টানে। সেই এক বর্গার একদিকে। আমি চোখ তুলে রাখতে পারি না। যা সরিয়ে রাখতে চাই দূরে, তা-ই সবাই নিয়ে আসে কাছে। সবাই এক সুরেতে বাজে। আমি বাজি কুল লাজ মান ভয়ে। কিন্তু সে কথা বোঝানো যাবে না কাউকে।

তবে আমার মনের মধ্যে নানান্ জিজ্ঞাসার চমক। গোপীদাসের কথায় লাগে গোল। এদের তত্ত্ব আমি বুঝতে পারি না। জয়দেব চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, বৈষ্ণব পদকর্তারা কেন তাদের গুরু, ধরতে পারি না। কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলে না। কেবল গুরু গুরু করে। প্রেম প্রেম করে। যার সন্ধানের দান থাকে, পদ্মাবতী, রামী রজকিনী, রানী লছমীর হাতে। যেন ঘটনাচক্রের, ঘর-সংসারের প্রেমের বার্তা না। প্রেম সাধনে, গুরুর আসন নারীর জন্যে পাতা।

সে প্রেমের তত্ত্ব বুঝি না। প্রেম কী, তাই বা কী জানি। তবু যেন মনের মধ্যে কেমন একটা দোলা লেগে যায়। কিসের একটা ধারা যেন উপছে পড়তে চায়। তাতে এক আনন্দের বোধ যতটুকু, তার চেয়ে বেশী যেন এক হাহাকারের কণ্ঠ বাজে। মন দুখানো ব্যথায় যেন কোন্ শূন্যতায় বাতাসে মাথা কোটে। এ অনুভবের ব্যাখ্যা জানি না। ব্যক্ত করতে পারি না।

এই সময়ে গোকুলদাস সরু গলায় গেয়ে ওঠে,

> 'সখী, হিয়া মোর ক্যানে কাঁপে।
> নয়ানে ঝরায়ে বারি,
> ই পরাণ থরথরি
> সি বাঁশীর মধুর আলাপে।'

টেনে টেনে, কীর্তনের সুরে, যেন আর্তস্বরে বাজে। গোকুলের দিকে চেয়ে দেখি, দৃষ্টি তার সামনের দিকে। কারুর দিকে চেয়ে নেই। সে যেন আপনাতে আপনি বিভোর। মুখে ভাবের খেলা নেই। সুরের মধ্যে যেন হিয়া কাঁপানো বিষাদ সংশয়। গাড়ির মধ্যে নতুন সুর বেজে ওঠে। অন্য আবেশ লাগে।

ঝিনির সঙ্গে দুই সখী, এদিকে ফিরে চায়। গোপীদাস বলে, 'সেই তো, পীরিতি পরকিতি, ফাঁদের ধরা।'

গাড়ি তখন বাঁদিকে বাঁক নেয়। অচিনদা ঘোষণা করেন, 'নানুর এল।'

নানুর! নান্নুর! যা-ই বলো, সেই এক কথা, নাম চণ্ডীদাস। ইতিহাস লিখি না, ইতিহাস জানি না। যদি বলো আর এক দেশে, আর একজন এই নামে আছেন, তবে তাও সেই নামের মহিমা। দুই বলো, চার বলো, লাখোও বলো, তবু জানি, সেই এক নাম, চণ্ডীদাস। এক কথা, এক গান, একই সুরে বাজে। নামের, স্থানের,

মহাফেজখানার যে দলিল-দস্তাবেজ ঘাঁটতে যায়, সে যাক। তার কাজ তার। আমার নাম সার। এখানে আমি তর্কেতে নেই। ছাতনা-নান্নুরের লড়াইয়ে নেই। যেমন কিনা একান্ন পীঠের যেখানে যাও, এক শরীরের নানা রূপ। আমার কাছে নান্নুর যা, ছাতনাও তাই। যেখানে তাঁর নাম, সেখানেই আমার কবিতীর্থ। শিল্পীর সাধন ক্ষেত্র।

এখন আমার সেই কবিতা মনে পড়ে,

নান্নুরের মাঠে গ্রামের নিকটে
বাশুলী আছয়ে যথা
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
সুখ সে পাইবে কোথা।

যেখানে বাশুলী অধিষ্ঠাত্রী, সেখানে দুঃখকষ্ট অপমান সকলই সুখ। কারণ,

'চণ্ডীদাস কহে সে এক বাশুলী
প্রেম প্রচারের গুরু।
তাহারই চাপড়ে নিদ্রা ভাঙ্গিল
পীরিত হইল শুরু।'

সেই নানুরে পদার্পণ। আগমন চণ্ডীদাসে। অচিনদা চেনা মানুষের মতো, এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করায়। চোখ মেলে তো দেখি, বীরভূমের এক গ্রাম। প্রথমেই লক্ষ্য পড়ে, মাটির বেড়া, খড়ের চাল। গাড়ির পথ যেখানে শেষ, গ্রামে ঢোকার পথের মোড়ে চায়ের দোকান একদিকে। আর একদিকে ভিন্ জিনিসের বিপণি। কালো মানুষটা শুকনো গামছা গায়ে। রোদে গা দিয়ে চায়ের অপেক্ষায়। সঙ্গে আরো দুই-চারি জন। হৃদয় মন শরীর সকল দিয়ে ধূমায়িত পানীয় দর্শন। ওদিকে মুড়ি মুড়কি ডাল তেল ইত্যাদির সামনে নানুরের মানুষদের অলস শ্লথ কেনাকাটা। তার মধ্যেই কারা এল হে? একবার চোখ তুলে অচিন লোকদের দেখা। একটু বা অবাক কৌতূহল, গাড়িওয়ালা শহুরেদের সঙ্গে একতারা-দোতারা-বাঁয়া আলখাল্লার দল জুটল কেমন করে। তারপরে আর তেমন উৎসাহ নেই। চণ্ডীদাস বলে কথা। এমন কত মানুষ আসছে যাচ্ছে। তাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলে কি আর ঘর গেরস্থালি চলে।

পাকা রাস্তা আবার ডাইনে মোড় নিয়ে চলে গিয়েছে। অচিনদা আমাদের ডেকে নিয়ে যান গ্রামের মধ্যে। তার আগে পরম রসিকের লীলাভূমিতে নেমে ভূমির ধুলো নিয়ে মাথায় ছোঁয়ায় গোপীদাসের দল। মুখে শব্দ জয়গুরু। আর গ্রামের পথে পা দিয়ে আমার বুকের মধ্যে ধ্বক করে ওঠে। দেখি এক বড় জলাশয়। তার পাড়ে ধোপার পাট রয়েছে। কাপড় কাচছে না কেউ। ওপারের গাছের ছায়ায় ছায়ায় মাথায় ঘোমটা এক বধূ সদ্য জল সইয়ে কলসী কাঁখে চলে যায়।

ভাবি, এই কি সেই রজকিনীর পাট নাকি? আর কোথায় বসে ছিপ দিয়ে মাছ ধরত বাশুলীর পূজারী ব্রাহ্মণ। যেথায় 'পীরিতি করিল, জগতে ভাসিল, ধোপানী দ্বিজের সনে। জগতে জানিল, কলঙ্কে ভাসিল, কানাকানি লোকে জনে।' কোথায় সেই তেহাই গ্রাম, তিন ক্রোশ দূরে। যেখান থেকে রজকনন্দিনী আসত নানুরের বাশুলীর জলাশয়ে কাপড় কাচতে।

ডাইনে দেখি, উঁচু পাড়, আরো এক পুকুর। পথের দু পাশে বন্ধুর ভূমি। হয়তো এই সেই মাঠ, 'নান্নুরের মাঠে, গ্রামের নিকটে।' এখানে ওখানে তাল, ছেউটি বাবলার ঝাড়। এ প্রান্তর গ্রামের নিকটে বটে। ধান্কাটা রিক্ত মাঠ। যেন সব দিয়ে-থুয়ে, উদাস বৈরাগী ধূলি আলখাল্লায় জড়ানো। তার বুকের ওপর দিয়ে চলে যায় গরুর গাড়ি। হেথা হোথা, পলাশের ডালে এখনো ফুল আসেনি। কিন্তু ন্যাড়া শিমুলের ডালে ডালে ইতিমধ্যেই পাগলা মাতামাতি। লালের ছড়াছড়ি।

ছাতিমতলা পেরিয়ে এলাম বাশুলীর থানে। এক মরমীয়া ধ্যানের দেশ থেকে আর একজনের লীলাভূমে। হয়তো এই পথে হে'টে গিয়েছেন তিনি মাঠে গ্রামান্তরে। ছেলেবেলার ধূলি খেলা থেকে যৌবনের পীরিতি আখর তিনের গানে গানে ফিরেছেন। মন শিহরে যায়, তরঙ্গে দোলে। এই ধূলিতে সেই পায়ের ধুলো আছে। এই বাতাসে সেই মানুষের নিঃশ্বাস। কেমন দেখতে ছিলেন! কেমন করে কথা বলতেন, হাসতেন। নিরালা নিরিবিলি কোন্খানে বসে ছন্দের ভাবে মগ্ন থাকতেন।

গায়ে স্পর্শ লাগতে ফিরে তাকাই। লিলি জামা ধরে টানে, 'ও মশাই, আসুন। সবাই যে চলে যাচ্ছে।'

দেখি, বাঁয়ে ফিরে পুষ্করিণীর ধার দিয়ে সবাই গ্রামের ভিতরে যান। অচিনদা সকলের আগে। তাঁর পিছে গোপীদাসেরা। তিন সখী সকলের পিছনে। তারা এখনো দাঁড়িয়ে। ঝিনির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। জলের ধারে, পথের ওপর দাঁড়িয়ে সে। তার পাশে রাধা।

শুনতে পাই, অচিনদার গলা, 'ওকে নিয়ে এসো। বলো, ওদিকে কিছু নেই, এদিকেই সব।'

তার সঙ্গে গোপীদাসের তালের ঠেকা, 'হুঁ, চিতে বাবাজী আবার দিক ভুল না করে।'

ঝিনির পাশে রাধা আমাকে বলে, 'একেবারে তন্ময় হয়ে গেলেন যে। আগে মন্দিরটি দেখে আসি চলুন।'

তাড়াতাড়ি সকলের পিছন ধরি। পুকুরের সীমা পেরিয়ে দু' পাশে মাটির ঘর। মাঝখানে গলি পথ। একটুখানি গিয়েই চোখে পড়ে উ'চু ঢিবি। ঢিবির ওপারে মন্দিরের চূড়া। ঢিবির পাশ দিয়ে এগিয়ে উ'চুতে মন্দিরের চত্বরে যাই। আমরা ছাড়া আর কোনো প্রাণী দেখি না। নিঝুম নিশ্চুপ চারদিক। ঘুঘুর অলস ডাক, ঝি'ঝির টানা স্বর। গাছের ছায়ায় নিবিড়, উঠোনে শুকনো পাতা ওড়ে। বাশুলীর মন্দির একদিকে। উঠোনের ওপারে বাশুলীর মুখোমুখি আর এক মন্দির। এই মুহূর্তে স্মরণে আসে না, কোন্ বিগ্রহ এই মন্দিরে। বাশুলীকেই প্রথম দর্শন করি। ছোট এক কালো পাথরের মূর্তি। কে বাশুলী, বাসলী কে, কে বা বিশালাক্ষী, কে জানে। এ'কে নিয়ে নানা মত, নানা কথা। কেউ বলে বৌদ্ধ, ইনি নিত্যার সহচরী। 'ডাকিনী বাশুলি, নিত্যা সহচরী, বসতি করয়ে তথা।' 'নিত্যের আদেশে, বাশুলী চলিল, সহজ জানাবার ওরে।' স্বয়ং চন্ডীদাসের এই বার্তা। 'বাশুলী কহায় বলে চন্ডীদাস গীত। আপনি আপনি চিত করহ সম্বিত।' কিন্তু দেখি, ইনি, চতুর্ভুজা বাগীশ্বরী। পাষাণের দেবী মূর্তি, বীণা পুস্তক জপমালাধারিণী। এ দেবী আমাদের পরিচিতা। ইনি বিদ্যাদেবী 'ব্রজেশ্বরী।'

বাশলী যাঁর নাম, তিনি রুধিরপায়িনী চামুন্ডা। ইনি যে তিনি নন, সন্দেহ নেই। বিশালাক্ষী বা কে। ধর্মঠাকুরের যাঁরা আবরণ দেবতা, তাঁদের কেউ কি। কে জানে। বাশুলীর নমস্কারের শ্লোকে তাঁকে মঙ্গলচন্ডীও বলা হয়েছে। যিনি সেই চন্ডীকে সেবেন, তিনি চন্ডীদাস। কত যে কথা। তাই লোকে বলে, নানা মুনির নানা মত।

থাকুক। আমি মুনি না। আমার মুনির মতন মত নেই। চন্ডীদাসের বচনে শুনি, ইনি তাঁর 'প্রেম প্রচারের গুরু।' 'বাশুলী আসিয়া চাপড় মারিয়া চন্ডীদাসে কিছু কয়।' বাশুলীর আদেশেই চন্ডীদাস প্রেম সাধেন, পীরিতি গান করেন। 'বাশুলী আদেশে কহে চন্ডীদাসে, ধোপানী চরণ সার।' তবু ভয় ছিল প্রাণে। সমাজের ভয়ে, লোকভয়ে, অত্যাচারে পীড়নে শ্লেষে ঠাট্টায় তিক্তবিরক্ত চন্ডীদাস যখন আত্মীয়দের মুখ চেয়ে প্রেমিকাকে ছাড়তে চেয়েছিলেন, তখন রামীর বিলাপ, 'নাথ আমি সে রজক-

বালা।...কহেন রামিনি, শুন গুণমণি, জানিলাঙ তোমার রীতি। বাশুলী বচন করিলে লঙ্ঘন, সুনহ রসিকপতি।'

কিন্তু বাশুলীর বচন লঙ্ঘন করেননি। রামী ত্যাগ করে ঘরে ফিরে যাননি। প্রেম ছেড়ে অ-প্রেম সাধনে যাননি। কারণ শিরে বন্দী বাশুলী আদেশ। 'রামীর বচন, করহ শ্রবণ, দাসীর করহ সাথ।' সাথ-ই করেছিলেন, কিন্তু তার আগে অনেক যাতনা, পীড়ন, অপমান। ইনি সেই বাশুলী। ইনি যে-ই হোন, নিত্যা সহচরী বা রুধির-প্যায়িনী, মঙ্গলচন্ডী বা বিদ্যাদেবী, ইনি সেই কবির পূজ্যা। ইনি তাই সকল মানবের পূজ্যা। সকল শিল্পীর পূজ্যা। এ'রই নির্দেশে প্রেম সাধন, প্রেমপদাবলী রচনা। ছাতিমতলার কবির বচন মনে পড়ে। ভবিষ্যতের সেই দিনের মুখ চেয়ে যিনি চন্ডীদাসের কথা বলেছেন, '...যখন হৃদয়ের দ্বার দিবারাত্রি উদ্ঘাটিত থাকিবে, ও কোন অতিথি রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া না যাইবে, তখন কবিরা গাইবেন, "পিরীতি নগরে বসত করিব, পিরীতে বান্ধিব ঘর। পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব, তা বিনু সকলি পর।"

কোন্ দূরে না জানি আছে সে প্রেমজগৎ। আর সেই প্রেমজগতের কবিতা সকলই, সৃষ্টির নির্বন্ধ ছিল, কবির এই দেবীর হাতে। জানি, সামান্য ধনে গরীব বলি, অসামান্য সৃষ্টির আকাঙ্খায়। মনো আশ বাস পুরুক না পুরুক, বাশুলীকে নমস্কার। প্রণাম, শত কোটি।

তবু ভাবি মনে, তবে রাধাকৃষ্ণ গান কেন। বৌদ্ধ হিন্দু মেলামেলি জড়াজড়ি যদি বা দেখি, বৈষ্ণবের রূপ কোথায়। চোখ ফেরাতে গিয়ে দেখি, পাশে অচিনদা। মন্দিরের খোলা দরজার কাছে দেওয়ালে হেলান দিয়ে ঝিনি দাঁড়িয়ে আছে। গোপীদাসের দল কখন মন্দিরের দাওয়া থেকে, দর্শন করে নেমে গিয়েছে। কে যেন একতারা বাজায়। সঙ্গে বাঁয়ার বুকে আল্‌তো চাঁটির আওয়াজ। রাধা লিলি যেন কোথায় নিরুদ্দেশ। হয়তো ডাইনে যে পুরনো পাকা বাড়ি দেখা যায়, সেখানেই ঢুকেছে। কিংবা আশেপাশে, মন্দির প্রদক্ষিণে।

হয়তো এই মন্দিরে যা কিছু এই-ই সব না। কেতাবে পড়েছি, পাঁচশো বছরের সেই আদি মন্দির, কালের ধূলায় মিশিয়েছে। এ মন্দির অনেক পরে। হয়তো সেই প্রাচীন মন্দিরে কালাচাঁদ রাইকিশোরী ছিল। অন্যথায় পদাবলীর যা কিছু, সবের নায়ক-নায়িকা তো সেই দু'জনেই।

অচিনদাকে জিজ্ঞেস করব ভেবে মুখ তুলি। দেখি, বাশুলীর প্রতি নিবিড় দৃষ্টিপাতে নিশ্চল মগ্ন। কী ভাবেন অচিনদা। এই পিরীতি গুরুদেবীর সামনে দাঁড়িয়ে, বসন্তোৎসবের রাত্রে আম্রকুঞ্জের নীরজাকে মনে পড়ে নাকি। কোন্ ধ্যানেতে এমন মগ্ন!

তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি না। মুখ ফেরাতে গিয়ে ঝিনির দিকে চোখ পড়ে। বাশুলীর দরজায় দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। আসবার পথে যেটুকু চঞ্চলতা ছিল, সকলই গিয়েছে। চোখের নানা রঙের ঝলক গিয়েছে। ঠোঁটের হাসি গিয়েছে। শীতের সকালে কোনো প্রসাধনই সারতে পারেনি। রুক্ষু চুলে, আলগা বাঁধনে, একটা খোঁপা করা। বাসন্তী রঙের শাড়ি, লাল পাড়। ফুলতোলা পশমী চাদর, লম্বা ভাঁজে গলায় ঝোলানো। চুলে আর শাড়িতেই যেন, কেমন একটু বৈরাগিনী ভাব এনে দিয়েছে। ওর মুখে এখন ছায়া নিবিড়। চোখের কোলে যেন কিসের এক অস্পষ্ট উদ্বেগ, আর জিজ্ঞাসা। যেন কিছু জিজ্ঞেস করতে চায়।

চোখে চোখ পড়তে এক মুহূর্তের জন্যে চোখ সরাতে পারি না। তারপরে মুখ ফিরিয়ে বাশুলীর দাওয়া থেকে নেমে আসি। অন্য মন্দিরে যাই। আশেপাশে দেখি।

কোথায়, রাধাকৃষ্ণ তো দেখি না। ইতিমধ্যে কোথা থেকে গান বেজে ওঠে,

পিরীতি অনল ছুঁইলে মরণ
শুন গ কুলের বধূ
আমার বচন না শুন এখন
জানিবে কেমন মধু।
সই, পিরীতির বুলি বলিস না মোকে
পিরীতি অনলে পুড়িয়া মরিবে
জনম যাবে গ দুঃখে।...

কোথায় গান বাজে। মনে হয়, গোকুলদাসের গলা। হয়তো মন্দিরের সীমা ছাড়িয়ে নিচে কোনো গৃহস্থের উঠোনে, ওরা দল বেঁধে আসর জমিয়ে বসেছে। ভাবতে ভাবতে ভিন্ মন্দিরের পিছন থেকে যখন উঠোনের দিকে আসি, দেখি সেখানে কেউ নেই। চার পাশের, বেষ্টিত চত্বরে, এই ভিন্ মন্দিরের দাওয়ায় আমি একলা। স্তব্ধ, নিশ্চুপ। মুখোমুখি, ওপারে বাশুলীর শির মাত্র দেখি। শুধু গানের আখর ভেসে আসে, 'সই বলিস না গ, বলিস না গ, বলিস না মোকে।'...

কোথায় গেল সবাই। ধীরে ধীরে নেমে আসি নিচে। দেখি, দরজা দিয়ে চত্বরে ঢোকে গোপীদাস। বলে, 'তাই ভাবি, চিতে বাবাজীরা গেলেন কুথা।'

পিছনে পায়ের শব্দে চেয়ে দেখি, যে-দাওয়া থেকে আমি নেমে আসি, সেই দাওয়াতে ঝিনি দাঁড়িয়ে। অবাক লাগে, কখন এল, কোথায় ছিল সে। ও কি আমাকে কিছু বলতে চায়। এমন করে চেয়ে কেন! অথচ বলে না কিছুই। জানি না, কী দেখে আমার মুখে। গোপীদাসকে জিজ্ঞেস করি, 'অচিনদা কোথায় গেলেন।'

গোপীদাস ভুরু নাচিয়ে হেসে ভাষে, 'সবাই যে যার নিজের মনে, আপনাদের মতনই।'

আপনাদের! হয়তো তা-ই ভাবে গোপীদাস। আমি অন্য কথা জিজ্ঞেস করি, 'আপনি এখানে আগে এসেছেন!'

গোপীদাস দাড়ি নাড়িয়ে চোখ বড় করে বলে, 'আগে কী গ বাবাজী! পিতি বচ্ছর একবারটি না এইসে কি পারি। হেথাতে আসি, আর পিতি বছরে একবার যাই কিরনহারে। সেথাতেই ওঁয়াদের দুইজনার সমাধি আছে।'

এ কথা জানা ছিল না। জিজ্ঞেস করি, 'দু'জনের মানে, চন্ডীদাস আর রামীর?'

'এ'জ্ঞে। সবাই কয়, সেথাতে এক মন্দির ছিল, পুরনো লাটমন্দির। বইসে, দু'জনে গান কইরছিলেন। মন্দির ভেঙে পড়েছিল।'

আমার মনে পড়ে যায়, ভিন্ কাহিনী। গৌড়ের রাজা ডেকেছিলেন চন্ডীদাসকে পদাবলী গান শোনাতে। সঙ্গিনী রজকিনীকে নিয়ে গিয়েছিলেন গান শোনাতে। কিন্তু 'রূপিলে বিষের গাছ হৃদয় মাঝারে। গরলে জারল অঙ্গ দোষ দিব কারে।' গৌড়ের রাণী চন্ডীদাসকে দেখে, গান শুনে 'ঘরে রৈতে নারে, করে অভিসার।' অতএব রাজার আদেশ, হাতীর পিঠে শিকল দিয়ে বেঁধে মারো কবিকে। 'চন্ডীদাসে করি ধ্যান ; বেগম তেজল প্রাণ। শুনিয়া ধবিনি ধায় ; পড়িল বেগম প্যায়।' চন্ডীদাসের সঙ্গে বেগমের প্রাণ যায়। তার পায়ে প্রাণত্যাগ করে রজকিনী।

কত কথা, কত কাহিনী। সত্যি-মিথ্যার বিচারে কে যায়। তবে এইটুকু শুধু মনে হয়, দুঁহু করে ধরাধরি করে দুইয়ের মরণ হয়েছিল। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কখনো ছাড়াছাড়ি হয়নি।

গোপীদাসকে জিজ্ঞেস করি, 'কিন্তু এখানে রাধাকৃষ্ণের কিছুই দেখি না কেন।'

গোপীদাস দাড়ি উড়িয়ে হাসে। বলে, 'অই চিতে বাবাজী, তুমাকে আর বুঝাব

কত। হেথা রাধা কৃষ্ট থাইকবে ক্যানে? পদাবলীর জন্যে বুইলছ?'

এই প্রথম গোপীদাস আমাকে তুমি বলে। যেন এতক্ষণে সহজের হাওয়া লাগে। দূরত্ব যায় দূরে। বলি, 'হ্যাঁ।' গোপীদাস কাছে এসে, মুঠো করে দাড়ি ধরে। যেন কী এক পরম বার্তা বলে, এমনি করে। ধীরে ধীরে বলে, 'রাধাকিষ্টের লীলা কোথায়, নিজের কথা বাজে, বুইঝলে ত? রজকের বিটির কথা ভাব, আর চন্ডীঠাকুরের কথা ভাব। এ দুয়েতে যে লীলা, তারই মিলেমিশে রাধা-কেষ্ট। নিজের কথা পরকে দিয়ে, হাঁ, বুইঝলে? যে দুঃখে রাধা কাঁদে, রামীও সেই দুঃখে কাঁদে, না কী বাবাজী আঁ? হল ত? ইবারে দেখ, রসতত্ত্বের লেগে কেষ্ট থাকেন রাধার পায়ে। উনি থাকে রামীর পায়ে। তবে কি না বাবাজী, খালি পদাবলী শুইনলে, রসিকের আদত কথা শুন নাই।'

তার কথার মাঝেই, বিন্দু আর সুজন আসে। কাছে এসে কথা শোনে। জিজ্ঞেস করি, 'কী সে কথা?'

চোখ বড় করে মাথা দুলিয়ে বলে, 'অই সেই এক তত্ত্ব। রাধা-কেষ্ট যা সাধে, এ পুরুষ পিকিতিও তাই সাধে। রসিকের গান শুন নাই,

সই, 'সহজ মানুষ নিত্যের দ্যাশে
মনের ভিতর কেমনে আইসে।
ব্যাসের আচার করিবে যেই
বিরজা উপরে কেমনে আইসে।
সহজ ভজন বিষম হয়
অনুগত বিনা কেহ না পায়।
চন্ডীদাস বলে ই সার কথা
বুঝিলে যাইবে মনের বেথা।'

গোপীদাস যেন গোপন কথা বলে, এমনি তার সুর স্বর মুখের ভাব। চন্ডীদাসের এ গান আমার শোনা নেই। মনে হয় যেন, বাউলের গান শুনি। এদিকে বিন্দু আর সুজন কপালে হাত ঠেকিয়ে শব্দ করে 'জয়গুরু'। তারপরে বিন্দু গুনগুন করে গেয়ে ওঠে,

সখি, যাইবি দক্ষিণে
থাকিবি পচ্চিমে
বলিবি পুবের মুখে।
গোপন পিরীতি
গোপন রাখিবি
থাকিবি মনের সুখে।

সাধিবি মনের কাজ—
সাপের মুখেতে
ভেকেরে নাচাবি
তবে ত রসিকরাজ।
কুলটা হইবি
কুল না ছাড়িবি
কলঙ্কে ভাসিবি নিতি
পেয়ে কামরতি
হয়ে অন্য পতি
তাইতে বলাবি সতী।

সিনান করিবি
জল না ছুঁইবি
আলায়ে মাথার কেশ
জলেতে পশিবি
জলে না তিতিবি
নাই সুখ দুখ কেলেশ
আনের ছোঁয়াতে
সিনান করিবি
তবে ত সে রীতি সাজে
কহে চণ্ডীদাস
ই বড় ওল্লাস
থাকিব যোবতী মাঝে।

গানের শুরুতেই সুজনের দোতারায় সুর বেজে উঠেছে। গান শেষ হতে না হতেই গোপীদাস চোখ বুজে, যেন হেসে কেঁদে, আওয়াজ দেয়, 'জয় গুরু জয় গুরু!' তাড়াতাড়ি বিন্দুর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। গালে চিবুকে হাত বুলিয়ে দেয়। বলে, 'বেঁচে থাক মা, গুরু তোকে দয়া কইরবেন গ বিটি। তুই দয়া পাবি।'

আমার মন ফেরে অন্ধকারে মাথা কুটে। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে এমন বাউল হেঁয়ালি শোনা ছিল না। এই তত্ত্ব বুঝি না, অর্থ জানি না। নির্বাক, অবাক চোখে চেয়ে থাকি। সুজনের তো থামবার নাম নেই। তার শরীরে সাপের পাক তরঙ্গ। দোতারা বাজিয়ে চলে বিন্দুর দিকে চেয়ে। গান গেয়ে বিন্দুরও যেন কিসের ঘোর লেগেছে। গোপীদাস আমার দিকে ফিরে বলে, 'যা সাধেন রাধা কেষ্ট, তাই সাধের রামী চণ্ডীদাস, বুইঝলে বাবাজী?'

কেবল ঘাড় নেড়ে নিঃশব্দে জানাই, 'না।'

গোপীদাস দাড়ির ভাঁজে রহস্য হেসে বলে, 'ক্যানে গ বাবাজী, শুন নাই, "শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে? সব রস সার শৃঙ্গার এ। শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে। মরম বুঝিয়া ধরম যজে।" শুন নাই?'

যত শুনি, অবাক মানি তত। কিন্তু বুঝি না কিছুই। তাই মাথা নাড়াই সার। গোপীদাস তেমনি বলে চলে, "স্বরূপে আরোপ যার, রসিক নাগর তার, পাওয়া যাবে মদনমোহন। যেইয়ে দেবী বাশুলীরে, শুধায় করজোড়ে, রামী কহে শৃঙ্গার সাধন।" আর চণ্ডীদাস যেইয়ে বলেন, "তুমি ত হে রমণের গুরু, রসের কল্পতরু, তার সনে দাস অভিমান। চণ্ডীদাস কহে, মাতা, বইললে সাধন কথা, রামী সত্য প্রাণপ্রিয়া হইল।"'

বলে, বলতে বলতে গোপীদাসের চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। সে যেন কিসের এক ঘোরের মধ্যে ডুবে যায়। আর বিন্দু তার নিজের ঘোরেই, আবার গুনগুনিয়ে ওঠে,

আমার পরাণ পুতুল লইয়া
নাগর করে হে পূজা
নাগর পরাণ পুতুল আমার
হিদয় মাঝেতে রাজা।

গোপীদাসের চোখ ভেসে যায়। আবার বিন্দুর মাথায় হাত দিয়ে বলে, 'বা বিটি, বাহ্ বাহ্।' আমার দিকে ফিরে বলে, 'বুইঝলে তো বাবাজী। আদতে চণ্ডীদাস হলেন বাউল, রসের রসিক।'

তারপরে হঠাৎ আমার চিবুকে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'বুঝবা তুমি?'

বলি, 'ইচ্ছা করে।'

গোপীদাস ঘড়ঘড়ে গলায়, হা হা করে হাসে। বিন্দু যেন ঢুলু ঢুলু চোখে, আমার দিকে চেয়ে হাসে। সুজন তেমনি বাজিয়ে চলে।

গোপীদাস আমার কপালে হাত রেখে চোখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসে। বলে, 'এই জানবা বাবাজী, মোট কথা, পুরুষ পিকিতি মিলন চাই, আবার যখন মিলন, তখনই বিচ্ছেদ। জীবন্তে যে মরা থাকে, টানেতে যে উজান চলে, তার সাধন হয়। বড় কঠিন, বড় কঠিন। পিরীতে সাধন, সাধনে পিরীত, এই কথা। চন্ডীদাস হলেন এই সাধক।'

মাথা নেড়ে বলে, যেমন নিরালা নিভৃতে, শ্রবণ উৎকর্ণ হয়ে শোনে, দূরের অস্পষ্ট ধ্বনি, তেমনি যেন আওয়াজ দেয় গোপীদাসের কথা। অন্ধকারে যেমন জাগে ধাপসা আলোর ইশারা, তেমনি বোধ হয় তার কথা। দেহতত্ত্বের সহজ সাধন, যেন এক অরূপের রূপে জেগে ওঠে। তার ধর্ম্ম কী, মর্ম্ম কী, জানি না। মনে বাজে, প্রেম ভজে যেই জন, সেই জন সেবিছে মানব। প্রেম, দুঃখের লাগিয়া শুধু। যবে সুখের আগমন, তখন সুখ দুঃখ অতীত। তখন এক ভিন্ জগতের দোলা। তখন রূপ ছেড়ে, অরূপের খেলা। তখন চোখের জলে, হাসির ধারা ঝরে। সে অনুভূতি কেমন, কে জানে। কেবল দেখি, নিজের বুকে কেমন এক বাষ্প জমে ওঠে। কথা ফুরিয়ে যায়। কী চাই, কী পাই না। সেই এক শূন্যতার বাতাসের ঘূর্ণি লেগে যায়।

গোপীদাস ডেকে বলে, 'চল গ বিন্দু, বাশুলীর কাছে যেইয়ে আর একটুক বসি।'

চলতে গিয়ে আমার দিকে ফিরে একবার সুর করে বলে, 'রসের মানুষ ধরবি যদি, রসের খোঁজে যা।'

যার নাম-ঠিকানা জানি না, আলাপ-সংবাদ নেই, তাকে কোথায় খুঁজব। তার চেয়ে যাই, কবির লীলাভূমির পথে পথে। ধূলায় ধূলায় ফিরি গিয়ে। শুনেছিলাম, এখানে নাকি রামী রজকিনীর ভিটাও আছে। দেখে আসি গিয়ে।

কিন্তু পিছনের মন্দিরের দাওয়ায় ঝিনি দাঁড়িয়ে। একবার না তাকিয়ে যাই কেমন করে। ফিরে দেখি, দাওয়া শূন্য। ঝিনি নেই। সেই ভালো, সেই ভালো। মন্দিরের সীমা থেকে বেরিয়ে ঢিবির পাশ দিয়ে গ্রামের পথে নেমে যাই। কে জানে, পাঁচশো বছর আগে, এ পথই ছিল কি না। এই যে সব নানুরবাসীরা মুখের দিকে তাকিয়ে চলে যায়, কুটিরে কুটিরে গৃহস্থালির নানা রব, উঠোনে মরাই, দরজার কাছে গরুটা বাঁধা, সবই হয়তো এমনি ছিল। এই পথেই, রজকনন্দিনী বাশুলীর মন্দিরে যেতো হয়তো। মন্দিরের সে ছিল পরিচারিকা। ঝাঁট পাট ধূলা পরিষ্কার তার কাজ। পূজার দায় চন্ডীঠাকুরের। হয়তো, এই পথেই, গাছতলায় দাঁড়িয়ে পড়শীরা কানাকানি করেছে, কলঙ্ক দিয়েছে। কিন্তু বাশুলীর আদেশ লঙ্ঘিত হয়নি। 'ধোপানী চরণ সার' হয়েছিল। কেবল প্রেম সাধনে না। প্রেম সাধনের ফুল ফুটেছিল রামিনীর কবিতায়। চন্ডীদাস একা নন, রজকঝিয়ারিও কবি ছিলেন। 'কোথা যাও ওহে, প্রাণবঁধু মোর, দাসীরে উপেক্ষা করি। না দেখিয়া মুখ, ফাটে মোর বুক, ধৈরয ধরিতে নারি। বাল্যকাল হতে, এ দেহ সঁপিনু, মনে আন নাহি জানি। কি দোষ পাইয়া, মথুরা যাইবে, বল হে সে কথা শুনি।' ব্যথার ফুলের নাম কবিতা। প্রেম মৃত্তিকায়, বিরহের বৃক্ষে তার জন্ম।

এই তো সেই গ্রাম। এই সেই পথ। আমি সেই পথে চলি। ভুলে যাই কোন্ কালে আছি। কালের ঘূর্ণিতে পাক খেয়ে যাই। আমি যুগল গলার গান শুনি। মৃদঙ্গে শব্দ, প্রেমজুরির ঠিনি ঠিনি।

কোথায় এসে পড়ি, খেয়াল থাকে না। নিরালা জঙ্গল, বাঁশঝাড়ের ছায়া, সামনে

মাঠ। যেন কার পায়ের শব্দ পাই। কার গলায় যেন কিসের শব্দ। থমকে দাঁড়াই। সামনের মূর্তিকে ভালো করে চেয়ে দেখি। দেখি ঝিনি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। বলে, 'গ্রামের বাইরে চলে যাচ্ছেন যে।'

'তাই বুঝি। তুমি কোথা থেকে এলে?'

'আপনার পেছনে পেছনে।'

সহসা সংবিৎ ফেরে আমার। দেখি, ঝিনির চোখের কোলে স্পষ্ট উদ্বেগ, মুখে ছায়া ভার। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করি, 'আর সব কোথায়?'

'মন্দিরের কাছে-পিঠেই আছেন।'

'চলো তা হলে সেদিকেই যাই।'

বলে, ফিরতে যাই, ঝিনি নিশ্চল থাকে। পলকহীন চোখ সরায় না। আবার ডাকতে যাই। তার আগেই জিজ্ঞেস করে, 'এখান থেকে কোথায় যাবেন?'

বলি, 'ইচ্ছে আছে, বক্রেশ্বর যাবো।'

'এখান থেকেই?'

'হ্যাঁ, তাই তো কথা হয়েছে গোপীদাসের সঙ্গে।'

'স্নান খাওয়ার কী হবে এই দুপুরে?'

কী অবাক কথা বলে ঝিনি। হেসে বলি, 'সে কথা তো ভাবিনি। সঙ্গীদের যা হবে, আমারও তাই।'

ঝিনি চুপ করে চেয়ে থাকে এক মুহূর্ত। তারপর বলে, 'বক্রেশ্বর থেকে কোথায়?'

'যেখান থেকে শান্তিনিকেতনে এসেছিলাম, সাঁওতাল পরগণার সেই জায়গাতে।'

'তারপর?'

'কেঁদুলি যাবার ইচ্ছা, মকর সংক্রান্তির মেলায়।'

'তারপর?'

'তারপর কিছু ভাবিনি।'

'ঘরে ফেরার দিনক্ষণও জানা নেই?'

জবাব দিতে পারি না। দিন ক্ষণ না জানি, পথ তো সার করিনি। ঘরে ফেরার পথেই তো পা বাড়িয়ে আছি।

ঝিনি বলে, 'জবাব দিতে ভয় লাগছে, না?'

'কেন?'

'পাছে সেই ঠিকানায় চিঠি দিই।'

তাড়াতাড়ি বলি, 'না, না, চিঠি দেবে বৈ কি।'

'জবাবের প্রত্যাশা না করে।'

ওর নিচু স্বরে যেন কী এক তরঙ্গের দোলা। বলি, 'তা কেন।'

ও আবার চুপ করে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকে। তারপরে জিজ্ঞেস করে, 'আবার কি কখনো দেখা হবে?'

সহজেই বলি, 'কেন হবে না।'

ঝিনি বলে, 'শুনলে মনে হয়, কতই সত্যি। ভয় নেই, জানতে চাইব না, কোথায় কবে। দেখা হবে, এইটুকু জানলাম, তাই যথেষ্ট।'

কথা শেষ হবার আগেই, ওর অপলক চোখের রঙ বদলে যায়। যেন জলের মতো চিকচিক করে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে। হঠাৎ নিচু হয়ে হাত বাড়ায়।

এ যেন বড় বেশী। আমার মনে ভাবনায় সব কিছুতেই বাধে। বলে উঠি, 'থাক না।'

বলি আমি, শোনার দায় তো ঝিনিরই। ও কথা শোনে না। আমি আবার বলে উঠি, 'এটা ভারি সেকেলে ব্যাপার।'

ঝিনি উঠে দাঁড়ায়। ওর গলা ভেঙে যায়, তবু বলে, 'হতে পারে। আমার সেকাল-একাল নেই। সে সব তোমারই থাক। শিক্ষা শহর আধুনিকতা ওসব ভাবনা তোমার থাক। আমার কোনো দরকার নেই। আমার যা দরকার, আমি তাই করি।'

এত বড় কথাটা, এমনি করে বলে ঝিনি। কত সহজে ওর সম্বোধন বদলে যায়। আমার বুকের মধ্যে নানান কথা বেজে ওঠে। গলার কাছে, যেন রুদ্ধশ্বাসে চেপে থাকে। কথা বলতে পারি না। ওকে আমি কী বলব, তা জানি না। কিন্তু একটা কণ্ট বিঁধে থাকে কোথায়। যেন নড়তে চড়তে পারি না।

ঝিনি চোখ মোছে। তাকাতে গিয়ে, চোখ নামায়। ওর মুখে আবার রঙের ছোপ লাগে, বলে, 'ক'টা দিন খুব যাতনা পেলে। এবার সুখে ঘুরে বেড়াবে।'

বলি, 'না, যাতনা তো পাইনি।'

কথা শেষ করতে পারি না। ও বলে ওঠে, 'কত মিথ্যে যে বলতে পারো। সেটাই বুঝি তোমার শক্তি। এ সময়ে মুখখানিকে এমন সুন্দর করে রাখো কেমন করে।'

কথার জবাব খুঁজি। জবাব খুঁজে পাবার আগেই, শুনতে পাই, 'বলেছিলাম কি না, কোথাও দুটিতে ঘুষটে মুষটে আছে।'

পিছন ফিরে দেখি, অচিনদা, রাধা লিলিসহ। অচিনদা ঝিনিকে হাতের ঘড়ি দেখিয়ে বলেন, 'আমাদের যে এবার ফিরতে হবে ভাই।'

ঝিনি বলে, 'চলুন। এই ভদ্রলোকের একটু তত্ত্বতল্লাস করছিলাম, কোথা থেকে কোথায় যাবেন।'

অচিনদা যেন ঝেঁজে বাজেন, 'ওর কথা ছাড়। ও আছে ওর নিজের তালে। আমাদের সঙ্গে ওর বনবে না। দেখছ না, উনি এখন বাউল বাবাজীদের দলে ভিড়েছেন। চলো চলো, আমরা ফিরি।'

ইতিমধ্যে দুই সখী, ঝিনির গায়ের কাছে দাঁড়ায়। রাধা ঝিনির একটা হাত ধরে। সবাই মিলে এগিয়ে যাই। গ্রামের বাইরে, গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াই। গোপী-দাসেরা হয়তো মন্দির চত্বরেই আছে। আমি গাড়ি থেকে আমার ঝোলাটা নিই। বাকীরা সব গাড়িতে উঠে বসে। সেখান থেকেই রাধা লিলি, কলকাতায় নিমন্ত্রণ করে। আর অচিনদা বলেন, 'শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর। ওকে আবার নেমন্তন্ন। দেখছ, আমি একটা কথাও বলছি না। বলবও না। আমি চিঠিও দেবো না, ওকেও দিতে বলব না।'

আমি বলে উঠি, 'অচিনদা, আপনার কাছে লখনৌয়ে যাবো।'

'এই দ্যাখ্, আমাকে পর্যন্ত মিথ্যে বলতে আরম্ভ করেছে। তবে তুই আমাকে ভোলাতে পারবি না।'

বলতে বলতেই, এঞ্জিনে গর্জন তোলেন। অচিনদার কথায় হাসতে যাই, হাসতে পারি না। ওঁর পাশে বসে ঝিনি। পিছনে দুই সখী। ঝিনি এক পলকের জন্যেও চোখ সরায় না।

হঠাৎ এঞ্জিনের শব্দ থেমে যায়। অচিনদা আমার দিকে চেয়ে, কোমল স্বরে বলে ওঠেন, 'সবটা মিথ্যে করিস না। সময় পেলে একবার আসিস।'

তারপরে ঝিনির কাঁধে হাত রেখে বলেন, 'এবার যাওয়া যাক কেমন।'

ঝিনি ঘাড় কাত করে সম্মতি জানায়। এঞ্জিন আবার গর্জন করে। গাড়ি ঘুরে যায়। ঝিনির মুখ আড়ালে পড়ে যায়। চকিতে দেখি, রাধার চোখের কোণে জল। লিলি হাত তোলে। ওরা যেন ওদের সখীর হয়ে বিদায় জানায়। এক রাশ ধুলোয় আমি ঢাকা পড়ে যাই। চোখ বুজে থাকি।

ধুলো সরে যায়। তবু আমার চোখ খুলতে একটু সময় লাগে। জগৎসংসারে,

আমিও কি জগৎজন নই? বন্ধুবিদায় কি আমাকেও একটু বাজে না? না বাজবে তো, সব মুখ ক'টি এমন করে চোখের সামনে ভাসে কেন?

এখন তো দেখি, পথ আমার সামনে। চলায় কোনো বাধা নেই। অথচ, পথ চলার পাওনায় ঝুলি আমার উপচানো। হৃদ্‌কলসী টলটলানো। এখন মনে হচ্ছে, অচিনদার চোখ দুটি যেন রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল। মুখখানিও তাই। বিদায়ের প্রথম পাটে কত ঝাঁজ, বিরাগ। শেষ মুহূর্তে গোপন সুধার পাত্র ফেটে গেল। প্রাণের ধারা গড়িয়ে এল। 'তুইতোকারি' তো অনেক শুনেছি। এমন মন-বীণাতে ঝঙ্কার তুলতে পারে কে? এমন সহজ স্বরে, ছোট কথায় ডাক দিতে পারে ক'জন? মুখখানি যতই মনে পড়ে, পাশে আর একটি মুখ কিছুতেই সরতে চায় না। সে মুখ আমার কল্পনায়। নাম তাঁর নীরজা। সব মিলিয়ে এক দুঃসহ যন্ত্রণা, যেন খুলতে গেলে লাগে, পরতে গেলে বাজে। ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে-জন আছে মাঝখানে। তারপরে শুধু একটি কথা জাগে, ওহে, মানুষ কী বিচিত্র! আমার প্রাণে নমস্কারের নতি। এই ভুঁয়েতে দাঁড়িয়ে বলি, সবার উপরে মানুষ বিচিত্র, তাহার উপরে নাই।...

সেই সঙ্গে মানবীর কথাও বলো। মানুষজগতে সে আলাদা কিছু না। রূপে রূপে মিলে যেমন অপরূপ, তেমনি এক রূপের ফের মাত্র। মিল-অমিলের একটা সে, তাইতেই ছন্দ। বিদায়ের পর মন এখন থিতু হয়েছে। তাই যেন মনে পড়ে যায়, গাড়ি ঘুরে যাবার মুহূর্তে, ঝিনির ঠোঁট দুটি একবার নড়ে উঠল। ও যেন বলল, 'আসি।'

এই মুহূর্তে আমার পথ চলার আর সংশয় নেই। কিন্তু নিঃসংশয়ে বুঝতে পারি, কোথায় যেন একটা কষ্টের কাঁটা বিঁধে রইল। চলার পথে খচ্‌খচ্‌ করে নানাভাবে সে জানান দেবে। কিন্তু তার চেয়ে বেশী, আমাকে ঘিরে যেন নানা ফুলের বর্ণবাহার, নানা গন্ধের মদিরতা। সেই সকলি একটি মেয়ের সহজ প্রকাশ। সেসব সকলিই তার কথা। তার হাসি, চোখের জল। হতাশা নৈরাশ্যের অন্ধকারে কেউ আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে যায়নি। রেখে গিয়েছে তার প্রাণের কুসুমকলি বিকশিত সমারোহে। কোথাও তার কাঁটা থাকবে, আশ্চর্য কী! তবু, কেবল খচখচানি না। বিচিত্রের পরম বিস্ময়, কী অপরূপ যেন সে রেখে গেল। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু' হাত আমার বুকে এসে ঠেকে। পুলকিত প্রণাম শুধু বিচিত্রকে না। পথ চলার প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতায়ও।

দেখলাম, একটি মন যখন দ্বিধাহীন সুরে বাজে, অন্য প্রাণে তার তাল লাগে। তাই চকিতে দেখেছি, রাধার চোখের জল। লিলির হাত তুলে বিদায় জানানো। এমন কি ঝিনির অনুমতি নিয়ে অচিনদার গাড়ি ঘুরিয়ে নেওয়া। মানুষ থাকে না বেশ-বাসে পোশাকে। তাই মনবিচিত্রার ভরা ডালি আমার প্রাণপুটে নিয়ে চলি এবার ভিন্ পথে।

'কী দ্যাখেন গ গোঁসাই?'

পাশ ফিরে দেখি বাউল-প্রকৃতি বিন্দু। ভুরু টেনে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখে আমার চোখের দিকে। বলি, 'ওঁরা সবাই চলে গেলেন!'

বিন্দু সনিশ্বাসে, প্রায় গানের সুরে বলে, 'সোমসারের কী গতি গ! সামনে থাইকলে নজরে পড়ে না। দূরে যেইলে মন টাটায়।'

যে যেমন বোঝে, তেমনি ভাষে। আমার কিছু বলার নেই। সে আবার বলে, 'যাবার সময় দেখা হলো না। তা না হক, আবার হবে, না কী বলেন বাবাজী?'

বিন্দুর তেমনি চোখের নিবিড়ে হাসির ঝিলিকখানি বাঁকা বাঁকা। লালপাড় গেরুয়া রঙের শাড়ির ঘোমটা ভেঙে পড়েছে রুক্ষু চুলের খোঁপায়। বাউল-প্রকৃতি

যেন রাগিণী। চন্ডীদাসের ভণিতায়, তার ধন্দ ধরানো গানের কথা মনে পড়ে যায়। সে কুলটা হবে, তবু কুল ছাড়বে না। এর মর্ম সঠিক বুঝি না। গেরুয়ায় ঢাকা, এই নিটুট অধরা যৌবন। বৈরাগিনী কোন্ সাধনে সাধে, তাও জানি না। আবার বলে, 'চলেন, যাই বাবাজী। এ-কূল গেল, ও-কূলে চলেন। সবাই সাতরানীর দীঘির ধারে আছে।'

সাতরানীর দীঘি আবার কোথায়? জিজ্ঞেস করবার আগেই প্রকৃতি হাত টেনে ধরে। দু-এক গ্রামবাসী একটু নজর ঘুরিয়ে দেখে। কিন্তু যার কারণে দেখা, সেই বিন্দুর কোনো খেয়াল নেই। সংকোচের বালাই যা তা আমার। জিজ্ঞেস করি, 'সাতরানীর দীঘি আবার কোথায়?'

'পাচ্চিমে। বাশুলীর মন্দিরের কাছ দিয়েই যাবো চলেন।'

হাত টেনে, পথ ধরিয়ে দিয়ে আবার হাত ছাড়ে বিন্দু। চলতে চলতে বলে, 'নলরাজার রাজ্যি ছিল ইখ্যানে। রাজা রানী দীঘি কেট্যাছিল, তার নাম সাতরানীর দীঘি।'

জিজ্ঞেস করি, 'সাতরানী কেন?'

'সাত রাজার সাতরানী। সাত রাজা রাজত্ব কইরেছিল যে, তা-ই। নল রাজাদের নাম শুনেন নাই ক্যানে?'

সে তো এক পৌরাণিক রাজারই নাম জানি, নলরাজা। রানী যাঁর দময়ন্তী। সে উপাখ্যানের সঙ্গে নানুরের কী সম্পর্ক তা জানি না, বলি, 'মহাভারতে নল রাজার কথা পড়েছি।'

বিন্দু ঘাড় দুলিয়ে বলে, 'তা কী জানি বাবাজী, ই নল রাজাটো সেই কিনা, জানি না। নলহাটির নাম শুইনেছেন ত?'

'তা শুনেছি।'

'অই, অই নল রাজাদের রাজ্যি ছিল। নান্নুরেও তাদের রাজ্যি ছিল। গোঁসাইবাবা সব জানে, বইলতে পারবে। রাজাদের অনেক গাড়ি ছিল ই গাঁয়ে। পখুরের নাম শুনেন নাই, নলগড়ে পখুর, তেলগড়ে, ফুলগড়ে, ঘিগড়ে। গড়ের নামে পখুর।'

বিন্দুর কথায়, আর এক নানুরের কথা শুনি। মনে মনে অবাকও মানি। গেরুয়া-ধারিণী এক বাউল-প্রকৃতি কেমন ইতিহাসের খবর দেয়। এমন বলতে পারবে না যে, দেশপরিচয়ের খবর রাখি না। কিন্তু বিন্দুকে একটু অন্যমনস্ক লাগে। পথ চলতে, গৃহস্থের ঘরের এদিকে ওদিকে ইতিউতি চায়। উৎকর্ণ হয়ে, যেন কিছু শুনতে চায়। আমার পাশে পাশে চলে। চোখাচোখি হলে হাসে।

একবার জিজ্ঞেস করি, 'হাসছেন কেন?'

বিন্দু খিলখিলিয়ে হেসে মরে। শরীরে বাঁক লেগে যায়। কী এমন কথা বলেছি যে, এত হাসি। অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। বিন্দু হাসি সামলে বলে, 'বাবাজীর তনজ্ঞান নাই দেখি। "আপনি" বইলছেন কী গ?'

তা বটে। কিন্তু এক কথাতেই তুমি বলতে এ জিভের আড় ভাঙে না। ঘর পরিবেশের একটা টান আছে তো! বিন্দু আবার বলে, 'হাসি না, বাবাজীকে

আমাকে দেখার কী আছে, কে জানে। বিন্দু আবার তেমনি চোখেই চায়। আমার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে চেয়ে মুখখানি এগিয়ে নিয়ে আসে। নিচুস্বরে বলে, 'দেখি বাবাজী পাষাণ, নাকি মাকড়া পাথর।' সে আবার কী! পাষাণ বা কী, মাকড়া পাথর বা কী, আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? এদের সকলের সব কথাতেই হেঁয়ালি। বলি, 'বুঝলাম না।'

বিন্দু আবার হাসে। প্রকৃতি তার শরীরের অধরা তরঙ্গে আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে

যায়। বলে, 'বাবাজীর মনের কথা বইলছি। জানেন ত বাবাজী, পুন্নিমেতেও অমাবস্যা হয়। পাষাণও গলে। ঝিন্‌দিদির লেগে কি মন পুইড়ছে না একটু?'

কথা কত ধারায় বহে। ঘুরে ফিরে সেই ঝিনির প্রসঙ্গ। কথার ধরনে বুঝতে পারিনি। বলি, 'পোড়াপুড়ির কী আছে!'

বিন্দু ঘাড় কাত করে বলে, 'নাই বাবাজী? তবে যে একজনকে পুইড়তে দেখলাম. সিটো কি কিছু না?'

গম্ভীর হয়ে বলি, 'সংসারে চলতে গেলে তার নিয়মে চলতে হয়।'

বিন্দুর হাসিতেও এবার গাম্ভীর্য দেখা দেয়। বলে, 'আই গ বাবাজী, মন ছাড়া কি সোম্‌সার! সোম্‌সারখানা কি সোম্‌সার ছাড়া! যে সোম্‌সারে ঝিন্‌দিদির মতন মানুষ নাই, তা আমার কেমন সোম্‌সার!'

দেখি, বলতে বলতে, বিন্দুর স্বর বদলে যায়। তার নিশ্বাস পড়ে। কপালে হাত ছোঁয়ায়। কার উদ্দেশে, কে জানে। তারপরে হঠাৎ আমার একটা হাত টেনে ধরে। বলে, 'আমার একটা কথা রাখবেন বাবাজী?'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কী কথা?'

'আবার যদি কুন দিন ঝিন্‌দিদির দেখা পান, তাকে কাঁদাবেন না। হেনস্থা কইরবেন না।'

যাকে কাঁদাতে চাইনি. হেনস্থা করতে চাইনি. তার সম্পর্কে কী কথা দেবো। তবু কথা বাড়াতে চাই না, বলি, 'তাই হবে।'

বিন্দু বলে, 'সোম্‌সারে কত রকমের পাপ আছে। আপনি ক্যানে পাপের ভাগ নিবেন। ধম্মে থাইকবেন বাবাজী, কথা রাইখবেন।' বলে বিন্দু আমার হাতে একটু চাপ দেয়। বড় বড় কালো চোখ দুটো মেলে আমার চোখের দিকে চেয়ে হাসে। লাজানো হাসি না। যেন কী ইশারা দেয়, কালো মণির ঝিলিকে।

বিন্দুর সঙ্গে আমার তর্কের কিছু নেই। সে যে জগৎ থেকে কথা বলে, তার ঠিকানা আমি জানি না। তার পাপ পুণ্য ধর্মবোধের থেকে আমি থাকি অনেক দূরে। আমার চারপাশের বিধিনিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে সেই পুণ্যের সীমায় যেতে আমার বাধা। অন্ধকারের ভয় আমাকে দূরে সরিয়ে রাখে। অন্য পথে চালায়।

বিন্দু আমার হাত ছেড়ে দেয়। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে আপন মনেই বলে ওঠে, 'আমার গোঁসাইয়ের গান কুথাও শুনি না।'

গোকুলের কথা বলে বিন্দু। তাই কি সে এত উৎকর্ণ, এত ইতিউতি চাওয়া! আমি তার দিকে তাকাই। সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'দেইখেছেন নাকি?'

বলি. 'গোকুলদাসকে? না তো।'

বিন্দু হেসে ঘাড় দোলায়। বলে, 'কী জানি, কুথা যেইয়ে বইসে আছে। অনেকক্ষণ দেখি না।'

বিন্দুর হাসিতে আর ঘাড় দোলানিতে সব মেটে না। কোথায় যেন চোখের বালির মতন একটু মন করকরিয়ে যায়। কোথায় যেন একটু বেসুরের ধন্দ লেগে যায়। বিন্দু কি গোকুলকে খুঁজতে বেরিয়েছে? সে মানুষটি গেল কোথায়? বিন্দুর দিক থেকে আমার চোখ সরে না। ভাবি, এতক্ষণে আপন গোঁসাইয়ের খোঁজ! পাষাণ কেবল আমি. এ প্রকৃতি-পাষাণ ঠাকরুন কী পাষাণী নয়?

বিন্দু আমার দিকে চেয়ে আবার হেসে বাজে। জিজ্ঞেস করি, 'গোঁসাই হারিয়ে গেল নাকি?'

বিন্দু বলে, 'হারাবার লয়। তবে গোঁসাই আমার ক্ষ্যাপা গোঁসাই ত! মন কইর্‌ল ত, একতারাখানা নিয়ে হাঁটা দিলো।'

'তা হলে কী হবে?'

'খুঁইজে লিব। যাবে কুথা, আমার গোঁসাই না?'

গরবিনী ঘাড় কাত করে ভুরু টেনে হাসে। আমি ছাড়ি না, জিজ্ঞেস করি, কিন্তু না বলে যাবে কেন?'

বিন্দু ঠোঁট টিপে হেসে, চোখে ঝিলিক হানে। বলে, 'মন যাওয়ায় আবার মন ফেরায়।'

বলতে বলতে আমরা গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমায় আসি। দীঘির ধারে গা, দেখি প্রাচীন এক ছড়ানো ভগ্নস্তূপের মধ্যে গাছতলাতে গোপীদাস আর রাধা বসে। আমাকে দেখে গোপীদাস ডেকে ওঠে, 'এইস বাবাজী। অচিনবাবু আর দিদিমণিরা চইলে গেছে?'

জবাব দেয় বিন্দু, 'হিঁ গ বাবা, যেইয়ে দেখি, চিতেবাবাজী পথের দিকে চেইয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইয়েছেন।'

'অই হে, জয় গুরু। মন বইলে না কথা!'

আমার দৃষ্টি তখন চারদিকের ধ্বংসস্তূপের দিকে। আস্ত কিছুই নেই, কালের দাগে দাগানো, বিবর্ণ ভাঙা ইঁটের ছড়াছড়ি। হেথা হোথা ভিতের দাগ, প্রসাদের চিহ্ন। কোথাও ভাঙা স্তূপ ঢেকে দূর্বা গজিয়েছে। নল রাজার প্রাসাদ। আমাকে দেখতে দেখে গোপীদাস রাজবার্তা শোনায়। তার থেকে বুঝতে পারি, নল রাজার বংশ বীরভূমে কোনো এককালে রাজত্ব করেছিলেন। সময়ের হিসাব সে দিতে পারে না। কিন্তু নলহাটিতে আর সন্ধিগড়া বাজারেও রাজাদের অনেক পুরনো চিহ্ন আছে।

জানি না, কোন্ সে রাজবংশ। কোথা থেকে তাদের আগমন। নাম শুনে মনে হয় হিন্দু। আর এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যেন জেগে উঠতে দেখি বিশাল রাজপ্রাসাদ, লোকলস্কর। তার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, গড়প্রাকারে প্রহরী। সকালে সন্ধ্যায় বাদ্য সঙ্গীত, দুন্দুভি বাজে। প্রহরে প্রহরে বাজে ঘণ্টা। পূজা, উৎসব, আলো, নৃত্যগীত। অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠনময়ীর আয়ত চোখে হাসি, বাজে কিঙ্কিনী। সাত রাজা সাত রানী, চিহ্ন তার রেখে চলে যায়। তারপরে, আর এক উৎসবের ঘণ্টা বাজে বাশুলীর মন্দিরে। নানুরের ইতিহাসে, নতুন পায়ের ধ্বনি বেজে ওঠে। কবির পায়ের ধ্বনি। মৃদঙ্গ বেজে ওঠে। রজকিনীর হাতে বুঝি প্রেমজুরি বাজে, দুহুঁক স্বরে ওঠে গান, পিরীতি আখর তিন।

এখন স্মৃতি কেবল ধ্বংসস্তূপে, গ্রামের পথের ধুলায়, নিঃশব্দ নিঝুম ঝিঁঝি-ডাকা গ্রাম নানুর। পতঙ্গের নিরন্তর ডাকে, এ-কালের যাত্রী আমরা, কান পেতে শুনি এক দুর্বোধ্য বাণী। অর্থ বুঝি না, তবু যেন কী এক অর্থময় রহস্যেই পতঙ্গের পাখা বেজে চলে।

গোপীদাসের গলা শুনে ফিরি। দেখি, এক দিক থেকে সুজন আসে একলা। গোপীদাস জিজ্ঞেস করে, 'কুথাও দেখতে পেইলে না?'

সুজন ঘাড় নাড়ে। গোপীদাস রাধার দিকে চেয়ে মাথা দুলিয়ে একটু হাসে। বিন্দুকে জিজ্ঞেস করে, 'কী কইরবি গ বিটি?'

বিন্দু তার গেরুয়া রঙের ঝোলা হাতড়াতে হাতড়াতে বলে, 'তোমরা যা কইরবে, তাই কইরব। তবে আমি বলি সে চলে গেইছে।'

'কুথা?'

'আখড়ায়।'

বিন্দু কথা বলে, বিন্দু কারুর দিকে চায় না। গোপীদাস আর রাধা আবার চোখাচোখি করে। এই সময়ে বিন্দু হঠাৎ সুজনের দিকে চায়। চেয়ে হাসে। বলে, 'লাও, ঝোলাটোলা লিয়ে রওনা দিই।'

সুজন যেন একটু চিন্তিত। তবু হেসে মিনতি করে বলে, 'বলছিলাম কি, আমি এবার ফিরি।'

গোপীদাস জিজ্ঞেস করে, 'কুথা যাবে?'

'বোলপুর হয়ে ঘুরে ফিরে তোমার কাছে যাবো।'

বিন্দু ঘাড় কাত করে, অপাঙ্গে চেয়ে বলে, 'ইস্! কে যেতে দিচেছ! তুমি যাবে আমাদিগের আখড়ায়, মনে নাই? তুমি আমার সাথে।'

সুজনের তবু দোমনা। সে কেবলই বিন্দুর চোখের দিকে চায়। বিন্দু কিন্তু হাসে। যেমন করে আগে হেসেছে, এখন তেমনি গলায় ঢেউ দিয়ে আবার বলে, 'গোঁসাই তুমাকে নিমন্তন্ন কইরেছে। তুমি না আমাদিগের অতিথি!'

সুজনের গলায় দোতারা ঠিক ঝোলানো আছে। তারের গায়ে আঙুল দিয়ে টং টং শব্দ তোলে। বলে, 'তা ঠিক কথা বটে। তবে গোঁসাই নিজেই চলে গেল।'

বিন্দু বলে, 'তা যাক গা না, আমাকে ত রেইখে গেইছে। আমার সাথে যাবে।'

গোপীদাস কী বোঝে কে জানে। সে সুজনের দিকে চেয়ে বলে, 'হুঁ হুঁ, বিন্দু যা বইলছে, তাই করো বাবা।'

এমন সময়ে বিন্দু ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে চায়। চেয়ে হাসে। গোপীদাসকে বলে, 'চিতেবাবাজীকে কী বইলবে, বলো।'

গোপীদাসের যেন হঠাৎ খেয়াল হয়। তাড়াতাড়ি আমার দিকে ফিরে বলে, 'অই অই, ভুলে যেইছি গ। শুন বাবাজী, হেথাতেই চালে ডালে ফুটিয়ে খেয়ে লিবে, নাকি অন্য কিছু খাবে? বেলা তো হলো মেলা।'

আমার কোনোটাতেই আপত্তি নেই। কিন্তু কোথা থেকে কোথায়, কীভাবে যাচিছ, সেটা জানা দরকার। আমার গন্তব্য বক্রেশর। যানবাহন কোথায় কেমন, কিছু জানি না। জানবার চেষ্টাও করিনি। গোপীদাস্ বলেছে, বক্রেশ্বরে পৌঁছানোর দায় তার। বলি, 'যা সুবিধে তাই হোক। যাওয়া হবে কীভাবে, কখন গাড়ি, কিছুই তো জানি না।'

গোপীদাস বলে, 'অই তাইতেই বলছিলাম বাবাজী, সময় বিশেষ হাতে নাই। ইথ্যান থেকে মোটরগাড়িতে যাবো লাভপুর। লাভপুর থেকে কাটোয়া আদমপুরের রেল ধইরে যাবো আদমপুর। তা তো ছোট রেলগাড়ি। আদমপুর থেকে বড় গাড়ি ধইরে যেতে নাগবে সাঁইথে। তুমি তো চিতেবাবাজী বুঝ সবই, পথ বড় ঘুরপাক।'

বলে একবার দাড়ি কাঁপিয়ে চোখ ঘুরায়, 'তা'পরেতে সাঁইথে থেকে আবার গাড়ি বদল কইরে শিউড়ি যেতে হবে। সিথ্যান থেকে মোটর কইরে বক্রেশ্বর। তা বাবাজী, ধর ধর কইরে, এখন রওনা দিয়ে, আজ রাত্রে শিউড়িতক যাওয়া যাবে।'

আমি ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'বক্রেশ্বর যাবো কখন?'

'কাল সক্কালবেলাতেই যেতে পারবে।'

'রাত্রে থাকব কোথায়?'

যেন কত হাসির কথাই বলেছি, এমনিভাবেই সবাই হেসে ওঠে। বিন্দুর হাসিটাই সব থেকে চড়া। গোপীদাস বলে, 'চিতেবাবাজী, তুমাকে কি চিনি না? থাকবার জায়গার লেগে তুমার ভাবনা? তুমি পথেঘাটে ঘোরা মানুষ।'

বলি, 'কিন্তু, জায়গাটা তো চেনা না।'

বিন্দু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে ঝোলাটা কাঁধে ফেলে, আমার কাছে আসে। বলে, 'গেলেই চেনা হইয়ে যাবে। কিছু না থাক, গোকুল বিন্দুর আখড়া তো আছে।'

এতক্ষণে জানা গেল, গোকুল বিন্দুর আখড়া আছে শিউড়িতে। বিন্দু আবার বলে, 'চিতেবাবাজীরও আজ আমাদিগের আখড়ায় নিমন্তন্ন।'

বলে হাত টেনে ধরে, 'চলেন চলেন, আর দেরি না।'

গোপীদাসও উঠে পড়ে বলে, 'হুঁ হুঁ, রওনা হওয়া যাক। চলো গ রাধা।'

চলতে চলতেই রাধা জিজ্ঞেস করে, 'আর হেরুক কবে যাবে?'

গোপীদাস বলে, 'যাবো গ যাবো, চিতেবাবাজীর সাথে, বক্রেশ্বর ঘুইরে এইসেই, হেরুকে যাবো।'

হেরুক নামের সঙ্গে যেন বৌদ্ধজগতের গাঁটছড়া বাঁধা। হেরুক বজ্রের কথা কোন্ বৌদ্ধ শাখায় মেলে। তার সঙ্গে কি গ্রামের নামের কোনো যোগসূত্র আছে? জিজ্ঞেস করি, 'হেরুক কোথায়।'

গোপীদাস জানায়, 'আমাদিগের আখড়া বাবাজী। গদাধরপুর থেকে লেইমে যাওয়া যায়, সাঁইথে থেকেও যাওয়া যায়। শিউড়ি থেকে মটরে করেই চইলে যাবো। দ্বারকা লদীর নাম শুইনেছ বাবাজী?'

শুনেছি বলে মনে হয়, কিন্তু স্মরণ করতে পারি না। এক দ্বারকার কথাই জানি, মথুরা বৃন্দাবনের সঙ্গে যার চিন্ পরিচয়। নদীর কথা মনে নেই, অকপটেই বলি, 'না।'

'অই গ বাবাজী, তুমি ক্যানে জাইনবা না। বড় লদী, বাঁকুড়া তক চইলে গেইছে। দ্ব্যরকার ধারে হেরুক।'

দ্বারকার ধারে হেরুক। কানে বাজে যেন, কত দূর কালের এক ভূগোল পরিচয়ের মতো। চুপ করে থাকি। মনে মনে ভাবি, কতটুকু জানি এই বঙ্গদেশ। রঙ্গ করতেই আধখানার ওপরে পাঁচিল উঠে গিয়েছে। বাকীটুকুর সীমায় জলস্থলের কত বৈচিত্র্য, কত বিচিত্র মানুষ, এই পথ চলাতে তার কতটুকু মেলে! বাঁধানো সড়ক ভেঙে চলে যাই। পরশপাথরের মতো, ক্ষ্যাপার সকল খোঁজা কোথায় হয়তো পড়ে থাকবে, জানতেও পারি না। কত দ্বারকার তীরে কতই হেরুক। কত না জানি কালের চিহ্ন নিয়ে, কোনো এক বনস্থলীর টলটলে জলাশয়ে আপনার প্রতিবিম্ব দেখে। কিছুই জানতে পারি না।

তবু মানুষ নিশ্চল না, চলে নিরন্তরে, পথে জনপদে। দ্বারকা তীরের, হেরুকের মানুষের সঙ্গে চলি। এই যে তার সঙ্গ পাই, গান কথা শুনি, এই আমার হেরুক পরিচয়। আমার এই দেখাতেই, সব দেখা। মানুষের মাঝেই, দেশকালের পরিচয়।

বিন্দু তখনো আমার পাশে পাশেই। তার পিছে পিছে সুজন। দোতারার তারে তার অন্যমনস্ক টং টং চলেছে।

বিন্দু জিজ্ঞেস করে, 'হেরুক যাবেন নাকি বাবাজী?'

বলি, 'যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এ যাত্রায় হবে না।'

গ্রামের বাইরে এসে পথের মোড়ে চিঁড়ে মুড়কির বিপণি। গোপীদাস সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই, তার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। বলি, 'ওটি হবে না। কতখানি কী কিনতে হবে বলুন, নিয়ে নিচ্ছি।'

'অই অই, চিতেবাবাজীর কথা শুন গ তোরা। তা বেশ লাও, কিন্তুক ক্যানে বাবাজী, যাবৎ খরচ তুমি ক্যানে কইরবে?'

বলি, 'সেই যে বললেন, তত্ত্ব বোঝাবেন। না-হয় গুরুসেবাই করি।'

ঠাট্টা করে বলে কি না জানি না। গোপীদাস সহসা ধুলো আলখাল্লাসহ জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, 'জয়গুরু জয়গুরু, এমন কথা বইল না গ চিতেবাবাজী, কেঁদে মইরে যাবো।'

বলতে বলতেই দেখি, তার চোখ রক্তাভ, জল উপচে পড়ে। হঠাৎ কথা বলতে পারি না। গোপীদাসের আলিঙ্গনে চুপ করে থাকি। ধর্মাধর্মের আবেগ বুঝি না।

কিন্তু, কেমন এক প্রেম-স্নেহের ধারায় যেন, আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সুখে দুঃখে মেশানো এক বোধে, নিশ্চল হয়ে থাকি। নিজেকে নিজে মনে মনে বলি, 'যদি কিছু ঠাট্টা করে বলে থাকি, তবে অপরাধ, বড় অপরাধ।'

গোপীদাস নিজেকে নিজেই সামলায়। বলে, 'লাও বাবাজী, লাও। চিঁড়ে মুড়কি মিশুয়ে, বাতাসার টাকনা দিয়ে, যেতে যেতে খাওয়া যাবে।'

দোকানীকে সে নিজেই পরিমাণ বলে দেয়। মাপজোক শেষ হতে না-হতেই মোটর বাস এসে পড়ে। হাত তুলে চেঁচিয়ে যন্ত্র-ঘোড়াকে থামিয়ে রাখতে হয়। গাড়িতে জায়গা পাবে, সে আশা কম। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে যেতে হয়। তারপরে, যার যেখানে জায়গা মেলে, সে সেখানেই বসে। বিন্দু আর সুজন পাশাপাশি জায়গা পায়। সেখান থেকে উঠে বিন্দু আমার জামার কোঁচড়ে চিঁড়ে মুড়কি দিয়ে যায়। চোখাচোখি হলে হাসে। একটু দূরে হলেও বুঝতে পারি, সুজনের কানের কাছে সে কী যেন সুর দিয়ে গুন গুন করে। সুজন বাউল পাগড়ি ঝুঁকিয়ে নিষ্পলক চেয়ে থাকে।

তবু, যদি ঠিক দেখে থাকি, বিন্দুর হাসির ঝিলিকে, কোথায় যেন মেঘ থম্‌থম্‌ ছায়া। ঠোঁটের কোণের চকিত চমকে, থেকে থেকে যেন কেমন এক বিষাদ আড়ষ্টতা।

লাভপুরে পৌঁছেও, সময় বিশেষ হাতে থাকে না। ছুটোছুটি করেই টিকেট কাটতে হয়। তখন বেলা শেষে, বাতি জ্বলে উঠেছে। কয়লার ধোঁয়া উড়িয়ে, ছোট গাড়িটি যখন এসে দাঁড়ায়, তখন একটু সৌভাগ্য, গাড়ি ভরাভরতি ঠাসাঠাসিতে কলরবে জমজমাট না।

গাড়ির কামরায় বাতি নেই বললে চলে। এক কোণে একটি বাতি টিমটিম করে। তাতে অসুবিধা নেই। পাশাপাশি জায়গা মেলে। কিন্তু বিন্দুর কোনো কথা শুনি না। অথচ সে আমার পাশে বসে। আলস্যে হেলানো শরীর, মুখ কাত করে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। মাথায় ঘোমটা নেই। রুক্ষু খোঁপাটা আধ-ভাঙা বিস্রস্ত। তার মুখের এক পাশে টিমটিমে আলো। অস্পষ্ট মুখের কিছুই দেখতে পাই না। কেবল মনে হয়, ভিতর বাহিরের অন্ধকারে সে যেন নিজেকে মিশিয়ে রেখেছে।

চুপ করে থাকতে পারি না। গাড়ির শব্দের সুযোগ নিয়ে, তার কানের কাছে জিজ্ঞেস করি, 'গোঁসাইয়ের জন্য মন কেমন করছে?'

বিন্দু চমকে তাকায়। চকিত হেসে, তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে দেয়। সেও গাড়ির শব্দে গলা ডুবিয়ে বলে, 'মানুষ তো বাবাজী!'

কথাটা যেন ঠিক বুঝতে পারি না, তাই চেয়ে থাকি। বিন্দু আবার বলে, 'মন কেমন না করলে কি তত্ত্ব সাধা যায়! মানুষের সব কিছু থাকে। মন বড় অধৈর্য হয়েছে আমার।'

বলে, আবার তেমনি করেই, ঘাড় কাত করে পেতে দেয় জানালায়। আমি যেন আর সেই গেরুয়াধারিণী বাউল-প্রকৃতিটিকে চিনতে পারি না। আমি দেখি, বিরহ বিবশ রাই, দহনে না যায়। সব মিলিয়ে, এ যেন এক গৃহস্থ প্রেমিকা বধূ, ঘোমটা টেনে দেয়, নিশ্বাসে ভারী হয়ে থাকে।

আদমপুর থেকে সাঁইথিয়াতে গাড়ি বদলে শিউড়িতে নামি, তখন এই শহরটি নিঝুম।

শীতের রাত্রি, যাত্রী অল্প। তবু তিন চাকার রিকশাওয়ালারা যাত্রী খুঁজতে আসে। গোপীদাস ডাক দিয়ে নিয়ে যায়, শহরের উল্টোদিকে, রেল লাইনের অন্য পারে। রিকশায় উঠতে হয় না, সবাই হেঁটে যায়। সকলের আগে এবার বিন্দু। আমার মনে পড়ে যায়, বিন্দুর বিশ্বাস, গোকুলদাস আখড়াতেই ফিরে এসেছে।

এসেছে তো? এই ব্যাকুল উৎকণ্ঠা আমার। বিন্দুর মনে কী ঘটছে কে জানে।

আমাদের সকলের পিছনে সুজন।

খানিক দূর এসেই, গুটিকয় গাছ। দুই চারি নিঝুম কুটির, কোথাও সাড়াশব্দ, বাতি নেই। তারই পাশ দিয়ে গিয়ে মাটির দেওয়ালের সীমানা। দরজা খোলা, উঠোন অন্ধকার। কোথাও আলো নেই।

বিন্দু আগে গিয়ে ঢোকে। দূর থেকেও বুঝতে পারি, সে উঠোনের মাঝখানে থমকে দাঁড়ায়। তার গলায় একবার উচ্চারিত হয়, 'নিতাই আছ?'

একটু পরেই, খুট করে কোথায় যেন শব্দ পাই। একটা বাতি এগিয়ে আসে উঠোনে। তারপরেই দেখি, বাতি হাতে স্বয়ং গোকুলদাস। সে একবার বিন্দুর দিকে তাকায়। তাড়াতাড়ি বাতিটা এক পাশে রেখে, হঠাৎ একেবারে বিন্দুর পায়ের কাছে নিচু হয়ে বসে।

গোপীদাস বলে ওঠে, 'জয়গুরু, জয়গুরু!'

ততক্ষণে বিন্দুও নত হয়ে, মাটিতে বসে, গোকুলের পায়ে হাত রাখে। কাছে যেতে যেতে দেখি দু'জনের চোখেই জল। আমাদের সাড়া পেয়েই, গোকুল চোখ তোলে। কাকে যেন খোঁজে। তাড়াতাড়ি উঠে সুজনের কাছে ছুটে যায়। বিন্দুর মতো, তারও পায়ে হাত দেয়। সুজন গোকুলকে দু' হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে।

গোপীদাস ভাঙা ভাঙা গলায়, আবার বাজে, 'জয়গুরু, জয়গুরু!'

আমি কী দেখি, কী বুঝি, কিছুই জানি না। আমি কোন্ কালের সীমানায়, কোন্ মানুষদের কাছে দাঁড়িয়ে, বুঝতে পারি না। কেবল আমার বুকের কাছে যেন কী এক প্রস্রবণের উথালি-পাথালি। বুকের কাছে হাত রেখে, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। আমার কানে বাজতে থাকে শুধু, হাসি-কান্নার এক অস্পষ্ট, শ্বাস-প্রশ্বাসের আবেগমন্থিত ধ্বনি।

বাউল বলো বৈষ্ণব বলো, সকলই মানব-মানবী লীলা। এই আলো-আঁধারি উঠোনে সকলের ছায়ায় হারিয়ে আমি একলা একলা তা-ই দেখি। থাকি নির্বাক স্তব্ধ, কিন্তু আমার ভিতরেও হাসিকান্নার দোলা লেগে যায়। তার সঙ্গে পরম বিস্ময়ে এক ভুলভঞ্জনের, অপরাধভঞ্জনের, মানুষলীলার অরূপসায়রে যেন ডুবে যায়। সেই যে আমার মনে একসময়ে প্রশ্ন জেগেছিল, সুজন বিন্দুর রঙবিচ্ছুরিত হাসাহাসি চোখাচোখি দেখে সেই কথা মনে পড়ে যায়। ভেবেছিলাম, গোকুল বিন্দু না-ই বা হলো ঘর-করণের স্বামী-স্ত্রী। সাধন সাধবার পুরুষ-প্রকৃতি তো। গোকুলের প্রাণে কোথাও কি আঁধার ঘনায় না! মনের কোথাও কি যাতনা বেঁধে না!

এখন চোখ ভরে দেখ, শ্রবণ ভরে শোনো, সেই জবাবের ছবি ও কথন। গায়েতে আলখাল্লা, মাথায় চুড়ো করে বাঁধা চুলে পাগড়ি, হাতেতে একতারা, এই মানুষেও সেই মানুষেরই খেলা। এই মানুষেও সেই মানুষেরই ব্যথা বেজেছে। সেই 'হারাই হারাই সদা ভয় হয়, হারাইয়া ফিরি চকিতে।'...ব্যথায় উদাস প্রাণের বলগায় ঢিল পড়ে যায়। এই মানুষকেই হারাবার হাহাকার সঙ্গছাড়া করে, নিঃসঙ্গের কান্নায় নিয়ে যায়। ভেক দাও, ভেল্‌কি দাও, মানুষ সেই মানুষ। সেই তার সব থেকে বড় চেনাচিনি।

আমার চোখ যদি ভিজে থাকে, তার চেয়ে খুশি বাজে বেশী। পরম বিস্ময়ে আমার নমস্কারে নতি অন্য কারণে। সে কারণ শুধু মানুষ পরিচয়ের সুখে নয়। মানবমহত্ত্বের বিস্ময়ে। ভাবি, প্রাণধর্মের এত সাহস, এমন সহজ মন কোথা থেকে পেয়েছে গোকুল বিন্দুরা। ঈর্ষা যেখানে ব্যথা হয়ে বাজে, ব্যথা যেখানে হীনমন্যতার অন্ধকারে বাঁধা পড়ে না, নিঃসঙ্গ মানুষটিকে একলা ছুটিয়ে দেয়, যেন ত্যাগেতেই প্রেম জাগায়। একবারও তো ওদের মুখে অন্ধকারের কালি দেখিনি। কথার ঘৃণায় অপমান করতে দেখিনি। বিতৃষ্ণায় বিরাগে রাগে একবারও তো হাসাহাসি দেখিনি। অথচ প্রাণের

এক জায়গায় বিঁধেছিল ঠিক। সেই তীরবেঁধা পাখি একবারও কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেনি। কখন নিঃশব্দে বুকের পালকে রক্ত চাপা দিয়ে চলে এসেছিল আপন ঝোপের কোটরে।

কিন্তু পক্ষিণীর প্রাণে বেজেছিল ঠিক। তাই দেখেছিলাম তার বিজলী চোখের ওপারে মেঘের ছায়া। তার হাসির তরঙ্গে উদাসিনীর বিষাদ। শুধু সে-ই জানত, তাই বলেছিল, 'সে আখড়ায় চলে গেছে।'

তারপরে দেখ, প্রাণের সাহস কত! কী সহজ আবেগে বাজে। আপন ভুল-ভঞ্জনের দায়ে মনের কলুষ যত, সকলই প্রকৃতির পায়ে ঢেলে দেয়। সুজনকে বুকে আগলে ধরে। কথা কিছু বলে না, ঘন নিশ্বাসে আর হাসি-কান্নায় বাজে। আমি যেন শুনতে পাই, 'আমার প্রাণের অন্ধকার ঘুচাও, ক্ষমা করো। আমি অতি হীন। তোমাদের পায়ে রাখো। আমার দীনতা ঘুচাও।'...

কিন্তু অন্ধকার, দীনতা, হীনতা গোকুলের একলার নয়। বিন্দু আর সুজনও যেন সেই সুরেই বাজে। ব্যথা দিয়েছে তাই ব্যথা বাজে। তাদেরও যেন সেই কথা, 'ক্ষমা করো, ক্ষমা করো।'...

আমি তা-ই দেখি। আমি ভুল-ভঞ্জনের সহজ লীলা দেখি। আমি এসে দাঁড়িয়েছি যেন এক অপরাধভঞ্জনের পাটে। এখন গোকুলের এক হাতের আলিঙ্গনে বিন্দু। আর হাতে সুজন। গোপীদাসের ঘড়ঘড়ে গলায় খুশির গোঙানি। তার সঙ্গে এক কথা, 'জয় গুরু, জয় গুরু!'

আমি বলি, 'জয় মানুষ, জয় মানুষ!' দেখ দেখি কোথা থেকে কোথায় এলাম। সেখানে এসে কী দেখি। কী অপরূপ! আমি যেন, এমনি করে চলতে পারি, এমনি করে দেখতে পাই, আর পাওনা নিয়ে চলে যাই। পথ চলাতে এই আমার পরম পাওয়া যেন। আমি তীর্থ অতীর্থ জানি না। মন্ত্রতন্ত্র সাধনপূজন সন্ন্যাস-বৈরাগ্য, কিছু আমার নেই। কিসের সন্ধানে ফিরি তাও জানি না। তবু যেন সব ভরে ওঠে।

উঠোনের অন্ধকার থেকে আরো দু'জনের আবির্ভাব হয়। দেখি, বয়স্ক এক কালো পুরুষ। শক্ত সমর্থ বটে, গায়ে একখানি মোটা জোড়াতালি কাপড় জড়ানো। চুল দাড়ি উসকোখুসকো। আর একজন এসে দাঁড়ায়। বছর তেরো চোদ্দর মেয়ে, সেইরকম আমার অনুমান। এমনি একটা সাধারণ শাড়িতে জড়ানো শ্যামাঙ্গিনী বালা। ডাগর চোখের বিস্ময়ে এখনো ঘুম জড়ানো। কিশোরীর মাথায় সিঁদুর আছে কিনা ঠাহর করতে পারি না। তবে শীতে যে সে কাতর, বোঝা যায়, শাড়ির আঁচল দিয়ে নাক অবধি ঢাকা দেওয়া দেখে।

গোপীদাসের বুঝি আচমকা ধ্যান ভাঙে। তাড়াতাড়ি এ পাশে ও পাশে চেয়ে পিছন ফিরে আমার কাঁধে হাত রাখে। বলে, 'তা-ই বলি, বাবাজী কুথা গেল।'

বলে তার আলখাল্লা-জড়ানো বুকের একটু কাছে টেনে নেয়। ছোটখাটো মানুষটি তো না। দশাসই গোপীদাস আমার থেকে লম্বা। এমন আজানুলম্বিত বাহু, এমন খাড়া নাক, টানা চোখের ফাঁদ ক'জনের থাকে। মুখ নিচু করে সে আমার মুখের দিকে চায়। চোখের দিকে চায়। তারপরে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে নিঃশব্দে হাসে। বলে, 'বাবাজী, ই দ্যাখ, দেইখছ তো, সাধন কেবল তত্ত্বে হয় না।'

তারপরেই সুর করে গায়,

'অনুরাগ না থাইকলে কি সাধন সাধা যায়?
অনুরাগেই পিরীত মধুর,
রাগের কারণ হয়।'...

গেয়ে আবার বলে, 'দুঃখে বাড়ে অনুরাগ। অনুরাগে প্রেম। তবে সহজ ভজন

বুইঝলে ত বাবাজী।'

সাধন ভজন জানি না। জানি শুধু বেশেবাসে, সম্প্রদায়ে, মন্ত্রে তন্ত্রে মানুষের চিন্ পরিচয় না। মানুষের পরিচয় নিতান্ত মনুষ্যত্বে। সেইখানেই যত আবিস্কারের বিস্ময়, রঙ ছড়াছড়ি। আমি সুখে বিস্ময়ে তা-ই দেখি। তত্ত্বের মূল দেখি।

ইতিমধ্যে বিন্দু যেন ত্রস্ত চকিতে বেজে ওঠে, 'আই গ গোঁসাই, চিতেবাবাজীও যে আজ আমাদিগের অতিথি। ওয়াঁকে যে আমি ডেইকে লিয়ে এসেছি।'

বলতে বলতে গোকুলের আলিঙ্গন ছাড়িয়ে সে আমার কাছে আসে। তার আগে গোকুল ছুটে এসে আমার হাত ধরে। বলে, 'ই দ্যাখ ক্যানে, বইলতে লাগে, চিতেবাবাজী এসেছে। আসেন বাবাজী, আসেন, কী ভাগ্যি গ বিন্দু আমাদিগের।'

শহর-নগরের হিসাব খতানো মানুষ আমি। তবু আমারও যেন ইচ্ছা করে, গোকুলকে একটু বুকে জড়িয়ে ধরি। পারি না, লজ্জা করে। এই মানুষদের এত আবেগ সহজ ধারায় কেমন করে বহে তাও জানি না। বরং নিজের মনের হিসাব কষি। রাত্রিবেলা এক বাউল যদি আমার অতিথি হতো, তাকে কি এমনি করে ডেকে নিতে পারতাম? এমন করে কি সৌভাগ্য মানতাম?

বিন্দু আবার বলে, 'বাবাজীর যে কী চিন্তে। বলে কিনা, রাতে থাকা জুইটবে কুথা।'

অমনি সবাই হেসে ওঠে। গোকুল এখন আর সেই চুপচাপ কম কথার গোকুল না। বলে, 'তা বটে। বাবাজী আমাদিগের চিতে যে! বন-জঙ্গলের হালচাল কেমন, জাইনতে হবে তো।'

আবার সবাই হেসে বাজে। গোকুল আবার আমাকে ডেকে গোপীদাস আর রাধা বৃন্দাকে ডাকে, 'আসেন, বাবা গোঁসাই আসেন। মা আসেন গ। চলো চলো সোজন গোঁসাই, ঘরেতে চলো, আর ঠান্ডায় থাকে না।'

বিন্দু ততক্ষণে সেই কিশোরীর কাছে। তার গালে গলায় হাত দেয়। কাপড় সরিয়ে গায়ের তাপ দেখতে দেখতে বলে, 'অই লো কুস্‌মি, খোলামেলা ঠান্ডাতে এইসে দাঁড়ালি, জ্বর নাই তা?'

গোকুল জবাব দেয়, 'না, আমি দেইখেছি, জ্বর নাই তবে ঠান্ডায় আর থাকিস না গ, ঘরে যা, ঘরে যা।'

কুস্‌মি নিশ্চয় কুসুম। গোপীদাস তাড়াতাড়ি কুসুমের চিবুক ধরে, কালি মুখ-খানি তুলে পুছ করে, 'লাতিনের আমার আর রাগ বিরাগ নাই তো?'

কুসুম অমনি মুখখানি সরিয়ে নিয়ে বলে, 'লিয়ে তো যাও নাই, এখন আর জিগেস করা ক্যানে?'

কটাক্ষে তার কোপ। মুখখানি অমনি ভার। গোপীদাস চোখ গোল করে বলে, 'উই উই, উ র‍্যা বাব্বারে বাব্বা, এখনো গোসা যায় নাই।'

বিন্দু বলে, 'গোসা ক্যানে করিস কুস্‌মি। জ্বর শরীলে বিদেশ বিভুঁয়ে লিয়ে যাবো, তা'পরে একটা ভারী ব্যামো-স্যামো হইয়ে গেলে কী হতো বল দিকিনি।'

কুসুমের কোপকটাক্ষ একটু সরল হয়। সকলের দিকে একবার তাকাতে গিয়ে হঠাৎ অচেনা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লোকটার দিকে নজর পড়ে যায়। চোখাচোখি হতেই, আহ্ কী লজ্জা! অমনি মুখ নত।

তাই দেখেই বিন্দু চোখে ঝিলিক দিয়ে বলে, 'তা'পরেতে এই দ্যাখ ক্যানে, কী সোন্দর একটা চিতেবাবাজী ধরে লিয়ে এসেছি। চেইয়ে দ্যাখ একবার।'

বলছে যখন দেখতেই হয়। একেবারে ডাগর চোখ দুটি তুলে কুসুম আমার দিকে চায়। বিন্দু আবার জিজ্ঞেস করে, 'ভালো না?'

কুসুম সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়িয়ে সায় দেয়। অমনি হাসির রোল পড়ে যায়। আমিও না হেসে পারি না। বেচারী!

বেচারী? ওই শোনো, অমনি হাসির মুখে বেজে ওঠে, 'আহা, হাসবার কী আছে, সত্যি তো ভালো।'

বিন্দু অমনি চোখ ঘুরিয়ে হাসে, বলে, 'উ বাব্বা! আচ্ছা লো আচ্ছা, বাবাকে গুরু করে তোদের দুজনাকে দীক্ষা দেওয়া হবে, রাজী আছিস তো?'

ভেবেছিলাম, এবার বুঝি কুসুম লাজে লাজিয়ে যাবে। সে আশা ক'রো না। ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, 'খালি মিছা কথা।'

বলে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। আর বিন্দু বলে, 'আচ্ছা, মিছা না সাচা, পরে দেখিস। এখন বাবাজীদের খাওয়ার ফিকির দ্যাখ।'

বলে বিন্দু আমার দিকে চেয়ে হাসে। সবাই মিলেই হাসে। আমি ভাবি, তের চোদ্দ না, তার চেয়েও কম। এ কুসুম-কলি এখনো কলির রূপ পেয়েছে মাত্র। এখনো লজ্জা পেতে শেখেনি, নিতান্ত শিশু। শরীরের আড়ায় একটু লম্বা, তায় শাড়ি জড়ানো। তাতেই একটু ধন্দ লাগে। জিজ্ঞেস করি, 'ও কে?'

বিন্দু বলে, 'আমার ননদ।'

গোপীদাস বলে, 'আমি বলি, আমার সতীন।'

আবার হেসে চোখ ঘুরিয়ে বলে, 'গোকুলের বোন বটে, আমি বলি নাতিন।'

শুনি, আর মনে হয়, আখড়া কোথায়। আমি তো যেন কোনো গৃহস্থের আঙিনায় ননদ-ভাজের কথা শুনি। দাদু-নাতনীর বাক্যালাপ শুনি। হেথায় আখড়া গেরুয়া আলখাল্লা একতারার সংসার-বৈরাগ্যের আসর কোথায়।

বিন্দু ততক্ষণে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'অই গ লিতাই, আর দাঁড়িও না। চলো চলো, তাড়াতাড়ি যাই। তুমি যেইয়ে চুলায় কাঠ ধরাও। আমি দেখি, চাল ডাল কুথা কী আছে।'

সে যেদিকে যায়, গোকুল হাত ধরে সেদিকেই নিয়ে যায় আমাকে। নিতাই আসে সঙ্গে হ্যারিকেন নিয়ে। খড়ের চালের ঘর। ঘরের সামনে দাওয়া। দাওয়াও খড়ের চাল দিয়ে ঢাকা। মাথা নিচু করে উঠতে হয়। তারপরে ঘরের দরজা। খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পাই, কুসুম আর একখানি হ্যারিকেন ইতিমধ্যে জ্বালিয়েছে। দাওয়ার এক পাশে তক্তপোষের মতো কী একটা রয়েছে। তাতে মাদুর কাঁথা ছড়ানো। গোপী-দাসকে সেদিকে যেতে দেখে আমিও ফিরতে যাই। গোকুল বলে, 'ঘরে চলেন বাবাজী, দাওয়ায় শীত কইরবে। বাবা গোঁসাই ঘরে আসেন। সোজন এইস।'

ঘরের দরজার পাশে বিন্দু হেসে দাঁড়ায়। যেন অভ্যর্থনা করছে। বাইরে শীত করছিল সত্যি। ঘরের ভিতরে বেশ গরম। আসবাবপত্র তেমন কিছু চোখে পড়ে না। এক পাশে কিছু বাসনপত্র। তার মধ্যে কাঁসা পিতল অ্যালুমিনিয়াম কলাই মাটির পাত্রও আছে। এক পাশের মাটির দেওয়ালে দড়িতে ঝোলানো গেরুয়া জামা-কাপড়। লাল পাড় শাড়িই একটি বিশেষ করে চোখে পড়ে। সঙ্গে ভাঁজ করা কাঁথাও আছে। এক পাশে কাঠের একখানি বাক্স। ঘরের বেশ খানিকটা জুড়ে মাদুর আর শতরঞ্জির ওপরে গেরুয়ায় ছোপানো চাদর পাতা। মোটা মোটা কাঁথা ভাঁজ করা রয়েছে। গুটিকয় ময়লা ময়লা বালিশ। সব মিলিয়ে কোথাও ধূলি-মলিন মনে হয় না। সযত্ন হাতের ছোঁয়ায় যেন বেশ পরিপাটি পরিচ্ছন্ন।

গোকুল আমাকে সেই বিছানায় বসতে বলে, 'বসেন ইখ্যানে। বাবা মা বসেন। সোজন বইস।'

সবাই মিলে বসি, কেবল রাধা বৃন্ধা ছাড়া। সে তার কাঁধের ঝোলাটা আগে

রাখে কাঠের বাক্সের ওপরে। আর বিন্দু এসে আমার কাঁধের ঝোলা ধরে টান দেয়। বলে, 'দেন, কাঁধের ঝোলা লামিয়ে বসেন বাবাজী।'

ঝোলাটা নিয়ে সে দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝুলিয় দেয়। আবার বিছানার কাছে এসে একটা কাঁথার পাট ভেঙে আমার কোলে বিছিয়ে দেয়। আমি সঙ্কুচিত হয়ে তাড়াতাড়ি বলি, 'আহা, থাক না, আমি নিচ্ছি।'

বিন্দু বলে, 'আমিই দেই ক্যানে বাবাজী। কত কষ্ট দিয়ে লিয়ে এইসেছি।'

আর একখানি কাঁথা খুলে পাশাপাশি গোপীদাস আর সুজনের কোলে ছড়িয়ে দেয়। গোপীদাস আরামের শব্দ করে। বিন্দু সুজনকে বলে, 'একটুক্ গরম হইয়ে লাও।'

গোকুল তাড়াতাড়ি বলে, 'তবে দেখ গোঁসাই, ওম্ পেইয়ে মুরগীর মতন ডিম পাড়তে লেইগ না, তা হলে আর তুইলতে লারব।'

সবাই হাসে। ডিম পাড়ার রহস্য কী, বুঝি না। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়ার কথা বলে। সুজনও পিছোয় না। বলে, 'বসে থাকব বটে। তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'যাই, বিন্দুর সাথে একটুক আয়োজন দেখি গা।'

'তুমি একলা দেখবে কেন। আমিও দেখব।'

বিন্দু গোকুল দুজনেই হাসে। গোকুল বলে, 'তবে এইস।'

গোপীদাস তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'তবে বাবা সোজন, তুমিও আয়োজন কইরবা তো, ছেদোয় একবার ঠিকরে গোঁজা দাও।'

বলেই কাঁধ থেকে নিজের ছোট ঝোলাটি নামিয়ে তার থেকে হাতড়ে বের করে ন্যাকড়া জড়ানো কল্কে। তার সঙ্গে ছোট একটি পুরিয়া। অর্থাৎ গাঁজা সাজতে বলছে। শুধু গাঁজা তো না, আয় ভাই, প্রেমের গাঁজা খাবি কে। ছেদোয় ঠিকরে মানে, কলকেতে ঠিকরে দেওয়া।

গোকুল বলে, 'বাবা গোঁসাই রাখেন ক্যানে, আমার কাছে তো জিনিস আছে।'

'তা থাক্ বাবা, পরে তো আবার লাইগবে। এখন উতেই হক।'

সুজন কল্কে আর পুরিয়া নিয়ে গোকুলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। বিন্দু ডেকে বলে, 'অ কুস্মি, কুলোখান লিয়ে আয় ভাই।'

কুসুম তাড়াতাড়ি ঘরের এক কোণ থেকে একখানি কুলো বের করে নিয়ে আসে। বিন্দু ততক্ষণে সরা ঢাকা এক এক হাঁড়ির মুখ খোলে। বড় একটা হাঁড়ি থেকে কুন্কে দিয়ে চাল তোলে। আর বাকী হাঁড়িগুলো থেকে হাতের মুঠোয় মুঠোয় ডাল তোলে। কুলোয় কুসুম আর রাধা বৃদ্ধা হাত দিয়ে ছড়িয়ে দেয়। ধান কাঁকর বাছতে আরম্ভ করে। কুসুম বলে ওঠে, 'অই গ আই মা, কী কইরছ গ? ডাল ফেলে দিচ্ছ য্যা।'

রাধা বৃদ্ধা বিব্রত হয়ে ভুরু কোঁচকায়। তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে বলে, 'তাই নিকি?'

'হুঁ গ!'

চোখের বাতিতে আর কতকাল তেল থাকে বল। এদিকে তেল বাড়ন্ত, ওদিকে নজর নিবু-নিবু। বয়স কত কে জানে। দেখে মনে হয়, গোপীদাসের চেয়েও জরা তাকে বেশী ধরেছে।

গোপীদাস বলে ওঠে, 'আর কি রাতে চাল ডাল বাছার লজর আছে তুমার?'

'তুমার আছে তো?'

বৃদ্ধা প্রকৃতি একটু যেন ফোঁস করে। গোপীদাস আমার দিকে চেয়ে একটু চোখ মটকে হাসে। বলে, 'আমি তো জম্মোকানা।'

এই বাউল যে বিটলে বুড়ো, তা জানা ছিল। কিন্তু বৃদ্ধা প্রকৃতিটির পিছনে লাগার রস যে এখনো আছে, তা জানতাম না।

রাধা জবাব দেয়, 'সি তো আমিও বটে, জম্মোকানা।'

'না না, জম্‌মোকানা ক্যানে। গোটা জেবন ধইরে চাল ডাল বাইছলে। এখন তুমি রাতকানা হইয়েছ। রাতে আর লজর খেলে না।'

আই বাপ, বৃদ্ধার কোপ দেখ একবার। ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে বলে, 'ক্যানে, রাতকানা হবো ক্যানে। একটা তো ডাল ফেইলেছি। আমি কি ধান কাঁকর বাইছতে লারছি? একবার দেইখে যাও ক্যানে।'

বিন্দুর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়। কৌটাবাটা থেকে কী যেন সে বের করে। হলুদ লঙ্কা বের করে বোধ হয়। পরমুহূর্তেই মুখখানি গম্ভীর করে বলে, 'চুপ করো ক্যানে বাবা।'

'আচ্ছা গ আচ্ছা, জয়গুরু।'

ওদিকে ততক্ষণে রাধা কুলোসুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়েছে। কুসুমকে বলে, 'চলো গ লাতিন, আমরা চুলার ধারে যেইয়ে বসি। আগুনও পাওয়া যাবে, বাতিও পাওয়া যাবে।'

বলে নিজেই আগে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বিন্দু পিছন থেকে বলে, 'আধারে যাইচ্ছ, পড়ে যাবে যে। ও লিতাই, বাতি লিয়ে কুথা গেইলে, মাকে দেখাও।'

শেষের দিকে তার গলা ওঠে। বাইরে কোথাও থেকে নিতাইয়ের জবাব আসে, 'এই যে দেখাই। আমি কিন্তুক কাঠ জ্বেলে হাঁড়িতে জল বসিয়ে দিইছি গ।'

বিন্দুও গলা তুলে বলে, 'বেশ কইরেছ।'

তারপরে গোপীদাসের দিকে চেয়ে কপট কোপে ভুরু কুঁচকে বলে, 'বাবা গোঁসাই খালি মায়ের পেছুতে লাগে।'

গোপীদাস গলা নিচু করে প্রায় চুপিচুপি স্বরে বলে, 'লজর যে উঁয়ার এখন খাটো হয়্যা যেইছে, সিটো বইলতে গেলেই রাগ। তা হলে যাকগা, তোরেই চাল-ডালগুলান বেবাক লষ্ট হবে, আর ধান কাঁকরগুলান পইড়ে থাইকবে।'

ভুরু কোঁচকাতে গিয়ে বিন্দু হেসে ফেলে। কুসুমকে বলে, 'এগুলান লে ভাই, লিয়ে চল তাড়াতাড়ি যাই। পেটে কারুর কিচ্ছু নাই।'

কুসুম আঁচল পেতে ধরে। বিন্দু তার আঁচল কোঁচড়ে মুঠো করে রাখা হলুদ-লঙ্কা দেয়। কিছু তেজপাতা, চুপড়ি ঘেঁটে গুটিকয় আলু বেগুন, মায় পালং শাকের গোছাও ঢেলে দেয়। তারপরে দু'জনে যখন বেরুতে যায়, তখন কুসুম গোপীদাসের দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়ে বলে, 'আইমার নামেতে যা বইললে, সব যেইয়ে ল্যাগাল্‌ছি আমি।'

অমনি বুড়োর কপট আঁতকানি দেখ। বলে, 'ইস ইস, অই গ কুস্‌মি ডেকরি চামুণ্ডি।'

কুসুম থমকে দাঁড়িয়ে বলে, 'আবার গালি পাইড়ছ। বলি যেইয়ে।'

বিন্দু হাসতে থাকে। আমিও সামলাতে পারি না। একেই লোকেরা বিচ্ছু বলে কিনা, কে জানে। আমার যেন সেইরকম লাগে। তবে, যেমন দেবতা, তার তেমনি পুজো। বিটলে বাউল্‌ একেবারে ঢিট। তাড়াতাড়ি বলে, 'অই শুন গ লাতিন, ই বারে যিখ্যানেই যাই, তোকে ছাড়া যাবো না। জ্বর হলে ক্যাঁতা ঢাকা দিয়ে লিয়ে যাবো।'

'ঠিক তো?'

'অব্যথ।'

বিন্দু আওয়াজ দেয়, 'বাব্বারে বাবা, মেয়্যা তো না, কেউটের ছানা।'

দু'জনেই হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়। তার আগেই কুসুমই আবার দরজার কাছে থমকে দাঁড়ায়। ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'তা, হাঁই দাদা, উয়াকে লিয়ে ইখ্যানে বইসে

থাইকবে ক্যানে। চুলার কাছে চলো, আগুন পোয়াতে পাইরবা।'

উয়াকে মানে আমি। বিন্দু চোখ বড় করে বলে, 'উ বাবা, চিতেবাবাজীকে ছেড়ে কুসি যেইতে লাইরছে গ।'

যাকে বলা, তার তেমন প্রতিক্রিয়া নেই। বলে, 'ঘরে বইসে কী কইরবে। তার চে উথানেই তো ভালো। এইস ক্যানে, এইস।'

অবাক হয়ে দেখি, কুসুম অবলীলাক্রমে আমার দিকে তাকিয়ে, আমাকেই ডাকছে। জিজ্ঞেস করি, 'আমাকে বলছ?'

'হুঁ।'

বিন্দু হেসে ওঠে খিলখিলিয়ে। আর গোপীদাস বলে, 'তাই চলো চিতেবাবাজী, আগুনের ধারেই জইমবে ভালো। লাতীন আমার ঠিক বইলছে।'

চড়ুইভাতি বনভোজনের আসর জানি। নামেতেই তার পরিচয়। চড়ুইয়ের ভোজ লাগে, দল বেঁধে মাঠে মাঠে। তাদের মতো, মানুষেরা যারা দল বেঁধে বনে বনে, খোলা আকাশের তলায়। হেথায় দেখ, অন্যরকম। ঘরের পিছনে, উত্তর-পশ্চিম আড়াল করে মাটির দেওয়াল। পুব-দক্ষিণ খোলা। দর-দরওয়াজা কিছু নেই। মাথার ওপর দোচালা ছাঁদে খড়ের ঢাকা। এক কোণে দুই উনোন। এর নাম রান্নাঘর।

এক উনোনে কাঠের আগুন। তার ওপর হাঁড়ি। কাঠের আগুনে আর হ্যারিকেনের আলোয় যেন তরঙ্গ খেলছে। চার পাশে অপর্যাপ্ত জায়গা। মাদুর শতরঞ্জি পাতার দরকার হয়নি। কয়েক আঁটি খড় বিছিয়ে দিয়েছে নিতাই। যে যেমন পারো, বসো।

সেই রকমই বসা হয়েছে। উনোন ঘেঁষে বিন্দু। তার কাছাকাছি রাধা বৃন্ধা। গোপীদাস কি যেমন-তেমন বুড়ো! আগেভাগেই গিয়ে রাধার পাশ ঘেঁষে বসে। অমনি রাধার ভুরুতে বাঁক, চোখেতে কোপ। কুলা নিয়ে সরে বসতে যায় কিন্তু জায়গা নেই তো, যাবে কোথায়! গোপীদাস বসে আওয়াজ করে, 'জয়গুরু!'

বিন্দু আমার দিকে চেয়ে একটু হাসে। এমন কি কুসুমও চোখে ঝিলিক হানে। মুখে আঁচল চাপা দেয়। সে আবার আইমার মুখোমুখি বসেছে কি না। চাল ডালের ধান কাঁকর বাছবে বলে। আঁচল না চাপলে আইমা যদি দেখতে পায়!

গোপীদাস চোখের কোণে একবার আমার দিকে দেখে জিজ্ঞেস করে, 'কই সোজন, হলো?'

সুজন খড়ের বাইরে, মাটির ওপর বসে ছিলিম বানাতে ব্যস্ত। যে উনোনে আগুন নেই তার পাশে বসে গোকুল। সে জবাব দেয়, 'এখন রাগের কারণ হচ্ছে বাবা। তারপরে তো রূপ দরশন।'

'জয়গুরু জয়গুরু।'

গোপীদাস চোখ বুজে বোল দেয়। গোকুল বিন্দু চোখাচোখি করে হাসে। যেন তারা কী এক ঘোরের মধ্যে আছে। গোকুলের কথার মধ্যে ঘোর। এরা সবাই যেন সব সময়েই এক ঘোরের মধ্যে আছে। যে ভাব-কথার অর্থ বোঝা দায়।

সুজন হাতে নিয়ে গাঁজা ডলতে ডলতে বলে, 'তার মানেই রসের ভিয়েন হচ্ছে।'

ওদিকে নিতাই আরো কাঠের বোঝা এনে জড়ো করে উনোনের কাছে। তারপরে গোকুলের কাছ ঘেঁষে মাটির দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে। আমি গোপীদাসের কাছাকাছি। এ আসরের কী নাম দেবো জানি না। শীতের বাতাস আটকানো। খড়ের শয্যা গরম হয়ে উঠবে। ওদিকে চুলোয় লাল শিখা সাপের মতো ফোঁসফুঁসিয়ে জ্বলে। সেই তাপটুকুও সকলের গায়ে এসে লাগে। তাছাড়া এতটুকু ঠাঁই, এতগুলো মানুষ কাছাকাছি পাশাপাশি। তার উত্তাপ অনেকখানি। মানুষের দেহে মনে প্রাণে যত উত্তাপ তার জুড়ি নেই।

চালার বাইরে একটা আমগাছের গোড়া দেখা যায়। তারপর অস্পষ্ট মাটির দেওয়াল। দেওয়ালের গায়ে ছোট দরজা বন্ধ। বোধ হয় খিড়কির দরজা।

সব মিলিয়ে নিজেকে যেন নিজেই চিনতে পারি না। এমন এক আসরে যে আমি বসে আছি, যেন নিজের প্রত্যয় হয় না। এমন আসর যে হতে পারে, তা-ই কি জানা ছিল। কতটুকুই বা জানি, দেখেছি বা কতটুকু! কত যে মানুষ, কত যে ঠাঁই, কত যে রূপ, কত অপরূপ, বঙ্গের নানা অঙ্গে। বিস্ময়ের ঝিলিক লাগে চোখে। তারই মধ্যে চোখ জুড়িয়ে যাওয়া সুখশীতল কাজল লেপে যায়। প্রাণের ভিতর এক ভাবের তরঙ্গ দুলে ওঠে।

দেখ, শিউড়ি শহরের বাইরে নিরালা এক আখড়ায় বাউলদের সঙ্গে তাদের রান্নাঘরের চালায় বসে আছি। বাইরে নিঝুম শীতের রাত। রাতের হিসাব কে করে। তবু যদি এ যামিনীর প্রহর জানতে চাও, হাত তুলে, ঘড়িতে দেখ রাত সাড়ে বারো। এদিকে যখন গাঁজায় 'রসের ভিয়েন' হচ্ছে, তখন হাঁড়িতে টগবগ শব্দ। জল ফুটতে আরম্ভ করেছে।

বিন্দু জিজ্ঞেস করে, 'অই লো কুসুমি, চাল ডাল বাছা হলো? আমার হাঁড়ির জলে ফুট ধইরছে।'

কথা শুনেই গোকুল বিন্দুর দিকে চায়। বিন্দু কিন্তু মুখ তোলে না। হাঁড়ির দিকেই চেয়ে থাকে। তার স্নিগ্ধ কালো মুখের রেখায় হাসি কাঁপে, নাকি আগুনের আলো ঝলকায় বুঝতে পারি না। গোকুল মুখ ফিরিয়ে সুজনের দিকে চায়। চোখা-চোখি করে দু'জনেই মুখ টিপে হাসে।

রাধা বৃদ্ধা বলে, 'এই যে হইয়ে এলো মা।'

গোপীদাস তাড়াতাড়ি কুলার দিকে ঝুঁকে বলে, 'দাও ক্যানে, আমিও বাছি।'

রাধা অমনি কুলা আড়াল করতে চেষ্টা করে। বলে, 'ক্যানে, জম্মোকানা কি দেইখতে পারে?'

'তা ক্যানে পাবে না গ। কানাটোর যে সব মনে মনে জানা।'

এ দুয়ের বচনে সকলের চোখে মুখে হাসির ঝিলিক। কুসুম আবার আমাকে চোখ টেপে। মুখে আঁচল চাপে।

রাধা বলে ওঠে, 'ইস্! মনে মনে জানা থাইকলেই ধান কাঁকর বাইছবে বটে।'

'তা ক্যানে লারব হে। আমি তো আর রাতকানা না। জয় গুরু।'

ভারী নির্দোষী সুরে বাজে গোপীদাস। কিন্তু ঝাঁজে বাজে বৃদ্ধা, 'ক্যানে, আমি কি রাতকানা নাকি। এতগুলান বেইছেছে কে? আমি, না গোপীদাস ক্ষ্যাপা বাবাজী?'

গোপীদাস চোখ ঘুরিয়ে ভারী সন্ত্রস্ত হয়ে বলে, 'অই গ ঠাকরুন, রাগ-মাগ ঝগড়া-বিবাদ করো না গ। বইললাম একটা কথা, মানে কানা কি আর বইলছি গ? রাতে লজর করা দায়, তাই বইলছি যে—।'

'ল্যান বাবা ল্যান, এদিকে তৈয়ার।'

কথার মাঝখানেই সুজন তাড়াতাড়ি কল্‌কেখানি বাড়িয়ে ধরে গোপীদাসের সামনে।

গোপীদাস বলে ওঠে, 'হুঁ হুঁ, এই যে, দাও বাবা।'

হাত বাড়িয়ে কল্‌কে নেয়। ভাগ্যিস কল্‌কে তৈরি হয়ে গিয়েছে। নইলে এ রসিক বুড়ো যে বুড়ীকে কত দূরে তুলত, বলা যায় না। রাধা তখনো বিড়বিড় করছে। বাকী সকলের মুখেই হাসির ঝিলিক। রাধার ভয়ে কেউ আওয়াজ দিয়ে হাসতে পারে না।

গোপীদাস তখন কল্‌কের আগুনে আঙুল দিয়ে একটু খুঁচিয়ে টিপে টিপে দেখছে। গুনগুন করে গান করে, 'হইলে ক্ষ্যাপার রাগের কারণ, রূপের ঘরে লাগায় দম।'

বলে কল্‌কেটি সোজা আমার দিকে বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'একটুক হবে বাবাজী?'

চমকাই যত, অবাক তত। তাড়াতাড়ি বলি, 'না না, ও আমার লাগবে না!'

বলেই তাড়াতাড়ি পকেট থেকে নিজের ধূমপান বের করি। গোপীদাস বলে, "আহা, উ তো বাবাজী, তুমার আছেই গ। ই বস্তু একবার চেখে দ্যাখ ক্যানে, কেমন মৌজ হয়। তখন আর উ সব ভালো লাইগবে না। লাও, ধরো।'

বিন্দু বাজে খিলখিলিয়ে। আর যে নিতাই বাবাজীর সঙ্গে এখনো বাক্যালাপ হয়নি, সে বলে ওঠে, 'ল্যান বাবাজী, ল্যান, একবার পরখ করেন।'

সঙ্গে সঙ্গে কুসুমের ধমক, 'তুমি থামো ক্যানে লিতাইদা। দাদা যেমন হইয়েছে! ই বাবাজী তোমাদিগের মতন গাঁজা খায় যে, খেতে বইলছ?'

অবাক কেবল আমি না। কুসুমের ধমক শুনে, অবাক সবাই! বিন্দু চোখ বড় বড় করে বলে, 'বাপ্‌পুরে! তা বাবাজী যে এখন আমাদিগের মানুষ। খাবে না?'

কুসুমের ঘাড় নাড়ার চোটে চুলের বিনুনি একেবারে এদিক ওদিক ঝাপটা। বলে, 'না, খাবে না।'

আমার দিকে চেয়ে বলে, 'খেও না, লিশা হবে, তখন ভোম্ হইয়ে বইসে থাকবে, হ্যাঁ।' বলে এমনভাবে ঘাড় কাত করে যেন ভয় দেখায়। অবাক যত মানি, ভিতরে যেন হাসি ততই কলকলিয়ে উঠতে চায়। কিন্তু এমন নির্ভেজাল ফরসা মন আর কোথায় পাবে। দেহেও বালিকা, মনেও বালিকা। তাই বাজে অ-বিকল। মনে মুখে আলাদা নেই। তার ওপরে উদ্বেগ। বয়স দিয়ে তো তার বিচার চলে না। খাইয়ে কেন ভোম করে দেবে এমন মানুষকে। তারপরে যদি কিছু হয়?

বিন্দুর চোখে হাসির তরঙ্গ। ঠোঁট টিপে, হাসি চেপে সে ঠায় আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। গোপীদাস বলে, 'শুন গ লাতীন, একটু আস্বাদ লিলে, লিশা হবে না। লাও চিতেবাবাজী, ধরো।'

এবার গোকুল সুজনও তাল দেয়, 'হোক, একটু হোক, কিছু হবে না, ভয় নাই।'

জেদাজেদির কথা না। মনপ্রাণের সাধ। তাই মনে কোনো জেদ চাপে না। ভয়টাই আসল। যে বস্তুকে চিরদিন ভয়ের চোখে দেখেছি, তার চেয়ে বেশী সংস্কারে জড়ানো মন নিয়ে যে জিনিসকে নীতি-দুর্নীতির ভাবে ভেবেছি, এক কথাতেই তার স্বাদ নিতে ভরসা পাই না। কিন্তু মনের দিকে চেয়ে দেখ তো, পাপাপাপের বোধ আছে কি!

দেখি না তো। পাপ পুণ্য কি এতই ঠুনকো! এত যদি সকলের সাধ, তা-ই না-হয় পুরুক। জীবনে অনেক কিছুই ঘটেনি। এমন মানুষদের সঙ্গে এমন আসরেই বা আর কবে মিলেছি! এই রাত্রের স্মৃতিতে না-হয় এই সাধ মিটুক।

গোপীদাসকে বলি, 'আপনি আগে নিন।'

সঙ্গে সঙ্গে গোকুল বলে ওঠে, 'হুঁ হুঁ, ঠিক কথা। তুমি আগে সেবা করো, বাবাজীর তাতে সুবিধা হবে। পেথম তো!'

গোপীদাস 'জয় গুরু' বলে কপালে কল্‌কে ছুঁইয়ে দাড়ির ওপরেই কল্‌কে চেপে ধরে। এবার দেখ কুসুমের চোখ! তাকাতে লারছি হে। তোমার জন্যে চুরি করি, তুমিই বলো চোর! কেবল যে আশাহতের অভিমান, তাই না। ডাগর চোখ দুটিতে কী অবিশ্বাস আর কোপ কটাক্ষ। আমি প্রায় অপরাধের দায়ে একটু হাসি।

কুসুম ঝটিতি মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারপরেই তৎক্ষণাৎ আবার চোখ পাকিয়ে বলে, 'খাও না, দেইখবে তা'পর কী হয়। মাথা যখন ঘুরাবে তখন বুইঝবে।'

বলেই কুলাটা তুলে বিন্দুর দিকে বলে, 'লাও, ঢেইলে দাও।'

গোপীদাস সুদীর্ঘ টান দিয়ে স্থির চোখে আমার দিকে চায়। দাড়ির ভাঁজে হাসি, চোখ লাল। কোনো কথা না বলে কল্‌কেটা বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে।

ভালো করে ধরতেও পারি না। লজ্জা করে, হাসি পায়। কেমন একটা উত্তেজনাও। ভয়ে ভয়ে কোনোরকমে একটু টান দিই। একটু ধোঁয়া বেরোয় সেই যথেষ্ট। হাত বাড়িয়ে দিই গোকুলের দিকে। সবাই 'জয়গুরু' বলে হেসে আওয়াজ দেয়।

গোকুল বলে, 'কিছুই যে হলো না বাবাজী। একটু দম দেন।'

ঘাড় নেড়ে বলি, 'আর না।'

গোকল কল্‌কে নেয়। কিন্তু আমি পরিবর্তন কিছুই বুঝতে পারি না। গন্ধটা ভালো লাগে না, এই পর্যন্তই। নিজের ধূমপানে যেটুকু অনুভব করি, তাও করি না। ভোম্ হওয়া মাথা ঘোরা তো দূরের কথা।

ওদিকে গোকুল সুজনে সাধাসাধি হয়। শেষ পর্যন্ত সুজনকেই আগে নিতে হয়। তারপরে গোকুলের হাত ঘুরে যায় নিতাইয়ের হাতে। এদিকে, কুসুমের চোখের যেন পলক পড়ে না। চোখ বড় বড় করে ঠায় চেয়ে আছে আমার দিকে। আমি হাসতে জিজ্ঞেস করে, 'মাথা ঘুইরছে?'

মাথা নেড়ে বলি, 'না।'

'লিশা হয় নাই?'

'কিছু তো বুঝি না।'

একটু বোধহয় প্রত্যয় হয় কুসুমের। চোখে বিশ্বাস ফিরে আসে। তবু ভুরু কুঁচকে বয়স্কার মতো ঘাড় নেড়ে বলে, 'আমি লিশা ভাঙ দু'চক্ষে দেইখতে পারি না। আখড়ায় যে আসে, সে-ই গাঁজা খায়। এই দ্যাখ ক্যানে, দাদাকে একবার দ্যাখ, কেমন ভোম্ হইয়ে যেইছে।'

গোপীদাস চোখ বুজে অনেকক্ষণ চুপচাপ। এবার বলে, 'ভোম্ হবো ক্যানে গ লাতীন। এই দ্যাখ কেমন কথা বইলছি।'

কুসুম বলে, 'চখ্ মেল তো দেখি।'

গোপীদাস ভুরু টান করে চোখ তাকায়। লাল বর্ণ চোখ। না তাকাতে হলেই যেন ভালো। বলে, 'এই দ্যাখ, চখ মেইলতে লারব ক্যানে। একটুক মৌজ খেতে দিবি তো!'

অন্যান্য সব পুরুষেরই তখন মৌজ খাওয়া চলেছে। সকলেই চুপচাপ। বিন্দু থেকে থেকে হাঁড়িতে কাঠের হাতা নাড়ে। এদিকে চেয়ে হাসে। হাঁড়ির মুখের সরা খুললেই ডালে চালে মেশানোর সেদ্ধ গন্ধ ছড়ায়। তারপর হঠাৎ বিন্দু বলে, 'তা বলে, সবাই কি আর কাশীর মতন গাঁজা খায়?'

গোপীদাস অমনি বলে ওঠে, 'অই অই, তাই বল্ ক্যানে গ মা। লাতীনের আমার এত রাগবিরাগের কারণ বুইঝতে পাইচ্ছিলেম না।'

কুসুম চকিতে একবার বিন্দুর দিকে চায়। বিন্দু ততক্ষণে হাঁড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারপরেই কুসুম ফিরে চায় গোপীদাসের দিকে। তার চোখে গভীর সন্দেহ। টেপা ঠোঁটে রাগের লক্ষণ।

ঠিক এই সময়েই নিতাই সারা শরীর দুলিয়ে খল খল করে হেসে ওঠে। কুসুম তৎক্ষণাৎ ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'এই দ্যাখ লিতাইদা, তুমি হেসো না, আমার গা জ্বলে যায়।'

নিতাই তাড়াতাড়ি গম্ভীর হয়ে বলে, 'দ্যাখ ক্যানে, আমি কী কইরলাম। একটুক হাইসছি বই তো না।'

'ক্যানে, হাসবে ক্যানে? হাসির কথা কী হয়েছে, শুনি?'

কথা আর ধমকের চোট শুনলে মনে হবে, ডাগর যুবতী কামিনী ঝংকার দেয়। অথচ সামনে দেখ সবুজ পানপাতা চকচকে মুখখানি। অসীম প্রকৃতি জুড়ে যেন এক শীর্ণ নদী। প্রতীক্ষায় থমকানো, অসীম প্রকৃতি জুড়ে ভাসবার একটু সংকেত চিহ্ন মাত্র যেন। তবু দেহে কুলুকুলু, ভাবে ঢলঢল। চোপায় পাঁচমুখ, কথার ঝিরকুটি।

নিতাইটিও কম না। বলে, 'না, তাই বইলছি, অই কাশীনাথের কথা বইললে কি না। বোষ্টমদের বিটাটো পনর যোল বচ্ছরের হল্যে কী হবে। কী গ্যাঁজা খেতে পারে, বাপ রে বাপ!'

ইতিমধ্যেই কুসুম একবার আমার দিকে দেখে নেয়। আসন্ন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তার চোখ তখন দপদপে। কাশীনাথ নামের মধ্যে কিছু একটা রহস্য আছে বুঝতে পারি। আর সেই রহস্যে কুসুম জড়ানো। বিন্দুর টিপে টিপে হাসি, আড় চোখে চোখে চাওয়া দেখেও সেই অনুমান হয়। ধরতাইটা তো সে-ই দিয়েছে।

কুসুম ঝেঁজে ওঠে, 'উ মুখপোড়া গ্যাঁজা খেতে পারে তো আমার কী।'

বোঝা যায়, নিতাই হলো নরম মাটি। বিন্দু আর গোপীদাসকে ছেড়ে তাই তার ওপরেই কুসুমের আক্রমণ বেশী। নিতাই বলে, 'অই দ্যাখ, আমি কি তোকে কিছু বইলছি।'

কিন্তু অবুঝ মনের রাগ তখন এসব শুনতে বুঝতে নারাজ। বলে, 'বইললেই বা আমার কী।'

বিন্দু তাড়াতাড়ি বলে, 'তবে তো মিটেই গেল।'

কুসুম তাতেও থামে না। বলে, 'ও গ্যাঁজা খেয়ে মরুক গা, যা খুশি তাই হক গা। ই আখড়ায় এইসে থাক ক্যানে, মুখে নুড়ো জেবইলে দেবো।'

একবার ফোঁসানি দেখ। কথা শোনো। নগরে থাকলে এ মেয়ে বই বগলে ফ্রক গায়ে দিয়ে ধিতিং ধিতিং নেচে ইস্কুলে যেতো। কিন্তু ভিন্ জগতের, ভিন্ সংসারে সে আর এক মেয়ে।

বিন্দু তাড়াতাড়ি মিষ্টি করে তরাসে বলে, 'তা হা ছি. উ কি রে কুসুমি, কী বইলছিস। অমন কইরে বলিস না।'

কুসুমের অমনি মাথা নত। কিন্তু স্বর বন্ধ না। যেন নিচু স্বরে গর্জায়, 'না, বইলবে না!'

তারপরে বিন্দুর দিকে চেয়ে বলে, 'তুমিই তো বইললে। ওর কথা কে শুনতে চায়?'

'আচ্ছা আচ্ছা, আর বইলব না।'

বিন্দু সান্ত্বনা দেয়। সকলের দিকে চেয়ে টিপে টিপে হাসে। আর আসলে যে লোক চটিয়েছে, যার কথাতে নিতাই হেসে উঠেছিল, সেই গোপীদাস এতক্ষণে শব্দ করে ঘাড় নাড়ে। গম্ভীর মুখে বলে, 'হুঁ, ইটো তো ভালো কথা না। কাশীর এত নিশা টিসা ভালো না। ওকে বইলতে লাইগবে!'

কুসুম মুখ তুলে সন্দিগ্ধ চোখে একবার দেখে। আবার মুখ নামায়। আর গোপীদাস গুনগুন করে। আমি এবার জিজ্ঞেস করি, 'কাশীনাথ কে?'

গোপীদাস খুবই যেন নিরুৎসাহিত স্বরে বলে, 'কে আবার! কাছেই থাকে, বোষ্টমদের এক বিটা। লাতীনের তার উপর খুব রাগ। ছোঁড়া বেজায় গ্যাঁজা খায়। ই আখড়াতে তার যাতাত আছে।'

তারপরে আর বুঝতে বিশেষ বাকী থাকে না। ওদিক থেকে বিন্দু আমার দিকে চেয়ে বলে, 'এখন কাশী বোষ্টম ছেড়ে বাউল হতে চায়। কুসুমির দাদাকে গুরু কইরতে চায়।'

বক্তব্য পরিস্কার। ঘটনাও স্বচ্ছ। কাশীনাথের বোষ্টম ধর্ম, বাউল ধর্ম, শত

ধর্ম আছে সব ধর্মের সার কুসুম ধর্ম। তাই এখানে যাতায়াত। তাই গোকুলকে গুরু করার ইচ্ছা। আমি নিজেই মনে মনে বলি, জয়গুরু জয়গুরু। নগরে সংসারে হলে এ মেয়ের সামনে এ বিষয়ে এমন করে কথা বলতে পারতাম না। কিন্তু এখানে অন্য দরিয়ায় ভাসি। এ দরিয়ায় টান স্রোত সবই আলাদা। তার দিক ফেরাতে পারি না। তবে নগরে সংসারে বলো, গ্রামে আখড়ায় বলো, তার ধরন-ধারণ চালচলন আলাদা হতে পারে। সহজ মন সেই এক। একটাই। ইস্কুল পড়া আর না পড়া মনের তার এক জায়গাতে বাঁধা। যা ভালো তা ভালো, যা মন্দ তা মন্দ। তাই মুখে বলি, 'সে তো ভালো কথা।'

কুসুম অমনি ফোঁস করে ওঠে, 'আর কাঁড়ি কাঁড়ি গ্যাঁজা খায় যে!'

তাতে কুসুমের কী, জিজ্ঞেস করা যায়। সে তো হবে গোকুলের শিষ্য। কিন্তু সে কথা জিজ্ঞেস করার সাহস আমার হয় না। বরং গম্ভীর হয়ে বলি, 'সেটা অবিশ্যি ভালো না। ছেলেমানুষের অত গাঁজা খাওয়া কিসের!'

কুসুম একেবারে গিন্নীর স্বরে বাজে, 'অই বলে কে!'

যত গম্ভীর কুসুম, তত আমি। আসলে কুসুমের তো বেশী কিছু বলার নেই। কাশী যেন গাঁজা না খায়। কুসুম আর একবার আওয়াজ দেয়, 'লজ্জা আছে নাকি!'

এইটুকুতেই আমার মনে বিস্ময়ের ঢেউ লেগে যায়। এই তো এক ফোঁটা মেয়ে। তার আচার আচরণ দেখলে মনে হয়, সংসার তাকে কোথায় উঠিয়ে দিয়েছে। নগরে যারা এই বয়সে লিখে-পড়ে হেসে-খেলে কাটায়, এ মেয়ে তখন যেন দায়-দায়িত্বের ভার নিতে তার কচি অপুষ্ট কাঁধ পেতে দেয়। মানুষ আর পরিবেশ, তাকে এই শিক্ষাই দিয়েছে।

ইতিমধ্যে নিতাই উঠে যায় কোথায়। গোপীদাস গুনগুন করেই চলে। বিন্দু বলে ওঠে, 'অই লো কুসুমি, কড়া আর তেল লিয়ে আসতে হবে। লঙ্কা ভেজে এইটুকু ঢেইলে দিতে হবে। লিতাইয়ের বোধ হয় এতক্ষণে খেয়াল হইয়েছে, হলুদ আদা, কিছু বাটা হয় নাই।'

গোপীদাস বলে, 'পাকায় কী দরকার, কাঁচাতেই হোক না।'

বিন্দু বলে, 'না, চিতে বাবাজী খাবে। একেবারে এমনি কইরতে পারব না।'

আমার দিকে চেয়ে হাসে। আমিও বলি, 'থাক্ না।'

কুসুম চুপ করে থাকতে পারে না। সে উঠতে উঠতে বলে, 'থাইকবে ক্যানে, আমি লিয়ে আসছি। চিতে বাবাজী বাতিটো লিয়ে এইস।'

গোকুল বলে ওঠে, 'শুন শুন, মেয়্যার কথা শুন। উনি বাতি লিয়ে যাবেন ক্যানে, আমি যেইছি।'

অতঃপর আমার শিরদাঁড়াতে ধাক্কা। কুসুম যদি এমন অনায়াসে আমাকে ডাকতে পারে, আমি বা বসে থাকি কোন্ লজ্জায়! তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে হ্যারিকেন নিয়ে বলি, 'চলো, চলো।'

গোকুল বিব্রত হয়ে বলে, 'আমার বোনটি এইরকম বাবাজী, ওর মুখে কথা আটকায় না।'

কুসুমকে অনুসরণ করতে করতে বলি, 'ভালোই তো।'

চালা ছেড়ে যাবার আগে, বিন্দু কী যেন ইশারা করে, বুঝতে পারি না। উঠোন পেরিয়ে কুসুমের সঙ্গে আবার সেই ঘরে আসি। কোথায় যেন শিল-নোড়ার ঘটং ঘটং শব্দ হয়। কুসুম কুলুঙ্গি থেকে তেলের ছোট বৈয়াম পাড়ে। বাসনপত্রের ডাঁই থেকে, ছোট একটা কড়াই তুলে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করে, 'তোমাকে কুথা থিক্যা লিয়ে এল? দাদার সঙ্গে আগে চেনাশুনা ছিল বুঝি?'

দাদা অর্থে গোপীদাস। বলি, 'চেনাশোনা ছিল না। শান্তিনিকেতনে দেখা হলো, সেখান থেকেই এলাম।'

'অ।'

কুসুম কড়াই বের করেও ওঠে না। তেমন যেন তাড়া নেই। মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি সত্যি দীক্ষা লিবে?'

একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। কুসুমের কথা বুঝতে পারি না। তারপরে হঠাৎ মনে পড়ে যায় বিন্দুর কথা। সে বলেছিল কুসুম আর আমাকে একসঙ্গে দীক্ষা দেওয়া হবে। কিন্তু সে কথা হঠাৎ এখন কুসুমের মনে পড়ে গেল কেন? আমি ওর অপলক উৎসুক চোখের দিকে চেয়ে দেখি। কী ভেবে জিজ্ঞেস করছে কুসুম? ও কি বিন্দুকে বিশ্বাস করেছে নাকি? এমন অসংশয়িত সরলতায় তাও অসম্ভব না। বলি, 'এখনো কিছু ঠিক করিনি। কেন বলো তো?'

কুসুম গ্রীবায় দোলা দিয়ে বলে, 'তোমাদিগের মতন কেউ তো ল্যায় না, তাই বইলছি।'

বলে, এক হাতে তেলের মাটি-পোড়ানো বৈয়াম, আর এক হাতে কড়াই ঝুলিয়ে নেয়। কিন্তু ঘরের বাইরে যায় না। হঠাৎ বলে, 'রাগ কইরলে মানুষ কত কী বলে, না কি, না?'

এ প্রশ্নের জবাব সহসা ধরতে পারি না। তা-ই চেয়েই থাকি। কুসুম আবার বলে, 'বোষ্টমদের বিটাটো এত গ্যাঁজা খায় ক্যানে? তা-ই ত নুড়ো জেবলে দেবো বইলছি, উতে কি পাপ হয়?'

মুহূর্তের মধ্যে যেন অন্ধকার সরে গিয়ে আমার চোখের সামনে আলো ঝলকে ওঠে। সেই আলোতে দেখি গভীর অনুশোচনায় উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসু একটি মুখ। আমার দীক্ষা, আগমন মূলে কিছু না। হয়তো আমাকে ডেকে নিয়ে আসার কারণও এইটুকুই। এই একটি জিজ্ঞাসা।

এই এক আশ্চর্য আলো-আঁধারি মুখ। কাঁচায় পাকায় মেশানো, তবু যেন সব কিছুরই ঊর্ধ্বে। এই ব্যাকুল উৎকণ্ঠা দেখে, কোথায় একটা ব্যথা ধরে যায়। মনে মনে বলি, তুমি হাজারবার নুড়ো জেবলে দিলেও বোষ্টমদের বিটা সেই কাশীনাথের মুখে সেই আগুন হাজার বছরের পরমায়ুর অমৃতে ঝরবে। তাড়াতাড়ি বলি, 'কখনো না। তুমি বললে কোনো পাপ হয় না।'

কুসুম আমার চোখের দিকে একটু চেয়ে থাকে। তারপরে আস্তে আস্তে হাসে। হাসি ফোটে তার ঠোঁটে, চোখের তারায়। বলে, 'কাল তাকে দেইখতে পাবে। এইস!'

আমি আলো নিয়ে ওর সঙ্গে যাই। কিন্তু আমার বুকের মধ্যে কোথায় কোনো এক প্রস্রবণ যেন ভেসে যেতে থাকে।

মনে করি, ঘুম আসবে। ঘুম আসে না। অথচ যেন এক ঘোর-লাগা ভাব। এ ঘোর আমার মনে লাগায় গোপীদাস। যেন আমার চিন্তার সীমায়, সীমান্তে সীমান্তে, এক দূর কালের চির রহস্যের, বাণী বন্ধনে বেঁধে বেঁধে যায়। আমি শুনি। আমার সমস্ত অনুভূতির মধ্যে এক আলো-অন্ধকারের দোলা। সেখানে বিস্ময় জাগে। জিজ্ঞাসার তরঙ্গ দোলে। কৌতূহলের অশেষে ভেসে যাই। গোপীদাসের নীচু ঘড়ঘড়ে মোটা গলার স্বর যেন বাতাসের গোঙানি। সেই গলার তত্ত্বকথা যেন, আমার সকল অনুভূতির পাথার বিথারে এক দীপশিখায় ভেসে যায়।

কিছুক্ষণ আগেই, রান্নার সেই চালাঘরেই, ভোজের আসর শেষ হয়েছে। নিতাই

যখন ধোয়া কলাপাতা নিয়ে এসেছিল, বিন্দু বড় বিচলিত হয়ে উঠেছিল। এই নিশিরাত্রে কী বলে, নিতাই কলাপাতা কেটে নিয়ে এল! নিতাই হেসে তাকিয়েছিল, গোকুলের দিকে। জানা গিয়েছিল, গোকুল সন্ধ্যার আগেই কলাপাতা কেটে রেখেছিল। কেন যেন তার মনে হয়েছিল, রাত্রে কলাপাতার দরকার হতে পারে। তাই নিয়ে কুসুম বেজায় চোপাও করেছিল। কথা নাই বাত্তা নাই, কলাপাতাগুলোন মুড়াল্ছ ক্যানে গ?...

কত স্বাদের, কত সাধের, নানাখানে, কত খিচুড়িই তো খাওয়া হয়। তবু মনে হয়েছিল, এমন স্বাদ পাইনি কোথাও। এক রকমের ডাল না, নানা রকমের। পাকা হলো সম্বরা দেওয়া। কাঁচা বিনা সম্বরাতে। প্রকৃতির রীতি বুঝি এই। সে যেখানে হাত দেয়, সেখানেই রসের আস্বাদ। বিন্দুর হাতখানিও পাকা। এমন কিছু মালমসলা ছিল না। প্রকৃতির হাতেতে তুক ছিল। তার ওপরে, চিতে বাবাজী নতুন মানুষ। তাই একটু আলু বেগুন ভাজার বিলাসিতা। সব শেষে, খেজুর রসে বানানো লবাৎ। অমন মিষ্টিমুখ আর হয় না।

শোয়ার প্রশ্নে অতিথিদের জন্যে বিছানা-পাতা ঘরটি ছেড়ে দেবার কথা হয়েছিল। আমি বেছে নিয়েছি, ঘরের বাইরে এই দাওয়ার কোণের তক্তপোশ। ঠাণ্ডা এখানে ঢুকতে পায় না। কেবল যে খড়ের চাল নিচে নেমে এসেছে, তা-ই না। দাওয়ার এদিকটায় মাটির দেওয়াল খাড়া। তার ওপাশেই রান্নাঘরের চালা। এখনো যেন আখা থেকে কাঠকয়লার উত্তাপ আসছে।

তক্তপোশের এখানে এখনো গাঁজার গন্ধ। এখানে বসেই, সকলের একপ্রস্থ হয়েছে। তারপরে সবাই শুতে গিয়েছে। ঘরে গিয়েছে বিন্দু রাধা কুসুম। গোকুল সুজন নিতাই গিয়েছে অন্য ঘরে। সে ঘরের বাইরে দেখেছি, ভিতর দেখিনি।

বিন্দুর আগে, কুসুম একখানি মোটা কাঁথা আমার গায়ে ফেলে দিয়েছিল, 'লাও, ইটো গায়ে দিয়ে শোও।' বিন্দু হেসে বলেছিল, এটি কুসুমের কাঁথা। চিতে বাবাজী যেন জুতজাত করে গায়ে দিয়ে শোয়। তবে বাবাজীর গঞ্জিকাসেবন যতক্ষণ চলেছিল, কুসুম একটুও নড়েনি। চিতে বাবাজী আবার কল্কে ধরে কিনা, ঠায় দাঁড়িয়ে দেখেছিল। ধরিনি। নিজের বস্তুতেই ধূমপান করেছিলাম। কিন্তু মন পাথারে পাড়ি দিও না। তার রঙ বাহারে, রঙ চিনতে যেও না। কূল পাবে না। কেবল, মনে হয়েছিল, সহজে যে প্রকাশ করে, সহজ সে তো নয়। কোথায় এক কাশীনাথের বৃত্ত ধরে। বৃত্ত করে আমাকে। মেয়ের চপল চাঞ্চল্যে মায়ের উদ্বেগ কোথায় মিশে থাকে, তার হদিস মেলে এমনি করে। সে যে হাত বাড়িয়ে, বুক দিয়ে সব আগলে রাখতে চেয়েছে। তবে কুসুমের এ মনে, সেই মন কেমন করে লীলায়িত, তা আমি জানি না। এত অনায়াস মাধুর্যে কেমন করে গলে, সে রহস্যও বুঝি না। কুসুমের দিকে চেয়ে, একটা হাসি উছলে উঠেছিল। কিন্তু চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে উঠতে যাচ্ছিল।

সবাই চলে যাবার পর, আমি আর গোপীদাস। তক্তপোশ তেমন সরু না যে, দু'জনের পাশাপাশি শোয়া হয় না। সারাদিনের অগাধ ক্লান্তি। শরীর মন ঘুমে ডুবে যাবারই কথা। অথচ যায়নি। তার জন্যে কোনো কষ্টও হচ্ছে না। সব মিলিয়ে, এই নতুন পরিবেশে, নতুন মানুষদের নেশা লেগেছে আমার। চোখে ঢুলুঢুলু আমেজ লাগে। মুখ গুঁজে শুইয়ে দেয় না। আমি কনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া। গোপীদাস দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আলস্যে এলানো। এইটুকু অনুমান। দেখতে পাচ্ছি না কিছুই। চারপাশে গভীর অন্ধকার। নিঝুম রাতের প্রাণ বাজে ঝিঁঝির স্বরে। চালের খড়, মাটির দেওয়াল, কাঁথা মাদুর, আশেপাশের গাছপালা, সব মিলিয়ে এক বিচিত্র গন্ধ।

এক সময়ে গোপীদাসের গলা শোনা যায়, 'বাবাজী কি ঘুমাও?'

'না।'

গোপীদাস একটু নড়াচড়া করে। তক্তপোশে শব্দ হয়। নিচু ঘড়ঘড়ে স্বরে বলে, ‘নানুরে চিড়া মুড়ি লিবার সোমায় বইলছিলে যে, গুরুসেবা কইরবে। না বাবাজী, কি কারণে কিছু বলি না। তবে বাবাজী, ক’দিন তোমার মনটো দেইখলাম চখের লজর দেইখলাম, তা-ই দুটো কথা বইলছি। বয়স তো হলো। মানুষ দেইখলাম মেলা। তা, তোমাকে দেইখে মনে হলো, লদীর মতন ভেইসে নাও। মনখানি টানা, যা পাও, তাই লিচ্ছ। তাই লিয়ে চইলে যাচ্ছ। এ বড় ভালো, তা-ই দুটো কথা বইলতে ইচ্ছা কইরছে। গুরু-চিন্তে ক’রো না বাবাজী, উতে তুমি ঠইকবে, আমি ঠইকব, বুইঝলে।’

বলতে বলতে বৃদ্ধ গোপীদাসের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। কিন্তু আমার নিজের কথা তার মুখে শুনে, নিজেই অবাক হই। নদীর মতো ভেসে যাই, যা পাই, তাই নিয়ে চলি, এমন অনিবার দুরন্ত প্রাণ আমার না। তবু, এই নিশীথে, গোপীদাসের এমন আশ্চর্য কথায় নিজেরই যেন আবেশ লেগে যায়। কথা বলতে পারি না।

‘বাবাজী।’

‘বলুন।’

‘ঘুম পাইচেছ?’

‘না।’

একটু চুপচাপ। যেন তেপান্তরের দূরে বাতাসের শব্দে গোঙানি ওঠে, তেমনি স্বর শোনা যায়, ‘বইলছি কি বাবাজী, আমি বাউল না। আমরা কেউ বাউল না। বইলতে পারো, গোকুল-বিন্দু বাউল। উয়ারা এখনো ধ্যানে মনে আছে। তা যদি না থাইকত, তবে এ আখড়া, বিটাবিটি ঘর-সোম্‌সারে ভরা-ভরতি হয়ে যেতো। সিটি হলো, পতন। তা, আমরা হলাম পতিত। কী কইরব বলো, এই চুল দাড়ি আলখাল্লা ধরা চূড়া ছাইড়তে পারি না। গুপীযন্তর আর বাঁয়া হইয়েছে কেবল হাতের শোভা। কিন্তু বাউল কেউ লই বাবাজী। বাউলের কখনো বিটাবিটি হবে না, এই জাইনবে। তা আমাদিগের খালি তত্ত্ব জানা সার। কাজের কাজী হলাম না।’...

গোপীদাসের গলা ডুবে যায়। যেন এই গভীর অন্ধকার এক বিশাল গহ্বর। তার মধ্যে ডুবে যায়। আমার মনে পড়ে যায়, দক্ষিণের দরিয়ার কূলে গাজীর কথা। পুরুষ-প্রকৃতি বচন তার মুখেও শুনেছিলাম। তত্ত্বের মূল তখনো জানতাম না। এখনো জানি না। তার মুখেও শুনেছিলাম, ফকির দরবেশের, পুরুষ-প্রকৃতির মিলনে, জন্ম বলে কিছু নেই। কিন্তু শেষ মুহূর্তে জেনেছিলাম, ঘরে তার ক্ষুধার্ত সন্তানেরা বাবার পথ চেয়ে বসে আছে। সেই মুহূর্তে দেখেছিলাম, গাজী না, দরবেশ ফকির না, মুরশেদের নাম নিয়ে এক দরিদ্র বাঙালী। তার অন্তরে বাস করে এক স্বামী, এক পিতা।

গোপীদাসের কথাতেও যেন সেই ধ্বনি শুনি। কিন্তু একটু ভিন্ন সুরে বাজে।

গোপীদাস বলে, ‘রাঁধবার জন্যে তোমার কাছে আনাজপাতি মসলা দিলাম। পাত্তর ধইরে দিলাম। চুলায় আগুন জ্বলে খা খা। কিসেতে কী দিলে কী হয়, সব তুমি জাইনলে। কিন্তু, রাঁধতে যেইয়ে, পুড়িয়ে সব ছাই কইরলে। আগুন লাগল তোমার গায়ে। পোড়া অংগ লিয়ে দৌড় দিলে। তুমি পাচক লও হে, তুমি পাচক লও। আমাদিগের হলো সি গোত্তর। আমরা কেউ বাউল না বাবাজী। গোটা দেশ চুইল্যে বাউল পাবা দু-চার জনা। আর সব জাইনবে খালি চুলা আলখাল্লা সার। হাঁ বাবাজী, অনেক নেকাপড়া তো কইরেছ, চণ্ডীদাস জয়দেব বিদ্যাপতির কোনো বিটাবিটি ছিল, শুইনেছ?’

কথাটা যেন নতুন সুরে বেজে ওঠে কানে। কখনো তা ভাবিনি। কখনো তো শুনিনি। একটু অবাক হয়েই বলি, ‘না তো।’

'তবে? ওঁয়াদের তো • পিকিতি ছিলেন। রাণী পদ্মাবতী লছমী। সি কারণে ওঁয়ারা হলেন রসের রসিক। "যে জন অনুরাগী হয়, সে রাগের দেশে যায়, রাগের তালা খুলে সে রূপ দেখতে পায়।" লালন ফকিরের কথা বাবাজী। তা, ওঁয়ারা তালা খুইলতে জানেন। আমরা জানি না। মনে ল্যায়, গোকুল-বিন্দু পাইরবে। উয়াদের আট বছর একত্তর বাস। ই দুটোতে তালা খুইলবে। আমরা পাইরলাম না।'...

গোপীদাসের কথা শেষ হয় না। তার আগেই নিশ্বাসের ঢেউ এসে কথা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। দাওয়ার অন্ধকার কোণে সেই নিশ্বাসের বাতাস যেন পাক দিয়ে ফেরে। অ-মুক্ত বন্ধনে বাঁধা হাহাকার বাজে, তবু যেন আমার মনে অন্ধকার ভার। আমার ভিতরের জিজ্ঞাসা বাইরের শব্দে বাজে, 'এ কেমন ভজন, কিসের ভজন।'

গোপীদাস যেন সহসা জেগে ওঠা স্বরে বলে, 'আঁ? বইলব, বাবাজী সি কথাটো বইলব।'

তবু আমার জিজ্ঞাসা বাজে, 'চণ্ডীদাস-রামী, জয়দেব-পদ্মাবতী, তাঁদের সঙ্গে এই সাধনার সম্পর্ক কী?'

'তাও বইলব বাবাজী। আগেও বইলছি তোমাকে, আবার বইলব, ভেঙেচুরে বইলব তবে বুইঝবে। তোমাকে বইলব। ক্যানে? না, অই কথা, তুমি বাবাজী সাধু চোরে মিশামিশি। তুমি বাদী পিতিবাদী, রাগী বিরাগী। মানো বা না মানো, আপনার বাবা-মাকে যেইয়ে জিগে'সা করো, তোমার জম্মের মধ্যে কিছু একটা চমক আছে। কম্মের মধ্যে মেলা ফাড় ফোড় আছে। নিজে ভেইবে দেখ।'

গোপীদাসের কথা সহসা হৃদয়ঙ্গম হয় না। সে কি জ্যোতিষী শোনায় নাকি? তাতে বালাই, সে চিন্তা আমি করি না। কিন্তু জন্মের মধ্যে চমক মানে কী? জিজ্ঞেস করি, 'ঠিক বুঝলাম না। জন্মের মধ্যে চমক আবার কি?'

অন্ধকারে একটা হাত এসে আমার গায়ে পড়ে। গোপীদাসের হাত। গায়ে হাতড়ে সে হাত আমার মাথা স্পর্শ করে। বলে, 'মন্দ কিছু না বাবাজী। এই যেমন ধরো, কেউ জম্মায় ভাদ্দর মাসে জম্মাষ্টমীর দিনে, আবার কেউ দোল পুন্নিমার দিনে। কেউ জম্মায় মায়ের বাসন মাজার ঘাটে, কেউ পথের গাছতলায়। এই চমকের কথা বলি। তোমার তেমন কিছু আছে।'

নিজের কথায় সাত কাহন, ভাবতে লজ্জা করে। তবু যেন সহসা মায়ের গলার স্বর আমার কানে বেজে ওঠে। আমি আমার জন্মবৃত্তান্তের কাহিনী শুনি। অবাক লাগে তাই। গোপীদাসের কথার সঙ্গে যেন কোথায় মিলে যায়। জন্মবৃত্তান্তের ঘটনায় তার চমকের মিল দেখতে পাই। জিজ্ঞেস করি, 'কী করে বললেন?'

গোপীদাস মাথায় একটু হাত বুলিয়ে বলে, 'মন্তর-তন্তর না বাবাজী। বাউলের মন্তর-তন্তর বেদ বেরাহ্মণ নাই। তোমাকে দেইখে মনে হয়, তাই বলি। আপন কম্মের কথা ভাবো। ইদিকে যাও তো উদিকে ধাক্কা, উদিকে যাও তো ইদিকে। ঠেকাঠেকি বাঁকা-বাঁকি, নদীর মতন। বাঁধালে পইড়বার লোক তুমি লয়। তাই তোমাকে বইলব। তুমি শুইনলে বুইঝবে। বিকার হবে না।'

কিন্তু এমন করে আমার কর্মের কথা গোপীদাস বলে কেমন করে! শুধু চোখের দেখায়, এই মানুষের কর্মের সর্পিল গতি সে চিনতে পারে? অথচ নিজে তো জানি, কর্ম আমাকে কখনো সোজা পথ দেখায়নি। কঠিন যত, বাঁকা তত। মুখ তোলবার আগে জীবনস্রোতের ঝাপটায় ভেসে গিয়েছি অন্য দিকে।

গোপীদাসের হাত সরে যায় আমার মাথা থেকে। তারপরে তার গলার স্বর যেন, নিরবধি কালের স্রোতে গুনগুনিয়ে বাজে, 'বাউলের মোদ্দা কথাটো শুইনছ তো, যা নাই ভাণ্ডে, তা নাই বেহ্মাণ্ডে। অই অই গ বাবাজী, উটি হলো আসল

কথা। তোমার শরীলে যা নাই, তা জগৎ-সোম্‌সারে নাই। ভজন করো, পূজন করো, সবই শরীলের মধ্যে। পুরুষের শরীলে, আর নারীজাতির শরীলে। ই দুয়েতে মিলন হলে, তবে সব মিলে।'

আমি সেই নিরবধি স্রোতের গায়ে। জিজ্ঞেস করি, 'মিলন?'

'হ্', হ্', হ্' গ বাবাজী, মিলন। তব্‌বে হ্', ই তোমার বিয়ে নিকার পরে, আঁতুর ঘরের কারবার লয়। চিতার যেমন আঁধার রেতে, পাকে পাকে ঘোরা, ইখ্যান থেকে উখ্যানে, জঙ্গল থেকে জঙ্গলে, তা'পরেতে একেবারে অব্যর্থ শিকার, তেমনি। চিতা যেমন খালি শিকারের ঘোরে থাকে, ভাবে থাকে, চখের লজরে শিকার ঘোরে, তেমনি। লক্ষ্যভেদের কথা জানো তো বাবাজী, অর্জুনের লক্ষ্যভেদ। দ্রৌপদীকে পাবার আগে যেমন মীন লক্ষ্যভেদ কইর‍্যেছিল, তেমনি। কী কইরে কইর‍্যেছিল বাবাজী, মনে আছে?'

বলি, 'আছে। নিচে মাছের ছায়া দেখে, ওপরে—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই, গোপীদাসের গলায় শব্দ ওঠে, 'অই অই অই।'

সঙ্গে সঙ্গে তক্তপোশ দুলে ওঠে। গোপীদাস নিজেই হাত পা নাড়িয়ে দোলে। বলে, 'অই, নিচেতে জলে মীনের ছায়া দেইখে, ঊদধে মারে তীর, তার নাম লক্ষ্যভেদ। জয় গুরু জয় গুরু! বাবাজী, এর নাম পুরুষ-পিকিতি মিলন। রতি আর রসের খেলা। নিচের জলের ছায়ায় খেলা করে, আসল মিলন উপরে। সিখ্যানে জম্‌মো মিত্যু নাই। সিখ্যানে, "বিষামর্তে আছে মিলন, জাইনতে হয় তার কিরূপ সাধন, দেইখ যেন গরল ভক্ষণ করো না হায় রে।" হাঁস যেমন জল থেকে দুধ খেয়ে ল্যায়, এ মিলন তেমনি। বুইঝলে বাবাজী।'

আমার চারপাশের অন্ধকার দুয়ার ভেদ করে, সহসা যেন একটা ঝলক লেগে যায়। বাউল পুরুষ-প্রকৃতির মিলন রহস্য, একটা চকিত ঝঙ্কারের মতো আমার অবোধ অনুভূতির মধ্যে বেজে ওঠে। কিন্তু আমি কথা বলতে পারি না।

গোপীদাস বলে যায় বাউল তত্ত্ব। সে বলে, দুই দিকে দুই নদী বহে যায়। তার এক নাম কাম, আর নাম রতি। এই দুই নদী যখন বহে, তখন সে এক টানেতে চলে। কিন্তু মাঝখানে তার অমৃত নদী। কাম রতির মিলনে, সেই অমৃত নদী উজান বহে চলে। সেই অমৃতের যে নদী তাতে ডুবতে পারলেই সুখ। মহাসুখ। কামেতেই তাই প্রেম। প্রেমেতেই উত্তরণ। সেখানে মানুষ জীবের জন্মলীলা নেই। পতন পাতন ত্যাগ করে, সেই যে নিরন্তর মহাভাবের অনুভূতি, তাই জানবে বাউলের সাধনা।

কিন্তু, উজান চলতে পারে কয়জন। উজান চলার সাধন যে সাধেনি, ভেসে যায় সে স্রোতের টানে। তখন সে বিষয়ে পোড়া। আগুন কেবল ভস্মস্তূপ। সাধতে জানা চাই। কেমন সাধন? যোগসাধন। তখন দমের ঘরে দম। সেই জন্যে বলেছে, 'ব্রহ্মাণ্ডের পরপারে আছে মূলাধার মূলে। নাহি দিবা নাহি রাতি, মন, মানুষের মহলে। চন্দ্র সূর্য যেতে নারে সে দলকমলে।' তার জন্যে সেই সাধন, 'যে কারণে যোগী ঋষি, রেচক, পূরক, কুম্ভক কেন করে অনিবার।'

এই সঙ্গে জানবে, তুমি বাইরে যারে তত্ত্ব করো, অবিরত সে আছে আজ্ঞাচক্রের ওপরে। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি আছে মূলাধারে। প্রণয়ের যোগে জাগাও তাহারে। তোমার বামে ইড়া, ডাইনে পিঙ্গলা, মধ্যে সুষুম্না। রজঃ তমঃ গুণে খেলা খেলছে। সেই জন্যেই, নিশ্বাসে বিশ্বাসে দম। যার নাম রেচক পূরক কুম্ভক।

শুরুতে চাই পুরুষ-প্রকৃতির আপন শরীরবস্তুর নানা পান-ভোজন। সেসব সকলই গঙ্গা-যমুনা-বারি, অমৃত স্বাদ। উভয়ে উভয়ে পিয়ে, তাইতে সুন্দর। সে আলো চাই, রূপবতী রসবতী যুবতী প্রকৃতি। যে প্রকৃতির মন সাধিকার মতো একাগ্র। আপন

ভজনে যে সতী, শক্তিধারিণী। বাহ্যিক জীবনে সে যাই হোক, ব্রাহ্মণী-শূদ্রাণী, রজকিনী-নরসুন্দরী, যবনী-কপালী-বেশ্যা-নর্তকী। মোচন বচন কিছু নেই তার। আছে প্রেম সাধনের এক মন, এক দেহ।

একেই বলে, পরকীয় সাধন। পরকীয় সাধন মানে, পরস্ত্রীর সঙ্গে না। 'উটি লোকে ভুল জানে গ বাবাজী। বলে রাধাকিষ্টের লীলা যেমন, পরকীয় তেমন। না, উটি ল্যায্য কথা লয় জাইনবে।' পরকিতি পিরীতিই হলো পরকীয় সাধন। তবে কিনা প্রকৃত রসের রসিক কৃষ্ণ-রাধা। বাউল সাধন সময়ে আপনার মধ্যে তাঁদেরই অনুভব করে। নিজেদের রাধা কৃষ্ণ কল্পনা করে। 'ক্যানে কিনা', নিরন্তর শৃঙ্গার লীলাময় রূপের মধ্যেই প্রেম প্রকাশিত। রজকিনী রামী পরের ঝি বটে, স্ত্রী না। পদ্মাবতীও তা-ই। যে সাধকের কাছে যেমন সাধিকার আবির্ভাব। দুয়ের মধ্যে প্রেম না থাকলে সাধন হয় না। যত আকর্ষণ, তত বিকর্ষণ। শেষ পর্যন্ত যা থাকে তা অন্য অনুভূতি, যখন আকর্ষণের বালাই নেই। তখন উভয় শক্তির স্তম্ভিত সাম্যে এক চিরমিলনের আনন্দ। সেই আনন্দের মধ্যে 'মনের মানুষের' অনুভব। 'ভাবের মানুষের' সঙ্গে সাক্ষাৎ। এই অনুভূতির আর এক নাম, 'সহজ মানুষ'। তখনই জানবে, 'আমার কাম নদীতে টান ধরেছে, প্রেম নদীতে জল ধরে না।'...

এই 'সহজ মানুষের', 'অধর মানুষের' আবির্ভাব কোথায় হয়? প্রকৃতির রজেঃ। তাই বাউল বলে, 'মীনের আবির্ভাব হয়েছে। সাধক হে, এবার বাঁধাল বাঁধো জলে।' যে তিন রসেতে তাঁর আবির্ভাব, সে ঠাঁইয়ের নাম ত্রিবেণী। এবার ত্রিবেণীতে ডুব দাও। মীন রূপী সেই 'অধর' ধরো। কিন্তু সাবধান, এই ত্রিবেণীতে ডুব দিয়ে সাধিকার অঙ্গ না ভেজে। তার যেমন বেণী তেমনি থাকবে, চুল ভিজবে না। সাধক ডুব দিয়ে মীন তুলে আনবে, গায়ে একটু জল লাগবে না। সেই যে বলে, রাঁধবে বাড়বে খাবে সুখে, স্বামীর ঘর তো করবে না, তার অর্থ, 'স্বামী'র ভজন সে করে না। সে 'সহজ মানুষ' ভজে। হেথায় স্বামী-স্ত্রী নেই। এই 'সহজ মানুষ'কে ধরে সাধক সাধিকা উল্টাকলে উজান বেয়ে নিয়ে যায়। তিনি তাই অনুভূতিগম্য নিবিড়, অচঞ্চল মিথুনানন্দস্বরূপ। বাউলের পরমাত্মা শৃঙ্গার রস লীলাময়। ইনিই 'অটল'। যদি টলে, তবে 'জীবাচার'। 'প্রেমাচার' আর হলো না।

গোপীদাস বলে, আমি শুনি। আমার মনের নিবিড় অন্ধকারের গহীন বিস্তারে তার কথা যেন এক দীপশিখার মতো ভেসে চলে। আমার কল্পনার চক্ষে নানা দৃশ্য, নানা ছবি, বিচিত্র অনুভূতি খেলে।

তারপরেও প্রশ্ন জাগে, এই সাধনের লক্ষ্য কী? কোন্ ঈশ্বরের আরাধন ?

সেই এক লক্ষ্য, অচঞ্চল মিথুনানন্দের মধ্যে 'মনের মানুষে'র অনুভব। 'সহজ মানুষ'কে অনুভূতিগম্য করে তোলা। ইনিই ঈশ্বর। বাউলের আর কোনো ঈশ্বর নেই। এই 'অনুভব'-ই ঈশ্বর। সে জন্যেই গান, 'টলিলে জীব, অটলে ঈশ্বর। এর মাঝে ক্রীড়া করে রসিক শেখর।' জগৎজোড়া মীন সেই গাঙে, খেলছে খেলা পরম রঙ্গে। 'সোনার মানুষ ভাসছে রসে।' ইনিই সেই ঈশ্বর। রূপের মধ্যে অরূপ। আকারের মধ্যে নিরাকার।

এক মহা সুখবাদেরই কথা শুনি। বৌদ্ধ সহজিয়া, হিন্দু তন্ত্র সাধনার সঙ্গে এর তফাত বুঝতে পারি না। পরস্পরের যোগসূত্র কোথায় জানি না। তবু, সব মিলিয়ে আমার মনের মধ্যে এক বিশাল ভারত, যেন রহস্যকুয়াশাবেষ্টিত, জেগে ওঠে। কিছু তার দেখতে পাই, কিছু পাই না। নিরন্তরের পথে সে চলেছে, বিচিত্র তার ভাঙাগড়া। মুগ্ধ হই, আবার ভয় পাই। আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠতে গিয়ে ব্যথা বেজে ওঠে। বিস্মিত হতে গিয়ে হেসে বেজে উঠি।

এই একটি লোক গোপীদাস। এক গ্রামীণ বাঙালী। তার মুখ থেকে শুনি এক ভিন্ জগতের কথা। আমারই আর এক পরিচয়। যে-পরিচয়ের লিখন আমার সমাজে পরিবেশে কোথাও নেই। কিন্তু আমারই চারপাশে ছড়িয়ে আছে।

অথচ এই পরিচয়ের কোথাও ভারতের সেই অধ্যাত্মবাদের চিহ্ন দেখি না। এই দেহবাদের মধ্যে কেবল বস্তুবাদের লীলা। ঈশ্বর নেই, ব্রহ্মণ্যবাদের কথা নেই। বেদ-বিধিবহির্ভূত এ আর-এক জগতের সংবাদ। আর-এক ভারতের সংবাদ। সেই ভারত আগে কতখানি ছিল, জানি না। দেখছি, আজও তার কিছু কিছু আছে। হয়তো ভবিষ্যতে থাকবে না।

গোপীদাস তখনো বলে, 'তাই জাইনবে বাউলের কোনো জাত নাই। মানুষের কোনো জাত নাই। সি কথা বইলছেন রসিক চন্ডীদাসে। আর জপ-তপ মন্তর-তন্তর, তাও বাউলের না। দেখ নাই ক্যানে, বামুনে তপ্পোন করে, বলে, স্বগ্গে পিত্রি পুরুষকে জল দেয়। ই হবার লয় বাবাজী। বাউলের গান আছে,

'বামুন বলে, তপ্পনে জল স্বগ্গেতে যায়।
হায়, অনাবিষ্টির মাঠে চাষা কাঁদে হে
ঠাকুর, তোমার তপ্পনের জল হোথা ক্যানে না যায়?'

গোপীদাসের ঘড়ঘড়ে গলায় একটু হাসি বাজে। বলে, 'ই হলো কথা বাবাজী। সোম্সারখানি সোম্সার বটে, উয়ার মধ্যে মানুষ লীলা করে। কেউ ভজে 'সহজ মানুষ'। কেউ ভজে 'জীবপ্রেম'। আর কিছু না।'

সে চুপ করে। সহসা একটা ঠান্ডা হাওয়ার ঝলক লাগে গায়ে। কোথায় যেন একটা নাম-না-জানা পাখি ডেকে ওঠে। রাত্রিশেষের সংকেত।

গোপীদাসের আর কোনো সাড়াশব্দ পাই না। কী একটা গানের কলি গুনগুন করতে করতে সে নৈঃশব্দ্যে ডুবে গিয়েছে। অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে। হয়তো চোখে তার ঘুম নেমেছে। কিংবা তত্ত্বকথা বলতে গিয়ে নিজের ব্যর্থ সাধনের ব্যথায় মুখ গুঁজে আছে। কারণ, বাউল তত্ত্বের পরে আরো কয়েকবার সে সেই কথা বলেছিল, 'আমরা কেউ সাধক লই বাবাজী। যে যোনিতে জম্মো, সেই যোনিতেই মিত্যু আমাদিগের। আমরা বাউল না।'...তারপরে কী যেন গুনগুন করছিল। এখন নিশ্চুপ।

থেকে থেকেই ঠান্ডা হাওয়ার ঝলক আসে। তার দংশন তেমন ভয়ংকর না। তবু কুসুমের দেওয়া কাঁথাটিকে আর হেলাফেলা করা গেল না। পা থেকে গলা অবধি ঢাকতে হলো, একটু আগেই এক নাম-না-জানা পাখির ডাক শুনেছি। সে ডাক যেন অবাক প্রাণের চকিত, স্খলিত শব্দ। এখন আবার থেকে থেকে সেই ডাক বাজছে। এখন আর অবাক স্খলিত না। পাখির প্রথম ডাক ছিল অবাক জিজ্ঞাসা, 'এ কিসের বাতাস আসে? রাত কি পোহায়?' যত সময় যায় ততই তার গলায় আগন্তুক দিনের আলোর অসংশয় ধ্বনি বেজে ওঠে, 'ওই আসে, দিন আসে।'

বালিশে মাথা পেতে দিই। তন্দ্রার আবেশ লাগে। অঘোর ঘুম নামে না। এই রাত্রিশেষে আর বোধ হয় নামবে না। গোপীদাসের বাউল তত্ত্ব আমার মস্তিষ্কের চারি সীমায় ফিরতে থাকে। আর বাউল গানের কথা দুর্বোধ্য রহস্যময় মনে হয় না। এখন আর অস্পষ্ট আবছা আলো-আঁধারি মাখামাখি লাগে না। এখন যেন প্রতিটি কথা দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ দেখি। গহীন জলের তলায় সকলই আমার চোখে সুস্পষ্ট।

বাউলের গান আসলে গান না। সকলই তার সাধনমার্গের ঠিকঠিকানার কথা। গানই তার মন্ত্র। সে সদাই থাকে আপন ঘোরে। সদাই জপে আপন সাধন। সেই রসের রসিক যে, সে বোঝে। অরসিকের লাভ কেবল বিচিত্র বাণীর ছন্দে, লয়ে মানে তালে গানের ডালি। নানাভাবে বাউল তার গানে সাধন পথের প্রতীক খোঁজে। এই প্রতীক

দিয়ে যখন সে গান বাঁধে তখন সে শিল্পী। কত যে তার প্রতীক! যুগে যুগে যুগ-বদলের হাওয়ায় তার প্রতীক বদলে যায়। বলে তার বাড়ির কাছে আরশিনগর, তবু পড়শীর দেখা পেল না। এখন জানি, আরশিনগর আপনারই 'দেহভাণ্ড'। পড়শী সেই 'অধর মানুষ'। রেলগাড়ি দেখেও বাউলের কবি-কল্পনা জাগে। কয়লায় আর জলে এই যে এঞ্জিন চলে, তার সঙ্গে মানুষের শরীর কল্পনা, 'মানুষ চলছে আজব কলে'। অন্যত্র বলে, 'গাড়ির প্রথম লক্ষ্য রাধা জংশনের দিকে। তিন লাইন পেরিয়ে (ত্রিবেণী) রাধা নামের জংশনে এসে গাড়ি উজান পথে চলে।' এই কারণে তার নিজেকে বারেবারে সাবধান,

ভাল কইরে পড় গা ইস্কুলে
নইলে দুঃখু পাবি শেষকালে।

গুরুর কাছে সাধনপদ্ধতির ঠিক পথ চিনে নিতে হবে। নইলে কপালে দুঃখ। সেজন্যে বাউল কেবল জয় গুরু ধ্বনি দেয়। গুরু তার ঈশ্বরের তুল্য। কেননা, পথের সন্ধান তিনি দেন। সে পথে আছে বিষধর কালনাগ, দংশন করবে। দংশনে মৃত্যু। গুরু চিনিয়ে দেবেন পথের দিশা। কালনাগকে জয় করে কেমন করে সাধক যাবে? বাউল এতই বিনয়ী, সে সকলের কাছেই কিছু শিখতে চায়। হাটে মাঠে, ঘরে সংসারে, মঠে আখড়ায়, সকলের সব কথার মধ্যেই সে তার সাধন-পথের সংকেত খোঁজে। সংকেত পায়। তাই তার অঠিক বেঠিক, অথিক পথিক, গুরু অগণন। গুরু বলে কাকেই বা সে বিশেষ করে প্রণাম করবে। সেই কারণে বাউলের গানে সামান্য মানুষের, সামান্য কথার সুর বাজে। ভিতরে তার অসামান্যের খোঁজাখুঁজি। সেই একমাত্র জানে, সে নেই বৃন্দাবনে। 'বেরথা তারে খুঁজে মরা মাটির এই বেন্দাবনে, ভুঁয়ে নি সে বসবারই ধন, বসবে হিয়ার মাঝখানে।'

হাজার বছর আগে চর্যাপদের দোহায় এ কথা আগেই ধ্বনিত হয়েছে। সেখানেও সেই কথার খেলা। চর্যাপদের গানও তখন হয়তো মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে। সাধকের মুখে গান শুনে সাধারণে গেয়েছে। কিন্তু তার ভিতরে ঢুকতে পারেনি। সেখানেও অরসিকের গান, রসিকের সাধনতত্ত্ব। পণ্ডিতেরা তাই চর্যাপদের দোহাকে নাম দিয়েছেন সন্ধ্যাভাষা। যা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট না। রাতের অন্ধকারের মতো কালোতে ঢাকা না। অস্পষ্ট আবছায়ায় থেকে যায় আসল কথা। দেখা যায়, তবু দেখা যায় না। ধরি ধরি করেও ধরা দেয় না। সেখানে সাধন-সংকেতের প্রতীক হয়েছে চঞ্চলা হরিণী, শিকারী ব্যাধ। শবরী বালা বা ডোম্বিনী নারী অবস্থান করেছে সাধকের বজ্র-সাধনের পদ্মমণ্ডলে। গভীর বিশাল নদী দুর্যোগে পার হয় সাধক সেই নারীর আশ্রয় নিয়ে।

বাউল গানের মতোই কথা শোনায় এক। আসল সুর বাজে অন্যখানে। হিন্দু তন্ত্রেও তাই। নানা ভাষা, নানা সংকেত, নানা প্রতীক। কিন্তু কথা সেই এক, লক্ষ্য এক, উজানে চলো সাধক। সেই তোমার শক্তি। নিম্নে রাখো দৃষ্টি, লক্ষ্যভেদ করো ঊর্ধ্বে। কেউ সাধে, জন্মান্তরে আর যেন জীবাকার না ঘটে, জন্মান্তর না হয়। কেউ সাধে শক্তি। শক্তিই মুক্তি, মানব-জীবন সার্থক।

ফললাভের বিচার আমি করি না। আমি বুঝি না। আমি জানি না। আমার চোখের দুয়ারে দেশের, কাল-কালান্তরের, রূপ-অরূপের এক তরঙ্গ দোলে। আর ভাবি, কত স্রোত মেশামেশি, তবু এক স্রোতেই যেন ভারতবর্ষ চলমান। এক স্রোতের হেথায় এক রঙ, হোথায় আর রঙের ঝলক। তারই সঙ্গে বিবিধ বিচিত্র মানব-গোষ্ঠী। কত যে তার ধ্যান-ধারণা, কত বিভিন্ন মন! কত বিচিত্র রূপ! নানা ভাবে, নানা রূপে, যাত্রা যেন সেই একই অরূপের দ্বারে।

তবু একটা মন যখন এমনি ভাবের স্রোতে ভাসে, আর একটা মন ঠেক খেয়ে খেয়ে থমকায়। তন্ত্র, বজ্রযান, বাউল, বেদবিরুদ্ধ এই দেহবাদ, কোথায় তার আদি? অন্তেই বা কী? এ যেন ভাবে আর বস্তুতে বিরোধ। সেই দূরে, দূরকালের, কৃষি উৎপাদনের প্রতীক ধরে মানুষ যে খেলা খেলেছে, এই দেহতত্ত্বের সঙ্গে কি তার কোনো সুতো-বাঁধাবাঁধি আছে? অস্পষ্ট আবছায়ার ধন্দ আমার চোখে। স্পষ্ট দেখতে পাই না। শুধু এইটুকু দেখি, পিছনের সেই দূরান্তের কালে দমনের নামগন্ধ নেই। সেখানে উজান, ঊর্ধ্বগমন, গূঢ় সাধনপদ্ধতি নেই। সেখানে সৃষ্টির বাসনায়, বিশ্বাসে, নানা বিচিত্র রীতি-পদ্ধতিতে পৃথিবীর অনুকরণ। মানুষ মাটি কেটেছে, বীজ বুনেছে। আর বালিকা যবে প্রথম সৃষ্টির সংকেতে ঝলকে উঠেছে, তখন পুরুষ তার সঙ্গে কর্ষিত ক্ষেত্রে সৃষ্টির সহজ আচরণে নিবিড় মিলনে মিলেছে। বলেছে, 'হে পৃথিবী, তুমি যা করো, আমরাও তা-ই করি। তুমি উৎপাদন করো, আমরাও উৎপাদন করি। আমার দেহের সৃষ্টির সকল কণা তোমার মৃত্তিকায় রেখে যাই। বীজের ভাঁজে ভাঁজে দিয়ে যাই। তোমার গর্ভ ভরে উঠুক। বীজ আহরণ করে আমি গর্ভবতী হই।'

এই বিশ্বাসে মানুষ কত বিচিত্র আচরণ করেছে। কত রহস্য, গূঢ় গুপ্ত ভাবে গানে নাচে কথায় মিলনে লীলা করেছে। মলুটির সাঁওতালদের গণ-মিলনের মধ্যে আসলে সেই আকাঙ্ক্ষা ফুটেছে। শান্তিনিকেতনের সাঁওতালদের উৎসবকে তাই এই সভ্যতার চোখ দিয়ে চেনা যায়নি।

এ সব-কিছুর মধ্যেই বস্তুর সংকেত। তাই ভাবি, দেহতত্ত্বের মধ্যে কি সেই কৃষি-লীলার কোনো যোগ আছে? যে যোগাযোগ পরে ধর্মতত্ত্বের আঙিনায় এসে উজান, ঊর্ধ্বগমন, দমন হয়ে উঠেছে?

জানি না। বুঝিও না। আমার মস্তিষ্কের সীমায় সীমায় এক বৃহৎ দেশ এক বিস্ময়কর অর্থবহ ছবির মতো ভেসে ভেসে চলে। অরণ্য পর্বত নদী, নগর পুরী, জনপদ, বিভিন্ন বিচিত্র কোটি কোটি মানুষ। আমি তাদেরই মধ্যে ফিরি, আর নানা রূপে নিজেকেই যেন খুঁজি। যত দেখি, বিস্ময়ে আনন্দে আমার কথা ফুরিয়ে যায়। কেবল নতমস্তকে, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে শীতল মৃত্তিকায় বুক চেপে যেন স্তব্ধ হয়ে থাকি। আমার সকল চেতনা কী এক গভীরতায় ডুবে যেতে থাকে!

সহসা একটি মেয়ে-গলার ঝংকারে প্রথমে শ্রবণ বিদ্ধ, অতঃপর চমকিত নিদ্রাভঙ্গ। যেন এক স্বপ্নাবেশে ছিলাম। চোখ তাকিয়ে প্রথমেই দেখি দিনের আলো দাওয়ায়। আমার গায়ে কাঁথা। মুহূর্তেই মনে পড়ে যায়, কোথায় আছি। কাঁথা সরিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বসি। পাশে গোপীদাস নেই। তক্তপোশ থেকে যতটুকু উঠোন দেখা যায়, সেখানে কোনো মানুষ দেখতে পাই না। কিন্তু কথা শুনতে পাই। শুধু শুনতে পাই না, বুঝতেও পারি, যার গলার ঝংকারে আমার নিদ্রিত শ্রবণ বিদ্ধ হয়েছে, সে কুসুম। সেইজন্যেই বিন্দুর গলায় সামাল সামাল রবও শুনি, 'আ ছি ছি কুসুমি, তোর জ্ঞান-গম্যি কিছু নাই ক্যানে? এই শুইনলি বাবার মুখে, চিতেবাবাজী সারাটা রাত জাগা ছিল, এই মাত্তর একটুকু চখ বুজেছে! তুই হাঁকড় পাড়ছিস?'

একটু চুপচাপ। তারপরে কুসুমের কিঞ্চিৎ নীচু গলার ফোঁসানি শোনা গেল, 'তা সাতসকালে এইসে ওকে কে উসব কথা বইলতে বইলছে। ক্যানে বইলবে।'

উত্তরে বিন্দুর গলা, 'ক্যানে, কাশী তো মন্দ কিছু বলে নাই। বইলছে, আগে জাইনলে উ-ও রাতে আইসত, সকলের সাথে খেতো, বইসত।'

অই হরি! আবার সেই কাশীনাথ! তাই কুসুমের অত চোপা! আবার এই কাশীনাথের অমঙ্গল ভাবনাতেই গত রাত্রে কুসুমের অন্য মূর্তিও দেখেছি। কিমাশ্চর্যম্ ভোলা মন, সংসারে সকলই সম্ভব, বিচিত্র বাহারে। কিন্তু আমার ভাবনাতে

বালাই। কুসুমের গলা আবার শোনা গেল, 'তাই খালি বইলছে বুঝিন ও? এই যে বইললে, "কাল রেতের বেলায় এলে দম চড়ানো যেতো।" উ কথা বইলবে ক্যানে? ইটো কি দম চড়াবার আখড়া?'

এবারে আর বিন্দুর গলা হঠাৎ শোনা যায় না। একটু পরে দমে যাওয়া স্বরে শোনা যায়, 'বইলছে বুঝিন?'

কুসুমের গলা, 'বলে নাই?' সামনেই তো দাঁড়িয়ে রইলছে, আবার দাঁত বের করে হাইসছে, লজ্জাও করে না। জিগ্যেস করো ক্যানে।'

এবার একটি বেপরোয়া কাঁচামিঠে ছেলের গলা শোনা যায়, 'বইলছি তো, হুঁ বইলছি, বেশ কইরছি। লিতাইদা বইললে কাল খুব দম হয়েছে। আমি থাইকলেও দম দিতাম। তাতে হয়েছে কী?'

কুসুম আবার ভুলে গেল চিতেবাবাজীর নিদ্রার কথা। আগের মতোই ফোঁস করে ঝংকার দিয়ে ওঠে, 'ইস, দম দিতাম! মুখে নুড়ো জেবলে দিতাম না তা'লে।'

আবার নুড়ো জবালা! কুসুমের প্রাণে কি ভয় নেই। তার কি বুক ধুকধুক করছে না!

সঙ্গে সঙ্গে ছেলে-গলা ঝেঁজে ওঠে, 'এঃ, কুথাকার মা গোঁসাই এইলেন র‍্যা, নুড়ো জেবইলে দেবে। তোর মুখে নুড়ো জেবইলে দেবো।'

পরবর্তী দৃশ্যে যে কী ঘটতে যাচ্ছে, দাওয়ার এক কোণে বসে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কেবল বিন্দুর উৎকণ্ঠিত গলা শুনতে পাই, 'এই, তোদের দুটোকে লিয়ে আমি আর পারি না। কাশী, তুই যা, তুই যা তো ভাই এখন। নইলে এই হাঁকাহাঁকি থাইমবে না।'

কাশীনাথের গলা শোনা যায়, 'যেঁছি যেছি, উয়ার মুখ দেখবার নেগে ইখ্যানে থাইকব না।'

কুসুমের মুখ দেখবার জন্যে এখানে থাকবে না। সে যাচ্ছে। আমি ভাবি, কুসুমও তা-ই চায়। তার বুঝি হাড় জুড়ায়। রাগারাগির ব্যাপার তো। রাগের নাম চন্ডাল। কিন্তু শেষরাত্রের সেই নাম-না-জানা পাখির মতোই যেন কুসুমের গলায় ভিন্ন সুরে স্খলিত ডাক বাজে। সে একবারে অন্য সুরে বলে ওঠে, 'চলে যাবে ক্যানে! বইললাম ক্যানে, চিতেবাবাজী উকে দেইখতে চেয়েছে।'

অর্থাৎ কাশীনাথকে আমি দেখতে চেয়েছি। চেয়েছি বলে কিছু মনে করতে পারি না। তবে কুসুম রাত্রে বলেছিল, সকালে তাকে দেখতে পাবো। কুসুম কথাটা বোধ হয় বিন্দুকেই বলে। কিন্তু জবাব আসে কাশীর ব্যঙ্গভরা ঝাঁজালো স্বরে, 'অত শখ খায় না। তোর চিতেবাবাজীকে লিয়ে তুই থাক গা যা। আমার দরকার নাই।'

দুমদাম পায়ের শব্দ পাই না। তবে বিন্দুর কথা শুনে বুঝতে পারি, কাশীনাথ চলে গেল। বিন্দু একটু গলা তুলে বলে ওঠে, 'পরে আবার আসিস কাশী, নক্‌কী ভাই আমার।'

তার আর কোনো জবাব পাওয়া যায় না। উঠোনও স্তব্ধ। দু'জনেই কাশীনাথের পিছু পিছু চলে গেল কিনা বুঝতে পারি না। কিন্তু সে ধন্দ বেশীক্ষণ থাকে না। আবার বিন্দুর গলা শুনতে পাই, 'নে, এখন প্যাঁচার মতন মুখ করে দাঁড়িয়ে থাক। বইলছে তো বইলছে, মুখের কথা বই তো না। তুই অমন করে চোপা কইরতে ক্যানে গেলি?'

'আর উ যে্য কইরলে!'

'উ তো পরে কইরেছে। অন্য সোমায় তো বইলতে পারতিস।'

'ক্যানে, উ কথা বইলবে ক্যানে? গাঁজার নাম শুইনলেই নোলা ছোঁক ছোঁক করে

ওঠে।'

'সিটো আলাদা কথা। সোমায় বুঝে বইলতে নাগে। এখন আর মুখ ভার কইরতে হবে না, যা গরুটো আতুর পোড়োয় বেঁধে দিয়ে আয় গা।'

একটু চুপচাপ। আবার বিন্দুর গলা, 'দাঁড়িয়ে রইলি ক্যানে, যা।'

কুসুমের গলা শোনা যায়, 'আর উ কথা ক্যানে বইললে, "তোর চিতেবাবাজীকে লিয়ে তুই থাক গা যা?"'

বিন্দু বলে, 'উটো রাগের কথা।'

কুসুম আবার বলে, 'চিতেবাবাজীর সঙ্গে দেখা হবে না।'

এবার বিরক্তিতেই বুঝি বিন্দুর গলায় হাসি বাজে। বলে, 'অই লো কুস্‌মি, আর ধকাস নাই আমাকে। আমি নেয়ে এসেছি, গুরু পেন্নাম হয় নাই। তা'পরেতে দুধ জ্বাল দিতে নাগবে, আমি যাই।'

বিন্দুর হাসিটা আমার মুখেও যেন ঝলকে ওঠে। এই নাবালক-নাবালিকাদের খুনসুটির সাক্ষী হয়ে তার কি থাকা চলে! কিন্তু কুসুমের জন্যেও আমার মন খারাপ লাগে। কাশীনাথের গাঁজা খাওয়া না, কটু ভাষাটাও তেমন কিছু না, যদি আমার সঙ্গে কাশীনাথের সাক্ষাৎটা হয়ে যায়। তার নিজের মনের ইচ্ছাটা যে আমার বয়ানে বলেছে সে। আমি কাশীনাথকে দেখতে চেয়েছি। আসলে সেইটুকু কুসুমের সাধ, আমি যেন কাশীনাথকে দেখি। কিন্তু কাশীনাথ সেইখানে বাদ সেধেছে, চিতেবাবাজীকে নিয়ে তার কোনো দরকার নেই।

রাগের কথা বটে। কুসুমের প্রাণেও তো বাজে। ঝগড়া বিবাদ, মুখে নুড়ো জেবলে দেবার পরেও খেদোক্তি তবু থেকেই যায়। সেই রহস্যের ব্যথা কি কেউ বুঝবে!

বিন্দু নীচু হয়ে খড়ের চালে মাথা বাঁচিয়ে দাওয়ায় ওঠে। আমাকে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'অই গ, উঠে পড়েছ বাবাজী?'

'হ্যাঁ।'

'শুইনছ তো সব?'

আমার মুখে তখনো হাসির রেশ। আমার দিকে চেয়ে বিন্দু নিজেই হাসির শব্দে বাজে। তার সারা শরীরেই যেন হাসির তরঙ্গ লেগে যায়। আবার বলে, 'তাতেই বুঝি ঘুম ভেঙে গেল? তা কী বইলব বলো, ইসব পাগলা-পাগলী নিয়ে আমাকে থাইকতে হয়। যত ঝগড়া, তত ভাব। থাইকতেও পারে না, ছাইড়তেও পারে না। তবু তো বয়স পাকে নাই।'

কথার শেষে বিন্দুর চোখের তারায় একটি ঝিলিক খেলে যায়। আর আমি ভাবি, বয়সের ভারে যেদিন ফাঁকা জায়গা ভরাট হবে, সেদিন তো অন্য সুরে বাজবে। সে সুর কেউ শুনতে পাবে না। তখন দুহুঁ দোহাঁ নিবিড় গভীরে পূর্ণ, নিঃশব্দ নিশ্চুপ। তখন তো স্বরে বাজবে না, প্রাণে বাজবে। এখন তো কেবল অপূর্ণ পাত্রের ঝনঝনা।

কিন্তু তার চেয়েও আমার দুই চোখের আলোর পূর্ণতায় যেন বিন্দু ভাসে। তার দিক থেকে আমি সহসা চোখ ফেরাতে পারি না। গায়ে তার জামা নেই। একটি মাত্র গেরুয়া রঙের লালপাড় শাড়িতে সর্বাঙ্গ জড়ানো। অল্প করে একটুখানি ঘোমটা টানা। ডান পাশের খোলা কাঁধের ওপর দিয়ে সদ্য জল নিংড়ানো, আঁচড়ানো চুলের গোছা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বুকের এক দিক ঢেকে দিয়েছে। টকটকে লাল সিঁদুরের ফোঁটা তার কপালে। মাঝখানের সরু সিঁথেয় সিঁদুরের উজ্জ্বল রেখা। একটি লোহার বালা ছাড়া হাতে দু'টি মোটা শাঁখা। আয়ত চোখে কাজল নেই। তবু যেন কাজলের রেখায় কালো। কালো দু'টি ভুরু, টিকলো নাক।

সব মিলিয়ে এই কি বাউল প্রকৃতির বেশ নাকি জানি না। আমি দেখি, সেই এক চিরসধবা নারী। যে যতই চলকায়, ছলকায়, ঝলকায়, চোখের তারা নাচায়, তবু যেন কী এক গভীরভাবে বিরাজিত। নম্র-অনম্রের, কোমলে-কঠিনে, কী এক পবিত্রতায় যেন গলে, অমৃত বিন্দু বিন্দু।

বিন্দু কখন যেন পায়ে পায়ে কাছে আসে। ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করে, 'কী দেইখছ বাবাজী?'

একটু লজ্জা পাই। হেসে বলি, 'তোমাকেই। স্নান হয়ে গেল বুঝি?'

বিন্দু একেবারে তক্তপোশ ঘেঁষে বলে, 'হ্যাঁ।'

তারপরেই ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করে, 'আমার কী দেইখলে?'

এ বিন্দু সেই আবার রঙবাহার প্রকৃতি। বলি, 'তুমি সুন্দর, তাই দেখলাম।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'ঝিনুদিদির চাইতে?'

এ আবার কেমন প্রশ্ন? ঝিনির প্রসঙ্গ আসে কেন? বলি, 'তুমি এক, সে আর এক।'

বিন্দু ঠোঁটের কোণে হাসি টিপে বলে, 'তাহলেও আমরা এক।'

এ কথার কোনো জবাব দিতে পারি না। বিন্দুই আবার বলে, 'তবে ঝিনুদিদি যখন লিয়ে যেতে পাইরল না, আমিই রেখ্যা দিই বাবাজীকে। ক'দিন থেকে যাও আমার কাছে।'

বিন্দুকে চেনা হয়তো অনেক বাকী। তবু একটুখানি তো চিনেছি। ওর মধ্যে প্রকৃতিলীলা সহজভাবে সদাই খেলে। ওর আসল উদ্দেশ্যটা বুঝতে সময় লাগে না। আখড়ায় থাকতে বলার রীতিটা ওর এইরকম। বাকী সবই ওর আচরণের বৈশিষ্ট্য। গতিক সুবিধার নয়। তাড়াতাড়ি তক্তপোশ থেকে নেমে বলি, 'আমার আর দেরি করার সময় নেই, এখুনি বেরোতে হবে। গোঁসাই বাবা কোথায় তোমাদের?'

বিন্দু যেন চমকে থতিয়ে যায়। চোখ বড় বড় করে চেয়ে বলে, 'উ বাবা, উ বাবা! ই কী গ, কথা নাই বাত্তা নাই, ই যে একেবারে লাফ দিয়ে ওঠে। কুথা যাবে?'

'বক্রেশ্বর।'

'তা বেশ তো, হাত-মুখ ধোয়া লাইগবে না? একটু গোছগাছ কইরবে তো, না কী গ?'

আমি ততোধিক ব্যস্ত গলায় বলি, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কোথায় একটু জল-টল পাওয়া যায় বলো। অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

বিন্দু তেমনি চোখ বড় বড় করে আমার দিকে চেয়ে থাকে। কোনো কথা বলে না। তারপরে আস্তে আস্তে তার চোখে কৌতুক ঘনিয়ে আসে। হাসির নিবিড়ে ঝিলিক দেয়। খিলখিল করে হেসে ওঠে। এ হাসিটা আমার মধ্যেও সংক্রামিত হয়। বিন্দু বলে ওঠে, 'বাব্বা! সত্যি তুমি চিতে বাপু! রঙ্গ জানো বটে! আমি ভাবি কী যে, অই গ মা, থাইকতে বলেও ফ্যাসাদ কইরলাম য্যা! কুথা বিষ্টি তার দেখা নাই, মেঘের ডাক শুনেই চাষা লাঙল লিয়ে দৌড়াল্‌ছে!'

এবার আমার দ্বিগুণ হাসির পালা। বিন্দু ডাক দিয়ে বাইরে নিয়ে যায়, 'এসো।'

তার সঙ্গে বাইরে যাই। হাতের ঘড়ি হাতেই বাঁধা। সময় কম না, সকাল আটটা বাজে। চারদিকে রোদের ঝিলিমিলি। বাইরে এসে মনে হয়, যেন রোদে ডুব দিলাম। রাতের অন্ধকারে কিছু দেখতে পাইনি। এখন দেখি, উঠোনের অন্য দিকে আর একখানি

মাত্র ঘর। বাইরে থেকে শিকল টানা। উত্তর দিকে মাটির দেওয়ালে বাড়ির সীমা। তার ওপাশে আরও কয়েকটি ঘরের খড়ের চাল দেখা যায়। আম-কাঁঠালের গাছ আশে-পাশে। শাল-সেগুনও আছে গুটিকয়।

বিন্দুর সঙ্গে সেই রান্নাঘরের দিকে যাই। খিড়কি দরজটা যেখানে, সেখানে দু' বালতি জল রয়েছে। একটুখানি জায়গা শান বাঁধানো। বিন্দু খিড়কি দরজা খুলে দেয়। সেখানে আম-কাঁঠাল ছাড়াও কয়েকটি কলাগাছ। চারপাশে মনসার বেড়া ডিঙিয়ে উঁচু-নীচু জমি দেখা যায়। কোথাও তার সবুজ ঘাস। কোথাও বাবলার ঝাড়। তার ওপারে রোদে পিঠ দিয়ে পড়ে আছে আদিগন্ত ধানকাটা মাঠ।

বিন্দু বাগানে গিয়ে মনসার বেড়ার কাছে ডিঙি দিয়ে পোড়ো জমির দিকে কী যেন দেখে। ফিরে বলে, 'গরু বেঁধে দিয়ে কুসুম আবার কোথা গেল্ছে, কে জানে।'

মনসার বেড়ার গায়ে কঞ্চির তৈরি আগল করা আছে। সেই আগল খুলে দিয়ে আমার দিকে ফিরে বলে, 'মাঠের দিকে ইচ্ছে হলে যেও। জল বাড়িতে আছে, উখানে হাত-মুখ ধোয়া কইরবে। আমি যেছি, হাঁ? তোমার গামছা লিয়ে আসি।'

মাঠে যেতে বলার উদ্দেশ্য কী, তা আমার জানা। রাঢ় বলে কথা না, বাংলা দেশের অনেক পাড়াগাঁয়েই প্রাতঃকৃত্যের জন্যে প্রথম যাত্রা মাঠে। নগরের চাল হেথায় অচল। আমি বলি, 'আমার ঝোলায় গামছা আছে।'

'সিটিই পাবে।'

বিন্দু একটু হেসে চলে যায়।।

মাঠ থেকে ফেরার পথে পোড়োর উঁচু জমিতে যখন উঠি, তখন দেখি বাবলা-বনের একটেরেতে কুসুম দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার দিকে ওর লক্ষ্য নেই। অন্য দিকে মুখ তুলে কী যেন দেখছে। ডাকতে গিয়ে চুপ করে রইলাম। কী দেখছিল কুসুম কে জানে। হঠাৎ সে মাটিতে বসে পড়ে। বসে কী যেন ভাবে, আর মাটিতে আঙুল দিয়ে দাগ কাটতে থাকে।

হয়তো সে কাশীনাথকে দেখতে পেয়েছে। কিংবা কাশীনাথ এই পথে আসবে, তার প্রতীক্ষা। কিছু না বলে আমি বাগান পেরিয়ে খিড়কিতে যাই। সেখানে ছোট পিঁড়ের ওপর আমার তোয়ালে। বালতির পাশে ঝকঝকে ঘটি, আর একটি মাজনের শিশি।

মুখ ধোয়া শেষ হবার আগেই বিন্দুর আবির্ভাব। জিজ্ঞেস করে, 'নেয়ে লিবে বাবাজী?'

বলি, 'না। বক্রেশ্বরে গিয়ে স্নান করব।'

'উ বাবা, ধনুকভাঙা পণ দেইখছি য্যা, আঁ?'

ততক্ষণে আমার ধোয়ামোছা শেষ। ফিরে বলি, 'কুন্ডের গরম জলে স্নান করব আজ।'

ঘরে এসে দেখি, গোপীদাস গোকুল সুজন সবাই রয়েছে। বিন্দু জিজ্ঞেস করে, 'একটুকু দুধ এনে দিই বাবাজী, কেমন?'

দুধ! বিন্দুর কথার সুরে ও স্বরে কেমন যেন ভিন্ন স্বাদের আমেজ লেগে যায়। নেশা ধরে যায়। কিন্তু রাত পোহালে চা চা করে মরি। দুধের স্বাদ কি মনে আছে আর! তাও সকালবেলাতে! বলি, 'না, একটু চা পেলেই হয়।'

'তাও দেবো, একটু দুধ খেয়ে লাও ক্যানে?'

গোপীদাস বলে, 'আমার বিন্দু মায়ের শ্যামা গাইয়ের দুধ বড় মিঠা বাবাজী। একটুক খাও। চাট্টি মুড়ি দুধে ভিজিয়ে লরাত চিবিয়ে খেয়ে লাও।'

তারপরে আর বিন্দু অনুমতির অপেক্ষা করে না। সে বেরিয়ে যায়। গোকুলদাস

থাকবার জন্যে অনুরোধ করে। গোপীদাস তাতে তাল দেয়। আমি বলি, 'বক্রেশ্বরের টান লেগেছে, আগে সেখানেই যাই, তারপরে দেখা যাবে।'

খাওয়ার পালা চুকলে যখন বিদায় নিতে যাই, তখন সব হাসিমুখের আলোয় যেন একটি বন্ধু-বিদায়ের ছায়াও ঘনায়। গোপীদাসই আমার একমাত্র সঙ্গী। সে বক্রেশ্বর থেকে আবার এখানেই ফিরবে।

কিন্তু পা বাড়িয়েও যেতে পারি না। কুসুম কোথায়? কাশীনাথকে কি আমার দেখা হবে না? নিতাই তাড়াতাড়ি ছুটে যায় সামনের দরজা দিয়ে। একটু পরেই ফিরে আসে একটি সতেরো-আঠারো বছরের ছেলেকে নিয়ে। এখনো গোঁফ-দাড়ি কিছু গজায়নি। কিশোরী মেয়ের মতোই প্রায় মুখ। মাথায় তেলহীন রুক্ষ চুল। রোগা রোগা, লম্বা। ডাগর চোখ দু'টি দেখে একবারও ভাবতে পারি না, এ ছেলে গাঁজা খায়। চোখ দু'টিতে এমন একটি আবেশ, দেখে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না, এ ছেলে অমন করে ঝগড়া করতে পারে। মুখখানি যেন কুসুমের থেকেও সুন্দর। একটু শীতও তার নেই। গা একেবারে খালি। পরনে ছোট একখানি ধুতি। আমার সামনে এসে সলজ্জ হেসে মাথা নীচু করে রইল।

আমি তাকেই জিজ্ঞেস করি, 'কুসুম কোথায়?'

'জানি না।'

কেমন করে জানবে! আমি জানি, তোমাকে নিয়ে সে আমার কাছে আসবে। তাই তোমারই অপেক্ষায় বনের নিরালায় বসে আছে। কিন্তু সে কথা আমি বলি না। মনে মনে জানি, কুসুমের সাধ পূর্ণ হলো। চিতেবাবাজীর সঙ্গে কাশীনাথের দেখা হয়ে গেল।

আমি কাশীনাথের ঘাড়ে হাত দিয়ে এগিয়ে চলি। বিন্দুকে বলি, 'কুসুমকে ব'লো।' বিন্দু হেসে ঘাড় নাড়ে। কিন্তু ওর চোখের কোণ দু'টি যেন চিকচিক করে।

দু'পাশে ঘর। মাঝখানে সরু পথ। লাল মাটি আর বালি কাঁকরে মেশানো। গোকুল সুজন নিতাই আমাদের পিছনে পিছনে আসে। গোপীদাস সকলের আগে জয় গুরু ধ্বনি দিয়ে বেরিয়েছে। এখন একতারাটা বাজায় বঙ্‌বঙিয়ে। কাশীনাথের কাঁধে এখনো আমার হাত। রাস্তার বাঁক নেবার আগে আর একবার পিছন ফিরে তাকাই। রাধা বৃন্ধার পাশে বিন্দু তখনো মাটির দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথাখানি হেলানো। বৈরাগিণী, তবু শাঁখায় সিঁদুরে আমার অপরূপ দেখাটা ঘোচে না। মনে মনে বলি, এই প্রকৃতিতে সেই প্রকৃতি আছে। সহজ মানুষ যার অঙ্গের নীরে ভেসে ওঠে। সময় বুঝে যে নীরেতে বাউল বাঁধাল বাঁধে।

বাঁক নিতেই পাড়াটা শেষ হয়ে যায়। তারপরে মাঠ। মাঠের ধারে রেললাইন। লাইনের ওপারে শহর। শিউড়ি দেখা যায়। কিন্তু কুসুমকে সত্যি দেখা গেল না। আতুর পোড়ো যে কোন্‌টা, এখান থেকে ঠিক বুঝতে পারি না। সেখানে কি সে এখনো বসে আছে! সেখান থেকে কি সে আমাদের দেখতে পাচ্ছে!

কাশীনাথকে বলি, 'তা গোঁসাই, গাঁজাটা একটু কমসম খেলে হয় না।'

দেখ এবার ছেলেকে। লাজে লাজানো মুখখানি দেখে মনে হবে যুবতীর ব্রীড়া। চোখের তারায় যেন অষ্টাদশীর বিস্ময়-হানা হাসি। মুখ নামিয়ে বলে, 'একটুক-আধটুক খেয়েছি। রোজ খাই না। এদের জিগে'স করেন ক্যানে।'

'কুসুম যে বলে, গাঁজা দেখলে তোমার নোলা ছোঁক ছোঁক করে।'

'উ তো মিছা কথা বলে।'

আর কাশীনাথ সাচা কথা বলে। আমি পিছন ফিরে গোকুলের দিকে তাকাই। গোকুল বলে, 'সিটো কথা বটে। কুস্‌মি যত বলে, অত না।'

কাশীনাথ বলে ওঠে, 'কুসি তো খালি আমাকে গ্যাঁজা খেতেই দ্যাখে। ন' মাসে ছ' মাসে এক দিন খেলে নিত্যি তিরিশ দিন খোটা দেবে। পাকামি দেইখলে গা জ্বালা দেয়।'

সত্যিই তো। বলছে কে দেখতে হবে তো। হতে পারে সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে। তা বলে, কুসুমের পাকামি সহ্য করবে কেন। তাও আবার, কুসুমের দাদার সামনেই বলছে। দাদাটিও শুনে হাসছে।

আমিই ভিন্ কথায় বেকায়দা করে ফেলি, 'তা ন' মাসে, ছ' মাসে এক-আধটু না খেলেই নয়?'

আহ্, ক্যানে এমন লজ্জা দেন গা। কাশীনাথের রুক্ষু চুলের মাথাটা একেবারে তার আদুড় বুকের কাছে নুয়ে পড়ে। কোনো জবাব দেয় না। আর কুসুমের বেলায় যেমন, কাশীনাথের বেলাতেও, আমার সেই কথাই মনে হয়।

ওর দিকে চেয়ে মনে হয়, বই বগলে এখন ওর ইস্কুল কলেজে যাবার কথা। কিন্তু তার কোনো ছাপ-ছোপ ওর কোথাও নেই। বরং, কথা বলতে হচ্ছে গাঁজা খাওয়ার প্রসঙ্গে। বাঁধা গত্-এ মানুষ নেই। মানুষ মেলে না এক ছাঁদে। রূপেতে তার সীমা নেই। সেইখানে সে অসীম। জিজ্ঞেস করি, 'সারা দিন কী করো?'

'কাজ করি।'

'কী কাজ?'

'আমাদিগের চাষ-আবাদ আছে। মাঠে গরু রেখ্যা আইসছি। গরু আমাকে দেইখতে হয়।'

অন্য ইস্কুলের মানুষ। কাশীনাথ কৃষক। কাশীনাথ রাখাল। তার ওপরে, বোষ্টমের ঘরের ছেলে। গোকুলের কাছে বাউলের দীক্ষা নিতে চায়। ইস্কুল কলেজের কথা এখানে আসে কেমন করে! সবই কি তোমার শহরের ভদ্রলোকের চালে চলে! বাঙলা দেশের দিশে, দেশান্তরে! সে আর কতটুকু! ঘাটে মাঠে খেটে খাবার মানুষ তো বেশী!

ইতিমধ্যে আমরা রেল লাইন পেরিয়ে শহরের সীমায় এসে পড়ি। এখানকার চেহারা আলাদা। তিন চাকার রিকশা আর মোটর গাড়ির ভেঁপু সমান। আপাতত আমাদেরও রিকশা নিতে হয়। কাছারির কাছে গিয়ে, বক্রেশ্বরের মোটর ধরতে হবে।

গোপীদাস বাঁয়াটা কোলের ওপর টেনে নিয়ে রিকশায় বসে। কাশীনাথকে ছেড়ে দিয়ে আমিও উঠে বসি। গোকুল সুজন নিতাই জয় গুরু ধ্বনি দেয়। গোকুল বলে, 'দিনকালের কথা বইলতে লারছি। তবে যদি উত্রানের দিন কেঁদুলিতে আসেন, দেখা হতে পারে।'

দিনকালের কথাটা আমারও। তাই বলি, 'দেখি। আশা তো করি যাবো।'

কাশীনাথ আমার দিকেই চেয়েছিল। একবারও চোখ নামায়নি। কিছুটা অবাক, একটু বা কৌতূহল, তার মধ্যেই একটু ভালো লাগার হাসি, সলজ্জভাব। চোখাচোখি হতেই কিশোরীর মতোই হেসে চোখ নামিয়ে নেয়। বলি, 'তাহলে যাওয়া যাক কাশীনাথ।'

'আবার আইসবেন।'

সে কথার জবাব না দিয়ে বলি, 'আমার কথাটা একটু বিবেচনা করে দেখো।'

আবার লজ্জা, মাথা নত। জানি না, এর চোট আবার কুসুমের ওপর গিয়ে পড়বে কী না। রিকশা চলবার আগে গোকুলকে কী যেন বলে কাশী। গোকুল বলে ওঠে, 'তলে যা ক্যানে।'

গোপীদাস বলে, 'কী?'

'কাশী বইলছে, বক্রেশ্বরে যেতে মন কইরছে।'

আমি ডেকে বলি, 'এস।'

কাশীনাথ সলজ্জ হেসে মাথা নাড়ে। বলে, 'উপায় নাই। মাঠে আলু রইয়েছে।'

কৃষকের কাজ আছে। তাছাড়া, রাখালের গরু দেখবে কে। আমাদের রিকশা ছেড়ে চলে যায়। নতুন ছবি ভেসে ওঠে। রাঢ়ের শহর। বাঙলা দেশের দূর মফস্বল শহর যেমন হয়, তেমনই। তবে, প্রকৃতিতে কিছু ভেদাভেদ আছে। শহরের ধারেও রাঙা মাটি, পাথুরে প্রান্তর, উঁচু-নিচুতে ধু ধু করে যেন। শহরে যত ঢোকা যায়, তত ঘিঞ্জি। দোকান পাট বাজার, সব মিলিয়ে একটা গোছানো শহর যেন তবু হয়ে উঠতে পারে না। খড়ের চাল মাটির দেওয়াল, পাকা ইমারতের পাশেও পাবে। এদিকে-ওদিকে, ফাঁকে-ফাঁকে, একটু মাঠ-ঘাট চোখে পড়বে। গাছপালায় নিবিড় কোনো বাগান বা পোড়ো উঁচু ঢিবির ওপরে তালগাছের জটলা চিনিয়ে দেয় জলাশয়। তালগাছের ভিড় একটু বেশী।

তারপরে, পুরনো শিউড়ি শহরে, সরু রাস্তায় যত যানবাহনের ভিড় তত মানুষের। তাও প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। ধুতি-কুর্তা চোগা-চাপকানে মানুষ চেনা দায় জনপদের খেটে খাওয়া মানুষদের দেখলে জানবে, কোন্ দেশেতে চল। তাদের মুখের ছাপে, গায়ের রঙে, পায়ের ধুলায় রাঢ়ের লিখন। তাদের চলন চালে, কথার ছন্দে দেশের পরিচয়। তার সঙ্গে তুমি যেটা পাচ্ছ সেটা হলো একটু কৌতূহলী দৃষ্টি। ইটো আবার কে হ্যা, আলখাল্লা পরা চুল-দাড়িওয়ালা ডুগি একতারার সঙ্গে কোঁচাওয়ালা ভদ্দরলোক চইলছে! কাছারিতে সাক্ষী দিতে নাকি!

তা না হলেও কাছাড়ির সামনেই নামতে হয়। প্রচুর মোটর গাড়ি। মোটর বাস বলো, ছোট গাড়ি বলো, সব আছে। যাতে খুশি চলো। শিউড়ি রাজনগর। রাজনগর দুবরাজপুর লাইনের মোটর বাসে বক্রেশ্বর যাওয়া যায়। একখানি ছোট গাড়ি ভাড়া করেও যাওয়া যায়। টাকা একটু বেশী লাগে। গোপীদাসের তাতেই আপত্তি। ক্যানে বাবাজী, এত খরচের কী প্রয়োজন। আগের দিন তো বনের আর মাঠের পথে হেঁটেই যেতো গোপীদাসেরা। এখনই যত গাড়ি-ঘোড়ার দিনকাল এসেছে। আর সেই যে বলে, ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া, এখানকার মানুষেরা তা-ই হয়েছে। গোপীদাস হেঁটে যেতেও রাজী।

তা জানি, সে হেঁটে যেতে রাজী। কিন্তু আমার এতটা সইবে না। বারো-চৌদ্দ মাইল হেঁটে পাড়ি দেওয়া বড় কঠিন। তাছাড়া, গতকাল নানুর থেকে যেভাবে এসেছি, আজ আর কোনো ধকল নিতে ইচ্ছা করে না। তা-ই দু'জনে একটি আলাদা গাড়িই ভাড়া করি।

গোপীদাস গাড়িতে উঠে হাত পা ছড়িয়ে বসে। ড্রাইভারের সঙ্গে দু'-একটা কথা বলে। তারপরে একটি শব্দ করে বলে, 'বড় আরাম লাগে।'

চেয়ে দেখি, তার দৃষ্টি গাড়ির জানালা দিয়ে দূরে নিবদ্ধ। আরামের আমেজী ছাপটা তার মুখে দেখি না। যেন অন্য এক লোকে চলে গিয়েছে। দাড়ির ভাঁজে ভাঁজে মুখে একটু হাসির আভাস আছে। কিন্তু তাতে যেন কেমন একটু ব্যথা জড়ানো।

তার গতকালের রাত্রের কথা আমি ভুলিনি। এমনি এক ধুলিমলিন আলখাল্লা পরা, একতারা বাঁয়াওয়ালা ঝোলা কাঁধে পথে পথে ফেরা মানুষ যে, এমন তত্ত্ব ভাষতে পারে না শুনলে তা জানা যায় না। এই সব মানুষে যে আর এক মানুষ আছে, তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু ভারতবর্ষের হর্ম্যতলে, রম্যকক্ষে কবে তত্ত্ব শোনা গিয়েছে! কেবল তত্ত্ব কেন। শিল্প বলো, সঙ্গীত বলো, সবাই তো বনে পথে পাহাড়ে বন্দরে গাছতলায়। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যে মানুষেরা মোহন হেসে পথ চলে যায়, ভারততত্ত্বের তত্ত্ব যে তাদেরই ঝুলিতে। ভাবেই থাকো, আর বস্তুতেই থাকো, ভারত

রীতির এইটুকুই বিস্ময়, ধুলো পায়ে যে-মানুষ পথের প্রান্তে গাছতলায় বসে, গভীর বাণী সেখানে বেজেছে।

অবাক যতই লাগুক, জানি আমার অচেনাতে চিনেছি গোপীদাসকে। তত্ত্ব রাজে তাদের কাছেই, ভাবেও তারাই। নগর আর আধুনিকতার ঘোরে যতই তাদের দীন ভাবি না কেন। তা-ই এমন মানুষকে যদি একটু আরাম দিয়ে থাকতে পারি, তা আমারই সন্তুষ্টি। সেই জন্যেই জিজ্ঞেস করি, 'ভালো লাগছে?'

গোপীদাস ফিরে তাকায় না। তেমনি দূরে চোখ রেখে বলে, 'হুঁ বাবাজী, জীবনে এই পেথম তোমার সাথে এমন আরাম কইরে বক্কেশ্বর যেইচ্ছি। তাই বইলছি বাবাজী, তুমি কিছু মনে ক'রো না, নিজের কথাটো খালি মনে লেয়। আরাম কাউকে শিখিয়ে দিতে হয় না, ক্যানে কি না, আঁ? তা উতেও কোনো দোষ নাই, যদি ধম্মে থাইকতে পাইরতাম। না পাইরলাম ধম্মে থাইকতে, না পাইরলাম খোলস ছাইড়তে। তবে বেঁচে ক্যানে রইলাম হে।'

গোপীদাস যেন আপনাকে করুণা করে হাসে। অথচ তার চোখ দু'খানি কেমন টলটলিয়ে ওঠে। গতকাল রাত্রের সেই আক্ষেপ, সেই বিলাপ। সেই ভাবেরই স্রোত যে মনের গহনে চলছে, বুঝতে পারিনি। এ কথার জবাব আমার জানা নেই। আমার সন্তুষ্টি যেন এক চকিত কষ্টে থমকে যায়।

গোপীদাস নিজেই আবার বলে, 'বড় সোখ পেলাম, তাই কথাটো মনে হলো। সোখেতেই পতিত হলাম যে বাবাজী। দুঃখের দান না দিয়ে সোখের ঘর কইরতে গেলে এই হাল হয়। সেই সোখেতেই পতিত হলাম।'

গতকাল রাত্রে যেন ঠিক এ কথা এমনভাবে শুনিনি, সুখেতেই পতিত হলাম। জিজ্ঞেস করি, 'দুঃখের দান কী?'

'শিক্ষে।'

'শিক্ষা?'

'হুঁ বাবাজী। তোমরা যেমন নেকাপড়া শিখে পরীক্ষা দাও, তেমনি শিক্ষে। নেকাপড়া না শিখে পরীক্ষায় যেইয়ে বইসলে পতন তো হবেই। তাই পরীক্ষায় ফেল কইরলাম বাবাজী।'

'আবার তো পরীক্ষা দেওয়া যায়।'

'না বাবাজী, উইখ্যানেতে তফাত। পরীক্ষা একবার। সারাজীবন ধইরে গুরুর কাছে শিক্ষে লাও, তা'পরেতে পরীক্ষেয় বসো। ফেল মাইরলে তো গেলে। সি কথাটো কাল বইলেছি তো তোমাকে, জীবাচার বারবার, প্রেমাচার একবার। তাই শরীলে সোখ পেইলেই নিজের কথাটো মনে পইড়ে যায়। আর তো বাবাজী, ই জীবনে কিছু হবার লয়। সব শেষ হয়ে গেছে।'

গোপীদাস কথা থামায়। দেখি টলটলানো চোখের দরিয়া গাল বেয়ে দাড়ি ভিজিয়ে দেয়।

মনে মনে এত আতুর হয়ে উঠি, ইচ্ছে থাকলেও একটু হাত বাড়িয়ে গোপীদাসের হাত ধরতে পারি না। এ জীবনে সবই শেষ হয়ে গেছে। সেই ব্যর্থতা তার ভাষায় ভাবে এমন গভীর করে বাজে, কথা বলতেও পারি না।

কিন্তু গোপীদাস আপন ঘোরেই বাজে। কেন সব শেষ হয়ে যায়? জরা এসে যে সব পথ বন্ধ করে দিলে। যৌবন থাকতে যে সাধন সাধেনি, জরাতে সে পথ রুদ্ধ। যার কাম গিয়েছে, তার প্রেমও গিয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতিতে দেখনি, ঋতুর বদল আছে বলে, ধরিত্রী যুবতী। প্রকৃতিও তেমনি, তারও জরা এলে চলবে না। এই কাম-রতির মেশামেশিতেই কামগন্ধহীন প্রেম সাধন। নইলে হবার নয়। শব সাধনা শ্মশানে বসে।

প্রেম সাধনা কামের ঘরে বসে। তবে তো সাধন। চোখ যদি নেই তো দেখবে কী দিয়ে। পা নেই তো চলবে কেমন করে।

এ সাধন সম্ভব কি না সে প্রশ্ন ভুল। ডুব দিতে যে শিখেছে, সে ডুব সাঁতারে পার হয়। সেই তো একই কথা, লক্ষ্যভেদ যে শেখে, সে নিচে তাকিয়ে উঁচুতে তীর গাঁথে। তার মধ্যে অনেক কথা। নিজেকে তৈরি করতে হবে। পুরুষ প্রকৃতির শরীরে নীর ক্ষীর সবই আছে। সবের আস্বাদ নিতে হবে। শরীরের কোনো কিছুই অখাদ্য না। অপেয় না। সেজন্যে বলেছে, বাউল সাধকের লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকিতে নয়। কেননা তাকে যোগ্য হতে হবে। সেইজন্যে দ্রব্যগুণের কথা। শুধু পাতা চিবোও, লাল হবে না। শুধু খয়ের, শুধু চুনে, সুপুরিতেও না। সব মিলিয়ে চিবোলে তবে লাল। সেইরকম এই শরীরেই বহে গঙ্গা যমুনা। কামরতির নীর ক্ষীর। একে বলে,

বিনে জলে হয় চরণামৃত
যা খেলে যায় জরা-মৃত।

এ না হলে সাধক তৈরি হয় না। 'স্ব স্ব বিন্দু পান কর আপনার করি। নহিলে সাধন সিদ্ধি নাই, নিত্যে যাইতে নারি।' এর নাম আত্মরক্ষা। আত্মরক্ষার শক্তি। 'গুরুর কাছে জেনে বুইঝে ঠিক মতন যদি লিতে পারো তো তরে যাবে। ইও বাবাজী, "কেবল ইস্তিরি পুরুষে রমণ করা লয়। আত্মায় আত্মায় রমণ হল্যে রসিক তারে কয়।"

গুরুর নির্দেশে সব যদি ঠিক ঠিক মতো করতে পারো তবে এ সাধন সম্ভব। সব মিশিয়ে যাও তবে লাল হবে। পাকা হবে। কাঁচায় ডাঁসায় চলবে না। যদি ধাপে ধাপে পাকা হতে পারো, তবে সাধন করো। গোপীদাস বলে, 'ধন্দের কিছু নাই বাবাজী। আমি তো ফাঁকি, আমাকে দেইখে ধন্দে প'ড়ো না। জাইনবে, যে সাইধতে জানে, তার অসম্ভব কিছু না। আমি তো পতিত বাবাজী।'...

কখন যেন শহর পেরিয়ে গ্রাম ছাড়িয়ে গাড়ি এসে পড়ে নিরালা বনের ছায়ায়। সহসা মনে হয় অরণ্যের সীমায় এসেছি। ঋজু শাল বন রাস্তার ধারে। গহন বিথার ছায়ায়। রোদ ঝিলিমিলি। শুকনো পাতার ছড়াছড়ি। কাঠকুড়ানীদের দু'-একজনকে দেখা যায় এখানে সেখানে।

আমি গোপীদসের কথা শুনি। সম্ভব-অসম্ভবের সকল ধন্দ নিরসন করে সে বাজে। আর কিছু না, এইটুকু ভাবি, তত্ত্বের এই বিচিত্র বিস্ময়কর গুণ ভেদাভেদ বিষয় একদা অতীতে মানুষের মনে কেমন করে এসেছিল। আধুনিক বিদ্যাশিক্ষায় যার নাম 'কেমিস্ট্রি' দ্রব্যের সেই গুণাগুণের বিচার কেমন করে আয়ত্ত করেছিল, সে যুগের ঝোলা কাঁধে ছেঁড়া আলখাল্লা ক্ষ্যাপা বাউল কাপালিকেরা। তাদের ইস্কুলের নাম কী। তাদের বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় ছিল।

গায়ে স্পর্শ লাগতে সংবিৎ পাই। ফিরে চাই। গোপীদাস আমার দিকে চেয়ে। এখন তার চোখ টলটলানো না। সুখেতে পতিত বাউল এখন আমার চোখের দিকে চেয়ে যেন কেমন এক নিবিড় রহস্যে হাসে। কিন্তু আমার একবারও মনে হয় না, এ মানুষ পতিত। এ মানুষ যে কেবল জীবাচারেই ডুবেছে, বিশ্বাস হয় না। এ মানুষ প্রেমাচারেও ভেসেছে। না হলে অমন কেঁদে ভাসে কেন। তার মুখের দিকে তাকিয়ে তো একবারও পতিতের পাপ দেখি না!

গোপীদাস জিজ্ঞেস করে, 'কী ভাবো বাবাজী?'

'আপনার কথা।'

'কেমন লাগে?'

'আশ্চর্য লাগে।'

গোপীদাস এক মুহূর্ত চেয়ে থাকে আমার দিকে। তারপরে হঠাৎ বলে, 'সাইধবে

বাবাজী?'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কী সাধব?'

'বাউল সাধন?'

আমার গায়ের মধ্যে সহসা যেন এক শিহরণ লেগে যায়। আমার বুকের কাছে কেমন একটা তোলপাড় ভাব। তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলি, 'না, না, ও সাধন আমার নয়।'

'ক্যানে বাবাজী?'

'আমি বাউল নই।'

'কে বা বাউল, বাবাজী! যে ভজে, সাধে, সে-ই বাউল হয়।'

আমি গোপীদাসের চোখের দিকে চেয়ে দেখি। তারপরে হেসে বলি, 'জগতে সব কিছু সকলের জন্য নয়।'

'তুমি বাবাজী লদীর মতন ভেইস্যে চলো, তুমি পাইরবে।'

'না, এ কথা বলবেন না। আমি যে আপনার চেয়েও বেশী সুখেতে পতিত।'

'জয়গুরু!'

গোপীদাস যেন সহসা অস্ফুট কান্নায় ভেঙে পড়ে। আচমকা সে আমার পায়ের দিকে নুয়ে পড়ে। আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি তার দু' হাত চেপে ধরি, টেনে নিই। গোপীদাস মাথা নাড়ে, নিচু ভাঙা ভাঙা স্বরে বলে, 'তুমি পতিত লও, আমি জানি, আমি জানি গ।'

এ সব কথার জবাব দিতে পারি না। কিন্তু আমার বুকের কাছে যেন কিসের ভার চাপে। আমি ঠোঁটে ঠোঁট টিপে থাকি। তবু আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে ওঠে। চোখ শুকনো রাখতে পারি না। আমার কোথায় যেন কলকল ধারা বহে যায়। কেবল একটা ধ্বনি শুনতে পাই, 'পতিত পতিত পতিত।'

অথচ যা জানি না, বুঝি না, মানি না, বিশ্বাস করি না, তারই মধ্যে টেনে এনে গোপীদাস আমাকে এমনিভাবে আতুর করে। এমনিভাবে প্রাণমনের তরঙ্গে, এক অচিন আবেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তারপরে, আমার মনের মধ্যে, কেবল একটি কথাই বাজে। এই মুহূর্তে যেন নতুন করে বুঝতে পারি, এ গোপীদাস পতিত নয়।...

জমি ক্রমে উঁচু-নিচু। ছোটখাটো চড়াই উৎরাই পেরিয়ে, গাড়ি এসে দাঁড়ায় বক্রেশ্বর নদীর ধারে। এখানে ওখানে পাথরের বড় বড় চাংড়া। মৃত্তিকায় কাঁকর বালি। মনে হয়, তার নিচেই পাথর। নদীতে জল নেই। নতুন সাঁকোর কাজ সবে শুরু হয়েছে। শেষ হলে তবে যাতায়াত। আমাদের যেতে হবে নদী পেরিয়ে ওপারে।

ওপারে বক্রেশ্বর। পাপহরা নাম উষ্ণ কুণ্ডবাহী, শিবক্ষেত্র। ওপারের পাথুরে জমির উঁচুতে দেখি কেবল মন্দির। মন্দির মন্দির মন্দির, সকলই শিব মন্দির। সব থেকে উচ্চ মন্দিরের চূড়াও এখান থেকে চোখে পড়ে। যেখানে উঁচু গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায় রৌদ্র ঝিলিমিলি।

গাড়ি থেকে নামতে চালক জিজ্ঞেস করে, আমরা আজই ফিরব কী না। তা হলে, সে-ই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তার জন্যে টাকাও সামান্য লাগবে। কেননা, তাকে তো ফিরতেই হবে।

গোপীদাস এক কথাতেই নাকচ করে। 'না বাবা, তা-ই কী হয়। পথে বেরিয়ে পিছু টান, উ ভালো লয়। তখন তোমার মুখ চেইয়ে আর সোমায় বুইঝে, আমাকে চইলতে হবে। তুমি বাবা যাও গা।' অতএব চালককে বিদায় করতে হয়। গোপীদাসের বক্তব্য, একেবারে জলে পড়ে নেই তো। যে পথে আসা, সেই পথেই ফিরতে হবে কেন। না-হয় মোটর বাসে দুবরাজপুর দিয়ে রেলগাড়িতে করে যাওয়া যাবে। আর আমি

যদি বর্ধমানের বড় রেল রাস্তা ধরতে চাই, তাতেও কোনো অসুবিধা হবে না।

নদীর একেবারে নীচে এসে, সামান্য একটু জলের ধারা চোখে পড়ে। পার হয়ে ওপারে যখন উঠি, তখন চারদিকে চেয়ে অবাক লাগে, এত শিবমন্দির করল কে!

গোপীদাস জানায়, জনে জনে করেছে। শিবক্ষেত্রে মানুষ নানা মানসে বাসনায় বিশ্বাসে এক এক মন্দির করেছে। সংখ্যা কত হবে? তা তিন শো-র ওপরে বটে!

অবাক লাগে, মুগ্ধও হই। এর নাম ভারতবর্ষ। তার মাঝে এক দেশ, বাঙলা দেশ। যেখানে যাবে, নানাখানে নানা বৈচিত্র্য। এলাম যেন এক মন্দিরের রাজ্যে। কারুকার্যখচিত শিল্পের মেলা নেই মন্দিরে মন্দিরে। এর রূপ আলাদা। ইঁট গেঁথে গেঁথে, দোচালা চারচালা সটান সোজা মন্দির কেবল। পথ বেঁধে দেওয়া, নিয়মতান্ত্রিক সারি সারি না। এখানে ওখানে, যেখানে সেখানে, মন্দির মন্দির। রাজা মহারাজা নামী ব্যক্তিদের স্মৃতি গাঁথা বিশাল দেবমন্দির না। সাধারণ শিবভক্তদের সামান্য নিবেদন, সামান্য প্রতিষ্ঠা। আশেপাশে জঙ্গল, বাবলা মনসা আশশ্যাওড়া। কিছু প্রাচীন মহীরুহ বট অশ্বত্থ। আরো নানা গাছগাছালি। কোথাও বা বেড়ার কুটির, মাটির দাওয়া। কঞ্চির বেড়ায় ঘেরা, সামান্য একটু পালং মুলো, লাউয়ের মাচা।

তবু যেন সব মিলিয়ে, একটা সবুজ নিবিড় ভাব নেই। জমির উঁচু-নিচু পাথুরে বিস্তার, নতুন পুরনো, ভাঙা আস্ত মন্দির। কিছু গাছপালা। সব মিলিয়ে শিব বক্রেশ্বরের মতই জটাজুটবিস্তৃত রুক্ষতা। যেন একটা সন্ন্যাসের বৈরাগ্যের ছাপ সর্বত্র। যেন এক উদাস বৈরাগী আপনাকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। তার দৃষ্টি যেন কোন্ সেই দূর আকাশলোকে, একটু ভ্রূকুটি ভাব। অথচ কপাল কপোল ঘিরে এক ধ্যানের প্রসন্নতা। তার মধ্যে বাজে ঝিল্লিস্বর। পাখির পিক্-পিক্ চিক্-চিক্ শিস ডেকে ওঠে। নদীর পাড়েতেই থমকে দাঁড়িয়ে থাকি। পা চলে না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। মনে হয়, এখানে যেন পৃথিবীর এক শেষ প্রান্ত। এখান থেকে আর কোথাও যাবার নেই।

গোপীদাস আমার কাঁধে হাত দিয়ে ডাকে, 'চলো বাবাজী। ইখ্যানে দাঁড়িয়ে থাইকলে কী হবে। কুণ্ডের দিকে চলো, আরো ভালো লাইগবে। তারপরে আসল বক্রেশ্বর বাবাকে দশ্শন কইরবে। চলো এগিয়ে যাই।'

তার সঙ্গে কয়েক পা চলতেই, কোথা থেকে সামনাসামনি একজন এসে দাঁড়ায়। রোগা, লম্বা, মাঝবয়সী লোক। মাথায় কাচা-পাকা খোঁচা খোঁচা চুল, আঁচড়ানো নেই। কিন্তু টিকিতে একটি ফুল বাঁধা। পরনের কাপড়েই গা ঢাকা। বুকের কাছে খোলা জায়গায় একগাছি পইতা দেখা যায়। চোখের কোলে কালি, দৃষ্টি যেন, মর্মভেদী। আমার দিকে চেয়ে, প্রথম প্রশ্ন, 'কুথা থেকে আইসছেন, কী নাম?'

থমকে দাঁড়াতে হয়। অবাক হয়ে তার দিকে দেখে, গোপীদাসের দিকে ফিরে চাই। গোপীদাস আমার হাত ধরে টেনে অন্য দিকে জবাব দেয়, 'এ বাবাজী পুজা-টুজা দেবেন না গ ঠাকুর, উঁয়ার পাণ্ডার দরকার নাই। একটুক বাবাকে দশ্শন কইরবেন, ঘুরে বেড়িয়ে দেইখবেন, চইলে যাবেন।'

তার কথা শেষ হবার আগেই আর একজনের আবির্ভাব। বয়স একটু কম বটে, তবে চেহারায় যেন মিল আছে। সে বলে ওঠে, 'সি কথাটো তুমি বইলছ ক্যানে। উনি কি বইলছেন, পুজা দেবেন না?'

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠি, 'পুজো দেবার কথা কিছু ভাবিনি। একটু দেখতেই এসেছি।'

প্রথম পাণ্ডা চোখ শিবনেত্র করে, মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'তা বইললে কি হয় মোশায়! তীর্থক্ষেত্রে এইসেছেন, হিন্দুর ছেলে। জাগ্রত ক্যানে। কুথা থেকে আইসছেন?'

গোপীদাস সরাসরি বলে দেয়, 'কলকতা।'

'অ। নাম কী?'

আমি নাম বলি। পান্ডা ঠাকুর একটু কী ভেবে যেন বলে, 'তা বেশ তো। চলেন, আমার বাড়ি চলেন। কুন্ডে নেয়ে-টেয়ে, পূজা দিয়ে আমার ওখানেই দুটি পেসাদ পাবেন।'

আমি ঘাড় নেড়ে বিনীতভাবে বলি, 'তার কোনো প্রয়োজন নেই।'

কথাটা মনঃপূত হলো না, তা বুঝতে পারি। মুখের ভাব কেবল ব্যাজার না। ঠাকুরমশায়দের একটু যেন গোঁসাও হয়েছে। দ্বিতীয়জন আওয়াজ দেয়, 'সে আপনার ইচ্ছা। কলকেতা থেকে এত দূরে এইসে পূজা না দিয়ে যাবেন, ইটো ঠিক লয়।'

এবার গোপীদাস একটু যেন ঝেঁজেই ওঠে, 'আ রে দূর, ক্যানে এত কথা বইলছ ঠাকুর! বাবাজী যদি পূজা দেন, তো দেবেন। পলায়ে যেছেন না তো গ। তব্যা? হইল্‌ছে হইল্‌ছে, বাবাজী এখন আছেন।'

গোপীদাস আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে। কিন্তু, যদি ভেবে থাকো, ঠাকুরমশায়রা তাতে তোমার পিছন ছাড়বেন, তা হলে ভুল করবে। তবে ঠাকুরমশায়রা নেই-আঁকুরে না। সঙ্গে সঙ্গে চলে, বলে, 'শ্বেত গঙ্গা দেখেন আগে। চান করে ল্যান। গামছা-টামছা আছে তো?'

'আছে।'

'তবে আর কী। চান করে মন্দিরে যান। বাবার মন্দির এখনো খোলা আছে, যেইয়ে দর্শন কইরে আসেন।'

বলে, গোপীদাসকে জিজ্ঞেস করে, 'তাঁ, হ্যাঁ হে বাবাজী, বাবুর খাবার ব্যবস্থা কী কইরছ?'

গোপীদাস নিস্পৃহ গলায় বলে, 'দেখি।'

'বাবাকে কুন্ডগুলোন সব দেখাবে ঠিক করে।'

একেবারে নির্দেশ-আদেশের সুর ঠিক না। তবে, 'বাবু' কথাটা কানে লাগে। গোপীদাসের বাবু না আমি। আমি তার পথিক বন্ধু, পরস্পরে মজেছি। আমি তার বাবাজী।

গোপীদাস বলে, 'দেখাব গ ঠাকুর দেখাব। না হল্যে আর লিয়ে আসছি ক্যানে।'

পথিমধ্যে আরো দু-চার পান্ডার দেখা পাওয়া যায়। তারাও আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। তারপরে এক জায়গায় সবাই দাঁড়িয়ে, কী যেন বলাবলি করতে থাকে। আমি গোপীদাসের সঙ্গে এগিয়ে যাই।

শীতের এই সকাল-দুপুরের মাঝামাঝি বেলায় খোলা জায়গার ঠান্ডা হাওয়ায় গোপীদাস আমাকে নিয়ে এল এক উষ্ণ পরিবেশে। এক না, একাধিক উষ্ণ কুন্ড হেথা হোথা। এই জলাশয়ের পাশে দাঁড়ালে, সারা গায়ে উত্তাপ লাগে। জল ছুঁয়ে দেখবার আগেই মনে হয়, সারা শরীরের রক্তে রক্তে যেন উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে।

ছোট ছোট বিভিন্ন কুন্ডের বিভিন্ন নাম। পাকা গাঁথনি দিয়ে বাঁধানো, আলাদা আলাদা জলাশয়। সিঁড়ি নেমে গিয়েছে কুন্ডের জল পর্যন্ত। কিন্তু দাঁড়াও হে বক্রেশ্বরযাত্রী। সাত-তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে জলে হাত দিও না। জলেতে আগুন আছে। আল্‌সে দিয়ে ঘেরা জায়গায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিলে, মুখে এসে তাপ লাগে। বড় বড় বুদবুদ, জল যেন টগবগিয়ে ফুটছে। শব্দ করে, নিরন্তর বুদবুদ ফাটছে। জলে একটু ঘোলানি নেই। একেবারে তলা অবধি দেখা যায়। ঘ্রাণে লাগে এক নানা মিশালী ধাতব গন্ধ। কুন্ডের এখানে ওখানে, নানা গাছের ঝুপসি ঝাড়। ধরিত্রীর কোন্‌ কোল থেকে, পাতালের কোন্‌ শিরা বেয়ে আসে এই উষ্ণ স্রোত, কে

জানে। আমি ভাবি। যার পাতাল রন্ধ্রে, ঠান্ডা মিষ্টি জলস্রোত বহে, তারই আর এক রন্ধ্রে এই ভয়ংকর তপ্ত স্রোত পাশাপাশি চলে। কেমন করে? নোনতা মিঠে, ঠান্ডা গরম, একের মধ্যেই, সকলের পাশাপাশি বাস। এক ধরিত্রীর দেহের কূল, নানা রূপে রসে অকূল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে, ছোট এক কুন্ডের জলের দিকে হাত বাড়াই। আর তখনই, নতুন গলায় আওয়াজ পাই, 'এই কুন্ডের জল বেজায় গরম বাবু, হাত দিবেন না।'

থমকে দাঁড়িয়ে মানুষ খুঁজি। কে বলে, কার গলা? পিছন ফিরে দেখি, গোপীদাস ঘাড় নিচু করে ডাইনের জংলা ঝোপের দিকে লক্ষ্য করছে। সেদিকে চেয়েই সে জিজ্ঞেস করে, 'ই য্যা এলেকাটা বাবাজী দেইখ্ছি গ। এখনো তুমি আছ?'

ততক্ষণে মাঝখানের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে, একটি মুখ আমিও দেখতে পেয়েছি। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। একমুখ গোঁফদাড়ি। গায়ে একটা ময়লা কাঁথার মতো কিছু জড়ানো। আমার সংগে চোখাচোখি হতে, চোখমুখ ভরে গোঁফদাড়িতে ছড়িয়ে একখানি হাসির ঝিলিক লাগে। তারপরে, গোপীদাসের দিকে ফিরে বলে, 'থাইকব না তো যাবো কুথা। যদ্দিন যার জিনিস সে না লিচেছ, তদ্দিন থাইকতে হবে।'

গোপীদাস বলে, 'আহ্, সি কথা হইচেছ না। বইলছি, বক্রেশরে এখনো আছ?'

ঝোপের মানুষ বলে, 'আর কুথা যাবো গ। ই তো শেষ জায়গা। হিঃ হিঃ হিঃ।'...

শোনো হাসি! যেন একেবারে খিক্‌খিকিয়ে বাজে, হিক্কা তুলে গড়িয়ে যায়। গোপীদাস বলে, 'তা বটে। কেমন আছ এলেকাটা বাবাজী?'

এলেকাটা বাবাজী! এমন নাম কখনো শুনিনি। আর ঝোপের মধ্যে, কেউ যে অমন করে কাঁথা জড়িয়ে বসে থাকে, তাও দেখিনি। জবাব দেয়, 'অই আছি, ভালো আছি। পেটে একটু গোলমাল, তা না হলে—।'

কথা শেষ না করে, আবার সেই খিক্‌খিক্ হাসি। সেই বেজায় হাসি যে একেবারে নাভিস্থল থেকে আসছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু পেটের গোলমালের কথায়, হাসির কী আছে, বুঝতে পারি না। আমি একবার গোপীদাসের চোখের দিকে চাই। সেও যেন একটু ধন্দেই পড়েছে।

এলেকাটা বাবাজীর হাসি একটু থামলে, আবার বলে, 'তা না হলে, খুব ভালো আছি। এতো সোখ্ আর কুথা মিলবে। মাটি গরম, জল গরম। ঠান্ডাতে বড় আরাম।'

গোপীদাস জিজ্ঞেস করে, 'পেটে কী হলো?'

'জ্বালা!'

বলে, এলেকাটা ঝোপের আড়াল থেকে, আমার দিকে চেয়ে হাসে, আর একটি চোখ বুজে যেন কী ইশারা করে। আবার বলে, 'মহামাঁস তো খেতে শিখি নাই। পেট ভরাব কী দিয়ে। খিদের জ্বালা গ, বুইঝলে?'

গোপীদাস আওয়াজ করে, 'জয়গুরু।'

কিন্তু মহামাঁস কী। গোপীদাস জিজ্ঞেস করে, 'তা মহামাঁস খেলো কি পেট ভইরবে হে?'

এলেকাটা বলে, 'খেতে পাইরলে, ভইরত। মহামাঁসের তো অভাব নাই গ।' গোপীদাস আবার 'জয়গুরু' বলে। এলেকাটা বাবাজী তেমনি খিক্‌খিক্ করে হাসে। হাতছানি দিয়ে আমাকে ডেকে বলে, 'ইদিকে আসেন বাবু, একটো কথা বলি।'

আমি মাঝখানের সিঁড়ি থেকে উঠে আসি। কিন্তু মহামাঁস মানে কী? মহামাংস? মানুষের মাংসকেই তো মহামাংস বলে জানি। এলেকাটা বাবাজী কী তাই দিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তির আশা করেছিল নাকি?

সামনে এসে দেখি, হাঁটু মুড়ে পায়ের ওপর বসে আছে বাবাজী। ঝোপঝাড়ের মাঝখানে এমনভাবে বসে আছে, আওয়াজ না দিলে সাধ্য নেই, সেখানে কেউ জীবের সন্ধান পাবে। সামনে এসে দাঁড়াতে তেমনি হেসে বলে, 'এই ক'দিন আগেই, অই কুণ্ডে এক বাবাজী দেহ রক্ষা কইরেছেন। ফুটন্ত জল কি না, তাই বইলছি, থাক্ আর নাইমবেন না, উথান থেকে দ্যাখেন।'

গোপীদাস তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে, 'কে গ?'

'সি তুমি চিনবে না। লতুন এইসেছিল। শ্মশানের উইপারে থাইকত। চ্যালা চামুণ্ডা জুইটতে দেরি হয় নাই। বাবাজী একেবারে ঘোর তান্ত্রিক। গ্যাঁজা মদ, দুয়েতেই খুব টান। তা এই ক'দিন আগে কারণ খেঁইয়ে, তা'পরে আবার খুব কইরে গ্যাঁজায় দম দিয়ে এই কুণ্ডের সিঁড়িতে এইসে শুইয়েছিল। কখন যে গড়িয়ে পইড়েছে কেউ জানে না। জাইনবার কথাও না। রাতবিরেতে কে আর অত খোঁজ রাখে। যখন তোলা হলো, তখন বেবাক সেদ্ধ। ই তো আর তুমার চাল ডাল লয় যে, কুণ্ডের জলে ফুইটবে না। মানুষ ঠিক ফোটে।'

বলে আবার খিক্‌খিক্ হাসি। গোপীদাস আওয়াজ করে 'জয়গুরু।' কিন্তু আমার গায়ের মধ্যে যেন শিউরে ওঠে। একটা গোটা মানুষ গরম জলে সেদ্ধ হয়েছে! এ যেন সেই রূপকথার ফুটন্ত তেলে ফেলে দেওয়া! নরকের শাস্তি তৈল কটাহে নিক্ষেপ! আমি জলের দিকে ফিরে চাই। এই কুণ্ডে বুদবুদ উঠছে না, ফাটছে না। টগবগ করে ফুটে ফুটে শব্দ করছে না। কিন্তু দূর থেকে কেবল উত্তাপ লাগে না। খরতাপে যেমন মরীচিকা কাঁপে জলের ওপরে উত্তাপের তীব্রতায় তেমনি মরীচিকার মতো কাঁপছে। এলেকাটা বাবাজীর কথার সত্যি-মিথ্যা জানি না। তবে মানুষ পড়লে সেদ্ধ হবে সন্দেহ নেই।

আমি বলে উঠি, 'কী দরকার ছিল এখানে এসে শোবার?'

এলেকাটার আবার সেই হাসি। বলে, 'বাবুর কথা শুইনে হেস্যে মরি গ। নিজের দরকারের জন্যে ক্যানে শুতে আইসবে বাবু। যার দরকার সেই ডেক্যে নিয়ে আইসছে।'

'সে আবার কে?'

'মরণ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!...মরণ বইললে, আয় ইখানে এইসে শো। তাই এইসে শুল, আর মইল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।'...

বিচ্ছিরি! মৃত্যু, নিয়তি, যাই বলো, এই তত্ত্বরহস্যের কথায় ও হাসিতে গায়ের মধ্যে যেন কেমন করে ওঠে। গোপীদাসের দিকে চেয়ে ফিরতে যাই। তখন শুনি, 'তা বাবু, কি কারণে, ডেক্যে লিয়ে আইসলাম আপনাকে, এলেকাটা বাবাজীকে কিছু দিয়ে যান।'

গোপীদাস দাড়ি কাঁপিয়ে চোখ পাকায়। ঠোঁট গুটিয়ে ঘাড় নাড়ে। বলে, 'অইটি বলো ক্যানে। মরণ কুণ্ডের ইজারা লিয়ে বইসে আছ. পাওয়ানা দিয়ে যেতে হবে।'

এলেকাটা বাবাজী জিভ কেটে মাথা নাড়ে। বলে. 'ছি ছি ছি, মরণ, কুণ্ডের ইজারা লিব আমি। বলে শালো. আমার ইজারা লিয়ে কে বস্যে রইয়েছে তার ঠিক নাই। আমি থাইকব মরণ কুণ্ডের ইজারা লিয়ে। দেন বাবু, এলেকাটা বাবাজীকে কিছু দিয়ে যান।'

আবার আমার দিকে চেয়ে হাত বাড়ায়। এমন কিছু জটিল ব্যাপার না। নতুন মানুষ, বাবু বলে মনে হয়েছে, তাই কিছু প্রাপ্তিযোগের আশা। তা না হয় হলো। কিন্তু ঝোপের আড়াল থেকে ওরকম ডাক দিয়ে খিকখিক করে হেসে এত কথা শোনাবার কারণ কি? ভয় দেখাবার জন্য নাকি? তখন তো মনে হচ্ছিল ব্যাপার গুরুতর। মূলে তো কিছু আশা। জিজ্ঞেস করলাম, 'এলেকাটা নামের মানে কী?'

এমন তো কখনো শুনিনি।'

আবার সেই হাসি। সঙ্গে সঙ্গে হাতের ওপর ভর দিয়ে সামনে পা এগিয়ে বসে। দেখি একটা পা আছে, আর একটা পা হাঁটুর কাছ থেকে নেই। হাসতে হাসতে বলে, 'এই জন্যে!'

একপদবিহীন মানুষের নাম এলেকাটা হয় নাকি! জিজ্ঞেস করবার আগেই জবাব শুনি, 'এল গাড়ি', মানে রেলগাড়ি জানেন তো?'

যে রকম শুনছি, তাতে রেলগাড়ি নামে শকট আছে, সেটাও হয়তো জানতে হবে এবার, বলি, 'জানি।'

'তা রেলে এ পাখানি কাটা পইড়েছিল বুইঝলেন ক্যানে বাবু। সি থেকে এলেকাটা বলে সবাই।'

অর্থাৎ রেলেকাটাই হলো এলেকাটা। ভালো ভালো। তার সঙ্গে বাবাজী কেন, সে কথা আর জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করি না। যে কারণেই হোক, ইনি বাবাজী। তারপরে অন্য নাম যা-ই থাক, রেলে কাটা পড়ার খ্যাতিতেই বাবাজীর নামের গৌরব। খুবই সোজাসুজি সহজ ব্যাপার। অথচ শুনলে মনে হয়, না জানি কী ভজকট জটিল রহস্যই রয়েছে নামের মধ্যে।

ক্ষমতায় যেটুকু হয় পকেট থেকে তাই তুলে এলেকাটার হাতে দিই। সঙ্গে সঙ্গেই জয়জয়কার 'জয় বাবা বক্রেশ্বর। জয় বাবা অঘোর।'

কপালে হাত ঠেকিয়ে আবার বলে, 'তবে আমার আসল নাম মানিকলাল। বাবার থানে আছি বটে, তবে জাইনবেন, আমি শৈব না বাবু, শাক্ত। যদি পুজো দেন তাহলে একটুক পেসাদ যেন পাই।'

গোপীদাস ততক্ষণে আমাকে ডাক দেয়, 'এইস বাবাজী, এইস। তা অই গ এলেকাটা বাবাজী, আমাদিগের ক্ষ্যাপা অবধূতের খবর কী? ইখানে আছে?'

এলেকাটা এমন ঠোঁট বাঁকায় যে, দাড়ি সুদ্ধ উল্টে যায়। বলে, 'থাইকতে পারে। উয়ার কথা আমাকে জিগেস করো নাই বাবা, বইলতে লারব।'

গোপীদাস একটু অবাক হয়ে বলে, 'ক্যানে, তুমি অবধূতের চেলা না?'

সঙ্গে সঙ্গে এলেকাটার বিদ্রোহ, 'আমি শালা কোনো শালার চেলা নই। উসব আমাকে জিগেস করো নাই।'

গোপীদাসের চোখে সেই বিটলে ছোঁড়ার বিটলেমি ঝিলিক দেয়। বলে, 'অ, আচ্ছা বাবাজী, ভৈরবী ঠাকরুণের খবর জানো?'

'নাঃ।'

এক কথায় নাকচ। কেবল নাকচ না, বিরক্তি যত বিক্ষোভ তত। গোপীদাস তবু জিজ্ঞেস করে, 'ইখানে আছে কী না, তাও বইলতে লাইরছ?'

'তা থাইকতে পারে, খুঁজে দ্যাখ গা।'

গোপীদাসের দাড়ির ভাঁজে হাসি। ফিরতে ফিরতে চোখের ইশারায় আমাকে চলতে বলে। আমি চলতে চলতে শুনি, এলেকাটা বাবাজী বিড়বিড় করে, 'দ্যাখ গা তোমার অবধূতের কীর্তিকলাপ, শালা সাধনা কইরতে এইসেছে।'

কথায় কথায় এত যার চোখে মুখে গোঁফ দাড়িতে হাসি, পিকপিকিয়ে বাজে নাভিস্থল থেকে, হঠাৎ একজনের নামোচ্চারণেই একেবারে যেন তার আগুনে ঘিয়ের ছিটা। ব্যাপার কী?

গোপীদাস আমার চোখের দিকে চেয়ে বলে, 'বইলব বাবাজী, পরে বইলব।' সে বিষয়ে সন্দেহ কিছু আছে। পরে জানা যাবে।

আপাতত পাপহরা জলাশয়ে যাবার আগে মাঝখানের কুণ্ডের দিকে আর একবার

চোখ পড়ে। প্রথমবারে লক্ষ্য করিনি। এখন দেখছি কাঁচের মতো স্বচ্ছ জলের তলায় গোটা গোটা চাল ডাল পড়ে আছে। ফুটন্ত উষ্ণ জল দেখে অনেকে হয়তো আশা করেছিল চাল ডাল ফেললে ফুটবে।

গোপীদাস বলে, 'আবার কী দেখ বাবাজী?'

'চাল ডাল।'

গোপীদাসও চেয়ে দেখে আর হাসে। বলে, 'আমার গুরুর কথা মনে পইড়ছে বাবাজী। জয় গুরু জয় গুরু!'

সে কপালে হাত ঠেকিয়ে গুরু স্মরণ করে। তারপরে বলে, 'আমার গুরুর নাম ছিল নয়ন ক্ষ্যাপা। তা সি ক্ষ্যাপার সাথেই পেথম এই তীথে এইসেছিলাম। আমারও বাবাজী পেথম এই কুণ্ড দেইখে মনে হইয়েছিল, এত গরম, এত টগবগানি, ই জলে চাল ডাল ফুইটবে। ঝোলা থেকে এক মুঠা চাল লিয়ে ই কুণ্ডেতেই ফেইলেছিলাম। সি দেইখে ক্ষ্যাপার কী হাসি। বললেন, "অই র‍্যা ভোলা, ই জল সি জল লয় রে। ই জল পাকা জল। ই জলও বটে, গরমও বটে, ফুইটছেও বটে। কিন্তুক চাল দিবি, ডাল দিবি, দিব্বি ফুইটবে, মুখের মতো গেলবার গরাসটি হবে, উটি হবার লয়। ই থেকে বুঝে লে নিজের সাধন তত্ত্ব। সাধন সাইধবি এমনি কইরে। জলও থাইকবে, গরমও থাইকবে, ফুইটবেও বটে, কিন্তুক আদত মালে ফুট খাবে না।"'

কথার শেষে গোপীদাসের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। বক্রেশ্বরের দূর বিস্তৃত শিবমন্দিরের দিগন্তে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। তার গুরু নয়ন ক্ষ্যাপাকে কখনো চোখে দেখিনি। কিন্তু যেন গোপীদাসের মতোই একটি চুলদাড়ি আলখাল্লাওয়ালা মানুষের ছবি ভেসে ওঠে। আর ভাবি, বাউলের সেই এক তত্ত্ব কথা। কিন্তু কত বিচিত্র তার প্রতীক। কুণ্ডের উষ্ণ জলের কথায়ও তার তত্ত্বের প্রতীক জেগে ওঠে।

একটু পরে গোপীদাস 'গুরু সত্য' বলে আমাকে ডাক দেয়, 'এইস বাবাজী।'

তার সঙ্গে একটুখানি গিয়েই নতুন দিগন্তে এসে পড়ি। দেখি বাঁধানো বড় ঘাট। এদিকে ওদিকে মেয়ে-পুরুষ কয়েকজন স্নান করছে। ঘাটের সিঁড়ির এখানে-ওখানে দু-একটা ছেঁড়া কাঁথা-মাদুর।

গোপীদাস বলে, 'পাপহরা।'

আমার মনে হয়, জলের এমন গাঢ় রঙ দেখিনি। পৌষের নীল আকাশের ছায়া যেন এই জলে কেমন গাঢ় কৃষ্ণ হয়ে উঠেছে। খাঁটি আয়নার কাঁচে যেমন গভীরতা, এ জলেও যেন তেমনি। এখনই যেন উঁকি দিলে পাতালরাজ্যের সব কিছু দেখা যাবে।

এ নদী নয়। এমন কি বড় দীঘিও নয়। মাপজোক করে কাটাকাটি নেই। রোদ দেখে মনে হয়, পুবে-পশ্চিমে লম্বা আপন খেয়ালে টলমল এক জলাশয়। জলাশয়ের ওপারে চোখ পড়তে হঠাৎ চমকে উঠি। এতক্ষণ খেয়াল করিনি। দেখে মনে হয় যেন এক বিশাল সাপের ফণা তোলা কেওড়ার ঝাড়। তার পাশে লকলকে আগুনের শিখা। বাতাস নেই, আগুনের জিভ যেন শূন্যে মেলে আকাশ চাটতে চায়। আগুনের পাশ ঘেঁষে সুঠাম শক্ত কালো এক পুরুষ। পরনে এক চিল্‌তে কাপড়, মাথায় গামছা। মোটা বাঁশে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দেখা মাত্র সেই মুহূর্তেই যেন সব বুঝতে পারি। তবু মুখে কথা ফোটে, 'ওখানে কী?'

গোপীদাস বলে, 'শ্মশান বাবাজী। আসলে বক্রেশ্বর হলো মহাশ্মশান। যে শ্মশানের কোনো নিবিত্তি নাই, তারে বলে মহাশ্মশান। বক্রেশ্বরের চিতা কখনো নিভে না বাবাজী। যিদিনে আইসবে, যখনই আইসবে দেইখবে, চিতা জ্বইলছে।'

মহাশ্মশান। চির সংস্কারের মনে কোথায় যেন শ্মশানের নামে এক ভয় জড়িয়ে

আছে। মৃত আর শবের সান্নিধ্যে মন কখনোই যেন অনায়াস হয়ে ওঠে না। কিন্তু উষ্ণ কুণ্ড, এই জলাশয়, এত শিবমন্দির, এই গাছপালা ঝোপঝাড় প্রান্তর, গেরুয়া রঙের পাথর, মাটির সন্ন্যাসী-প্রকৃতি, আর গোপীদাসের কথা শুনতে শুনতে একবারও যেন অন্ধকার জাগে না। বরং সমস্ত মন জুড়ে যেন কী এক বিস্ময় জাগে। কী এক অচেনা গভীরতা, অদৃশ্য অচিন দূরত্ব আমাকে ডাক দিয়ে ডুবিয়ে নিয়ে যায়।

এত মন্দির দেবদেবী দেখি, নমস্কারের কথা মনে আসে না। পাপহরার ঘাটে দাঁড়িয়ে সহসা মনে হয়, ওই চিতার আগুনকে নমস্কার করি। কেন আমার এমন মনে হলো, আমি জানি না। অথচ আমার চারপাশ সম্পর্কে আমি অচেতন নই। তাই হাত তুলে চিতার আগুনের দিকে চেয়ে নমস্কার করতে পারি না। কিন্তু মনে মনে করি।

কেন করি, কিছুই জানি না। কার চিতা তাও জানি না। তবু দেখি, আগুনের বিশাল বুকে আগুনের ব্যাকুল আলিঙ্গনে কে যেন মহাশান্তিতে নিবিড় ঘুমে অচেতন। কেন দেখি তাও জানি না। কেন প্রাণ বারংবার নমস্কারে নত, আমি জানি না।...

হঠাৎ মোটা গলার চড়া হাসিতে চমক লাগে। দেখি, এক খালি গা, প্রকাণ্ড কালো পুরুষ, সিঁড়ি দিয়ে জলে নেমে আসে। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, কানে রুপোর মাকড়ি। চোখ দুটি লাল টুকটুকে। মুখে জ্বলন্ত বিড়ি। শরীর যেন একটু টলমল। হাত মটকা দিয়ে বলে, 'তু যা ক্যানে, আমি আইসছি।'

তার জবাবে ওপরের সিঁড়ি থেকে মেয়ে গলায় ঝংকার বেজে ওঠে, 'না, তুমি এইস। কেমন তুমার স্‌সাত্যি কথা, আমি সিটি শুইনতে চাই। এইস বইলছি।'

ই বাবা দেখে মনে হয়, মেয়ে লয় বটে, বিষহরির বিটি! পায়রার মতো বুক ফোলানো যুবতী, কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছে যেন ছিলা-টানা ধনুকের মতো বেঁকে। একবার যদি তীর ছিটকে আসে, তবে অব্যর্থ শিকার জানবে। মাথাতে নেই ঘোমটা, বাসী খোঁপা এলোমেলো। ময়লা রঙিন শাড়িটাও শরীর জড়িয়ে এমন কিছু ঢাকাঢাকিতে নেই। চোখের রঙ কোকিলের চোখের মতোই লাল। বচন তো শুনলেই। এর পরেও কি কারুর এই মুখের ওপরে কথা বলতে সাহস হয়!

হয়। কেবল কথা বলার সাহস না, হেঁড়ে গলায় হো হো করে হাসতেও সাহস পায়। পুরুষটি হেসে বলে, 'তু যা না বইলছি। আমি ডুব দিয়ে আইসছি।'

বলে ঘাটের শানে বসে, জলে পা ডুবিয়ে দেয়। বিড়ি টানে ঘন ঘন। ওপর থেকে তেমনি স্বরে শোনা যায়, 'ক্যানে, একবার ঘুরে যেঁইয়ে লাঁইতে লাইরছ?'

'হুঁ, লাইরছি, যা!'

এক মুহূর্ত চুপচাপ। নারীর চোখে তীরের ফলায় অঙ্গারের বিন্দু জ্বলে। কিন্তু আর কথা না। ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে পিছন ফিরে চলে যায়। যেদিকে যায় সেদিকে কয়েকটি ঘরের ইশারা দেখা যায়। একজন স্নানার্থী জিজ্ঞেস করে, 'কী হলো র‍্যা মদন?'

মদনের জবাব, 'শিল লোড়াতে দিনে-এতে যা হচেছ, তাই। আবার কী, ঘট-টং ঘসড় ঘসড়। লে বাবা, যা।'

তারপরেই কথা নেই, বার্তা নেই, হাত দুটো পিছনে ভর দিয়ে শরীর আর মুখটাকে আকাশমুখী করে মদনের প্রচণ্ড গলায় গান বেজে ওঠে, 'হারালিধি পেইলেম বইলে হিদেতে লইলে তুলি...।'

কে একজন বলে ওঠে, 'উঃ উঃ, উ বাবা র‍্যা!'

ছোটখাটো একটা হাসির ঢেউ লাগে। আমিও গোপীদাসের দিকে চেয়ে হেসে ফেলি।

গোপীদাস হেসে বলে, 'শ্মশানের ডোম।'

আর যে চলে গেল, সে নিশ্চয় ডোম্বের ডোম্বিনী। চর্যাপদের ডোম্বিনীর মতোই যেন যুবতী নায়িকা লক্ষণাক্রান্তা।

গোপীদাস জিজ্ঞেস করে, 'নেয়ে লিবে বাবাজী? এ জলে নাইতে খুব ভালো লাইগবে। উ পাটটো মিটিয়েই লাও।'

জিজ্ঞেস করি, 'খুব গরম না তো?'

'লেমেই দ্যাখ ক্যানে বাবাজী, এই ঠান্ডাতে উইঠতে ইচ্ছা কইরবে না। তা'পরে চলো, বাবাকে এবেলা একবার দরশন কইরবে।'

সেই ভালো। দর্শন মানে দেখাই। দর্শনের গুণ আমার নেই। মন্দিরের থেকে বাইরে যা দেখি তাতেই আমার মন মজে, ঘোর লাগে। ঝোলা খুলে সামান্য এক বস্ত্র পরে নিই চানের জন্য। আর গা মোছার তোয়ালে। গোপীদাসও তৈরি হয়।

জলে নামতে গিয়ে আবার চমক। আবার ঠেক খাই। ঘাট বরাবর ওপারে এতক্ষণ শুধু এক পাকা বাড়িই দেখছিলাম। ওপারে জলাশয়ের কাছাকাছি সামনের দিকে সব খোলা এক কুঁড়েঘর দেখতে পাই। তার সামনে নিকানো ঝাঁটানো উঠোন। উঠোনের এক পাশে বড় এক গাছের গোড়ায় ভুর করা রয়েছে নরমুণ্ডের কঙ্কাল। আবার যেন হঠাৎ সব কিছুর মধ্যে এক নতুন জগৎ জেগে ওঠে। গোপীদাসের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করি, 'ওখানে কী আছে?'

গোপীদাস ওপারের দিকে চেয়ে বলে, 'উটি অঘোরী বাবার থান। মস্ত বড় তান্ত্রিক সাধু ছিলেন। উনি আর নাই, দেহ রেইখেছেন অনেককাল।'

'কতকাল?'

তা বইলতে লাইরব। অ্যাই ধরগা, আমি ওঁয়ারে শেষ দেইখেছি পেরায় চল্লিশ প'য়তাল্লিশ বছর আগে। আর দেখি নাই। সি বাবাজী, ওঁয়ারে দেইখলে বুকের মধ্যে কেমন কইরত!'

'কেন?'

'অ্যাই দশাসই মূর্ত্তি, তায় একেবারে দিগম্বর। চখ কী! অই বাপরে বাপ! চখে চখ পইড়লে মনে হতো, তোমার ভিতর-বার বলে কিছু নাই। আলখাল্লা আর কপ্নি দিয়ে নিজেকে কত ঢাইকবে, আর কী লা ঢাইকবে। ওঁয়ার যা দেখার তাই দেইখতেন। ভিতরের যত কালাকালি, সব ওঁয়ার নজরে পইড়ত। ফাঁকি দিবার উপায় নাই। অই জন্যেই কেউ কাছে গেলে বাঁশ লিয়ে তাড়া কইরতেন। আর মুখে বাবাজী শ-কার ব-কার লেইগেই ছিল।'

আমি অবাক হয়ে ওপারের কুটিরের দিকে চাই। শূন্য কুটির, কাউকে দেখতে পাই না। কুটিরের পিছনের বেড়ার কাছে একটা কী যেন রয়েছে। হয়তো তাঁরই স্মৃতি স্তূপ। উঠানেও কেউ নেই। পাকা ইমারতের জানালা দরজা, সবই বন্ধ। কেবল বটের গোড়ায় রাশিকৃত নরমুণ্ড কঙ্কালের চোখের অন্ধকার ছিদ্রে ছিদ্রে যেন তিনি নিষ্পলক দৃষ্টির মতোই নিরীক্ষণ করছেন।

স্নানের কথা ভুলে যাই। জিজ্ঞেস করি, 'আপনি কাছে গেছেন কখনো?'

'যেইছি বই কি বাবাজী। উনি যে গুরুর গুরু। নামে কামে, উনিশ বিশ তফাত। লইলে বাবাজী বাউলের সাধনার সাথে ওঁয়ার সাধনার তো তফাত কিছু না। কেউ শ্মশানে, কেউ আখড়ায়। যেথাকার যেমন আয়োজন, সেই মতো। ইখানে এইসে ওঁয়াকে দশ্‌শন না কইরে কি কেউ যায়!'

আমার চোখের সামনে এক বিশাল নগ্ন ক্ষ্যাপা মূর্তি ভেসে ওঠে। কিন্তু কেবল উন্মাদ ভাবতে পারি না সেই মূর্তিকে। ভাবনা চিন্তার যে লৌকিকতার মধ্যে থেকেও

মন কখনো কখনো কোনো এক অলৌকিক ভাবের মধ্যে ডুবে যায় সেইরকম লাগে। সেই মূর্তির মধ্যে কী যেন এক অলৌকিকতা দেখি। হয়তো কেবল কল্পনা। কিন্তু সম্যক কোনো কিছুই জানি না। জিজ্ঞেস করি, 'আপনাকে কী বলেছিলেন?'

গোপীদাস সব খুলে এক চিল্‌তে কাপড় জড়িয়ে খালি গায়ে সিঁড়িতে বসে। বলে, 'অই বাবা, আমার গুরুর সাথে পেথম সিবারে এইলেম, সিবারেতেই দেখা। আমার ক্ষ্যাপা বাবাকে একটা মন্দ কথা বলেন নাই। কুঁড়েতে যেঁইয়ে দাঁড়াতে লয়ন ক্ষ্যাপাকে বইললে, "কীরে শালো, এতদিনে সময় হলো তোর?" ক্ষ্যাপা হেসে বইললেন, "তুমি যখন ডাইকলে তখনই এলাম। আগে তো ডাকো নাই, কেমন কইরে আইসব।" উ বাবা, কী বইলব বাবাজী, দেখি কিনা দুই ক্ষ্যাপা চখে চখে চেইয়ে হাসে। যেন কতকালের পীরিত। অথচ আমার ক্ষ্যাপা বইলেছিলেন, সিই জীবনে দুজনার পেথম দেখা। আমি বইসেছিলাম আমার গুরুর কাছে। তা কি বইলব বাবা, হাঁক কইরে উঠে ঘুষি পাকিয়ে তুইলে আমাকে দেখিয়ে লয়ন ক্ষ্যাপাকে বইললেন, "দে তো, উ শালোকে দু ঘা দে তো। শালোর মনে আমি পেচছাব করি।" ই কথা না বইলেই অ্যাক্কেবারে নিজের পুরুষাঙ্গখানি দেখিয়ে আবার বইললেন, "আমারটা দেখ্যা কী করবি শালো, লিজেরটাকে ঠিক করগা যা।"

বলতে বলতে গোপীদাসের ভাবান্তর হয়। সে ওপারের কুঁড়ের দিকে যেন অবাক শোকের চোখে চেয়ে থাকে।

এসব তত্ত্ব ধর্ম আমি কিছুই জানি না। কিছুই বুঝি না। কেবল অবাক হয়ে শুনি। আর সব মিলিয়ে আমাকে যেন কোন্ এক রহস্যের ঘূর্ণিপাকে টেনে নিয়ে যায়। এক অবুঝ বিস্ময়ের ঘোর লেগে থাকে। একটা অলৌকিক ভাবনা আমাকে ঘিরে থাকে।

গোপীদাস সেদিকে চেয়েই মাথা নেড়ে বলে, 'মিছা বইলতে লাইরব বাবাজী। তখন বয়স কম। অঘোরী ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ দিয়ে বইসেছিলেন, আমি মনে মনে ওঁয়ার অঙ্গের কথা ভেইবেছিলাম। যাই ভাবনা অমনি হাঁক! আমার বুকে যেন বাজ পইড়ল। আমি দু'হাত দিয়ে লয়ন ক্ষ্যাপার পা জড়িয়ে উপুড় হইয়ে রইলাম। গুরু আমার গায়ে মাথায় হাত বুলাতে লাইগলেন। বইললেন, "ঠিক কইরবে গ, ঠিক কইরবে।" অঘোরী সি কথার জবাব দিলেন না। খালি বইলতে লাইগলেন, "শালোর আদিখ্যেতা দেইখলে গা জ্বালা করে! শালোকে ভালো কইরে ধোয়াবি, লইলে দাগ যাবেক নাই।"

গোপীদাসের আবার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। শুধু উচ্চারণ করে, 'লইলে দাগ যাবেক নাই।'

মনে হয় স্বপ্নের মতো বিস্ময়কর, বিচিত্র, অথচ অস্পষ্ট ঝাপসা। কিন্তু বক্রেশ্বর মহাশ্মশানের কোনো এক দুর্নিরীক্ষ্য সংসারের আলো অন্ধকারে আমি যেন বসে আছি। যা শুনি তার গুণ ব্যাখ্যা করতে পারি না, মর্মে যেতে পারি না। ভাষা যেন দুর্বোধ্য। যা দেখি তা অচেনা।

আমিও ওপারের দিকে চেয়ে থাকি। আবার একবার এই দেশের কথা নতুন করে মনে হয়।

কতক্ষণ ওপারের দিকে চেয়ে বসে ছিলাম, জানি না। গোপীদাস কতক্ষণ চুপ করেছিল, খেয়াল করিনি। ওপারের কোনো কিছু যে দেখছিলাম, তাও না। গোপীদাস-বর্ণিত সেই বিশাল কালো ধুলা-ভস্ম মাখা নগ্ন এক মানুষের মূর্তি আমার চোখের সামনে ভাসছিল। আর গোপীদাসের কথাগুলো মস্তিষ্কের সীমান্তে সীমান্তে চক্র দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, বসনভূষণ নগ্নতা, সকলই কোথায় যেন একাকার হয়ে

গিয়েছে। সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা এক অদেখার গভীরে। মানুষ সেথায় চলেছে অন্য কলে। সেথায় চোখের দেখায় সব দেখা না। তাতেই সব কথা না। সে যেন আর এক অলক্ষ্যের চোখে দেখা। সেই দেখাতেই কথা। নইলে গোপীদাসকে অঘোর ক্ষ্যাপা অমনভাবে বলেছিল কেমন করে।

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব বুঝে উঠতে পারি না। কেবল এই বিরাট সংসারের বিশাল চলমানতায় নিজের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে দেখি, ভারী দীন অতি ছোট। তাইতে আতুর বোধ করি।

গোপীদাস গায়ে হাত দিয়ে ডাকে, 'ইবারে নেয়ে লিবে চলো বাবাজী।'

চমক ভাঙে। চোখ ফিরিয়ে চাই। বলে উঠি, 'একবার ওপারে ঘুরে এলে হতো না?'

গোপীদাস হেসে বলে, 'যাবো বাবাজী, যাবো বইকি। ইদিককার পাট মিটিয়ে লিই। তা'পরেতে যাবো। শ্মশানের উঁদিকটো সব দেইখে আইসব।'

অগত্যা তা-ই। কী দেখতে যেতে চাই, তাও জানি না। তবু মনে হয়, ওপারে যেন কী আছে। ওপার যেন আমাকে হাতছানি দেয়। জলে নামবার আগে তবু না জিজ্ঞেস করে পারি না, 'অঘোর ক্ষ্যাপার প্রকৃতি ছিলেন?'

গোপীদাস তার লোমশ ভুরু তুলে চোখ বড় করে বলে, 'লিশ্চয় বাবাজী। পিকিতি ছাড়া সাধন হয় না। তবে ই ক্ষ্যাপার বেলায় অন্য কথা। ক্যানে, না কী ওঁয়ার সাধনে পিকিতির নাম ভৈরবী।'

'কে ছিলেন তাঁর ভৈরবী?'

'বইলতে লাইরব বাবাজী। উনি ছিলেন ই শিবক্ষেত্রে বইসে মহাভৈরব। ইখ্যানে কত ভৈরবী এইসেছে, যেইছে। খাঁটি বুজরুকি তো ওঁয়ার চখে ফাঁকি যাবার উপায় ছিল না। বাবাজী, সোম্‌সারে আছ লজরটিও তোমার খারাপ না। নায়িকার নাম লিয়ে, রতির নাম লিয়ে কত শত ঝি বিটি শরীলের সোখের জন্যে হেথা হোথা পাক দিয়ে বেড়াচ্ছে, দেইখছ তো! তা, যোবতী বিটি তুমি অঙ্গে লিলে গেরুয়া, মাথায় রাইখলে জটা, হাতে লিলে ত্রিশূল, আর ভৈরবীটি হইয়ে কেবল সঙ্গ করবার জন্যে সাধু খুঁইজে বেড়াবে, তা হয় না। অমন অনেক ভৈরবীকে অঘোর ক্ষ্যাপা চিতার কাঠ মেরে তাড়া ক'ইরেছেন। নিজের কানে শুইনেছি বাবাজী, একবার এক বিটিকে কী গালাগাল! অই বাবা, কান পাতা যায় না। সব বুইঝতে পাইরতেন। আবার তেমন ভৈরব হলে তাকে ভক্তি কইরে বইসতে দিতেন, তার সঙ্গে সাইধতেন। তা বলে কী আর যিদিন যখন খুশি? তা না, মহাযোগের সোময় না হলে কিছুই না। মহাযোগের সোময় যদ্দিন না আইসবে, তদ্দিন কেবল ভৈরব ভৈরবীর যোগে বইসে ধ্যান করা। তাও দেইখেছি। তা-ই বইলছি, ওঁয়ার কোনো ভৈরবীর নাম জানি না। ক্ষ্যাপা নিজেও কি তাদের নামধাম জাইনতেন? না, মনে হয় না। উসব নামের খোঁজে আদত মিলে না।'...

যত শুনি, ততই অবাক লাগে। গোপীদাসের কথা না শুনলে কোনো দিন জানতে পারতাম না, প্রকৃতি আর ভৈরবীদের মধ্যে খাঁটি আর বুজরুক থাকে। সাধিকার ছদ্মবেশে শরীরের সুখের খোঁজে নারী ফেরে, তা-ই কি কখনো শুনেছি! তা-ও এই বক্রেশ্বরের মহাশ্মশানের মতো জায়গায়! ভাবতেও কি পেরেছি কখনো! নগরে, জনপদে যে সমাজে পরিবেশে বাস করি, সেখানে বসে ঘরত্যাগিনী নারীর এমন রূপের কথা কি চিন্তা করা যায় কখনো! তাও কিনা শুধু শরীরের সুখের খোঁজে! কারা সেই নারী? কেমন তাদের রূপ? কী তাদের মন? কত, কতই না বিচিত্র, আমারই আঙিনার বাইরে নরে নারীতে লীলা করে। কিছুই তার জানি না। যতটুকু জানি, দেখি, তা শুধু ধন্দ লাগায় চোখে মনে।

এ যেন ঘরে থাকি, পরিবারের কাউকে পুরো দেখি না, চিনি না। দেশে থাকি, দেশের রূপ মন দেখি না, চিনি না।

গোপীদাস উঠে দাঁড়ায়। ওপারের দিকে চোখ রেখেই বলে, 'মাহিন্দ্রক্ষ্যানে দুজনার সাথে দুজনার দেখা হলেই সাধন হয়। যারা সাইধতে জানে তারা সাধে।'...

কথার শেষে গোপীদাসের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। মুখ নামিয়ে জলের দিকে চেয়ে বলে, 'এইস বাবাজী, নেয়ে লিই।'

আমি তার পিছু পিছু গিয়ে জলে নামি। সত্যি, এ শীতের বেলায় ঈষদোষ্ণ জলের স্পর্শ যেন মধুর মতো। খাঁটি মধু যেমন মুখে উষ্ণতা ছড়িয়ে দেয়, এও যেন তেমনি। ওপরের কুণ্ডে জল টগবগিয়ে ফোটে। আর এখানে যেন ঠাণ্ডায় গরমে মেশানো গা সহানো। তেল সাবানের প্রশ্ন নেই। পথে বেরিয়ে সে কথা কে-ই বা চিন্তা করে। পথ চলাতে কে-ই বা চায়।

ইতিমধ্যে শ্মশানবাসী মদন কখন ডুব দিয়ে উঠে গিয়েছে। আরো দু'-চারজন যারা স্নানে আসে যায়, তারা কেউ কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে না আমাদের। নিজেদের মধ্যেই কথা বলে যায়। তার মধ্যে কেউ বা একেবারে মৌনী। আপনার ভাবেই আছে।

জলে নেমে গোপীদাস বলে, 'এ জলে নাইলে বাত ব্যামো সারে। চামড়ার রোগ যায়। বাবা বক্রেশ্বরের পুণ্যি লাগে। ডুব দাও বাবাজী।'

ডুব দিই। আরোগ্য বা পুণ্যের চিন্তায় না। এ জলের স্পর্শে শরীরে যেন নতুন অনুভূতি জাগে। অস্পষ্ট ধাতব গন্ধ, কিন্তু জলের স্বাদ বিকৃত না। নিজের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ জলের নিচে পরিষ্কার দেখি। জলের দূরে গভীরে অনেকখানি পর্যন্ত রোদের ঝিলিক দেখতে পাই।

স্নান করে উঠতেই ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে গায়ে। কিন্তু তাতে তেমন শীতবোধ করি না। ভিতরে যেন জলের উষ্ণতা চুঁইয়ে ঢুকেছে। গা মুছতে গিয়ে শুনি হরিধ্বনি। চেয়ে দেখি, একদল নতুন শ্মশানযাত্রী আসে শ্মশানের দিকে। কাঁধে তাদের শববাহী মই। মহাশ্মশান। চিতা এখানে কখনো নেবে না।

এখন ভাবি, এখানে এসে কেন আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল, এ যেন পৃথিবীর কোনো এক শেষ প্রান্তে এসেছি। এখান থেকে আর কোথাও যাবার নেই। কেন মনে হয়েছিল এ কথা, কে জানে। কিন্তু এই মহাশ্মশানের সেও এক সত্য। শেষ গন্তব্যের এক ঠাঁই এখানে।

কুণ্ডের পাশ দিয়ে ঘুরে ছোটখাটো অনেক মন্দির পেরিয়ে স্বয়ং বক্রেশ্বরের পাথর বাঁধানো চত্বরে এসে পড়ি। বক্রেশ্বরের সীমানা আলাদা। যেখান দিয়ে প্রবেশ করি, চত্বরে এসে বাঁদিকে দেখি এক জলাশয়। নাম শ্বেতগঙ্গা। কিন্তু গঙ্গা কেন। এ তো নদী নয়। চারদিক ঘেরা বিবর্ণ একটি জলাশয়। গোপীদাস কী যেন এক কিংবদন্তীর কথা বলে। কে যেন এই নাতিশীতোষ্ণ জলাশয়ে গঙ্গা আনয়ন করেছিলেন, নাম শ্বেতগঙ্গা। গঙ্গাস্নানের পুণ্যি হয় এখানে নাইলে। আমার আর তার দরকার ছিল না। লম্বা সিঁড়ি নেমে গিয়েছে ধাপে ধাপে। গোপীদাস জানায়, এ জলাশয়ের জল গরম না। জলাশয়ের চারদিকে বাঁধানো। চত্বরে ঢুকে ডান দিকে বক্রেশ্বরের মন্দির। চত্বরের পিছনে জলাশয়ের ওপারে সবদিকেই গাছপালার নিবিড় ছায়া। সীমানার পাঁচিলে ভাঙন লেগেছে। তাতে শ্যাওলা ধরেছে, আগাছা জন্মেছে।

নিঃশব্দ নিশ্চুপ চারদিক। কেবল কোনো কোনো পাখি যেন ডাকে থেকে থেকে। আর ঝিল্লিস্বর। সব মিলিয়ে এখানে আর এক পরিবেশ। তবু যেন সবুজ নিবিড় না, একটা ছন্নছাড়া রুক্ষতা বিরাজ করে সবখানে। ডান দিকে ফিরে মন্দিরের দরজার কাছে যাই। পায়ের পাদুকা চত্বরে ঢোকবার আগেই খুলে রেখে এসেছি। আমি একা

না। বক্রেশ্বর দর্শনেচ্ছু, আরো কিছু আছে। তবু ভিড় নেই বললেই চলে। কেবল একটি থামের পাশে এক রমণী দাঁড়িয়ে। দৃষ্টি তার মন্দিরের দরজার দিকে। রমণী যুবতী, কিন্তু যেন আবেশে আচ্ছন্ন, বিষণ্ণ অথচ উৎসুক। তার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একটি শিশু। সন্তান বলে মনে হয়, একই মুখ তাদের। একই ভাব যেন দু'জনের মুখে। কেবল শিশুর চোখে মুখে কৌতূহল বেশী।

সহসা যেন এক অজন্তার চিত্র ভেসে ওঠে চোখে। দৃশ্যটা যেন অনেকদিনের চেনা। রমণীর সীমন্তে ঝাপসা সিঁদুর। চুল ঘোমটার বাইরে এলানো।

আমি দরজার কাছে যেতে সামনেই দেখি সেই পান্ডা। প্রথম যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে একগাল হেসে অভ্যর্থনা করে, 'আস্যেন, আস্যেন, বাবাকে দর্শন কইরবেন, আস্যেন।'

তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে পিছন ফিরি। গোপীদাসকে দেখতে পাই না। সে আবার গেল কোথায়! আমি জানি, সে আমার পিছনে পিছনে আছে। সচকিত অনুসন্ধিৎসায় চত্বরের দিকে ফিরি। দেখি, দূরের পাঁচিলের কাছে দাঁড়িয়ে গোপীদাস ভেজা দাড়িতে ঝাপটা মারছে। ভেজা লম্বা চুল কাঁধে পিঠে ছড়ানো।

নজর রেখেছিল আমার দিকে। চোখে চোখ পড়তেই হাত তুলে বলে, 'যাও বাবাজী, বাবাকে দশ্‌শন কইরে এইস। আমি হেথাতেই আছি।'

তবুও কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলাম। কেন, গোপীদাস কি দর্শন করবে না? দেখি, গোপীদাস হাসছে। আর আমার পান্ডা আওয়াজ দেয়, 'ওদের মশায় ঈশ্বরের বালাই। ওদের কথা বাদ দেন ক্যানে। আস্যেন, আপনি আস্যেন।'

সেই মুহূর্তে আমারও মনে পড়ে যায়, বাউলের দেবদেবী ঈশ্বর নেই। আছেন শুধু গুরু। পান্ডার সঙ্গে মন্দিরে ঢুকতে গিয়ে ঠেক। দরজার কাছে এসে দেখি অন্ধকার। নিচের অন্ধকারে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। নিচে প্রদীপের রক্তিম শিখা তিরতির করে কাঁপছে।

সেখানে আরো অন্য মানুষের অস্পষ্ট ছায়া। তাদের অস্পষ্ট নানা গলার স্বর। আমি কী করব স্থির করবার আগেই পান্ডামশাই আমার হাত চেপে ধরে। নিচের ধাপে পা দিয়ে প্রায় টান দিয়েই বলে, 'আস্যেন, আস্যেন।'

জোর করে নামাবে নাকি? অন্ধকারে কী আছে, কারা আছে, কিছুই জানি না। অন্ধকারকেই ভয়। তবু কৌতূহলের টান কি কম? জেদাজেদির প্রশ্ন নেই। না দেখে কি আমিই ফিরতে চাই? পান্ডার হাত-ধরা হয়ে নেমে যাই।

নিচের পাথরে পা পড়তেই বুঝতে পারি ঠান্ডা ভেজা পাথর। প্রদীপের আলোয় দেখতে পাই গোল করে কাটা পরিখার মাঝখানে শিবলিঙ্গ। ইনি বক্রেশ্বরের বিগ্রহ। সেখানে দুইজন পান্ডা পুরোহিত। দু'জনকে নিয়ে বসে, সম্ভবত পুজোই করাচ্ছে। আমার পান্ডামশাই বক্রেশ্বরের বক্রতা দেখান। তারপরে কোনো কিছু না বলেই হঠাৎ হাতে যেন কী তুলে দেন।

বুঝতে না পেরে হাত বাড়াই। দেখি, কিছু ফুল-বেলপাতা। জিজ্ঞেস করি, 'কী করব?'

'বইসেন।'

বসব? ভাববে পরে, তার আগেই আমার হাত ধরে পান্ডা বসিয়ে দেয়। অর-পরেই পান্ডা নির্দেশ দেয়, 'নেন, ইবারে বলেন!'

বলেই সংস্কৃত উচ্চারণ শুরু হয়ে যায়। আমি প্রতিধ্বনি করি কী না, তাও শোনে না। নিজের মনেই বলে যায়। আমি তেমনি বসেই থাকি। উচ্চারণ করি কী না, নিজেই জানি না। সেখানে আরো, অন্য গলায় মন্ত্রোচ্চারণ ও প্রতিধ্বনি বেজে

চলেছে। আমি সকলের দিকে দেখি। অন্ধকারের কোণে কোণে দেখি। আমার ঘ্রাণে ধূপ দীপ বেলপাতা ফুলের গন্ধ। তার মধ্যে দুধের গন্ধ আছে। এই ঘ্রাণের ভিতর দিয়ে সমস্ত পরিবেশ যেন প্রথম থেকেই নতুন জগতে নিয়ে যায়।

কিন্তু এমনি করে কেন বসে আছি? এমনি করে ফুল-বেলপাতা নিয়ে? আমি কি বিশ্বাস করি? না, করি না।

তবে কেন বসে আছি? আমি কি মন্ত্রোচ্চারণ করি?

না, করি না।

তবে সব ফেলে দিয়ে আমি কেন চলে যাই না?

তা আমি জানি না।

এও কি বিশ্বাসের নামান্তর নয়?

আমি এ-সবে বিশ্বাস করি না।

তবু কেন উঠে চলে যাই না?

জানি না, জানি না, জানি না। আমার যেন দুই ধারার মাঝখানে বাঁধা এক কষ্টের অবস্থা। এই স্রোত যায়। ওই স্রোত যায়। আমি কোন্ স্রোতে যাই, বুঝতে পারি না। পান্ডা মন্ত্রোচ্চারণ করে, আমি নিঃশব্দেও প্রতিধ্বনি করি না। তার নির্দেশে কেবল ফুল-বেলপাতা ফেলে দিই, নিই। কেন, তা জানি না। কেবল মনে হয়, আমি এখানে নেই, বর্তমানে নেই। আমি যেন হাজার বছর ধরে অনেক পায়ের চিহ্নে চিহ্নে চলেছি। আমি বহু দূর থেকে আসি আমারই ছায়ায় ছায়ায়। একা না, বহু লক্ষ কোটির সঙ্গে।

আমি আসি, দেশ-কাল-গোষ্ঠীর পূর্ব পরিচয়ের আলো-অন্ধকার বেয়ে। পিছনের বিচ্ছিন্নতাকে যোগ দিয়ে দিয়ে। আমার বর্তমানের অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণের রূপে পাবার কৌতুকে, ঔৎসুক্যে।

'এবার প্রণাম করুন।'

প্রণাম করি! হে বর্তমান, যুগযুগান্ত দেখিয়ে নিয়ে এলে অনেক রূপ-অরূপের মধ্য দিয়ে। এখন যে রূপে তুমি দেখাও, অরূপের যে স্রোতে টেনে নিয়ে যাও, সেই পথেই চলি।

মন্দিরর নীচে থেকে বাইরে যখন আসি, তখন যেন রোদের রঙ অন্যরকম লাগে। একটু আগে দেখেছিলাম যেন কাঁসার মতো ঝলক। একটু সময়ের মধ্যেই কাঁসা যেন সোনার মতো হয়ে উঠেছে। পান্ডা তখনো ডাকে, 'আস্যেন।'

আইসেন বলে কি আসোন বলে, তাও বুঝি না। শুনে মনে হয়, আস্যেন! কিন্তু আবার কোথায়? একটু ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য মুখে আর একটি বিগ্রহের সামনে উপস্থিত করে। ইনি গুহাগহ্বরে নন, খোলা দরজার সামনে মেঝের ওপরেই। ইনি বক্রেশ্বরের শক্তি। যা হোক কিছু নাকি এখানে দিতে হবে।

দেবতা থাকলেই দেবী থাকবে। বক্রেশ্বরই বা শক্তিবিহীন বসত করেন কেমন করে। স্ত্রী ছাড়া স্বামী থাকবেন, এ বে-আক্কেলে কথাবার্তা, আমাদের জানা নেই। যেমন, যা নাই ভাণ্ডে, তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে; তেমনি, যা নাই ঘরে, তা নাই মন্দিরে। অতঃপরে এ মন্দিরের শক্তির দর্শনী না দিলেই বা চলবে কেমন করে। দর্শন করলেই দর্শনী লাগে। তবে, এর পুরোহিত আলাদা। দেখি, একজন গায়ে একটি চাদর জড়িয়ে পাশেই বসে আছে। দর্শনী কিছু দেবার পর সে আমার হাতে একটি ফুল তুলে দেয়। সেটি ঝোলায় ফেলি।

বক্রেশ্বরের গুহামন্দিরের প্রাপ্য সবই ঝোলায় ফেলেছি। কোথা থেকে কখন যে শালপাতায় মোড়া ফুল-বেলপাতা-বাতাসা পান্ডা যোগাড় করল টের পাইনি। পুজোর

শেষে সেটি হাতে তুলে দিয়েছে। অতঃপর পাণ্ডামশাইয়ের উক্তি, 'বেলা অনেক হলো। আপনার পূজা হইয়ে গেল, ইবারে ঘরে যাই।'

যাবার আগে দক্ষিণাটা মিটলেই যেতে পারে। সেটা বলে বোঝাতে হবে, তেমন আহাম্মক তোমাকে সে ভাবে না।

সি তো বটেই কথা। কিন্তু কী দক্ষিণা দিলে মশায়কে খুশি করা যাবে তা জানি না। জিজ্ঞেস করতেও ভয়। আমার মুরোদে কুলোবে কেন। তবু ভয়ে ভয়ে যা পারি তাই দিই।'

জয় বাবা বক্রেশ্বর। কী কৃপা! মশাইয়ের হাসিখানি দেখ ক্যানে একবার। বলে 'বেঁচ্যা থাক্যেন বাবা, বেঁচ্যা থাক্যেন।'

সঙ্গে সঙ্গে কোমরের কষি থেকেই বেরোয় একখানি তেলচিটে ছোট খাতা, দুই ইঞ্চি সমান একটি পেন্সিল। জিজ্ঞেস করে, 'নাম-ঠিকানাটো বলেন তো বাবা, লিখে রাখি। আবার যখন আইসবেন, আমার নাম কইরবেন, সব্বাই বাড়ি দেখিয়ে দিবে। আপনি না এল্যেও আপনার বাপ-খুড়ো-দাদা যেই আসুক, নাম শুইনলেই সবাই জাইনবে, আমার যজমান।'

বাবা স্বর্গে। খুড়া দাদা আমি কেউ কোনোদিন আর আসব কিনা জানি না। তবু বলতে আপত্তি কী। নাম-ধাম পিতৃপরিচয় সবই দিয়ে দিই। কিন্তু তারপরেও যে মশায় যান না! বেলা তো অনেক হলো, ঘরে যেতে হবে না?

যাবেন যাবেন, একটা কর্তব্য বলে কথা আছে তো। সেইটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে, 'ল্যান বাবা, আমাকে ছেইড়ে দেন। বইললাম, আমার ঘরে চলেন, একটুক ভাত পেসাদ হতো। আমাদিগের গ্রামখানি দেখা হতো। আর তো সিদিন নাই বাবা। বিটা-লাতীরা এখন পড়াশুনা কইরছে। গাঁয়ে লাইবেরি-টাইবেরি হইয়েছে। হাওয়া লেইগেছে সব জায়গায়। আস্যেন বাবা, আমাকে বিদায় দেন, নমস্কারটা সেৱ্যা ল্যান।'

হে বক্রেশ্বর! এ কি ভুল আমার! পূজা করালেন, দক্ষিণা নিলেন, যজমান প্রণাম না করা পর্যন্ত মশাই বিদায় নেয় কেমন করে। এ বিষয়ে একেবারে কুণ্ডের জলের মতন সাফ-সুরত্‌ মানুষ। একটু কথার কারচুপি নেই। যজমানকে ধন্দ ধরানো নেই। তুমি নাহয় এসব নিয়ম-কানুন জানো না, মশাই ভোলে কেমন করে। যে কাজের যা।

আমারও কোথাও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে ঠাকুরের পদধূলি নিই।

'জয়স্তু, জয়স্তু বাবা, আমি চলি।'

সত্যি সত্যি মশাই চলে যায়। আমি চেয়ে দেখি। হয়তো আমার মুখে হাসি লেগে আছে। মনে মনে অবাকও মানি। কিন্তু বিদ্রূপের বাঁকাচোরা খোঁচা কোথাও লাগে না আমার। একটু যদি বা করুণ লাগে, তবু কেমন একটা খুশির ছটা ঝলকে ওঠে। মানুষটি যেন হঠাৎ অনেক চেনা, সহৃদয় সরল হয়ে ওঠে আমার কাছে। মানুষ যে কী বিচিত্র!

কিন্তু গোপীদাস গেল কোথায়! আবার চত্বরে ফিরে আসি। দেখি চত্বরের জলাশয়ের ধারে সিঁড়িতে বসে গুনগুন করছে। আমাকে দেখে কাছে উঠে এসে জিজ্ঞেস করে, 'পূজা দিয়েছ তো বাবাজী?'

'ঠাকুর যা বলেছে, তাই করেছি।'

গোপীদাস আমার চোখের দিকে চায়, মিটিমিটি হাসে। আবার জিজ্ঞেস করে, 'পাওনাগণ্ডা মিটল?'

'তাও মিটেছে। লোকটাকে বড় ভালো লাগল।'

গোপীদাস হেসে চোখ ঘোরায়। বলে, 'তা না হলো কি বাবাজীর চখেমুখে

এত ঝিলিক মারে। তুমি সত্যি বাবাজী চিতে বাঘ। তোমাকে চেনা মুশকিল আছে।'

আমি বলি, 'কেন?'

গোপীদাস কেশো গলায় বিটলে হাসিতে কাঁপে। তার হাসি শুনে আমারও যেন হাসি পায়। সে আমার গায়ে হাত দিয়ে বলে, 'ভালো বাবাজী, খুব ভালো। এমনটি তো চাই গ। গুরু তোমাকে কিরপা করুন।'

গোপীদাস এ মন্দির, সে মন্দিরের মাঝখান দিয়ে ঝোপ-লতাপাতা সরিয়ে কোথায় যে নিয়ে চলে বুঝতে পারি না। জিজ্ঞেস করি, 'কোথায় চলেছি?'

গোপীদাস বলে, 'একেবারে চিড়ে-মুড়কি খেয়্যা থাইকবে? তাই দেখি, একটুক ব্যবস্থা কিছু হয় কী না।'

এই শত শত মন্দির আস্ত ভাঙা পোড়ো, হেথায় জঙ্গল, হোথায় পাথর বিছানো বক্রেশ্বরের খোয়াই, এর মাঝখানে কোথায় ব্যবস্থা দেখতে চলেছে সে? পুজারী পুরোহিতের গ্রাম তো এদিকে না। বরং উলটো দিকে। দু-একটি কঞ্চির বেড়ার সীমায় যে কাঁচা বেড়ার ঘর দেখা যায়, সে সবই বন্ধ। এই রুক্ষ খোয়াইয়ের মন্দির ছড়ানো সীমায় কোথায় কী ব্যবস্থা দেখবে সে? জিজ্ঞেস করি, 'আপনার চেনাশোনা কেউ আছে নাকি?'

গোপীদাস বলে, 'না থাইকলে অচিনার কাছেই যাবো। যদি কুথাও একটুক অন্ন ফুটিয়ে লিবার ব্যাওস্থা করা যায়, সিটো দেইখছি। তবে কিনা, একটুক দেরী হইয়ে যাবে, বাবাজীর কষ্ট লাইগবে, না কি বাবাজী?'

তেমন একটা ক্ষুধার তাড়না বোধ করছি না। তেমন স্থানে পরিবেশে একটু যদি অন্নের সংস্থান হয়, মন্দ কী। পরে আবার কোথায় জুটবে না জুটবে, কে জানে। তার চেয়ে একটু সময় কাটিয়ে কষ্ট করে এখানেই যদি মিলে যায়, সে-ই ভালো। বলি, 'কষ্ট আবার কিসের! জুটলেই হলো।'

'জয় গুরু। তাই চলো, দেখি যেইয়ে। তবে ভাত ফোটার আগে দু-চার মুঠ চিড়ে-মুড়ি জুইটে যাবে।'

এই বলতে বলতেই কঞ্চির বেড়া ঘেরা একটি কুঁড়ের সামনে গোপীদাস দাঁড়ায়। ঘরের দাওয়া বাইরের দিকে, সেখানে কোনো বেড়া নেই। মাথায় খড়েরই চাল। কিন্তু অনেক কাল ভালো করে ছাওয়া হয়নি মনে হয়। তবে মাটির দাওয়া আর সিঁড়ি নিকনো, পরিষ্কার।

বাঁ দিকের ছেঁচাবেড়া একটু এগিয়ে এসেছে। সেদিকে নজর পড়তে একটু চমক লাগে। দেখি, আলকাতরা দিয়ে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা রয়েছে—'ব্রহ্মানন্দ অবধূত। বক্রেশ্বর।' অতএব কুটিরবাসীর নামেই পরিচয়।

গোপীদাস ডাক দেয়, 'কই গ, ঘরে মানুষ নাই ক্যানে?'

দাওয়ায় উঠে ঘরের যে দরজা রয়েছে সেটা বন্ধ। কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। গোপীদাস আবার ডাকে, 'অবধূত বাবাজী আছ ক্যানে গ, না কী?'

অবধূত বটে, আবার বাবাজীও! কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ নেই। কুঁড়ে যেমন চুপচাপ, তেমনিই থাকে। গোপীদাস গলা চড়িয়ে যেন নিজের মনেই বলে, 'কোনো সাড়াশব্দ নাই, সব গেইলছে কুথা?'

বলতে বলতে একবার আমার দিকে চায়। আবার বলে, 'ঠাকরুনও নাই মনে হইলছে।' বলে নিচু হয়ে দরজার মাথায় লক্ষ্য করে আবার বলে, 'না, বাইরে থেক্যা তো শিকল টানা নাই। মনে হইলছে ভিতর থেক্যা বন্ধ।'

এবার সে দাওয়ার ওপর ওঠে। আবার ডাকবার আগেই শব্দ করে দরজা খুলে যায়। আমি বাইরের থেকে পুরোপুরি না দেখতে পেলেও সরু লাল পাড়ওয়ালা

একটা আধ-ময়লা গেরুয়া শাড়ির অংশ দেখতে পাই। যার পরিধানে সেই কাপড়, তার কোমর অবধি চোখে পড়ে। বাকী খড়ের চালে ঢাকা। তারপরেই একটু যেন ভারী ভারী বামা গলা কানে আসে, 'অ মা, তুমি? আমি ভাবি, কে না কে। এইস, ঘরে এইস।'

দরজাটা সবটুকু খুলে যায়। গোপীদাস বলে, 'আইসব বইকি দিদি। ভৈরব কুথা?'

জবাব শোনা যায়, 'সি দাদা অনেক কথা, পরে হবে। ঘরে এইস। রাধাদিদিকে লিয়ে এইসেছ নাকি?'

'না, রাধাদিদি আসে নাই। তবে একজনকে লিয়ে এইসেছি।'

'অ মা, ডাইকবে তো, কুথা, কে বটে?'

গোপীদাস দাওয়া থেকে নীচু হয়ে আমার দিকে চেয়ে ডাকে, 'এইস বাবাজী।'

তা যাবো, তবু নতুনের আড়ষ্টতা যায় না। নতুনের কৌতূহল যেমন থাকে, তেমনি আড়ষ্টতাও থাকে। গোপীদাস আবার কোথায় নিয়ে তুলছে, কে জানে। অবধূতের সঙ্গে বাউলের কী সম্পর্ক থাকতে পারে, জানি না। ধর্ম ও সাধনমতে তারা এক কিনা, তাও জানি না। এইটুকু বুঝতে পারছি, একেবারে অচেনা কোনো জায়গায় এনে তোলেনি। গোপীদাসের সঙ্গে বেশ আঁতের কারবার আছে। নইলে ডেকে ঘরে নিতো না।

ইতিমধ্যে দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়ায় গোপীদাসের ঠাকরুন। আমি এক পলকে দেখি। লালপাড় গেরুয়া শাড়ির অংশ দেখে বিন্দুর কথা মনে পড়েছিল। কিন্তু ঠাকরুন বেবাক উলটো। এর রঙটি কটা, ফর্সা বলা চলে। রাঢ়ের কাঠের পুতুলের মতো একটু খাটো কিন্তু বাঁধুনিতে আঁটোসাঁটো। কাঠ-খোদাইয়ের মতোই যেমন শরীর উদ্ধত, তেমনি সটান। শরীর দেখে মনে হয় কুমারী বা। তবে মুখের গোল ছাঁদে কেমন করে যেন একটু বয়সের ছাপ পড়েছে। সেটা চোখের কোলের কালির জন্য হতে পারে। মুখে যেন কিসের দাগও আছে। মেছেতা না ছুলি, কে জানে। তবে শরীরে ষোড়শী, মুখেতে ত্রিংশ। এটুকু জীবনযাপনের ছাপ হতেও পারে। নাক চোখ মুখও মন্দ না, কাটা কাটা ভাবের। মাথায় ঘোমটা নেই, চুল খোলা। গায়েতে জামা নেই, তবে নীচে অন্তর্বাস।

চোখ একটু আরক্ত। হয়তো নিদ্রা যাচ্ছিল। তাই কোলে কালি থাকলেও চোখ দুটি যেন ভেসে উঠেছে। কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। নজর সোজাসুজি। আমার দিকে কয়েক পলক দেখে গোপীদাসের দিকে ফিরে চায়।

গোপীদাস বলে, 'আমাদিগের চিতেবাবাজী।'

ততক্ষণে আমি দাওয়ার সিঁড়িতে পা দিই। ঠাকরুন একটু হাসে। জিজ্ঞেস করে, 'কুথা থেক্যা আমদানি কইরলে?'

'আমদানি করি নাই গ ঠাকরুন, লিজে থেক্যাই ভেইসে আইসছে।'

'তাই বুঝি?'

'হুঁ গ, বোলপুরের পোষ মেলাতে দেখা। সিখ্যান থেক্যাই এক সাথে।'

'তা, চিতেবাবাজী ক্যানে?'

'সি কথাটো তোমাকে বইলতে লাইগবে? চখের দিকে চেয়্যা দেখ ক্যানে?'

যেন দেখতে হলে মুখে আঁচল চাপতে হয়। সেইরকম মুখে আঁচল চেপে ঠাকরুন আমাকে দেখে। কী ব্যাজ বলো! এ কী পরীক্ষা নেওয়া নাকি! দেখি, ঠাকরুনের সুঠাম অঙ্গে একটু তরঙ্গ লাগে। বলে, 'হুঁ, মিছা না।'

তারপরে হুস করে নিশ্বাস ফেলে বলে, 'রক্তের আশ মিটে না।'

বলেই আমার দিকে চেয়ে ডাকে, 'এইস বাবাজী, ঘরকে এইস।'

ঠাকরুন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। নিশ্বাসের হাওয়াটাও ভালো না। আমি গোপীদাসের পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকি।

আমাদের পিছু পিছুই ঠাকরুন ঢোকে। অন্ধকার ঘরে কিছুই দেখতে পাই না। ঠাকরুন নিজেই সেই অন্ধকার ঘোচায়। আর একটি ছোট দরজা সে অন্য দিকে খুলে দেয়। ঘরে আলো ঢোকে।

নতুন দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি, এক পাশে একটি লাউয়ের মাচা। সবুজ কচি লাউডগা মাচার আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। ফুল ধরেছে অনেক। ফল আসেনি এখনো। এ ফুলের সঙ্গে ও ফুলের রেণুতে রেণুতে মাখামাখি করবে, সেই দূত মৌমাছি এখনো তার কাজ করেনি। আর এক পাশে গুটি কয় গাঁদাফুলের গাছ। তাতে ফুল ধরেছে। একটি ঝাড়ালো জবাফুলের গাছ। তাতে গুটি কয় পাঁচ-পাপড়ি ফুল ধরে আছে।

এদিকেও কঞ্চির বেড়ার সীমানা রয়েছে। বাইরে এলোমেলো কয়েকটি মন্দির দেখা যায়। কোনো মন্দিরের পলেস্তারা খসেছে। কোনোটার গায়ে বড় ফাটল। কোনোটার বা অর্ধেক ধসে স্তূপীকৃত জমে আছে মন্দিরের পায়ে। বাবলার ঝাড়ের গায়ে, বনশিউলির বনের গায়ে নানা লতাগুল্মের জট পাকানো। দু'-একটি বড় গাছ। তারপরে উঁচু-নিচু পাথরমাটির ঢেউ-বিস্তৃতি। সেই বিস্তৃতিতে ছোট ছোট শিব-মন্দির ছড়ানো।

'বইস ভাই বাবাজী।'

ঠাকরুনের গলা শুনে ঘরে দৃষ্টি ফেরাই। এক পাশে একটি ছেঁড়া মাদুর পেতে দিয়েছে। তার দরকার ছিল না। মাটির মেঝে অনেক ভালো।

গোপীদাস বলে, 'হঁ, বইস ক্যানে বাবাজী।'

অগত্যা। অতিথির একটা মান আছে তো। কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে মাদুরেই বসি। তখনই নজর পড়ে, ঘরটা চৌকো না। এক দিকে বড়। বাইরে থেকে যেদিকে ঘরের ছেঁচাবেড়া এগিয়ে গিয়েছে। আলকাতরা দিয়ে আশ্রমবাসীর নাম যে বেড়াতে লেখা আছে। ঘরের ভিতর সেদিকটাতেই দেখি, মাটির মেঝেতে একটি সিঁদুরমাখা ত্রিশূল পোঁতা রয়েছে। ত্রিশূলের গায়ে একটি জবাফুলের মালা চড়ানো। পিছনের বেড়া ঘেঁষে একটা কাঠের পাটাতনে দড়ি বেঁধে তাক করা। তার ওপরে একটি নরমুণ্ডের কঙ্কাল। সেই কঙ্কালের কপালেও সিঁদুর মাখানো। তাকের দু' পাশে বেড়ার গায়ে সিঁদুরগোলা দিয়ে স্বস্তিকাচিহ্ন আঁকা।

আমি যখন এসব দেখি, তখন ঠাকরুনের গলা শুনি, 'কই গ গোপীদাসদাদা, দাঁড়িয়ে ক্যানে, বইস।'

গোপীদাস বলে, 'বইসব তো। কিন্তুক ব্যাপারটা কী, বুইঝতে লাইরছি। অবধূত বাবাজী কুথা, তুমি ক্যানে একলা ঘরে?'

ঠাকরুন হাসে। হাসতে গিয়ে গায়ের আঁচল বিস্রস্ত হয়। সে টেনে দেয়। তার মধ্যেই দেখতে পাই, একটি রুদ্রাক্ষের মালা গলায় রয়েছে। চোখ ঘুরিয়ে বলে, 'ভয় নাই গ, অবধূত এখনো আমাকে ত্যাগ করে নাই। এলেকাটার পোড়োয় যেলেই তাকে দেইখতে পাবে।'

গোপীদাস অবাক হয়ে বলে, 'এলেকাটার পোড়োয়? তাকে তো দেইখলাম কুণ্ডের ধারে জংগলে বইসে রইয়েছে।'

'কিছু বলে নাই?'

'হঁ, তুমাদিগের কথা জিগেঁসা কইরতে খালি বইললে, উয়াদের কথা জানি না, আমাকে কিছু জিগেঁসা করো না। একটুকু যেন গোঁসা গোঁসা ভাব।'

ঠাকরুন আবার হাসে। বলে, 'তা বেচারির গোঁসা ক্যানে হবে না বলো। তার ঘরখানি যদি তুমি দখল কইরে বইসে থাকো, ঘর থেক্যা তাড়িয়ে দাও, তবে? গোঁসা হবে নাই নাকি?'

'এলেকাটাকে তার ঘর থেক্যা খেদিয়ে দিয়েছে?'

'হুঁ গ।'

'ক্যানে, বিত্তান্ত কী?'

ঠাকরুন হাসতে হাসতে বলে, 'এলেকাটার ঘরকে যে এক ভৈরবী এইসেছে! তা উয়াকে যেইয়ে তোমার অবধূত বাবাজী সাধন-ভজন বুঝালছে, বুইঝলে তো? এলেকাটা তো উসব বুঝে না, তাই উয়াকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

গোপীদাসের চোখ ঠায় ঠাকরুনের ওপর। দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা আর অনুসন্ধিৎসা। আমারও একটু চমক লাগে। ব্যাপার যেন কেমন কেমন। অবধূতানী যত সহজে ভাষে, ব্যাপার তেমন সহজ মনে হয় না। কোথায় একটু ঘোরপ্যাঁচ আছে। এলেকাটার ঘরে এক ভৈরবী এসেছে, তাকে গিয়ে অবধূত সাধন-ভজন বোঝাচেছ। আর এলেকাটা ঘর থেকে বিতাড়িত। এদিকে ঠাকরুন অবধূতাশ্রয় একলা আগলাচেছ। কেমন যেন ধন্দ-সন্দ'র গন্ধ লাগে।

গোপীদাস জিজ্ঞেস করে, 'কবে থেক্যা?'

ঠাকরুন বলে, 'দু'দিন থেক্যা।'

'তা ই ঘরে না বইসে এলেকাটার ঘরে যে?'

'এলেকাটার ঘরেই যে ভৈরবী ঠাঁই লিয়েছে। তা তুমি বইস ক্যানে।'

'বইসব তো, কিন্তুক—'

'আবার কিন্তুক কী। আমি আছি তো, না কী?'

তা আছ। ভাইবলাম কি যে, চিতেবাবাজীকে লিয়ে তুমাদিগের কাছেই আসি, ইখানেই দুটো অন্ন জুইটবে। তুমাদিগের খাওয়া লেওয়া যদি হইয়ে যায় তো, আবার দুটো ফুটিয়ে লেওয়া যাবে।'

ঠাকরুন এবার একটু অবাক মুখে চমকায়। বলে, 'অই যা, বইলতে লাগে! কী লোক গ তুমি গোপীদাদা! এখুনি কাঠ জ্বাইলছি, হাঁড়ি চড়ালছি, ইতে ভাবনা কী।'

গোপীদাস জিজ্ঞেস করে, 'তোমার খাওয়া হইয়েছে?'

ঠাকরুন ঠোঁট উল্টে বলে, 'না, আমার শরীল ভালো নাই। চুলায় আগুন-মাগুন কিছু দিই নাই। শুয়েই ছিলাম, তুমি ডাইকলে তাই উঠলাম।'

এখন বুঝে দেখ, শরীর খারাপ, না মন খারাপ। প্রথমেই মনে হয়েছিল, নিশ্বাসের হাওয়াটা ভালো না। অবধূতানির চোখের কোলে কালি কি আর এমনি পড়েছে? মুখের শীর্ণতা কি অকারণ? আসলে এদিকে উপবাস। ওদিকে মনোকষ্ট। নিজের আশ্রম ছেড়ে সাধক যাবে অন্য আশ্রমে, অন্য ভৈরবীকে সাধন-ভজন বোঝাবে, এতে কি আর খেতে বসতে ইচ্ছা করে! তার চেয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকতেই ভালো লাগে।

এমন ঘটনার মাঝখানে আমরা দুই অনাহূত অতিথি। আমি বিব্রত বোধ করি। বলি, 'রান্নাবান্নার পাট থাক না। আমরা না হয়—।'

কথা শেষ করতে পারি না। ঠাকরুন বাগানের দিকের দরজার দিকে এগুতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। আমার দিকে চেয়ে বলে, 'ক্যানে গ বাবাজী। ইখানে কি রান্না-খাওয়া হয় না?'

আমি বলি, 'তা হয়। কিন্তু আপনার শরীর খারাপ।'

'অই মা গ!'

ঠাকরুনের ঘাড়ে একটা চকিত দোলা লাগে। রুদ্রাক্ষের মালাটি কণ্ঠার কাছে

এলিয়ে আসে। বলে, 'মরে তো যাই নাই। ই শরীল খারাপে দুটো চাল ফুটাতে মরে যাবো না। কানে যখন শুইনেছি, তখন যেতে লাইরবে বাবাজী। তবে—।'

কথা থামিয়ে সে গোপীদাসের দিকে তাকায়। একবার একটু ঠোঁট টিপে হাসে। বলে, 'তোমার কাছে আর কী লজ্জা কইরব। তুমাদিগের অবধূতের ঘরকে চাল বাড়ন্ত গ গোপীদাদা। গাঁয়ে যেইয়ে লিয়ে আইসতে হবে।'

গোপীদাস তৎক্ষণাৎ আওয়াজ করে ওঠে, 'অই অই, জয় গুরু। ই আবার কোনো কথা নাকি। কী কী আইনতে হবে, তুমি বলো, লিয়ে আইসছি।'

'আর কিছু না। চাল আর ছটাকখানি সর্ষের তেল লিয়ে এইস। উতেই হবে। আর সবই আছে।'

বলতে বলতে সে বাগানের দিকের দরজা দিয়ে বাইরে যায়। বাইরে বেড়ার গায়েই বোধ হয় কোথাও দড়িতে বাঁধা তেলের শিশি ঝোলানো ছিল। সেটা এনে দেয়। আর একখণ্ড পুরনো গেরুয়া কাপড়ের টুকরো। চাল আনবার জন্য।

আমিও তাড়াতাড়ি উঠি। ঠাকরুন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, 'কুথা যাচ্ছ বাবাজী?'

বলি, 'আমিও সঙ্গে যাই।'

ঠাকরুনের অমনি চোখের তারা ঘুরে যায়। বলে, 'ক্যানে, আমার কাছকে একলা থাইকতে ভয় লাইগছে? তুকতাক বশীকরণ কইরব, তার ভয়?'

'না, না...।'

তার আগেই ঠাকরুন নিঃশব্দে হেসে কাঁপে। গোপীদাস বলে, 'যেতে হবে না বাবাজী, তুমি বইস। যা দেবার, আমাকে দাও, তা হলেই হলো।'

বলে মিটি মিটি হাসে। গোপীদাস আমাকে এখন বুঝতে পারে না শুধু। সহজে কথা বলতেও পারে। বক্রেশ্বরে সে আমার সঙ্গে এসেছে। সে চাল তেল কিনতে যাবে, আমি চুপ করে থাকি কেমন করে। তা-ই সঙ্গে যেতে চাওয়া। আমি তাকে পয়সা বের করে দিই। তার মধ্যেই সে ঠাকরুনকে বলে, 'ইখানকার পাণ্ডাঠাকুর বাবাজীকে পেসাদ খাওয়াবে বইলে ঘরে লিয়ে যেতে চেইয়েছিল। আমি যেতে দিই নাই।'

ঠাকরুন বলে, 'বেশ কইরেছ। একা একা আর ভালো লাইগছিল না। তবু একটু কথা বইলবার লোক পাওয়া গেল।'

এবার গোপীদাসের একটা নিশ্বাস পড়ে। বলে, 'তা এলেকাটার ঘরে ভৈরবী, ই তো লতুন কথা শুনালে গ যোগো দিদি।'

এতক্ষণে তবু একটা নাম শোনা গেল ঠাকরুনের। যোগো কিসের আগে কে জানে। মায়া না বালা, বুঝি না। তবে যেরকম সিঁদুরের ত্রিশূল গাঁথা দেখি, সিঁদুর মাখা নরমুণ্ডের কঙ্কাল, তাতে বা যোগমায়া-ই হবে। ভৈরবী শক্তির সঙ্গে মায়ার যোগই বেশী। বালাও হতে পারে। শুনেছি, জ্যোৎমার্গী দশনামী সন্ন্যাসীদের বিশেষ অনুষ্ঠানে বালা নামে সুন্দরীর আবির্ভাব হয়। চৈত্রের শুক্লা নবমী রাত্রে তার ব্রত পালন করে তারা।

সে ব্রত অতি গুহ্য। সে গুহ্য গূঢ় কথা যথাতথা কহনে না যায়। তবে মদ্য মাংস রমণী সেই ব্রতের অবিশ্যি উপকরণ। আচরণ মরণ তথা উজান সাধন।

যোগো বলে, 'আহ্, সে কি আর এলেকাটার ঘরকে এইসেছে? সে এইসেছিল বক্রেশ্বরে, তীত্থি কইরতে, সাধন-ভজন সাইধবে বলে। এলেকাটা নিজের ঘরকে লিয়ে গেলছে উয়াকে।'

গোপীদাস বলে, 'অই! তা বটে। এলেকাটাকে দেইখছি তোমার ভক্ত, তোমার কাছটিতে বইসে থাইকতে পাইরলে আর কিছু চায় না।'

যোগো ঘাড় বাঁকিয়ে ঝামটা দেয়, 'মরণ! তুমি যাও, আর দেরি ক'রো না। আমাদিগের কথা আলাদা, তোমার চিতেবাবাজী কতক্ষণ খিদে লিয়ে বইসে থাইকবে?'

'হুঁ হুঁ। তবে, বাবাজীকে সহজ পাত্তর ভেইব না। লইলে আর আমাদিগের সঙ্গ করে?' বলে দরজার কাছে গিয়ে গোপীদাস আবার জিজ্ঞেস করে, 'দিদি, অবধূতের সপ্তমী কিঞ্চিৎ ঘরে আছে?'

যোগো বলে, 'তা আছে। ঘুরে এইস, তা'পরে দম দিও।'

'জয় গুরু।'

গোপীদাস বেরিয়ে যায়। কিন্তু সপ্তমী কী, তার সঙ্গে দমের সম্পর্কই বা কী, বুঝতে পারি না। অথচ শোনা শোনা লাগে। তা-ই যোগোর দিকেই জিজ্ঞাসু চোখে একটু চেয়ে থাকি। যোগো ফিরতে গিয়েও আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

জিজ্ঞেস করি, 'সপ্তমীটা কী? শোনা শোনা লাগছে যেন।'

যোগো ঘাড় কাত করে ভুরু কুঁচকে চায়। তার এ রকম ভাবভঙ্গি দেখলে কেমন যেন একটু ভয় ভয়ই লাগে। বিন্দুর মধ্যে যেমন একটু সখী ভাবের তরঙ্গ খেলে, এর তা নয়। এর সবই যেন একটু চোখা চোখা। আরক্ত চোখের দৃষ্টি যেন দপদপে, পাকানো পাকানো। বলে, 'শোনা শোনা লাইগছে? ক্যানে হে, সাধুসন্নেসীদের সাথে কখনো ঘুর‍্যা বেড়াল্‌ছ নাকি?'

অবাক হয়ে বলি, 'না তো।'

'তবে? তবে আর সপ্তমী কাকে বলে, সি তো সবাই জানে। তিথিকে বলে, ক্যানে কী না? তুমি কি আর কিছু জানো?'

বলেও আমার চোখের দিকে চেয়ে ঠোঁট দুটিতে হাসি হাসি ভাব করে। এলিয়ে পড়া চুল গালের কাছে। রুদ্রাক্ষের মালাটা সাপের মতো কণ্ঠার কাছ থেকে বুকের কাপড়ে ঢাকা পড়েছে।

কিন্তু শুধু তিথির কথা এখানে হয়নি, তা বুঝতে পারি। নিজের স্মৃতিশক্তিকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করে।

যোগো আবার জিজ্ঞেস করে, 'আর কিছু শুইনেছ বুঝিন?'

'তাই তো মনে হয়।'

'তা হলে এই শুইনেছ কী?'

বলে সে দু' হাতে কল্‌কে ধরার মতো ঠোঁট ছুঁচালো করে টেনে দেখায়। তখনই আমার মনে পড়ে যায়, গাঁজার কথা। সাধুদের কাছে, বিশেষ কুলাচারীদের কাছে, গাঁজার ছদ্মনাম সপ্তমী। সাধারণের দুর্বোধ্য। শুনেছিলাম প্রয়াগের কুম্ভমেলায় সাধুদের কাছে। বলে উঠি, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এ কথাই শুনেছিলাম সাধুর কাছে।'

যোগো হঠাৎ হাঁটু মুড়ে, পিছনে পা দিয়ে, ধপাস করে বসে আমার সামনা-সামনি। বলে, 'দেখি, কাজে কম্মে হাত দেবার আগে, তোমার কথাবার্তা একটুক জেইনে লিই। সাধুসঙ্গ কইরেছ বুঝিন? দেইখে তো মনে লেয় না'

তাড়াতাড়ি বলি, 'না না, ওসবের মধ্যে নেই। চলতে ফিরতে যেটুকু দেখি শুনি, তার বেশী নয়।'

যোগো বলে, 'বটে? তা তুমাদিগের মতন মানুষ হিল্লি দিল্লি বেড়ায়। শ্মশানে মশানে ক'জনা বেড়াতে যায়? ক'জনই বা গোপীদাসের সাথে ঘোরে?'

আমি বলি, 'ওই দু'-একদিন একটু ভালো লাগছে, তাই।'

যোগো খানিকক্ষণ কথা বলে না। চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে থাকে। এ আবার কেমন দেখা! দপদপে চোখে এমন করে চেয়ে থাকলে অস্বস্তি লাগে। সত্যি সত্যি তুকতাক মন্ত্রে মায়ায়, সম্মোহনে ভেড়া বানাবে নাকি হে!

যোগো বসবার পরে তার সারা গায়ে মাথায় ভালো করে আলো পড়ে। এখন দেখি তার সিঁথিতে সিঁদুরের দাগ। কপালের সিঁদুরটিপ হাল্কা হয়ে গিয়েছে। একটু পরে জিজ্ঞেস করে, 'চিতেবাবাজী নামই তো খালি শুইনলাম। আসল নামটি কী?'

ভারী ভারী গলার এই জেরার সামনে চুপ করে থাকা যেন কঠিন। তাই আসল নামটি বলি। তারপরেও যোগোর নানা প্রশ্ন। ঘর বাড়ি কোথায়, ঘরে কে কে আছে, কী কাজ করি? যত দূর সম্ভব জবাব দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করি।

সব কথা শোনার পরে যোগো আমার চোখের দিকে চেয়ে একটু একটু ঘাড় নাড়ে। বার দুয়েক হুঁ দেয় নিজের মনে। তারপরে বলে, 'তবে গোপীদাদা ধইরেছে ঠিক, চিতে তুমি বটে।'

নিজের প্রসঙ্গ পাড়তে ইচ্ছা করে না। তবু জিজ্ঞেস করি, 'কেন?'

'চিতার মতন এক লজর। লজর লাইগল তো আর ইদিক উদিক নাই।'

'সেটা কীরকম?'

'যিদিকে মন, সিদিকেই ধ্যান। কোনো লড়চড় নাই।'

বুঝতে পারি না। তাই চুপ করেই থাকি।

যোগো শরীরে একটা বাঁক দেয়, যেন আড়মোড়া ভাঙতে চায়। কিন্তু বাঁকে থেকেই বলে, 'বুইঝতে লাইরলে? বইলছি নিজে মজো আর মজিয়ে ছাড়।'

সে আবার কেমন কথা? জিজ্ঞেস করি, 'কী মজানো?'

'মন।'

'কার?'

যোগো রুদ্রাক্ষের মালাটা আঁচলের আড়াল থেকে টেনে বের করতে করতে একটু হেসে দোলে। বলে, 'কেবল বিটি-ঝিদের লয় গ, বিটাছেল্যাদেরও বটে। তোমার চখে মুখে তা আছে। আর উতে তোমার জায়গা, অজায়গা নাই, যখন যিখানে হক। তবে—'

তার চোখ দু'টি যেন নতুন করে ঝিলিক দেয়। হঠাৎ থেমে জিজ্ঞেস করে, 'কী খুঁইজে বেড়াল্‌ছ, বলো তো?'

একটু অবাক হই। কেমন যেন থতমত খাই। অথচ তার কোনো কারণ নেই। তবু যোগোর জিজ্ঞাসাটা তার দৃষ্টির মতোই, কোথায় যেন বিঁধে যায়। বলি, 'জানি না তো।'

'তবে?'

'এমনি একটু ঘুরে বেড়াই।'

যোগোর শরীর কাঁপে। সে নিঃশব্দে হাসে। চোখ যেন আরো লাল হয়ে ওঠে তার। তারপরেই উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, 'বেড়াও। অনেক বেড়াতে হবে।'

যেন তার ঠোঁট বেঁকে যায় বিদ্রূপে। কিন্তু চোখের তারায় তা দেখতে পাই না। অন্যদিকে চেয়ে সে যেন নিজের মনেই বলে, 'তাই তো হয়। অনেক মার খেতে হয়, অনেক মাইরতে হয়, তবু আসল মরা হয় না, মারাও হয় না। ঘাটে ঘাটে জল খেইয়ে ঘুইরতে হয়। বিষ পচা পাতকো, যা ওঠে মুখে, তাই গিলতে হয়, তা'পরে আবার ঘোরা।'

বলে সে ঘাড়ের ঝটকায় গালের চুল সরায়। তার কাঠখোদাই শরীরে আঁচলটা একটু টেনে দেয়। তারপরে বাগানের দিকে বাইরে যেতে যেতে বলে, 'বইস, জলটল আছে কিনা দেইখে আসি।'

যোগো চলে যায় বাইরে। কিন্তু আমার ভিতরে যেন সকলই নির্বাক হয়ে যায়।

আমার দেহের স্পন্দনও যেন স্তব্ধ। যোগোর কথাগুলো যেন আমার সকল নির্বাক নৈঃশব্দ্যের মধ্যে একটা স্পষ্ট ঝিকিমিকির মতো চিকচিক করছে কেবল। আমি যে তার সব কথা বুঝেছি, তা মনে করি না। কিন্তু বোঝা না-বোঝার মাঝখানে কোনো এক দূরের দিগন্তে সে যেন আমার সকল চেতনাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিল। যেখানে আমি এক অসহায় কষ্টে যেন দাঁড়িয়ে থাকি।

এই অবস্থায় আমার চোখ পড়ে তেল-সিঁদুরমাখা ত্রিশূলের দিকে। সহসা ত্রিশূলটাকে কেমন এক প্রতিমার মুখের মতো মনে হয় আমার। যেন দু' পাশের দুই ঊর্ধ্বগামী বক্রগতি মুখেরই আদলে উঠেছে। তারপর দুই ভুরুর মতো দু' পাশে বেঁকে গিয়েছে। মাঝখানের ঋজু রেখায় যেখানে সিঁদুর মাখানো সেখানে মুখ, তার ওপরে থাক; তারও ওপরে তৃতীয় চোখের ঝলক।

একই সঙ্গে, একটু ওপরে, নরমুণ্ডের কঙ্কালের দিকে চেয়ে মনে হয় বিকট হাঁ-মুখে দন্তব্যাদান। চোখের কালো ছিদ্রে যেন পলক দৃষ্টি আমার দিকে। তার কপালে করোটিতে মাখানো সিঁদুরের ঝলকেও যেন দৃষ্টি রয়েছে।

কেন এমন মনে হয় জানি না। হয়তো মুহূর্তে এক চিত্রের কল্পনাতেই এমন মনে হয়। সেই সঙ্গে যোগোর বলে যাওয়া কথাগুলো আমার চেতনার গভীরে তেমনি এক অসহায় কষ্টে আমাকে স্তব্ধ করে রাখে।

কতটুকু সময় কাটে জানি না। আস্তে আস্তে আমি আবার বক্রেশ্বরের এই কুটিরে ফিরে আসি। আমার কানে এখন শুধু একটি কথাই বাজে, 'অনেক বেড়াতে হবে।'...এখন ক্রমে অবাক হই। ভাবি একথা আমাকে বলে যায়, বক্রেশ্বরের এক কুটিরবাসিনী ভৈরবী। যার শিক্ষা দীক্ষা অভিজ্ঞতা, কোনো কিছুর ওপরেই আমার কোনো আস্থা থাকার কথা না। আমি সমাজের পরিবেশের যে সীমানা থেকে এসেছি, সেখানে এ আস্থা থাকবার কথাও না।

তবু যেন ক্রমেই বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। যেন এক দৈববাণী শুনেছি, 'অনেক বেড়াতে হবে।' কিন্তু সে কথা এমনি এক নারীর মুখে।—এইটুকু বিস্ময়। বিস্ময়ের মধ্যে যেন এক চকিত খুশির ঝিলিক লেগে যায়। তাতে এক ভিন্ন বিচিত্র সুর বেজে ওঠে। কতই অজানা। তবু একটুকু জেনে মন ভরে যায়। আমার ঘরের কাছে এক বিচিত্র পড়শী, তাদের আমি দেখতে পাই। চিনতে পারি না। কিন্তু সব মিলিয়ে মনে একটা দোলা লেগে যায়।

যেন এই দেখাতে চলতে পারি।

যোগোর খোঁজে বাগানের দিকে দরজায় চোখ তুলতে যাই। এ সময়েই হঠাৎ দেখি ঘরের এক কোণে খাঁচার মতো কী একটা রয়েছে। সেটা আচমকা নড়েচড়ে উঠছে। প্রথম ঘরে ঢুকে একবার চোখে পড়েছিল। ভেবেছিলাম অবধূতের সংসারাশ্রমের জিনিসপত্র কিছু।

হঠাৎ নড়ে উঠতে ভালো করে লক্ষ্য করি। গাছের ডাল কেটে খাঁচা তৈরি। মাথাটা নিশ্চয় ঢাকা। কেননা তার ওপরে দু'টি হাঁড়িও রয়েছে। একটু কোল-আঁধারে বলে ভালো করে দেখতে পাই না কিছু। কিন্তু খাঁচাটা নড়ে উঠল কেন? বাইরে থেকে বেড়ার গায়ে ধাক্কা লেগেছে নাকি?

পরমুহূর্তে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। দেখি খাঁচার ফাঁকে সাপের চেরা জিভ বাইরের দিকে লকলক করছে। খাঁচাটা আর একবার নড়ে ওঠে। সেই সঙ্গে খাঁচার ওপরে হাঁড়ি দুটোও।

চকিতে উঠে দাঁড়াই। আমার সকল চিত্র-কল্পনা, মনের ভাব মুহূর্তে মৃত্যুভয়ে কণ্টকিত! সাপ! খাঁচার মধ্যে সাপ! নাকি বাইরে থেকে সে ঢুকেছে। আমি এখন

স্পষ্ট দেখতে পাই, কাঠের বেড়ার ফাঁকে সাপের একটি চোখ যেন নিষ্পলক আমার দিকে চেয়ে। খাঁচার মধ্যে তার শরীর পাক খাচ্ছে। খাঁচার বাইরে চেরা জিভ ছুঁড়ে ছুঁড়ে শূন্যে লেহন করছে।

ত্রিশূল, কঙ্কাল, সাপ। বাইরে ভাঙা আভাঙা শিবমন্দির। বক্রেশ্বরের খোয়াইয়ের উঁচু নিচু, বনপালা স্তব্ধ প্রকৃতি। কারুর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। কোন্ দরজা দিয়ে বাইরে যাবো, আমি তাই ভাবি। বেরুবার উদ্যোগ করি।

ঠিক এই মুহূর্তেই রাস্তার দিকের দরজায় একজনের আবির্ভাব। হাঁটু অবধি নামানো কাছাহীন ময়লা গেরুয়া কাপড় পরা এক পুরুষ। গোঁফদাড়ি কামানো মাথায় চুলের জটা বিড়ে করে বাঁধা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। দুই ডানায় রুদ্রাক্ষের তাগা।

সে সবে কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু আরক্ত চক্ষু, মাজা মাজা রঙের বুকও আরক্ত যেন। দেহের অবস্থা টলটলায়মান। ঢুকেই দরজা ধরে ঝুঁকে পড়ে তাকিয়েছে আমার দিকে। নেহাইয়ের মতো শক্ত বুক দেখলে মনে হয় আমার মতো একটি জীবকে বুকে চেপেই খতম করতে পারে। বুক কপাল আরক্ত, কপালে সিঁদুর লেপা।

আসছিল বেশ বেগে এবং ঝোঁকেই। আমাকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়েছে। একটু জড়ানো বজ্রস্বরে প্রথম প্রশ্ন, 'কে তুমি?'

'আমি?'

এই পাল্টা প্রশ্ন ছাড়া আর কিছুই উচ্চারণ করতে পারি না। কোন্ গ্রহে ফেলে গেল গোপীদাস, কে জানে। ত্রিশূল কঙ্কাল সাপ, তার সঙ্গে এই মদমত্ত পুরুষ। রসের গন্ধে ঘর ভরে যায় ইতিমধ্যেই।

আরক্ত চক্ষু শিবনেত্র করে সে আমার দিকে দেখতে থাকে। তারপর হঠাৎ আবার হুংকার দিয়ে ওঠে, 'কে বটে, বইলছ না ক্যানে হে, আঁ?'

'ক্যানে, কী দরকার?'

যোগোর গলা তীক্ষ্ণস্বরে বাজে। ফিরে দেখি বাগানের দিকের দরজা দিয়ে সে কখন এসে ঢুকেছে। তার রক্তিম চোখের দপদপানিতে এখন যেন অঙ্গারের আগুন। নাসারন্ধ্র কাঁপে থরথর। তার সারা গায়ে চোখে মুখেই যেন আগুন লেগেছে। যেন ফণা তোলা সাপিনী, দংশনে উদ্যত।

আমি ভাবি, ইনি কি স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ অবধূত!

জটাধারী, গোঁফদাড়িহীন, আরক্তচক্ষু মত্ত পুরুষ যোগোর দিকে তাকায়। তাকায় না তো, যেন আগুনের শলা দিয়ে বেঁধে। রসের ঝোঁকে শরীর একবার টাল খায়। বুকের নেহাই খানিক এগিয়ে আসে। যেন চাপা গলায় গরগরিয়ে ওঠে, 'ক্যানে, জিগেস করতে নাই?'

যোগোর অঙ্গার দৃষ্টি একটুও এদিক-ওদিক হয় না। শুধু তীরের মতো একটি শব্দ বেরোয়, 'না।'

'বট্যে?'

জটাধারীর আরক্ত চোখ একবার পাকিয়ে ওঠে। কপালের রেখা কিলবিল করে। তারপরেই চোখ দু'টি ছোট হয়ে আসে। চোখের কোণ কুঁচকে যায়। মুখ শক্ত ক্রুদ্ধ দেখায়। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'ক্যানে গ মা, নতুন ভৈরব পাকিড়াও কইরেছ নাকি?'

হে বক্রেশ্বর, এ কী সম্বোধন! এ আবার কেমন প্রশ্ন। কিন্তু দেখ রাঢ়ের খোদাই করা দারুমূর্তি হঠাৎ সজীব হয়ে কেমন দুলে ওঠে। চোখের আগুন মুখে জ্বলে। ঠোঁট দু'টি বেঁকে যায় ধনুকের মতো। অথচ ঘাড় বাঁকিয়ে বড় যেন মিষ্টি সুরে, সুর করে বলে, 'হুঁ গ বাবা বেহ্মালন্দ অবধূত, সি খবরটো জানো নাই?'

বলতে বলতে যোগো পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে আমার দিকে। কিন্তু চোখ সরায় না অবধূতের দিক থেকে। বলে, 'তবে ভৈরব লয় গ অবধূত। তোমার মতন মাথা লিয়ে ই লোক তো টপো টপো জপ কইরতে জানে নাই, সাধন-ভজনও শিখে নাই। উতে আমারও ঘেন্না ধরে যেইছে। ইটো আমার লাগর গ, লাগর! দেইখছ না, কেমন চেহারা আর জামাকাপড় এখন আমি উয়ার লাগরী।'

'খপরদার!'

মানুষ তো না, বাঘের গর্জন বাজে। যেন কুটিরও কেঁপে ওঠে। খাঁচার অজগরও গর্জন শুনে জিব গুটিয়ে নেয়। আর আমার কী অবস্থা। কোথা হে বিপদঘ্ন, শ্রীমধুসূদন, গোপীদাস বাউল, তোমার চিতেবাবাজীকে রক্ষা করো এসে। ভৈরব ভৈরবীর পাল্লায় পড়ে বক্রেশ্বরেই বুঝি প্রাণটা যায়।

কিন্তু ওদিকে যেমন বাঘের গর্জন, এদিকে তার কিছুই না। ধনুকের ছিলায় আরো জোর টান। যোগোর ঠোঁটের তীক্ষ্ন বাঁকে নিষ্ঠুর বিদ্রূপের ঝিলিক। ঘাড় আরো কাত হয়ে পড়ে। ভৈরবী যোগিনীর ঘোমটা খসে যায়। বুকের কাপড় আরো নেমে আসে। রক্তিম বক্ষদেশে রুদ্রাক্ষের মালা দোলে। বলে ওঠে, 'আহা হা, অমন চটেন ক্যানে গ, অবধূত! আপনি হল্যোন সাধক পুরুস্, যোগী মানুস্। আমাকে খবরদার কইরছেন ক্যানে গ বেম্মালন্দ। আমি কি আপনার যুগ্যি? আমি এখন লাগরী হইয়েছি। দ্যাখেন ক্যানে, কেমন কাঁচা বয়সের লাগর জুইটেছে আমার। আপনার মতন বুড়ো লাগর আমার আর ভালো লাগে নাই।'

'কী, আমি লাগর? বেম্মানন্দ অবধূত তোর লাগর? আমার আশ্রমে দাঁড়িয়ে এত বড় কথা? তবে র‍্যা মাগী পাপিষ্টি, তোর বুকের রক্ত আজ খাবো।'

হাঁক দিয়েই ব্রহ্মানন্দ অবধূত ছুটে ঘরের এক কোণে যায়। যেদিকে যায় সেদিকেই সেই প্রকান্ড অজগরের খাঁচা।

এদিকে চিতেবাবাজীর প্রাণ খাঁচা-ছাড়া। এ কেমন সাধক সাধিকা, এ তাদের কেমন সম্বোধন হে? তারপরে আরো ভয়ংকর কথা, বুকের রক্ত খাবে বলছে! তীর্থ খোরা, মানুষ দেখার সাধ মিটেছে। আর না। শরীর শক্ত করে দরজার দিকে একবার লক্ষ্য করি। এত সহজে কারুর লাগর হয়ে প্রাণ দিতে পারব না।

ব্রহ্মানন্দ কোণের অন্ধকারে হাতড়ে হঠাৎ একটা ত্রিশূল বের করে। আমার বুকের মধ্যে ধক করে ওঠে, যোগোর দিকে ত্রিশূল তুলে গর্জে ওঠে, 'আজ তোর একদিন আর আমার একদিন। আশ্রমে দাঁড়িয়ে মাগী লাগর লাগরী দেখাল্ছে।'

উদ্যত ত্রিশূল মদমত্ত ক্ষ্যাপা ভৈরবের হাতে। ভৈরবীর বুকে এসে এই বুঝি বেঁধে! কিন্তু যার দিকে উদ্যত, সেই যোগোর যেন ভ্রূক্ষেপও নেই। সে যেন ভারী সন্ত্রস্ত হয়ে বলে ওঠে, 'ইস্ ইস্, একেবারে শিবঠাকুরের মতন দেখাল্ছে গ। দক্ষযজ্ঞ কইরবেন। আহা তা না হবেক ক্যানে, কত বড় সাধক দেইখতে লাইগবে তো? এত এত মদ গাঁজা টাইনতে পারে, কাঁড়ি কাঁড়ি ভৈরবী লিয়ে সাধন-ভজন কইরতে পারে, শিবঠাকুরের থেক্যাও বড়। তা দাঁড়িয়ে ক্যানে, মারেন। মেইরে বুকের রক্ত খান।'

সর্বনাশ! যোগো যেমন করে বুক এগিয়ে দাঁড়ায় তার আঁচলটুকুই না খসে। তার ধনুক ঠোঁটের, অপলক চোখের আগুন দেখে আমারই ভয় করে। ওদিকে ব্রহ্মানন্দের হাতের ত্রিশূল আরো উঁচুতে ওঠে। চিৎকার ওঠে, 'সাবধান, হুঁশিয়ার, তোপা সামাল দে বইলছি। আমার চখের সামনে থেক্যা দূর হ মাগী। কুলটা, ব্যাশ্যা...।'

'সি কী গ অবধূত, আঁ? লাগরী বইলতে রাগ, আশ্রমে দাঁড়িয়ে কুলটা ব্যাশ্যা বইলছ? ধাম্মিক তুমি, পাপ লাইগবে না?'

যোগোর গলা যেন ক্রমেই খাদে নামে, আরো সরু হয়। কিন্তু তীব্রতা তীক্ষ্ন‌তা

বাড়ে।

ব্রহ্মানন্দ হাঁকড়ে ওঠে, 'না, পাপ লাগে না। ব্যাশ্যাকে ব্যাশ্যা বইলছি। তুই কুলটা, তুই ছিনাল...।'

আহ্, আহ্, আর শুনতে পারি না হে। এর চেয়ে একটা হেস্তনেস্ত ভালো। কিন্তু তার কোনো আশা নেই দেখে কোনোরকমে অস্ফুটে উচ্চারণ করি, 'আচ্ছা আমি চলি।'

পা বাড়াবার আগেই যোগো খপ্ করে আমার হাত টেনে ধরে। কিন্তু চোখ আমার দিকে না। জ্বলন্ত দৃষ্টি ব্রহ্মানন্দের দিকেই। কথাও বলে তার সঙ্গেই, 'তাতেই বা আপনার মান যাবেক ক্যানে গ অবধূত। আপনি যে বলেন, ব্যাশ্যা কুলটা ভৈরবী দিয়ে সাধন ভালো হয়? এখন এত গোঁসা ক্যানে?'

'চোপ, চোপ হারামজাদী। যা, দূর হ, দূর হ আমার আশ্রম থেক্যা।'

ত্রিশূলটা কিন্তু নিক্ষিপ্ত হচ্ছে না। বুকের রক্ত খাওয়ার দৃশ্যটাও ঘটছে না। যোগো তেমনি চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ক্যানে গ ভৈরব, লতুন ভৈরবী এন্যে তুইলবে নাকি?'

'হঁ, তা-ই তুইলব। তুই দূর হ।'

'তব্‌বে র‍্যা চিতের মড়া। বড় বাড় হইয়েছে তোমার, আঁ?'

বলেই যোগো আমার হাত ছেড়ে দিয়ে আমাকে বলে, 'বাবাজী, ভয় পেয়ো না, একটুক দাঁড়াও। ই কত্ত বড় অবধূত হইয়েছে আমি একবার দেখ্যা লিই। মরণ তোর মিন্‌সের নিকুচি কইরেছে, আয়, আয় দেখি কেমন শিবঠাকুর হইয়েছিস্।'

বলেই ছুটে গিয়ে ঘরের আর এক কোণ থেকে সে টেনে বের করে লম্বা একটা বর্শা। ফলায় তার জঙ্ ধরেছে বটে, তেমন করে মারলে এফোঁড়-ওফোঁড় করা যায়। সেটা তুলে একেবারে সোজাসুজি ব্রহ্মানন্দের বুকে ঠেকায়। সঙ্গে সঙ্গে অবধূতের ত্রিশূল নামে। শংকিত অথচ ক্রুদ্ধ চিৎকার ওঠে, 'অ্যাই সাবধান, খপরদার বইলছি, অস্তর লিয়ে ছেল্যেখেলা ভালো না।'

'ছেল্যেখেলা, আঁ?'

যোগোর গলা তেমনি নিচু। কিন্তু মুখ ভয়ংকর। দৃষ্টি খুনীর। কী বিপদ। এখন কি এই হত্যা দেখতে হবে? যোগো তেমনি বলে, 'নিজে তিরশূল লিয়ে আমার বুকের রক্ত খেতে আইসছিলে, এখন আমি অস্তর লিয়ে ছেল্যেখেলা কইরছি? তোমার রক্ত দশ্‌শন কইরব আজ।'

অবধূতের আবার সেই চিৎকার, 'সাবধান, বইলছি আর একটুক খোঁচা মাইরলে ঢুক্যে যাবে কিন্তুক।'

'ঢুকুক, ঢোকাব বইলেই ধইরেছি। বাটপাড়, মিথ্যুক, ভণ্ড! জানি না ভাইবছ, না? তোমার কোন্ ছুঁচো চামচিকে যেইয়ে খবর দিয়েছে, ই ঘরকে লোক এইসেছে। তা-ই তুমি ঘর সামলাতে এইসেছ, না?'

'অ্যাই, অ্যাই দ্যাগ্ গ, ভৈরবী...।'

ওই শোনো, এখন আর ক্রোধ নেই ব্রহ্মানন্দের গলায়। উদ্বিগ্ন মিনতি। বুকে ঠেকানো বর্শার ফলাটা এক হাত দিয়ে চেপে ধরে অবধূত। আবার বলে, 'মরণ লিয়ে খেলা করিস না গ। তোল, তুলে লে।'

'ক্যানে, তুইলব ক্যানে? আমি ব্যাশ্যা কুলটা। মাইরবে বল্যে বাবার তিরশূল লিয়েছ, এখন মারো দেখি। এলেকাটার ঘরকে যাকে সাধন-ভজন বুঝালছ আজ দু' রাত ধইরে, সে যোগীর তেজ দেয় নাই, আঁ?'

বাবার ত্রিশূল তো অনেক আগেই নত হয়েছে। অবধূতের তেজ যদি কিছু

থেকেও থাকে তবে আপাতত তা গুপ্ত আছে। প্রকাশের কোনো লক্ষণ দেখি না। প্রথম দর্শনে যেটুকু দেখা গিয়েছিল সেই তুলনায় ক্ষ্যাপা মহাদেব এখন একেবারে বাবা ভোলানাথ। আর চেয়ে দেখ যোগো ভৈরবীকে বর্শা হাতে খোলা-চুল যোগিনী। লাল পাড় গেরুয়ার এক বেড় আঁচল, উদ্ধত বুকের ওপর থেকে অনেকখানি নেমে গিয়েছে। রোষে নিঃশ্বাসে দুলছে। চোখ দপ্‌দপে, মুখ ঝকঝকে।

এ মূর্তির নাম কী আমি জানি না। তবু অসুরের বুকে বর্শা বেঁধানো দুর্গা প্রতিমার কথা মনে পড়ে যায়। যোগোর মুখে কিসের দাগ? হয়তো এই কটা মুখ-খানি পাঁচ সাত বছর আগে খুবই সুন্দর ছিল। এখন তেমন সুন্দর না। সেই অর্থে সুন্দর না, যে অর্থে নারীর লাবণ্য ভাবি। কিন্তু এখন দেখে মনে হচ্ছে আরো কী এক সৌন্দর্য যেন আছে। যে সৌন্দর্য বাস করে মনের গভীরে, শক্তিতে ভক্তিতে জ্ঞানে তেজে। এখন যেন যোগোর মুখে সেই সৌন্দর্যেরই ঝলক লেগেছে।

দু'জনের মাঝখানে পড়ে কোনো কথা বলা উচিত কি না বুঝি না। এখন আমি অনেক নির্ভয়। স্বয়ং আশ্রয়দাত্রীর হাতে এখন অস্ত্র। ভয়ে ভয়ে বলি, 'বর্শাটা তুলে নিন, আমার বড় অস্বস্তি লাগছে।'

ব্রহ্মানন্দ আরক্ত চোখে চকিতে একবার আমাকে দেখে নেয়।

তার চোখ থেকে রাগ বিদ্বেষ যে একেবারে অপসারিত তা মনে হয় না। আমার প্রতি এখনো যেন কেমন একটু সন্দিগ্ধ কুটিল কটাক্ষ হানে।

যোগো আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে, অবধূতের দিকেই চেয়ে বলে, 'নোক নাই, জন নাই, চেনা-অচেনা নাই, যার-তার সামনে তুমি আমার বেইজ্জত কইরবে! ক্যানে, ই ঘরকে নোক এইসেছে শুন্যে চুপ কইরে থাইকতে পাইরলে না? ভাইবলে বুঝি হাতেরটা পিছলে বেরিয়ে যেইছে তা-ই সামালতে এইসেছ। ক্যানে, যাকে সাধন-ভজন বুঝাল্‌ছ তাকে লিয়ে থাকো না। ইথানে মইরতে ক্যানে? বড় তুমি বেহ্মালন্দ বেহ্মচারি হইয়েছ, না? মরণ তোমার, মুখে আগুন অমন অবধূতের।'

ব্রহ্মানন্দ অবধূত যেন ধ্যানমগ্ন। দৃষ্টি যোগোর দিকে। কিন্তু আগুন নেই। ধোঁয়াটি নেই। নাকি যোগো দর্শনে একেবারে অবশ হয়ে গেল।

এও যে দেখতে হবে এমন ভাবিনি। কে আমাকে পথে ঘোরায়, পথে চালায়, দিক নির্দেশ করে জানি না। সে যে আমাকে এমন দেখাও দেখাবে ভাবিনি। ভয় গিয়েছে, এখন মনের ভিতরে যেন একটা তরঙ্গ দুলে উঠছে।

যোগোর বর্শা নেমে আসে। অবধূত বুকে হাত দিয়ে মুখ নামিয়ে দেখে। যেখানে বর্শার ডগা ঠেকেছিল, সেখানে বার কয়েক আঙুল বোলায়। তার মুখ আবার শক্ত হয়। বোধ হয় একটু লেগেছে। শত হলেও নিটুট বর্শা তো! আর যোগো একেবারে আলতো করেও ছুঁইয়ে রাখেনি। রোখের বশে, একটু-আধটু খোঁচাও মেরেছিল নিশ্চয়।

অবধূত আর একবার আমার দিকে চায়। তারপরে ত্রিশূলটাকে ছুঁড়ে ফেলে একদিকে। বলে, 'বেশ, আমি চইললাম। তোর মুখ আর আমি দেইখতে চাই না।'

যোগো বর্শাটা মাটিতে ঠেকিয়ে বলে, 'বাঁচি, আমার হাড় জুড়োয়। তোমার মতন অবধূতের সাথে, আমাকে যেন আর না থাইকতে হয়। একদিন যেমন কর‍্যা এইসেছিলাম, তেমনি কর‍্যা চইলে যাবো। তবু তোমার নষ্টামো ভণ্ডামো, উতে আমি থুথু দিই। উতে আমি ন্যাকার করি।'

বাবা, প্রতিবাদের কী তীব্র ভাষা। এর বোধ হয় আর তুলনা হয় না। অবধূত বলে ওঠে, 'তবে মনে রাখিস, আশ্রমে যদি কোনো অনাচার করিস, তবে মহাপাতকী হবি, শরীলে পোকা পইড়বে।'

বলে সে দরজার দিকে ফিরতে যায়। যোগো বলে ওঠে, 'যা যা, শকুনের শাপে আবার গরু মরে! তুমি যদি হেথা হোথা দশটা ভৈরবী জুটিয়ে সাধন-ভজনের র‍্যালা কইরতে পারো, তবে আমিও পারি। করবও তা-ই।'

সসম্মানে পশ্চাদপসরণকারী অবধূতের গলায় কেবল একটা তীব্র হুংকার শোনা যায়। সে বেগে ধায় দরজার দিকে। তখনই শোনা যায় 'জয় গুরু জয় গুরু! এইসেছ দাদা বেহ্মানন্দ! এইসে ইস্তক তোমার খোঁজ কইরছি।'

কথা ঘরে বা দাওয়ায় না। একেবারে বাইরে, গোপীদাসের সঙ্গে অবধূতের দেখা। সেখানে অবধূতের গলা শোনা যায়, 'অ, তুমি। তুমি কখন এল্যে?'

'এই তো একটুক আগে। সাথে এক বাবাজীকে লিয়ে আইসছি। ছেলেমানুষ, বড় ভালো মানুষ বাবাজী, বক্রেশ্বর দশ্শন কইরতে এইসেছে। তা ভাইবলাম কী যে, তোমাদিগেও একটুকু দশ্শন কইরবে, ইখানেই দুটো ফুটিয়ে লিয়ে খাওয়া হবে। তা তোমারই পাত্তা নাই। এইস, যেইছ কুথা?'

সঙ্গে সঙ্গে সেই গর্জন, 'নাঃ, আর ই আশ্রমে লয়। আমাকে কি না বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে মাইরতে আসে?'

'সি কী! কে গ, কে মাইরতে আসে?'

'কে আবার! ইখানে আর আছে কে! অই পাপিষ্টি ডাকিনী মাগী।'

অমনি গোপীদাসের গলায় ভিন্ সুর বাজে, 'আ ছি ছি অবধূতদাদা, কী বইলছ গ! যোগোদিদিকে গালি পাইড়ছ?'

ঘরের মধ্যে আমি যেমন চুপ করে শুনছিলাম, যোগোও তেমনি শুনছিল। আর বোধ হয় থাকতে পারল না। বর্শাটা নিয়েই বেরিয়ে গেল দুপ দুপ করে। বাইরে থেকে তার গলা শুনতে পাই, 'ফুঁড়ে মাইরতে যেইছি, বেশ কইরছি। মারি নাই, সে তোমার ঠাকুরের দয়া। এখন যাবে, না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ খারাপ কইরবে?'

অবধূতের গলা শোনা যায়, 'অই, অই দেখ, মিছে বইলছি কি না। কথা শোনো একবার।'

যোগোর গলা, 'হুঁ শুইনবে, আমার কথা শুইনবে। ক্যানে, আমাকে ব্যাশ্যা কুলটা বইলবে না আরো? বলো, বলো আবার, দ্যাখ ক্যানে কী করি।'

গোপীদাসের গলায় বাজে, 'জয় গুরু, জয় গুরু! আহ; ছি ছি ছি! এমন কথা ভৈরবীকে বইলতে আছে? এইস, এইস গ অবধূতদাদা, রাগারাগি করো না, ঘরকে এইস। দুটো ফুটানো হোক, খেয়ে লিয়ে বস্যে দুটো সোখ দুঃখের কথা বলি।'

অবধূতের তেড়িয়া হাঁক, নাঃ, আর না। উয়ার কাছে আর না। বাবার কাছে যদি ধম্মত ঠিক থাকি, তবে উয়ার জন্যে আমার সাধন-ভজন আটকে থাইকবে না।'

যোগো বলে, 'অ মা গ, তাই কখনো হয়! এমন ভোলানাথের পায়ে আমার মতন কত ভৈরবী গড়াগড়ি যেইছে। আমার জন্যে কখনো তোমার সাধন-ভজন আটকায়?'

গোপীদাস সামাল দেয়, 'চুপ করো গ যোগোদিদি, রাগের কথা ছাড়ো, এইস বেহ্মালন্দদাদা, ঘরে এইস।'

সেখানে জবাব সেই এক, 'নাঃ, যাবো নাই। তবে, তুমি যদি আমার কাছকে এইসে থাকো, ইখানে আর না। চলো, আমার সাথে চলো। তোমার সাথে কে আছে, উয়াকে ডেক্যা লিয়ে এইস।'

সর্বনাশ! ব্রহ্মানন্দ অবধূতের আতিথেয়তা! এখানে যদি একটু মনে মনে ভরসা পাচ্ছি, অবধূত দর্শন করে তার কিছুই পাই না। গোপীদাসের গলা শোনা যায়, 'এস্যেছি তোমার ঘরে, যাবো অন্য ঘরে, সেটা কি ভালো দেখায়? তুমি থাইকবে, যোগোদিদি থাইকবে, কত কথা হব্যে, তাতেই সোখ। আমার চিতেবাবাজীর মনেও

আনন্দ হব্যে। এইস, ঘরে এইস। ই দ্যাখ, চাল লিয়ে এইসেছি। ঠাকরুন এখনি চাপাবে।'

আবার সেই জবাব, 'নাঃ, ইখানে লয়! চাল লিয়ে এলেকাটার ঘরকে চলো, সিখানেই রান্না হবে।'

যোগো যোগ করে দেয়, 'সেথা রাঁইধবার লোকও আছে। যাও ক্যানে গোপীদাদা, তোমাদিগের অবধূতদাদার লতুন ভৈরবীর হাতে আজ একটুক পেসাদ পেইয়ে এইস। আমার হাতে তো অনেকবার হইয়েছে। ইবার লতুন হাতে হবে।'

গোপীদাসের গলা শোনা যায়, 'আর লতুনের ঝোঁক নাই গ যোগোদিদি। যা পাই, তা পুরনো হাতে লিয়ে থুয়ে যেতে পাইরলে হয়। তা, আমি বলি অবধূতদাদা, সিখানে যদি কেউ থাকে, তাকে ডেক্যা লিয়ে এইস ক্যানে। না কী বলো গ ঠাকরুন।'

যোগো বলে, 'সি তো পেত্থম দিন থেক্যা বইলছি গ। তাকে আমি নিজে বইলছি, এই আশ্রমে থাইকতে। থাইকবে কেমন করো? সাধন-ভজন হব্যে, চক্ষুলজ্জা নাই?'

অবধূতের গলা শোনা গেল, 'চইললাম। তবে ই মাগীকে বইলে দিও, আমার আশ্রমে যেন কোনো অনাচার না হয়।'

যোগোর গলায় আবার ঝাঁজ বাজে, 'আরে যা যা, অমন বেহ্মানন্দ বেহ্মচারী ঢের দেইখেছি।'

'আচ্ছা, তোর বিষ দাঁত...।'

অবধূতের গলা মিলিয়ে যায়। যোগো ডাকে, 'এইস গোপীদাদা, আর দেরী করা চলে না।'

বলতে বলতে সে ঘরে ঢোকে। আমার দিকে চেয়ে একবার হাসে। কিন্তু এ হাসি সে হাসি না। যোগো ভৈরবীর চোখের আগুন এখনো নেবেনি। মুখের রক্ত এখনো নামেনি। তবু যেন কোথায় একটা বিষাদের ছায়া লেগে গিয়েছে। মেঝে থেকে ত্রিশূল কুড়িয়ে বর্শাসহ এক কোণে রাখতে রাখতে বলে, 'কী চিতেবাবাজী, আক্কেল একেবারে গুড়ুম হয়্যা গেলছে তো? এমনটি আর দেইখেছ কখনো?'

সে ঘরের মাঝখানে এসে আমার দিকে ফিরে তাকায়। আমিও তার চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম। এখন যোগো ভৈরবীর চোখে চোখ রাখতে ভয় হয় না। এখন তার আরক্ত চোখের ভাব অন্যরকম। বলি, 'না, দেখিনি।'

যোগো একটু হাসে। গায়ের আঁচল টেনে দেয়। এই মুহূর্তে সহসা যেন তাকে গৃহস্থ বধূর মতো মনে হয়। শ্মশানের যোগিনী নয়।

ইতিমধ্যে গোপীদাস এসে ঘরে ঢোকে। যোগো তাকে বলে, 'লাও, তোমার চিতেবাবাজীকে একটুক দ্যাখ গ গোপীদাদা। বেচারী অনেকক্ষণ ধইরে ভূত-পেতনীর লড়াই দেইখছে। একবার তো পালাবার জন্যে পা বাড়ালছিল, আমি ধর‍্যে রাইখছি।'

এ ব্যাপারে গোপীদাসের তেমন উৎসাহ কৌতূহল দেখা যায় না। সে নিচু হয়ে চালের পুঁটুলি আর তেলের শিশি রাখে। আমার কাছে যা অভাবিত বিচিত্র ঘটনা, তার কাছে হয়তো পুরনো ঘটনার পুনরাবৃত্তি। বলে, 'বাবাজী পালাবার মানুষ না। ঘরের বাইরে যেইয়ে বইসতে চেয়েছিল হয়তো। এ মানুষ আমার চেনা হইয়েছে ঠাকরুন। এ মানুষ সব ঠাঁই, সবকিছুতে থাইকতে পারে।'

বড় ব্যাজ, বড় ব্যাজ। এ কথা থাকুক। আমি অন্য কথা বলতে যাই। তার আগেই যোগো বলে ওঠে, 'বাব্বা! চিতেবাবাজীকে লিয়ে যে তোমার মন ভোর হইয়ে আছে গ?'

'তা আছে, সিটি বইলব। হাজারবার বইলব। একবার রেখ্যা দ্যাখ তো, এত কথা, এত ঘটনা, তবু কেমন মোহন মূর্ত্তিটি লিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।'

যোগো আবার তাও চেয়ে দেখে। কী বিশ্রী! আত্মধিক্কারই লাগে প্রায়। আমি

জিজ্ঞেস করি, 'আচ্ছা, ওই সাপটা কেন ওখানে?'

যোগো খাঁচার দিকে চেয়ে বলে, 'উটি অবধূতের বাহন।'

বলেই সে তাড়াতাড়ি খাঁচাটার কাছে গিয়ে বসে। খাঁচার গায়ে হাত দেয়। মুখ এগিয়ে নিয়ে যায়। খাঁচার গায়ে তার চুল এলিয়ে পড়ে। তারপরে যেন শিশুকে আদর করে বলে, 'আহা আমার সোনা, আমার মাণিক, আজ ক'দিন ধর‍্যে কিছু খেতে দিতে লাইরাছি, ঘরে বাগানে, দুটো ইঁদুরের কল পেত্যা রেখ্যাছি। তা মরণ, ইঁদুরগুলানও চালাক হয়্যা গেলছে। একটাতেও ঢোকে নাই। আহা, আহা!'...

অবাক হয়ে দেখি, প্রকাণ্ড সরীসৃপের গোটা মুখখানি, খাঁচার দুই ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে পুরো বেরোয় না। কিন্তু লকলকে সরু চেরা জিভ দিয়ে, যোগোর চুলে মুখে চেটে দেয়। তার যে-চোখটিকে দেখতে পাই, সেটিকে হঠাৎ সাপের চোখ বলে মনে হয় না। যেন স্নেহার্থী আতুর অপলক নিবিড় কোনো চোখ। তবু আমার গা-টা কেমন সিরসির করতে থাকে। শিরদাঁড়ার কাছে যেন একটা কাঁপুনি লাগে।

গোপীদাস আমার দিকে একবার চেয়ে হাসে। যোগোও আমার দিকে একবার চায়। তারপরে গোপীদাসকে বলে, 'তবু শীতকাল বইলে রক্ষা, খিদেতেষ্টা তেমন নাই। গীসসি কালে বাছার আমার ভারী কষ্ট। তা মদনা ডোমকে বইলে রেইখেছিলাম। মাঝে মাঝে ইঁদুর পাখি যা হক, দু'-একটা ধর‍্যে দিয়ে-টিয়ে যায়। তিন দিন তার পাত্তাও নাই।'

গোপীদাস বলে, 'তাকে তো আজ দেইখলাম ঘাটে। লাইছিল। তবে খুব রস খেইয়েছিল। উদিকে ঘাটেতে বউয়ের সাথেও এক পেস্থ হয়ে গেল্ছে।'

যোগো বলে, 'অই, শ্মশানের সাধক বলো, ডোম বলো, সব এক গোত্তর। উয়াদের কোনো তফাত নাই।'

বলতে বলতে সে আবার অজগরের দিকে নজর দেয়। খাঁচার ফাঁকে হাত বাড়িয়ে মুণ্ডে বুলিয়ে বলে, 'খাবার পেইলেই দেবো বাবা, এখন একটু কুণ্ডলী হইয়ে থাকো। আমি উঠি।'

বলে সে উঠে চালের পুঁটুলি আর তেলের শিশি তুলে নেয়। তারপরে পিছনের দরজার দিকে, যেতে গিয়ে আমার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, 'কী বাবাজী, খুব ঘেন্না কইরছে?'

প্রশ্ন শুনে আমি চমকে উঠি। ঘেন্নার কথা তো একবারও মনে হয়নি। বরং অবাক হয়ে অজগর আদরের বিস্ময়কর ঘটনা দেখছিলাম! বলি, 'না তো। কেন?'

যোগো বলে, 'কইরতে তো পারে। সবার সব জিনিস তো ভালো লাগে না। তবে আমি হাত ধুইয়ে লিবো, ভেবো নাই।'

বলে সে আমাকে অবাক করে দিয়ে চলে যায়। আরো অবাক লাগে এই ভেবে, কথাটা একেবারে মিথ্যা বলেনি সে। আমার গায়ের মধ্যে যে সিরসিরানি লেগেছিল, তা যে কেবলই ভয়ের, তা বলতে পারি না। ঘৃণা না হোক, চিরসংস্কারে একটা গা পাক দেওয়া ভাব নিশ্চয়ই আছে। হয়তো খাবার সময় এ কথা আমার মনে হত্তো।

গোপীদাস বলে, 'বইস বাবাজী। ভাত ফুটবার এখনো দেরি আছে। ততক্ষণ একটুক গা পেইতে লাও।'

বলে যোগোর উদ্দেশে জিজ্ঞেস করে, 'কই গ ঠাকরুন, সপ্তমী দেবে নাকি?'

'অই মা, ভুইলে যেইছি গ।'

যোগো বাইরে থেকে ঘরে এসে ঘরের বেড়ায় গোঁজা একটা ছোট পুরিয়া এনে দেয়। জিজ্ঞেস করে, 'আর সব সামগ্গিরি আছে তো?'

'হুঁ হুঁ, সব আছে।'

কিন্তু এই মুহূর্তে যোগোকে যেন আরো অন্যরকম মনে হয়। তার চোখ-মুখের আরক্ত ভাব গিয়েছে। তবে, তার চোখের বর্ণই হয়তো একটু রক্তাভ। কিন্তু তার মুখের ভাবে ইতিমধ্যেই কেমন একটা অন্যমনস্কতা এসে গিয়েছে। সেই সঙ্গে বিষাদের ছায়া। সে আবার পিছনের দাওয়ায় চলে যায়।

গোপীদাস গাঁজার সামগ্রী ঝোলা থেকে বের করে নিয়ে বসে। গাঁজা ডলতে ডলতে কী একটা গানের কলি যেন গুনগুন করে।

স্বর শুনি, কথা বুঝতে পারি না।

আমি বলি, 'একটু বাগানে গিয়ে ঘুরব?'

'হুঁ, হুঁ, ঘোরো ক্যানে বাবাজী, যেথাতে ইচ্ছা ঘোরো। কেউ কিছু বইলবে না।'

আমি পিছনের দরজা দিয়ে দাওয়ায় পা দিই। বাঁ দিকে দেখি, কাঠের উনোনে কয়েক খণ্ড কাঠে পিড়্পিড়িয়ে আগুন জ্বলছে। তার ওপরে হাঁড়ি চড়ানো হয়ে গিয়েছে। কাছেই পা ছড়িয়ে বসেছে যোগো। তার ছড়ানো পায়ের ওপর কুলোর বুকে চাল। তার সেই রক্তাভ বক্ষের লজ্জা এখানে নিরিবিলি অবকাশে অনেকখানি খোলা। কিন্তু, তার চোখের কোণে যেন দুটি মুক্তো বসানো। আলোয় চিকচিক করে।

আমার পায়ের শব্দে সহসা মুখ তুলে আমাকে দেখেই ঝটিতি মুখ ফিরিয়ে নেয়। পাশ ফিরে তাড়াতাড়ি চুলার কাঠ উসকে দিতে থাকি। আমিও একটু চমকে অস্বস্তি নিয়ে তাড়াতাড়ি বাগানে নেমে যাই। কিন্তু আমার মনের মধ্যেও একটা বিষাদের ছায়া নেমে আসে। যোগো ভৈরবীর মুখখানি আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

অমন যার দাপট, অমন খোদাই করা দপদপে যার চেহারা, যার চোখের তারায় আগুন জ্বলে, বর্শা নিয়ে দুর্গা প্রতিমার মতো পুরুষের বুকের ওপর এলো চুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার চোখের কোণ দুটিও টলটল করে। আশ্চর্য, সংসারে বলো, সংসারের উপান্তে শ্মশানে বলো, গৃহিণী বলো, ভৈরবী বলো, সেই এক মন, এক প্রাণ, সবখানে রাজে। সবখানে বাজে। যত বিচিত্র হেরো, সেই এক সুর বাজে।

যোগোর চোখের কোণ কেন টলমল, জানি না। কিন্তু রণচণ্ডী সব না। তারপরেও সেই মূর্তি আছে। দারুণ আগুনের পর যেখানে পাত্রে পাত্রে জল ঝরে। যেখানে বেদনা বাজে শান্তির মতো। বাজে গভীরে নিঃশব্দে, যেন সকল কল্যাণের প্রার্থনায়। অপরের না শুধু, নিজেরও।

হঠাৎ শুনতে পাই, 'অই চিতেবাবাজী, বেড়াল্‌ছ তো ভালো কইরছ, আমাকে দুটো শুকনো কাঠ কুড়িয়ে দেবে গ?'

যোগোর গলা শুনে ফিরে দেখি সে আমার দিকে চেয়ে হাসছে। মুখে এখন তার একটি স্নিগ্ধ আলো। বলি, 'হ্যাঁ, দেবো।'

'তবে দাও। কিন্তুক ভেজা কাঠ না, আমার চখ যেন না জ্বলে।'

বলে আবার হাসে।

ব্রহ্মানন্দ অবধূতাশ্রমের কঞ্চির বেড়ার সীমায় কোথায় শুকনো কাঠ জানি না। কিন্তু যোগো ভৈরবীর কথা কানে লেগে থাকে। ভেজা কাঠ যেন তাকে না দিই। তার চোখ যেন না জ্বলে। একটু আগে তার চোখের কোণে টলটলানো মুক্তোর ফোঁটা দেখেছি। কেন, চোখ চোঁয়ানো সেই মুক্তাবিন্দু কি ভেজা কাঠের ধোঁয়ার জ্বালায়?

হয়তো সেইটুকু তার সান্ত্বনা। বলতে চায়, যোগোর চোখে যা দেখেছ তা প্রাণ চোঁয়ানো না। নিতান্ত ধোঁয়ার জ্বালা। বেশ তো, তাই হে, তাই। তাতে যদি মান বাঁচে, বাঁচুক। তার চেয়ে বাঁচোয়া, যদি প্রাণের ধোঁয়া একটু যায়।

কিন্তু কাঠ কোথায়? বাগানের চারপাশে সব তো সাফসুরত্ পরিষ্কার। শুকনো কাঠপাতার ভাজও নেই। একবার এদিকে যাই, আবার ওদিকে। তখন ভৈরবীর গলা

আবার শোনা যায়, 'অ মা, কুথা যেইয়ে খুঁইজছ। কাঠ কি সবখানে ছড়ান ছিটান রইয়েছে নাকি? ই কি তোমার বনজঙ্গলে কাঠ কুড়নো?'

তবে? জিজ্ঞেস না করে তার দিকে চেয়ে দাঁড়াই। সে আমার দিকে চেয়ে এক প্রস্থ হেসে কাঁপে। তারপর লাউমাচার কাছে এক জায়গায় আঙুল দেখিয়ে বলে, 'উই দ্যাখ ক্যানে. কাঠকুটো ডাঁই করা রইয়েছে উখানে। তোমাকে কি আমি ঘুর‍্যা ঘুর‍্যা কুড়তে বইলছি? উখান থেক্যা কিছু শুকনো কাঠ লিয়ে এইস।'

তা বটে। কিন্তু আগে কুড়িয়ে দেবার কথা হয়েছিল। তুলে দেবার না। তাইতেই প্রমাদ। লাউমাচার কাছে গিয়ে কাঠের স্তূপে হাত দিই। টান দেবার আগেই ছপ্ করে কী যেন একটা হাতের কাছে এসে পড়ে। পড়েই হাতের ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে মাটিতে পড়ে কিলবিলিয়ে চলে যায়। আমিও চমকে উঠে হাতের ঝটকা দিয়ে একটু সরে আসে। গা-টা সিরসিরিয়ে ওঠে।

ভৈরবী দাওয়া থেকে উদ্বেগে বেজে ওঠে, 'কী গা বাবাজী, কী?'

আমি বলি, 'টিকটিকি।'

'টিকটিক—।'

পুরো উচ্চারণ করতে পারে না। তার আগেই ভৈরবীর মুখে আঁচল চাপা পড়ে। শরীর কেঁপে ওঠে। ঘর থেকে গোপীদাসের মোটা গলা শোনা যায়, 'কী হলো গ?'

যোগো বলে, 'দ্যাখ এইসে ক্যানে, তোমার চিতেবাবাজীর কী দোগ্‌গতি।'

ঘরের ভিতর থেকে ঝিমঝিমানো মোটা গলায় উদ্বেগ ফোটে, 'কী দোগ্‌গতি গ ঠাকরুন?'

যোগোর দৃষ্টি আমার দিকেই। তার রক্তিম চোখে হাসির ঝিলিক। বলে. 'তুমি এখন দম দিয়ে বইসে আছ, দেইখবে কেমন কইরে। টিকটিকি গ টিকটিকি।'

'টিকটিকি?'

'হুঁ। বাবাজীর হাতে পইড়ছে।'

'অই।'

গোপীদাসের গলায় স্বস্তির সুর বাজে। বলে, 'তাই বলো ক্যানে। তা আচমকা পইড়লে একটুক চমক লাইগবে। সি তোমার বনের চিতার গায়ে পইড়লেও লাগে।'

গোপীদাসের গলা এত ঝিমনো আর অস্পষ্ট, সব কথা বোঝা যায় না প্রায়। শুধু গাঁজা তো না। প্রেমের গাঁজা। তায় আবার সন্ন্যাসীর সপ্তমী। একটু ঘোর লাগবে বইকি। আমি ততক্ষণ থেমে নেই। শুকনো কাঠের পাঁজা হাতে তুলে নিই।

যোগো জিজ্ঞেস করে, 'কোন্ হাতে পইড়ল হে বাবাজী? ডাঁয়ে, না বাঁয়ে?'

তার মতো করেই জবাব দিই, 'ডাঁয়ে।'

'যাক, তবু ভালো।'

'আর বাঁয়ে পড়লে?'

'বিটিছেল্যাদিগের ভালো।'

অর্থাৎ মেয়েদের। জীব টিকটিকি। তার ডাইনে বাঁয়ে পড়াপড়িতেও ভালো-মন্দ। শুকনো কাঠের পাঁজা এনে যোগোর সামনে রাখতে রাখতে বলি, 'কী ভালো?'

'তা জানি নাই। অই শুইনেছি, সবাই ভালো বলে, তাই বলি।'

কিছু না ভেবেই বলি, 'কেন, আপনি তো ভৈরবী, আপনি জানেন না?'

যোগো হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে এমন করে তাকায়, আমার অবাক লাগে। একটু বিব্রতও হই। তার সেই বড় বড় দপদপে চোখের দৃষ্টি যেন আরো ধারালো, তীব্র হয়ে ওঠে। অন্যায় কিছু বললাম নাকি?

যোগো আবার হঠাৎ-ই চোখ ফিরিয়ে নেয়। দেয়ালের কাছে পাট করা পুরনো

শাড়ির পাড় দিয়ে মোড়া চটের আসন একটা খুলে পেতে দেয় তার কাছাকাছি। না তাকিয়ে বলে, 'বইস।'

বলে কুলো কাত করে হাঁড়ির মধ্যে চাল ঢেলে দেয়। হাঁড়ির মুখে ঢাকনা ঢেকে উনোনের মধ্যে কাঠ দিয়ে আগুন খুঁচিয়ে উসকে দেয়। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছে আমার দিকে ফিরে বলে, 'কী হল্য, বইসলে না?'

বসব বটে, মন যে খাড়া। কোথায় যেন একটু বেসুর বেজেছে মনে হয়। কিন্তু কোথায় কেমন করে তা জানি না। যোগোর কাছাকাছি আসনে বসতে বসতে বলি, 'এই যে বসি।'

কিন্তু যোগো বিন্দু না। একটু যেন ভয়ে ভয়েই বসি। না জেনে যদি কোনো অপরাধ করে থাকি, এখুনি হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে রাজী। তা-ই জিজ্ঞেস করি, 'আপনি কি রাগ করেছেন আমার ওপর?'

'কইরেছি।'

সহজ কথা, সোজা জবান। কিন্তু যোগোর মুখে তার কোনো ছাপ নেই। এমন কি একটু আগের ধারালো তীক্ষ্নতা, সন্দেহ, কিছুই নেই। বরং তার রক্তিম চোখের ফাঁদে কেমন একটা টানা স্রোতের ঝিকিমিকি। তাতে নানা ছায়া খেলা করে। বলে, 'ভৈরবী হল্যে বুঝি সব জাইনতে হয়?'

এই কথা! তার জন্যে রাগ কেন? মন্দ ভেবে কিছু বলিনি। যোগো অবধূতানীকে ঠাট্টাও করিনি। এই কেমন একটা ধারণা, শ্মশানবাসিনী ভৈরবী, টিকটিকির ডাইনে-বাঁয়ের বৃত্তান্ত তার জানা আছে বা। যে কথা অন্যে জানে না, ভৈরবী তা জানে। সে যে ভৈরবী। তার জগৎ ভিন্ন, যোগ আলাদা। সে জানে অনেক কিছু। এই ধারণা থেকে বলেছি। তাড়াতাড়ি বলি, 'আমি কিন্তু অন্য কিছু ভেবে বলিনি, বিশ্বাস করুন। আমি ভাবলাম, আপনি ভৈরবী, একজন সাধারণ মেয়ে তো নন। আপনি নিশ্চয় জানেন।'

যোগোর ঠোঁটের কোণে যেন একটু চিকুর হানা হাসি খেলে। তার সারা চোখে মুখেই এমন একটা রক্তাভ জ্বলজ্বলে ভাব আছে, হাসির ধারে তা যেন আরো তীব্র দেখায়। বলে, 'তা-ই বুঝি? তা, অই কী বলে ছাই, অসাধারণ কুথা দেইখলে গ?'

বলতে বলতে তার শরীরে কেমন একটা দোলা লেগে যায়। ঘাড় কাত হয়ে পড়ে, চোখ দুটি আধবোজা ভাব করে, দৃষ্টিতে আবেশ ফোটায়। তার কাঠ-খোদাই শরীরে যেন কেমন আগুনের খেলা। পুষ্ট, শক্ত, উদ্ধত উজ্জ্বল। লালপাড় গেরুয়া শাড়ির ঢাকায় অঙ্গার যেমন জ্বলজ্বল করে। চোখ রাখা যায় না। তবু সাপের মতো রুদ্রাক্ষের মালা দোলানো বারে বারে চোখ টানে। রক্তাভ স্ফীত দুই স্তনান্তরের মাঝখানে যেন জগৎজনের অন্ধকারকে দারুণ দীপ্তিতে হানে।

আমি বলি, 'সংসারে যাদের দেখি, তাদের সঙ্গে আপনাদের মেলাতে পারি না। মনে হয় কত তফাত।'

'ক্যানে গ?'

বলে গায়ের আঁচল তুলে রুদ্রাক্ষের মালা টেনে দেখিয়ে বলে, 'ইয়ার জন্যে?'

এমন করে দেখায়, যেন এখনি সব টেনে খুলে ফেলে দেবে। বলি, 'না, এজন্যে নয়। কেবল বসনভূষণ কেন, সবই।'

'অই, শ্মশানে মশানে থাকি, তা-ই?'

শুধু তা-ই বা কেন। বসনভূষণ বাসস্থান ছাড়াও জীবনযাপন আচার-আচরণ আছে। তার চেয়ে বড় কথা, অবধূতের ভৈরবী। সে কি কখনো সংসারের আর দশ নারীর মতো হতে পারে? যার জীবনে সব কিছুর মূলে সাধন-ভজন সার। যে কারণে

সংসারের বাইরে এসে আশ্রয় নিতে হয়েছে এ মহাশ্মশানে। ঘরে যাদের নরমুণ্ডের কঙ্কালের শোভা, ত্রিশূল গাঁথা, খাঁচায় অজগর। আমি বলি, 'আপনি ভৈরবী, সাধিকা।'

'থাক, উ কথা বল্যো না।'

আমার কথার ওপরেই ঠেক দেয় সে। তারপরে হঠাৎ আঁচল গুছিয়ে ঘোমটা টেনে বসে, আমার দিকে চেয়ে বলে, 'দেখ তো, তা-ই কি আমাকে মনে হয়?'

দেখতে দেখতে যেন যোগোর ধার, ধারালো তীব্রতা ঢাকা পড়ে যায়। যেমন ভাদ্রের বিশাল বেলার দারুণ রৌদ্রে সহসা ছায়া পড়ে, সকলই কেমন গভীর গম্ভীর বিষণ্ণ লাগে, যোগোকে তেমনি দেখায়। এমন কি, তার রক্তিম চোখেও ছায়ার নিবিড়তা। জলের রঙ যেমন হোক, আকাশের ছায়ায় বদলায়, তেমনি। তার গলার স্বরেও যেন দূর গভীরের সুর বাজে। তবু একটুখানি হাসি তার মুখে, তাতে ছায়ার প্রসন্নতা। বলে, 'তফাত কুথা দেইখলে বাবাজী? সম্‌সারে মা বইন বিটি ঝি থেক্যা আলাদা কী দেইখছ বলো। একজনের ঘর করি, সম্‌সার করি, তার মতো থাকি। আর তো কিছু জানি নাই।'

বলতে বলতে যোগোর চোখের রঙ বদলায়। লাল কুসুমের দুটি ডাগর পাতা যেন হিমে ভেজা। আরো বলে, 'সে যিখানে লিয়ে যাবে, সিখানেই যাবো। যেমন রাইখবে, তেমন থাইকব। সে যেদিন ভৈরবী হতে বলে তো ভৈরবী। যোগিনী কর‍্যা রাখে তো যোগিনী। আর তো কিছু জানি নাই ভাই বাবাজী।'

বিন্দু বিন্দু হিম বড় ফোঁটায় টলে। আর আমার কানে যে কথাগুলো বাজে, তা আসে যেন সংসারের মাঝখান থেকে, সেই পুরাতন দিনের সুরে। এক নিয়ে থাকি, এক মনে, এক বেশে। তার বেশী আর কিছু না। শুনতে শুনতে আমার কথা ফুরিয়ে যায়। আমার বুকে কিসের উত্তাপে বাষ্পের সঞ্চার হয়। একটা ব্যথা ধরে যায়। তবু বিস্ময়ের ঝলকে অপার কৌতূহলে চেয়ে থাকি। কথা বলতে পারি না। সংসারে শ্মশানে যেখানে মেশামেশি, যোগো যেন সেইখানে নিয়ে যায়। যেখানে স্থান-কালের সীমা নেই।

সংসারে যে আছে, শ্মশানেও সে-ই। কৈলাসে শ্মশানে এক মন, এক প্রাণেরই লীলা। যোগো আবার বলে, 'তাও দ্যাখ ক্যানে, সম্‌সারে ঝগড়া বিবাদ মারামারি। হেঁথাতেও তা-ই। লোকে বলে, "মাগ-ভাতারের বিবাদ, পাড়ায় যেন ডাকাত পইড়েছে।" ইও তো তা-ই। ঘরে দব্য থাইকলে ফোটাই, রাঁধি বাড়ি, দিই খাই। আর তো কিছু জানি নাই। ইয়াতে যদিন তফাত বলো তো বলো। ই যদিন সাধন-ভজন হয়, তা হল্যো সাধন-ভজন। আর তো কিছু জানি নাই।'

আর কিছু জানে না যোগো। যোগো ভৈরবী, ব্রহ্মানন্দ অবধূতের শ্মশান-সাধিকা। চোখ তার জলে ভরে যায়। গলায় দোলে রুদ্রাক্ষের মালা। কিন্তু সে আর তো কিছু জানে না। পরমের পিছে পিছে মরম চলে। রাঁধে বাড়ে খায়, ঝগড়া বিবাদ করে। হয়তো কাঁদালে কাঁদে, হাসালে হাসে। সুখ দুঃখ নিয়ে ফেরে একের পিছে পিছে। মরম ফেরে পরমের পিছে পিছে। একে যদি তুমি সাধন-ভজন বলো তবে তাই।

শিলা যেমন জলে ভাসে, তেমনি। কাষ্ঠের সঙ্গে পীরিতি করে লোহাও যেমন জলে ভাসে, সেইরূপ। সমর্পণে নিবেদনে প্রেম বাজে, যোগোর কথায় সেই বাণী শুনি। সেই তার সাধন।

এ কি সংসারের বাইরের কথা? অন্তরে বাহিরে সীমান্তে সেই এক কথা। কিন্তু ভৈরবীর মুখে না শুনলে বুঝতে পারতাম না। এ রূপে, সে রূপে, নানা রূপের ধন্দ। অরূপের সীমা নেই, এক সুরে বাজে। তখন কথা ফুরায়। তখন বুঝহ মনে, যে জানো রসের সন্ধান।

যোগোর দিকে চেয়ে আমার মনের একদিকে যখন টলটলিয়ে ওঠে, আর একদিকে তখন খুশির ঝোরা ঝরে। তারপরে সহসা চিড় খাওয়া মেঘের ফাঁকে যোগোকে দেখি আর এক রূপে। এত কথা যোগো এই নতুন চেনা লোকটিকে এমনি বলেনি। চোখের জল অকারণে গলেনি। ব্রহ্মানন্দ অবধূত শেল হেনেছে ভৈরবীর বুকে। সেই শেল আছে, এলেকাটার ঘরে।

সংসার, সংসার এই! শ্মশানে মশানে তীর্থে, নগরে বন্দরে গ্রামে, সেই এক খেলাখেলি। বৃন্দাবনে গোকুলে সেই নায়ক-নায়িকা লীলা। যোগো আজ বেজেছে বড় বেদনায়। সাধিকার কোথাও লাগেনি, যোগিনী ভৈরবীর কোথাও বাজেনি। বেজেছে সেই এক মানবীর প্রাণে।

যোগোর মতো নারীও আমার চোখের দিকে চেয়ে সহসা লজ্জা পায়। চোখে জল নিয়েই একটু হেসে, তাড়াতাড়ি মুখ ফেরায়। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে উনোনের কাঠ ঠেলে আগুন উসকে দেয়। এখন নিশ্চয়ই ভেজা কাঠের ধোঁয়ার জ্বালা না। জল লেগেছে, প্রাণের আগুনেই।

কিছুই বলতে হয় না, জিজ্ঞেস করতে হয় না। চোখে চোখ পড়ে, হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিতেই যেন সকল জানাজানি হয়ে যায়। অবিশ্বাসী কপট ভৈরব, ভৈরবীকে কাঁদিয়েছে।

ওদিকে ঘরের মধ্যে কোনো সাড়াশব্দ নেই। যোগো আমার দিকে ফিরে আবার বলে, 'কী, কথা বইলছ না যে বাবাজী।'

বলি, 'আপনার কথাগুলোই ভাবছি।'

হঠাৎ যেন হাত তুলে মারতে আসে যোগো। কথার মাঝখানেই বলে ওঠে, 'অই, তুমি আর আমাকে আপুনি আজ্ঞা কর্যো না হে, শুইনতে পারি না।'

তা-ই ভালো। ভাবলাম, না জানি আবার কী অপরাধ করেছি। বলি, 'সে হবে। নতুন তো।'

অমনি যোগোর চোখে দপদপানি। ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, 'তা আর জানি নাই। লতুন বেলা তোমাদিগের জোড় হাত। পুরনো কইরতেই বা কতক্ষণ লাগে।'

বলে, দীপ্ত কোপে হানে। তা বটে। নায়ক পুরুষদের লক্ষণ সেরকম বটে। বৃন্দাবনে লীলা করে মথুরাতে চলে যায়। নতুন বেলায় মানভঞ্জন, নৌকাবিলাস। পুরনো হলেই বিশ্বের দরবারে।

একটু ভয়ে ভয়ে দ্বিধায় জিজ্ঞেস করি, 'উনি কি আর সত্যি আসবেন না?'

যোগো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কে?'

'মানে—আমি অবধূত মশাইয়ের কথা বলছি।'

সঙ্গে সঙ্গে যোগোর ঠোঁট দু'খানি ধনুকের মতো বেঁকে যায়। চোখেও সেই পরিমাণ বিদ্রূপ হানা। যেন আমাকেই প্রায় হানে। যেন আমাকেই জিজ্ঞেস করে, 'কুথা যাব্যে?'

'অ্যাঁ?'

'কুথা যাব্যে, জিগেস করি?'

আমিই ঢোঁক গিলে বলি, 'তা তো জানি না।'

'হুঁহু, মরণ! তোমাদিগের বেম্মালন্দই কি জানে নাকি?'

বলে ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। হাঁড়ির ঢাকনা খুলে, বগবগানো হাঁড়িতে হাতা দিয়ে ভাত তুলে দেখে। ঘটি থেকে একটু জল ঢেলে দিয়ে ফিরে বলে, 'অমন কতই দেইখলাম। বেড়ালের আড়াই পা জানো তো?'

'শুনেছি।'

'অই সিরকম। ছোঁকছোঁকানি থাইকলে মাঝে মাঝে অইরকম মরণ ধরে। ই বেলাটা পার হল্যে বাঁচি। অবধূতের আমার হয়্যা গেছে।'

সেটা খানিকটা আন্দাজেই অনুমিত। মহাশয়ের অবধূতীয় তেজ তখনই যেন কেমন নিবু নিবু হয়ে এসেছিল। তবে সেটা নিতান্ত প্রাণের ভয়ে। কেননা বুকে বর্শা বিঁধিয়ে প্রাণ নিয়ে ছেলেখেলার উদ্বেগ সেটা। কিন্তু যেভাবে শাসিয়ে গেলেন তাতে তো মনে হলো এ-মুখো আর কোনোদিন হবেন না। অবিশ্যি তাঁর আশ্রমে অনাচার হচ্ছে কিনা তা দেখতে আসতে পারেন।

ভৈরবী আবার বলে, 'অমন কতবার কত জনাকে সাধন-ভজন শেখাতে গেল, কিন্তুন মরতে সি যোগমতীর কাছকে। তা লইলে ওয়াঁর আদত মরণ হয় না।'

এ মরণ কী, তার আবার আদত বে-আদত কী, তা জানি না। কিন্তু যোগোর কথা শুনে আমার মনের ভিতরটা কুলকুলিয়ে ওঠে। এসব বাক্যি নেহাত বাক্যি না। প্রাণের জোর না থাকলে বলা যায় না। এবার ভাবো হে ব্রহ্মানন্দ অবধূত, সেদিন তোমার কেমন।

ভৈরবী জিজ্ঞেস করে. 'বুকে জাম হয় জানো তো?'

'জাম?'

'হুঁ গ, জাম, সর্দ্দি কাশির জাম লাগে না? তখন পুরনো ঘিয়ের মালিশ লাগে। জাম লাগুক, তখন আইসবে। যখন আইসবে তখন আমিও দেইখব। এই সারাটো জেবন ধইরে দেখ্যা এলাম। উ মিন্‌সেকে আমি চিনি না?'

মিন্‌সে! ব্রহ্মানন্দ অবধূত মিন্‌সে? এ যে কেবল সংসারের কথা না। সংসারের জমজমাট চাকের বচন! তার ওপরে আমিও যেমন উদোমাদো মানুষ। ফস করে জিজ্ঞেস করে বসি, 'আপনাদের বিয়ে হয়েছে কতকাল?'

'কী বইললে? বিয়ে?'

'হ্যাঁ, মানে—।'

'মরণ!'

বলেই হাঁড়িতে হাতা ডোবায়। ভাত দেখে হাতা দিয়ে হাঁড়ির মুখে ঠক ঠক ঝাড়ে। ঘটি কাত করে, হাতে জল দিয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে বলে, 'বিয়ে কুথা দেইখলে হে?'

তাও তো বটে, সাধন-ভজনে আবার বিয়ে কিসের। এ কি সমাজ-সংসারের বিষয় নাকি যে, সাতপাকে বেঁধে স্বামীর ঘর করবে। তবু একটা কিছু নিশ্চয় আছে। নইলে আর দুজনের দেখাসাক্ষাৎই বা হলো কেমন করে। পরিচয়ই বা কীভাবে। কিন্তু যোগোমতীর দিকে চেয়ে সে কথা জিজ্ঞেস করতে ভরসা পাই না। তার চোখমুখ তো আবার সেই অসুরসংহারিণী। তাতে আবার একটু সন্দেহের ছোঁয়া। তাড়াতাড়ি বলি, 'না, মানে জানি না তো।'

আমার কথা শুনে মুখ দেখে সন্দেহটা বোধ হয় ঘোচে। বলে, 'মিন্‌সে বিয়ে আর মাইনল কুথাক। আমি হল্যাম তাঁতীদের বউ, আর উ হল্যা বামুন।'

লাও শোনো এবার কথা! কথা কোন্‌ দিকেতে বহে! প্রায় হাঁ করেই চেয়ে থাকি যোগোমতীর দিকে। ব্রাহ্মণ অবধূত, তার ভৈরবী তাঁতীদের বউ। কী দিয়ে কী মেলাবে, এখন বসে বসে ভাবো। কেবল গলা দিয়ে শব্দ করি, 'অ।'

যোগোমতী বলে, 'তবুব্যে? আমাকেও ঘর কইরতে দিলে না, নিজেও ভরাভর্তি সম্‌সার ফেল্যে, শ্মশানে এল্য সাধন কইরতে।'

অবাক হয়ে উচ্চারণ করি, 'ভরাভরতি সংসার মানে?'

'ইয়ার আবার মানে কী। ঘরেতে বামনী রইয়েছে, বিটাবিটি রইয়েছে। ক্ষেত-

খামার চাষবাস পুজো যজমান সবই রইয়েছে। সব ফেল্যে ছেড়্যে আমাকে মহাপাতকে ডুবিয়ে লিয়ে চল্যে এল্য।'

'নিয়ে চলে এল!'

'ত কী বইলছ, আমি নিজে চল্যে এইসেছি?'

সর্বনাশ, কথা উলটো পালে যায়। তাড়াতাড়ি বলি, 'না না, তা বলছি না। অবধূতের কথা বলছি, এভাবে হঠাৎ একেবারে নিয়ে চলে এল!'

'তা মরণ ধইরলে অই রকম হয়।'

বলে ভৈরবী উনোন থেকে হাঁড়ি নামায়। ফ্যানের মালসায় অত বড় হাঁড়িটা উপুড় করে অনায়াসে ঠেকো দিয়ে রেখে ছেড়ে দেয়। আবার হাত ধোয়। দাওয়ার কোণ থেকে হাত বাড়িয়ে ধোয়া কড়াই নিয়ে আঁচল দিয়ে মুছে উনোনে চাপায়। তাতে জল ঢেলে দেয় অনেকখানি। আমি তখনো সেই মরণের রূপের কথা ভাবছি। বারে-বারেই যে মরণ ধরার কথা শুনি, সেই মরণের সংজ্ঞা কী, কে জানে।

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ভৈরবী একবার আমার দিকে চায়। আবার মুখ নামিয়ে ঠোঁট টিপে ডালের কুনকে তুলে কয়েক মুহূর্ত নাড়াচাড়া করে। তারপরে হঠাৎ বাগানের দিকে চেয়ে বলে, 'তবে খালি তো উয়ার মরণ ধরে নাই, আমারও ধইরেছিল। তা লইলে কী আর আসি?'

সেটা একটা কথা। একা ব্রহ্মানন্দর না, যোগোমতীরও মরণ ধরেছিল। যোগোমতী ঘাড় ফিরিয়ে ভুরু বাঁকিয়ে যেন কৈফিয়তের মতো করে বলে, 'তা কী বলো, তখন চৌদ্দ পনের বছর বয়স, উদিকে বামুনের নজর সরে না। এখন দেইখছ ইরকম, তখন অবধূতের অন্য মূর্তি। এখন তো পুড়্যে গেলছে, পোড়া কাঠ মূর্তি হইয়েছে। তখন সোন্দর চেহারা, গোরা রঙ, মিছা বইলব না, হুঁ, মনে হতো কন্দপ্পকান্তি। আর যেমন-তেমন ঘর তো লয় যে, খালি অগ্গদানীদের মতন ছেরাদ্দের পিণ্ডি খেয়ে বেড়ালছে। বাঁকড়োর নাম-করা শাক্ত বংশ। ঘরে ধূমাবতীর নিত্যি পুজো, ধূমাবতী উয়াদের ঘরের দেবী। পালা-পাবোনের কথা বাদ দাও, সে ভারী ধুমধাম ব্যাপার। তা হলেই বুঝ ক্যানে, ঘোষাল ঠাকুর কেমন মানুষ। অই তোমার বেহ্মালন্দর কথা বইলছি গ, ঘোষাল বামুন তো। শিবঠাকুরের ছোট বিটার নামে নাম, ময়ূর যার বাহন, নামটো আর মুখে লিতে পাইরব নাই বাপু, বুইঝলে তো?'

তা বুঝি, তবু জিজ্ঞেস করি, 'কার্তিক ঘোষাল তো?'

'হুঁ হুঁ, অই অই।'

অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ অবধূতের গৃহস্থ নাম শ্রীযুক্ত কার্তিক ঘোষাল। কিন্তু নিজেরও মরণ ধরার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে প্রথমে যেমন যোগো ভৈরবীর গলায় ক্ষোভ খেদ বেজে ছিল এখন আর তেমন বাজে না। এখন যেন বাঁকুড়ার কোনো এক গ্রামের তাঁতী বউয়ের গলায় কোনো এক শাক্ত পরিবার ঘোষালদের রমরমা বার্তা শুনি।

যোগোমতী কড়াইয়ের জলে কুনকের ডাল ঢেলে দিয়ে খুন্তি দিয়ে একবার নেড়ে দেয়। আবার আমার দিকে ফিরে বসে। এ মুখ আর সে মুখ নেই। মুখ এক পনেরো বছরের তাঁতী বউয়ের। যে মুখে অন্য এক জীবনের বিস্ময় কৌতূহল, ভয়তরাসের নানা রঙ। যেমন জলের বুকে আলোছায়ার নানা ঝিকিমিকি। ঘাড় কাত করে আমার দিকে চেয়ে বলে, 'তা বলো, পাড়ায় যার ছায়া দেইখলে বুক ধড়াইস্যে মরি, সে যদিন দিনরাত যোগো, যোগো করে, তা হলে ঠিক থাকা যায় কেমন কর্যা, অাঁ? অ্যাই লম্বা খাঁড়ার মতন ঝকঝকে মূর্তি, কপালে সিঁদুর, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গলাতে রুদ্দাক্ষর, হাতের তাগাও তাই। গলাখানিও তেমনি মিঠে, মায়ের নাম লিয়ে গান ধইরলে মনে হয়, ঘোষাল ঠাকুর সাক্ষাৎ মায়ের বিটা। ক্যানে কী জানি, আমার তাই

মনে হতো।'...

বলতে বলতে যোগোমতী মুখ নিচু করে। নিজেরই পায়ের পাতায় আঙুল ঘষে। বেশ কয়েকদিন আগের আলতার আবছা দাগ এখনো তার নিটোল পায়ে রয়েছে। হয়তো সেই ঘোষাল ঠাকুরের গানের সুর তার কানে বাজে। সে কী করবে বলো। তার যে মনে হতো ঘোষাল যেন সাক্ষাৎ মায়ের ছেলে। সে কী করবে বলো। যার ছায়া দেখলে বুক ধড়াসে যায়, সে যদি বারে বারে নাম ধরে ডাকে, তবে কেমন করে ঠিক থাকা যায়। বাঁশি লাজ মানে না। বড় নিষ্ঠুর, প্রাণও মানে না। সে নাম ধরে বেজে যায়। যার নাম ধরে বাজে, সে যে লাজে মরে। প্রাণেও মরে।

তবু যোগোমতীর দিকে চেয়ে আমি রুদ্ধবাক্। কী এক আশ্চর্য কথা যেন শুনি, এমনি অবাক হয়ে কিসের একটা ঘোরে যেন ডুবে থাকি।

যোগোমতী বাগানের দিকে মুখ তুলে চায়। দৃষ্টি তার বহু দূরে, দূর কালে, বাঁকুড়ার এক গ্রামে। গলাও যেন তেমনি দূর থেকে আসে, 'অই, কী বইলব গ, ঠাকুর কী দেইখল আমার মধ্যে, যিখানে যাই সে আমার সামনে। ঘাটকে যাই, ঘাটকে। ঘরকে যাই, ঘরকে। তা'পরেতে একদিন বলে কী, "অই যোগো, তোকে আমি পুজা কইরব গ!" আই মা, কী পাপ গ, আমাকে পুজা কইরবে কী গ! এমন কথা কি বইলতে আছে! "বইলতে নাই ক্যানে গ, ধুমাবতীর আদেশ হইয়েছে যে। তুই যে ধুমাবতীর অংশ!" আঃ হায় হায় গ, আমার গায়ে কাঁটা, মুচ্ছো যাই শুনে। বলে কী ঘোষাল ঠাকুর!...আমাদিগের ঘরকে ঠাকুর যেইলে, সব্বাই এইসে পায়ে হুমড়ি খেয়্যা পড়ে। মায়ের নাম লিয়ে থাকে, ঠাকুরের কত পাগলামি, কেউ কিছু মনে কইরত নাই। যখন তখন আইসত। বস্যে বস্যে গান গাইত, শাশুড়ী ননদ বস্যা বস্যা শুইনত। আমিও শুইনতাম। আবার সবার সামনেই আমাকে বইলত, "ইয়ার মধ্যে দেবীর অংশ আছে। ইয়াকে সাবধানে রেখ্য গ তাঁতী দিদি।" আমার শাশুড়ীকে দিদি বইলত। তা'পরেতে একদিন—।'

হঠাৎ থামে যোগোবতী। সে যেন কেঁপে ওঠে। চোখ বুজে চুপ করে থাকে। আমি অবাক হয়ে এই মূর্তির দিকে চেয়ে থাকি। একদিন কী হয়েছিল? কী ঘটেছিল? যোগোর কাঁপুনি যেন আমার গায়েও লাগে। সে ফিসফিস করে বলে, 'গাঁয়ের উত্তর পাড়ায় মোচ্ছব হচ্ছিল। সিখানে গেল্ছিল শাশুড়ী ননদ। সোয়ামী তো ঘরকে থাইকবার মানুষ ছিল নাই। সাঁজবেলাতে বাতি দেখিয়ে মাত্তর উঠান থেক্যা ঘরকে যেইছি, শুইনতে পেল্যোম ঘোষাল ঠাকুর গান কইরতে কইরতে আইসছে। ঠাকুর এল্য, একেবারে ঘরের ভিতর এল্য। এইসেই উপুড় হয়্যা পড়্যা আমার পায়ে হাত। দু' হাতে পা চেপ্যা ধর্যা কেঁদ্যে বইললে, "অই গ যোগো, যোগোমতী, যোগমায়া তুই। মহামায়া তুই। আমাকে উদ্ধার কর গ। তুই আমার পুজা না লিলে আমার সব বেরথা। ধুমাবতীর আদেশ হইয়েছে, আমি তোকে ছাড়ব নাই।"

বলতে বলতেও যোগো্য যেন কাঁদতে থাকে। তার চোখ মুখে ভয়-তরাসের ছাপ। দৃষ্টি তার দূরে। যেন সাঁজবেলাতে ঘরে ঢুকে ঘোষালের সেই পায়ে ধরা দেখছে। একটু থেমে আবার বলে, 'সিই আমি পেথম কথা বইললাম ঠাকুরের সাথে, "এমন করবেন নাই গ, পা ছাড়েন। আমার যে পাপ লাইগছে। আমার ভয় লাইগছে। ছাড়েন, পা ছাড়েন।" না, ছাইড়বে না। বলে, "ছাইড়ব না মা, তোমার পা ছাইড়ব না, ই পায়ে পইড়ে থাইকব।" তা বইললে কী হয়। কেউ দেইখলে কী বইলবে। ঘরে রাইখবে ক্যানে আমাকে। ঠাকুর বইললে, "দরকার নাই। চল ক্যানে, দু'জনায় চল্যে যাই। সিখানে যেইয়ে তোমার পুজা কইরব।" কিন্তুক কথা কি বইলতে পারি। আমার শরীলে তখন যেন কী হল্ছিল গ। আমি বইসে পইড়লাম। ঠাকুরের পা

ধইরলাম। মিছা বইললে আমার পাপ লাইগবে, ঠাকুর যেন আমার ধ্যান জ্ঞান হয়্যা যেইছিল। খেত্যে শুত্যে চইলতে ফিরতে, ঠাকুরকে দেইখতাম। আমার মনটা সব সোময় ঠাকুর ঠাকুর কইরত। তাকে যেন আমার সাক্ষাৎ শিব মনে লিত।...আর পাইরলাম না। ঠাকুরের পায়ে হাত রেখ্যা বইললাম, “যা বইলবেন তাই হবেক গ, কিন্তুক কুথাক যাবেন? আপনার এত বড় সম্‌সার—।” বইলতে দিলে না। বইললে, “কিছু চাই না মা, এ জেবনটা তোমার পুজো কর‍্যা সাথক কইরব।” তা'পরেই তো...।'

একটু থামে যোগো। কী বলতে গিয়ে আবার কী যেন মনে পড়ে যায়। ঘাড় নেড়ে নিজের মনেই বলে, 'তব্বে, হুঁ, ইয়ার ভিতর একটো কথা আছে। দশ বছর বয়সে বিয়া হয়্যেছিল। সোয়ামীকে দেইখতাম, পাড়ার ভানু বল্যে এক ছোঁড়ার সাথে দিনরাত ঘোরে। তার সাথে খায়, রাতে তাকে লিয়ে ঘরে শোয়, মাঠে যেইয়ে থাকে। আ মরণ, ভানু ছোঁড়া শাড়ি পর‍্যা থাইকতো। আমাদিগের মতন বিটি জামা গায়ে দিত, কপালে ফোঁটা, পায়ে আলতা, ঢঙ ঢাঙ সব বিটি-ঝিদের মতন। মনে লিত, উয়াকে ঝাঁটা পিটা করি, নুড়ো জেবল্যে দিই মুখে। তা সোয়ামী হয়্যা তুমি যদি আমাকে না দেইখলে, আমার কী হয় গ। তাই ঠাকুর যত যোগো যোগো কইরত, আমার মনটোও ঠাকুর ঠাকুর কইরত। তা'পরে সি সাঁজবেলার তিন দিন পরে সাঁজ-বেলাতেই ধুমাবতীর নাম লিয়ে ঠাকুরের সাথে ঘর ছেড়্যা গেলাম। ঘুইরতে ঘুইরতে এই বক্কেশ্বরে। সি কি ই দিনের কথা। পেরায় আঠার বচ্ছর হয়্যা যেইল...।'

যোগো থামে। চুপ করে তাকিয়ে থাকে দূরের দিকে। তারপরে হঠাৎ উনোনের দিকে ফিরে কড়াইয়ে হাতা চালায়। আমি আবিষ্ট হয়ে থাকি। যে কাহিনী শুনি, সে কি কোনো সাধক-পূজকের কথা শুনি? নীতিবিগর্হিত কোনো নরনারীর পাপ কথা শুনি কী? নাকি সব মিলিয়ে এও এক পীরিতি পরম কথা। ধুমাবতী আদেশে, কার্তিক ঘোষাল কহে, পুজি গিয়ে তাঁতীবালা যোগমতীকে।

এমন কি আর কোথাও ঘটে। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে অন্য মনে! যোগোর দিকে চেয়ে দেখি। তার সেই কথাটি আবার মনে পড়ে যায়, 'আর তো কিছু জানি নাই।' ব্রহ্মানন্দ বিহনে সে আর কিছু জানে না। কই, একবারও পাপ মনে হয় না। যোগোকে ভ্রষ্টা স্বৈরিণী স্বামী-সংসারত্যাগিনী অন্ধকারের প্রাণী বলে মনে হয় না। এর নাম সাধন-ভজন, তার বিচ্যুতি নেই। এক মনে এক সাধন। তবে ব্রহ্মানন্দকে সে চিনবে না কেন? সে-ই তো চেনে।

আমি জানি, যোগো মুখ ফিরিয়ে আছে। কিন্তু চোখ তার শুকনো নেই। কঙ্কাল ত্রিশূলে না, এই তো সাধন। ঝগড়ায়, বিবাদে, বিরহে চোখের জলে এই তো সাধন।

আমার ভিতরেও কোথায় যেন কলকলিয়ে যায়। তাতে যদি চোখের জলের ছিটেও থাকে, একটা খুশির ঝরণাও বাজে। অবাক যত লাগে, মুগ্ধ তার বেশী। চলার পথে এইটুকু প্রাপ্য। কী খুঁজে ফিরি জানি না। পথ চলাকে গড় করি, নমঃ নমঃ নমঃ। নমঃ বিচিত্র, নমঃ জীবন। বক্রেশ্বর, ঈশ্বর কোথায়, কে জানে। তার চেয়ে পথ চলার এই অপরিচয়ের পরিচয় নমঃ যোগোমতী, নমঃ নমঃ।...

গোপীদাস কখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে টের পাইনি। যোগোও পায়নি। তার মুখ তখনো উনুনের দিকে ফেরানো। গোপীদাস বলে ওঠে, 'সব শুনতে পেইয়েছি গ ঠাকরুন।'

যোগো নড়ে ওঠে। বলে, 'পেল্যেই বা, নতুন কথা তো লয় দাদা। তোমাদিগের জানা কথা।'

বলতে বলতে মুখ ফিরিয়ে রেখেই আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। আবার বলে, 'তোমার চিতেবাবাজী জিগেস্যা কইরলে যে কবে বিয়া হইয়েছে। তাই বইললাম।'

গোপীদাসের লাল চোখ দুটি এখনো ছোট, ঢুলুঢুলু ভাব। দাড়ি দুলিয়ে বলে, 'আমিও তো তাই বইলছি গ যোগো দিদি। তিন আখরের তাগদ আলাদা, সেথা বিয়া শাদীর কী কথা। অই তিন আখরে বাঁধে তিন আখরে ছাড়ে। তিন আখরে সতী তিন আখরে কুলটা। যা বইলবে তাই অই তিন আখর সব—পি-রী-তি। পিরীতি-কলে যে পইড়েছে, তার আর ঘর-সম্‌সার বিয়া বিটাবিটি সব ফোক্কা।'

বলে ঘড়ঘড়ে মোটা গলায় গেয়ে ওঠে :

'কলে কলে কল কইরেছে
কল দেখ্যে মন ভুল্যে আছে
কলের কলে কল পইড়েছে
ই কল হারাল্যে চইলবে না হে।'

যোগো বলে ওঠে, 'ছাই। অমন কলের মরণ, পিরীতির মুখে আগুন।'

গোপীদাস বলে, 'তা দাও গা। যত খুশি আগুন দাও গা। পিরীতির মুখে। না, কী বলো হে বাবাজী?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ দিই, 'হ্যাঁ।'

যোগো ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে চায়। তার চোখে মুখে আবার সেই আগের ভাব ফিরে এসেছে। লাল কুসুমের পাতার মতো চোখ দুটিতে ঝিলিক হেনে ভ্রূকুটি করে বলে, 'উ বাবা, ই যে দেখি বিন্দার শুকপাখি গ। কথা বইলবার আগে আওয়াজ দেয়।'

গোপীদাস আবার বলে, 'তা হতে পারে। পিরীতির কথা যে। না, কী বাবাজী?'

আমি আবার জবাব দিই, 'তা-ই।'

যোগো বুঝি এতটা আশা করেনি। তার চোখে কৌতূহল, আর বিস্ময়। কয়েক মুহূর্ত ঠায় চেয়ে থাকে আমার মুখের দিকে। তারপরে হঠাৎ হেসে কাঁপে সর্বাঙ্গে। বলে, 'অই গ গোপীদাদা, ই যে সত্যি চিতে গ।'

'তব্যে? এমনি এমনি কী আর বইল্যেছি। দেখে শুনে বইল্যেছি।'

আমি মিটিমিটি হাসি আর মনে মনে বলি, তা যা বলো আর তা-ই বলো অচেনার ভয় আর আমার নেই। পিরীতের মুখে তুমি যত আগুনই দাও সে পোড়াতে তুমি অঙ্গার হয়েছ। অঙ্গারের নিচে পিরীতির মরণে যে সোনা তার রূপও দেখেছি। দেখেছি বলেই সাহস পাই। যোগোমতী ভৈরবীকে ভয় পাই না আর। তার দপদপানো সংহারিণী রূপের আড়ালে যে বিগলিত ধারা বহে, এখন আমার চিন্ পরিচয় সেখানে।

যোগো আমার ওপর থেকে চোখ নামায় না দেখে না বলে পারি না, 'যা সত্যি, তাই বলব তো।'

যোগো প্রায় হুমকে ওঠে, 'বটে। দেখি শালার চিতের চখ গেল্যে দিই।'

বলে একেবারে খুন্তিটা উঁচিয়ে ধরে আমার মুখের স্যামনে। আমি তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে বলি, 'দোহাই।'

সঙ্গে সঙ্গে যোগো খুন্তি রেখে হেসে বেজে ওঠে। গোপীদাসও।

তারপরে যেন যোগোর হঠাৎ খেয়াল হয়, বেলা পড়ে গিয়েছে। মিথ্যে না, শীতের বেলার রোদ ঢল খেয়ে গিয়েছে গ্রাম বক্রেশ্বরের পশ্চিমের ঢালুতে। মুখের লাজে লাভ নেই, মহাপ্রাণী অতি ক্ষুধার্ত। যোগোও সেটা টের পায়। নিমেষের মধ্যেই ডালের সম্বরায় ঝাঁজ ছড়িয়ে ছুটোছুটি করে ঘর থেকে শালপাতা পেতে খেতে

দেয়। আমাকে আর গোপীদাসকে ভাত বেড়ে দিয়ে কড়া চাপিয়ে আলু বেগুন ভাজে।

আমি জিজ্ঞেস করি, 'আপনি খাবেন না?'

ভাজার ছ্যাঁকছোঁক শব্দে যোগোও যেন ছ্যাঁকা দিয়ে কথা বলে, 'ক্যানে হে, শ্মশান বল্যে কি নিয়ম নাই? অতিথি না খাইয়ে খাবো আমি?

তা বটে। বলি কোন্ লজ্জায় তা-ই ভাবি। এমন খাওয়া যে কপালে ছিল তাও কোনোদিন ভাবিনি। মহাশ্মশান ক্ষেত্রে, অবধূতাশ্রমে, ভৈরবীর হাতে। বলি, 'ভুল হয়ে গেছে।'

যোগো ভ্রূকুটি করে হাসে। গোপীদাস দাড়ি গোঁফে মাখিয়ে খায়। যোগো ভাজার দিকে চোখ রেখে বলে, 'তোমার চিতোবাবাজীর লক্ষণ ভালো না গোপীদাদা।'

'ক্যানে?'

'অবধূত ঠিক বইলেছে। ই আশ্রমে থাইকলে অনাচার হত্যে পারে।'

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠি, 'না না, সে কী!'

গোপীদাস আর যোগো দু'জনেই হেসে ওঠে। গোপীদাস বলে, 'অনাচার ক্যানে গ ঠাকরুন। সি তো রসিকের আচরণ গ।'

আমি খাওয়া থামিয়ে দু'জনের দিকে চেয়ে থাকি। লজ্জাও করে বিব্রতও হই। যেগে হাত তুলে মারার ভঙ্গি করে বলে, 'দ্যাখ ক্যানে, তবু হাঁ করে চেয়ে থাকে। ভাত খা চিতে, ভাত খা।'

যাক, ঠাট্টা তবু ঠাট্টাই। যোগোর সম্বোধনে বচনে ভাষণে সেটা আরো বেশী করে বোঝা যায়। তার চেয়ে বেশী তার প্রীতি আর বন্ধুত্ব যেন নতুন সুরে বাজে। মাঝখানে যেটুকু বা সংশয়ের অস্পষ্টতা থাকে সেটুকুও কাটিয়ে দেয়।

আমাদের খাওয়া হয়ে গেলে যোগো সব গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখে। আমরা পাত ফেলে দিয়ে হাত মুখ ধুই। যোগো ততক্ষণে উনুন আর দাওয়া লেপে নেয়। ভাবি, সে হয়তো চান করে এসে খাবে। গোপীদাস আর আমি ঘরে গিয়ে বসি।

গোপীদাস জিজ্ঞেস করে, 'বাবাজী কি রাতটো বক্রেশ্বরেই থাইকবে?'

'কোথায় থাকব?'

আমার অবাক হওয়া দেখে সে বলে, 'ক্যানে, ইখানেই থাইকবে, ই ঘরে।'

বক্রেশ্বরে আর কেন থাকব তা জানি না। নতুন করে কিছু দেখবার আছে বলে মনে হয় না। তবু এই মুহূর্তে মনে হয় একটা রাত্র থেকে গেলে ক্ষতি কী? এই মহাশ্মশান, উষ্ণ কুণ্ড, শত শত মন্দির, বক্রেশ্বরের খোয়াই গাছপালা সব মিলিয়ে কেমন একটা উদাস বৈরাগ্যে গাম্ভীর্য। অথচ ঘরছাড়া মনকে এখানে কে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। ডাক দিয়ে বসায়। একটা অচেনা আকর্ষণে টানে।

কিন্তু এই ঘরে! শুধু যে ব্রহ্মানন্দ অবধূতের মুখ মনে পড়ে তা না। ঘরের কোণে অজগরের খাঁচা, বেড়ার গায়ে নরমুণ্ডের কঙ্কাল—ভাবতেই অস্বস্তি লাগে।

গোপীদাস হেসে বলে, 'কী বাবাজী, ইদিক উদিক দেইখছ যে? সাপের জন্যে ভয় লাইগছে? কোনো ভয় নাই। অনেক থেক্যেছি ই ঘরে। খাঁচা থেক্যা সাপ বের হতে পাইরবে না। আমি তো থাইকব তোমার কাছেই।'

সেটা একটা ভরসা। কিন্তু তা যেন হলো, অবধূত মশাই এসে যে অনাচারের দায়ে ত্রিশূল খুঁচিয়ে দণ্ড দেবেন না তা জানব কেমন করে। জিজ্ঞেস করি, 'আর অবধূত?'

গোপীদাস হেসে আমার পিঠে হাত দেয়। বলে ওঠে, 'অই অই, উয়ার কথায় ভয় লাইগছে তোমার? উ ভারী ভালো লোক গ বাবাজী। যদি আসে কথাবার্তা শুইনলে

বুইঝবে। উসব উয়ার মুখের কথা, ভৈরবীর সাথে বিবাদ হইয়েছে তা-ই।'

তবু যেন ভরসা পাই না। মাঝ রাত্রে এসে হুংকার দিলেই হলো। যোগোমতী রক্ষাকর্ত্রী আছে। কিন্তু বিড়ম্বনা রোধ করা যাবে কি না কে জানে।

গোপীদাস আবার বলে, 'আর যদি নিতান্ত তোমার মন না চায় অন্যত্তর থাইকতে পারি। গাঁয়ে যেইয়ে থাইকতে পারি। ঠান্ডার দিন, তা-ই। তা না হল্যে যিখানে সিখানে রাতটো কেট্যা যেত। একটুক কইসে গড়ায়ে লাও, তা'পরে ঘুর‍্যে ফির‍্যে দেইখে ঠিক করা যাবে।'

সে-ই ভালো। সেরকম দেখলে সন্ধ্যাবেলার বাস ধরে দুবরাজপুরে চলে যেতে বাধা কী। দুবরাজপুর ইস্টিশনে একটা রাত কেটে যাবে। কিন্তু সব যেন কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমার আর গোপীদাসের ধূমপান শেষ হয়ে যায়। তারপরেও অনেকখানি সময় পার হয়ে গেল। ভৈরবীর এখনো দেখা নেই।

জিজ্ঞেস করি, 'উনি কোথায় গেলেন?'

'কে, যোগোদিদি? বাইরে বস্যে, খাইচ্ছে বোধ হয়।'

কিন্তু তা কেমন করে হবে! খাবার তো সব ঘরেই তোলা হয়েছে। যোগো যে খাবার বেড়ে নিয়ে যায়নি, তা দেখেছি। বাইরের দাওয়ায় কারুর কোনো সাড়া-শব্দও নেই। বলি, 'খাবার তো সব ঘরেই ঢাকা দেওয়া রয়েছে।'

গোপীদাসের একটু ঝিমানো ভাব এসেছিল। মুখ তুলে চেয়ে বলে, 'তা-ই তো। গেল কোথা। লাইতে যেইয়ে কি এত দেরি কইরবে?'

গোপীদাসের সঙ্গে আমিও চোখ তুলে দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাই। সেখানে শিবমন্দিরের মাথায় গায়ে, গাছের ডালে পাতায় বিকেলের পড়ন্ত রোদ। ছায়ার বিস্তার বেশী, ফাঁকে ফাঁকে পড়ন্ত বেলার লাল রোদ।

গোপীদাস ডেকে ওঠে, 'অই গ যোগো দিদি, বাইরে আছ নাকি?'

নেই সেই বিষয়ে সন্দেহ কী। থাকলে এতক্ষণে তার সাড়া পাওয়া যেত। কিন্তু অবাক হয়ে শুনি তার গলার শব্দ আসে বাইরের দাওয়া থেকে, 'আছি।'

আছে! গোপীদাস আর আমি দু'জনেই চোখাচোখি করি। গোপীদাস জিজ্ঞেস করে, 'লাইতে যাও নাই?'

বাইরে থেকে জবাব আসে, 'সি আমার সকালবেলাই হয়্যা যেইছে।'

'খাবে না?'

জবাব আসে না আর। অতিথির খাওয়া হয়ে গেলে সে খাবে তা-ই জানতাম। গোপীদাস আবার জিজ্ঞস করে, 'খাবে না ঠাকরুন?'

কেমন যেন উদাস গলায় আওয়াজ আসে, 'খাবো পরে।'

ব্যাপারটা কেমন যেন ধন্দ ধরায়। যোগোমতী ঠিক সুরে যেন বাজছে না। গোপীদাস ওঠে। আমিও কৌতূহল না চাপতে পেরে তার পিছু পিছু যাই। দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি ভৈরবী দুই হাঁটুতে মাথা রেখে চুপচাপ বসে আছে বাইরের দাওয়ায়। আমাদের দেখে একটু লজ্জা পেয়ে হাসে। গোপীদাস বলে, 'ক্যানে, পরে আবার কখন খাবে গ?'

যোগো বলে, 'রাতে খাবো!'

বলে আবার হাসে। কিন্তু সে-ই বেসুর। কেমন একটা খটকা লাগে তার হাসি দেখে। চোখের কোল দুটি এখন যেন আরো বেশী বসা মনে হয়। তীক্ষ্ম মুখটি যেন আগের থেকে শীর্ণ দেখায়। খিদের জন্য কি না জানি না। কিন্তু সাত তাড়াতাড়ি আমাদের রেঁধে-বেড়ে খাওয়ালে, তারপরে নিজে সব গুছিয়ে চুপচাপ বসে আছে!

দেখে ভালো লাগে না। মন খারাপ হয়ে যায়।

গোপীদাস আবার অবাক হয়ে বলে, 'রাতে খাবে কী গ। গোটা দিন না খেইয়ো থাইকবে?'

যোগো কোনো কথা বলে না। সে দূরের দিকে চেয়ে থাকে। আর সেই মুহূর্তেই সহসা আমার মনে একটা চমক লেগে যায়। মনে হয় আজকের গোটা দিনটিই শুধু না। হয়তো এমন কয়েকটা গোটা দিনরাত্রিই না-খেয়ে কেটেছে। আমি ঘরের বাইরে এসে বলি, 'এটা ভিলো লাগছে না। আপনি খেয়ে নিন।'

যোগো মুখ তুলে ভুরু কোঁচকায়। বলে, 'আবার আপুনি আগ্‌গা কইরছ?'

বলি, 'তা না হয় করব না। কিন্তু খেয়ে নিতে হবে।'

যোগো কথা এড়িয়ে যায়। গোপীদাসকে বলে, 'দেইখছ তো তোমার চিতে-বাবাজীকে। আমার জন্যে মইরছে।'

অনায়াসে বলে উঠি, 'মরছি।'

'বাবা রে! সত্যি সত্যি মরো না যেন।'

সে চোখ ঘুরিয়ে ঘাড় বাঁকায়। গোপীদাস বলে, 'কিন্তু খেয়ে লাও যোগোদিদি।'

যোগো কী বলবার জন্যে মুখ তোলে। হঠাৎ আবার মুখ নামিয়ে নেয়। আবার যখন মুখ তোলে তখন তার ভাব আলাদা। বলে, 'গোপীদাদা উদিকে তো একজন এলেকাটার ঘরে যেইয়ে সাধন-ভজন শিখাল্‌ছে। মদ গাঁজাও খুব চইলছে। পেটে ক'টা দানা পইড়েছে একবার জিগেস করগা দেখি।'

বলে যেন রুষ্ট কোপে ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর আমার বুকের কাছে হঠাৎ যেন একটা খোঁচা লেগে যায়। খোঁচা লেগে ব্যথা করে ওঠে। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থাকি। তা-ই তো পরমের মুখ চেয়ে মরমের বসে থাকা। রেঁধেবেড়ে তাড়াতাড়ি অতিথিকে খাওয়ানো যায়। অতিথি যদি দেবতা, তার বড় দেবতাও তো আছে। সে সাতপাকের পতি না হোক, পতির চেয়ে বড়। সে যে গৃহত্যাগিণী তাঁতীবউয়ের সতীত্বের সুন্দর। নারীত্বের একমাত্র নয়। জাতিকুলমান সকলই আন্। সে আর যা-ই করুক, তবু সে সেই মানুষ, যার জন্যে সব ত্যাগ, শ্মশানবাস। তাকে রেখে কি যোগোমতী খেতে পারে কখনো!

আমি যেমন থমকে যাই গোপীদাসও তেমনি। কারুর মুখে হঠাৎ কোনো কথা যোগায় না। যোগো আবার নিজের মনেই বলে, 'কী বইলব বলো। এমনিতেই তো হাঁড়ি চড়ে না! তা রোজ রোজ দু' বেলা না খেল্যেও এখন আর কষ্ট হয় না, এক বেলাতেই যথেষ্ট। অথচ, ই মানুষের কিসের অভাব ছিল। দ্যাখ যেইয়ে তার ঘরের ভাত কে খায় তার ঠিক নাই। শিবঠাকুর শ্মশানে বস্যে ভিক্ষে কইরছে।'

যোগো চুপ করে। আমরা কেউ কথা বলতে পারি না। একটু পরে সে আবার বলে, 'রোজ রোজ বেড়ে দেবো এত ভাগ্য করি নাই। আর যদি বা একবেলা দিতে পারি তা-ই বা কে ল্যায়, কে খায়।'

মুখ তুলে গোপীদাসের দিকে চেয়ে বলে, 'তোমরা রাগ কর্যো নাই গোপীদাদা। ঠান্ডার সময় কিছু লষ্ট হবেক নাই। চারজনার ভাত রেঁধেছি, একজনের ভাত হাঁড়িতে পড়্যে থাইকবে?'

গোপীদাস বলে, 'দু'জনারটোই বা থাইকবে ক্যানে?'

যোগো হাসে। গোপীদাস আমার দিকে চেয়ে বলে, 'চলো তো বাবাজী, অবধূতকে ধইরে লিয়ে আসি।'

'বইস ক্যানে। লিজেই আইসবে।'

গোপীদাস দাড়ি ঝাঁকিয়ে ঘাড় নাড়ে। বলে, 'না, সে আসাতে চইলবে না।

আইসবে তো জানি, যাবে কোথা। কিন্তুক এখন খেইয়ে যেত্যে হবে। চলো তো বাবাজী, চলো।'

আমার মনে একটু দ্বিধা। যা মূর্তি দেখেছি সামনে যেতে ভরসা পাই না। সেখানে গিয়ে কী দেখব তা-ই বা কে জানে। একবার ভৈরবীর দিকে তাকাই। তারপর গোপীদাসের সঙ্গে যাই। কয়েকটা মন্দিরের এপাশ-ওপাশ দিয়ে উঁচুনিচু খোয়াইয়ের ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে একটু পুবে গিয়ে প্রায় একটা হেলেপড়া ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। ছোট নিচু বেড়ার ঘর। মাথার খড় প্রায় নেই। তার বদলে নানান গাছের ডালপালা পাতা দিয়ে খড়ের অভাব মেটানোর চেষ্টা হয়েছে। দরজাটা খোলা। দিনের বেলাও ভিতরটা অন্ধকার। কারুর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

গোপীদাস আওয়াজ করে, 'জয়গুরু। বেহ্মালন্দদাদা আছ নাকি?'

কোনো সাড়া নেই। তবে একজনের দেখা পাওয়া যায়। সে দরজার সামনে এসে অচেনা মানুষদের দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে থাকে। চোখে তার সন্দেহ, কৌতূহলও বটে। তারপরে একটু যেন ভয়ে ভয়ে, ভাব জমাবার ভাব করে ল্যাজ নাড়ে। শ্মশানের সারমেয় বটে, কালো কুচকুচে রং, হলদে চোখ।

গোপীদাস এগিয়ে যেতেই, শ্মশানবাসীটি ঘরের বাইরে এসে একটু দূরে সরে যায়। গোপীদাস নিজের মনেই বলে, 'কেউ নাই নাকি! অই গ বেহ্মালন্দদাদা, কোথা গেল্যে?'

ভিতর থেকে কেমন যেন চমক খাওয়া মোটা গলা ভেসে আসে, 'কে?'

স্বরেতেই মালুম দেয়, কণ্ঠস্বর ব্রহ্মানন্দ অবধূতেরই বা। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ কুকুরটিও কি এ ঘরের বাসিন্দা নাকি! নাকি, শ্মশানবাসীদের প্রাণিজগতেও কোনো ভেদাভেদ নেই।

গোপীদাস আর এগোয় না। একবার আমার দিকে দেখে, বলে, 'আমি গোপীদাস। একবার বাইরে এইস।'

এবার আর চমক খাওয়া স্বর না। প্রশ্ন আসে, 'ক্যানে, কী হইয়েছে?'

'এইস ক্যানে একবার।'

'তুমি এইস ক্যানে।'

পাল্টা ডাক আসে। গোপীদাস আবার আমার দিকে তাকায়। তার চোখ দেখে বুঝতে পারি, ঘরে ঢুকতে দ্বিধা। দ্বিধার কারণ, আর একজনের কথা ভেবে। ব্রহ্মানন্দ যাকে এ ঘরে সাধন-ভজন শেখাচ্ছে, যার জন্যে সে যোগোমতী ত্যাগ করে আশ্রমছাড়া হয়েছে। কিন্তু গরজ কার? গোপীদাসের না ব্রহ্মানন্দর। গোপীদাসেরই। তার গরজের পিছনে, যোগোমতীর উপবাসী মুখখানি জেগে আছে। অতএব, সে পায়ে পায়ে খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, মাথা গলিয়ে দেয় ভিতরে। এদিক ওদিক দেখে, ঘরের ভিতর এক পা দিয়ে, জিজ্ঞেস করে, 'একলা রইয়েছ নাকি?'

মোটা গলার জবাব শুনি, 'হুঁ। সংসারে একলা এস্যেছি, একলা যাবো।'

গোপীদাসের গলায়, সনিঃশ্বাসে বাজে, 'জয় গুরু!'

আমারও তো সেই অবস্থা। অবধূত মহাশয়ের গলায় যেন কেমন বৈরাগ্যের সুর বাজে। ও-বেলায় জোয়ারের তোড়। এ-বেলায় ভাঁটার ঢল। প্রকৃতির নিয়মই তা-ই।

গোপীদাস পিছন ফিরে আমার দিকে চায়। বিটলে বাউল পিট পিট করে, আমাকে দেখে চোখ টিপে ইশারা করে। ডাক দিয়ে বলে, 'এইস গ চিতেবাবাজী, দাদার কাছে এইস।'

আমিও তার পিছু পিছু ঘরে গিয়ে ঢুকি। এমনিতেই বিকেল হয়ে গিয়েছে। ঘরের ভিতরটা যেন ঘুটঘুটি অন্ধকার গুহার মতো। প্রথমে কিছুই চোখে পড়ে না।

কেবল একটা বিশ্রী গন্ধ নাকের মধ্যে ঢোকে। তারপরেই, অন্ধকার কোণে, দুটি চোখের সঙ্গে আমার দৃষ্টি মেলে। চোখ তো না, দুই খণ্ড অঙ্গার। আস্তে আস্তে গোটা মানুষটা জেগে ওঠে। ব্রহ্মানন্দ অবধূত বটে। আমার মনে পড়ে গেল, ধূমাবতীর সাধক, শাক্ত কার্তিক ঘোষালের কথা। সন্দিগ্ধ প্রশ্ন শোনা যায়, 'ইটি কে?'

গোপীদাস অতি বিনয়ে জানায়, শান্তিনিকেতন থেকে বাবাজীর আগমন। বক্রেশ্বর দেখবে, সেই সঙ্গে, অবধূত দর্শন করবে, তা-ই সে আমাকে নিয়ে এসেছে। সে যতক্ষণ বলে, ততক্ষণই অবধূত আমার দিকে চেয়ে থাকে। সেই অবসরে, যোগো-মতীর কথা আমার মনে পড়ে যায়, 'হুঁ, মনে হতো কন্দর্পকান্তি।' অবধূত কন্দর্প-কান্তি ছিল, সন্দেহ নেই। এই মদরক্ত চক্ষু, মাথার জট পাকানো চুল, চোখের কোলে গর্ত, কয়েক দিনের আকাটা গোঁফ দাড়ি, পোড়া মূর্তির মধ্যে, কোথায় যেন এখনো সেই একদা কন্দর্পকান্তিকে দেখা যায়।

গোপীদাস তার পাশে আমাকে বসতে বলে, জিজ্ঞেস করে, 'আর কে যেন ছিল হেঁথাকে?'

ব্রহ্মানন্দ উদাস চোখে দরজা দিয়ে বাইরে তাকায়। বলে, 'উ মাগীটা বড় বজ্জাত, খেদিয়ে দিইচি।'

গোপীদাস চোখের কোণে একবার আমাকে দেখে নেয়। কিন্তু কিছু বলে না। আমি মনে মনে বলি, জয় গুরু, আপদ গিয়েছে। কিন্তু, এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এত বড় বিপ্লব ঘটে গেল কেমন করে। ও-বেলার কথা শুনে তো কিছুই বুঝতে পারিনি। অবধূত নিজেই নিজের মনে বলে, 'উ সব হল্য রাক্‌কুসি বরাহী। সাধনের নামে খালি কামাচার কইরবে আর গিলবে। উয়াদের কোনো শক্তি নাই।'

গোপীদাস ভালো মানুষটির মতো, আঙুলে আঙুল ঠোকে। আওয়াজ করে, 'অ।'

অবধূত বলে ওঠে, 'হুঁ, শক্তি বইলব কাকে? যার মধ্যে প্রকৃত শক্তি আছে। তুমি নামেও ব্যাশ্যা কুলটা, কামেও তা-ই, আবার মনেও তা-ই, তা হল্যে আর কী রইল তোমার? রইল খালি একখানি স্ত্রী অঙ্গ। ঝাঁটা মার শালা, ঝাঁটা মার। হুঁ, শাস্ত্রে আছে বট্যে, কুলটাও শক্তি হত্যে পারে, কিন্তু মনে মনে তোমাকে সাধিকা হত্যে হব্যে, তব্যে তো।'

গোপীদাস সায় দিয়ে বলে, 'হুঁ, সবাই কি আর আমাদিগের যোগোদিদি।'

তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ গর্জন, 'কী বইললে, তোম্যাদিগের যোগোদিদি? উয়ার কথা আর আমাকে বল্যো না।'

অবধূত বসেছিল একভাবে। গোটা শরীরে ঝটকা মেরে, পাশ ফিরে বসে। চোখ জ্বলে ধক্‌ধক্‌। বলে, 'উয়ার বড় বাড় হইয়েছে। অত্‌ত কিসের হ্যা, আঁ? আমাকে খালি ঠাট্টা অচ্ছেদ্দা কইরবে, গালাগাল দিবে। ক্যানে, আমি যদি সিরকম হত্যাম, তা হল্যে তোমাকে আজ একপাল বিটাবিটির হাত ধর্য্যে ভিখ্ মাঙতে যেতে হত্য। আমি যদি লম্পট হত্যাম, কে তোমাকে দেইখত, আঁ? উ নিজেকে দুর্গা ভাবে, না কালী ভাবে। উয়ার অহংকার দেইখলে আর কাছকে যেত্যে ইচ্ছা করে নাই। তা উ ছাড়া কি আর আমার শক্তি জুটবে নাই?'

গোপীদাস চুপ। আমার তো কথাই নেই। কিন্তু যা জুটছে, অবধূতের নিজের ভাষায়, সব তো 'রাক্‌কুসি বরাহী।' অর্থাৎ শূকরী।

গোপীদাস একটু পরে, বড় মিহি সুরে বাজে, 'সি, তোমার মতন সাধকের শক্তি জুইটবে না, তা-ই কি হয়। তবে হুঁ, আমাদিগের যোগোদিদির মেজাজটা একটুকু চড়া।'

'একটুক? একটুক বইলছ তুমি. আঁ। হ্যা লয় তাই চোপা কইরবে, আবার আমাকে মাইরতে আসে? উ ভুল্যো গেইছে, আমি কে, আর উ কে আঁ?'

বেসুর, বেসুর, বড্ড বেসুর বাজে যেন। অবধূতের গলায় যেন কার্তিক ঘোষালের স্বর শুনি। কথায় যেন সেই ইঙ্গিত, সে হলো কার্তিক ঘোষাল আর যোগোমতী এক তন্তুবায় বধূ। কিন্তু আর কি সে হিসাবের দিন আছে! শ্মশানে, সাধনে, আশ্রমে আর গ্রাম-গৃহের কী সম্পর্ক!

তবে পিরীতি বিবাদে কোন্ বাদানুবাদ না চলে? কারণ, পিরীতি থাকলে সব রীতিতেই কথা বলা যায়। গোপীদাস আবার বলে, 'তব্যে বেহ্মালন্দদাদা যা-ই বলো আর তা-ই বলো, যোগোদিদি তোমাকে ছাড়া কিছু জানে না। অমন পবিত্তির সাধিকা আর হয় না।'

বলে গোপীদাস কপালে হাত ঠেকায়। ব্রহ্মানন্দ চুপ করে থাকে। ইচ্ছা না যে, চুপ করে থাকে। প্রতিবাদযোগ্য কথা যেন ঠিক হাতড়ে পায় না। আর আমি দেখি, গোপীদাসকে। বুড়া বাউলের দাড়ির ভাঁজে ভাঁজে, ধূর্তামির চোখ দেখে বুঝতে পারি। কোন্ সাপের কোন্ মন্ত্র, ঠিক জানা আছে। চোখের কোণে বারে বারেই আমার দিকে চায়। অর্থাৎ ইশারায় জিজ্ঞাসা, 'কেমন বুইঝছ বাবাজী?'

ব্রহ্মানন্দ আর একবার ঝেঁজে ওঠে, 'বেচাল আমি দেইখতে পারি না। অই বেচাল দেখ্যেই মাগীটাকে খেদিয়ে দিলাম। গাঁ থেক্যা জনার্দন চক্কোত্তি বেগুনপোড়া আর ভাত পাঠিয়ে দিইছিল। মদন হাঁড়ি ভরতি কর‍্যো কারণ রেখ্যে গেল্‌ছিল। ফিরে এস্যা দেখি, পিটি লোক খেয়্যা লিয়েছে, আঁ? তুমি ইখানে খালি গিলতে এইসেছ, আঁ? আবার হাইসতে হাইসতে বইলছে, সব খেয়্যা লিয়েছি। তব্যে র‍্যা মাগী, আঁ, তুই খালি ইসন কইরতে এইসেছিস? যা, দূর হ. দূর হয়্যা যা। কারুর বেচাল আমি সইব না, সি তুমি যেই হও।'

গোপীদাস তেমনি নরম মিহি সুরে সনিশ্বাসে বলে. 'আর উদিকে দ্যাখ যেইয়ে, যোগোদিদি রেঁধে-বেড়ে বইসে আছে। আমাদিগে খাইয়ে-দাইয়ে সব তুলে পেড়ে রেখ্যে দিয়েছে। জিগেস কইরতে বইললে, তোমাদিগের অবধূতকে না খাইয়ে কোনোদিন খাই নাই, আজ কী কর‍্যো খাবো বলো। ছি ছি ছি, আগে জাইনলে আমরাই কি খেতাম। যোগোদিদির মুখখানি দেখ্যা বড় কষ্ট লাইগল।'

গোপীদাস চুপ করে। অবধূতও নীরব। একটু পরে আর একবার পাশ ফিরে বসে বলে. 'ক্যানে, খেয়্যা লিলেই হত্য।'

কিন্তু গলার স্বরে তেমন ঝাঁজ নেই। গোপীদাস বলে, 'উ কথা বল্যো না দাদা। তা-ই কি হয়, না হইয়েছে কোনো দিন!'

অবধূত আবার চুপ। গোপীদাসও। তবে. তার জপানোর ভাবখানা একবার দেখ। এদিকে হাত জোড় করে বসে। ওদিকে, আমার দিকে ঘন ঘন চোখের কোণে দৃষ্টিপাত। আর এতক্ষণে সহসাই যেন আমার দিকে অবধূতের দৃষ্টি পড়ে। জিজ্ঞেস করে, 'তোমার নাম কী?'

নাম বলি। তারপরে ধামের ঠিকানা. কর্মের সন্ধান সবই হয়। গোপীদাস এক ফাঁকে নিবেদন করে, 'দাদা. তা হল্যে আর দেরি ক্যানে। তোমারও পেটে কিছু নাই, উদিকে একজন উপবাস দিচ্ছে। চলো যাই।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপরে অবধূত বচন. 'যেত্যে ইচ্ছা করে নাই।'

'কিন্তুক যেত্যে হবে।'

'ইদারটো যেইছি চলো, কিন্তু মন্দ কিছু বইললে আমি থাইকব নাই।'

'সি আমি দেইখব, তুমি চলো।'

গোপীদাস উঠে দাঁড়ায়। আমিও। একটু পরে অবধূতও গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। কারণবারির উত্তাল অবস্থা আর নেই। অনেকখানি ঝিমিয়ে গিয়েছে। ঘরের বাইরে

এসে মনে মনে বলি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি!...

অবধূতাশ্রমের কাছে এসেই গোপীদাস হাঁক পাড়ে, 'যোগোদিদি, ভাত বাড় গ, দাদার ভাত বাড়।'

আমরা ঘরে ঢুকতেই যোগোমতী মেঝে থেকে উঠে বসে। সে শুয়ে ছিল বোধ হয়। আমাদের সঙ্গে ব্রহ্মানন্দকে দেখে সে ঘোমটা টেনে দেয়। দিয়ে, বাইরে চলে যায়। তারপরে দেখ অবধূতের চেহারা। যে লোককে সাধ্য-সাধনা করে ধরে বেঁধে নিয়ে আসতে হয়, এ কি সেই লোকের মুখ! যেন, নতুন মানুষের, কুটুমের সঙ্কোচ। শান্ত মুখখানি নিচু করে থাকে।

যোগো আবার ঘরে আসে। আসন পেতে জল গড়িয়ে, আমাদের মতো পাতা পেতেই খেতে দেয়। অবধূত কোনো কথা না বলে বসে পড়ে। আমি গোপীদাস একটু দূরে বসি। কেউ কোনো কথা বলে না।

কিন্তু ভাতে হাত দিয়েই, অবধূতের চেতন জাগে। যোগোর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার আছে তো?'

যোগোর দৃষ্টি মাটির দিকে। মুখের ভাব শক্ত, নির্বিকার। ভাতের হাঁড়ি, ডালের কড়া, সব এনে বসিয়ে দেয় অবধূতের সামনে। অর্থাৎ দেখে নাও, আছে কি না-আছে। এর বেশী কথা খরচ করতে সে নারাজ।

অবধূত প্রায় হুংকার দিয়ে ওঠে, 'জয় ধূমাবতী।' তারপরেই মুখে গরাস পুরে দেয়। মুখে ভাত নিয়েই বলে, 'বুইঝলে গোপীদাস, সাধন কইরতে হল্যো—।'

যোগোমতী অমনি ঘাড় বাঁকিয়ে, গোপীদাসের দিকে তাকায়। গোপীদাস বলে ওঠে, 'পরে হব্যে, খেইয়ে লাও ক্যানে আগে।'

অবধূতও চকিতে একবার যোগোর দিকে দেখে, চুপ করে খেতে থাকে। তার খাওয়া দেখে ভাবতে ইচ্ছা করে, মা ধূমাবতী এত ক্ষুধা কোথায় রেখেছিলেন। আর এই মুহূর্তে, আর একটি কথাও আমার মনে পড়ে যায়। যে-মানুষ আজ এখানে বসে এভাবে খাচ্ছে, সেই কার্তিক ঘোষালের ঘরে অন্নের অভাব নেই। সংসারের সেই সুখ ছেড়ে, এ মানুষ, যোগোমতীকে নিয়ে শ্মশানে এসে আশ্রম করেছে। যখন যেমন জোটে, তখন তেমন খায় পরে।

আমি সাধন-ভজন জানি না, বুঝি না। কিন্তু এই যে মানুষ খাচ্ছে, ক্ষুধার তৃপ্তি মুখে ছড়িয়ে পড়ছে, যোগোমতীর দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছে, তাকে দেখে তো একবারও মনে হয় না, একটা উচ্ছৃঙ্খল বাউণ্ডুলে জীবন যাপনের জন্যে সে ঘুরছে। বিকার? বিকারগ্রস্ত মানুষের আর যা-ই থাক, দুঃখ বহনের শক্তি থাকে না। মনের বিকার নিয়ে সংসারের সুখভোগের মধ্যেই তার দিন চলত ভালো।

কী জানি, শেষ নাহি যার, তার শেষ কথা কে বলবে! মানুষের শেষ কোথায়, তল কোন্ গভীরে, কতটুকু জানি। কেবল অবধূতকে দেখে, তার খাওয়া দেখে, সেই মত্ত রুদ্র মানুষটিকে এখন সহসা অন্যরকম লাগে। সংসার ছেড়ে যে শ্মশানে এসেছে। অথচ সংসারের সকল দুঃখের ঢেউয়ে যে মানুষ দোলে, নানা রূপে জাগে। হয়তো সংসারে সুখের চৌহদ্দি ছোট লেগেছিল। শ্মশানের অসীমেই সে বাঁচে।

অবধূতের খাওয়া হয়ে যাবার পর, সেই পাতাতেই যোগো নিজের ভাত বাড়ে। কথাটি না, তাকে সাধাসাধিও করতে হয় না। আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসে খেতে থাকে। আর অবধূত হাত ধুয়ে, ঘরে এসেই, একেবারে গলা ছেড়ে গান ধরে দেয়,

'ই সব ক্ষ্যাপা মায়ের খেলা।
যার মায়ায় ত্রিভোবন বিভোলা
মাগীর আপ্তভাবে গুপ্ত লীলা—।'

যোগো মুখ ফিরিয়ে একবার গোপীদাস আর একবার আমার দিকে চায়। কিন্তু এবার ক্রুদ্ধ কোপ কটাক্ষ না। ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক। আর অবধূত যেন ক্ষুধার্ত শিশুটি, পেট ভরতেই গানের গলা খুলে যায়। সে আমাদের কাছে এসে বসে। বলে, 'বুইঝলে হে, আসল জিনিস, তার চেহারা আলাদা। অ্যাই তোমার মায়ের ভাবের কথা বইলছি।'

বলে আবার গান ধরে,

'সগুণে নির্গুণে বাধায়ে বিবাদ
ঢ্যালা দিয়ে ভাইঙ্‌ছে ঢ্যালা
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজী
নারাজ কেবল কাজের বেলা।'...

যোগো আর একবার মুখ ফিরিয়ে চায়। দেখি তার চোখে মুখে হাসির ছটা। মনে হয়, নতুন রূপে আর এক মানভঞ্জনের পালা দেখি।

আমি আমার সিগারেটের বাক্স বের করে অবধূতের দিকে এগিয়ে দিই। বলি, 'নিন, সিগারেট খান।'

সদানন্দ গলায় বলে, 'দাও। ইতে আমার কিছু হয় না, তবু একটুক টানি।'

সিগারেটটা ধরিয়ে আবার গান ধরে,

কালী তুই ভাবিস,
আমি তোর ছলনা বুঝি না।
ডাকিনীরে দিস আপন বেশ
তোর লজ্জা করে না।
ধন্দে ফেল্যে করিস খেলা
মনে ভাবিস জানি না,
এবার দেখ মাগী তোর ডাকিনীরে
খোলস ছেড়্যে করে কান্না।

গোপীদাস 'জয় গুরু' ধ্বনি দিয়ে ওঠে। কিন্তু লক্ষ্য যোগোমতীর দিকে। ওদিক থেকে যোগোমতীও পাশ ফিরে তার সঙ্গে চোখাচোখি করে। এখন যোগোর মুখে কেবল হাসির ছটা না—অমন যে দপদপানো মুখখানি, চোখ দুটি, তাও যেন লাজে লাজানো ব্রীড়ায় ভরা। সার্থক অবধূত। স্তুতি জানে বটে। নিজেই জানিয়ে দেয়, এলেকাটার ঘরে যে শক্তির বেশে এসেছিল, সে আসলে ডাকিনী। তার সঙ্গে অবধূতের কী সম্পর্ক। কালী এখন উপলক্ষ। গানের লক্ষ্য যোগোমতী। যে তার শক্তিস্বরূপিণী ভৈরবী।

কিন্তু গোপীদাসের 'জয় গুরু' শুনেই ব্রহ্মানন্দ হেঁকে ওঠে, 'জয় গুরু লয় হে, জয় মা বল্‌ শালো।'

গোপীদাস হেসে বলে, 'অই একই কথা। নামেতে কী যায় আসে।'

'না বাবা, আমি তোমাদিগের উই নেড়া নেড়ীতে নাই।'

গোপীদাস বলে, 'থাইকবে ক্যানে। তুমি ভৈরব ভৈরবীতে থাকো।'

যোগোর ঘোমটার পাশে এলানো চুল। চুলের পাশে মুখ, আবার মুখ ফিরিয়ে গোপীদাসের দিকে চোখাচোখি করে।

অবধূত আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কিসে আছ হে?'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'আমি?'

'হুঁ, ভৈরব ভৈরবীতে, না নেড়া নেড়ীতে?'

জবাব দেয় গোপীদাস, 'বাবাজী তো আর তোমার আমার মতন ভেক ধর্যা নাই।

যেমন দেইখছ সিরকমই আছে।'

ব্রহ্মানন্দ বলে, 'তব্যে মাগ্ ভাতারে আছে বল্য।'

গোপীদাসই দাড়ি দুলিয়ে বলে, 'না গ।'

'তব্যে?'

গোপীদাস চোখ ঢুলঢুল করে বলে, 'নাম যাতে তাতেই দাও গা দাদা, সবাই যাতে আছে, বাবাজীও তাতেই অছে, বুইঝলে? বাবাজী প্রেমে আছে।'

প্রায় যেন ভয়ে ভয়েই উৎকর্ণ ছিলাম, কী না জানি বলে গোপীদাস। কথা শুনে অবাক খুশিতে তাকাই তার দিকে। কোন্ প্রেমের কথা বলে সে জানি না। প্রেমে আছি কী না, তাও জানি না। কিন্তু গোপীদাসের মনে এমন ভাবনা সহসা আসে কোথা থেকে। এমন কথা পায় কোথায়। এমন একটা জবাব তো মাথা কুটলেও নিজের ভাষায় খুঁজে পেতাম না।

গোপীদাস আমার দিকে চেয়ে ঘাড় দোলায়। অবধূত ঝেঁজে বাজে, 'ধু-র শালো, সব কথাতেই খালি প্রেম। তোমাদিগের উসব চালাকি। বাবাজীর সাধন ভজন আছে কী না বল্য।'

'ক্যানে থাইকবে না। বাবাজী প্রেম ভজে য্যা।'

'শালো, আবার প্রেম?'

'ক্যানে নয় গ। তোমার সাধন ভজনে প্রেম নাই? যোগো দিদির সাথে প্রেম না থাইকলে কি ভইজাতে পারতে?'

বলে চোখের ইশারায় আবার যোগোকে দেখিয়ে দেয়। অবধূত একেবারে বিগলিত হয়ে মোটা গলায় গলগলিয়ে হেসে ওঠে। বড় ভালো লেগেছে কথাটা। অবধূতের প্রাণ মাতানো কথা যেন। বলে, 'শুইনলি গ ভৈরবী, শালো জয় গুরুওয়ালাটো বেজায় বদ।'

ভৈরবী কিন্তু চোখাচোখি করে গোপীদাসের সঙ্গেই। তারপরে পাতা গুটিয়ে উঠে পড়ে। খাওয়া হয়ে গিয়েছে তার। অবধূতের কথার কোনো জবাব দেয় না। তাতে কিছু যায় আসে না। ভৈরব চিৎকার করে গান ধরে দেয়,

'মা তোরে পুজ্যে মন তুষ্ট হয় না।
ইবার পুজা ছেড়্যে পিছে ঘুইরব
খুঁজ্যে লিব ঠিকানা।'

যোগো ততক্ষণে ঘরের বাইরে। এঁটো পাতা ফেলে দিয়ে এসে হাঁড়িকুড়ি তুলে পেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে আসে। ইতিমধ্যে ঘরে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বাইরের সামান্য আলোয় এখনো সবই অস্পষ্ট দেখা যায়। এর পরে আর যাবে না। বাইরেও অন্ধকার ঘনিয়ে এল বলে।

যোগো দেশলাই জ্বালিয়ে মাটিতে গাঁথা ত্রিশূলের কাছে প্রদীপ জ্বালে। সিঁদুর-মাখা ত্রিশূল যেন নতুন রূপ পায়। সেই সঙ্গে নরমুণ্ডের কঙ্কালটিও। প্রদীপের কাঁপানো শীষে নরমুণ্ডও যেন কাঁপে।

গোপীদাস আমাকে ইশারা করে। বলে, 'চলো বাবাজী, আমরা একটুক ঘুর্যে বেড়্যে দেখ্যে আসি।'

সে উঠে দাঁড়ায়। আমিও। যোগো তাড়াতাড়ি ফিরে অবাক হয়ে বলে, 'কুথাক গ?'

অবধূত বলে ওঠে, 'আরে, তোমার বাবাজীর সঙ্গে আলাপ করা হল্য না খ্যা।'

গোপীদাস বলে, 'হব্যে, হব্যে, চল্যে যেছি না তো। বাবাজীকে একটুক দেখিয়ে লিয়ে আসি, বাবার থানটো দেখুক ক্যানে।'

যোগো কাছে এসে আমার দিকে চেয়ে গোপীদাসকে বলে, 'দেখা গোপীদাদা,

যিখানে সিখানে লিয়ে যেইয়ো না। জায়গা ভালো না, ডাকিনীতে ঘাড় ভেঙ্যা দিবে।'

অবধূত তাড়াতাড়ি সায় দেয়, 'হুঁ, খোব হোশিয়ার।'

যোগোর ভুরু কুঁচকে ওঠে। এক মুহূর্তের জন্যে। অর্থাৎ, তার কথায় তুমি অবধূত কেন কথা বলতে এস। এখনো আড়ির পালা চলছে না?

যাবার আগে যোগো আমাকে বলে, 'দেখ্য বাবাজী, ইখানে চিতে মারার কল আছে।'

এবার আমিও জবাব দিই, 'সাবধানে থাকব।'

যোগো আবার বলে ওঠে, 'গোপীদাদা, ঠ্যাঙাবাবাকে দেখিয়ে লিয়ে এস ক্যানে।'

গোপীদাস বলে, 'দেখাব।'

অবধূত অমনি বলে ওঠে, 'হুঁ, হুঁ, তবে দূর থেক্যা, উ শালোকে বিশ্বাস নাই। হাত্যের কাছকে পেল্যে দিবে ক্যানে দুচ্চার ঘা।'

ব্যাপার বুঝতে পারি না। ঠ্যাঙাবাবা কে, দু'চার ঘা দেবেই বা কেন। কাকেই বা দেবে।

গোপীদাস শব্দ করে, 'হুঁ, হুঁ, জানি।'

'রাতে খাব্যে তো?'

যোগোর কথা শুনে গোপীদাস দাঁড়ায়। আমার দিকে তাকায়। আমি একবাক্যে অসম্মতি জানাই, 'আমার দরকার নেই।'

'আমারও নাই।'

অবধূত বলে, 'কারুরই নাই।'

অতএব বেরিয়ে পড়া যায়।

বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। সেই সঙ্গে শীতের বাতাসও। হঠাৎ পশ্চিমা হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। বক্রেশ্বর গ্রামের আকাশে ক্ষীণ এক ফালি চাঁদ। প্রথমা না দ্বিতীয়া কে জানে। পাশে এক নক্ষত্র। আরো কয়েকটি তারা অস্পষ্ট ঝিকিমিকি করে আকাশের কাছে ও দূরে। ঝিঁঝি ডাকে একটানা নানা বিচিত্র স্বরে। শিবমন্দিরগুলোর চেহারা বদলাতে থাকে। নিরেট কিম্ভূত স্থির কালো মূর্তির মতো দেখায়। জঙ্গলের ঝুপসি ঝাড় বাতাসে কাঁপে, দোলে, শব্দ ওঠে হায় হায়।

কয়েক পা অগ্রসর হতে না হতেই শিয়াল ডেকে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যেই যেন বক্রেশ্বরের রূপ বদলে যায়। দিনের আলোয় সে ছিল এক, রাত্রে আর-এক। দিনের আলোয় যাকে চিনেছিলাম, রাতের অন্ধকারে সে অচেনা। এখন মনে হয়, যা দেখেছিলাম তার চেয়ে অদেখাতেই বেশী রয়ে গিয়েছে। কী রয়েছে, তা জানি না। এখনো দেখত পাই না। যা আছে তা যেন আমারই অনুভূতির গভীরে, দূরে অন্ধকারে।

গোপীদাস কোথা দিয়ে নিয়ে যায়, পথ চিনতে পারি না। সহসা এক মন্দির জেগে ওঠে অন্ধকারে। টিম টিম বাতির আলোয় দু'-এক মানুষমূর্তি মন্দিরের সামনে। গোপীদাস বলে, 'কালী মন্দির।'

একবার কাছে গিয়ে দেখি। নরমুণ্ডমালিনী ঘোর কৃষ্ণা ভয়ংকরী, লোলজিহ্বাবদনী, নগ্না চতুর্ভুজা। বক্রেশ্বরের কালো রাত্রির সকল অন্ধকার গায়ে নিয়ে এ যেন আর-এক রূপ। বাইরে বেরিয়ে এসেই চোখে পড়ে দক্ষিণে আগুনের শিখা। কালো রাত্রির বুকে লাল আগুনের শিখা কেবল বাতাসে ঝাপটা খাওয়া ঊর্ধ্বমুখী না। নীচে তার অবিকল প্রতিবিম্ব দেখি পাপহরার নাতিশীতোষ্ণ জলে। চিতা জ্বলে, বক্রেশ্বর মহাশ্মশান। এ চিতা কখনো নেবে না।

দূর থেকে আগুনের আলোয় যাদের অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দেখি, কাছে যেতে যেতে তারা স্পষ্ট হয়। একটি না, তিনটি চিতা জ্বলে। যাদের চিতা জ্বলে তাদের যারা শেষ বিদায় দিতে এসেছে তাদের মধ্যে সব রকম মানুষ। গুচ্ছ গুচ্ছ হেথা হোথা

ছড়ানো ছিটানো মেয়ে-পুরুষ। তার মধ্যে সব থেকে বেশী নজরে পড়ে দু'-তিন বছরের শিশুকে বুকে জড়ানো একটি যুবতীকে। চোখে তার জল নেই, দৃষ্টি তার চিতার আগুনে। সেই আগুনের আলোয় এখনো তার এলো চুলের সিঁথায় অস্পষ্ট সিঁদুরের দাগ। মুছেও তুলতে পারেনি। কিন্তু হাত তার শূন্য। শাঁখা ভেঙেছে, নোয়া খুলেছে।

অবাক লাগে শিশুটির দিকে চেয়ে। সে আগুনের দিকে চেয়ে নেই। গায়ে মোটা কাঁথার মতো কী একটা জড়ানো। সে যুবতীর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। মনে করি যুবতী তার মা। মায়ের মুখের দিকেই সে অবুঝ অবাক চোখে চেয়ে রয়েছে।

একটা গুচ্ছের মধ্যে এক বৃদ্ধা কাঁদে বুক চাপড়ে চাপড়ে। কী যেন বলেও, বুঝতে পারি না। কে যেন সান্ত্বনা দেয়, 'কাইন্‌লে কী হব্যে বল্য।'

তাতে কান্না বাড়ে। আর অবাক হয়ে শুনি শ্মশানরক্ষী, শ্মশানবাসী কালো এক ডোম পুরুষ বলে, 'তা বইললে কি মন মানে। কেন্দ্যে লিক।'

অথচ মহাশ্মশানের অনির্বাণ চিতা সে প্রতিদিন জ্বালে। কান্না কিছুই ফিরিয়ে দেয় না, তার থেকে আর কে বেশী জানে। কিন্তু তারই আপত্তি নেই কান্নায়।

পাপহরার জলের কাছে কে এক গেরুয়া পরা মানুষ বসে। মাথায় চুলের জটা। চিতার আগুনের দিকে চেয়ে বসে আছে। এক গেরুয়াধারিণী কপালে সিন্দুরচর্চিতা প্রৌঢ়া ত্রিশূল নিয়ে একদল শ্মশানবাসীর সঙ্গে বসে কী যেন বলছে। কেউ কেউ তার কথা শুনছে। এখানে-ওখানে ছাইগাদায় এলিয়ে পড়ে আছে কয়েকটা কুকুর। তাদের আধবোজা চোখের দৃষ্টি যেন চিতার আগুনের দিকে। ওদের কিসের আশা কে জানে!

দাঁড়িয়েছিলাম। কাঁধে স্পর্শ লাগতে ফিরে তাকাই। গোপীদাস আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। বাতাসে ঝাপটা খায় তার দাড়ি। বলে, 'চলো, আর একটুক ঘুর্‌য়ে আসি।'

সে আমাকে টানে। পুব দিকে নিয়ে যায়। স্নানের সময় দুপুরে দেখেছিলাম অঘোরী বাবাব আশ্রম। সামনে খোলা কুঁড়েঘরের মতো একটি ঠাঁই। তার মধ্যে টিমটিম করে আলো জ্বলে। সেই অস্পষ্ট আলোয় চোখ ফিরিয়ে সেই অশ্বত্থের গোড়ার দিকে তাকাই। স্তূপীকৃত নরমুণ্ডের কঙ্কাল। যেন দলা পাকিয়ে ভিড় করে আছে অনেক-গুলো মুখ। তাদের মুখে মাংস নেই, চামড়া নেই, কোনো অভিব্যক্তি নেই। অথচ চোখের কালো গর্তে যেন দৃষ্টি আছে। যেন এদের নিষ্প্রাণ মৃত কঙ্কাল বলে মনে হয় না। নির্নিমেষ তাদের দৃষ্টি, কিন্তু ভয়ংকর বীভৎস লাগে না। বরং, কাছে থেকেও তারা যেন কোন্ দূর ওপার থেকে ভাবলেশহীন মুখে চেয়ে আছে।

এরা কারা কে জানে। কেন পুড়ে ছাই হয়নি তাও জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হয় না। এরা কে নারী, কে পুরুষ, কিছু লেখা নেই। নাম-ধাম পরিচয় কিছু ছিল একদা। এখন এক পরিচয়, কঙ্কালের মুণ্ড।

কুঁড়েতে টিমটিম বাতি, বাইরে অন্ধকার। গাছের আঁধার কোলে কঙ্কাল করোটি। সহসা জোনাকি জ্বলে চিকচিক। পাপহরার জলে ঈষৎ চঞ্চলতা। বাতাসের ঝাপটায় কাঁপে। তাই যেন জলের গায়ে ঝিকিমিকি দেখা যায়। একেবারে স্থির থাকলে দেখা যেতো না। ওপারে গাছপালা মন্দির। সর্বোচ্চ বক্রেশ্বর চূড়া। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি। আমি কী মানি বা না-মানি তার চেয়ে বড় আমার সমগ্র চেতনা জুড়ে যেন এক অস্পষ্ট অচিন ঘোর জীবনেরই দুয়ারে দাঁড়িয়ে আমি যেন কোন্ এক লোকে, কোন্ এক দূর কালে দাঁড়িয়ে আছি। যে কালের হিসাব পিছনে ফিরে পাই না। সামনে তাকিয়েও অথই পারাবার। আমি নিজেও আমার এই অনুভূতিকে চিনি না।

এ সময়ে কার ভারী মোটা গলা শোনা যায়, 'কে উখানে?'

গোপীদাস জবাব দেয়, 'চিনতে লাইরবে গ, আমি গোপীদাস।'

কোথা থেকে জিজ্ঞাসা আসে টের পাই না। দিক অনুমান হয় পুবে। দক্ষিণে এক পাকা বাড়ি। দিনেও দেখেছি। রাত্রে তার কোথাও আলো নেই, ইমারতের অবয়ব মাত্র। এখানে এই পরিবেশে বাড়িটা যেন বেমানান অপরিচিত। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে না কার ঘর, কার বসত।

গোপীদাস ডাকে, 'এইস বাবাজী। আমার হাত ধর্যে এইস।'

সে নিজেই আমার হাত ধরে। পাপহরার ধার দিয়ে আরো পুবে নিয়ে যায়। ছোট ছোট গাছপালা জঙ্গল, ফাঁকা ফাঁকা লাগে চারদিক। তবু তার মধ্যেই মানুষের অস্পষ্ট অস্ফুট সাড়া পাওয়া যায়। বাতির ক্ষীণ রেশ চোখে পড়ে।

কিছু দূর যাবার পরেই পুরুষের তীক্ষ্ন তীব্র চিৎকারে আর গালাগালিতে শ্রবণ যেন জ্বলে যায়, 'শালো কুত্তার বাচ্চা...।'

বাকী কথা উচ্চারণ করা দায়। তারপরেই প্রচণ্ড মারের শব্দ। চটাপট থাপ্পড়, গুপ্ গুপ্ ঘুষি। শুনতে শুনতে ততক্ষণে একটা কুঁড়ের অদূরে দাঁড়িয়ে পড়েছি। সেখান থেকে অবাক সভয়ে দেখি, এক জটাওয়ালা নেংটি-পরা খালি-গা মানুষ এক-জনকে প্রহার করছে। যাকে করছে, সে উপুড় হয়ে পড়ে মার খাচ্ছে। তার কোনো আত্মরক্ষার চেষ্টা নেই, প্রতিবাদ নেই। কেবল একটা কান্নার শব্দ উঠছে অন্ধকারের মধ্যে। গোপীদাস বলে, 'ঠ্যাঙাবাবা।'

জিজ্ঞেস করি, 'মারছে কেন?'

'ঠ্যাঙা বাবা য্যা। সবাই বলে, উনি যদি দয়া কর্যে মারেন, তব্যে জাইনবে উদ্ধার হল্যো। তব্যে জাইনবে, মনবাঞ্ছা পূরণ হব্যে।'

কী ভীষণ বিপদের কথা! একজন জটাধারী ক্ষ্যাপা এই মারাত্মক বুলিতে গালাগাল দিয়ে এমন ভয়ংকর উত্তম-মধ্যম দিলে উদ্ধার, পুণ্য, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ! প্রহারের বহর দেখে দূর থেকে আমারই গায়ের মধ্যে কেমন করে ওঠে। অথচ, যে মার খাচ্ছে, সে শুধু কাঁদে না। আমি তার আর্ত আকুতি শুনি, 'অই গ বাবা, মার, আমাকে মের্যে ফ্যাল গ, আমার পাপ ঘুচুক।'

এমন গভীর আর্ত আকুতি আর কখনো শুনিনি। কেবল একজনের গানের কথাই আমার মনে পড়ে যায়, "আরো আরো আরো, প্রভু আরো—এমনি করে আমায় মারো।"

এ লোকটার এত বিশ্বাস কোথা থেকে আসে। বিনামূল্যের শৌখীন বিশ্বাস না। আপন রক্তমাংস নিগ্রহের মূল্যে এ বিশ্বাস কেমন করে আসে। আমি তো ভাবতে পারি না। তার কান্নার মধ্যে দেহের কষ্ট ফোটে না। প্রাণের যন্ত্রনা জাগে। আমি তো কোনো দিনও পারব না। একজন জটাধারী নেংটি-পরা মানুষকে দূরের কথা, যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করি না, তিনি এলেও পারব কী না জানি না। অথচ এই মার খাওয়া মানুষকে কেবল কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকারের মানুষ ভেবে ঠোঁট বাঁকিয়ে চলে যাবো, সে সাহস আমার নেই। আমি তা ভাবতে পারি না।

আর যে মারছে, সে যেন কী এক ভয়ংকর রুদ্ররাগে জ্বলে উঠছে। ভীষণ আক্রোশে পিটিয়ে মারছে। আমি যেন শারীরিক অস্বস্তিতে বলে উঠি, 'কী আশ্চর্য, কতক্ষণ মারবে? মেরে ফেলবে নাকি লোকটাকে?'

গোপীদাস বলে, 'না বাবাজী, মের্যে ফেইলবে না। সিরকম শুনি নাই কখনো।'

গোপীদাসের গলা শুনে বুঝতে পারি, মারের আঘাত যেন তার গায়েও লাগছে। তার গলার স্বর অস্পষ্ট, ভেজা ভেজা।

কুঁড়েটার কাছে আরো লোকজন রয়েছে। সামান্য একটা লম্ফর আলোয় চুপচাপ

বসে থাকা মূর্তিগুলোকে যেন এই জগতের মানুষ বলে মনে হয় না। কিম্ভূত তাদের আকৃতি। মুখচোখ পরিষ্কার দেখা যায় না। দলা দলা অন্ধকারের মধ্যে তাদের কালো মূর্তির গায়ে মাঝে মাঝে লম্ফর আলো হিলহিলানো সাপের মতো কেঁপে কেঁপে উঠছে। আলো যেন ছুবলে ছুবলে খাচ্ছে। জটাধারী কুৎসিত গালাগালিতে চিৎকার করছে। তার মধ্যেই মেয়ে-গলায় কে যেন জয়ধ্বনি করে ওঠে, 'জয় ঠ্যাঙাবাবা, জয় ঠ্যাঙাবাবা।'

ঠ্যাংবাবা! অদ্ভুত নাম। অদ্ভুত ঘটনা। এমন আশ্চর্য বিচিত্র ব্যাপার কি পৃথিবীর আর কোথাও ঘটে!

গোপীদাস বলে, 'এতদিন খালি শুইনছি, ওয়াঁকে চখে দেখি নাই। এই পেথম দেইখলাম। শুইনেছি, বেশী দিন আসেন নাই, বেশী দিন থাকেন না কোথাও।'

প্রহারটা হঠাৎই থামে। ঠ্যাঙাবাবা যেন ক্লান্ত হয়ে সরে গিয়ে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে পড়েন। গালাগালও বন্ধ হয়ে যায়। মুখটা পাশ ফিরিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে থাকেন।

গোপীদাস জিজ্ঞেস করে, 'কাছে যেইয়ে দেইখবে বাবাজী?'

'অ্যাঁ?' শুনেই চমকাই। বলি, 'কিন্তু যদি মারে?'

গোপীদাস আমার পিঠে হাত দেয়। বলে, 'এখন আর মাইরবেন না। মার খাবার পিত্যেশে সবাই আসে। উনি সবাইকে মারেন না।'

তবু ভয়। তবু কৌতূহলও। পায়ে পায়ে যাই গোপীদাসের সঙ্গে। দরজা বলে কিছু নেই। সামনে বেড়াও নেই। কোনোরকমে একটা বেড়া ঘিরে মাথায় আচ্ছাদন করা হয়েছে। সামনে বসে থাকা লোকগুলো সবাই একসঙ্গে আমাদের দিকে ফিরে তাকায়। চোখে তাদের বিস্ময়ের থেকে অনুসন্ধিৎসাই বেশী। চোখে জিজ্ঞাসা, এরা আবার কী চায়!

এদের মধ্যে দু'জন স্ত্রীলোকও রয়েছে। একজন আমাদের দেখে আবার নিচু হয়ে কী যেন করতে থাকে। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, গাঁজার ছিলিম তৈরি হচ্ছে। আলো-অন্ধকারে দোলানো কাঁপানো ছায়া-ছায়া মানুষগুলো যেন বিষণ্ণ। কী একটা আর্ত ভাব যেন তাদের মুখে। সকলেই এরা মার খেতে এসেছে। সকলেই এরা উদ্ধারের আশায় বসে। গভীর বিশ্বাসেই তারা বিষণ্ণ, আর্ত। মার-খাওয়া মানুষটি তখনো পড়ে আছে। ফুলে ফুলে কাঁদছে। ঠ্যাঙাবাবা আমাদের দিকে ফিরেও তাকাল না। কাছে থেকে দেখে মনে হয়, মানুষটির খাড়া তীক্ষ্ন নাক। চোখ দু'টি বড়। মুখখানা একদা যেন সুন্দরই ছিল। মুখে কোনো প্রসন্নতা নেই। এখন মনে হয়, রাগ বা ঘৃণাও নেই। যেন কিসের একটা যন্ত্রণার জ্বালা গভীর ভাবনায় স্থির চোখ, অথচ একটা কষ্টের ছাপ। কে ইনি? কেন মারেন? কেন এদের এত বিশ্বাস?

ধর্মাধর্ম জানি না, বুঝি না। ভাবি কত বৈচিত্র্য এই সংসারে। কত বিচিত্র মানুষ। এমন বিচিত্র দৃশ্য যে কোনোদিন দেখব, কয়েক মুহূর্ত আগেও ভাবিনি। আমার চলার পথের ধারে শেষ পর্যন্ত কেবল বুকের কাছে দু' হাত জড়ো করে স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

আবার গায়ে স্পর্শ অনুভব করি। গোপীদাস বলে, 'চলো বাবাজী, এইস।'

তার সঙ্গে পুবের দিকেই এগিয়ে যাই, দক্ষিণে বাঁক নিয়ে। গোপীদাস কথা বলে না। আমি কথা বলতে পারি না। মনে হয়, কথা সবই ফুরিয়েছে। রাস্তা ক্রমে ঢালুতে নেমে যায়। পায়ের নিচে পাথর অনুভূত হয়। তার সঙ্গে বালি। সামনের দিগন্ত অনেকখানি খোলা মনে হয়। প্রকৃতি অনেকখানি উদার, আকাশ বড় হয়ে ওঠে। দূরে নিচে একটি জলের রেখা দেখতে পাই। বক্রেশ্বর নদীর আর এক দিক। পশ্চিম থেকে

বক্রেশ্বরের উত্তরে বেষ্টন করে নদী দক্ষিণে নেমে চলেছে।

সহসাই সামনে দেখি একটি পাতার ঘর। কাঠের আগুন জ্বলছে ঘরের সামনে। সেই আগুনের আলোয় দেখি, সম্পূর্ণ নগ্ন পুরুষ বসে আছে। চুপচাপ, নির্বিকার। যেন দূরান্তের প্রকৃতির দিকে চেয়ে রয়েছে। ঘরের মধ্যে অস্পষ্ট ছায়ার মতো এক মূর্তি। সে নারী না পুরুষ, বুঝতে পারি না।

আমি গোপীদাসের দিকে তাকাই। গোপীদাস আমার দিকে। একটু ঘাড় দুলিয়ে ইশারা করে। অপেক্ষা করতে বলে। নগ্ন পুরুষ আমাদের দিকে ফিরে তাকায় না। একে ধ্যানমগ্নতা বলি না। চোখ খোলা, দৃষ্টি দূরান্তে—অন্ধকারের কোথায় যেন। গায়ে ভস্ম মাখা। ঋজু শক্ত শরীর। রুদ্রাক্ষ বা কোনো কিছুরই মালা বালা একটিও নেই। সিঁদুর বা আর কিছুর রেখা টিকা নেই। চুল দাড়ি সকলই মুণ্ডিত। এমনই নির্বিকার নিশ্চল স্থির, মনে হয় ধাতব মূর্তি। অন্যথায়, যেমন গাছ, পাথর, মাটির ঢিবি, তেমনি প্রকৃতিরই আর এক অঙ্গ।

কিন্তু শীত বলেও কি কিছু নেই। পশ্চিমা বাতাসের তীক্ষ্ন প্রখর ঝাপটাও কি একটু কাতর করে না। দূরে অন্ধকারের প্রকৃতিতে কী রূপ দেখে এমন বাহ্যজ্ঞান-শূন্য! যেন এই জগতে নেই। যেন জগৎ পারাবারের ওপারে অলক্ষ্যে চলে কিসের লেনাদেনা। তুমি আমি নেই সেথায়।

ঘরের ভিতর থেকে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি বেরিয়ে আসে। একটি পুরুষ। অল্প অল্প চুল দাড়ি আছে। তারও দেখি, আমাদের দিকে নজর নেই। সামনে এসে জ্বলন্ত কাঠ খুঁচিয়ে আগুন উস্‌কে দেয়। দিয়ে সেখানেই বসে। কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই। ঝুপসি ঝাড়ে বাতাসের ঝাপটা। ঝিঁঝির ডাক। অরণ্যের অধিবাসীদের কাছে শুনেছিলাম, ঝিঁঝি কাঁদে।

গোপীদাস সহসা বসে পড়ে প্রণাম করে। নগ্ন পুরুষ সেই সময় মুখ ফেরায়। গোপীদাসের দিকে চায়। ভেবেছিলাম মানুষটি মৌন। কিন্তু এখন তার গলার স্বরও শুনি, 'একখান গান শুনিয়ে যাও।'

সে আমার দিকে ফিরে তাকায় না। কিন্তু তার চোখ দুটি যেন ভাসা ভাসা ভেজা ভেজা। দৃষ্টি গভীর। মুখে হাসি নেই, অথচ কী এক অনির্বচনীয় ভাব। তীব্রতা নেই, তীক্ষ্নতা নেই, ঝিলিক ঝলক নেই। মাধুর্য গাম্ভীর্য গভীরতা স্নিগ্ধতা সব মিলিয়ে একেবারে অন্যরকম। গলার স্বরটিও সেইরকম। যেন মুগ্ধতায় গভীর। মহাশ্মশানবাসীর আর এক রূপ।

গোপীদাসের দেখি আর এক রূপ। যেন তার সারা শরীরে তরঙ্গ খেলে যায়। চোখে নতুন জ্যোতি। বুড়া লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। হাত জোড় করেই বলে, 'জয় গুরু জয় গুরু, এত কিরপা কইরলে গ।'

তারপরে গান তো না, যেন গানের সুরে ভাঙা গলায় হাত নেড়ে নেড়ে নগ্ন পুরুষকে জিজ্ঞেস করে,

> 'মনের মানুষ খুঁইজলে কোথা মিলে?
> আমি (আমি গ আমি আমি) আমি
> দুখের দুখী দেইখতে পাই না,
> আত্মসুখী সক্কলে।
> বল, খুঁইজলে কোথা মিলে?'

নগ্ন পুরুষ মাথা ঝাঁকায়, আপন মনে ঘাড় নাড়ে। গোপীদাস তার দিকে দু' পা এগিয়ে নিচু হয়ে বলে, 'বইলবে গ, কোথা মিলে?'

গোপীদাসের বুড়া চোখ ছলছলায়। নগ্ন পুরুষ বলে, 'খুঁইজতে খুঁইজতে।'

গোপীদাস চোখ বুজে ঘাড় নাড়ে। নিজের বুকে ঠুকে গায়,

'কিন্তুন আপগরজী ভাব জান্যে না
গরজে সদাই চল্যে
গরজ পেল্যে গরজ কথা
কইবে গ হেস্যে খেল্যে।
(বল্য বল্য বল্য গ, পায়ে ধরি বল্য)
খুঁইজলে কোথা মিলে।'

একতারা দোতারা বাঁয়া ডুপ্‌কি কিছু নেই। তবু যেন মনে হয়, গোপীদাসের ঘড়ঘড়ে গলায় এমন চাপা নিচু মিঠে সুর আর শুনিনি। এমন আত্মভোলা মগ্ন রূপও দেখিনি। নগ্ন পুরুষের শরীরেও যেন কিসের তরঙ্গ লাগে। যেন মধু পানে গোলাপী নেশার আমেজে চোখ ঢুলুঢুলু। আবার বলে, 'খুঁইজতে, খুঁইজতে।'

গোপীদাসের চোখ টলটলিয়ে দাড়ি ভিজে যায়। তেমনি ঘাড় নাড়ে। গায়,

'কিন্তুন খুঁইজ কী বল্যে
পরোয়ানা হারিয়ে গেল্যে।
(কাছারির পরোয়ানাটো হারিয়ে ফেইলেছি যে গ।
তল্লাশ কইরব কী দিয়ে?)
এখন পইড়েছি মায়াজালে
কত দোষ কইরেছি আমি
শ্রীগুরুর চরণ তল্যে।
বল খুঁইজব কী ছল্যে।'

নগ্ন পুরুষের শরীর হঠাৎ কেঁপে কেঁপে ওঠে। মুখভরা হাসি, চোখ ফেটে জল পড়ে। হাসে না ফুঁপিয়ে কাঁদে, বুঝি না। হঠাৎ দিগম্বর উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ায়। বুড়া বাউল সেই হাতে গিয়ে ঝাঁপ খেয়ে আলিঙ্গন নেয়। দুহুঁ দোঁহা জড়ানো জড়িয়ে দোলে। এ ওর কাঁধে মাথা রাখে, হাসে না কাঁদে এখনো বুঝি না। দিগম্বর বলে, 'সবই খুঁইজতে খুঁইজতে মিলে। হারানোটাও মিলে।'

এ ভাবের নাম কী, আমি জানি না। কিসের ভাব তাও জানি না। ছাইভস্ম মাখা এক দিগম্বর পুরুষ, এই একটু আগেও স্থির। যেন এই জগতে নেই, এখানে দেহ রেখে ভিন্ জগতে কী করছিল। তারপরেই দেখ, কোথা থেকে কথা আসে। গান জাগে। চোখের জল গলে। শরীরে শরীরে হিল্লোলিয়া যায় তরঙ্গ। ল্যাংটায় জড়ায় গেরুয়া আলখাল্লা ধরে।

যেন মুহূর্তেই কি ঘটে যায়। যখন ঘটে, তখন বোধ হয় এমনি করেই ঘটে। আমি বুঝি না কিছু, কিন্তু দু'জনের আলিঙ্গন, হাসি-কান্না, সবই আমার ভিতরেও যেন কিসের স্রোত বহিয়ে দেয়। তার কুলুকুলু নাদ শুনি। অর্থ বুঝি না। শ্মশানের চারদিকে অন্ধকার—আগুনের আলোয় কী এক বিস্ময়কর গভীর মানবলীলা।

দৃশ্যের পর দৃশ্য। ব্রহ্মানন্দ অবধূত ভৈরবী যোগোমতী শ্মশানের চিতা অঘোরী আশ্রমের নরমুণ্ডের কঙ্কাল, মুক্তির প্রহার, ভাবের আলিঙ্গন। যেন সুর থেকে অন্য সুরে, তাল থেকে অন্য তালে। বিচিত্র রাগিণীতে ফিরি।

যে ঘর থেকে এসে আগুন উস্‌কে দিয়েছিল সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে এই দৃশ্য দেখে। তার চোখও জলে টলমল।

এক সময়ে দু'জনেই শান্ত হয়। দু'জনেই বসে। দু'জনেই চুপচাপ। আমি ভাবি, হঠাৎ কেমন করেই বা গানের কথা এল। গান শুনতে শুনতে এমন ভাবের উদয়ই বা হলো কেমন করে। দু'জনের চিন্ পরিচয় আছে বলে, গোপীদাসের মুখে শুনিনি। এই

নগ্ন পুরুষ কিসের সাধক, কোন্ পন্থী, কেমন তার সাধন পদ্ধতি, কিছুই জানি না।

নগ্ন পুরুষ চোখ বোজে। গোপীদাস বলে, 'যাই বাবা।'

চোখ না খুলেই সে বলে, 'এইস।'

গোপীদাস আমাকে ইশারা করে ডাকে। আগুনের আলো পেরিয়ে চারদিকেই অন্ধকার। এক ফালি চিকন চাঁদ এখন কোথায়, দেখতে পাই না। গোপীদাস আমার হাত ধরে। আমি জিজ্ঞেস করি, 'ইনি কে?'

গোপীদাসের গলায় এখনো ভাবের রেশ। ভেজা ভেজা মুগ্ধতা। বলে, 'জানি না বাবাজী, দেখি নাই কোনোদিন। এ তীর্থক্ষেত্তরে কত সোময় কত মহাপুরুষ আইসেন। কিছুদিন থাকেন, আবার চল্যে যান। এয়াঁকে আর দেখি নাই, তোমার ভাগ্যে দেইখতে পেল্যেম বাবাজী।'

অবাক হয়ে বলি, 'আমার ভাগ্যে কেন?'

'ক্যানে লয় বাবাজী। তুমি না এল্যে কি আসা হত্য। এয়াঁর মধ্যে শক্তি আছে, দেইখলেই মনে ল্যায়। এয়াঁর হইয়েছে, নিশ্চয় হইয়েছে, দেখ্যে বুইঝলে তো বাবাজী।'

কী হয়েছে, তা-ই বা জানব কেমন করে। জিজ্ঞেস করি, 'কী হয়েছে?'

'সিদ্ধি গ, সিদ্ধি। চখ-মুখের ভাব দেইখলে না! উনি পেইয়েছেন, খুঁইজতে খুঁইজতে পেইয়েছেন।'

'কী পেয়েছেন?'

'তা কি আমি জানি বাবাজী। কী পেল্যে সিদ্ধিলাভ হয়, পাতিতে কি তা জাইনতে পারে!

গোপীদাসের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সে চুপ করে পথ চলে। গভীর অন্ধকার আমার চারপাশে। ডাইনে বক্রেশ্বর নদী রেখে আমরা উত্তর বাঁকে চড়াইয়ে উঠতে থাকি। অন্ধের মতো চলি। অনুভূতিহীনের মতো শুনি। কী খোঁজে, কী পায়, কিসে সিদ্ধিলাভ ঘটে কিছুই জানি না। যে তার আপন খোঁজার নাম জানে না, হদিস পায় না, সে কেমন করে বুঝবে। তবু গোপীদাসের কথায় দিগম্বর মানুষটির মুখ আমার চোখে ভাসে। সংসারে অনেক দেখা মানুষের সঙ্গে সেই মুখের যেন অনেক অমিল। তার নির্বিকার নগ্নতা, স্নিগ্ধ দৃষ্টি, প্রসন্ন গম্ভীর মুখ, শিশুর মতো হাসি কান্না সব মিলিয়ে ভিন্ন! অন্য। খুঁজে ফিরে যে পায় তার রূপ কি এমনি? কে জানে। দীর্ঘশ্বাস সংক্রামক কিনা জানি না। অন্ধকার শ্মশান ও শিবক্ষেত্রের পথে আমারও দীর্ঘশ্বাস পড়ে। আর ভাবি, কত বিচিত্র, কত বিচিত্রতর এই মানুষের লীলা!

আমি জিজ্ঞেস করি, 'ইনি উলঙ্গ কেন?'

গোপীদাস বলে, 'আমিও সি কথাটা ভাবি বাবাজী, উনি ল্যাঙটা ক্যানে। আমি অঘোরীবাবাকে দেখ্যেছি। তিনিও ল্যাংটা ছিলেন। চুল দাড়ি ওয়াঁরও দেখি নাই। গায়ে যে কত কী মেখ্যে বস্যে থাইকতেন, অই গ, কোনো কিছুতে বিকার নাই। বাউলেরও বিকার থাইকতে নাই, তবে অঘোরীবাবা সব গায়ে মেখ্যে বইস্যে থাইকতেন। রস বিষ্ঠা সব। কারণবারি ছাড়া পান ছিল না। তাও বাবাজী কঙ্কালের খুলির খোলে। হাঁড়ির ভাত কঙ্কালের হাড় দিয়ে লাইড়তে দেখ্যেছি। গরম ভাতে ঘিয়ের মতন চিতার থেক্যে তুল্যে লিয়ে আসা মানুষের মাথার ঘিলুর ছিটা দিয়ে খেত্যে দেখ্যেছি। আমি অঘোরীবাবার চুল দাড়ি দেখি নাই। কিন্তুন ওঁয়াকে দেইখলে ভয় লাইগতো, সামনে যেত্যে বুক কাঁইপত্যো। আবার এ'য়ার দেখ, অন্যরকম। এ'য়ারও চুল দাড়ি নাই, ছাইভস্ম মাখা ল্যাংটা মানুষ, এই ঠান্ডায় বাইরে বস্যে রইয়েছেন,

ক্ষ্যাপা ভাবের কোনো লক্ষণ নাই। মুখখানি দেখলে তো, যেন ভাবের নদী। আনন্দের টেল্‌খেল্‌ হচ্ছে।...জয় গুরু। কার যে কী হয় জানি না।'

গোপীদাসও জানে না। সারা জীবন যার সাধনের সাধনায় গানের মন্ত্রে কেটে গেল, মানুষের আয়ুষ্কালের বিচারে যার সন্ধ্যা ঘনায় সেও জানে না। অচিনের পথ চলার অন্ধকারের মানুষ, আমার তো কোথাও ক্ষীণ রেশও নেই।

গোপীদাস আবার বলে, 'তবে বাবাজী, অঘোরপন্থী হল্যেই যে সব একরকম হব্যে তা নয়। আমার গুরুকে দেখ্যেছি, তিনিও ক্ষ্যাপা ছিলেন। ওলঙ্গ হয়্যে হেস্যে কেন্দ্যে ফিরতে দেইখ্যেছি। ধুলোবালি বিষ্ঠা গোবর, কোনো কিছুতে বিক্কার ছিল না। তবে সব সোময়ে লয়। যখন ক্ষ্যাপার দশা হইয়েছে তখন। উ যার হয় সি বোঝে। ক্যানে কিনা বাবাজী, ক্ষ্যাপা দশায় যখন গুরুকে দেখ্যেছি, তখন মনে হতো কী যন্তন্নায় যেন জ্বইলছেন গ, যেন জ্বইলে পুড়ে মইরছেন। খুব দুঃখ লাইগলে, মানুষ যেমন হেস্যে ওঠে, তেমনি হেস্যে উইঠতেন। আবার চখ-মুখ পাকিয়ে একে-বারে ডাক ছেড়ে হাঁক দিতেন, "তব্‌বে র‍্যা শালো, আমাকে তু ডুবাতে আইসছিস? আয় আয় ক্যানে।" বল্যে হাতে চ্যালা লিয়ে ছুইটতেন। কাকে যে মাইরতে যেত্যেন, দেইখতে পেত্যেম না।'...

বিচিত্র সেই জগতের, সেই মানুষদের কথা কিছুই বুঝি না। অঘোরীবাবা, গোপীদাসের গুরু, সদ্য দেখে আসা নগ্ন ভাবানন্দ পুরুষ। লোভ আর আকাঙ্ক্ষার পাপেই জীবন কাটে, তাই ভয় ফেরে আমার ভিতরে ছায়ার মতো। ক্ষ্যাপার কথা জানি কেবল আপন ভোগের বঞ্চনায়। অবিচারে যদি বা ক্ষিপ্ত হয়েছি, তা আমাকে সিদ্ধি-লাভের মুক্তি দেয়নি। তাই ভিন্‌ জগতের, ভিন্‌ কথায়, কেবল অবাক মানি। মানুষের অপার রহস্যের অন্ধকারে চোখ উদ্দীপ্ত করে চেয়ে থাকে।

অন্ধকারে সব ঠিক ঠাহর পাই না। মস্ত বড় এক গাছ। তার নিবিড় ঘন অন্ধকার তলে গোপীদাস দাঁড়ায়। কাছেই ঘর দেখা যায়। বাতি জ্বলে ঘরে, ফোকরে ফাকরে টের পাওয়া যায়। মানুষের অস্পষ্ট কথাবার্তাও শোনা যায়। অল্প একটু আগুনের শিখাও এক পাশে লক্ষ্য পড়ে।

গোপীদাস বলে, 'উটি মৌনীবাবার আশ্রম। ইটি হলো অক্ষয় বট।'

অক্ষয় বট নাম শুনলেই কল্পনার রূপ যায় বদলে। প্রয়াগের কথা মনে পড়ে যায়। এলাহাবাদের কেল্লার সীমানায় মাটির গর্ভে অক্ষয় বট নামে এক গাছের ডালের প্রদর্শনী হয় কুম্ভমেলার সময়ে। সেখানে ধূপদীপ জ্বলে, পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করে। দর্শনার্থী আর বট স্পর্শকামীরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। পয়সা দিয়ে চলে আসে।

কিন্তু এক সত্যান্বেষীর সাহায্যে আসল বটের চিহ্ন দেখেছিলাম, দুর্গের নিষিদ্ধ অন্য প্রান্তে। অতীত ইলাহাবাদের সেলিমের প্রাচীন প্রাসাদের ধারে। যেখানে দুর্গের প্রাকার-নীচে গঙ্গা বহে যায়। সেইখানে ছিল সেই অক্ষয় বট। যে বৃক্ষে উঠে একদা গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, অনেকে প্রাণ বিসর্জন দিতো। সেই তাদের পুণ্য। তাদের মুক্তি।

এখানেও দেখি এক অক্ষয় বট। যার অন্ধকার ঝুপসিতে জ্বলে জোনাকি মিটিমিটি। এই বটের তলাতেও আগুন জ্বলে। দুই তিন মানুষের অস্তিত্ব এখানে। সাধু না সংসারী কে জানে!

পথ পশ্চিমে চলে। গাছপালা শিব মন্দির মিলিয়ে অন্ধকার যেন অন্য রূপের নিবিড়তা পায়। অন্ধকারে বক্রেশ্বরের মন্দিরের চূড়া দেখে চিনতে পারি। প্রদক্ষিণের পর মন্দির এখন দক্ষিণের আকাশে।

তারপরেই ব্রহ্মানন্দ অবধূতাশ্রম দেখেই চিনতে পারি। উত্তর দিকের বাগান ঘুরে দক্ষিণ দরজায় যখন আসি, তখন ব্রহ্মানন্দর গলা শুনতে পাই, 'একটু পেসাদ কর‍্যে দে গ ভৈরবী। এত কষ্ট কর‍্যে মদনা বিটা দিয়ে গেল, দে, একটুক পাদোদক কর‍্যে দে।'

জবাবে শুনি, 'লাও, লাও, হইয়েছে। আমি আগুন কইরছি এখন।'

'তা করিস ক্যানে, আগে একটুক পেসাদ কর‍্যে দে।'

যোগোর গলা আর শোনা যায় না। দরজা বন্ধ, ঘটনা দেখতে পাই না। কেবল গোপীদাস নিচু স্বরে বলে, 'খোয়ারি চইলছে এখনো।'

তারপরে গলা তুলে আওয়াজ করে, 'জয় গুরু।'

এক আওয়াজেই দরজা খুলে যায়। ব্রহ্মানন্দ অবধূত দরজা খুলে দেয়। টিমটিমে বাতি। সেই আলোয় দেখি মেঝেতে মস্ত বড় এক মাটির পাড় বসানো ঘরের উত্তর ঘেঁষে। কুয়োর ভিতরে মাটির যেমন পাড় বসায় সেই জিনিস। আধ হাত উঁচু তার গা। দু'হাতে বৃত্তের ফাঁদ। তার মধ্যে মোটা মোটা শুকনো গাছের ডাল সাজানো হয়েছে। ফাঁকে ফাঁকে মেলাই ছোটখাটো কাঠের টুকরো।

পুবের বেড়া ঘেঁষে যেখানে ছেঁড়া চাটাই পাতা আছে, তার পাশেই ছোট এক মেটে কলসী। পাশে একটি নর করোটি। আমরা ঘরে ঢোকবার মুহূর্তেই যোগোকে দেখি, সে চাটাইয়ের সামনে থেকে মুখ ফিরিয়ে উঠে যায়। আঁচলটি তার মুখে চাপা এক হাত দিয়ে। সে গিয়ে বসে মাটির পাড়ের কাছে। কাঠ সাজিয়ে দিতে থাকে. কাঠ সাজাতে সাজাতেই উঠে এসেছিল বোধ হয়। কী যেন শুনছিলাম পেসাদ পাদোদক করে দেবার কথা। তা-ই করতেই উঠেছিল নাকি যোগো ঠাকরুন। কিন্তু কিসের পেসাদ, কিসের পাদোদক, কে জানে।

ব্রহ্মানন্দ ডেকে বসায়, 'এইস, এইস। কুথাক ঘুইরলে?'

গোপীদাস বসতে বসতে বলে, 'এই চান্দিকে একটো পাক দিয়ে এল্যেম।'

যোগো হঠাৎ উঠে দরজা খুলে বাইরে যায়। একটু পরেই আবার ফেরে। ছোট এক আঁটি খড় নিয়ে এসে কাউকে উদ্দেশ না করেই বলে, 'দিয়াশলাই দাও।'

অবধূত গোপীদাস পাপহরার ওপারের গল্প বলে। আমিই উঠে দেশলাই এগিয়ে দিই। যোগো তখন আমার দিকে চায়। তার চোখ দুটো যেন কেমন চকচক করে। বলে, 'বস্য।'

মাটির ওপরেই তার সামনে বসি। সে কাঠি জ্বেলে খড়ে লাগায়। খড়ের আগুন গুঁজে দেয় মাটির পাড়ের চারপাশে সাজানো শুকনো কাঠের মধ্যে। দেখতে দেখতে আগুন জ্বলে ওঠে। ঘরটা কাঁপানো আলোয় ভরে ওঠে।

সেই আলোয় দেখি যোগোমতীর কপালে মস্ত একটা টকটকে সিঁদুরের ফোঁটা। সিঁথিতেও দীর্ঘ রেখায় গাঢ় করে সিঁদুর টানা। পান চিবিয়েছে কি না ইতিমধ্যে কে জানে? ঠোঁট দুটো তা নইলে এত লাল হলো কেমন করে? পা দুখানি আলতায় রাঙানো। মুখে কি একটু রসেরও গন্ধ? আগুনের আলোয় তার কণ্ঠা আর বুকের উপরিভাগ যেন আরো রক্তাভ দেখায়। রুদ্রাক্ষের মালাটি কাপড়ের ওপরে বুকে দুলছে।

'কী দেইখছ?'

যোগো ঘাড় ফিরিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে। আমি যেন চমকে উঠি। বলে উঠি, 'না—হ্যাঁ মানে আপনাকে এখন অন্যরকম লাগছে।'

অবধূত মাটিতে ভর রেখে আগুনের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলে, 'কী, বাবাজী কী বইলছ 'হ?'

জবাবের প্রত্যাশা না করে ছোট লাল কলসী আর করোটি হাতে তুলে এগিয়ে নিয়ে আসে। ডেকে বলে, 'কই হে গোপীদাস, ইদিকে এইস।'

গোপীদাস এগিয়ে আসে। ভৈরবীর এক পাশে বসে অবধূত। আর এক পাশে আমি। আমার পাশে গোপীদাস। তারপরেই হঠাৎ চমকে দেখি, আরো দুটি কালো কুচকুচে জীব ঘরের অন্ধকার থেকে এসে আগুনের সামনে উপস্থিত হয়। ঘন ঘন লেজ নাড়ে, পিট্‌পিট্‌ করে চায়। অবধূত হাত তুলে বলে, 'বস্‌ হারামজাদীরা, কাছে এস্যে বস্‌।'

তৎক্ষণাৎ দুটিতেই একেবারে অবধূতের কোল ঘেঁষে এসে বসে। হাঁড়ির দিকে তাকায়। অবধূত বলে, 'খাবি?'

দুই সারমেয়-বালা লেজ নাড়ে। অবধূত আদর করে হেসে বাজে, 'হারামজাদী!' যোগোকে জিজ্ঞেস করে, 'পেসাদ করেছ?'

যোগোমতী ঘাড় কাত করে সম্মতি জানায়। তারপরে আমার দিকে চেয়ে হাসে। অবধূত করোটি ডুবিয়ে কলসী থেকে একটু কারণ তুলে বাঁ হাতের গণ্ডুষে নেয়। কালো জীব দুটির মুখের সামনে এগিয়ে দেয়। দেখি, দুটিতেই চক্‌ চক্‌ করে চেটে খেয়ে নেয়। চমৎকার! এমন আজব দৃশ্য জীবনে কখনো দেখিনি। অপরাধ না হলে কারণকে যদি মদ বলি, তবে কুকুরকে কোনো দিন ও বস্তু খেতে দেখিনি।

যোগোমতী হঠাৎ বলে ওঠে, 'চিতেবাবাজীকেও দাও।'

'তুমি বইলবে তবে?'

করোটিতে মদ তুলে অবধূত আমার দিকে এগিয়ে দেয়, 'এইস হে বাবাজী, লাও।'

আমি? কানে ভুল শুনিনি তো! শ্মশানের কারণবারি, তায় আবার নর করোটিতে! তাড়াতাড়ি বলি, 'না, না, আমার দরকার নেই।'

'দরকার নেই কী হে?'

প্রায় হুমকে ওঠে ভৈরব। বলে, 'ধর, ধর।'

দেখি, যোগোমতী থরথরিয়ে কাঁপে। হাসিতে কাঁপে। চোখের ছটায় ঝিলিক হানে। গোপীদাস তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'থাক না বেম্মালন্দদাদা, শরীল খারাপ-টারাপ কইরবে তা'পরে?'

'আরে তু থাম্‌ দিকিনি বিটা বাউল। তোদিগের ত খালি গাঁজায় দম মাইরলেই হয়। আর প্রকৃতি ঠাকরুনটি থাইকলেই হয়।"

গোপীদাস বলে ওঠে, 'জয় গুরু!'

আমি তখন যোগোমতীর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে। জানি সে অগতির গতি! বক্রেশ্বরের শক্তি যেমন মহিষমর্দিনী, শিবের শক্তি যেমন কালী, জগৎজনের আশ্রয় জগদ্ধাত্রী, সে এখন আমার তেমনি।

তবু যোগো বলে, 'একটুক দ্যাখ ক্যানে।'

হাত জোড় করে বলি, 'পারব না।'

সদ্যপূর্ণ করোটি নামিয়ে রেখে অবধূত বলে, 'ওহে শোন শোন, "মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ। মকারপঞ্চকঞ্চৈব মহাপাতকনাশনম্‌॥" বুইঝলে হে?'

মনে মনে বলি, তা বুঝেছি। মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা মৈথুন পঞ্চমকারে মহাপাতক বিনাশিত হয়। কিন্তু সে তো সাধকের। আমাকে কেন। আবার বলি, 'আমি সাধারণ মানুষ, আমার পাতক ঘোচবার নয়। আমাকে ছেড়ে দিন।'

'অই অই বুঝেছি হে, শহরে মদ খাব্যে মাংস খাব্যে, ব্যাশ্যাবাড়ি যাব্যে, সিটি পাইরবে, ইটি লাইরবে, আঁ?'

রীতিমত আক্রমণ। কিন্তু জানি তর্কে যাওয়া বৃথা। তাই যোগোমতীর দিকেই বারে বারে চাই। যোগোমতীর এবার করুণা হয়। বলে, 'বাবাজীকে উসব বইলছ ক্যানে গ। উ কি কথা, ছি! থাক্‌, বইলছে যখন পাইরবে না, ছেড়্যে দাও।'

অবধূতের দ্বিতীয় কথা নেই। বাঁ হাতের মাঝখানে দুই আঙুল মুড়ে, তর্জনী, কনিষ্ঠা আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে মাঝখানে কারণপূর্ণ করোটি স্থাপন করে। কী যেন বিড়বিড় করে। ডান হাত দিয়ে বুকের কাছ থেকে কল্পিত উপবীত টেনে নিয়ে স্পর্শ করে। তারপরে ভৈরবীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে। যোগোমতীও অবধূতের দিকেই তাকিয়ে ছিল। অবধূত একবার ঘাড় নেড়ে সবটুকু এক চুমুকে গলাধঃকরণ করে। একটু সময় চোখ বুজে ঠোঁটে ঠোঁট টিপে স্থির হয়ে থাকে। তারপরে গলা খুলে গোঙানো স্বরে প্রথমেই বলে, 'এ বাবাজীটোর মাথা খাইচেছ ই বিটা বাউল।'

গোপীদাসের সঙ্গে যোগোর চোখাচোখি হয়, দু'জনেই হাসে। আর অবধূত আমাকে বলে, 'দ্যাখ ক্যানে বাবা যিখানেই থাকো, নারীর পূজা কইরবে। তবে জাইনবে, শক্তি ধারণ। ভৈরবী পেসাদ কর্যে দিয়েছে, তুমি পর্শ কইরলে না, এ খোপ খারাপ!'

'আচ্ছা হইয়েছে, উয়াকে আবার উ-সব কথা ক্যানে। বাবার যদি কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে।'

যোগো ভুরু কুঁচকে বলে, আমার দিকে চেয়ে হাসে। এ আর এক বিচিত্র পরিবেশ। জীবনে কখনো যার সম্মুখীন হইনি।

তথাপি অবধূত থামতে রাজী না। করোটি পাত্রে আর এক দফা কারণবারি পান করে নেয়। অনুষ্ঠান আগের মতোই। বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ। উপবীত স্পর্শের কল্পনা। কপালে করোটি ঠেকিয়ে যোগোমতীর দিকে ফিরে বলে, 'খাই গ মা।'

এক চুমুকে করোটি শূন্য করে সে আমার দিকে তাকায়। পলকহীন রক্তাভ চোখের দিকে চোখ রাখতে পারি না। ব্রহ্মানন্দ অবধূত আবার আমার দিকে এমন করে তাকায় কেন। অস্বস্তিতে চোখ ফিরিয়ে নেবার আগেই, অবধূত অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ে। আবার মিটিমিটি হাসে।

এবার কী রহস্য, কে জানে। আমার দিকে চোখ রেখেই যেন রহস্যোদ্ঘাটনের সুরে ডাক দেয়, 'মা।'

এই যেন যোগোমতীর নাম। সে স্বাভাবিক স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'বল।'

'ইয়ার মধ্যে একটো কী রকম ভাব আছে, দেখ্যেছিস্‌?'

শোন এবার নতুন কথা। কার মধ্যে আবার কী ভাব আবিষ্কার করে অবধূত! দেখি, যোগো দৃষ্টি চালাচালি করে গোপীদাসের সঙ্গে। ঠোঁটের কোণে হেসে, আমার দিকে চেয়ে জবাব দেয়, 'বাবার লজর এতক্ষণে পইল্ল? আমি তো পেখম থেক্যাই লজর কইরছি।'

অবধূত ঘন ঘন ঘাড় দুলিয়ে বলে, 'করবি বই কি মা, তোর চখে ত ফাঁকি যাবার নয়।'

কী ব্যাজ দেখ দেখি। তিনজনেরই দৃষ্টি একজনের দিকে। অবধূত আবার বলে, 'লজর দেখ্যাছিস, যেন ধ্যানে রইয়েছে। বিটার জোর আছে খোব। ক্ষেইপলে গুণ জ্ঞান থাইকবে না, সিরকম ভাব!'

গোপীদাস বলে ওঠে, 'অই, অই জন্যেই ত চিতেবাবাজী নাম দিইচি গ।'

অবধূত ধমকে ওঠে, 'আ রে ধুর শালো তোর চিতেবাবাজী। এ মাল ভিন্ন

গোত্তরের। দেইখছিস না, কোনোদিকে লজর নাই, এক বগ্‌গা ছুইটছে। কোথাক কী এল্য গেল্য, এ বিটার কাঁচকলাটো।'

গোপীদাস অমনি ঘাড় দুলিয়ে, দাড়ি নাড়িয়ে আওয়াজ দেয়, 'লদীর মতন, বল্য ক্যানে গ বেম্মালন্দ দাদা। উ ত আমি আগেই বইলেছি। বাবাজী আপন মনে বইছে।'

অবধূতের আবার ধমক, 'তোর বাবার বাবাজী। খালি বাবাজী বাবাজী কইরছে শালোর বাউল।'

যোগো আর গোপীদাস চোখে চোখে হাসে। আর আমি ভাবি, এ কি বিব্রত করার ধরণ। বিরক্তিকরও বটে। শুনতে ইচ্ছা করে না। এদের মুখের ভাব দেখতে ইচ্ছা করে না। এরা থাকে থাকে, বেশ থাকে। হঠাৎ কোথায় গোলমাল লাগে, এদের কাছে থাকা দায়। তখন এদের সামনে, নিজেকে নিয়ে নিজের গোল লাগে। এদের কাছে, নিজের কথা শুনতে ইচ্ছা করে না। কারণ, এদের দেখা, এদের ভাব, এদের কথা, সবই আলাদা। আমি বলি, 'সে কথা এখন থাক।'

তোমার কথা কানে গেলে তো। যারা নিজের ভাবে বিভোর, তারা নিজের কথাই বলে। গোপীদাস বলে অবধূতকে, 'তা হল্যে, তুমিই বলো।'

'বইলব, বইলব বই কি। উয়ার ভক্তির জোরটো দেখ্যাছিস্। দ্যাখ্ তোরা ভালো কর‍্যো, বিটা পদে পদে মার খায়, অপমান হয়, তবু টলাতে লাইরছে।'

কে মারে আমাকে। কে অপমান করে। আমার কথা আমি জানি না। আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে শ্মশানবাসী অবধূত। আমার ভক্তিই বা কীসে, তার আবার জোরই বা কী। এ সবই যেন এক আত্মসম্মোহিতের কথা। আমার কথা কিছু না। তবু কথা বলতে পারি না, চুপ করে থাকি। কেন বলে, কোথা থেকেই বা আসে এসব কথা, কে জানে। হাসতে পারলে, খুশি হই। হাসতেও পারি না। অথচ, কৌতূহলও বোধ করি না। বিব্রত অস্বস্তিতেই চুপ করে থাকি। কেবল যোগো আমার চোখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসে। গোপীদাসও তা-ই।

অবধূত আমার ঘাড়ে হাত রাখে। এই সে আমাকে প্রথম স্পর্শ করে। গরম মস্ত হাতের পাঞ্জাখানি ভারীও তেমনি। একটু ঝাঁকানি দিয়ে বলে, 'ভালো, ভালো।'

বলে, হঠাৎ হাসতে হাসতে যোগোর দিকে ফিরে বলে, 'ই কি ভেব্যেছে জানিস মা। ই ভেবেছে, আমি বুঝি ঈশ্বরভক্তির কথা বইলছি।'

আমার দিকে ফিরে বলে, 'তা লয় হে বাবা, ভক্তির ভাব আলাদা জিনিস। উটো হল্য চষা জমির মতন। তা'পর তুমি উতে যা খুশি বীজ ছড়াও যেইয়ে, ফইলবার ধন ফইলবে, বুইঝলে? সিটি তোমার আছে।'

ভক্তিরূপের এমন ব্যাখ্যা আর শুনিনি। আমার তা আছে কি না আছে, জানি না। কথাটা মন্দ লাগে না শুনতে।

গোপীদাস বলে ওঠে, 'জয় গুরু, খাঁটি বইলেছ গ অবধূতদাদা।'

অবধূতের সে খেয়াল নেই। আবার করোটি পাত্র পূর্ণ, যথানিয়মে পান। পানের পর, আবার আমাকেই বলে, 'ভালো লাইগল বাবা তোকে। মরবি বিটা, তোর শান্তি নাই। আয়, তোর সঙ্গে কথা কই দুটো। শব না হল্যে শব সাধন হয় না, জানিস তো বাবা। তুই না হল্যে মনের কথা হবেক নাই।'

গোপীদাস আওয়াজ করে, 'জয়গুরু'। যোগোমতী নিষ্পলক চেয়ে থাকে আমার দিকে। সে যেন আমাকে সম্মোহন করতে থাকে।

অবধূত বলে, 'কারণ খাস নাই। নাই খাস। তবে বাবা, ভক্তি করো, নারীর পূজা কইরবি। পাঁটার মতন পাঁটী পূজা না। বিটা যেমন মা পূজ্যে, মানুষ যেমন

দেবী পূজ্যে, তেমনি। তবে হাঁ, খাঁটি নরে যেমন নারী পূজ্যে, সিটিও জাইনবি দেবী পূজার অঙ্গ।'

না জিজ্ঞেস করে পারি না, 'এ কথা আমাকে বলছেন কেন। আমি সাধক নই, তন্ত্রমন্ত্রও আমার নেই।'

'না থাইকল। কিন্তু তোর মন আছে, ধ্যান আছে, তা-ই তোকে বলি। তোর এই একটা ভাব আছে, নারী ছাড়া তোর দিন যাবে নাই। যিখানে যাবি, সিখানেই উয়ারা তোর কাছে আইসবে। দ্যাখ্ বাবা, আমার কিছু হয় নাই। আমি ফোপড়া ঢেঁকি, এখন শ্মশানের কুত্তা হয়্যেছি।'...

হঠাৎ যেন অবধূতের গলায় কথা আটকে যায়। বুকে কোথায় চোট লাগে। তা-ই নিজের বুকে একটা হাত চেপে ধরে। আর যোগোমতী যেন নিচু আর্তস্বরে ডেকে ওঠে, 'অই গ বাবা!'

গোপীদাসের গলায় বাজে, 'জয়গুরু!'

অবধূত বুকের থেকে হাত সরিয়ে, আবার করোটি কারণে পূর্ণ করে, সেই-ভাবেই পান করে। মুহূর্তেই যেন পরিবেশ বদলে যায়। অবধূতের চোখ কেবল রক্তবর্ণ না। যেন রক্ত ফেটে পড়তে গিয়েই, তার চোখ দুটি চিকচিক করে।

গোপীদাসের কথা আমার মনে পড়ে যায়। সে নিজেকে পতিত বাউল বলে, নিশ্বাস ফেলে চোখের জলে গলেছিল। এখন অবধূত বলছে, সে ফোঁপড়া ঢেঁকি। শ্মশানের কুকুর হয়েছে। এ সময়ে, তার মুখের দিকে চেয়ে, আমারও যেন কোথায় একটা চমক লেগে যায়। তাকে অন্য মানুষ মনে হয়।

অবধূত চোখ আধবোজা করে, মোটা স্বরে বাজে, 'নেশা, বাবা নেশা, ই য্যা দেইখছ কুকুর দুটো। ইয়াদের গাঁয়ে ঘরে পাটাও, যাবেক নাই। ইখানকার মড়া না খেল্যে, ইয়াদের পেট ভরে না, মৌতাত জমে না। সি রকম আমারও বট্যে, আমার আর উপায় নাই।'

যোগোমতী বলে ওঠে, 'ইসব কথা ক্যানে বাবা, থাক না।'

অবধূত বলে, 'না মা, ইয়াকে তাই বলি, তবু দেইখলে চিনতে পারি। বাবাকে দেখ্যে চিনতে পারি। তা বল্যে, তোকে কি আর তন্ত্রমতে পূজা কইরতে বইলছি? তা না, হেলাফেলা করিস না, যে বিটি যে ভাবেতেই আসুক, তাকে তুষ্ট কইরবি। তার মান রাইখবি, মন রাইখবি, তোর ভালো হব্যে। শক্তি বাইড়বে।'

এ সব কথার সত্য জানি না, মিথ্যা জানি না। তবু, আমার জীবনকালের পেরিয়ে আসা নানান পটে, নানা রঙ ভাসে। যে কথার অর্থ কিছুই বুঝি না, সে কথাই কেমন যেন ব্যঞ্জনাময় মনে হয়। চুপ করে তার কথা শুনি।

অবধূত তার নিজের বেগে ভাযে, আপন স্রোতেই কলকলায়, 'কলিকালে তো বাবা বেদের সাধন নেই, তন্ত্রসাধনই বিধি। তা সি শক্তি সাধনা হল্য কই। যার হল্য, তার হল্য, আমার কিছু হল্য না। ধ্যান না থাকলে হয় না শাস্ত্রে বইলছে, সুরা হল্য শক্তি, মাংস হল্য শিব। শিব শক্তির ভক্ত হল্য ভৈরব। তিনে যদি মিল্যে, তবে মোক্ষের কারণ। কিন্তু মদে মাংসে বদহজম কইরলাম, পচা ঢেকুর, মর্য়্যা রেইছি বাবা।'

অবধূতের চোখের কোণে, রক্তের ফোঁটাই যেন বিন্দুর মতো চিকচিকিয়ে ওঠে। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করে যোগোমতীর আলতা পরা পা। যোগো সেই হাতখানি দু' হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। ভৈরবীর চোখে যে এর আগে জল দেখিনি, মুখের বিমর্ষতা দেখিনি, তা না। কিন্তু এখন এ মুখ একেবারে আলাদা। এখন এ মুখে যেন গাঢ় অন্ধকার গভীর শোকের ছায়া। এখন দেখি যেন, এক আর্ত মানবী, এক অসহায় পুরুষের হাত ধরে। বলে, 'এমন কর্য়ে বইলছ ক্যানে গ। আমার পাপ লাগে না?'

অবধূত বারে বারে মাথা নাড়ে। বলে, 'না গ, না। তুমি যোগমায়া, মহামায়া। তোমার পাপ লাইগবে না। কিন্তু তুমি থাইকতে আমি পূজা কইরতে লাইরলাম। কুলস্ত্রী পেল্যেম, তবু আমার শক্তি পূজা হল্য না। কেবল অনাচার কর্যে বেড়াল্যেম।' ..

দূর তেপান্তরের বুকে টানা বাতাসে যেমন সুরহীন হাহা রব ওঠে, অবধূতের স্বর যেন তেমনি বাজে। কান্নার স্বর এক রকম। এ স্বর আর এক রকম, কান্নার থেকে গভীর, আরো ব্যাপ্ত কিছু। বুঝতে পারি না, এ কি কেবল নিষ্ফল সাধনের হাহাকার। নাকি, যোগোমতী ভৈরবীর কাছে, আপন কৃতকর্মের অনুতাপ। এলেকাটার ঘরে থেকে, যোগোকে দুঃখ দেওয়ার পাপ কি তার আপন ভাষায় বাজছে!

যোগো বলে, 'ক্যানে মিছা বইলছ গ। আমি কি তোমার সি শক্তি?'

অবধূত ব্যগ্র ব্যাকুল স্বরে বলে, 'অই গ, এমন কর্যে বলিস নাই। তোর মধ্যে যা আছে, তা আর কারুর নাই।'

যোগো নিজের দু' হাতে ধরা অবধূতের হাতখানি নিজের কপালে ছুঁইয়ে বলে, 'তোমার পূজা যেন চিরকাল কর্যে যেত্যে পারি গ। যদি আমার কিছু থাকে, তা-ই যেন পারি।'

দেখে মনে হয়, তন্ত্রমন্ত্র সাধন আচরণ দূরে, দুই নরনারী হৃদ-সায়রের তরঙ্গে ভাসে। যদি সেইখানেতে দুয়ে মিলে একাকার হওয়া যায়, তবে সফল সাধন ঘটে। দুইয়ে যদি পরস্পরকে পূজতে পারে, তবেই সকল পূজার ফললাভ। এখন দেখ, কথা যাকে নিয়ে উঠেছিল, সে ভেসে গিয়েছে। গোপীদাসের চোখে আবেশ, বিভোর হয়ে দু'জনকে দেখছে। দু'জনায় আপনাতে মগ্ন।

একটু পরে, অবধূত আবার করোটি পূর্ণ করে পান করে। তারপরে কুলস্ত্রী, ব্যাখ্যা করে। ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, রজকী, গোপবালা, কাপালী, নট বধূ, বেশ্যা, নর-সুন্দরী, মালাকার-কন্যা—এই নয় প্রকার কুলস্ত্রী। শুনে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, এদের মধ্যে তন্তুবায় বধূর হিসাব তো নেই। কিন্তু তার জবাব দেয় অবধূত নিজেই 'তবে হাঁ, সব থেক্যা সেরা কুলস্ত্রী জাইনবে সি-ই, যে "বিশেষবৈদগ্ধ্যযুতা সর্বা এব কুলাঙ্গনা।" পরপুরুষগামিনী বিদগ্ধা হল্যে, সি-ই কুলস্ত্রী হব্যে। তা বল্যে, পুরুষ ধর্যে ধর্যে শোয়ার বিষয় লয়। কুলাচারী, সি যি পুরুষই হক, তার নামই পরপুরুষ। আর পূজাকালে সি পুরুষকে, "পূজাকালে চ দেবেটি বেশ্যেয় পরিতোষয়েত্।" বেশ্যার মতন তাকে তুষ্ট কইরবে। কিন্তু পূজাকাল ছাড়া, তোমার চিন্তায় আর পুরুষ থাইকবে না, তব্যে হল্য কুলস্ত্রী।'

কুলাচারীর মতে, আগমোক্ত পতি শিবস্বরূপ, তিনিই গুরু। বিবাহিত পতি, পতি না। কুল পূজায়, স্বামী ত্যাগ করলেও নারীর দোষ নেই। এই কুলনারী সাক্ষাৎ কালীস্বরূপা।

এই কথা শেষ করেই, সহসা অবধূত ডাক দেয়, 'মহামায়া!'

যোগোমতী উত্তর দেয়, 'বলো।'

'ষটচক্র বিষয়ে কথা বইলব তোমার সাথে।'

'বলো।'

মুহূর্তেই যেন আবার পরিবেশ বদলায়। দু'জনেই, দু'জনের মুখোমুখি, সোজা হয়ে বসে। যোগোর কোলের ওপর দুই হাত জড়ো করা। ব্রহ্মানন্দর দুই হাঁটুর ওপরে দুই হাত। সে জিজ্ঞেস করে, 'মা, মেরুদণ্ডের দুই পাশে কী আছে?'

'ইড়া পিঙ্গলা নাড়ি।'

'তার ডাইনে বাঁয়ে?'

'সুষুন্না মগজ পয্যন্ত।'

'সুষুম্নার মধ্যে আর কোন্ নাড়ি আছে?'

'বজ্রাখ্যা।'

'বজ্রাখ্যার মধ্যে?'

'চিত্রিণী।'

'সুষুম্না নাড়িতে আর কী আছে মা?'

'সাত পদ্ম বাবা।'

'কী কী?'

'আধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, সহস্রদল।'

অবাক হয়ে শুনতে থাকি। যেন এক ঘোর লাগা চোখে, দুজনের দিকে চেয়ে থাকি। বুঝি না কিছুই। ষটচক্র কী, দেহের মধ্যে এত বিচিত্র জটিল যন্ত্রই বা কী, কিছুই জানি না। তবু, আমার সামনে এক আশ্চর্য দৃশ্য। বিচিত্র সংলাপ শুনি অবোধ কৌতূহলে। সর্বোপরি, পরমবিস্ময় লাগে বাঙলা দেশের কোনো এক পাড়া-গাঁয়ের, একটি তাঁতী বউয়ের মুখে এসব কথা শুনে। এ যোগোমতীকে এখন যেন আর চিনতে পারি না। তার গলার স্বর ভিন্ন। সে যেন অন্য জগৎ থেকে কথা বলে। দৃষ্টি স্থির, ধ্যানমগ্না. এক ধরনের সমাধিস্থ ভাব যেন। সিঁদুরের রক্তটিপসহ. এখন সে যেন ত্রিনয়নী দেবীপ্রতিমা। আমাদের কারুর প্রতিই তাদের লক্ষ্য নেই।

ব্রহ্মানন্দ আবার জিজ্ঞেস করে, 'আধার পদ্মে কয়টি দল আছে?'

যোগোমতী বলে, 'চাইরটে। চাইর দল, চাইর বর্ণ, বং শং ষং সং। ই পদ্মে চৌকোনা ধরাচক্র আছে, উয়ার আট দিকে আট শূল। মধ্যখানেতে জগতবীজ লং রইয়েছে, আর কর্ণিকার মধ্যে ত্রিকোণ যন্ত্র। ই পদ্মের মধ্যে মহাদেব রইয়েছেন লিঙ্গের রূপ ধর্যে। ওঁয়ার অমৃত গইলবার জায়গায় সাপিনীরূপ কুণ্ডলিনী শক্তি রইয়েছেন।'

'জয় মা ধূমাবতী। স্বাধিষ্ঠান পদ্মের কথা শুনাও মা।'

'স্বাধিষ্ঠান থাক্যেন লিঙ্গের মূলে। উয়ার ছয় দল, ছয় বর্ণ, বং ভং মং যং রং লং। ই পদ্মের মাঝখানটোতে গোল বরুণ মণ্ডল, তার মধ্যে যে্য অর্ধচন্দর রইয়েছে, তাতে বং বর্ণ আছে। ই পদ্মে বারুণী শক্তি থাক্যেন।'

যোগোমতীর গলায় যেন একটা আচ্ছন্নতা নেমে আসতে থাকে, সেই সঙ্গেই উচ্চারণের মধ্যে স্পষ্টতা লক্ষণীয়। ব্রহ্মানন্দ যত শোনে, ততই যেন সে কী এক আবেগে আপ্লুত হতে থাকে। গোপীদাসও ইতিমধ্যে একেবারে ধ্যানস্থ হয়ে পড়েছে। সে হাত জোড় করে, যেন পুজায় বসেছে।

অবধূত বলে ওঠে, 'জয় মহামায়া। মনিপুরের কথা বলো।'

'মনিপুর নাঁইকুন্ডলের মূলে। উয়ার দশ দল, দশ বর্ণ, ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং। ই পদ্মের মাঝখানটোতে ত্রিকোণা অগ্নিমণ্ডল, উয়ার তিন দিক্যে তিনটো স্বস্তিকার ভূপুর। তার মধ্যে রং বর্ণ রইয়েছে। ই পদ্মে লাকিনী শক্তি বাস করেন।'

'আর অনাহত?'

'হিদে ইয়ার থান। বার দল, বার বর্ণ, কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং। ই পদ্মের ছয় কোণা বায়ুমণ্ডল, উয়ার ভিতর যং বীজ রইয়েছে। ই পদ্মে শিব আর কাকিনী শক্তি থাক্যেন।'

'জয় যোগমায়া! বিশুদ্ধ পদ্মের কথা বল মা।'

'ই পদ্ম গলায় থাক্যে। ষোল দল, ষোল বর্ণ, অং আং ইং ঈং ঋং ঋৃং ৯ং ৯'ং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ। ইয়ার মাঝখানটোতে গোল চাঁদের মণ্ডল, ভিতরে নভমণ্ডল আর হং বীজ রইয়েছে। ই পদ্মে শাকিনী শক্তি রইয়েছেন।'

ব্রহ্মানন্দর শরীর যেন উল্লাসে কাঁপে। হাঁকে, 'জয় মা জগত্তারিণী। আজ্ঞা

কোথাক মা?'

যোগোমতী তেমনি স্থির চোখে তাকিয়ে বলে, 'ক্যানে বাবা, আজ্ঞা দ্বিদল নামে থাক্যে ভুরুর মাঝখান্যে। উয়ার দুই দল, দুই বর্ণ, হং ক্ষং। মধ্যখানে, ত্রিকোণ শক্তি, শক্তির মধ্যে শিব। ই পদ্মে হাকিনী শক্তি রইয়েছেন। ইয়ার উপরেতেই পরমাত্মা থাক্যেন। তার উপরে চন্দ্রবিন্দু, চন্দ্রবিন্দুর ওপরে শঙ্খিনী নাড়ি। সহস্র দল উয়ার উপরে।'

'সিখানে কী আছে গ?'

'গোল চাঁদের মণ্ডল, ত্রিকোণ যন্ত্র, মধ্যখানে পরম শিব।'

বলতে বলতে, যোগোমতীর শরীরেও যেন তরঙ্গের দোলা লাগে। তার চোখে মুখে ভাবের আবেশ। সে মাটিতে নত হয়ে, ব্রহ্মানন্দর পায়ে হাত দেয়। ব্রহ্মানন্দও নত হয়ে যোগোমতীর দু' হাত, নিজের হাতে নেয়। যেন সুখোল্লাসে ডেকে ওঠে, 'জয় যোগমায়া, জয় মহামায়া।'

সে উঠে দাঁড়ায়। যোগোমতীকে টেনে তোলে। বলে, 'চল ভৈরবী, একটুক ধ্যানে বসি যেইয়ে।'

'চল।'

হাত ধরাধরি করে, ঘন স্পর্শে, দু'জনেই প্রোথিত ত্রিশূলের সামনে যায়। ত্রিশূলের দিকে মুখ করে, দু'জনেই জোড়াসনে স্থির হয়ে বসে। তাদের মুখ আর দেখতে পাই না। আমাদের দিকে পিছন ফিরে বসেছে তারা। যোগোমতীর পিঠে ছড়ানো চুল। জামাহীন পিঠের একাংশ দেখা যায়। সামান্য আলোয়, দু'জনকেই অস্পষ্ট দেখি। মনে হয়, ঘরের মধ্যে থেকেও, তারা যেন আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে। বেড়ার গায়ে তাকের ওপরে, কপালে সিঁদুর মাখানো নরমুণ্ডের কংকালটি যেন, অল্প আলোতেই তার সাদা বর্ণে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চোখের শূন্য কোটরে যেন স্থির দৃষ্টি রয়েছে। কালো কুকুর দু'টি দু'জনের কাছাকাছি গিয়ে এলিয়ে বসে। যা শুনেছি, তা এই মুহূর্তে আর স্মরণ করতে পারি না। কিন্তু সব মিলিয়ে, আমি আমার কথা ভুলে যাই। আমার বর্তমান, দেশকাল, জীবনযাপন, চিন্তাভাবনা। যেন কোনো এক কালান্তরের ওপারে, বিস্ময়াবিষ্ট রহস্যের দ্বারে, আচ্ছন্ন হয়ে থাকি।

সত্য-মিথ্যার বিচার জানি না। মোক্ষ মুক্তির মূল্য বুঝি না। কিন্তু আমার এই সামান্য জীবনকালের স্রোতে, আমারই অপরিচয়ের দূর কাল এসে মেশে। সংসারে কত মানুষ, কত ধ্যান-ধারণা, কত তার বিচিত্র স্রোত নানা দিকে বহে। তার মাঝখানে আমি, আমার চলার পথের বাঁকে বাঁকে, কেবল জোড় হাতে দাঁড়িয়ে থাকি।

গোপীদাসের ধ্যান ভাঙে। সে ওঠে, ঘরের এক পাশ থেকে আরো কাঠ এনে, দীর্ঘস্থায়ী আগুন তৈরি করে। তারপরে আমার কাঁধে হাত দিয়ে, নিচু গলায় বলে, 'রাত্র অনেক হল্য বাবাজী, এবারে শুয়ে পড়, এইস।'

আচ্ছন্নের মতোই, ছেঁড়া চাটাইয়ের ওপর গা এলিয়ে দিই। চোখ বুজি। আর আমার চোখের সামনে যেন আগুনের শিখা নাচতে থাকে। ঘরের আগুন, নাকি চিতার, কিছুই বুঝতে পারি না। একটুও শীত লাগে না। বাইরে ভিতরে, সবখানে নিঝুম স্তব্ধতা। কোথাও কোনো শব্দ নেই।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙে, তখন সোনালী রোদে চারদিক ভরা। পাখির ডাক শোনা যায়। গোপীদাস ব্রহ্মানন্দ, দু'জনের কেউই ঘরে নেই। আমার ঘুম ভাঙতেই প্রথমে দেখি যোগোমতীকে। বাগানের দিকে দরজা দিয়ে সে ঘরে ঢোকে। এখন আবার তার মুখ আলাদা। গতকাল রাত্রের সে ভাব নেই। দেখলেই বোঝা যায়, সে স্নান করেছে। হেসে জিজ্ঞেস করে, 'ঘুম ভাইঙল বাবাজীর?'

দু’ হাত দিয়ে মুখ মুছে তাড়াতাড়ি উঠে বসি। বলি, ‘হ্যাঁ। এরা কোথায়?’

‘সব যেইয়ে বাইরে রোদে বস্যেছে।’

আমার ভিতরে ভিতরে তাড়া। এবার আমাকে ফিরতে হবে। বাইরে গিয়ে গোপীদাসকে ডাকি। সেও বেরোবার জন্যে প্রস্তুত। যোগোমতী বালতিতে কুণ্ডের জল রেখেছিল। জল যেন তখনো গরম। তাড়াতাড়ি হাতে মুখে একটু জল দিয়ে নিই। ঝোলাটা কাঁধে নিতেই, যোগোমতী প্রায় ধমকে ওঠে, ‘দেখ হে, ছুট লাগাল্‌ছ য্যো। বস্য ক্যানে, একটুক চা মুড়ি খাও।’

চা-মুড়ি! চমৎকার! এই শীতের সকালে, এমন প্রাপ্তি তো আশাই করতে পারিনি এখানে। যোগো একটা কলাইয়ের বাটিতে মুড়ি দেয়। একটু পরে বাইরের দাওয়া থেকে এসে, এলুমিনিয়ামের গেলাসে গরম চা এগিয়ে দেয়। বলে, ‘সবাইয়ের খাওয়া হয়ে যেইছে, তোমারটাই ছিল।’

জিজ্ঞেস করি, ‘আপনারা উঠলেন কখন?’

‘আবার?’

যোগোমতী চোখ পাকিয়ে ধমক দেয়। এবার আর স্মরণ করাবার দরকার হয় না। নিজেই তাড়াতাড়ি বলি, ‘তোমরা উঠলে কখন।’

যোগোমতী খুশি হয়ে চোখের কোণে হাসে। ঘাড় নেড়ে খুশিটুকু জানিয়ে বলে, ‘উঠাউঠির কী আছে? আমি আর কত্তা তো শুই নাই। অন্ধকার থাইকতে পাপহরাতে যেইয়ে লেয়্যে এস্যেছি দু’জনে।’

গতকাল রাত্রের যোগোমতীকে আমার মনে পড়ে যায়। সেই স্থির দৃষ্টি, আবেশ-ভরা মুখ, দুর্বোধ্য ষটচক্রের সেই বিচিত্র বর্ণনা। তখন যেন সে ছিল, কুলস্ত্রী সাধিকা ভৈরবী। এখন যেন পরিহাসিকা ঘরের গৃহিণী, কাছে বসিয়ে খাওয়ায়।

হঠাৎ দপদপে রক্তিম চোখ পাকিয়ে বলে, ‘কী দেইখছ হে?’

বলি, ‘তোমাকে। কাল রাত্রের সঙ্গে এখন আর মেলাতে পারি না।’

‘ক্যানে?’

‘কী জানি।’

হাত বাড়িয়ে প্রায় থাপ্পড় তুলে বলে, ‘তোমার চোখ দুটো গেলে দেবো আমি। তোমার লজর খুব খারাপ।’

বলেই হেসে কাঁপে। আবার বলে, ‘গোপীদাদাই তোমার ঠিক নাম রেখ্যেছে, চিতে বাবাজী, চিতে বাঘ।’

সে কথায় কান না দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলি, ‘তোমার সেই রূপ আমি ভুলব না। আমি কিছুই বুঝি না। কিন্তু তুমি যে এত জানো—।’

যোগোমতী উঠে দাঁড়িয়ে আমার মুখে হাত চাপা দেয়। বলে, ‘ছাই জানি। উসব কথা থাক। আবার কবে আইসবে বলো।’

বলে সে আমার হাত ধরে। বলি, ‘সময় সুযোগ পেলেই আবার আসব।’

আমি দরজার দিকে যাই। সে আমার হাত ছাড়ে না। হাত ধরেই বাইরে আসে। সেখানে গোপীদাস আর ব্রহ্মানন্দ বসে কথা বলছে। আমাকে দেখে গোপীদাস উঠে দাঁড়ায়। চোখ ঘুরিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করে, ‘কী গ যোগোদিদি, বাবাজীকে ছাইড়তে মন নাই ক্যানে?’

যোগোমতী ঘাড় নেড়ে বলে, ‘না।’

সহজ কথা, সহজেই বলে। আমার দিকে চেয়ে হাসে। আমিও তার দিকে চেয়ে হাসি। শ্মশানবাসিনী ভৈরবীটিকে অনেক দিনের চেনা বলে মনে হয়। তারপর তো, আরো বিস্ময়ের অবধি থাকে না, যখন মনে পড়ে, কার্তিক ঘোষালের সঙ্গে সে এক

পলাতকা তাঁতীবউ।

গোপীদাস চোখ বড় করে বলে, 'সব্বনাশ, শুইনছ গ বেহ্মালন্দদাদা।'

ব্রহ্মানন্দ উঠে এসে আমার আর একটা হাত ধরে। বলে, 'বিটাটোকে আমারই কি ছাইড়্যে মন কইরছে হে।'

গায়ের কাছে জড়িয়ে নিয়ে বলে, 'আবার এস্য বাবা। বেঁচ্যে থাইকলে দেখা হবে।' অবধূতের মোটা গলায় কেমন একটা করুণ সুর বাজে। গতকাল রাত্রের কথা মনে পড়ে যায়। এখন সামান্য এক ফালি কাপড় কোমরে জড়ানো। চুলের জটা মাথায় আঁট করে জড়ো করা। খালি গা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা।

বলি, 'আসব। চলি।'

গোপীদাসের সঙ্গে অবধূত-আশ্রম ছেড়ে বেরিয়ে যাই। ছড়ানো শিবমন্দিরের আড়ালে পড়ে যায় অবধূতাশ্রম, সেই সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ যোগোমতীও। চন্দ্রসায়রের পাশ দিয়ে পাকা রাস্তায় এসে পড়ি আমরা। সেখান থেকে দেখতে পাই, বক্রেশ্বর মহা-শ্মশানে নতুন চিতা জ্বলছে। সত্যিই, এখানকার চিতা নেভে না।

গোপীদাসের ইচ্ছা, সে আমার সঙ্গে দুবরাজপুর পর্যন্ত যাবে। সঙ্গদান ছাড়া সেটা আর কিছু না। কিন্তু গোপীদাসের কষ্ট। এখান থেকে দুবরাজপুর গিয়ে আবার তাকে রেলগাড়িতে উজান শিউড়ি ফিরতে হবে। তার চেয়ে সে বাসে চেপে, শিউড়িই ফিরে যাক। তার ফিরে যাবার ভাড়া হাতে দিয়ে, সেই কথাই বলি।

বক্রেশ্বর গ্রামের পাশে, আমার মোটর বাস আগে আসে। ওঠবার আগে মনে হয়, গোপীদাসের বুড়া চোখ দুটি চিকচিক করে। বলে ওঠে, 'জয়দেবে যেন দেখা হয় বাবাজী।'

আমি ঘাড় নেড়ে গাড়িতে উঠি। এবার আমার যাত্রা আবার সাঁওতাল পরগণার নির্জন বাসে। সেখান থেকে শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় গিয়েছিলাম। পৌষ সংক্রান্তির অপেক্ষা, তারপরে কেঁদুলি হয়ে দক্ষিণে ফেরা।

কিন্তু চিন্তায় আর কাজে মেলাতে পেরেছি কবে! সাঁওতাল পরগণার নিরালায়, একদিন হঠাৎ অট্টহাসের হাসি যেন নতুন কৌতূহলে বেজে ওঠে। বেজে উঠতেই আর চুপ করে থাকতে পারি না। অট্টহাসে নাকি দেবীর ওষ্ঠ পড়েছিল। বাহান্ন পীঠের সেও এক পীঠ। ওষ্ঠ পড়েছিল, নাম তাই অট্টহাস।

এমন নাম কি আর কোথাও হয়। কেন যেতে ইচ্ছা করে জানি না। কিসের বা সন্ধানে তাও বুঝি না। কী যেন এক অপার রহস্যের কৌতূহল আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। থাকতে পারি না, তাই বেরিয়ে পড়ি।

বর্ধমান থেকে কাটোয়া। কাটোয়া থেকে আহ্‌মদপুর ছোট লাইনে, পাচনদি-তে গিয়ে নামি। পাচনদি হাটের পাশ দিয়ে মাঠে নামি, আলের সঙ্গী সাথী মেলে না। নিতান্ত গাঁয়ের পথচলা হাটুরে-বাটুরে মানুষের সঙ্গে পথে দেখা। দু-একটা কথা। পথ বাতলে দেওয়া।

কিন্তু অট্টহাস গ্রামের সঙ্গে অট্টহাস ক্ষেত্রের ব্যবধান অনেক। বেলাশেষে, গ্রামের প্রান্তে এসে দেখি, এক তীব্র স্রোতস্বিনী। সুদীর্ঘ বাঁকে কলকলিয়ে যায়। ওপারে ধান কাটা বিশাল মাঠ। তার মাঝখানে ঘন ঝোপের বিশাল মহীরুহের বিস্তৃত অরণ্যের এক দ্বীপ ভেসে আছে যেন। ওই অট্টহাসক্ষেত্র। বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না।

দেখি খুঁটিতে বাঁধা নৌকা রয়েছে ওপারে। মাঝি নেই। একখানি বৈঠা নৌকার ওপরে। এদিকে ওদিকে চাই। লোক দেখতে পাই না। নিজেকেই মাঝি হতে হবে

নাকি। এদিকে সময় চলে যায়।

এই সাত-পাঁচ ভাবনার মধ্যে একটি লোক এসে দাঁড়ায়। বেঁটে খাটো মানুষ। ছোট ছোট চুল, মাথায় টিকি, কপালে সিঁদুরের হালকা ছাপ। হাঁটুর ওপরে কাপড়, গায়ে সুতির চাদর। ছোট ছোট চোখে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা। যেন তলপেট থেকে জিজ্ঞাসা আসে, 'কোথায় যাবেন মশায়?'

'ওপারে, অট্টহাসের মন্দিরে।'

লোকটার দৃষ্টিতে কৌতূহল আর ঔৎসুক্য ফোটে। বলে, 'মন্দিরে? কি করবেন?'

'এমনি দেখতে যাবো।'

'একলা?'

'হ্যাঁ।'

'ওখানে কেউ নেই, একটা জনপ্রাণীও না।'

'সে কি, মন্দিরে পুজো হয় না? দেখাশোনা করবার লোক নেই?'

'দেখাশোনার আর কী আছে? অই একবারই পুজো হয়। তখনই বাতি জেবলে দিয়ে আসি। সকাল থেকে দুপুর অবদি থাকি, তারপরে চলে আসি।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে বলি, 'আপনিই পুজো করেন?'

'হ্যাঁ। দেখলাম, অচেনা লোক গাঁয়ের পথ দিয়ে ইদিকে এলেন, ভাবলাম যাই দেখি যেয়ে।'

চমৎকার! স্বয়ং অট্টহাসের পুজোরী পুরোহিতই উপস্থিত। মনে একটু আশা পাই, বল হয়। জিজ্ঞেস করি, 'ওখানে কি ঘরদোর নেই?'

'আছে, তবে থাকা যায় না। সব ছেড়ে, একলা কি ওখানে থাকা যায়? এখন আর কী দেখবেন, দেখবার কীই বা আছে। তবে যান তো চলেন। অন্ধকার হলে আর যাওয়া যাবে না।'

'নৌকার মাঝি?'

'আসেন না কেন, ওঠেন।'

পুরোহিত মশায়ের পিছু পিছু নৌকায় গিয়ে উঠি, উনি নিজেই দড়ি খুলে নৌকা চালান। প্রবল স্রোত, অনেকখানি ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু পুরোহিত শক্তিমান। ঠেলে ওপারের ঘাটে ওঠেন। সেখানেও একটা খুঁটি। সেই খুঁটিতে নৌকা বেঁধে বলেন, 'মাঝি বলে কিছু নেই। যখন যে আসে, সে পার হয়ে নৌকা বেঁধে রাখে। এপারে নৌকা থাকল, ওপারের লোক হা-পিত্যেশ করে থাকে, কখন একজন এসে পার হবে, তবে ওপারে নৌকা পৌঁছাবে।'

নিয়ম মন্দ না। কাজ চলে যায়। তবে সময়ের কথা ভাবলে হবে না। তাড়া থাকলে, সাঁতরে পার হয়ে যাও। কারণ উলটো পারের খেয়া দিয়ে কে যে কখন আসবে, তা তোমার ভাগ্যের লিখন।

পুরোহিতের সঙ্গে মাঠ পেরিয়ে সেই নিবিড় অরণ্যের দ্বীপের সীমায় যাই। সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হয়। ভিতরে ঢোকবার রাস্তা কোথায়! এ বনের কি কোনো পথ নেই।

পথ আছে। পুরোহিতকে অনুসরণ করেই সে পথ মেলে। এক প্রকাণ্ড ঝাড়ালো অশ্বত্থের পাশ দিয়ে বুনো ঝোপের ভিতর দিয়ে, সরু সর্পিল পথ। মাথা নিচু করে চলতে হয়। তবু মুখের ওপর ঝাপটা খেয়ে পড়ে ঝোপঝাড়ের ডালপালা। চোখ ঢেকে দেয় লতাগুল্মের নিবিড়তা। তাই হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে চলতে হয়।

ঢুকেই মনে হয় এলাম নতুন রাজ্যে। পৃথিবী ছাড়িয়ে আর এক গ্রহে। মুহূর্তেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। পায়ের তলায় শুকনো পাতা ছড়ানো, মাটি ভেজা ভেজা

নরম। মাকড়সার জাল মুখে লাগে। ঝোপ লতাপাতার তীব্র গন্ধ। এখানে কোনো কালে আলো উঁকি দেয়নি, রোদ কিরণ ছড়ায়নি। শীতও তাই বেশী অনুভূত হয়। চারদিক স্তব্ধ, কেবল ঝিঁঝির ডাক শোনা যায়। কেন, এ বনে কি পাখিপাখালি নেই। এত নিঝুম কেন!

পুরোহিত আমার আগে আগে চলেন। তার মধ্যেই নাম-ধাম পরিচয়ের জিজ্ঞাসাবাদ। কখনো বা এমন আন্‌কা জায়গায় দেবীর মন্দিরে লোকজন বিশেষ না আসার আক্ষেপের কথা। হঠাৎ দেখি, পথের বাঁ দিকে এক জায়গায় ছোট পুকুর। কিন্তু তাতে জল দেখা যায় না। যদিও জল আছে বেশ। পাতায় আর পানায় একেবারে ঢাকা। আর তখনই শুনতে পাই, সরু মেয়েলি গলায় নাকিসুরে কে যেন কেঁদে কেঁদে ওঠে। চমকে অবাক হয়ে আশেপাশে তাকাই। পুরোহিতের দিকে চাই।

পুরোহিত কানে কালা কী না জানি না। কিন্তু নির্বিকার ভাবেই চলেন। কিছু শুনতে পান বলে মনে হয় না। কাছ ঘেঁষে জিজ্ঞেস করি, 'কিসের একটা শব্দ হচ্ছে বলুন তো?'

পুরোহিত মশাই উৎকর্ণ হয়ে আমার দিকে তাকান। পাল্টা জিজ্ঞেস করেন, 'কই, কিসের শব্দ?'

আশ্চর্য, শব্দটা তো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গলাটা যেন চেরা চেরা লাগে। শব্দ যেন অমানুষিক, গা ছমছমানো।

তারপরেই পুরোহিত ওপর দিকে মুখ করে হেসে ওঠেন। বলেন, 'অ, আপনি গৃধিনীর ডাকের কথা বলছেন? অই ত, গাছের উপরে বসে ডাকছে।'

তাঁর কথায় চোখ তুলে ওপর দিকে চেয়ে থমকে যাই। সহসা যেন কেমন একটা ভয় ভয় শিহরণ লাগে, অস্বস্তির আড়ষ্টতা বোধ করি। প্রকান্ড গাছটার অনেক উঁচুতে দৈত্যের কালো কিম্ভূতাকৃতি হাতের মতো, পাতাহীন ডালপালা। তাতে, সাপের মতো ফণা তোলা ভঙ্গিতে কতগুলো শকুন বসে আছে। কারুর দৃষ্টি নিচে আমাদের দিকে। কারুর বহু দূরে, দূরান্তে। যেন তীক্ষ্ন চোখে স্থির অনুসন্ধিৎসায় কিছু দেখছে। তাদের মাঝখানে গলায় লাল ঝুলি, লাল করোটি গৃধিনী পাখা ছড়িয়ে বসে আছে। সে-ই ডাকছে। মাথাটা অদ্ভুতভাবে দোলাচ্ছে।

'এই দিকে আসেন।'

ডাক শুনেই ডান দিকে ফিরি। রাস্তা একটু প্রশস্ত। তারপরেই প্রশস্ততর মন্দির প্রাঙ্গণ, সেখানে একটা হাঁড়িকাঠ। ঝাঁটপাট দিয়ে প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখা যায়নি। কিছু শুকনো পাতা ছড়ানো। এখানে-ওখানে শকুনের বিষ্ঠা। ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে কোথা দিয়ে খানিকটা লাল আলো এসে পড়েছে। ডুবু ডুবু সূর্যের রক্তিম আলো। তাতে প্রাঙ্গণের খানিকটা যেন রক্তে লেপা দেখায়। হাঁড়িকাঠের গায়েও রক্তাভা।

পুরোহিতের নাভিস্থল থেকে উঠে আসা গলাটা যেন এখন বদলে গিয়েছে। নদীর ওপারে থাকতে তাঁর চোখের দিকে ভালো করে লক্ষ্য করিনি। এখন আমার দিকে ফিরে তাকাতেই মনে হয় ছোট ছোট রক্তবর্ণ চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ন। অথচ যেন কী একটা ঘোরে মগ্ন। আমার দিকে একবার তাকিয়ে গহ্বরের ভিতর থেকে আওয়াজ করে ডাকেন, 'এদিকে।'

তাঁর পিছনে পিছনে গিয়ে মন্দিরের সামনে দাঁড়াই। সাধারণ মন্দির। সামনের দাওয়াটা লাল সিমেন্টে বাঁধানো। দরজা বন্ধ। সামান্য একটা পাকা ঘরের মতো দেখায়।

পুরোহিতের বুকের কাছ থেকে ময়লা চাদরটা খুলে পড়ে। গাছের গুঁড়ির মতো শক্ত কালো এবড়োখেবড়ো বেঁটে বেঁটে হাত-পায়ের চেহারা। বুকটাও সেই

রকমই, কিন্তু লাল। গলার পৈতাগাছ বুকের ওপর। তিনি একদিকে তাকিয়েছিলেন। আমিও সেদিকে তাকাই। জমিটা সেখানে ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে। গাছ আর ঝোপ-ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে দেখি রক্তাভ জলের স্রোত চিকচিক করে। নদীটা এখানে এত কাছে এসে পড়েছে বুঝতে পারিনি। পুরোহিত ডেকে ওঠেন, 'শিবা।'

সঙ্গে সঙ্গে দেখি, ঢালু জমির ঝোপের পাশ থেকে একটা শেয়াল আস্তে আস্তে উঠে এসে সেখানেই থমকে দাঁড়ায়। পাঁশুটে বর্ণের পশুটার চোখের মণি দেখতে পাই না। কিন্তু সে যে আমার দিকেই চেয়ে আছে, বুঝতে পারি। মোটা লোমশ ল্যাজটা এক-আধবার দুলে ওঠে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই পাশ ফিরে সে আবার চলে যায়। যেতে যেতেও ফিরে ফিরে দু'-একবার তাকায়। গৃধিনীর সেই কান্না সমানে থেকে থেকে বাজতে থাকে। পুরোহিতের শিবা ডাক শুনে, তাঁকে আমার কাপালিকের মতো মনে হয়। আর কোথাও একটি জনপ্রাণী নেই। আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া নিবিড়তা সবখানে। চারদিকে গভীর বন, বড় বড় গাছের গায়ে গায়ে নিবিড় জটলা। তার এক পাশ দিয়ে চোখে পড়ে একদিকের মাঠ। যার কোনো শেষ নেই। সেই দূর আকাশে গিয়ে ঠেকেছে।

আমার ঘাড়ের কাছের শিরাটা কেমন শিরশিরিয়ে ওঠে। গা ছমছম করে যেন, কাঁটা দেয়। সহসাই মনে হয় এমন করে একলা অসময়ে এই মানুষটির সঙ্গে অট্টহাস দেবীর থানে না এলেই হতো! আমার সমস্ত ভিতর জুড়ে যেন কিসের একটা ভয় বিপাকের ছায়া ঘনায়।

পুরোহিত আবার আমার দিকে ফিরে তাকান। বলেন, 'এ বেলা থেকে সারা রাত এরাই মন্দির পাহারা দেয়।'

বলে, মন্দিরের দাওয়ায় উঠে কোমরের কাছ থেকে চাবি বের করে মন্দিরের তালা খোলেন। এই বনের নির্জনে তালা কোন্ কাজে লাগে, কে জানে। যদি কেউ কিছু চুরি করতে চায়, এ তালা সে অনায়াসে নির্বিঘ্নে ভেঙে ঢুকতে পারে। বাধা দেবার কেউ থাকবে না। এক পাশে দু'টি চালাশূন্য চালা রয়েছে। তার দরজা খোলা। লোকজন নেই, বোঝাই যায়।

মন্দিরের দরজা খোলেন। ভিতরে গভীর অন্ধকার, কিছু দেখতে পাই না। উনি সেই স্বরেই ডাকেন, 'আসেন।'

কোথায়? মন্দিরের মধ্যে? সাহস পাই না যেন। তবু পায়ে পায়ে দাওয়ায় উঠে দাঁড়াই। সেখান থেকেই প্রথমে চোখে পড়ে, এক পাশে ঝোলানো খাঁড়ার ধারালো ঝলক। বলির খড়্গ। পুরোহিত ভিতরের অন্ধকারে কোথায় গেলেন দেখতে পাই না। বিগ্রহের স্থানে একটা স্তূপের মতো কিছু দেখতে পাই। দেবীর ওষ্ঠের কী রূপ আছে সেখানে চোখ পড়ে না। নাম অট্টহাস। যেন কোনো করাল মুখ ব্যাদান করে আছে সেখানে, হঠাৎ হাসি বেজে উঠবে হাহা করে।

পিছনে আচমকা পাতার সামান্য শব্দে ফিরে তাকাই। চোখের ওপর দিয়ে চকিতে যেন সেই পাংশুবর্ণ শিবা একটা ঝোপের মধ্যে মিলিয়ে যায়। তার সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হয়ে যায়। আর তখনই চোখে পড়ে, বটের গুঁড়ির গায়ে পাথরে সিঁদুর মাখানো। গুটিকয় মাটির ঘোড়ার পুতুল। গৃধিনী ডাকছে, আঁ আঁ আঁ—উউউ!

'ভেতরে আসেন।'

সেই গলায় ডাক শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি মন্দিরের দিকে ফিরি। পুরোহিতকে দেখি না। কিন্তু ঘরে যেন ক্ষীণ আলো দেখা যায়। প্রদীপ যদি জ্বলে থাকে, শিখায় তার তেজ নেই। এখন একটি দেবীমূর্তি চোখে পড়ে স্তূপের পাশে। চতুর্ভুজা কালো মূর্তি। কালী মূর্তিই কী না বুঝতে পারি না। কারণ, প্রসারিত জিহ্বা চোখে

পড়ে না।

পুরোহিত দরজায় আবির্ভূত হন। আমার দিকে চেয়ে ডাকেন, 'আসেন, দর্শন করে নেন।'

খালি পায়ে ভিতরে ঢুকি। প্রদীপ জ্বলছে ঠিকই, শিখা মরো মরো। যেন তেল নেই, শুকনো পলতে। বাইরে থেকে যা দেখেছি ভিতরেও তাই। বেশীর মধ্যে মন্দিরের কিছু জিনিসপত্র। নতুনের মধ্যে একটি শিবলিঙ্গ।

পুরোহিত ছোট একটা কুষিতে করে চরণামৃত এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'নিন।'

নিয়ে ঠোঁটে ছুঁইয়ে মাথায় ঢেলে দিই। তারপরে প্রাপ্তি, দুটি ছোট ছোট নকুলদানা। দেবীর প্রসাদ। প্রথানুযায়ী কপালে ঠেকিয়ে খেয়ে নিই।

পুরোহিত বলেন, 'একেবারেই যে লোকজন আসে না তা না। সকালবেলার দিকে আসে। পাল-পার্বণে বা চোতমাসে লোকজন বেশ আসে। আর মাঝে মধ্যে সাধক সাধুরা কেউ কেউ এসে থাকেন এখানে।'

না জিজ্ঞেস করে পারি না, 'রাত্রেও থাকেন?'

'হ্যাঁ থাকেন। অই যে বাইরে দুটো চালা রয়েছে, সেখানে থাকেন। চলেন, বাইরে যাই।'

অনুমতি পেয়েই তাড়াতাড়ি বাইরে আসি। পুরোহিত হাতের ঝাপটায় প্রদীপ নিবিয়ে বাইরে আসেন। ঘরের তালাটা লাগাতে দেখে একটু যেন স্বস্তি পাই। বলেন, 'ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পুজো করবার জায়গা তো নয়। সাধকরা নিরিবিলিতে এখানে পুজো করতেন। তান্ত্রিক কুলাচারের চক্র সাধনার ভালো জায়গা। এক সময়ে নাকি নরবলিও হয়েছে এখানে।'

খুবই স্বাভাবিক। নরবলির এমন প্রশস্ত জায়গা আর হয় না। জিজ্ঞেস করি, 'এখানে কি শ্মশানও আছে নাকি?'

'না, এখানে শ্মশান নাই। আমাদের এদিক থেকে সবাই উদ্ধারণপুরের ঘাটেই যায়। সেখানে গঙ্গা আছে, বড় শ্মশান। বিশ পঁচিশ মাইলের সব লোক সেখানেই যায়।'

আকাশে যত না অন্ধকার ঘনায় তার চেয়ে নিবিড় কালো এখানে। মনে হয় অনেক রাত হয়ে গিয়েছে। বিশেষ কিছুই আর চোখে পড়ে না। মন্দিরের দাওয়া থেকে নেমে পুরোহিত জিজ্ঞেস করেন, 'কারণ পান চলে আপনার?'

এখানেও সেই কারণ! এখন আর হকচকিয়ে চমকাই না। রাঢ়ের এইসব অঞ্চলে তান্ত্রিকদেরই প্রাধান্য। জবাব দিই, 'না।'

পুরোহিত বলেন, 'তাহলে এখানেই বসা যেত। রাত্রটা চালাতে থাকতে পারতেন।'

রক্ষে করুন! বক্রেশ্বর মহাশ্মশানে তবু জানতাম আশেপাশে অনেক লোকজন রয়েছে। এখানে এই বনের মধ্যে হাঁড়িকাঠ মাঝখানে রেখে, সারা রাত্রি গৃধিনীর কান্না শুনে, শিবার সঙ্গে চোখাচোখি করে, পুরোহিতের সঙ্গে রাত্রিবাসে মন সাড়া দেয় না। তাছাড়া, কারণবারি যখন আমার চলবে না। বলি, 'না, থাক। অন্য সময় এসে থাকা যাবে।'

এখন বুঝতে পারি, মহাশয়ের চোখ কেন লাল। গলার স্বরই বা এমন কেন। কাপালিকের কিছু অংশ আছে ঠিকই। তবে এখন আর তাঁকে ভয় লাগে না। বরং অন্ধকারে তাঁর কাছ ঘেঁষেই থাকবার চেষ্টা করি। তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে তাঁর হাতে দিয়ে বলি, 'এটা রাখুন।'

টাকা দুটি নিয়ে বলেন, 'জয়স্তু বাবা, বেঁচে থাকেন। মায়ের কৃপা হোক।'

কিন্তু সেজন্যে আমার ব্যয় না। উনি অসময়ে এলেন, দেবী দর্শন করালেন,

চরণামৃত প্রসাদ দিলেন।. তার একটা প্রাপ্তি তো চাই। বলেন, 'তাহলে চলুন যাওয়া যাক। আমার হাত ধরুন।'

তাঁর হাত ধরে নিবিড় অরণ্যের অন্ধকার পথে চলি। গৃধিনীর ডাক পিছনে পড়ে থাকে। শকুনের পাখা ঝাপটা বেজে ওঠে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হয় শিবারা যেন আমাদের আশেপাশেই চলাফেরা করে। শুকনো পাতায় প্রায়ই খস খস শব্দ ওঠে। একটা হাত সামনে রেখে চলি মুখ বাঁচাবার জন্যে। তবু মাকড়সার জাল মুখে লেগে যায়। পুরোহিত আশেপাশের গ্রামের আর পথঘাটের বৃত্তান্ত বকবকিয়ে চলেন।

সে সব কথা বিশেষ আমার কানে যায় না। বাহান্ন পীঠের এই নির্জন নিবিড় বনক্ষেত্রের কথা ভাবি। বাহান্ন পীঠের পুরাণ কথা জানি। দেবীর ওষ্ঠ-রহস্য বুঝি না। তবু সব মিলিয়ে এক গভীর কল্পনা মনোজগতে তরঙ্গ তোলে। পৃথিবীতে কত বিস্ময় আছে। তবু বাঙলার এমন বৈচিত্র্য আর কোথায় আছে জানি না। আকাশের নিচে, দিগন্তবিসারী মাঠের মাঝে এক অরণ্যদ্বীপ। তার মধ্যে কোন্ মানুষেরা খুঁজে পেলো দেবীর ওষ্ঠ! নাম দিয়েছে তার অট্টহাস। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে সঁপেছে নিজেকে।

হয়তো এ সবের মধ্যে যে ভাবনা নিহিত, তার মধ্যে নিজেকে সঠিক খুঁজে পাই না। কিন্তু আমার সমস্ত কিছুর মধ্যে এই অট্টহাসও যেন কোন্ এক স্তরে চাপা পড়ে আছে। এই প্রকৃতি, পরিবেশ, এই হাত ধরে নিয়ে চলা, প্রায় বামনাকৃতি রক্তচক্ষু পুরোহিত- সব কিছুর মধ্যে আমি যেন কোথায় ছায়া ফেলে রয়েছি। সব কিছুতেই এক অচিন অনুভূতির দোলায় আমার মন দোলে। কোন্ এক রহস্যপারে যেন নির্বাক স্তব্ধ হয়ে থাকি।

সৌভাগ্য, এপারের আর যাত্রী ছিল না, তাই নৌকা ওপারে যেতে পারেনি। ওপারে গিয়ে পাচনদি যাবার চিন্তা ছাড়ি। কারণ, কাটোয়া যাবার গাড়ি রাত্রে আর নেই। পাচনদির মতোই সমান দূরে নিরোল গ্রাম। সেখানে আমার পরিচিত মুখোপাধ্যায় বংশ, এক পরম শাক্ত পরিবার আছেন। নাম বলতেই পুরোহিত চিনতে পারেন। অট্টহাস থেকে তিনি একটি গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করে দেন। নিরোলে পৌঁছোতে সময় যায় তিন ঘণ্টা। আমার মনে হয়, এ রাত্রির আর শেষ নেই। আমার চলা যেন এমনি করে চিররাত্রির সঙ্গে বাঁধা থাকবে।

বক্রেশ্বরে যে চাঁদকে ক্ষীণ দেখেছিলাম, এখন তার একটু বৃদ্ধি হয়েছে। তবু পাতলা কুয়াশার ঝাপসাতে এই দশমী বা একাদশীর জ্যোৎস্নাকেও কুহেলিময় লাগে। সমস্ত প্রকৃতি যেন জাগ্রত, অথচ আচ্ছন্ন। গাড়ির চালকের নাম নসীরাম। সে জানায়, সে দুলে। তার বউ ছেলেমেয়ে পরিবার পরিজনের কথা বলে। ভূমিহীন এক কৃষক। আজ রাত্রে আর সে নিরোল থেকে ফিরবে না, কাল ভোর রাত্রে বেরিয়ে পড়বে। পথের কোন্ এক জায়গা নাকি খারাপ। না, ঠ্যাঙাড়ে ডাকাত না, সেখানে একটু অপদেবতাদের বাড়াবাড়ি। রাতবেরাতে একলা চলাফেরায় দু'-একজনের প্রাণ গিয়েছে। কী দরকার, নসীরাম কাল ভোরেই ফিরবে। এই পর্যন্ত বলে, অট্টহাসের দুলে পুরুষ বলদকে বলে, 'চখের মাথা খেয়েছে হারামজাদা, খালি ডাইনে যাবে।' তারপরে সেই দূর আকাশ পর্যন্ত গলার স্বর তুলে মাঠ কাঁপিয়ে গেয়ে ওঠে, 'আমি অই ভয়েতে মুদি না আঁখি।'...

রীতিমত টপ্পা ধাঁচের সুর। জানতেও পারিনি, আচমকা সে এরকম গান ধরে দেবে।

তার চেয়েও বিস্ময়কর, মুখোপাধ্যায় গৃহের বাহির দুয়ারে যখন গাড়ি দাঁড়ায়, তখনো ভাঙা ভাঙা বুড়ো গলায় সেই গানই শুনতে পাই, 'নয়ন মুদিলে পাছে তারা-ছাড়া হয়ে থাকি। এই ভয়ে মুদি না আঁখি।' গলার স্বরেই চিনতে পারি, স্বয়ং গৃহ-

কর্তার গলা। পুজামণ্ডপের অন্ধকারে বসে আছেন।

সাঁওতাল পরগণা ছাড়িয়ে এসে দুর্গাপুরে নামি। যাত্রা কেঁদুলি। কেন্দুবিল্ব। বাউলের পাঁচ রকম রসিকের এক রসিক, জগতজনের কবি জয়দেবের লীলাক্ষেত্রে।

বাউল বলে, 'জয়দেবে যাবো।' তার মানেই কেঁদুলি যাওয়া। আজই সেই পৌষ সংক্রান্তির দিন। আজ জয়দেবের স্মারকোৎসব।

নিরোল থেকে সাঁওতাল পরগণায় ফিরেছিলাম। সেখান থেকে এখানে। কিন্তু গতিক সুবিধার বুঝি না। নতুন লৌহনগরীতে ইতিমধ্যেই মানুষ আর যানবাহনের বেজায় ভিড়। শুনেছিলাম এখান থেকেই মোটর বাস পাওয়া যাবে। ভিড়ের চেহারা-চরিত্র যা দেখি, সেই ছাতিমতলার কথা মনে করিয়ে দেয়। নগর লোকের ভিড় বেশ।

তবে কেঁদুলির বাস যখন খুঁজে পাই সেখানে নগর নাগরিক ছাপছোপ যাত্রী একটু কম। আলাদা মোটরগাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। তার দরকার নেই। সকলের সঙ্গে যাওয়াই স্থির। জানা গেল, কেঁদুলির মোটর বাস নিয়মিত না। মেলা উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন।

গাড়িতে বসবার জায়গা যে পাওয়া যায় সেটাই আশ্চর্য। আমার আশেপাশে অধিকাংশই গ্রামীণ নরনারী। শহুরেরাও আছেন ছড়ানো ছিটানো। শোনা গেল, তাঁদের ভিড় বেশী হবে, যখন কলকাত্তার গাড়ি আসবে। এখন কলকাতা থেকে দুর্গাপুর দিয়েই কেঁদুলির সহজ রাস্তা। অন্যথায় অণ্ডাল থেকে দুবরাজপুর, সেখান থেকে মোটর বাসে জয়দেব। বহুত ঘুর পথ।

ভিড় হলেও শেষ পর্যন্ত প্রকৃতি তার কষ্টটা ভুলিয়ে দেয়। মাইলের পর মাইল শালবন। মাঝখান দিয়ে লালমাটির শক্ত সড়ক। সবখানেই লালে লাল। শালবনের ডালে ডালে পাতায় পাতায় লাল ধুলার মাখামাখি। আলখাল্লা জড়ানো বিবাগী হয়েছে মহীরুহ। পথের ধারে ধারে ঝোপঝাড়ের গায়েও লাল ধুলার ছড়াছড়ি। যাত্রীরাই বা বাকি থাকবে কেন। লাল ধুলাতে আমরাও মাখামাখি হয়ে যাই। তবু ভালো লাগে।

যাত্রী নামার থেকে, ওঠাই বেশী। কিন্তু বেকায়দা করলে এক কৃষ্ণা যুবতী। মাঝপথে কোথা থেকে উঠে কোলের কচি অজাটিকে এনে ফেলে দেয় একেবারে আমার কোলে। নিজেই ঢলে পড়ে আর একজনের কোলে। তারপরেই বিব্রত লজ্জায় কী হাসি! অই মা, দ্যাখ দিকিনি ছাই!

তার আগেই গুটি কয় সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষ গাড়ির মেঝেতেই বসে গিয়েছে। কনডাকটারের ধমকে তাদের কিছুই যায় আসেনি। তাতে পা নীচে রাখাই যাচ্ছিল না। তার ওপরে এই নধর পুষ্ট ছোটখাটো একটি পাঁঠা কোলের ওপর!

কৃষ্ণা যুবতী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। চোট লেগেছে কী না, লজ্জাচকিত মুখ দেখে তাও বোঝা যায় না। কিন্তু এমনি দাঁড়িয়ে থাকতে তো পারে না। অতএব জায়গা থাক বা না থাক, নীচেই কোনোরকমে বসে পড়ে। তারপর হাত বাড়িয়ে দেয় জীবটির জন্য। সেটিকে নিয়ে প্রায় বুকে চেপেই বসে। সে বেচারী ভয়ে ভয়ে তাকায় এক-আধবার ডেকে ওঠে। নানান কলরবের মধ্যে একজন গ্রামীণ যাত্রীর সঙ্গে যুবতীর কথায় জানতে পারি, সে যাবে চিন্তামণিতে! নতুন কথা শুনি যে। যাচ্ছে সবাই জয়দেবে। এ বলে চিন্তামণিতে। এর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কী। বাউলের গানে চিন্তামণি। বিল্বমঙ্গলের কথা শুনেছি বটে। কেননা, সহজিয়াদের পাঁচ রসিকের এক রসিক বিল্বমঙ্গল। তাঁর প্রেমিকা চিন্তামণি। কিন্তু এখানে চিন্তামণি কোথায়। এ

দেশে কি চিন্তামণির নামে কোনো জায়গা আছে নাকি। বিল্বমঙ্গল চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি কবি রায় শেখর আর জয়দেব।

কৃষ্ণা যুবতীর কথায় আরো ভিন্ গলাতেও আওয়াজ ওঠে, 'আমরাও তো চিন্তামণিতেই যেইছি গ।'

সবাই তাহলে জয়দেবে না। অন্য রসিকের খোঁজেও। এমন কথা জানা ছিল না। ভাবি, চিন্তামণি কোথায়। আজ সেখানে কিসের উৎসব!

তার কোনো সঠিক জবাব মেলে না। কিন্তু কৃষ্ণা যুবতীর বুকে আঁকড়ানো জীবটি ম্যাঁ বলে আওয়াজ দিয়ে হঠাৎ ধড়ফড়িয়ে এক লাফ। কী দুর্গতি! সবাই হইহই করে ওঠে। যুবতী হেসে তাকে ধরতে গিয়ে কনুইয়ের একখানি মোক্ষম খোঁচা মারেন আমার ঊরুতে।

কী লজ্জা বলো দিকিনি ছাই! তাই একটু সলজ্জ হাসি। তারপরে কটাক্ষের কোপে একদিকে চেয়ে ঝঙ্কার দেয়, 'তুমি ধরো না!'

যাকে বলে, তার দুরবস্থা আরো। হাত দিয়ে কিচ্ছু ধরবার নেই বেচারীর। কাঁধে ঝোলানো পুঁটুলি। গোঁফজোড়া ভিড়ের চাপে বসে গিয়েছে বলা যায়। ওপর ঠোঁট ঢেকে দিয়েছে। সামনে পিছনে ভিড়ের চাপেই খাড়া আছে। অসহায় চোখে চেয়ে এগিয়ে আসবারই চেষ্টা করে। পাশের লোকে ধমক দেয়, 'ধুত্তোরিকা।'

যুবতী আবার পালটা ঝামটা দেয়, 'থাক, দরকার নাই।'

বলে নিজেই গুছিয়ে-গাছিয়ে পশুটিকে বুকে জড়িয়ে বসে। এবার কৌতূহল প্রকাশ না করে পারি না, 'চিন্তামণিতে পাঁঠা কী হবে?'

যুবতী বলে, 'বলি হবে।'

বলি! সহজিয়া রসিকের থানে বলি! এ যে নতুন কথা শুনি। যুবতীর পাশে যে পুরুষটি নিবিড় হয়ে বসে আছে, সে বলে, 'ওখেনে এক দেবীও আছে ত, সেখেনেই হবে।'

যুবতী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'চিন্তামণির মানত।'

পুরুষটি জবাব দেয়, 'অই হল। অধরার মানত।'

যুবতী ঘাড় কাত করে সম্মতি জানায়। বোঝো, এবার কী বুঝবে। লোকের মুখে শুনলে না হয় প্রত্যয় না হতো, এ যে চোখে দেখি, কানে শুনি!

তবে অবাক হবারই বা কী আছে! অথৈ-এর থৈ পাবার কী আছে। এই যে নানা মতের নানা ছন্দের তরঙ্গ, এ বহু দিকের বহু স্রোতের মিলজুলের মোহনা। তুমি ভাসো সঙ্গমে, যেখানে সব একাকার। আলাদা করে বাছবিচার করতে যাও, খেই হারিয়ে যাবে। বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্য লুইপাদ। সহজ ধর্মের অন্যতম প্রবর্তক। তাঁর নাম শুনবে রাঢ়ের ধর্মঠাকুরের পূজায় মেলায়। সেখানে শত শত বলি, রক্ত নিয়ে হোলি, মদমত্ত নরনারীর উল্লাস উৎসব। জয় বাবা লুই ঠাকুরের জয়! আবার লুইপাদের চর্যাপদের ইঙ্গিত পাবে রসিকের গানে কথায়। বাউলের দুর্বোধ্য গানে। তবে, সমাজে যাদের বলে নিচু ঘর, ধর্মঠাকুরের মত্ত বলিদান উৎসবে তাদের পাবে বেশী। এই কৃষ্ণা যুবতী বা যারা চিন্তামণির যাত্রী, তাদের অনেককেই দেখে মনে হয়, হিন্দু সমাজের সেই 'নিচু ঘরের' মানুষ।

অতএব, কোথায় কিসের যোগাযোগ, সে বিচারে নেই আমি। আমি দেখি, বঙ্গের বিচিত্র রঙ্গ। বিচিত্র এই মানুষের মিছিল। তার মধ্যে নানা বিশ্বাস, নানা চিন্তা, নানা ভাবের খেলা। সেই স্রোতে ভাসি আমি। আমার ভিতরে ছলছলিয়ে কলকলিয়ে ওঠে।

এদিকে গাড়ি যত অগ্রসর হয়, পথের ভিড় বাড়ে। কেবল পায়ে চলা মানুষের

না। যানবাহনেরও বটে। তার মধ্যে গরুর গাড়ি বেশী। শহরে নতুন আসা বলদের ভারী ধন্দ। মোটর বাসের শব্দ শুনেই রাস্তা থেকে নেমে গাড়ি নিয়ে দৌড় দিতে চায় মাঠে। কেবল যে মানুষবাহী গো-শকট, তা না। মালবাহীও প্রচুর। তরিতরকারি ফলফলারি নানান বস্তুর বোঝা। তার মধ্যেই হঠাৎ হঠাৎ দু'-একখানা ছোটখাটো সুন্দর মোটর গাড়ি দেখা যায়। জীপ গাড়িও চলেছে। যাত্রীবাহী দেখলেই মনে হয়, এ পথে মেলায় ছাড়া ভিন্ যাত্রী নেই।

তারপরে অজয়ের কাছাকাছি এসে চিন্তামণির যাত্রীরা নামে আগে। জয়দেবের যাত্রীরা একেবারে অজয়ের উঁচু বাঁধের কাছে এসে নামে। বর্ধমান বীরভূমের সীমানা। এপারে বর্ধমান, ওপারে বীরভূম। মাঝখানে অজয়। চিন্তামণি যাবার ইচ্ছাটা মনে রেখে গাড়ি থেকে নামি।

এবার দেখ লোক। মেলার কাছে এসেছি, দেখলেই বোঝা যাবে। মোটর বাস দাঁড়িয়ে যায় বটে বাঁধের সীমানায়। গরুর গাড়ি বাঁধ ডিঙিয়ে চলে যায়, কাঁকর আর বালি মাটির চরার বুক দিয়ে। জীপ গাড়িগুলোও তাই।

অনেকখানি চরা পেরিয়ে তারপরে নদী। বর্ষাকালে না জানি এ নদীর কী ভয়ংকর প্রমত্ত রূপ হয়! এখনো নদীখানি ছোট না। লাল বালি আর কাঁকর মাটির রক্তাভ চরা পেরিয়ে ওপারের দূরত্ব অনেকখানি। কিন্তু পারাপারের ব্যবস্থা কী?

ব্যবস্থা একটাই, হেঁটে পারাপার। গরুর গাড়িরও তাই। তবে চেনা পায়ের চিহ্ন ধরে চলো। যারা অনায়াসে যায়, তাদের পিছন ধরো। নইলে অগাধ জলে, একেবারে টুপুস! ওদিকে দেখ, দুর্গাপুরের সরকারি জীপ গাড়িতে বাবু-বিবিরাও এসেছেন। কিন্তু কাল করেছে অন্যত্র। সাহেবের পাতলুন গুটিয়ে তোলা যায় না। মেমসাহেবের অবস্থা আরো খারাপ। কাপড় কতখানি তোলা যায়! অজয়ের এ কি খেলা! নারীর লজ্জা হরণ করতে চায়।

কিন্তু লজ্জা আছে তবু নারীরা পার হয়, তাও দেখি। কেননা তাদের কথা হলো, জলে নামব, কাপড় ভেজাব না, তা হয় না। তারপরে আর কী লজ্জা হরণ করবে করো।

এপারে থাকতেই চোঙার ফোঁকা, যে রকম কলের গানের হুংকার শুনি, তাতে তো জয়দেবের বাউল সমাবেশের কল্পনাই মাটি হয়ে যেতে চায়। সার্কাসের তাঁবু। বাজীকরের তাঁবু, এপার থেকেই চোখে পড়ে। সব মিলিয়ে একটা প্রচণ্ড গর্জনের মতো কানে এসে বাজে। মানুষের ভিড় তো অথৈ।

পার হয়ে, পাড়ে উঠে ভিড়ের মধ্যে মিশি। যার নাম মেলা, এ তা-ই। খাজা-গজা মণ্ডা-মেঠাইয়ের দোকান সারি-সারি। তার পাশে ভাত ডাল মাছ মাংস পরিবেশন-কারী নানা নামের হোটেল। ইত্যে যদি লা হয়, তব্যে চপ কাটলেট চা খেয়্যে যান ক্যানে গ! কর্তার পাশে ঘোমটা ঢাকা দিয়ে বউ বসে গিয়েছে। ঘোমটার তলে খ্যামটা নাচে বলে না। ঘোমটার মধ্যে হাত, হাত ভরে খাবার। মেলায় এলে একটু না খেলে মন মানে নাকি।

মনোহারি, বাঁশী, পুতুল, কত কিছুর পসার। কিন্তু এসব এখন দেখতে চাই না। অনেক সময় পাবো, জয়দেবের আসল যাত্রীরা কোথায়। তাদের দেখা আগে চাই। জনস্রোতে একদিকে ভাসতে ভাসতে চলি। তবে, অজয়ের কূল বরাবর পথ রাখি। সামনে এক মন্দির পড়ে। তার চারি ভিতে দাওয়ায় মানুষের ভিড়। শুনি শ্রীরামের মন্দির। তারপরে মনে হয়, গ্রামের পাড়ায় ঢুকে পড়েছি। ঘরের দাওয়ায় দাওয়ায় দোকান। দোকানে নানান পসরা। কোথায় যে সেই শ্রীচরণাচরণ চক্রবর্তী কবির ভিটা, তার খোঁজ পাই না। যার মুখের দিকেই চাই, সবাই আপন ভাবে বিভোর। ভারী

ব্যস্তত্রস্ত দ্রুতগামী।

এমন সময়ে এক বিবাগী বাবাজী গেরুয়াধারীকে দেখি, একতারাটা বঙ্‌বঙিয়ে আপন মনে চলে যায়। তাকেই জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছা, বাউলরা এখানে কোথায় বসেন!'

ঘাড় কাত করে একবার দেখে, বাবাজী বলে, 'আসেন। সব বেদনাশা বটের তলায় আছে।'

বেদনাশা বটতলা! কথাটা শোনা ছিল। স্বরূপে রূপ মাখাচোখা। বেদবিধিতে নাই। বাউল বেদবিরুদ্ধ পথের মানুষ।

খানিক যেতেই দেখি, প্রকৃতি ভিন্ন, পরিবেশ ভিন্ন। অজয়ের ধার ঘেঁষে, মস্ত জমির পরিসরে, অনেক গাছ। গাছতলাতে গেরুয়া রঙের ছেঁড়া কাঁথার ঝুলি আলখাল্লার ছড়াছড়ি। ডারা ডুপ্‌কি প্রেমজুরি, একতারা বাঁয়া গোপীযন্তরী, খোল করতাল খঞ্জনী, কী নেই! হেথায় হোথায় গুচ্ছ গুচ্ছ, আসরে আসরে জমজমাট। লালপাড় গেরুয়া ছোপানো শাড়িধারিণী যেমন পাবে, পাড়হীন গেরুয়া থান পরা বৈষ্ণবীর রসকলিও দেখবে। চুলদাড়িতে ঝাপটা যত, কামানো সাফানো চিকন মুখে কালার হাসিও তেমনি ঝলক দেয়।

কেউ গায়, 'গৌরচাঁদে দেখবি যদি, চল গ নদীয়ায়।' পায়ের ঘুংগুরে বোল্ তুলে, কোমর দুলিয়ে, কেউ বলে, 'জান্‌গে, মানুষের করণ কিসে হয়।'...

একতারাওয়ালা বাবাজীটি কোথায় হারিয়ে যায় দেখতে পাই না। আমি দেখতে দেখতে যাই। সবাই যে কেবল এমনি বসেছে, তা নয়। এর মধ্যে আবার অস্থায়ী আখড়াও হয়েছে। বাঁশের বেড়ায় খড়ের চালে, কোনোরকমে একটা ডেরা। বড় ব্যবস্থাও আছে। চারদিকে বেড়া দিয়ে, মাঝখানে মস্ত তাঁবুর আস্তানা। সেখানে নাম-করা ক্ষ্যাপা কিংবা বাবাজীদের সমাবেশ। তাদের শিষ্যসাবুদদের চেহারাও আলাদা। কোট-পাতলুনে সাহেব। ঝকমকানো ধুতি-পাঞ্জাবিতে বাবু। সেই সঙ্গেই সঙ্গিনীরা মেমসাহেব আর বিবি। সব মিলিয়ে, তবু ভালো লাগে। নানা রূপের ছন্দে, এক অপরূপের সুর বাজে। রূপে রূপে লহর তোলে।

এই সমাবেশ আর আখড়াগুলোর সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে দেখি, নদীর কিনার একটু নিরালা। এই শেষ বেলাতেও সেখানে কেউ কেউ অজয়ের তুহিন জলে ডুব দেয়। নদীর ধারে, ধানকাটা মাঠের ফাঁকে ফাঁকে রবিখন্দের সবুজ আঁচল পাতা।

এদিক থেকে ফিরে যাই। কোনো একটা আখড়ায় ঢুকে পড়লেই হবে। তার আগে, গোপীদাসের সঙ্গে একটু দেখা করা দরকার। জয়দেবে তারা নিশ্চয়ই এসেছে। যত ভিড়ই হোক, খুঁজে নিশ্চয়ই পাবো। একটা মুখ তো না। অনেকগুলো মুখই চিনি।

অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে, দিকে দিকে বাতি জ্বলে। বড় আখড়ায় হ্যাজাক জ্বলে। ছোট আখড়ায় হ্যারিকেন, গাছতলার খোলা সমাবেশে, তাও প্রায় নেই। বড় বড় কাঠের গুঁড়িতে আগুন জ্বালিয়ে আলো হয়েছে। আলো তাপ, এক সঙ্গেই। মকর সংক্রান্তি বলে কথা। গঙ্গাসাগরের যাত্রায়, যত না শীত পাবে, এখানে রাঢ়ের সীমায় তার বেশী।

গাছতলাতে এক জায়গায় এক বাউলকে দেখে মনে হয়, রূপে ভুবনমোহন। বয়স কাঁচা। কালো রঙ, ডাগর চোখ। এখনো ভালো করে দাড়ি ওঠেনি। পায়ে তার ঘুংগুরের গোছা। গায়ে কাঁথার জোড়ায় আলখাল্লা। কোমরে শক্ত করে বাঁধা এক ফালি গেরুয়া। সব থেকে পাগল করে তার গলা। যেমন মিঠে, তেমনি উঁচু। ভঙ্গিতে হরিণের নাচ। সে নিজে মাতাল গানে। তার গানে মাতাল বাকীরা। সকলেরই শরীরে দোলা লেগে গিয়েছে। তার সঙ্গের নরনারীরা ঘিরে রয়েছে, মাঝখানে আগুনের শিখা।

দেখেশুনে চলতে ভুলে যাই। সেখানেই বসে পড়ি। নিজেরাই সরে বসে জায়গা করে দেয়, 'বস্যেন, বস্যেন দাদা।' হাতে হাতে প্রেমের গাঁজার কলকেখানি ফেরে। ফিরতে ফিরতে হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা, 'চইলবে নাকি দাদা।'

না, থাক। সেধেছে তাই যথেষ্ট। পাগলটার গানেই মজে থাকি।

এর মধ্যেই দেখি খিচ্ খিচ্ করে বিদ্যুচ্চকিতে ঝিলিক হেনে যায়। বুঝতে পারি, নগরবাসীদের ক্যামেরার ঝিলিক। ফটো তোলা হচ্ছে। কেউ কেউ খাতা কলম নিয়ে ঘোরেন। বাউলের গান লিখে নিয়ে যান।

তারপরে হঠাৎ একেবারে আমার পাশ থেকে, মুখের সামনে একটি মুখ। চেনা মুখ যেন! ছোটখাটো মুখখানি, নাকে আবার নাকছাবি। আয়ত চোখ দুটিতে অনুসন্ধিৎসা আর রাজ্যের বিস্ময়। হঠাৎ আমার পিঠে একটা আল্তো চড় মারে আবার। বলে ওঠে, 'ই গ, তুমি! তাই ভইবছি, ই ত সিই বাবাজী। ইখানে বস্যে আছ তুমি?'

আমার বিস্ময় ততোধিক! গোকুলের বোন কুসুম যে! এ কী করে আমাকে দেখতে পেলো। এই অন্ধকারে ভিড়ের মধ্যে! চিনতেই পারে কী করে। জিজ্ঞেস করি, 'কুসুম তো।'

তার জবাব পরে। হাত ধরে টেনে বলে, 'এস্য, এস্য শীগ্গির।'

আশেপাশের কৌতূহলিত অনুসন্ধিৎসায় না উঠেই বা উপায় কী। কুসুম যেন আমাকে নিয়ে প্রায় ছুট দেয়। জিজ্ঞেস করি, 'সবাই এসেছে? গোপীদাস বাবাজী, তোমার দাদা, এরা সব কোথায়?'

'তুমি এস্য ক্যানে।'

কোন্ দিকে যে সে নিয়ে যায় ঠাহর করতেও পারি না। লোকের গায়ে ধাক্কা লাগে। পড়ি না মরি, এ কি ছোটা! সে আসে একটা ভাঙাচোরা পাকা বাড়ির ভিটের মাঝখানে। সেখানে কয়েকটা হ্যারিকেনের আলো। বাঁশ ঘিরে বেড়া করে মাথায় খড়ের চাল দিয়েছে। কে যেন গান করে। ভিড়ও মন্দ হয়নি।

কিন্তু সে পর্যন্ত যাবার আগেই কুসুম থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে একটা গাছতলার কাছে। বলে, 'দ্যাখ ক্যানে।'

লেপামোছা গাছতলায় যে কয়জন বসেছিল তাদের একজনের দিকে চোখ পড়তে অবাক হয়ে যাই। সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায়। চমকিত বিস্ময়ে যেন এক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু সে হাসে না। তার ঠোঁট কেঁপে যায়। অস্পষ্ট উচ্চারণ শোনা যায়, 'তুমি!'

আমি অবাক হলেও হেসে জিজ্ঞেস করি, 'কবে এলে?'

ঝিনি কোনোরকমে বলে, 'গতকাল।'

এখনো যেন ওর চোখে অবিশ্বাস, বিস্ময়, আর সেই সঙ্গেই একটা রুদ্ধ আবেগের থর থর ভাব। জানতাম না, ঝিনি—শ্রীমতী অলকা চক্রবর্তী এখানে উপস্থিত। বেশবাস এত রুক্ষ কেন কে জানে। আবাঁধা চুলে মুখে যেন ধুলো। শাড়ির অবস্থাও তথৈবচ। সারা শরীরের কোথাও এক কণা অলংকারের চিহ্ন নেই। হাতে একটা বড় ব্যাগ। কিন্তু ওর চোখ ছলছলিয়ে ওঠে দেখে আমি বিব্রত হই। আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বলে উঠি, 'বসো।'

ও থমকে যায়। আমার কানে আসে, 'আপনিও বসুন।'

শ্রীমতী লিলিও এসেছে! ও বসে আছে গাছতলাতেই। চোখাচোখি হতে হাসে। ঘাড় নাড়িয়ে ডাকে।

কুসুম আমার গায়ে একটা খোঁচা দিয়ে বলে, 'বস্য বাবাজী, বউদিকে সম্‌বাদ

দিয়ে আসি।'

কুসুম চলে যায়। ঝিনি বসবার আগেই আমি বসি। তারপরে ও বসে। গায়কের দিকে ফিরে দেখি, স্বয়ং গোপীদাস। গান করে, 'অ রাই, কিছু দিন মনে মনে, যতন করে শ্যামের পীরিত রাখ গোপনে।'

বুড়া দাড়ি নাড়িয়ে চোখ ঘুরিয়ে হাসে। আমার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়। সে হাত তোলে আসর থেকে। আমিও তুলি। তারপরে সে ভাঙ ভাঙা গলা চড়িয়ে গায়,

'ইশারায় কইবি কথা,
দেখিস যেন কেউ না শোনে।
কিছুদিন মনে মনে—
ও রাই, রাই লো!'...

আমার ডাইনে লিলি বাঁয়ে ঝিনি। গাছতলাতে এদিক ওদিক, আরো দু-চারজনা। দেখলে চেনা যায়, তারা শহুরে কেতার মানুষ না। গ্রামীণ মানুষ, বসে বসে গান শোনে। তবে শহুরে মেয়েদের দিকে নজরে কিঞ্চিৎ কৌতূহল। হয়তো গোকুলদাসদের সঙ্গে শিউড়ি থেকেই এসেছে। কিংবা গোপীদাসের হেরুক থেকে। নতুবা নিতান্ত জয়দেবের যাত্রী আসর নিয়ে বসে গিয়েছে।

গোপীদাসের গানের আসরেও লোকজন কম না। রাধা বৃদ্ধা পাশে আছে তার। সুজন গোকুলও রয়েছে। সুজন তার দোতারা বাজায় হেলেদুলে। বিন্দু কোথায় কে জানে। কুসুম তাকে কোথায় ডাকতে ছুটে গেল জানি না। কিন্তু মজা লাগিয়েছে বটে গোপীদাস। গান গাও তুমি আসরে বসে। তোমার যত ভুরু কাঁপানো, চোখের ইশারা, হেসে হেসে হাত তুলে এদিকে দেখানো কেন। কেবল কি তাই। গানের কথাও তেমনি। সেই যে বলে, 'কথা পড়ে সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে' সেই রকমের ব্যাপার। গোপীদাস গায় সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে। সে যেন বিটলে বুড়োর মতো চোখের নজর আর গানের কথা, গাছতলাতে ছুঁড়ে মারে,

'আগে না জেন্যে প্রেম-ফল
খেয়েছিলেম প্রেমের গাছে উঠ্যে।'

গানের সঙ্গে হাঁ করে হাত দিয়ে খাওয়ার ভঙ্গি করে। তারপরে বুক চেপে ধরে, মুখ বিকৃত করে গায়,

'অই গ জাইনলে খেত্যেম না,
গাছে উইঠতেম না
এখন বিষের জ্বালায় বেড়াই ছুট্যে।...
সি প্রেম সরল লয় হে, গরল মাখা,
জম্মাবধি স্বভাব বাঁকা।
এখন উগরাইতে লারি।
উহু মরি মরি
বিষের জ্বালায় আমার পরান ফাটে।'...

হায় হায় ধ্বনি ওঠে আসরে। আর গোপীদাসের বারে বারে এদিকে চেয়ে ইশারা করা দেখে আসরের সবাই গাছতলার দিকে ফিরে ফিরে চায়। বড় গোলমেলে বুড়া। অকারণ মানুষের সামনে লজ্জা দিতে চায়। আবার হেঁকে জিজ্ঞেস করে, 'হাঁ চিতেবাবাজী, ঠিক বইলছি তো?'

হেসে ঘাড় নাড়ি। তবু একটা আড়ষ্টতা ঘোচে না। যতবার চোখ তুলি, ঝিনির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। লিলি হঠাৎ পাশ থেকে বেজে ওঠে, 'আপনি আর ঘাড় নাড়বেন না মশাই।'

'কেন?' বলে তার দিকে ফিরে তাকাতেই ঘাড় অবধি রুক্ষ চুলের গোছায় ঝাপটা দেয় নাগরিকা। সখীর দিকে তাকায়। ঝিনি চোখ নামিয়ে নেয়। ওর গায়ে ফুল-তোলা মেয়েলী পশমী শাল, আঁচলের মতো করে গায়ে ছড়ানো। লিলির গায়ে মেমসাহেবের পশমী কোট। সামনের দিকে বোতামগুলি সব খোলা। তার ফাঁকে রাঙা শাড়ি, রাঙা জামা শোভে। ওর তুলনায় ঝিনিকে বৈরাগিনীই মনে হয়। গেরুয়া রঙের খয়েরী পাড় শাড়িতে খয়েরী রঙের নানা ছাঁদের ছাপ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় নামাবলী বুঝি।

লিলি প্রায় চোখ পাকিয়ে বলে, 'কাল আসতে পারেননি?'

অবাক হয়ে বলি, 'কাল আসবার তো কোনো কথা ছিল না।'

'কথা না থাকলে বুঝি আসতে নেই?'

এরকম পালটা প্রশ্নের জবাব হয় না। তাই বলি, 'না, শুধু শুধু আসব—মানে—।'

লিলি সে কথায় কানই দেয় না। আবার বলে ওঠে, 'আর কথা থাকলেই যেন আপনি আসতেন?'

বলে ঝিনির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ঝিনি হেসে বেজে ওঠে। যেন এতক্ষণে মনের মতো একটা কথা শুনেছে। বলে, 'তাই না বটে!'

সঙ্গে সঙ্গে লিলির পাল্‌টা কথা, উল্‌টা রূপ। তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে ঝিনিকে বলে, 'থাক ভাই, তুমি আর কথা বলো না।'

অমনি ঝিনির অবাক চোখ দুটি বড় হয়ে ওঠে। মুখে একটু রঙ লেগে যায়। প্রায় যেন অভিমান করে বলে, 'কী মেয়ে বাবা!'

এবার আমার অবাক হবার পালা। আমি মধ্যখানে বসে দুই সখীকে দেখি। লিলির কথা শুনে মনে হয় না এ মেয়ে একেবারে নিটুট নাগরিকা। ঘাড় নেড়ে বলে, 'এখন কী মেয়ে বাবা! কই, কাল থেকে তো এরকম হাসতে দেখিনি।'

বলেই আমার দিকে চায়। আবার বলে, 'কাল থেকে এ মেয়ে নিয়ে মশাই একেবারে ভাজা ভাজা হয়ে গেলাম।'

ব্যাপার বুঝত পারি না। লিলির কথার ঢঙে হাসি পায়। তবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কী ব্যাপার?'

লিলি ঝিনির দিকে দেখিয়ে বলে, 'জিজ্ঞেস করুন কী ব্যাপার। আমার কোনো ব্যাপার নেই।'

বলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আমি তাকাই ঝিনির দিকে। ঝিনি যেন বিব্রত বিস্ময়ে সখীর দিকে চেয়ে থাকে। তবু ভুরুতে একটু বাঁক। চোখের তারায় যেন কী কথা। মুখে কিছু বলে না।

লিলি আবার আমার দিকে ফেরে। জিজ্ঞেস করে, 'কেঁদুলিতে কবে আসবেন নানুরে ওকে বলেছিলেন?'

মনে করতে পারি না ঠিক। কিন্তু দুই সখীর কথার বিষয় এবার অনেকটা আঁচ করতে পারি। বলি, 'ঠিক মনে নেই। এখানে আসব বলেছিলাম।'

লিলি বলে, 'আর কাল থেকে এসে অবধি কী খোঁজাখুঁজি। কাল তো তবু একরকম গেছে। আজ সকাল থেকে তো নাড়ি ছেড়ে যাবার যোগাড়।'

ঝিনি আর একবার অস্বস্তিতে লজ্জায় বলে ওঠে, 'আহ্, কী হচ্ছে লিলি!'

এখন আর লিলিকে থামানো যাবে না। সারা দিনের একটা শোধ তো আছে। মনে মনে আমিও বলি, থাক না এ প্রসঙ্গ।

লিলি বলে, 'এত বড় মেলায় এত মানুষের মুখ দেখে বেড়ানো যায়! বলুন তো মশাই।'

ওর 'মশাই' বলা শুনলেই আমার হাসি পায়। বলি, 'খুব অসুবিধে!'

ঝিনি এবার আমার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে ভুরু বাঁকিয়ে তাকায়। বলে ওঠে, 'মোটেই তা করিনি।'

'করিসনি?'

লিলির কাজল লাগানো চোখের পাতায় কুঞ্চন। ঝাপসা রঙ ঠোঁটে ক্ষোভের স্ফুরণ। বলে, 'আমি একলা সাক্ষী, না? কুসুম বিন্দুরা সাক্ষী নেই? তারপরে কী যেন সেই ছেলেটির নাম—কাশীনাথ, সে পর্যন্ত খুঁজেছে।'

এবার আমিই বলে উঠি, 'তা এত খোঁজাখুঁজির কী ছিল।'

লিলি হাত উলটে বলে, 'সেটা আপনি জানেন আর ইনি জানেন। মুখ দেখেই বুঝতে পারছেন, দুপুর বেলা ইনি মুখে অন্ন তুলতে পারেননি। এবার যান, খাইয়ে নিয়ে আসুন।'

আমাকেও জড়িয়ে দিয়ে লিলি বড় বেশী লজ্জায় ফেলে দেয়। কিন্তু ঝিনির এতটা উতলা হবার কী ছিল। হবেই বা কেন। আমি ঝিনির দিকে ফিরে তাকাবার আগেই ওর গলায় প্রায় একটা আর্ত আক্ষেপের ধ্বনি বাজে, 'আহ্ লিলি, কিছু রাখলিনে।'

বলেই মুখটা নিচু করে দু' হাতে ঢাকে। লিলি তখনো আপন স্রোতে বহতা, 'আপনি আসবার একটু আগেও গোটা মেলার ধুলো মেখে ফিরেছি। সন্ধ্যাবেলা তো মেয়ে—।'

কথা শেষ হবার আগেই লিলি চকিত হয়ে ঝিনির দিকে ফিরে তাকায়। ঝটিতি উঠে গিয়ে একেবারে ঝিনির গা ঘেঁষে বসে। উদ্বেগে হেসে বলে, 'এই ঝিনি, ও কি, রাগ করলি আমার ওপর?'

ইহার নাম মানবী লীলা। একটু ভেঙে বললে, যুবতীলীলা। এর কী বুঝবে বলো। ঝিনিকে দেখে বোঝা যায়, ও মুখ ঢেকে কাঁদছে। রোধ করতে চেয়েও পারছে না। লিলির কথায় কোনোরকমে ঘাড় নেড়ে জানায়, রাগ করেনি।

লিলি চকিতে একবার আমার দিকে চায়। এখন সখীকে বিঁধিয়ে কাঁটায়, নিজে বেঁধে অনুশোচনায়। বলে, 'তবে কেন কাঁদছিলি? আমি কি যার-তার সামনে কিছু বলেছি? ওঁর সামনেই তো বলেছি।'

ঢাকা মুখ থেকেই ভেজা রুদ্ধ গলা শোনা যায়, 'কাঁদিনি।'

লিলি আবার আমার দিকে চায়। ওর আঁকা ভুরু কাঁপে, চোখের তারায় কী যেন ইশারা করে। ইশারা ধরতে পারি না। তাই জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকি। আর বুড়া বাউলটা কী লাগিয়েছে দেখ। সেই চোখ ঘুরিয়ে ঘাড় নাড়িয়ে গেয়েই চলেছে,

'আই আই. কে বলে সই পীরিত ভালো
পীরিত কর‍্যে ই লাভ হল্য
সোনার বরন কালি কইল্য
পীরিত কন্নোদ্ধারে পিরবেশিয়ে
ঢুইকল যেইয়ে হিদ্মাঝারে
শেষে ধরে আপন জোর
আমারে করে চোর
অকলঙ্ক্যে কলঙ্ক রটো।'

লিলির চোখের তারায় তখনো কী এক নিঃশব্দ ইশারা। যদি বুঝেও থাকি তার ইশারা, সেই মতো কাজ করা দায়। আমার পক্ষে ঝিনিকে সান্ত্বনা দেবার কিছু নেই। বরং অন্য কথা বলি, 'আপনারা যে আসবেন, সে কথা আমার জানা ছিল না।'

লিলি বলে, 'নাই বা থাকল। না হয় আজ সকালেই আসতেন।'

এ কথারও কোনো জবাব থাকতে পারে না। হঠাৎ ঝিনি ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলে, 'জানা থাকলে বোধ হয় আসতে না, না?'

এখনো চোখ শুকোয়নি। ভেজা আরক্ত চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি হানে ঝিনি। অবাক হয়ে হেসে বলি, 'আসব না কেন? বলেছিলাম তো আসব।'

'কিন্তু জানতে না যে, আমরা আসব।'

'তা জানতাম না বটে।'

'জানলে কি আসতে?'

কী উত্তর দেওয়া যায় এ কথার। যে কোনো কারণেই হোক, জয়দেবের মেলায় আসব না কেন? এ তো আমার অনেক দিনের ইচ্ছা। ঝিনি আসবে জানলেও আসতাম। ও এত ভুল ভাবে কেন? এত অবিশ্বাস কেন?

ওর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে হঠাৎ আমার দেখাটা বদলে যায়। ওর চোখ দিয়ে যেন ওকে দেখতে পাই। আর তখন হাসির মধ্যেও একটা কষ্ট কেমন খচখচিয়ে ওঠে। ও এসেছে অনেক দ্বন্দ্বের মধ্যে ধন্দের দোলায় দুলতে দুলতে। অনেক সংশয়ে হাতড়ে ফিরে, প্রতি মুহূর্তে হতাশা কাটিয়ে কাটিয়ে চোখের আলোয় আশা ফুটিয়ে। ওর সঙ্গে আমার তুলনা হয় না। ও এসেছে যোগিনী হয়ে। ওর সব কিছুতেই সেই ছায়া, সেই রূপ। ও যে আসে ভয়ে ভয়ে। কিছু ভুল, অবিশ্বাস থাকবেই তো।

এই মুহূর্তে, ওর মুখ থেকে চোখ সরাতে ভুলে যাই। মন যেখানেই ঘাড় ফিরিয়ে থাক, ও যে কী সুন্দর, তাই ভেবে মুগ্ধ হয়ে থাকি।

ঝিনি হঠাৎ ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করে, 'কী দেখছ?'

'তোমাকেই।'

ঝিনি যেন ভয়ে চমকে কেঁপে ওঠে। যেন উৎকণ্ঠায় স্ফুরিত হয়, 'মিথ্যুক।'

'সত্যি।'

'মিথ্যুক মিথ্যুক মিথ্যুক।'

তিনবার করে বললেই যেন সত্যি হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গেই আবার জিজ্ঞেস করে, 'একবারও কি ভেবেছিলে, আসতে পারি?'

সত্যি কথাই বলি, 'সেটা ভাবিনি বটে।'

'জানলে কি আসতে?'

ঘুরে আবার সেই কথা। নির্দ্বিধায় জবাব দিই, 'আসতাম।'

ওর সন্দিগ্ধ চোখে গভীর বিমর্ষতা ফোটে। মাথা নেড়ে বলে, 'বিশ্বাস হয় না।'

'কেন বিশ্বাস হয় না?'

ওর দৃষ্টিতে অন্যমনস্কতা ফোটে। গলার স্বরেও জাগে। বলে, 'কী জানি কেন বিশ্বাস হয় না। কেবলই মনে হয়, আমি যেখানে থাকব, তার অনেক দূর দিয়ে তুমি চলে যেতে চাও।'

ঝিনির এই অসহায় রূপটা আমি চিনি। জানি, আমাকে উপলক্ষ করে যে কথাটা বলে, সে কথা ওর জীবনের গভীরে মিশে আছে। এমনিতে যে ভয়ংকর কিছু জটিলতায় জড়িয়ে আছে, তা না। ওর দাদার মৃত্যু, দাদার বন্ধু হেনরির কারাবাস, ওর প্রায় কৈশোরেই সেই রাগী বিষণ্ণ দুঃখী বন্ধু, স্বামীই বলা চলে, যার সঙ্গে ওর আইনত বিয়ে হয়েছিল, মারা গিয়েছে অথচ বাবা-মা জানেন না, সব মিলিয়ে কিছু মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা আছে। তার পরেও আর দশটি মেয়ের মতো নিটোল সংসার পেতে জীবন কাটানো এমন কিছু আশ্চর্যের ছিল না।

কিন্তু সংসারে যারা নিটোল জীবনে অনায়াস হতে পারে না, ভিতরে আছে

সেই বিড়ম্বিত মন। আয়াসের মধ্যেই ওর আশা ফেরে। অনায়াস কিছু দেখলে ধন্দ লাগে। যে কারণে ও ছুটে বেড়ায়। না পাওয়ার মধ্যে ডুব দিতে চায়। সম্ভবত এমন মনেরই বিশেষত্ব, চোখের জলেই হাসির কিরণ দেখবে বলে চেয়ে থাকে। ঈশ্বরে ওর বিশ্বাস আছে কি না জানি না, কিন্তু জীবনের সব কিছুই যে বড় দূরে, দূর দিয়ে চলে যায়, ওর এই আর্তস্বরে কোনো ফাঁকি নেই।

ওর কথা শুনে লিলির সামনে আমার একটু লজ্জা করে। লিলি সখীর মুখের দিকেই চেয়ে রয়েছে। আমি একটু হেসে হাল্কা করেই বলি, 'এটা তুমি ভুল করো। দূর দিয়ে চলে যাব কেন। আমি তোমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলব কেন। মানুষ নিজের তাগিদেই বাঁচে, নিজের তাগিদেই চলে।'

ঝিনি দ্রুত মাথা নেড়ে বলে, 'ঠিক তাই, ঠিক তাই। তুমি চলে যাও নিজের মনে, আমি তোমাকে ধরতে পারি না। সেটাকেই বলি, দূর দিয়ে চলে যেতে চাও।'

ঝিনি যদি এমনি করে বলে, তবে তার জবাব দিতে পারি না। তারপরে হঠাৎ হেসে, দু'চোখে ঝিলিক দিয়ে বলে ওঠে, 'আচ্ছা, যদি এমন হতো তুমি খালি আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে চাও, তাহলে কী ভীষণ ভালো হতো?'

ধন্দের চমকে জিজ্ঞেস করি, 'কেন?'

ও বলে, 'ভালো হতো না? খালি এড়িয়ে চলতে যাওয়া মানেই তো কিছুতেই আমাকে ভুলতে পারবে না। সব সময়ে মনে রাখতে হতো।'

সহসা ওর কথার কোনো জবাব দিতে পারি না। আর ও সারা শরীরে তরঙ্গ তুলে নিঃশব্দে হাসে। আবার যেন লজ্জা পেয়েই ফুল-তোলা শাল দিয়ে ঘোমটা টেনে একটু মুখ চাপা দেবার চেষ্টা করে।

লিলিও যেন অবাক হয়ে যায়। বলে, 'তুই তো সাংঘাতিক মেয়ে ঝিনি।'

ঝিনি কোনো জবাব দেয় না। লিলিই আবার বলে, 'অমনি করে মনের মধ্যে থাকতে হবে?'

ঝিনির যে গলার কাছে স্বর আটকে গিয়েছে, চোখ ভেসেছে, তা ওর কথায় বুঝতে পারি। বলে, 'উপায় না থাকলে এমনি করেই থাকতে হয়। কী করব।'

লিলি আমার দিকে তাকায়। ওর দৃষ্টিতে একটা করুণ অভিযোগ ফোটে। আমি ডাক দিই, 'ঝিনি।'

'বলো।'

বলতে পারি না কিছু। কী বলতে হবে, তা জানি না। তবু বলি, 'বলছি, এমন করে বলো না।'

ঝিনি তাড়াতাড়ি চোখ মুছে পরিষ্কার গলায় বলে, 'তোমাকে ভারী জ্বালাতন করছি। রাগ করো না যেন। সারাটা দিন এত কষ্ট পেয়েছি, আর ভয় পেয়েছি, আমার মাথার ঠিক নেই। চলো আমরা মেলায় বেড়িয়ে আসি।'

লিলি সঙ্গে সঙ্গে চোখ কপালে তুলে বলে ওঠে, 'ও কি রে ঝিনি, আবার বেড়াতে যাবি কী? সারা দিন ঘুরে ঘুরে আমার যে কোমরে ব্যথা ধরে গেছে!'

'সত্যি, তাও তো বটে।'

লিলি বলে, 'তুমি যাও তো যাও, তোমার এখন নতুন বল এসেছে। আমি পারব না ভাই।' বলে আমার দিকে চেয়ে ঝিলিক হানে।

ঝিনি বলে ওঠে, 'কী বিচ্ছিরি মেয়ে!'

দুই সখীতে আবার লাগে। লিলি বলে, 'হ্যাঁ, আমি বিচ্ছিরি, তুমি খুব সুচ্ছিরি।'

বলেই আমার দিকে ফিরে বলে, 'কীভাবে এসেছি জানেন? কাউকে কিছু বলা নেই, কওয়া নেই, শুনি শ্রীমতী একলাই কেঁদুলিতে চলে আসছেন। শুনে বাড়ির লোকদের

দুশ্চিন্তা। ওর মা আমাকে বললেন, 'তোরা কেউ সঙ্গে যা। একলা একলা কোথায় যাবে।'

আমি হেসে বলে উঠি, খুব ভালো পন্থা বটে। এক যুবতীকে রক্ষা করতে আর এক যুবতী।'

লিলি বলে ওঠে, 'আরে মশাই, যুবতী কাকে বলছেন। সেসব চিন্তা মাথায় থাকলে তো! আমার বন্ধু তো যাকে বলে পাগলিনী। আর আমি তার পাহারাদার। ও সব যুবতী চিন্তা-টিন্তা কিছু নেই।'

ইতিমধ্যে আমার সামাজিক প্রশ্নগুলো মনে পড়ে। ঝিনিকে জিজ্ঞেস করি, 'তোমার বাবা-মা কেমন আছেন!'

ঝিনির জবাব একটু তেরছা হবেই। বলে, 'তবু যা হোক, মানুষ দুটোকে লিলি মনে পড়িয়ে দিল। ভালোই আছেন। তোমার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে দেখা হয়েছে শুনে বাবা বললেন, জানলে যেতাম। মায়েরও খুব ইচ্ছে হয় তোমাকে দেখতে।'

অগ্রহায়ণের দক্ষিণের দরিয়ায় লঞ্চের ছাদ-ঘরে দুটি মানুষের মুখ মনে পড়ে যায়। যাঁদের সামনে দেখলে মনে হয়, প্রৌঢ়ত্বের সীমায় দুটি নিবিড় প্রাণের যোগে বহতা। অথচ শোকের ছায়া গভীর হয়ে পড়ে আছে দু'জনের মধ্যে। বলি, 'সময় করতে পারলেই একবার দেখা করে আসব।'

ঝিনি এখন অন্য মানুষ। আমার অনেকখানি কাছে, ঘাড় বাঁকিয়ে মুখ কানের কাছে এনে চুপি চুপি স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'সত্যি? কবে সময় করতে পারবে বলে মনে হয়?'

ওর ঠাট্টা বা বিদ্রূপ, যাই হোক, এমনই তীব্র, আমাকে অবাক হয়ে হেসে বাজতে হয়। বলি, 'কেন, বিশ্বাস হয় না?'

'অবিশ্বাস করিনে। কিন্তু এটুকু বুঝেছি, তোমার চলার পথে না পড়লে কারুর সঙ্গেই দেখা হয় না।'

'কেন, আমার কি সমাজ সামাজিকতা নেই?'

'আছে, সকলের মতো নয়। ওই যে তখন বললে, মানুষ নিজের তাগিদেই চলে বাঁচে। এড়িয়ে তো তুমি যাও না।'

বলে ঘাড় কাত করে আমার চোখের দিকে কটাক্ষ করে। আমার মুখে কোনো কথা যোগায় না। এমন সময় বিন্দু এসে দাঁড়ায়। সেই লালপাড় গেরুয়া শাড়ি। এই মাত্র যেন কপালে সিঁথেয় সিঁদুর দিয়ে এসেছে। গায়ে একটি খয়েরী রঙের সুতীর চাদর। এসেই সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলে, 'জয় গুরু চিতেবাবাজী, জয় গুরু।'

আমিও নড়েচড়ে বসে বলি, 'জয় গুরু।'

বিন্দু আড়চোখে চায় ঝিনির দিকে। ঘাড় দুলিয়ে চোখ বড় বড় করে বলে, 'সি হিসাবে লয় গ বাবাজী, ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি বইলছি। না কি বলো গ লিলিদিদি?'

লিলি বলে, 'তুমিই বলো। আমি বলতে গিয়ে তো দোষী।'

বিন্দু ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, 'তাই নিকি? ক্যানে, হাস্যে না কান্দ্যে?'

বলে ঝিনির দিকেই আড়চোখে চায়। লিলি বলে, 'দুই-ই।'

বিন্দু বলে ওঠে, 'অই অই, বুইঝলে গ লিলি দিদি, উ রাগ তোমার জন্যে নয়, কাঁদাও তোমার জন্যে লয়। সবই কারণে কারণ আছে, বুইঝলে তো?'

এতক্ষণে ঝিনি বলে, 'বাবারে বাবা, বিন্দুদি এবার চুপ করো। আমার অপরাধ হয়েছে।'

বিন্দু সেদিকে চায় না। বলে, 'এখন আর অপরাধ বা কী, অন্যায় বা কী। আর তো আমাদিগে দরকার নাই, ক্যানে গ লিলিদিদি।'

লিলি বলে, 'ঠিক বলেছ।'

ঝিনি লজ্জায় হাসে। বিন্দু আমাকেও বিব্রত লজ্জিত করে। জিজ্ঞেস করি, 'ভালো আছ তো বিন্দু?'

বিন্দু কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে। বলে, 'ভালো বাবাজী। তবে সাধক আমার বাবার নজর, যে তোমার নাম দিইছে চিতেবাঘ। ই কী ঝিনিখেকো গ!'

বলে সে নিজে খিলখিলিয়ে বেজে ওঠে। সেই সঙ্গে তার এই বিচিত্র বিশ্লেষণে লিলি ঝিনিও বেজে ওঠে। আর আমি বিন্দুর ঠাট্টায় একেবারে এতটুকু হয়ে যাই। জয়দেবে এসে এমন কথাও শুনতে হলো। এই কি নামের বিশ্লেষণ!

আমার অবাক লাগে অন্য কারণে। লিলি ঝিনির মতন এমন বিদুষী নাগরিকাদের সঙ্গে বিন্দু নামে বাউল প্রকৃতির এত আশনাই কেমন করে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উঠোন পেরিয়ে আসা নগরের একেবারে হাল গমকে গামিনী এমনি মেয়েদের কাছে, কোনো বাউল প্রকৃতিকে এত নিকট হতে দেখিনি। কেবল তা-ই কেন, এমন দুই দুনোকে পাশাপাশি কে দেখেছে। তাদের জগৎ আলাদা, বহেও দুসরা গাঙে। অথচ দেখ, জয়দেবের বেদনাশা বটের তলায় তিন সখীতে এক ভাবের ভাবিনী।

সংসারে সবই আছে; সমাজ শিক্ষা নগর গ্রাম। কিন্তু তার ওপরে আরো কিছু আছে, যেখানে কোনো কিছুতেই ফাঁক ফারাক থাকে না। সে তুমি বিশ্বের বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে এস কিংবা পাড়াগাঁয়ের পাঠশালা থেকে। সেই যে এক চিরন্তনের খেলা আছে, কালো ধলো রাঙা হরিৎ সকল নদী সাগরে গিয়ে মেশে, সেই রকম। সেই এক চির মেয়ে, এক অগাধে যেয়ে মেশে। তখন আর আলাদা করে চেনা যায় না। এখানে এই বেদনাশা বটের তলায় সেই চির প্রকৃতির খেলা।

এর মধ্যেও একটা সুর বেজে যায়। যে যা-ই বলুক, হাসুক কাঁদুক রাগুক, সব মিলিয়ে একটা সুর বেজে ওঠে। বেসুরের আঘাত লাগে না। যে অচিনের খোঁজেই ফিরি, ফেরার তালে, যতই দ্বিধা সংশয় ভয় বিরক্তির দোলা লাগুক, জানি যাবো 'আপন দেল্-এ।' ফকির যেমন তার মুরশেদের দেল্-এ যায়, তেমনি আমার নিজের দেল-এ। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাবো এই সুরটুকুও। কোথাও একটু থেমে ঝুলি ঝাড়া দিলেই এই সুরটুকু বাজবে মনের কোণে। সেইটুকু আমার প্রাপ্য। তবু ওরা তিন সখীতে যখন হাসে তখন নিচুস্বরে বিন্দুকে না বলে পারি না, 'তা বলে এমন একটা নাম দিলে?'

বিন্দু অমনি আমার কাছে এসে কানের কাছে মুখ এনে বলে, 'রাগ কইরলে বাবাজী?'

বলি, 'না, লজ্জা পেলাম।'

বিন্দু আমার ঘাড়ের কাছে আল্‌তো করে একটি চাঁটি মারে। ফিসফিস করে বলে, 'দূর ছাই, তোমাকে কিছু বইলছি নাকি? যাকে বলার, তাকেই বইলছি, তোমার নাম দিয়ে বইলছি। তোমার লজ্জার কী আছে।'

বিন্দুর সঙ্গে আমার চোখে চোখ মেলে। দৃষ্টিতে তার অনুসন্ধিৎসা, একটু বা কটাক্ষে কোপ, কিন্তু কৌতুকে নিবিড়। গলার স্বরে সান্ত্বনার আভাস। এ সময়ে সেই কথাটা মনে হয়, স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্! বিন্দুকে যেন একটু ছলনাময়ীই মনে হয়। ভোলাতে চায় নাকি আমাকে।

তারপরে আবার চুপি চুপি বলে, 'তবে বাবাজী, ঝিনদিদিটো একেবারে মইরেছে গ, উয়ার আর কিছু নাই।'

আমি হাত জোড় করি না বটে। অসহায় করুণ চোখে বিন্দুর দিকে চাই। বিন্দু তাড়াতাড়ি বলে, 'আচ্ছা, বইলব না বাবাজী, বইলব না।'

বিন্দু হাসে। নিশ্বাসও পড়ে সেই সঙ্গে। নিশ্বাসের বাষ্প জমে আমারও। তবু যেন কৃতজ্ঞতা বোধ করি বিন্দুর কাছে।

ইতিমধ্যে গোপীদাস আসর থেকে উঠে আসে গাছতলায়। এসেই দু' হাত বাড়িয়ে দেয়, হাঁটু পেতে বসে। আমি তার হাত ধরতে যাবার আগেই মোটা কাঁথার আলখাল্লা সহ বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে। তার দাড়ি আমার মুখে লেগে যায়। দাড়িতে মুখে স্পষ্ট গাঁজার গন্ধ। তা হোক, তার এই ব্যগ্র আলিঙ্গনে মনটা টলটলিয়ে ওঠে। হঠাৎ মনে হয়, গোপীদাসের পায়ে হাত দেওয়া উচিত ছিল আমার। কিন্তু লজ্জা করে। আমি যে আমাকে ছাড়তে পারি না। নিজেকে ভুলতে পারি না। তাই নানা লজ্জা, নানা সঙ্কোচ।

সে বলে, 'জয় গুরু, জয় গুরু, ভালো তো বাবাজী?'

বলি, 'ভালো।'

'তখন থেক্যে দেইখছি আর ভাইবছি, কখন বাবাজীর কাছে যাবো। আনন্দে ছিলে তো বাবাজী? আনন্দে থেক্য, খালি আনন্দ।'

তার ঘড়ঘড়ে গলায় আবেগ। তার আনন্দের স্বরূপ কী, জানি না। তাকে যেরকম সদানন্দ মনে হয় তেমন কি আমি হতে পারি? আমার সে মন নেই। কিন্তু তার কথার মধ্যেই যেন একটা আনন্দের সুর বাজে, অনুভবে বাজে। বলি, 'আপনি ভালো আছেন তো?'

'ভালো, ভালো বাবাজী। কিন্তুন "আপনি আজ্ঞে" ক্যানে গ, উটি কর‍্যো না।'

ঝিনি এমন করে আমাদের কুশল জিজ্ঞাসার ছবি দেখে যেন মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ। যেন ওর চোখেও একটা আকাঙ্ক্ষা।

গোপীদাস আলিঙ্গন ছেড়ে আমার হাত ধরে বলে, 'তব্যে বাবাজী, দিদিমণিদের সাথে আমার কথা নাই। উঁয়ারা আমাদিগের আখড়ায় আসেন নাই। ক্যানেই বা আইসবেন। আমাদিগের হল্য গরীবের আখড়া। ই ভাঙা পোড়োতে কোনো রকমে একটুক জোড়াতালি দিয়ে লিয়েছি। ইখানে দিদিমণিদের আসা চলে না।'

ঝিনি কয়েকবারই গোপীদাসের কথার মাঝখানে কথা বলবার চেষ্টা করে। বাউল বুড়োও তেমনি। এক দমে বলে যায়। ঝিনি বলে ওঠে, 'এটা ঠিক বললেন না গোপীদাস বাবাজী। আপনাকে তো এসেই বলেছি, আমার উপায় ছিল না।'

ব্যাপারটা এখনো আমার বোধগম্য না। লিলি ঝিনি বিশেষ কোনো জায়গায় এসে উঠেছে নাকি? প্রথম থেকে আমার ধারণা, আমার মতোই মেলায় চলে এসেছে। তারপরে যেমন সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, সেইরকম একত্র হওয়া। আমি ঝিনি লিলির দিকে তাকাই।

গোপীদাস বলে, 'সি তো আমার কপালের দোষ গ ঝিনুদিদি। নইলে মদনের আখড়ার খোঁজ মেলে কলকেতায় বস্যে, ই বুড়ার কথা মনে থাক্যে না।'

আমি জিজ্ঞাসু চোখে ঝিনির দিকে তাকাই। ও একটু লজ্জা পেয়ে বলে, 'আমাদের এক ইস্কুলের এক মাস্টারমশাই মদন বাউলের আখড়ার খবর দিয়েছিলেন। চিঠিপত্র লিখে আগে থেকেই যোগাযোগ করেছিলেন, সেই সূত্রেই অন্য আখড়ায় উঠেছি। কোনো ঠিক ছিল না তো, হঠাৎ—'

আর বলতে দেয় না গোপীদাস। বলে, 'বুইঝলে বাবাজী, সি খোব বড় আখড়া, বড় মানুষের আখড়া। বাঁকুড়ার মদন বাউলের যে মেলাই নামডাক। কত বড় বড় লোক উঁয়ার শিষ্যি সাবুদ, জজ ম্যাজিস্টর উকিল বেস্তর। উই পচ্চিমে গেলেই দেইখতে পাবে অজয়ের পাড়ে পেল্লাই তাঁবু খাটিয়েছে। কত লোকজন, অষ্টপ্রহর চুলা জ্বইলছে, রান্না হইলছে। অই সি কী বল্যে গ, আহ্ হ্ঁ হ্ঁ, মায়িক্ মায়িক্।

সব সোময় মায়িক বাইজছে...।'

এবার কথার মাঝে বিন্দু বলে ওঠে, 'কিন্তুন গোঁসাই মদন মস্ত বড় সাধক বাবা।'

গোপীদাস তাড়াতাড়ি কান মলে জিভ কাটে। বলে, 'অই, সি কথা কি বইলতে গ মা! গুণে না থাইকলে কি কেউ গুণিন হয়! এমনি এমনি কি আর মদন গোঁসাইয়ের কাছে সবাই ছুট্যে যায়? ওঁয়ার কত বড় আখড়া, তাই বইলছি।'

ঝিনি বলে, 'আমি কিন্তু বড়-ছোটর কথা কিছু ভাবিনি। ভাবলাম, অচেনা জায়গা, এত বড় একটা মেলা, কে কোথায় আছে, কোথায় গিয়ে উঠব। এমন সময় আমাদের ইস্কুলের এক মাষ্টারমশাই বললেন, তিনি ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। তিনি নিজেও মদন গোঁসাইয়ের শিষ্য।'

গোপীদাস হাত তুলে বলে, 'বুঝেছি গ ঝিনদিদি।'

বুকে হাত দিয়ে বিষণ্ণ হেসে বলে, 'মন যে মানে না। নিজের মানুষ পরের ঘর কইল্ল্যে কার মন মানে। তোমরা আমার মানুষ য্যে, ক্যানে কী না, আঁ? তব্যে—'

কথা শেষ না করে বুড়ো দাড়িতে হাত বোলায়। আর একবার আমার দিকে, আবার ঝিনির দিকে চোখ ঘুরিয়ে চায়। ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলে, 'হুঁ, চিতেবাবাজীকে ত ছাইড়ছি না। এখন দেখি কোন্ পাল্লায় ওজন বেশী।'

তার কথা শুনে সবাই হেসে ওঠে। গোপীদাস তখনো বলে, 'দেখি ইবারে কোন্ আখড়ার নোক কোন্ আখড়ায় ঘুরাফিরা করে।'

বলেই আমার ঘাড়ের থেকে হাত বাড়িয়ে ঝোলাটা টেনে নামায়। বলে, 'এখনো কাঁধে করে রইয়েছ? দাও ওটা। নে বিন্দু, চিতে বেঁধ্যে থো যেইয়ে।'

আবার হাসে সবাই। বিন্দু হাত বাড়িয়ে আমার ঝোলাটা নেয়। লিলি বলে, 'বোঝাই যাচ্ছে আপনার আখড়ার পাল্লাই ভারী হবে। আমি তো সব সময় আপনাদের আখড়াতেই এসে পড়ে থাকব।'

বলে ঘাড় বাঁকিয়ে তেরছা চোখে সখীর দিকে তাকায়। ঝিনি লজ্জা পায়। বলে, 'এক জায়গায় উঠতে হয় তাই উঠেছি। চেনাশোনা সবাই যেখানে থাকবে সেখানেই সময় কাটবে।'

গোপীদাস একেবারে গল্‌গলিয়ে হাসে। চোখে বিট্‌লে ঝলকানি। বলে, 'তা হল্যোই হল্য।'

তারপরে গোপীদাসের সঙ্গে আমার দু-চার কথা হয়। কখন এসেছি, আপাতত কোথা থেকে আগমন। শুনে বলে, 'আমাদিগের ঘরে লিয়ে যা মা বিন্দু, বাবাজী একটুক হাত-পা ছড়িয়ে বসুক যেইয়ে। তা'পরে গান তো সারা রাত্তির আছেই।'

অবাক হয়ে বলি, 'সারা রাত্রি?'

'বটে৷ ক্যানে বাবাজী, সারা রাত্তিরই তো মেলা। সি জন্যেই তো জয়দেবে আসা। রসিককে মনে মনে ভইজব আর গান গাইব। একদিন হক আর সাত দিন হক, হেথায় এস্যে থাইকলে গাইলে রসিকভজন হয়। উতেই বাউলের পুণ্যি। তা'পরেতেও অনেকের অনেক মানত মানসিক আছে, হেথায় এস্যে রেঁধ্যে বেড়্যে খাবে থাইকবে। আজ মকর সংক্রান্তি গেল, কত নোকে অজয়ে চান কইল্ল। আজ যে অজয়েতে গঙ্গাসাগরের পুণ্যি।'

এত ব্যাপার জানা ছিল না। আজ অজয়ের জলেই গঙ্গার স্রোত বহে। মনে করলে কোপাইয়ের জলে যমুনা বহে, সে কথাও শুনেছিলাম কোপাইয়ের কূলে। সব থেকে ভালো লাগে, মানত মানসিকের জন্যে জয়দেবে এসে সবাই রাত্রিবাস করে। রেঁধে বেড়ে খায়। জিজ্ঞেস করি, 'এই রকম মানত করলে কী হয়?'

বিন্দুর চোখ দুটি অমনি ঝিলিক দিয়ে ওঠে। চকিতে একবার ঝিনদের দিকে

দেখে নিয়ে বলে, 'ক্যানে গ বাবাজী, মানত কইরবে নাকি?'

'না।'

'তব্যে?'

'এমনি জানতে ইচ্ছে হয়।'

গোপীদাস বলে, 'মনোবাসনা পুইরলে আবার হেথায় এস্যে ই সোমায়ে থাইকতে হয়। রেঁধ্যে বেড়্যে খেত্যে হয়, অজয়ে ডুইবতে হয়। যেমন কর্যে মানত তেমন কর্যেই পূরণ।'

বিন্দু বলে, 'তুমি যদিন আজ উবেলা আইসতে, তবে মকর চান কইরতে আমাদিগের সাথে। ঝিন্‌দিদি লিলিদিদি, সবাই কর্যেছে।'

লিলির ঠোঁট তৎক্ষণাৎ বক্র। বলে, 'তবে আর নয়। যা নোংরা, বিশ্রী!'

গোপীদাস সস্নেহে হেসে বলে, 'সি তো হব্যেই গ দিদিমণি। কত নোক এস্যেছে, হাজার হাজার।'

তারপরে বিন্দুকে বলে, 'যা মা, সব্বাইকে লিয়ে যা। বাবাজী আর দিদিদেরও লিয়ে যা।'

আমি ঝিনি আর লিলির দিকে ফিরে চাই। ঝিনি আমার দিকে চেয়ে ছিল: চোখাচোখি হতে চোখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় লিলির দিকে। লিলি জবাবে বলে, 'হাতে-মুখে একটু জল দিতে ইচ্ছে করছে। তোয়ালে সাবান, সব তো সেখানে রয়েছে। তোর ইচ্ছে করছে না চোখে-মুখে জল দিতে?'

ঝিনি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। বিন্দু বলে 'সাবাং তয়লে দিতে লাইরব ভাই, তবে জল দিতে পাইরব আমাদিগের আখড়ায়।'

লিলি বলে, 'তার জন্যে নয়। সারাদিনের এই জামাকাপড়গুলো ছাড়তে ইচ্ছে করছে। সেই তো কোন্ সকালে নদীতে স্নান করে পরেছি। এর পরেও তো সারা রাত আছে।'

লিলির কথা শেষ হবার আগেই আমার কানের কাছে ঝিনির নিচু স্বর বাজে, 'খুব ক্লান্ত নাকি? অনেকক্ষণ বিশ্রাম নেবে?'

বলি, 'না। আমারও একটু চোখে-মুখে জল দেবারই ব্যাপার।'

লিলি বলে ওঠে, 'আমাদের থেকে তো ক্লান্ত নন মশাই। যান হাত-মুখ ধুয়ে নিন গে, তারপরে আমাদের ওখানে আসুন।'

'আপনাদের আখড়ায়?'

'ওই যাই বলুন। কেন, নিষিদ্ধ জায়গা নাকি?'

'তা নয়, জানাশোনা নেই—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই ঝিনি বলে ওঠে, 'আমরাই আসব, তুমি থেকো।'

তার কী প্রয়োজন জানি না। লিলি বলে ওঠে, 'তুই আর মেয়েদের ইজ্জত কিছু রাখলিনে ঝিনি। উনি আসতে পারবেন না?'

বিন্দু বলে, 'পাল্লা কোন্ দিকে ভারী সিটি দেইখতে হব্যে তো। তোমাদিগেরই আইসতে হব্যে। আমাদিগের আখড়ার মান নাই ক্যানে? এস্য বাবাজী।'

বিন্দু ওদের দিকে নিঃশব্দ হাসি ছুঁড়ে দিয়ে প্রায় আমাকে ঠেলে নিয়ে যায়। ওরা হেসে চলে যায়। গোপীদাস ইতিমধ্যে আবার আসরে গিয়ে বসেছে। যেদিকে গানের আসর তার পিছনদিকেই ভাঙা পোড়ো ঘর। তার দেওয়াল আছে তো ছাদ নেই। ঘরের মেঝে বলে কিছু নেই। তাতেই বেড়া বেঁধে খড়ের আচ্ছাদন করে সাময়িক আশ্রয় তৈরি করে নেওয়া গিয়েছে। দরজার কোনো পাল্লা নেই। এখানে তার দরকারও নেই। পিছনের উঠোনে ত্রিপলের ঢাকনা দিয়ে রান্নার ব্যবস্থা। সেখানেই

দেখা যায় নিতাইকে। নিতাই ছাড়াও দু-তিনজন রয়েছে। তার মধ্যে একজন স্ত্রী-লোক। সেখানে হ্যারিকেন ছাড়াও মোটা শীষের লম্ফ জ্বলে। ঘরের মধ্যে হ্যারিকেন। খড় বিছিয়ে তার ওপরে শতরঞ্জি পাতা। এই শীতের মধ্যে ব্যবস্থা মন্দ না।

পাশে আর একটি ঘর আছে। সেখানেও টিমটিমে আলো। বিন্দু আমার ঝোলা নিয়ে পাশের ঘরেই যায়। বলে, 'ঝোলাটা ই ঘরেই রইল। আশ্রমের জিনিসপত্তর সব ই ঘরেই রইয়েছে।'

তারপর সে এদিক-ওদিক ফিরে কুসুমকে ডাকাডাকি করে। তার কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। আমি বলি, 'তাকে যে গাছতলাতেই দেখেছিলাম।'

বিন্দু হতাশায় ঘাড় নেড়ে বলে, 'উয়ার কথা আর বল্য না বাবাজী, আমার হাড়-মাস কালি কর্যে খেল্যে সি বিটি। কখন কোথা যেইছে না যেইছে বুইঝতে লাইরছি। উ এস্যেই তো আমাকে বইললে, তোমাকে নাকি কোথা থেক্যে ধর্যে লিয়ে আইসছে।'

'হ্যাঁ, কুসুমের সঙ্গেই আমার প্রথম দেখা হয়েছে। কাশীনাথ আসেনি?'

'আস্যে নাই আবার! সিই তো জ্বালা বাবাজী। দুটোতে কাক চিল বইসতে দিচ্ছে না, ঝগড়া ঝগড়া ঝগড়া।'

আমি হেসে ফেলি বিন্দুর কথা শুনে। বিন্দু বলে, 'হাইসছ কী বাবাজী, আমি যে আর পারি না। কুসিরও বলিহারি! আজ দুপুরে কী মারটা মের্যেছে কাশী কুসিকে। তবু কি লজ্জা আছে ছুঁড়ির? দ্যাখ যেইয়ে, দুটোতে কোথাও বেড়াল্ছে, লয় তো কাশী লুকিয়ে কোন্ আসরে যেইয়ে গাঁজা টাইনছে, কুসি খুঁজে মইরছে।'

তথাপি আমার হাসি দমে না। সামনের প্রাঙ্গণে আসরে গোকুলের গলায় গান শুনতে পাচ্ছি। চারদিকেই গানের সুর। নানান্ যন্ত্রে, নানা স্বরে, বটতলার বিশাল প্রাঙ্গণ মুখরিত। তার মাঝখানে কাশী আর কুসুম এক বিচিত্র খেলা খেলে চলেছে। ওদের নাম-গান নেই, ভজন-সাধন নেই। চারদিকে আখড়ায় আশ্রমে সকলের কত কাজ। সেই দায়দায়িত্ব নেই ওদের। চারদিকের এই ডামাডোলে ওরা আপনাতে আপনি মত্ত। সেও যেন এক সাধন, কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এতে যে কোন্ রসিকের ভজন হচ্ছে কে জানে। মনে হয় কোন্ এক অদৃশ্যে বসে কে যেন মিটিমিটি হাসে চোখ চিকচিক করে। অলক্ষ্যে তার দৃষ্টি ফেরে কাশী কুসুমের সঙ্গে।

বিন্দু বিরক্তিতে হেসে বাজে। আবার বলে, 'সত্যি, দুটোকে লিয়ে আর পারি না।'

আমি বলি, 'ওরা আপন মনে আছে।'

'ছাই, তা থাইকলে তো বাঁচা যেত্য। দ্যাখ ক্যানে, হাঁকডাক পেড়্যে এল্য বল্যে। হ্যাপা যত আমার। আসুক, কাশী কুসি, একজনও নালিশ কইরতে আসুক, দুটোকেই আমি ইবারে দুচচার ঘা লাগাব।'

বলে, ঘাড়ে একটা দোলা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। রোষের মুখেও একটু হাসি তবু লেগে থাকে। তাতে বোঝা যায়, দুচচার ঘা দেবার মতো হাতের বা মনের জোর তার নেই।

তারপরে বিন্দু আমাকে পিছনের উঠোনের এক পাশে নিয়ে যায়। সেখানে জল ছিল। হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে আসতেই নিতাই এসে 'জয় গুরু' দেয়। আসল কাজের লোক সে-ই। মাটির ভাঁড়ে করে গরম চা খাওয়ায় সে। গুড়ের চা, একটু হলুদের গন্ধও আছে। তা হোক। গরম পানীয় তো। এই শীতের রাত্রে তা-ই বা কে দেয়। নিতাইয়ের হাতের চা, একটু হলুদের গন্ধই বা না হবে কেন। হলুদ রঙের হাত দেখেই বোঝা যায়, বাটনা তাকেই বাটতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে বিন্দু রান্নার দিকে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার মধ্যেই ডেকে বলে, 'বাবাজী,

একটুকু বস্যে, ইদিকে দেখ্যে যাই।'

এ যেন অনেকটা যজ্ঞিবাড়ির গিন্নীর ব্যস্ততা। তার ওপরে অনেক দায়িত্ব। হয়তো খিচুড়ি, একটা পাঁচমিশেলি তরকারি, একটু বা ভাজাভুজির আয়োজন। তবু খাবে হয়তো অনেক লোকে। প্রকাণ্ড মাটির উনুন আর হাঁড়ির আকৃতি দেখে তা-ই মনে হয়। বিন্দুর ব্যস্ত না হয়ে উপায় কী। তবু সে নিতাইকে আমার কাছ থেকে ডেকে নিয়ে যায় না। আমিই বলি, 'আপনি যান, কাজ করুন গে, আমি বেশ আছি।'

'বিন্দুঠাকরুন রাগ কইরবে।'

'রাগ করবে না। বলবেন, আমি বলেছি। আমি একটু একলা থাকি ততক্ষণ।'

নিতাই উঠতে উঠতে হঠাৎ কেমন কাঁচুমাচু মুখ করে শরীর বাঁকিয়ে হাসে। হাত বাড়িয়ে বলে, 'তবে আপনার ঐ বস্তু একটো দেন খাই।'

কী বস্তু? অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতেই সে আর একটু সলজ্জ হেসে গলে। ঠোঁটের ওপর দু' আঙুল রেখে ধূমপানের ভঙ্গি করে বলে, 'অই বস্তু।'

অর্থাৎ সিগারেট। আমি তখন সিগারেট ধরিয়েছি। আমারই ভুল, আমারই সাধা উচিত ছিল। তবু, এই মুহূর্তে ইছামতীর বুকে অধর মাঝির নৌকোয় মামুদ গাজীর কথা আমার মনে পড়ে যায়। সিগারেট আর দেশলাই এগিয়ে দিই। তখুনি নিতাইয়ের চলে যাবার লক্ষণ না দেখে জিজ্ঞেস করি, 'আপনিও বাউল তো নিশ্চয়?'

নিতাই জিভ কেটে তাড়াতাড়ি বলে, 'আমি কিছু না বাবাজী। আমাকে আপনি-আজ্ঞা কইরবেন না। আখড়ায় থাকি, কাজ কম্মো করি। আর কিছু না।'

বলে নিতাই মাথা নিচু করে হুস্ হুস্ সিগারেট টানে। কী যেন ভাবে, কী যেন বলি বলি করে বলতে পারে না। তারপরে হঠাৎ বলে ওঠে, 'আমি আজ্ঞে আসলে —কী বইলব বলেন, দাগী চোর ছিলাম।'

দাগী চোর? বলে কী লোকটা! অবাক অবিশ্বাসে নিতাইয়ের দিকে দেখি। তার মুখ তেমনি নিচু, কিন্তু মুখের চামড়া কাঁপে। যেন অনেক কথার তরঙ্গ। কিন্তু গোকুল-দাসের আখড়ায় দাগী চোর, ব্যাপার বুঝতে পারি না।

নিতাই নিজেই বলে, 'আপনাকে বইলতে তো বারণ নাই, আপনি হল্যেন গোকুল-দাস বিন্দুঠাকরুনের নিজের নোক। আমি জেলখাটা দাগী চোর ছিলাম। সিঁদেল চোর।'

এলিয়ে বসেছিলাম। সোজা হতে হয়। জিজ্ঞেস করি, 'জেল খাটাও হয়েছে?'

'আজ্ঞা হঁ, তা দু' দফায় তিন বছর। তারপরে ই দুনার পাল্লায় পড়্যে দশ বছর আর উ কাজ করি নাই।'

'কেন?'

'তা কী জানি বাবাজী। আমিও তো শিউড়ির মানুষ, ইয়াদের কাছে একটুক-আধটুক আসা-যাওয়া ছিল। যিখানেই যেত্যেম, সব্বাই দূর দূর কইরত। তা কইরবে বটে, চোরকে আবার বইসতে দিবে কে। কিন্তুন গোকুল বিন্দু কোনোদিন তাড়ায় নাই। উ তো দূরের কথা, বিন্দু আবার বইসতে দিত। ক্যানে, ইয়াদের কি ভয় নাই? ভাইবতাম, মনে মনে ভাইবতাম। জিগেঁসাও কইরেছি, "চোর বল্যে মনে করো না নাকি, খাতির কর্যে বইসতে দাও যে?" বলে, "তা যিখানে চোর আছ, সিখানে চোর আছ, আমাদিগের কী।" "ক্যানে, তোমাদিগের ঘরে চুরি করতে পারি তো।" "পারো, কইরবা। আমাদিগের কী চুরি কইরবা লিতাই, কী আছে। পিতল-কাঁসার কিছু বাসনপত্তর, মরাইয়ের দু-চার মণ ধান। আর কী লিবে? তা সি ও তুমি এখনই লিতে পারো, পিতল-কাঁসা ছাড়াও লোকের চলে, ঘরে ভাত না থাইকলে

ভিক্ষে কইরতে যাবো।" কথাটা যে মিথ্যা বইলত তা লয়। আমাকে বসিয়ে রেখ্যে দুজনায় নিজের নিজের কাজে যেত্য। ইচ্ছা কইরলে চুরি কইরতে পাইরতাম। তা ইচ্ছা হত্য না।'

প্রায় নিবে আসা সিগারেটে পর পর কয়েকটা টান দেয় নিতাই। মুখ এখনো ভার নিচু। আর আমি এক অদ্ভুত কথা শুনি। সে আবার বলে, 'তা কেউ যদি আমার হাতে ধন তুল্যে দিয়ে বলে, লাও হে চুরি করো, তা কি হ—য় বাবাজী! গোকুল-বিন্দুকে লোকে সাবধান কইরত, লিতাই চোরে একদিন উয়াদের পথে বসিয়ে যাব্যে। তাতেও ভয় ছিল না। উলটে কী হল্য জানেন বাবাজী, দেখি গোকুল বিন্দু আখড়া ছেড়্যে, শিউড়ি ছেড়্যে কোথা কোথা চল্যে যায়, আর আমিই আখড়া দেখাশুনা করি। তখন গোয়াল গরু দেখি, না আখড়ার ঘর-দোর সামলাই, না গাছপালা, মাচা মরাই দেখি। তার উপরে অই কুসি বিটি, সিটি তো এতটুক। উয়াকেই বা কে দেখে। শুধু কি তা-ই, কেউ এল্যে তার সেবাযত্ন করা, বসানো খাওয়ানো। লাও ঠ্যালা, কখন সিঁদ কাইটতে যাব্যো বলেন।'

সে হাসতে হাসতে এবার আমার দিকে চোখ তোলে। দেখি, তার চোখ দুটো কেমন আরক্ত। একেবারে শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটের অঙ্গার, সে অনায়াসে দু' আঙুলে টিপে নিবিয়ে ফেলে। যেন ওটা আগুনই না। আমার কথা কখন বন্ধ হয়ে যায়। আমি যেন এক অবিশ্বাস্য আশ্চর্য কাহিনী কেবল শুনি।

নিতাই হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'একদিন বিন্দু বল্যেছিল, "দ্যাখ লিতাই, চুরি যদিন কইরতে হয় তো একটা জিনিস্ কইরবে, তার কোনো মার নাই।" কী জিনিস? না, বইললে, "মন।"

বলে নিতাই আবার নিঃশব্দে তার শক্ত পেশীবহুল শরীরটা কাঁপিয়ে হাসে। হাসিতেই তার চোখ দুটো প্রায় ঢেকে যায়। বলে, 'বাবা রে, সি কি আমার কম্মো, বলেন তো বাবাজী। বসেন, উদিকে একটুক দেখ্যে আসি।'

সে চলে যায়। আর নিতাইয়ের মুখের ওপরেই গোকুল বিন্দুর মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এই যুগল রূপকে আমার ভালো লেগেছিল। সেই ভালো লাগাটা নিতান্ত চোখ ভরানো। নানুর থেকে শিউড়িতে ফিরে আসা সেই রাত্রেও তা-ই। কিন্তু এমন মুগ্ধ বিস্ময়ে মন ভরে যাওয়া না। এখন জানি, এ যেমন-তেমন যুগল না। আপন অন্বেষণে আছে।

আর নিতাই। চোরের রাণী বিন্দু যে সিঁদকাটি তার হাতে তুলে দিয়েছিল, তার কী গতি। সে কি কেবল সিঁদ কেটেই চলেছে? না কি মনের ঘরের খোঁজখবর কিছু পেয়েছে? কে জানে।

এত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ সামান্য শব্দে চমকে উঠে দেখি দরজায় দুই সখী দাঁড়িয়ে। লিলি আর ঝিনি। বেশবাসে এমন কিছু অদলবদল নেই। পশমী শাল এবং কোট, দু-ই আছে। তবু যেন দ্যুতিতে ছটা লাগানো। রঙে ঝলকানো।

আমার সঙ্গে ওদের চোখাচোখি হতেই ওরা পরস্পরের দিকে তাকায়। তারপরে লিলি আমাকে খুব নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যাপার মশাই, কিসের স্বপ্ন দেখছেন?'

অবাক হয়ে বলি, 'না, স্বপ্ন দেখিনি তো।'

লিলি আমার চেয়ে বেশী অবাক হয়ে বলে, 'তা-ই নাকি? আমরা তো ভাবলুম আপনার বাহ্যজ্ঞান নেই। কখন থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছি, আপনার কোনো চৈতন্যই নেই।'

বলি, 'তা নয়, একটা কথা ভাবছিলাম। এইমাত্র শোনা একটা কথা।'

লিলি ঝিনি চোখাচোখি করে। ঝিনি জিজ্ঞেস করে, 'কী কথা?'

'এদের আখড়ার নিতাইয়ের কথা।'

লিলি তাড়া দিয়ে বলে, 'আচ্ছা, সে কথা শুনব, এখন উঠুন তো, চলুন।'

'কোথায়?'

'যেখানে খুশি। যেখানে আমরা যাবো সেখানেই। আজ সারা রাত্রি আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন।'

'অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ। আসুন।'

লিলি ঝিনিকে দেখতে পেয়ে বিন্দু ঘরে আসে। দু'জনের দিকে চেয়ে চোখ ঘুরিয়ে হাসে। ভেজা হাত লাল পাড় গেরুয়ার আঁচলে মুছতে মুছতে বলে, 'বাবা গ, তোমাদিগের মতলব কী গ! আজ কি জয়দেবের সব বাউল-বাবাজীদিগের মাথা ঘুরিয়ে দেব্যে, না কি মেলার মানুষদিগের?'

দুই সখীর সাজ দেখেই বিন্দু এমত বচনে বাজে। আড় চোখে একবার আমাকেও দেখে নেয়। বিন্দুর কথা একেবারে মিথ্যে না। বেশবাসে যদিও তেমন অদল-বদল হয়নি, ঝিনির কুসুম রঙের, আর লিলির গাঢ় পুঁইমেটুলি রঙের রেশমী শাড়িতেই চোখে ঝলক লেগে যায়। তার ওপরে ঝিনি যদিবা প্রসাধনের দিকে ততটা যায়নি, একটু যা মুখের ওপর হালকা প্রলেপ, ঠোঁটে সামান্য একটু রঙ বুলানো, লিলি একেবারে পুরোপুরি। মুখে, চোখে, ঠোঁটে, সবখানেই তার গাঢ় রঙের প্রলেপ। সেই সঙ্গেই ফাঁপানো চুলের আবাঁধা তরঙ্গে সে যেন নিজেই দোলে। ঝিনি ওর গায়ের চাদরটা কেমন করে যেন ঘাড়ের ওপর দিয়ে জড়িয়েছে, পিছনের চুলের গোছা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। দুই সখীর হাতে দু'টি নাগরিকা-ঝোলা। এর নাম জেনানা কি ফুটানি কি থলিয়া, কী না কে জানে। জয়দেবের এই বাউল সমাবেশের মেলায় একটু যেন কেমন খেই হারানো।

জবাবে লিলি ঘাড়ে একটা ঝটকা দিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে, 'সেরকম লোক পেলে তো। মাথা ঘোরাবার মানুষ কোথায় এখানে।'

ঝিনি হেসে ওঠে, একটু যেন লজ্জা পেয়েই বলে, 'কী সব বলছিস।'

লিলি তাড়াতাড়ি চোখ বড় করে বলে, 'তাও তো বটে! তোমাকে কিছু বলিনি ভাই, আমি আমার কথাই বলেছি শুধু।'

বিন্দু হেসে বলে, 'তব্যে? সাবধানে মুখ খুল্যো গ লিলিদিদি। তোমাকে বল্যে রাখি, মাথা ঘোরাবার মানুষ কোথা কে ওত পেত্যে রইয়েছে, জাইনবে কেমন কর‍্যে। নিজের মাথা না ঘুইরলে কি জানা যায়?'

লিলি বলে, 'দেখা যাবে। কই মশাই, আসুন।'

তা ছাড়া উপায় আছে নাকি। যেতে তো হবেই, দেখতে হবে, এ স্রোতের টান কত দূরে, কোথায় নিয়ে যায়। বেরুবার আগে বিন্দু স্মরণ করায়, 'যিথানেই যাওয়া হক, ইখানে এস্যে খাবে, মনে রেখ্য বাবাজী। দিদিদের যদিন লিয়ে আসতে পারো, আরো ভালো। তোমার টানে যদি আস্যে।'

বলে বিন্দু লিলি ও ঝিনির দিকে তাকায়। আর বিন্দুর দিকে দেখে নিতাইয়ের কথা আর একবার আমার মনে পড়ে যায়। বলি, 'চেষ্টা করব।'

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুও খানিকটা আসে। আবার বলে, 'মেলার পুব দিকে বেশী যাবার দরকার নাই, সাবধানে ঘুরাফিরা কর‍্যো।'

কোনো দিকে তার নজর ফাঁকি যায় না। ফাঁকি গেলে সিঁদেল চোরকে মন-চুরির মতলব দিত না। এক মুহূর্ত তার দিকে আমার অবাক দৃষ্টি থমকে যায়। বিন্দুর

নজরও সজাগ। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'কী বইলছ বাবাজী, কিছু বইলবে?'

তাড়াতাড়ি বলি, 'না। একটা কথা মনে পড়ল, তা-ই।'

'কী কথা?'

'পরে বলব।'

তৎক্ষণাৎ বিন্দু ছেলেমানুষের মতো ঘাড়ে দোলা দেয়। বলে, 'না, ই বেলাতেই বইলতে লাইগবে।'

আমি হেসে বলি, 'নিতাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল।'

বিন্দু ভুরু কুঁচকে এক পলক অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। বলে, 'কী বলো তো?'

বলি, 'সিঁদকাটি ছেড়ে সে এখন মন-চুরির খোঁজে আছে।'

অমনি একেবারে বিন্দুর চোখ বড় হয়ে ওঠে। মাথায় হাত দিয়ে বলে, 'অই মা গ, ইস্! লিতাই আবার কী বলেছে তোমাকে?'

আমি হাসতে হাসতে এগিয়ে যাই। বিন্দু পিছনেই দাঁড়িয়ে থাকে। মুখ ফিরিয়ে বলি, 'মন্দ কিছু বলেনি, ভালোই বলেছে।'

বিন্দুর দুই চোখে তখনো অবাক হাসির ঝিকিমিকি। ঝিনি জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যাপার?'

ভিড় কাটিয়ে প্রায় দুই সখীর মাঝখানে চলতে চলতে দু-এক কথায় নিতাইয়ের ধৃত্তান্ত বলি। শুনে আমার মতোই ওদের মনের অবস্থা। ঝিনি বলে, 'সত্যি, না মিশলে জানতে পারতুম না, বিন্দু কী আশ্চর্য মেয়ে!'

লিলিও অন্যমনস্ক স্বরে বেজে ওঠে, 'বিন্দুর কাছে নিজেকে তো আমার তুচ্ছ মনে হয়। সত্যি, কিছুই জানি না, কিছুই দেখিনি।'

বলে কী এরা, এইসব গরবিনী নাগরিকারা। নিশ্চয়ই এসব কেবল নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞানের বিলাস নয়। বিন্দুকে এরা এতখানি মূল্য দিয়ে বোঝে? দু'জনের মুখের দিকে তাকাই। ঝিনি বলে, 'নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস হতো না, বিন্দু পরিষ্কার জয়দেবের কবিতা বলতে পারে।'

এবার আমার অবাক হবার পালা। জিজ্ঞেস করি, 'পারে মানে, সংস্কৃত উচ্চারণ?'

'হ্যাঁ। হয়তো শুধুই মুখস্থ। সবটা না হলেও, অনেকখানি। যেভাবেই হোক, মানেও সবই প্রায় বোঝে।'

এ কথা আমারও অজানা। বিন্দুর মুখে গীতগোবিন্দের বচন শোনা আমার ভাগ্যে ঘটেনি। রাঢ়ের এক সামান্য বাউল প্রকৃতি, যে হেথা-হোথা আলখাল্লাধারী পুরুষের সঙ্গে গান গেয়ে বেড়ায়, মাত্র এক জোড়া প্রেমজুরি যার বাদ্য, গলায় কিছু গানের ডালি, সে যদি গীতগোবিন্দ ভাষে, তবে অবাক লাগে বই কি! আমার আপন সীমার পরিবেশে চোখ ফিরিয়ে মনে হয়, অনেক ঝলকের মধ্যে বড় গরীব হয়ে আছি।

এ বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই এক আলো-ঝলকানো আসরের মাঝখানে এসে পড়ি। এখানে চেহারাই আলাদা। এখানে মাইকের—গোপীদাসের ভাষায় মাইকের গলায় গান। অনেকখানি অংশ ঘিরে শক্ত বাঁশের বেড়া। গানের আসরের সামনে, মস্ত বড় গদিতে সাদা ঝকঝকে চাদর। গুটিকয় তাকিয়া। সামনে একজন আসীন। মধ্যবয়স্ক গৌরাঙ্গ পুরুষ, সুপুরুষ। ধূসর গোঁফদাড়ি, মাথায় ধূসর চুল চুড়ো করে বাঁধা। গায়ে গেরুয়া রঙের রেশমী আলখাল্লায় ঝিলিক দিচ্ছে। আশেপাশে আরো দু'-এক বাবাজী। তার চেয়ে বেশী শহুরে মানুষের ভীড়। সামনে দাঁড়িয়ে, যন্ত্রের কাছে মুখ রেখে গান করে এক বাউল। কোট-পাতলুন পরা এক লোক, চোখে চশমা এঁটে, হাতের কাছে যন্ত্র নিয়ে বসেছেন। বোঝা যায়, যন্ত্রের ফিতেয়

গান তুলে নিচ্ছেন। গৌরাঙ্গ পুরুষ, তদ্‌গতভাবে, আধ-বোজা চোখে, শরীরের দোলায় গান শোনেন। শ্রোতার ভিড়ও কম নয়।

আসরের থেকে আমরা দূরে। বেড়া-ঘেরা বিরাট জায়গা জুড়ে অস্থায়ী ঘর তৈরি হয়েছে। যেমন-তেমন ঘর না, তার আবার সাজপোশাক আছে। নীল কাপড়ে বেড়া জড়ানো, লাল ঝালরে সাজানো। দরজার কোনো পাল্লা নেই, কিন্তু ভারী কাপড়ের পরদা আছে। পরদা একটু সরানো, তার ফাঁকেই দেখতে পাই সেখানে নানা বয়সের, নানা রূপের মহিলাদের ভিড়। সাজানো-গোছানো বাক্স-প্যাঁটরা বিছানা। মাঝখানে বড় বড় গদি পাতা। কেউ শুয়ে, কেউ বসে। কেউ বা পান সাজে, তরকারি কোটে। এলাহি ব্যাপার। তা ছাড়াও, ছোট ছোট তাঁবুর ঘর। সেখানেও যাদের ভিড়, সেই সব নারী-পুরুষকে দেখে মনে হয়, নগরের সম্পন্ন মানুষ।

অন্য দিকে রান্নার আয়োজন। গুটি ছয়েক বিশাল উনুন জ্বলে। কাঠ-লকড়ির ব্যাপার না, কয়লার আগুন। সেখানে ব্যস্ত কম করে জনা পনেরো-ষোল। কে যে কার দিকে দেখছে বুঝতে পারি না। তবে, আলো-ঝলমলে গানের আসরের তুলনায় অন্য দিকে ভিড় কম, হই-হট্টগোল নেই। বেদনাশা বটের তলায়, দেখেই তোমার ঠেক লাগবে, ই আখড়ার ছাঁদ-ছন্দ ধরন-ধারণ একটুক আলাদা।

লিলি ডেকে বলে, 'কী হলো, আসুন। আমরা কোথায় উঠেছি, একটু দেখিয়ে দিই।'

সেটা আমারও অনুমান, এটিই গোপীদাসের কথিত মদন বাউলের আখড়া। ঝিনিদের আশ্রয়। আমাকে ডাক দিয়ে ওরা গানের আসরের উলটো দিকে নিয়ে যায়। যেদিকে থাকবার ঘর আর তাঁবু। রান্নার জায়গাটা একেবারে নদীর উঁচু পাড় ঘেঁষে হয়েছে। সেখানেও মাথার ওপরে টিনের চাল।

আমার আর দেখার কী আছে। সব থেকে বড় ঘরের পরদা সরিয়ে ওরা দু'জনেই ভিতরে যায়। তখন টের পাই, বড় ঘরের সংলগ্ন, আর এক দিকে পরদা ঢাকা অন্য ঘরও রয়েছে। বাইরের থেকে তার কিছুই দেখা যায় না। বড় ঘর পেরিয়ে ওরা অন্য দিকের পরদার আড়ালে চলে যায়। আমার আর ভিতরে যাওয়া হয় না। নানা আবরণে আভরণে সাজা মহিলাদের নানা ব্যস্ততা, নানা রকমের আলস্য বিশ্রাম। দু'-এক পুরুষও তার মধ্যে আলাপে মগ্ন।

আমি দরজার কাছেই থমকে দাঁড়াই। ওদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে, একটু ধূমপানের ইচ্ছে জাগে। সিগারেট ধরিয়ে আশেপাশে চোখ ফিরিয়ে দেখি। কয়েক মুহূর্ত যায় কী না সন্দেহ। খপ্‌ করে কে যেন আমার সিগারেট সুদ্ধ হাত চেপে ধরে, আর সঙ্গে সঙ্গে, প্রায় বীণানিন্দিত তীব্র অথচ মন্থর গলায় বেজে ওঠে, 'কে তুই, আমার আশ্রমে দাঁড়িয়ে ফুরুক ফুরুক সিগ্রেট ফুঁকছিস?'

হস্তধারণ এবং কণ্ঠস্বরেই আমার বুক ধড়াসে যায়! তার ওপরে আত্মসম্মানের ভয়, বিব্রত লজ্জা। নানা কিছুতে হকচকিয়ে যাবার সঙ্গে কথাও বন্ধ অবাক মনে। যিনি আমাকে ধরেন, এবং কণ্ঠস্বরের অধীশ্বরী এক মহিলা। বয়স অনুমানের সাধ্য নেই। যুবতী কি না, বলতে পারি না, লক্ষণ সকলই আছে। হয়তো বেলা যায়, কিন্তু মধ্য ঋতুর ভাদ্রের মতো, এ শরীর থেকে যৌবন যেতে গড়িমসি করে। তা করুক, শেষ রশ্মিও যেমন জলে পড়লে বড় বেশী ঝলকায়, এ গৈরিকবসনা রমণী তেমনি।

চোখ তাঁর ডাগর, দৃষ্টির ভাবেতে যেন লাস্যের জড়িমা। নাগরিকা ছাঁদের সুন্দর চশমা থাকলেও এ চোখ সুন্দর, তাহে অঞ্জনবিলাসিনী কৃষ্ণনয়না। রেশমী গেরুয়ায় পাড় নেই, পরনের চালে নাগরিকা। পাতলা রেশমী গেরুয়ার কাঁধইস্তক জামা, অন্তর্বাসের ইশারা জাগানো। মুখের ছাঁচখানি মিঠে। তাম্বুলরাঞ্জনী রক্তবিম্বোষ্ঠা।

রুক্ষ কেশপাশে আলগা বাঁধনের খোঁপা।

ক্রুদ্ধ কটাক্ষের বদলে তাঁর অনুসন্ধিৎসু আয়ত চোখে ঢুলুঢুলু ভাব বেশী। তবু এই অপলক দৃষ্টিপাতের সামনে চোখ তুলে রাখতে পারি না যেন। অপরাধের চিন্তায়, জড়ীভূত হবার আগে কোনোরকমে বলতে পারি, 'আমি—মানে—।'

মহিলা মুখ থেকে একরাশ জর্দার মোহিনী গন্ধ ছড়িয়ে, ঘাড় দুলিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ বাছা, তুমি। তুমি কে, আমার আশ্রমের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট খাচ্ছ। পায়ে আবার লাটবরের মতো জুতাও রয়েছে।'

আত্মসম্মানের ভয় যত, কথাগুলো বুকে বেঁধে তত! দৃষ্টি যুবতীর পিছু‌পিছু, কাঁচপোকার পিছনে, আরশোলার মতো কোথায় এলাম! কার হাতে পড়লাম। কী লাঞ্ছনা কপালে আছে। ইনিই বা কে, তাও জানি না। তবে হাতের কবজিতে যে শক্তি আছে, তা তাঁর উষ্ণ করধৃতিতেই বুঝতে পারি। এই শীতেও ওঁর গায়ে কোনো গরম জামা নেই।

আশ্রমের দু-একজন কৌতূহলিত হয়ে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পড়ে। কিছু বলে না, আমাদের উভয়ের দিকেই দেখে। তাদের মুখভাব তেমন মারাত্মক মনে হয় না যে, আদেশ পেলে এখুনি এই অপরিচিত নিষ্ঠাহীনকে উত্তমমধ্যম দান করে। এদিকে হাত ছাড়বারও কোনো লক্ষণ দেখি না। অথচ, যে পর্যন্ত জুতো পায়ে এসেছি, সে পর্যন্ত লিলি-ঝিনিও এসেছে। ঘরের দরজার কাছে ওরা ছেড়ে রেখে গিয়েছে। এখন কি এই মহিলার হাতে-পায়ে ধরতে হবে নাকি। তাতেও আমার আপত্তি নেই, অপরাধ যখন করে ফেলেছি। বলি, 'দেখুন, আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই ঝিনি এসে একেবারে আমার গায়ের কাছে দাঁড়ায়। বলে ওঠে, 'কী হয়েছে?'

মহিলা বলেন, 'দ্যাখ্ মা, ছেলেটা এখানে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট খাচ্ছে।'

উচারণে 'সিগ্রেট' শব্দটা অদ্ভুত, এক শ্রেণীর লোক সবখানেই কেন যেন সিগারেটকে সিগ্রেট বলে। আমার বিব্রত লজ্জা এখন সবই ঝিনির গলায় বাজে, 'ওহ, মানে উনি জানেন না তো, তা-ই।'

লিলি বলে ওঠে, 'মা, উনি আমাদের সেই লোক, যাঁর কথা আপনাকে বলেছিলাম।'

ও আমার নামটাও উচ্চারণ করে। সঙ্গে সঙ্গে মহিলার আচরণ ভিন্ন। স্পর্শ কোমল হয়ে ওঠে। হাত ছেড়ে দিয়ে, একেবারে চিবুকে হাত দিয়ে বলে, 'তাই বলো, আমি ভাবি এমন ভালোমানুষ মুখখানি কার। খুব ভয় ধরিয়ে দিয়েছি তো? আয়, আমার কাছে আয়।'

বলে একেবারে গলা জড়িয়ে ধরে, গায়ের কাছে আকর্ষণ। ইতিমধ্যে ঝটিতি পরিস্থিতি বদল হলেও একটু একটু নিশ্বাস বইতে আরম্ভ করে। আগেই জ্বলন্ত সিগারেট ফেলবার উদ্যোগ করি। তিনি হাত ধরে বারণ করে বলেন, 'থাক, মুখের জিনিসটা খা। ফেলিস না। আমাকে আবার সব লক্ষ্য রাখতে হয় তো।'

বলে নিশ্বাসে এক রাশ মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে হেসে ঢুলুঢুলু চোখে তাকান। আঙুল দিয়ে আমার গালে টোকা মারেন। বলেন, 'তাই ভাবি, এমন মিঠে ভাবের ঠাকুরালি মুখ চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেন।'

ঝিনি তখন আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মহিলার দিকে দেখছে। লিলি বলে, 'আমরা আবার ভেতরে আপনাকেই খুঁজতে গেছলাম। ওঁকে ডেকে নিয়ে এলাম। বলেছিলেন, যেন আলাপ করিয়ে দিই।'

'না দিলে রাগ করতাম। চল্, ভেতরে একটু বসবি। এই, এই ধনু, একটা মাটির ভাঁড় দে তো রে, জল খাবার ভাঁড়। সিগ্রেটর ছাই ফেলবে।'

যাকে ডেকে বলেন, সে তাড়াতাড়ি দৌড়ে একটা খুরি এনে দেয়। আমিই হাত বাড়িয়ে নিই। বাহুপাশের আলিঙ্গন থেকে তখনো মুক্ত নই। মহিলা বলেন, 'কাল থেকে তা হলে তোমার জন্যেই হা-পিত্যেশ?'

বলে ঝিনির দিকে একবার তাকান। তাম্বুল-লাল ঠোঁটে হাসি। দৃষ্টি তেমনি ঢুলুঢুলু। এমন সময় একটু দূরে থেকে হাসি আর গলাখাঁকারির শব্দ হয়। মুখ তুলে দেখি, সীমানা-বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে জনা তিন-চারেক লোক, আমাদের দিকে দেখছে। মহিলা ডাকেন, 'এসো, ভেতরে এসো।'

এমন একজন মহিলার অঙ্গাঙ্গি থাকতে অস্বস্তি হয়, তথাপি তাঁর নির্বিকার উদাসীনতায় বাধা দিতে পারি না। পায়ের জুতো বাইরে রেখে ভিতরে ঢুকি। ঝিনি লিলি সঙ্গে। মহিলা আমাকে তেমনি ধরে নিয়েই চলেন। চলতে চলতেই বলেন, 'গিরিবালা আমাকে দুটো পান দিও গো।'

গায়ে এক গা গহনা, প্রায়-প্রৌঢ়া এক মহিলা পান সাজতে সাজতেই বলেন, 'দিচ্চি মা।'

আমি যেতে যেতেই ঝিনি-লিলির দিকে তাকাই। দু'জনেই ঠোঁট টিপে, চোখের তারা কাঁপিয়ে কী যেন ইশারা করে। কী আর ইশারা করবে, যা হচ্ছে, তা-ই হতে দিতে বলে নিশ্চয়ই। তখন তো মনে মনে বলেছিলাম, দেখি, এই দুই সখীর স্রোত কোথায় টেনে নিয়ে যায়। তবু ঘটনা-জালের জটায় কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি।

ঘর ছাড়িয়ে, পরদা সরিয়ে আর এক নতুন পরিবেশ। এখানে সম্পূর্ণ আলাদা তাঁবুর ঘর। মাটির সবখানেই মোটা করে খড় বিছানো। এক পাশে তার ওপরে মোটা করে গদি পাতা। গদির ওপরে ধোপদুরস্ত বিছানা। মহিলা আমাকে সেই বিছানায় বসিয়ে দেন। বলেন, 'বসো। বসো গো তোমরা।'

আমার পাশে বসে ঘাড় কাত করে চেয়ে হেসে বলেন, 'খুব ভয় পেয়েছিলে তো?'

সঙ্গে সঙ্গে স্বীকারোক্তি, 'তা পেয়েছিলাম।'

স্বীকারোক্তির ভঙ্গিতেই বোধ হয় তিনজনেই হেসে ওঠে। আবার তৎক্ষণাৎ মহিলা ভুরুতে যেন শর জুড়ে তাকান। ঝামটা দিয়ে বলেন, 'তা মুখপোড়া ছেলে বলবে তো, তুমি ওদের সঙ্গে এসেছ। তখন তো মনে হচ্ছিল, ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানো না। দেখে তো বুঝতে পারছি, তা মোটেই নও।'

লিলি তাতে ফোড়ন দেয়, 'একেবারেই নয়।'

মহিলা আবার বলেন, 'মেয়েগুলোকে সেই থেকে ঘুরিয়ে মারছ।'

সেই একই অভিযোগ। লিলি বলে ওঠে, 'গুলো নয় মা, আমি ওর মধ্যে নেই।'

মহিলা বলেন, 'আহা, বলিস কেন। বললে মনে হয়, আছিস। ঠাকুর ঘরে কে রে, আমি কলা খাইনি।'

এবার লিলির রঙ-করা গালেও লালের ছোপ ধরে যায়। ঝিনির দিকে একবার দেখে প্রায় আর্তস্বরে অস্ফুট শব্দ করে, 'মা কী বলছেন!'

মা প্রায় সখীর মতোই লিলির গায়ে চাটি মেরে বলেন, 'তুই যেমন বললি, আমিও সেইরকম বললাম। আমি তো অন্য কিছু বলিনি, বলেছি, মেয়েগুলোকে ঘুরিয়ে মারছ।'

লিলির অবস্থা ঝিনি উপভোগ করে হাসে। লিলি তাকায় আমার দিকে।

মহিলা আরো বলেন, 'দু'জনেই যদি ঘুরে মরিস, তাতেই বা ক্ষতি কী। কী বলে ছেলে, ক্ষতি আছে কিছু?'

আবার আমাকে কেন। আমি তো এমনিতেই বাক্যহারা হয়ে গিয়েছি। তবুও, কোনো গুরুত্ব আর জটিলতা আরোপ না করেই বলি, 'না, ক্ষতি আর কী।'

এবার ঝিনি লিলি, দুই সখীতে চোখাচোখি করে হঠাৎ একসঙ্গেই হেসে ওঠে। তখন গিরিবালা নাম্নী পান নিয়ে আসেন। মহিলা পান হাতে নিয়ে আমার দিকে ফিরে বলেন, 'খাবে?'

ঘাড় নেড়ে জানাই, 'না।'

'কেন, দাঁত নষ্ট হবে?'

'সেজন্য নয়, খাই না তো।'

'এই মেয়েগুলোকেও খাওয়াতে পারলাম না। কলকাতায় এত পানের দোকান চলে কী করে?'

তা বটে। নিজেকে কলকাতার লোক বলে আমার দাবি নেই। বাকী দু'জন কলকাতারই। দু'জনে পান না খেলে দোকানগুলো চলে কেমন করে।

উনি ঝিনিকে বলেন একটা ছোট বাক্স দেখিয়ে, 'ওটার থেকে আমার জর্দার কৌটোটা দাও তো।'

ঝিনি বাক্স থেকে জর্দার কৌটো বের করে দেয়। মহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার খালি হাত কেন, ঝোলাঝুলি কিছু নেই?'

'আমি অন্য জায়গায় উঠেছি।'

'কোথায়?'

'গোপীদাস বাউলের আখড়ায়।'

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা বলেন, 'অ, হেরুকের গোপীদাস? বড় ভালো মানুষ। তবে তো সেখানে বিন্দু গোকুলও আছে!'

আমি অবাক হয়ে বলি, 'আপনি চেনেন?'

চোখ ঢুলুঢুলু করে তাকিয়ে বলেন, 'চিনব না? এক সম্প্রদায়ের লোক আমরা, এক সাধন-ভজন। বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, সব জায়গার সবাইকে চিনি।'

আমি ঝিনি লিলির দিকে একটু অবাক জিজ্ঞাসায় তাকাই। কেন, ওরা কি এ মহিলাকে কিছু বলেনি। ঝিনির সঙ্গে আমার চোখাচোখি হতেই মহিলার দিকে ফিরে বলে ওঠে, 'আপনার সঙ্গে যে ওঁদের চেনা-পরিচয় আছে, তা তো জানি না। বিন্দুদের সঙ্গে আমাদের শান্তিনিকেতনে পরিচয় হয়েছে।'

মহিলা বলেন, 'ও মা, বলবে তো সে কথা!'

আমার দিকে ফিরে বলেন, 'আমার কথা বলো। কালই খবর পাঠাব, আমার এখানে এসে ওদের সবাইকে একবার গেয়ে যেতে হবে। গোপীদাসের গান শুনতে উনি খুব ভালোবাসেন।'

'উনি' সম্ভবত মদন বাউলের কথাই বলেন। কিন্তু পান দুটো সেই হাতেই। জর্দার কৌটো আর খোলা হয় না। আমাকে আবার বলেন, 'তা তুমিও এখানে এসে উঠলেই পারতে।'

বলি, 'ওদের সঙ্গে আগেই কথা ছিল।'

মহিলা লিলি ঝিনির দিকে ফিরে তাকান। বলেন, 'এ বছরে, আশ্রমে এ দু'টিকেও আমি ভালো পেয়েছি। মনগুলো বড় ভালো। ভাগ্যে না থাকলে মেলে না।'

ওরা দু'জনেই লজ্জা পেয়ে যায়। একটা খুশির রঙও লাগে। মহিলা আমার দিকে ফিরে ঠোঁট টিপে একটু হাসেন। বলেন, 'তোমার জন্যেই পেয়েছি বটে।'

লজ্জিত বিস্ময়ে বলি, 'না না, আমার জন্য কেন। ওঁরা নিজেরাই এসেছেন।'

'তা জানি হে। কাল থেকে এ পর্যন্ত, তোমার কথা অনেক হয়েছে। দেখলাম বটে, শুনলামও বটে, তাতেই বুঝেছি, তোমার আসবার কথা না থাকলে ওরা আসত না।'

চুপ করে থাকি। ঝিনি সবখানে, সকলের কাছে, এক রূপে এক স্রোতে বহতা।

তবু বলে ওঠে, 'কেঁদুলির মেলা দেখার ইচ্ছেটা অনেক দিনের।'

মহিলা হাত তুলে ধমক দেন, 'থাম্ দিকিনি বাপু, খালি আগ্ বাড়িয়ে কথা। আমি কিছু বলেছি নাকি। ও এসেছে বলে না-হয়, এ বছরে ইচ্ছে পূরণ হয়েছে, এই তো?'

লিলি বলে, 'তা-ই।'

'আর তুমি কী জন্য বাছা?'

প্রশ্নটা আমাকে। বাছা বাবা যা-ই বলুন, ওঁর মুখে যেন এ সম্বোধন মানায় না। সর্বাঙ্গে, ভাবে ভঙ্গিতে যেন অন্য এক নারী। রমণী, রঙ্গিণী। বলি, 'দেখতে শুনতে।'

যেন গোপন কথা জিজ্ঞেস করেন, এমনিভাবে কানের কাছে মুখ এনে বলেন, 'কী?'

বলি, 'মেলা, বাউল, বাউলের গান।'

'কেন।'

'ভালো লাগে।'

'শুধু ভালো লাগে? শুনলাম, এখানে সেখানে নানা জায়গায়, মেলায় খেলায় ঘুরে বেড়াও।'

'তা বেড়াই।'

'কেন, লেখবার জন্য?'

প্রশ্নটা অনেকের মতোই যুক্তিতর্কহীন। অর্থহীন তো বটেই। বলি, 'না। ঘুরে বেড়াবার সঙ্গে লেখার কিছু নেই। ঘুরে বেড়াই বলেই মাঝে মাঝে লিখতে ইচ্ছে করে।'

'আর ঘোরার তাগিদটা?'

'ঘোরার তাগিদেই।'

হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে, বুকের জামা মুঠি করে ধরে জোরে টান দেন। আমার চোখের দিকে তাকান। একটু একটু নাড়েন। আর যেন প্রায় রুদ্ধ গলায়, বলেন, 'দাগা খাওয়া তুই!'

কিসের দাগা খাবো? অবাক হয়ে তাকাই তাঁর দিকে। তিনি হাসতে হাসতে কাঁপেন, আর মুহূর্তেই দেখি, চোখে কাজল ভাসিয়ে জল গলে। আমি চেয়ে থাকি, কিছু বলতে পারি না। কারণ আমি বুঝতে পারি, হাস্যে লাস্যে তরঙ্গিনী রমণী ভিতর থেকে একটা কণ্টজাত আবেগে চোখের জলে ভাসেন। গলার কাছে তাঁর স্বর রুদ্ধ। যা উপচে আসতে চায় তা আর কিছু।

এই ভাব ও আবেগের সহসা লক্ষণের কিছুই বুঝি না আমি। কিন্তু আবার কোথায় যেন একটা বিকল ভাব লাগে। আমি যেন নিজের মধ্যেই হাতড়ে ফিরি। ঝিনি আমার দিকে গভীর অনুসন্ধিৎসায় দু'চোখ মেলে চেয়ে থাকে। লিলি নিজেও জানে না, কেন অকারণ ওঁর চোখ ছলছলিয়ে ওঠে।

একটু পরে মহিলা নিচু স্বরে বলেন, 'দাগা খাওয়া মানে জানো তো? কোনো মেয়েকে সমাজ যদি কুলটা বলে, সেটা একটা দাগা। কিন্তু সে মেয়ে যদি আপন ধর্মে চলে, তবে প্রাণে দাগা খেয়েও তার স্বর্গ। রাধা যেমন, বুঝলে তো? কিসের সমাজ, কিসের সংসার, কিসের বন্ধন। সব তো সেই "এক"-এর জন্য। সেটাই আসল দাগা। তুমি সেই রকমে দাগা খাওয়া, ঠিক বলেছি?'

ওঁর চোখের জল শুকোয় না, তার ওপরে গলে। আমি বলি, 'জানি না।'

'তা জানবে না। জানো খালি ঘোরার তাগিদেই ঘোরা। ভালো। তাই জানোগে। তবে দাগা খাওয়ারাই কিন্তু দাগাবাজ বেশী হয়, তা জানো তো?'

বলতে বলতে ভেজা চোখেই দেখি, ঢুলুঢুলু দৃষ্টি বঙ্ক হয়। আমি কোনো জবাব দিই না। উনি বলেন, 'যখন দাগা খায়, তখন "দেহি পদপল্লবমুদারম্।" কেন? না, "জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো হরতু তদুপাহিতাবিকারম্।" আর দাগা-বাজ হলো শঠ ধূর্ত, কেবল কাঁদায়।'

এ কথারও জবাব দিতে পারি না। কিন্তু কেউ কারুর দিকে ফিরে তাকাতে পারি না। ঝিনি একেবারে অধোবদন। লিলি মুখ ফিরিয়ে বোধ হয় ঠোঁট টিপে টিপে হাসে। তবু মনে মনে এ মহিলার বাণীবিন্যাস ও ভাবকে ভালো লাগে।

আমাকে একটু ঠেলা দিয়ে বলেন, 'কী, সত্যি কী না?'

বলি, 'বলতে পারছি না।'

'দাগাবাজ।' বলেই উঠে দাঁড়ান। বলেন, 'দেখি একবার ওঁকে ডাকি। উনি তোমাকে দেখতে চেয়েছিলেন।'

এ যেন এক ভাঁবুর ফাঁদ। ঘরের মধ্যে ঘর, তারপরেও ঘর। পর্দায় পর্দায় সীমানা। এমন মোটা পর্দা যে, পাশের ঘরের দৃশ্য দূরের কথা, কথাও শোনা যায় না। দেখি মহিলা অন্যদিকে আর এক পর্দা তোলেন। পাশে আর একটি ঘর। তেমনি বিছানো খড়ের ওপরে শতরঞ্জি পাতা। সেই ঘরের খোলা পর্দা দিয়ে চকিতে দেখা গেল, আশ্রমে প্রথম প্রবেশের মুখে আলো ঝলকানো গানের আসর। যেখানে 'উনি' বসে আছেন। ঘরের ভিতর দিয়েই আসরে যাওয়া যায়।

মহিলা অদৃশ্য হতেই আমি লিলি ঝিনির দিকে ফিরে তাকাই। আমার মনে ও চোখে কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা। ঝিনির চোখে মুখে তখনো জয়দেবের বাণীর রঙ। কিন্তু আমি দাগাবাজও নই, আর দুরন্ত কামাগ্নির বিকার নষ্ট করার জন্যে কারুর পদপল্লব মাথায় নিতে চাইনি। কিন্তু ভঙ্গির লাস্যে, বচনের চটুল দীপ্তিতে একটু রঙ ছড়ায় বইকি। মহিলা শুধু অভীষ্ট ভাষণে সিদ্ধা নন। এক হিসাবে রসিকা বিদুষী বলে মনে হয়। ভাষণের চাতুর্যেও পাকা স্যাকরার জড়োয়ার কারুমিতি। অথচ তারই মধ্যে এক লহমায় গলার স্বরও রুদ্ধ হয়ে যায়, চোখ ভেসে যায়। ইনি কে!

আমার এই কৌতূহলিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিপাতের আগেই লিলি ঘাড় বাঁকিয়ে চোখের কোণে হেসে নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন লাগল!'

বলি, 'অর্থ অনর্থ বাদ দিয়ে, অপূর্ব!'

অমনি লিলির চোখে শঙ্কা। কাজলা চোখ বড় করে একবার সখীর দিকে তাকিয়ে দেখে। তারপরে বলে, 'এত ভালো লেগেছে? দেখবেন মশাই, পাড় ধ্বসে না যেন।'

হেসে বলি, 'সে আশঙ্কা নেই!'

লিলি বলে, 'বলা যায় না, পুরুষ মানুষ তো। আর আমাদের মা-টিও যা। বাবারে!'

সেটা একেবারে মিথ্যা না। মহিলার প্রতি আমার কটাক্ষ নেই। কিন্তু অন্যের অঘটন অনায়াসেই ঘটিয়ে ছাড়তে পারেন বোধ হয়।

ঝিনি বলে ওঠে, 'কী যে বলিস। উনি কি তা-ই।'

অর্থাৎ মহিলাটি। লিলি যাঁকে কয়েকবারই মা বলেছে। লিলি তেমনি নিচু স্বরেই বলে, 'উনি যাই হোন ভাই, কী যে না পারেন আর না জানেন, তা জানি না।'

গলার স্বর আরো নামিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে ফিসফিসিয়ে বলে, 'আমি তো ভাবলাম, আপনাকে আর ছাড়বেন না। যেভাবে জড়িয়ে ধরেছিলেন।'

ঝিনি একটু ত্রস্ত সুরে বেজে ওঠে, 'আহ্ লিলি, চুপ কর।'

আমি বলি, 'তা যেন হলো, কিন্তু ইনি কে!'

লিলি বলে, 'ইনি মদন বাউলের প্রকৃতি মনোহরা।'

বলে উঠি, 'বাহ্, নামটিও চমৎকার!'

বলতেই ঝিনির সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে যায়। ওর দৃষ্টিতে অনুসন্ধিৎসা। চোখে চোখ পড়তে হেসে মুখ নামায়। আমি আবার বলি, 'মাতোয়ারা নাম হলেও ওঁকে মানাত।'

লিলি আল্‌তো করে ধাক্কা দেয় ঝিনির গায়ে। বলে, 'এই ঝিনি, ভদ্রলোক কী বলছেন রে। একেবারে মজে গেছেন মনে হচ্ছে।'

বলি, 'তা একরকম ভাবে মজেছি বলতে পারেন। সেই খপ করে হাত ধরা থেকে এইটুকু সময়ের মধ্যেই যেরকম দেখলাম, না মজে কে পারে। আপনারা মজেননি?'

দুই সখীতে চোখাচোখি করে ঠোঁট টিপে হাসে। লিলি বলে, 'মজেছি। তবে আমরা মেয়ে তো, সেইটিই ভরসা।'

দুই সখীতে নিচু স্বরে হেসে ওঠে। অর্থাৎ পুরুষকেই ভরসা নেই। ঝিনি হাসি থামিয়ে বলে, 'আমার কিন্তু ওঁকে খুবই ভালো লেগেছে। বাইরে থেকে ওঁকে যা দেখা যায়, ভেতরে তা নন। এমনিতে সেজেগুজে থাকতে ভালোবাসেন, কিন্তু সব সময়েই যেন কিসের একটা ঘোরে আছেন।'

বলতে বলতে ঝিনির মুখের রূপান্তর হয়। ওরও যেন একটা ঘোর লাগে। মদন বাউলের এ প্রকৃতি মনোহরাকে দেখে, আমার মনে হয়, যেন কিসের একটা ঘোরে রয়েছেন। এইমাত্র চোখ পাকিয়ে, পরমুহূর্তেই হাসেন। তৎক্ষণাৎ আবার কাঁদেন। তবু রাধারানীর কথা আমার মনে পড়ে যায়। সে প্রকৃতির সঙ্গে যেন এ প্রকৃতি মেলাতে পারি না। বাউল' প্রকৃতি কি এমনটিও হয়। বলি, 'আমি এমন বাউল প্রকৃতি দেখিনি।'

'কেমন বাউল প্রকৃতি হে?'

একেবারে পালটা প্রশ্ন পর্দার পাশ থেকে। দেখি স্বয়ং মনোহরা। পর্দা তুলে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন। আবার সেই বুক ধড়াসে যাওয়া। হঠাৎ কথা যোগায় না মুখে। কিন্তু এত সোজা প্রশ্নের সোজা জবাব না দিলেও চলে না। অথচ তাঁর পাশেই মদন বাউলের গোরা মূর্তি। রেশমী গেরুয়া, ধূসর গোঁফদাড়ি। দীর্ঘ পুরুষের চোখ দুটি যেন হাসিতে চিকচিক করে। তাতেই আরো ঠেক খেয়ে যাই। তবু বলে ফেলি, 'আপনার মতো।'

মনোহরা ঝটিতি বাউলের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে যেন ছোট মেয়ের মতো নালিশ করেন, 'দেখেছেন তো গোঁসাই।'

তারপরেই আমার ওপরে যেন ঝাঁপিয়ে পড়েন। কাছে এসে নিচু হয়ে ঝংকার দিয়ে ওঠেন, 'কেন রে মুখপোড়া, বাউল প্রকৃতি কি মাথায় জটা নিয়ে খেঁকি বোষ্টমী হয়ে থাকবে?'

মদন হেসে ওঠেন হা হা করে। আমি তাড়াতাড়ি বলি, 'তা বলিনি। আমি— মানে—।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো না, আমার সাজপোশাক, পান খাওয়া এ সবের মধ্যে ওসব থাকে না, তাই তো? প্রকৃতির তুই কী জানিস?'

বলেই ঝিনির একটা হাত ধরে টান দিয়ে কাছে এনে বলেন, 'এই দ্যাখ দাগাবাজ, এও একটা প্রকৃতি। বাউল প্রকৃতি। চিনতে পারিস, বুঝতে পারিস?'

ভঙ্গিতে যতখানি, গলায় তত রোষ ফোঁস নেই। বরং যেন একটা আবেগের ধারায় কৌতুকের ছটা, তরঙ্গ তোলে স্বরে। ঢুলঢুলু চোখেও সেই কৌতুক রহস্যের বান। ঝিনি আমার দিকে চেয়ে লজ্জিত হেসে চোখ নামায়। মদন বাউল গাঢ় স্বরে

বলে ওঠেন, 'বাহ্ বাহ্ মনোহরা, বড় ভালো বইলছ গ।'

আবার সেই রাঢ়ের সুর বাজে তাঁর গলায়। মনোহরা তখন লিলিকেও আর এক হাত দিয়ে ধরে বলে, 'কে প্রকৃতি নয় বল্ দেখি। যেখানে প্রেমরসের গতি সেখানেই প্রকৃতি। প্রেম কি আর বেশবাসে গন্ধে ধরা পড়ে? প্রকৃতি হয় মনে মনে, বুঝেছ হে ছোকরা।'

মদন যেন ফুকারি ওঠেন, 'সোন্দর, মনোহরা সোন্দর বইলছ গ। প্রেমপীরিতি বিনা রসের গতি নাই। রসের গতি প্রকৃতি ভিন্ন বইতে নারে।'

স্পষ্টই দেখতে পাই মদন বাউলের চোখ দুটি ছলছলানো। যখন এলেন তখন থেকেই ভেজা ভেজা, একটু রক্তিম। মনোহরা তাঁর দিকে ফিরে বলেন, 'সেইজন্যেই তো দেহ সাজাবার কথা কেউ বলে না। বলে মন।'

মনোহরা সুর করে গেয়ে ওঠেন, 'মন সাজো, প্রকৃতি সাজে।'...

মদন বাউল রুদ্ধ গলায় বলে ওঠেন, 'আহা অই অই অই, যথার্থ গ, যথার্থ।'

মনোহরা হাত বাড়িয়ে দেন মদনের পায়ে। মদনও নিচু হয়ে মনোহরার পা স্পর্শ করেন। দু'জনেরই যেন কিসের একটা আবেশ। দু'জনেরই চোখ ভিজে ওঠে। ভিতরের ভাব না বুঝতে পারি, দেখতে পাই, এ'রা আপন স্রোতে বহতা। সেই একই বাউল রীতিভঙ্গি। লিলি মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখে। কিন্তু ঝিনি ওর অপলক চোখ দুটি আমার চোখ থেকে সরায় না। কী ওর মনের ভাব সবটুকু বুঝি না। যেন এক কূলে দাঁড়িয়ে আর এক কূলে নজর করে। মদন মনোহরার কূলে দাঁড়িয়ে আর একজনের দিকে চেয়ে থাকে। সবাই আপন স্রোতে বহতা।

মনোহরা এই ঘোরের মধ্যেই সহজভাবে বলেন, 'গোঁসাই, আমার মেয়েরা যে ছেলের কথা বলেছিল, এ সে-ই।'

মদন অমনি দু' হাত বাড়িয়ে আমাকে বুকের কাছে টেনে নেন। এমন দ্বিধাহীন অসংকোচ আবেগে টেনে নেন, এ মানুষদের হৃদয়ের যেন কোনো তল খুঁজে পাই না। বলেন, 'এস্য বাবা, এস্য। তুমার কথা আগেই শুন্যেছি।'

যেন কতদিনের চেনাজানা, কত আপন। মেকিপনার দরকারও তো নেই। দেওয়া-নেওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই আমাদের। তথাপি, দেখ, যেন স্নেহে সোহাগে আলিঙ্গন যেন। এ মন-প্রাণের গতিপ্রকৃতি জানি না। তাঁর বিশাল শরীরের স্পর্শে একটি স্নিগ্ধতা। অস্পষ্ট হালকা একটা মিষ্টি গন্ধ। হয়তো চুলদাড়িতে কিংবা রেশমি আলখাল্লায়। পান যে খান না, সেটা বোঝাই যাচ্ছে। তবে অই এক ব্যাজ, মুখের সামনে কথা বললেই হাল্‌কা একটু প্রেমের গন্ধ পাবে। অর্থাৎ গঞ্জিকা।

মনোহরা সংবাদ দেন আমার গোপীদাসের আশ্রমে ওঠার কথা। তারপরে, বলেন, 'এ আবার কী বলে জানেন তো গোঁসাই?'

'কী গ?'

'বলে, লেখার জন্যে ঘুরি না, ঘুরি বলে লিখি।'

মদন হেসে আমার চিবুক ধরে নাড়া দেন। বলেন, 'ঠিক ঠিক, সাধে বল্যো জপে, জপে বল্যো সাধে না। ঠিক কী না বাবা।'

বলি, 'কী সাধি, তা-ই তো জানি না।'

মদন একেবারে হাঁকাড় দিয়ে হেসে বাজেন, 'জয়গুরু জয়গুরু। তবু সেধ্যো বেড়াও। তাই বেড়াও বাবা, তাই বেড়াও।'

মনোহরা জিজ্ঞেস করেন, 'কেমন বোঝেন গোঁসাই?'

'কিসের বুঝাবুঝি গ? ই বিটাকে? দ্যাখ ক্যানে, সব মনমনা ই বিটার। খুঁজ্যে মইরছে। এখন ইয়ার মইরছি না মইরতে আছি। কে ধর্যে রাইখবা রাখো।'

বলে, আর একবার নিবিড় করে জড়ান। মনোহরা ঘাড় নেড়ে শব্দ করেন, 'হুম্, বুঝেছি।'

তারপরেই হঠাৎ ঝিনির দিকে ফিরে বলে ওঠেন, 'চোখের জল মোছ্ মা, সবাই আমরা মরেছি নয় মরতে আছি।'

অবাক হয়ে চেয়ে দেখি, ঝিনির চোখ টলটলিয়ে ভেসে যায়। আমার চোখ পড়তেই মুখ নামিয়ে নেয়। মদন তাড়াতাড়ি একটা হাত বাড়িয়ে ঝিনির মাথায় রাখেন। বলেন, 'বটে৷ ক্যানে গ মা। তুমাকে বা কে ধর‍্যো রাইখবে?'

লিলির দিকে আমার চোখ পড়ে। ওর বিষণ্ণ মুখ। আমার দিকে চেয়ে থাকা চোখে যেন একটা অভিযোগের ছায়া। কার প্রতি সেই অভিযোগ জানি না। কিন্তু আমার মনের মধ্যে হঠাৎ চল্‌তি টানে মোড় বেঁকে যায়। একটা ঘোর লাগে। হয়তো মদন বাউলের সব কথা বুঝি না। তবু নিজের মনের কথা কারুর মুখে এমনি করে শুনি না। গোপীদাসের মুখে শুনেছিলাম। আবার মদনের কাছে শুনলাম। যেন তাঁর কথা শুনেই মনে পড়ে যায়, কী খুঁজি। কিছু কি খুঁজি! আমি কি কখনো এমন গতি পেয়েছি, যেন ফিরে যাবার কথা আমার কানে যায় না। চলি চলি চলি, এখন আর মরি কি না মরি।। না হয় মরতেই আছি। এমন গতি কি আমার! না কি, এও সেই গতির কথা, বারংবার বহু ডাকাডাকি, তবু যাই সেই তার কোলে, মরণ মরণ মরণ।

ঝিনি বা কেন কাঁদে! ওর গতিও কি এমনি। স্বরূপের কথা শুনে কি ওর চোখ ভাসে। না কি আর কিছু। ওর চোখ সহসা টলটলিয়ে না উঠলে, আমার নিজের কথাও এমন করে মনে হতো না। মদন বাউল কী ভেবে বলেন, 'জানি না। আমি এক স্রোতে ভেসে যাই।' তাঁর চোখও শুকনো নেই।

তারপরে মদন বলেন, 'কিন্তু আমার কাছে এক দিন থাইকতে হবে বাবা।'

মনোহরা বলেন, 'সে কথা বলেছি।'

খুশি হয়ে বলেন, 'বেশ করেছ। জাইনলে গ মনোহরা, আজ গোপাল আমাকে ভাসাইচ্ছে। আমি আর থির থাইকতে লাইরছি।'

বলতে বলতেই তাঁর গলার স্বর বন্ধ হয়ে আসে। চোখ ফেটে জল গলে। মনোহরা হাত দিয়ে তাঁর বুকের কাছে চেপে ধরেন। বলেন, 'জানি গোঁসাই। গোপাল ক্ষ্যাপার গান শুনলে আপনি কী করে থির থাকবেন!'

মদন মাথা নাড়েন, আর চোখের জলে গলেন। বলেন, 'আহা হা কানা মানুষ, আমার হাতখানা ধর‍্যো ধর‍্যো গান কইরছে, আমার ভিতরে যেন কী হয়্যে যেইছে গ। পেথম গানই ধইরলে, "আয় মজা দেখবি আয়, ভবনদীর মাঝখানে; রসরাজ উইঠছে ডুইবছে হাইসছে খেইলছে, ডাইকছে ভাবুক জনে।" গোপাল আমাকে পাগল কইরবে গ আজ। বড় সুখে রইয়েছি।'

তারপরে হঠাৎ আমাদের দিকে ফিরে বলেন, 'তুমরাও এস্য মা-বাবারা, কানা গোপালের গান শুইনবে এস্য, আমি যাই।'

বলেই একেবারে উঠে পড়েন। কে কানা গোপাল, যাঁর গান শুনে মদনের ভর হয়। এখন বুঝতে পারি, কেন প্রথম থেকেই তাঁর চোখ আরক্ত ছলছল। উনি আপন মন্ত্রে ডুবেছিলেন। আমার কৌতূহল হয় গোপালকে দেখতে, তার গান শুনতে। মদন যাবার আগে আবার বলেন, 'অই মনোহরা, উখানে যে সব বাবু ভেয়েরা যন্তর-পাতি লিয়ে বস্যে রইয়েছেন, উয়াঁদের একটু সইরতে বলো গ!'

মনোহরা বলেন, 'যাই, আপনি চলুন।'

মদন চলে যান। মনোহরা বলেন, 'এই আজকাল একদল মানুষ হয়েছেন গান তুলে নিয়ে যাবার বাতিক। কী, না সিনেমা-থিয়েটারে গিয়ে লাগাবে। মুখে তা-ভাত,

খালি রঙ।'

বলে ঘাড়ে একটা ঝটকা দিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে হাসেন। খুলে যাওয়া এলো খোঁপায় বাঁধন কষেন। দেখে মনে হয় একটি উদ্ধতস্বাস্থ্য যুবতী। জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা যাবে আসরে?'

লিলি বলে ওঠে, 'পরে। এই বেলা আমরা একটু ঘুরে আসি।'

ঝিনি চোখ ঘুরিয়ে একবার আমার দিকে দেখে বলে, 'তা হয়েছে, তবু আর একবার।'

মনোহরা আমার দিকে কটাক্ষ করে বলেন, 'আর একবার দাগাবাজের সঙ্গে!' যাও, ঘুরে এসো। গোপালের গান পরেও শুনতে পারবে।'

ঝিনি উঠে দাঁড়ায়। আমি বলি, 'আমার খুব শুনতে ইচ্ছে করছে।'

লিলি ঝিনির দিকে তাকায়। ঝিনি আমার দিকে। এখন ওর চোখ শুকনো। বলে, 'একটু ঘুরে আসি।'

'যা রে যা ছোঁড়া।'

মনোহরা ঠাস করে একটা চড় লাগান আমার কাঁধে। বলেন, 'গান শোনার দিন আসবে, এখন ঘুরে আয়।'

অগত্যা। আমরা তিনজনেই আগের পথ ধরেই বেরিয়ে আসি।

তিন সখীরই গতি দেখি বটতলার বাউল-আসর ছাড়িয়ে নিছক মেলার আঙিনায়। যেতে যেতেই লিলি আমাকে প্রায় ধমকে বলে, 'পুরুষ মাত্রেই স্বার্থপর। আপনাকে বললাম না, ওবেলা ঝিনির খাওয়া হয়নি। আশ্রমের রান্নাও এখনো হয়নি। একটু যা হোক চা-টা খাবে তো!'

চমকে উঠে তাড়াতাড়ি বলি, 'সত্যি, মনেই ছিল না।'

ঝিনি আমার একপাশে। লজ্জিত হেসে বলে, 'এমন কিছু নয়, একটু চা খাবো মেলায় গিয়ে।'

'নিশ্চয়।'

কিন্তু ক্রমে ভিড় বাড়ে। পাশাপাশি চলা সম্ভব হয় না। লিলি সকলের আগে চলে। ঝিনিকে মাঝখানে রেখে আমি পিছনে। কিন্তু হঠাৎ ঝিনি থমকে দাঁড়িয়ে ফেরে। বলে, 'দেখি।'

বলে, আমার কাঁধের ওপর পাট করে রাখা চাদরটা টেনে নামিয়ে ভাঁজ খুলতে খুলতে বলে, 'সেই তখন থেকে দেখছি, কাঁধে ফেলা রয়েছে। গায়ে দেওয়া যায় না?'

একটু অবাক হয়ে থমকে গিয়েছিলাম। তারপরে হেসে বলি, 'তেমন শীত করছে না।'

'কিন্তু ঠান্ডাটা ঠিক লাগছে। একটু জড়িয়ে নিলে ক্ষতি কী?'

বলে ও নিজেই চাদরটা গোটা গায়ে জড়িয়ে দেয়। আমার হাত বাড়ানোটাও চোখে পড়ে না। এমন কি, সরু পথ, লোকের ভিড়, কোনো কিছুতেই ওর নজর নেই। ওদিকে লিলি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, জিজ্ঞেস করে, 'কী হলো?'

জবাব দেবার আর প্রয়োজন হয় না। দর্শনেই বোঝে। আমার দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসে। আবার ফিরে চলতে আরম্ভ করে। ঝিনিও এগিয়ে চলে আবার। কিছু বলার নেই আমার। বিব্রত বা লজ্জিত হই না। পিছন থেকে ঝিনিকে দেখি। ভাবি, ও কী ভাবে। ওর মনকে কি ও চেনে? লোকে কী বলে জানি না, কিন্তু মানুষ তার নিজের দুঃখ নিজে ডাকে একথা বিশ্বাস করি না। ঝিনির বেলাতেও বিশ্বাস করি না। তবু ওকে কি একটু ফেরানো যায় না?

আমরা মন্দিরের কাছে চলে আসি। আলো ঝলমলে মেলা। বেদনাশা বটতলা

ছাড়িয়েও দোকানপাট কিছু আছে। কিন্তু এদিকেই বেশী। জনস্রোতের টান উত্তর দিকে। সেই একই মেলা। মনোহারির নানান ঝলক, খেলনা পুতুল, নানা অঙ্গরাগ, অঙ্গসজ্জা, অলঙ্কার। কাঁসা, পিতল, পাথর, লোহা, যতরকমের বাসন চাইবে সব পাবে। মন্দিরের কাছ থেকেই অজয়ের তীরে তীরে যত বাজীকরদের তাঁবু পড়েছে। সেখানে নানান ছবি, যন্ত্রের গলায়, সং সেজে বাজীকরের খেলার নানা বিজ্ঞাপনের চিৎকার। সব থেকে যেটা জরুরি ঘোষণা, "এই শুরু হয়ে গেল গেল গেল।" বলার ভঙ্গিটা এমনই নির্দয়, আর একটু হলে খোকাকে কাঁধে নিয়ে এক হাতে বউকে ধরে ছুটো-ছুটি করে বেচারি পড়েই মরত। এই তো সবে ধানপান উঠেছে, বউ-ছেলে নিয়ে মেলায় এসেছে। খেলা না দেখে কি ফিরে যেতে পারে। তারপরে তো আবার সেই কোদাল শাবল লাঙল নিড়ানী নিয়ে মাঠে মাঠে ফেরা। এখন তবু দু-চার মণ ধান বেচার নগদ কড়ি ট্যাঁকে আছে। তারপরে তো ঘর পেট জোত সবই মহাজনের কাছে বাঁধা। এখন একটু সবুরে চলতে দেবে তো।

আজকের মেলাই সব থেকে জমজমাট। তাই, সব তাঁবুর সামনেই ভিড়। নগদ পয়সার ঝনঝনা। আমরা উত্তরের স্রোতেই ভাসি। আর দেখি দুটি বিদুষী নাগরিকাকে। চারদিকেতে চোখ। এমনি চোখ না। খুঁটিয়ে দেখার চোখ। এবার আমিই একটু পিছনে। দু'জনে চারদিকে দেখে, কী যেন বলে, হাসাহাসি করে। লিলি বারেবারেই দাঁড়াতে চায়। ঝিনি টেনে টেনে নিয়ে যায়। আবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে নেয়।

কিন্তু এদিকে খাবারের দোকান কোথায়। আর যদি বা থাকে সেখানে কী খাবে ঝিনি।

শান্তিনিকেতনের মতো সেরকম শহুরে মেলা এটা নিশ্চয় না। আশেপাশে, পথের ধারে ধারে পাঁপর ফুলুরির দোকান অনেক।

তারপরে খানিকটা যেতেই আলো ঝলকানো বড় বড় খাবারের দোকান চোখে পড়ে। আলোর চেয়ে ঝলকায় বেশী বাটায় সাজানো খাজা গজা। বড় বড় কড়া ভরতি রাজভোগ-রসগোল্লা। আর একটু এগোও, এবারে লিখিত বিজ্ঞাপন, চপ কাটলেট ওমলেট। কিন্তু ভোজনালয়ের চেহারা দেখলেই বোঝা যায় বড় গরীব কেতার ব্যাপার। মাঝে মধ্যে ভাতের হোটেলও আছে।

এর মধ্যেই একটা ছোট ঘরের সামনে লিলি ঝিনি দাঁড়ায়। আমার দিকে ফিরে চায়। তবু একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে। ইতিমধ্যে আশেপাশে ডাকাডাকি পড়ে যায়, 'দিদিমণি, আমার এখানে আসেন, মটন কারি আছে, মটন চপ কাটলেট আছে।'

অন্যদিকে কে যেন চেঁচায়, 'ফাউল পাবেন, ফাউল ইদিকে দিদিমণি।'

কে যে কোন্‌কালে আমাদের এই মটন ফাউল শিখিয়েছিল। পেলে একবার তাঁকে উপুড় হয়ে গড় করি। বাঙলাদেশে যত দূরের মেলাতেই যাবে, মটন ফাউলের স্বাদ পাবেই পাবে। স্বাদ না পাও নাম শুনতে পাবেই।

দিদিমণিরা ইতিমধ্যে সেই ছোট দোকানেই ঢুকে পড়েন। যেরকম ডাকের বহর, দাঁড়িয়ে থাকাই দায়। পায়জামার ওপরে একটা মোটা কোট গায়ে দেওয়া লোক খাবারের তালিকা ঘোষণা করতে আরম্ভ করে। তার আগেই ঝিনি বলে ওঠে, 'আপনার দোকানে পাঁউরুটি আছে তো?'

'আছে বই কি দিদিমণি।'

'তা হলে পাঁউরুটি সেঁকে দিন। আর ভালো করে কাপ ধুয়ে চা দিন।'

দোকানি অবাক হয়ে পুছ করে, 'এক প্লেট দোপেঁয়াজি খেয়ে দ্যাখেন দিদিমণি ফাসকেলাস। খেয়ে ভালো না লাগলে দাম নেই।—বংকা, এই বংকা!'

প্রায় ছাগল-ডাকের মতো একটা আচমকা চিৎকার, 'কী-ই-ই।'

'তিন পেলেট মটন দোপেঁয়াজি লাগা।'

আমি যে একটা বিটাছেলে রয়েছি সেদিকে খেয়ালই নেই। এমন কি ঝিনির ঘাড় নাড়াও লোকটা দেখতে পায় না। যেন তার কথাতেই সব কিছু। কিন্তু আমার তো কাটলেট মটন দোপেঁয়াজি চলবে না। দুই সখীর যদি চলে, চলুক।

ঝিনি প্রায় ধমকে ওঠে, 'বলছি যে ওসব লাগবে না।'

'আহা, খেয়েই দ্যাখেন না।'

নাছোড়বান্দা লোক দেখছি। ঝিনি তেমনি করেই বলে, 'না। আপনার পাঁউরুটি থাকে তো দিন, নইলে চলে যাচ্ছি।'

তাতেও লোকটা ফিরে তাকায় না। পাঁউরুটির কাগজ ছাড়াতে ছাড়াতে বলে, 'আচ্ছা আচ্ছা বসেন। চপ কাটলেট খাবেন তো?'

'না, অন্য কিছুই চাই না।'

লোকটা এবার চেঁচিয়ে ডাকে, 'বংকা, এই বংকা।'

পিছনের একটা পর্দার আড়াল থেকে জবাব আসে, 'ই'-ই'-ই'!'

'ওসব থাক, এদিকে আয়, রুটি সেঁকার যন্তর দে।'

রুটি সেঁকার আবার যন্তর! বংকা তারের যন্ত্রটি নিয়ে উপস্থিত হয়। বংকাকে দেখে বোঝা গেল, কেন গলার স্বর মিউ মিউ চিঁচিঁ। রোগা কালো বংকা, বোধ হয় বঙ্কিমই হবে পুরো নামখানি। গায়ে একটি গেঞ্জি ছাড়া কিছু নেই। পরনে একটা ময়লা হাফপ্যাণ্ট এই শীতে, তারপরে আর ভালো আওয়াজ বেরোয় কী করে।

তিনজনেই বেঞ্চির ওপর মুখোমুখি বসি। টেবিলের ওপর হাত রাখতে ভয়। জলের ছিটা এখানে ওখানে। ঝিনি হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কিছু খাবে এখানে?'

প্রায় চমকেই চোখ বড় করে তাকাই। বলি, 'আমার কোনো খিদেই নেই।'

ঝিনি হেসে ফেলে। কিন্তু আমাদের দু'জনকেই চমকে দিয়ে লিলি বলে ওঠে, 'আমি কিন্তু খাবো।'

ঝিনি চোখ বড় করে জিজ্ঞেস করে, 'কী খাবি?'

'ফাসকেলাস দোপেঁয়াজি।'

ঠাট্টা ভেবেই, অবাক হই না আর। কিন্তু ঝিনি ওর বন্ধুকে ভালো চেনে। জিজ্ঞেস করে, 'সত্যি নাকি?'

লিলি ওর মেমসাহেবি চুলে ঝটকা দিয়ে রঙ মাখানো ঠোঁট টিপে ঘাড় নাড়ে। বলে, 'নিশ্চয়ই। এই যে, এই যে শুনুন।'

সত্যি সত্যি দোকানিকে ডাকে সে। লোকটা প্রায় ছুটে আসতে আসতে বলে, 'বলেন দিদিমণি।'

'এক প্লেট মটন দোপেঁয়াজি।'

লিলি এত গম্ভীর হয়ে বলে, তখন আমার হাসি চাপাও দায় হয়। এদিকে তখন হুংকার বেজে ওঠে, 'বংকা।'

শব্দ আসে, 'হিঁ-ই-ই।'

'এক পেলেট মটন দোপেঁয়াজি।'

বলে সে রুটি সেঁকতে চলে যায়। ঝিনি আমার দিকে চেয়ে হাসে। লিলিকে বলে, 'আজব মেয়ে বাবা।'

লিলি বলে, 'তা কী করব। এখানকার ঝাঁজালো গন্ধে আমার খেতে ইচ্ছে করছে। তোমাদের ইচ্ছে না করলে আমি কী করব।'

ঝিনি বলে, 'আমাকে কোনো দিন খেতে দেখেছিস এসব?'

লিলি আমার দিকে তাকায়। আমি তাড়াতাড়ি বলি, 'বেশী ঝাঁজালো বলেই আমি পারি না।'

ঝিনি লিলি দু'জনেই হেসে ওঠে। লিলি বলে, 'কিন্তু আমার খাওয়া দেখে যেন নাক সিঁটকোবেন না। আমি তেলে ভাজা-টাজা এসব খেতে খুব ভালোবাসি।'

খুব ভালো। আর এক দফায় প্রমাণ পাচ্ছি, বেশবাসে যাই হোক, এও সেই অধিকাংশ রমণী-রুচি।

রুটি চা আগে আসে। তারপরে দোকানি স্বয়ং দোপেঁয়াজির পাত্র নিয়ে আসে। ধোঁয়া তপ্ত, সন্দেহ নেই। রঙের তেজও যথেষ্ট। এখন লিলির জিভে কতখানি ঝাঁজ দিতে পারবে, কে জানে। তবে টিনের চামচটা সরিয়ে রেখে ঠোঁটের রঙ বাঁচিয়ে ওর খাওয়া দেখলেই বোঝা যায়, দোপেঁয়াজি জমেছে। তবু লজ্জা ঘোচে না। মুখ টিপে হাসে আর খায়। ঝিনি নিজে দু' টুকরো রুটি খায়। আমাকে বলে, 'খাও।'

'দরকার নেই।'

'এক টুকরো।'

মুখের থেকে চোখেই বেশী বলে। অতএব অনিচ্ছাতেই এক টুকরো রুটি তুলি। তখন আবার বলে, 'আচ্ছা থাক, জোর করে খেতে হবে না।'

বলি, 'তার জন্যে নয়, আমার ঠিক খিদেই নেই।'

'কখন খেয়ে বেরিয়েছ?'

'বেলা বারোটা নাগাদ।'

লিলি বলে ওঠে, 'আর এখন রাত্রি সাড়ে আটটা।'

ঝিনি চায়ের পেয়ালা মুখে ঠেকিয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকে। আমি এক টুকরো রুটি নিয়ে চিবোতে আরম্ভ করি। আর ঝিনি তাড়াতাড়ি লিলির দিকে ফিরে বলে, 'আর কিছু খাবি?'

লিলির তখন চোখে জল। হুসহুস করে শিসোচ্ছে। ঝিনির কথা প্রায় বিদ্রূপের মতো শোনায় ওর কানে। ইহার নাম ফাসকেলাস মটন দোপেঁয়াজি। বলে ওঠে, 'চুপ কর হতচ্ছাড়ি—জল জল জল।'

ঝিনি বলে ওঠে, 'জল দিন এখানে।'

সঙ্গে সঙ্গে জল আসে। সঙ্গে সঙ্গেই পান। পানের পরে লিলি বলে, 'একটু যা ঝাল, খেতে মন্দ হয়নি সত্যি।'

'তবে খা আরো।'

লিলি পরিষ্কার জিভ ভেংচে দিয়ে বলে, 'তুই খা গিয়ে।'

তারপরে হেসে বলে, 'দেখুন না!'

বিনা নোটিসেই ঝিনি ওর ব্যাগ থেকে পয়সা বের করে দিয়ে দেয়। এতে ঝিনির খেদ কতখানি মিটল, কে জানে। আবার মেলায়। জনস্রোতের টান তখনো উত্তরে। সেদিকে খানিকটা যেতেই আসল গ্রামীণ মেলাটা চোখে পড়ে। কাঠের দরজা, জানালা, ঢেঁকি, যতরকমের গৃহস্থালী, প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এদিকটায় আলোর ঝলক কম। হ্যারিকেন লম্ফই বেশী। দুই চারি হ্যাজাকের চড়া বাতি। গৃহস্থালী বিপণির পরেই ধানকাটা মাঠের শুরু। মাঠের পথ দিয়ে গরুর গাড়ি চলাচল করে।

ফেরার পথে লিলি কী কিনতে যে বাকী রাখে জানি না। কাঠের কুনকে থেকে পাথরের গেলাস, কাঠের দু-তিনরকমের পুতুল। ঝিনি কিছুই কেনে না। ওকে জিজ্ঞেস করি, 'তোমার কিছু কেনাকাটা নেই?'

ঝিনি কেবলই মাথা নাড়ে। লিলির দিকে চেয়ে হাসে। আর যতবারই অন্যদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ঝিনির দিকে চাই চোখাচোখি হয়ে যায়। কী দেখে, কী বলতে

চায়? একবার কাছাকাছি হয়ে হঠাৎ মুখ তুলে বলে, 'কী কেনা যায় এখান থেকে?'

ওর জিজ্ঞাসায় অবাক হয়ে বলি, 'তা তো জানি না।'

'তোমার কিছু কিনতে ইচ্ছে করে না?'

'ভেবে দেখিনি।'

তারপরেই ঝিনির মুখে সহসা পরিবর্তন দেখা যায়। এক মুহূর্ত মুখ নামিয়ে রেখে আবার চোখ তুলে চায়। এক মুহূর্তেই চোখের দৃষ্টিও বদলে যায়। চোখের কোণ চিকচিকিয়ে ওঠে। গলার স্বর নেমে যায়। বলে, 'কিছু কিনতে আসিনি এখানে, বরং—।'

'বরং?'

যেন হঠাৎ হেসে উঠে বলে, 'বিকোতেই এসেছি।'

বলে আবার মুখ নামিয়ে নেয়। অন্যদিকে ফিরে দাঁড়ায়, যাতে ওর মুখ দেখতে না পাই। চারদিকে জনস্রোত। দোকানপসার কেনাকাটা। তার মধ্যে জয়দেবে দাঁড়িয়ে কী বিচিত্র কথা বলে ঝিনি। কী বিকোতে, সে কথা জিজ্ঞেস করবার দরকার হয় না। হাসিটা যে ছল, তাও বুঝতে পারি। লোকে যে ওকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়, তাও ওর খেয়াল থাকে না। কী বলি, বুঝতে পারি না। তবু চুপ করে থাকতে পারি না। ডাক দিই, 'ঝিনি।'

ও ফেরে না। আমাকেই ওর সামনে যেতে হয়। প্রায় চুপিচুপি বলে, 'বলো।'

লিলি ইতিমধ্যে আরো কিছু কেনে। জিজ্ঞেস করে, 'সত্যি কিছু কিনবি না ঝিনি?'

ঝিনি ঘাড় নাড়ে। আমার দিকে চেয়ে হেসে বলে, 'হাট করতে এলেম আমি অধরার সন্ধানে। আমার ধরা ছোঁয়াতে নেই কিছু।'

লিলি বলে, 'তবে সেই হাট করগে।'

আমরা অজয়ের কাছাকাছি এসে পড়ি। প্রায় পুবদিকের কাছাকাছি এসে মনে পড়ে যায়, বিন্দু এদিকে দিকশূল দিয়েছে। অথচ আমাদের চলটা সেদিকেই। বেশী দূরে যেতে হয় না, গন্ধেই টের পাওয়া যায়, ওদিকে একটু ভিন্ রসের আসর। হাসি কথার মত্ততাতেও তারই আভাস। ছোট ছোট চালা ঘর, ঘাড় গোঁজা গরুর গাড়ি, গাছের ঝুপসি ঝাড়ে লম্ফ হ্যারিকেনের রক্তিম আলো, সেখানে যেন কী এক রহস্য ছড়িয়ে রেখেছে। ছায়া-কায়ার মেশামিশি, যাদের দেখতে পাই, তাতে মনে হয় অন্য রসের খেলাও কিছু চলছে।

এদিকটায় এসে টের পাওয়া গেল, পুবের গাছপালার ওপরে আকাশে ক্ষীণ আলোর ইশারা। ছোট এক ফালি চাঁদ উঠে আসছে। এখনো তা গাছপালা ছাড়িয়ে ওঠেনি।

আমি আবার পশ্চিম দিকে ফিরি। যেদিকে বেদনাশা বটতলা। ফেরবার মুহূর্তেই ঝিনি বলে, 'একটা কথা বলব!'

'কী?'

'ওপারে যাবে একটু?'

'এই নদী পেরিয়ে?'

'কত লোক তো যাতায়াত করছে।'

শুধু লোক কেন। কাতার দিয়ে গরুর গাড়িও পারাপার করছে। নদীর বুকে অনেকের হাতেই হ্যারিকেন লম্ফ জ্বলছে। ঘণ্টা বাজছে গরুর গলায়। কিন্তু কেন বলে ঝিনি। সব জেনেও কেন যেতে চায়। বলি, 'লিলি একলা ফিরবে?'

'আমি ওকে বলছি।'

boiRboi.net

তার আগেই লিলি ফেরে, 'কী হলো?'

ঝিনি বলে, 'ওপারে যাবো। তুই একলা ফিরতে পারবি?'

আমি প্রায় করুণ চোখে তাকাই লিলির দিকে। লিলি আমার দিকে একবার দেখে বলে, 'মরগে যা। একটু দেখবেন মশাই, জলে ডোবে না যেন।'

বলেই সে হনহনিয়ে হাঁটা দেয়। হাতজোড়া ওর জিনিসপত্র। খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ে, হাসে। আমাকে বলে, 'যান।'

আমি ওর দিকেই তাকিয়েছিলাম। মুখ ফিরিয়ে দেখি, ঝিনি জলের ধারে নেমে গিয়েছে। হাতে ওর স্যান্ডেল, ঘাটের কাছে অন্ধকার। যদিও লোকজন আছে। কিন্তু ওপারে কোথায় যাবে ও? আমি নেমে যাই। ঝিনি জলে পা দেয়। ফিরে ডাকে, 'এসো।'

অতএব আমারও পাদুকা হাতে। ওপারের মানুষের পিছন ধরে দু'জনেই চলি। জলে ছপ্ ছপ্ শব্দ বাজে। জিজ্ঞেস করি, 'ওপারে কোথায়?'

অস্পষ্ট ছায়ায় ওর মুখ দেখি। শুধু অবয়ব। ওপারের পশ্চিম দিকে আঙুল তুলে দেখায়। অন্ধকারে নিবিড় গাছপালা ছাড়া কিছুই দেখতে পাই না। গভীর ছায়ার বাইরে অস্পষ্ট নিরালা বালুচর।

জিজ্ঞেস করি, 'কী আছে ওখানে?'

'নিরালা।'

নিরালায় যেতে চায় ঝিনি। ডাক দিয়ে ফেরাতে ইচ্ছা করে। পারি না। তবু জিজ্ঞেস করি, 'কেন?'

ও পালটা জিজ্ঞেস করে, 'ভয় লাগে?'

'ভয় লাগবে কেন?'

ও আমার দিকে ফিরে চায়। বলতে পারি না, ভয় লাগে না। চলার পথকে বিড়ম্বিত হতে দেখি। উড়াল দিয়ে চলব, ডানায় যেন ব্যথা ধরিয়ে দিতে চায় ও। আমার স্বরের খুশিতে করুণ সুর ধরিয়ে দিতে চায়, এইটুকু আশঙ্কা।

জলের কল্ কল্ ছপ্ ছপ্ শব্দে ওর গলা শোনা যায়, 'আমাকে ভয় করো না।' যেন এক করুণ আর্তস্বরে বাজে। বলি, 'ভয় করিনি তো।'

আমরা ওপারে পৌঁছুতে পৌঁছুতেই চরের বালি যেন চিকচিকিয়ে ওঠে। সবকিছুই একটু যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি নিজেদের ছায়া পড়েছে বালিতে লম্বা হয়ে। পুবদিকে ফিরে দেখি রক্তিম একফালি চাঁদ আকাশের গায়ে।

ঝিনি বলে, 'ওদিকটায় দিনের বেলা দেখেছি, সুন্দর গাছপালা, পরিচ্ছন্ন নিরালা। দুপুরে মনে হয়েছিল, জয়দেব ওদিকে তাকিয়ে লিখতেন।'

ঝিনির কথা শুনতে শুনতে আমার মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে ওঠে, 'দূরালোক: স্তোকস্তবকনবকাশোক-লতিকা বিকাশ: কাসারোপবনপবনোঽপি ব্যথয়তি। অপি ভ্রাম্যদভৃঙ্গীরণিতরমণীয়া ন মুকুলপ্রসূতিশ্চতানাং সখি শিখরিণীয়ং সুখয়তি।' সই, এই ছোট ছোট নতুন গুচ্ছে সাজানো অদ্ভুত অশোকলতা আমার দেখতে ইচ্ছে করে না। এই গাছপালার ঠান্ডা বাতাসে কষ্ট হচ্ছে। সবই সুন্দর, গায়ে জড়ানো কুঁড়ি মাথা তুলে আছে, ভোমরা গুনগুনিয়ে ফিরছে, কিন্তু আমার প্রাণে একটু সুখ নেই।...কেননা আমার আগের দিনের কথা সবই মনে পড়ছে, যখন মামুদ্বীক্ষা বিলক্ষিতস্মিতসুধামুগ্ধাননং কাননে।

ঝিনি যে কানন সরসী নিবিড় বনের দিকে যায়, জয়দেব কি তাই দেখে কল্পনা করেছিলেন? আমরা যত এগিয়ে যাই ততই নিরালা হয়ে আসে। রক্তিম চাঁদের আলো যেন আর একটু স্পষ্ট হয়। তথাপি কুহেলী প্রচ্ছন্নতা। স্থান নিরাপদ

কিনা জানি না। সেই ভাবনার সীমা পেরিয়ে এসেছি। যত এগিয়ে যাই, ওপারের নানা কলরব ছাপিয়ে ঝিঁঝির ডাক শোনা যায়। একটা রাত-জাগা পাখির স্বর বেজে বেজে ওঠে।

ঝিনি থমকে দাঁড়ায়। ওপারের মেলার সীমানাও পেরিয়ে এসেছি। ও নদীর দিকে দেখে, আমার দিকে ফিরে তাকায়। জিজ্ঞেস করি, 'কী?'

ও আমার একটা হাত ধরে। বলে, 'বালি শুকনো, ওখানে একটু বসবে?'

'চলো।'

আজ তো তাই ভেবেছিলাম সন্ধ্যায়, দেখি কত দূরে নিয়ে যায়। খানিকটা গিয়ে ঝিনি বলে, 'বসো।'

বলে, আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বসে। আমিও বসি। আস্তে আস্তে মনে হয়, লোকজন সবাইকেই দেখতে পাচ্ছি। মেলার আলো যেন আমাদের গায়েও এসে পড়েছে।

ঝিনি চোখ নামায় না দেখে ওর দিকে ফিরি। অস্পষ্টতার মধ্যেও দু' পাশের বেয়ে পড়া চুলের মাঝখানে ওর মুখ স্পষ্ট দেখা যায়। অসংকোচ অপলক চোখের দৃষ্টি, তবু ঠোঁট যেন কাঁপে। আবার জিজ্ঞেস করি, 'কী?'

ও আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ে। প্রায় অস্ফুটে বলে, 'শুধু এইটুকুই।'

বলে মুখ নামায়। ওর মুখে, ওর সমস্ত ভঙ্গিতে একটা অসহায় কষ্টের ছাপ ফোটে। ওর বিকোতে আসার কথা আমার মনে পড়ে, মনে পড়ে, ও হাট করতে এসেছে অধরার সন্ধানে। বোধ হয় আপনাকে বিকিয়ে। ওকে কিছু বুঝিয়ে বলব, সে মেয়ে ও না। কিন্তু ওকে কোনোরকমে একটু স্নেহের প্রবোধ জানাব, সে সাহস পাই না। তথাপি আমার বুকে বিঁধে যায়।

মুখ নিচু রেখেই ও সহসা বলে, 'জানি, আমার লজ্জা নেই। তুমি দুঃখ পাও, বিরক্ত হও।'

এত তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, বাধা দেবার সময় পাই না। তবু বলি, 'বিরক্ত হইনি।'

'হও হও, আমি বুঝি। কিন্তু—এইটুকু, এইটুকু।'...

ওর গলায় স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। আমি ডাক দিই, 'ঝিনি।'

ও মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে, 'কেন এমন হলো, তুমি কি জানো?'

জবাব দিতে পারি না। ও বলে ওঠে, 'আমি জানি।'

ওর জলে ভেজা চোখের দিকে তাকাই। ও বলে, 'তোমার জীবনটা আমাকে লোভী করেছে। তুমি যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে চলে যাচ্ছ। কোনো কিছুতেই দৃক্‌পাত নেই। যেন কেউ ডাকছে।'

আমি বলি, 'জানি না তা। আমি তো কোনো ডাক শুনতে পাই না।'

'কিন্তু তোমাকে যে দেখবে, সে-ই বলবে একথা। তারপরে মনে হলো, তুমি সুখের খোঁজে যাচ্ছ না। ত্রাণের খোঁজে চলেছ। তাই আর মন মানাতে পারি না, চোখ ফেরাতে পারি না। কেবল ভাবি, আমিও, 'তুমি' হবো।

ও আমার দু' হাত নিজের হাতে নেয়। বলি, 'ঝিনি, তোমার সব কথার জবাব আমার জানা নেই। ত্রাণের খোঁজে যাই কিনা জানি না, শুধু এইটুকু জানি, আমার সবই বিষে ভরা। এ বিষ আমি সইতে পারি না। এই নিয়ে আমার চলা।'

'হ্যাঁ, তুমি বিষ, বিষাক্ত। সে বিষ তুমি আমাকেও দিয়েছ।'

'দিইনি ঝিনি।'

'তবে নিয়েছি।'

একথার কোনো জবাব দিতে পারি না। শুধু বলি, 'তবু সে তোমারি যন্ত্রণা, মুক্তি সে তোমারি নিজের উপায়ে।'

ঝিনি বলে, 'এইটুকু তোমার বলবার আছে জানি। সে পথ কখনো মিলবে না। একটা কথা বলব?'

'বলো।'

'কিছু তো নেবে না কিছু দাও।'

'কী?'

ঝিনি ঘাড় নাড়তে নাড়তে দু' হাতে মুখ ঢাকে। শরীর ফুলে ফুলে ওঠে। ভাঙা ভাঙা স্বরে বলে, 'জানি না, তা জানি না।'

বলতে বলতে বালিতে নিচু হয়ে পড়ে। অসহায় কষ্টে ওর দিকে চেয়ে থাকি। যে আলো আমার হাতে নেই, তা আমি জ্বালি কেমন করে। জানি, এই বাজীতে আগুন দিলে সংসারের আকাশ জুড়ে, নানা রঙের আলোর ঝাড় ঝলকাবে। কিন্তু সে আগুন আমি হাতে করে নিতে পারি না। দিতে পারি না।

একটু পরে ও শান্ত হয়, মুখ তোলে, উঠে বসে। পশ্চিমের দূরে নদী আর চরের অসীমে, অন্ধকারে মুখ ফিরিয়ে ক্ষণকাল চেয়ে থাকে। তারপরে আমার দিকে তাকায়। বলে, 'আমার লজ্জা ঘৃণা ভয়, কিছু নেই। আমাকে তোমার খুব খারাপ লাগছে, তাই না?'

এই মুহূর্তে আমারও বুকের ভিতরটা দুলে ওঠে। মনে হয় একটা আবেগের ঢেউ ভেঙে পড়তে চায়। বলি, 'আমি অমানুষ নই। কী বলব, তোমাকে কেমন লাগে? তোমার মতো সর্বাংশে সুন্দর আর—।'

কথা শেষ করতে না দিয়ে ও বলে ওঠে, 'বিষ বিষ বিষ। আর দিও না। বুঝেছি কী বলবে, থাক।'

বলতে বলতে ওর চোখ আবার ঝাপসা হয়ে ওঠে। বলে, 'চলো যাই।'

দু'জনেই উঠি। ঝিনি আবার বলে, 'একটা কথা রাখবে?'

'বলো।'

'আজ সারারাত মদন বাউলের আখড়ায় দু'জনে গান শুনব।'

'শুনব।'

'সত্যি, তুমি কী বাধ্য।'

বলে, যেন রঙ্গ করে হেসেই ওঠে। পথে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করে, 'এখান থেকে কোথায় যাবে?'

'ঠিক জানি না। তবে হাড়োয়ার পীর গোরাচাঁদের মেলায় একবার গাজীর সঙ্গে দেখা করতে যাবো।'

'গাজী? কোন্ গাজী?'

'সেই মামুদ গাজী।'

'ওহ্, সেই মানুষ, যার সঙ্গে তোমাকে প্রথম দেখি।'

'হ্যাঁ।'

ঝিনি কথা বলে না। যেন সেদিনের স্মৃতির মধ্যে ডুবে যায়। একটি কথাও না বলে, নদী পার হয়ে চলে আসে।

ঝিনিকে মদন বাউলের আশ্রমে পেঁছে দিয়ে বিন্দুদের আশ্রমে ফিরি। কথা থাকে, খেয়ে এসে ওদের সঙ্গে সারা রাত্রি গান শুনব। কিন্তু আমার কেবলই মনে হয়, জয়দেব দেখা আমার শেষ হয়েছে। জয়দেবের রাধামাধবের মন্দির দর্শনে লাভ কী। কেবল স্মৃতি। বিগ্রহ বৃন্দাবন থেকেই জয়পুররাজ জয়পুরের ঘাটি নামে জায়গায় প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আশ্রমে ফিরে দেখি গানের আসর তখনো জমজমাট। আমি ঘরে ফিরে যাই। সেখানে

দেখি বিন্দু কার সঙ্গে বসে কথা বলছে। নতুন একজন বাউল। গোপীদাসেরই বয়সী হবে। মোটা কাঁথার আলখাল্লায় শরীর জাড়ানো। মাথার পাকা চুল আলুলায়িত। পাকা দাড়ি কুঁকড়ে পাকিয়ে গিয়েছে গলার কাছে।

বিন্দু আমাকে দেখেই কাছে উঠে আসে। বলে, 'এস্য বাবাজী, ঘুরাফিরা হল্য?'

সে আমার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। তারপরে যেন চমকে উঠে বলে, 'কী হয়েছে চিতেবাবাজী?'

অবাক হয়ে বলি, 'কিছু না তো?'

বিন্দু তীক্ষ্ন অনুসন্ধিৎসায় তাকিয়ে বলে, 'মুখখানা যে বড় শুকনো দেখি, চখের কোল বসা।'

হেসে বলি, 'কিছু না। বেড়িয়ে ফিরলাম তো।'

বিন্দুর চোখে অতৃপ্ত সংশয় লেগে থাকে। বৃদ্ধ বাউল জিজ্ঞেস করে, 'কে গ বিন্দু!'

বিন্দু ফিরে বলে, 'ই সিই চিতেবাবাজী, যার কথা বইলছিলাম তোমাকে।'

আমার দিকে ফিরে বলে, 'ই বাবাজীর নাম গোপাল গোঁসাই। আমার বাবার আর ওঁয়ার একই গুরু, গুরুভাই দু'জনায়।'

গোপাল গোঁসাই! আমি ভালো করে বাউলের চোখের দিকে তাকাই। বিন্দু বলে, 'কী দেইখছ বাবাজী? ওঁয়ার চখ নাই। মায়ের দয়ায় লজর হারিয়েছে।'

বলি, 'হ্যাঁ, ওঁর কথাই শুনছিলাম মদন বাউলের কাছে। উনি বোধহয় ওখানে গান করছিলেন।'

গোপাল নিজেই বলে ওঠেন, 'হুঁ হুঁ বাবা, উখানে গান কইরেছি। এস্য বাবাজী, আমার কাছকে এস্য।'

গিয়ে ডান দিকে বসি। গোপাল হাত বাড়িয়ে দেন। তারপরে কাঁধের থেকে, গোটা মুখে চোখে মাথায়। বলেন, 'বাহ্, সোন্দর বাবাজী। মাথা মুখ বেজায় ঠান্ডা ক্যানে বাবাজী?'

বলি, 'বাইরে ছিলাম তো।'

'তাই। খুব ঠান্ডা।'

বলে আমার হাত টেনে নেন। যেন গরম করে দিতে চান। চোখের ভিতরে কিছুই দেখি না, তবু যেন কী চিকচিক করে।

ওঁর সঙ্গে দু-চার কথা হতে হতেই গোপীদাস আসে। রাধা বৃদ্ধাও আসে। তারপরে নিতাই খাবার জন্য ডাক দেয় সবাইকে। কিন্তু যতবারই বিন্দুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়, দেখি তার অনুসন্ধিৎসা ঘোচে না। একটু বা উদ্বেগের ছায়া।

আমার খাওয়া শেষ হতেই লিলি আসে। বলে, 'ডাকতে এসেছি।'

বলি, 'আমি তো যাবো বলেছিলাম।'

'যাকে বলেছেন, তার মন মানলে তো। তারপরে কী করেছেন কে জানে। খেলো না কিছুই। আমাকে বললে, ডেকে নিয়ে আয়, নইলে আসবে না হয়তো।'

লিলি কথা বলতে বলতে আমার চোখের দিকে বারেবারেই চায়। চোখাচোখি হলেই, দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। ওর চোখেও অনুসন্ধিৎসা। বিন্দুর কাছে থেকে বিদায় নিয়ে গোপীদাসকে বলে মদন গোঁসাইয়ের আখড়ায় যাই।

ঝিনি ঢোকবার মুখে দরজাতেই দাঁড়িয়েছিল। আমরা আসরের একেবারে সামনে গিয়ে বসি। গিয়ে বসতে হয় না। আশ্রমের যাত্রী উদ্যোক্তারাই ডেকে বসান। ইতি-মধ্যে গান আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় গুচ্ছ গুচ্ছ দল সব বসে আছে। একের পর এক গানের পালা।

ঝিনি আমি লিলি তিনজনেই পাশাপাশি বসি। ওরা দু'জনে এক চাদরে পরস্পরকে জড়িয়ে বসে। ঝিনি আমার চাদরটা তার আগেই টেনে একেবারে আমার পা অবধি ঢেকে দেয়। মদন বাউলের সঙ্গে যতবার চোখাচোখি ততবারই হাসাহাসি। চোখে চোখে নিঃশব্দে। তিনি যেন কেবলই ইশারায় ভুরু কাঁপান।

মনোহরা মাঝে মাঝে এসে বসেন, আবার উঠে যান। মাঝে রাত্রে মদন একবার আসন ছেড়ে উঠে যান। লিলি তখন কাত হয়ে শুয়ে পড়ে। ঝিনি আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'ঘুম পেয়েছে?'

বলি, 'না।'

'বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে না?'

আমি ওর দিকে ফিরে তাকাই। বলি, 'না।'

আমার যেন মনে হয়, ঝিনিই ক্লান্ত বেশী। বলি, 'তোমার একটু শোয়া দরকার।'

ও সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'শোবো?'

'শোও।'

'তোমার পায়ের ওপর মাথা রাখলে কষ্ট হবে?'

আমি এক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে থেকে বলি, 'আমার কোলের ওপরেই রাখো।'

মুহূর্তে ওর মুখের পরিবর্তন হয়। অস্ফুটে একবার উচ্চারণ করে, 'বিষ।' স্পষ্ট করে বলে, 'যাবার আগে ডাক দিও।'

বলে ও আমার পায়ের কাছেই মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। গানের দিকে মনোযোগ দিতে গিয়েও যতবার তাকাই, দেখি ঝিনি মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। চাদরের ভিতর দিয়ে ওর একটা হাত আমার পায়ে। ইতিমধ্যে মদন গোঁসাই আবার আসেন। এসে ঝিনি লিলির দিকে ইশারা করে মাথা নাড়েন। তারপরে হাতের ভঙ্গিতে জানান, থাক, এমনিই থাক ওরা।

শেষ রাত্রির আগেই ঝিনির চোখ বুজে যায়। এখন আমি ওর মুখের দিকে দেখি। ওর ঘুমন্ত মুখে যেন বিষণ্ণ হাসির আলোছায়া মাখা।

আসর অনেক ঝিমিয়ে এসেছে। শেষ রাত্রের দিকে চারদিকেই অনেকে ধরাশায়ী। এমন কি নাসিকা গর্জনও শোনা যায়। আমি আস্তে আস্তে পা থেকে ঝিনির হাত সরাই। সেই মুহূর্তে একবার মদন বাউলের সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হয়। তিনি দাড়ি দুলিয়ে হেসে ঘাড় নাড়েন। আমি আস্তে আস্তে পা গুটিয়ে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াই। ঝিনি এখন গভীর ঘুমে অচেতন। ওর হাতটা চাদরের বাইরে পড়ে থাকে। ওর চাদর দিয়ে ঢাকতে গেলে পাছে জেগে যায়। তাই আর ঢেকে দিই না। কিন্তু এলানো হাতটা দেখে কেমন একটা শূন্যতা জেগে ওঠে।

আমি আবার মদন গোঁসাইয়ের দিতে তাকাই, তিনি স্নিগ্ধ হেসে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি হাত তুলে নমস্কার করি। তিনি দু' হাত তুলে ঘাড় নেড়ে আমাকে বিদায় দেন। আমি বেরিয়ে আসি।

এখনো কোথাও কোথাও গান চলছে। কিন্তু অনেকটাই চুপচাপ হয়ে এসেছে। আমি আমার আশ্রয়ে ফিরে আসি। সেখানে একেবারেই নিঝুম। ঘরে ঢুকে দেখি, অচেনা অনেকে শুয়ে আছে। নিতাই আর সুজন তার মধ্যে চেনা।

হঠাৎ শব্দে পাশ ফিরে দেখি, পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বিন্দু। আমি তাড়াতাড়ি তার কাছে যাই। নিচু স্বরে বলি, 'বিন্দু আমার ঝোলাটা দাও।'

বিন্দু কিন্তু অবাক হয় না। আমার মুখের দিকে কয়েক পলক চেয়ে থেকে বলে, 'ঝিনিদিদিকে কোথায় রেখ্যে এল্যে?'

কী আশ্চর্য প্রশ্ন। আমি কেন তাকে রেখে আসব। বলি, 'ও আসরে ঘুমোচ্ছে।'

'আর তুমি পালাইচছ।'

বলে, জবাবের প্রত্যাশা না করে সে আমার ঝোলাটা এনে দেয়। আমি বলি, 'সবাইকে বলো, আমি গেলাম।'

বিন্দু আমার চোখের দিকে চেয়ে থাকে। ওর চোখের কোণ দুটো চিকচিকিয়ে ওঠে। বলে, 'বুঝি চিতেবাবাজী, তোমাকে বুঝি, তোমাকে দুইষব না। তবে—।'

বিন্দুর গলার স্বর বন্ধ হয়ে যায়। আমি বলি, 'যাই বিন্দু।'

আমার সঙ্গে সঙ্গে সে দরজায় আসে। বলে, 'আবার এস্য বাবাজী, যখন মন কইরবে এস্য। তোমার তো পথের বাধা নাই।'

ঘাড় নেড়ে চলে আসি। মনে মনে বলি, কত যে বন্ধন প্রতি পদে পদে, তা যদি বোঝাতে পারতাম। আমার পথের বন্ধন তো অন্য মানুষ না, আমার মন। সে যদি ঠিক, আমিও ঠিক।

জয়দেবকে মনে মনে স্মরণ করি। কে জানে, কেমন দেখতে ছিলেন। শুধু জানি, তিনি এক কবি। তিনি পদ্মাবতীরমণ, চরণচারণ চক্রবর্তী।

অজয়ের জলে কুয়াশা উঠছে ধোঁয়ার মতো। কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেকে স্নানে নেমেছে। চাঁদ চলে গিয়েছে, পশ্চিমের সেই নিরালা কাননের পিছনে। এখন অন্য আলোর ইশারা। আমি নদী পার হয়ে যাই।

এবার ফিরে চলো। এখন অবতরণ। রাঢ়ের উত্তর থেকে দক্ষিণের ঢলে নেমে যাওয়া। মনের দৃষ্টি ভরে যেন প্রকাণ্ড এক আলখাল্লা দোলে। কত যে ধুলো, কত যে রঙ তার গায়ে! দেশান্তরের ধুলা রূপান্তরের রঙ। যত সেলাই, পট্টিতালি মারার রঙে। তালিতে তালিতে রঙ। ছেঁড়া ন্যাকড়া, কাঁথার তালি, কাপাসী নামাবলী, রেশমী পশমী কত ঝলক দেওয়া তালি এই আলখাল্লায়।

এ আলখাল্লাটা যে কার গায়ে, তাকে দেখতে পাই না। কে যে ভিতর দিকে দৃষ্টি টেনে নিয়ে চোখের সামনে সেটাকে দোলায়, তা-ও দেখি না। মনে হয়, অনেক দূরে কোথায় যেন ডারা ডুপ্‌কি প্রেমজুরি, একতারা বাঁয়ার মিলিত শব্দ বাজে ক্ষীণ সুরে। তার সঙ্গে গানের কলি,

দিনে দিনে হল আমার
দিন আখেরি
আমি কোথায় ছিলাম
কোথায় এলেম
সদায় ভেবে মরি।

কে গায়, কার গলা, চিনতে পারি না। যেন কোন্ এক আত্মভোলা আপন মনে গেয়ে চলে। তার গলায় নেই সুরের বাহার, অথচ স্বরে আবেগ। কাঁদে, না হাসে—বোঝা যায় না।

পথ চলি। চলতে চলতে এমনি মনে হয়। চলার পথে যে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তা না। কিন্তু বুকের মধ্যে কেমন একটা ভার। অথচ একটা ব্যাকুলতা রয়েছে। কিসের ভার, তা জানি না। যে পথ পিছনে রেখে আসি, যা-কিছু ছেড়ে আসি, তার জন্যই কী না, কে জানে। তবু একটা ভার, কেমন একটা ব্যথা ধরানো।

ব্যাকুলতা যেন একটু বুঝতে পারি। যে আমাকে অচিনের খোঁজে ফেরায়, সে একটা পাগল, সন্দেহ নেই। পাগলই পাগল করে আমাকে। গাজীর নিমন্ত্রণের কথা মনে পড়ে বারে বারে। যেতে হবে। ব্যাকুলতার মধ্যে তার সেই কালো মুখের ভাঁজে ভাঁজে হাসি,

ঝাঁকড়া চুল, গোঁফ-দাড়ি, আলখাল্লা পরা চেহারাটা বারে বারে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর পান-খাওয়া তার সেই লাল দাঁত। ওইটুকু মাপ করতে হবে। মুরশেদের নামে ফেরে, কিন্তু পানের পিকছোপানো ল্যালিমাটুকু দাঁতে লেগে থাকে। তবু একটা মুখ, সমস্তটাই যেন হাসি।

জয়দেবের রাত পোহাতেই মাঘ মাস পড়ে যায়। তাই ফেরার পথে নবদ্বীপ হয়ে যাই। মাঘ মাসে ধুলট। ধুলট উৎসব। যত বৈষ্ণব কীর্তনিয়া, সকলের আগমন এখন নবদ্বীপে। যত নাম, তত গান, তত ধুলামাখামাখি। যে ধুলায় নিমাই চলেছে, যে-ধুলায় নিমাই গড়াগড়ি দিয়েছে, সেই ধুলায় ভক্ত গায়কের গড়াগড়ি। যতেক কীর্তনিয়া, মেয়ে-পুরুষ, ভদ্রাভদ্র, সকলেই নিমাই-ক্ষেত্রে গান নিবেদন করতে আসে এ সময়ে। নবদ্বীপে মাঘ মাস গানের মাস। প্রথম নিবেদন এখানে। তারপরে গ্রামে জনপদে যত্রতত্র। যাঁর গান, আগে তাঁকে দিয়ে, তারপরে অন্যে পরে।

মাধবী দাসীর গান শুনে মনে হয়েছিল, গান না, আর কিছু শুনি। তার জীবনটা কেমন কে জানে। চওড়া কালো পাড় ঢাকাই শাড়ি পরে প্রৌঢ়া গায়িকাটি যখন আসরে নেমেছিল, তখন তেমন কোনো আশা জাগেনি মনে। তার জামা শাড়ির বহর, পান খাওয়া ঠোঁট, সিঁদুরের ঔজ্জ্বল্য, পায়ের আলতা, হাতে পানের রুপার কৌটা, একটা রাজেন্দ্রাণী ভঙ্গি দেখে মনে হয়েছিল, মাইফেলের আসর তো না। কেমন যেন একটু 'অংখারের' ছাপ দেখা যায়।

কিন্তু মাথুর ছাড়া সে কিছু গায়নি। বিলম্বিত লয়ে তার সুর, সেই লয়েতেই শেষ। দীর্ঘশ্বাস, কান্না, বিরহ। গরবিনীবেশিনী মাধবী দাসী আসনে বিরহিণী। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে গেয়েছে, শ্রোতারা সবাই কেঁদেছে। তার গলার সুরে কান্না ছিল। চোখে জল ছিল না। 'হেন এ অবলা, করেছে বিকলা, নিয়ে চল্ সখী মথুরাপুরে।' নিজেকে দেখিয়ে দেখিয়ে কান্নার সুরে সে গেয়েছে, 'চল্ চল্ চল্ নিয়ে চল্ সখী।' অন্যেরা কেঁদেছে। রাই সখী মথুরায় গিয়ে ধিক্কার দিয়ে আসে, 'ধিক ধিক ধিক তোরে হে কালিয়া, কে তোরে কুবুদ্ধি দিল।' মাধবী দাসী চোখ পাকিয়ে তর্জনী তুলে তুলে গেয়েছিল, 'কে বা সেধেছিল পীরিতি করিতে, মনে যদি এত ছিল।' তারপরে চোখ বুজে রাগে অভিমানে ব্যাকুল স্বরে বলেছিল, 'তোমার কি একটু লজ্জা নাই হে, অ্যাঁ? একটা মেয়েকে কাঁদাতে বুঝি খুব ভালো লাগে! ওরে নষ্ট দুষ্টু!'

কিন্তু এক সময়ে মাধবী দাসীর চোখ ফেটেও জল এসেছিল, যখন নিজেকে দেখিয়ে আখর দিয়ে বারে বারে গেয়েছিল, 'এই অথির জীবন, অথির যৌবন, আর কতক্ষণ। ওহে, আর আর আর, আর কতক্ষণ।'...তখন সে গান যেন মাধবী দাসীর আপন গান হয়ে উঠেছিল। শ্রোতাদের সকলের গান হয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, আমার সারা রাত ঘুমের মধ্যে সেই গান শুনেছি।

সুদেব গোস্বামীর গানও ভালো লেগেছিল। বৃদ্ধ গায়ক, ধুলায় গড়িয়ে গড়িয়েই গেয়েছিলেন। তাঁর গান নিমাই-হারা নদীয়াবাসীর গান। পুত্রশোকাতুরা শচীমায়ের গান। স্বামীহারা বিষ্ণুপ্রিয়ার গান। 'হাজার চাঁদে আলো করুক, নদের আকাশে আর চাঁদ নাই।' নদীয়াবাসীর অন্ধকারে হাহাকার। শচীর ক্রন্দন, 'এ-বাড়ির পরাণ কেন থাকে।' বিষ্ণুপ্রিয়ার একলা কান্না, 'তোমার কৃষ্ণের একি অভিলাষ।'

মন্দিরে মন্দিরে আখড়ায় গান শুনি। ধুলট উৎসব না দেখলে, এ গান না শুনলে নবদ্বীপের মরমে যে রসের ধারা বহে, তা জানা যেত না। রাসযাত্রা বা অন্যান্য উৎসবের আলো কোলাহল বেশী। সে রূপে এ রূপ নেই।

এই উৎসবের শেষে অবার পথ চলা। বারোই ফাল্গুন হাড়োয়ার হাটে পীর গোরাচাঁদের মেলায় যেতে হবে। গাজীর নিমন্ত্রণ। কিন্তু এত ভাব, কোথা গেলে

মনে নামে। চকিতে চকিতে সচকিত হয়ে কী দেখি। যেন কেমন একটা চমক লাগে থেকে থেকে। আর ব্যাকুলতা বাড়ে।

তবুও ফেরার পথে, ঘুরপথে যাই। মাঘের পূর্ণিমায়, বর্ধমানের কুলীনগ্রামে ঘুরে যাই। শ্যামের মন্দিরে এখন উৎসব, কুলীনগ্রামে মেলা। একটু না দেখে যেতে পারি না। কেবল শ্যামের মন্দির আর মেলা না। সেখানে ভক্ত হরিদাসের একটি স্মৃতিমন্দির আছে। মেলা পেরিয়ে সেখানে যখন যাই, বিশাল একটা গাবগাছের দিকে চেয়ে মনে হয়, যুগ-যুগান্তর দাঁড়িয়ে আছে যেন। এত বিশাল আর প্রাচীন গাব গাছ আর কোথাও দেখিনি। এমন বিশাল পাথরের মতো এবড়োখেবড়ো অবয়ব আর কখনো চোখে পড়েনি।

হরিদাসের স্মৃতিমন্দির দেখবার মতো এমন কিছু না। অনেক দিনের পুরনো শ্যাওলা-ধরা খানিকটা ইঁট বাঁধানো জায়গা। তার এক পাশে একটি সামান্য ঘর। গাছপালার ছায়ায় ঘেরা, নিঃশব্দ নিরালা। বারো মাস জঙ্গলেই ঢাকা থাকে বোধহয়। উৎসব উপলক্ষে একটু সাফসুরত করা। মেলার কোনো হট্টগোল এখানে নেই। দু'-চারজন একাকী বা যুগল বৈষ্ণব সেখানে চুপচাপ বসা। তারাও সেই নিরালা নিঃশব্দের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে যেন।

কুলীনগ্রাম থেকে নোগ্রামের জলেশ্বরের ক্ষেত্র দেখে যাই। শিব জলেশ্বর। ফাল্গুনে শিবরাত্রির উৎসবে মেলা হয়। সে মেলা কেমন জানি না। কিন্তু জলেশ্বর ক্ষেত্রের এই অরণ্যের নিবিড়তা মন ভুলিয়ে দেয়। চোখ জুড়িয়ে যায়। বনে, নিরালায়, কে এই শিব প্রতিষ্ঠা করেছিল, কে জানে। বাঙলা দেশের অধিকাংশ দেবদেবীর প্রতিষ্ঠাই দেখি নদীর কূলে, ঘর-গৃহস্থের দুয়ার পেরিয়ে, আকাশের নিচে, সুদূর বিস্তৃতিতে। কোথাও বা অরণ্যে বনে নিরালায়। বছরের কয়েকদিন উৎসব মেলা যা কিছু সব সেখানেই।

মানুষ সেখানে আর-এক জগৎ সৃষ্টি করতে চেয়েছে। দেখি, পথ চলি, দেখি। 'তবু ভরিল না চিত্ত।' ভরবেও না। কিসের খোঁজে ফেরা, তার সন্ধান যে জানেনি, তার ভরাডুবির কোনো কথা নেই। শুধু এই এক, দেখি, চলি আর দেখি, নানা মানুষ। ভাবের পটে, ছবির মতন। এত বিচিত্র, বিস্ময়কর, অভয় মন-প্রাণের শূন্যতার কথা ভুলে যাই। বৈরাগ্য আমার নেই, আমি বৈরাগী না। তাই অনেক শূন্যতার মধ্যেও যে বিচিত্র বিস্ময়কে দেখি, তার সামনে দাঁড়িয়েই সহসা স্তব্ধ হয়ে যাই। বুকের কাছে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে পড়ি।

বসিরহাটগামী বাস ধরে বেড়াচাঁপার কাছে নামি। এবার হাড়োয়ার পথে। আমার গাজীর নিমন্ত্রণ। এতক্ষণ পূবে গতি ছিল। বেড়াচাঁপা থেকে সোজা দক্ষিণে। বেড়াচাঁপার ভিড় দেখেই বোঝা যায়, মেলা লেগেছে। দু'খানি বাস ছেড়ে দিতে হয়। ভিড়ের মধ্যে জায়গা পাই না। যাত্রী দেখলেই বোঝা যায়, সকলের গতি এক দিকে। হাড়োয়া, পীর গোরাচাঁদের মেলায়। বিদ্যাধরী নদীর কূলে।

সেখানে গিয়ে গাজীর সঙ্গে দেখা করেই নতুন কাজ, নৌকা আর মাঝির খোঁজ। যাবো দক্ষিণে, দূর দরিয়ার কূলে। সুন্দরবন, সাগরসঙ্গমে।

গাড়িতে উঠে গাজীর কথাই বারে বারে মনে হয়। মনে মনে অনেকবার বলেছি, গাজী না পাজী। যেমন তেমন পাজী না। রসের শেজোমিতে ওর মন ভরা। আশমানী ছায়া দরিয়ার মতো চোখ দেখলেই বোঝা যায়। তার জন্য কিছু নিয়ে যাবার নেই আমার, শুধু কয়েক প্যাকেট সিগারেট ছাড়া।

তা-ই নিয়েছি। মনে আছে, ইছামতী পার হবার সময়ে আমার দুমপাশে তার নাসারন্ধ্রের স্ফীতি। তারপরে 'বাবুর ছিরগেটের কী খোশবু। ভারী মিঠে বাস ছাড়তিছে।' তার মানেই, একটু আস্বাদ দাও। সাধু-ফকিরদের এসব দেখলে যে বিরক্তি লাগে না, তা না। তবু একটা 'ছিরগেট' দিয়েছিলাম। কিন্তু সেটাকে দু' টুকরো করে সে যে নৌকার মাঝিকেও আধখানা দান করবে, তা ভাবিনি। সেই অধম মাঝিকেও ভোলবার নয়। পারাপারের অনেকটা সময় তাকে দেখেছিলাম। খালি গা, খড়ি-ওঠা দাগ, দুটি গভীর কালো চোখ, যেন একটা ঘোর-লাগা মানুষ। সে অধর মাঝি আমার কাছে অধরই থেকে গিয়েছে। তাকে আধখানা সিগারেট দিতে দেখে অবাক হয়েছিলাম। অমন জিনিসের ভাগ দেবার উদারতাও যে গাজীর আছে, বুঝতে পারিনি। মানুষ চিনি কতটুকু।

তারপরে তো মুরশেদের নামের মজুরি করে ফেরা গাজী গান দিয়েই মাত করেছিল। মনে আছে, কালীনগরের ঘাট থেকে ঝিনদের নিয়ে যখন লঞ্চ ছেড়ে গিয়েছিল, সে গুনগুনিয়ে উঠেছিল, 'ও সে না জানি কি কুহক জানে, অলক্ষ্যে মন চুরি করে।'...সেই মুহূর্তে কেন গেয়েছিল এই গান। গাজী সত্যি পাজী।

তা-ছাড়া, এবার তো শুধু গাজী না। সঙ্গে তার 'পিকিতি' নয়নতারার দেখাও পাওয়া যাবে। 'পিকিতি না হলি তো সাধন হয় না বাবু। একটি পিকিতি চাই।'

কেমন করে সেই প্রকৃতি প্রাপ্তি ঘটেছিল, তারও বাখানি আছে। এই হাড়োয়ার মেলাতেই একদা এক যুবতী বৈষ্ণবী গাজীর গান শুনে নিজের দল আখড়া সব ছেড়ে গাজীর সঙ্গে চলে গিয়েছিল। নাম তার নয়নতারা। গাজীর পিকিতি।

এ কি যে-সে গাজী। তারপরেও বলেছিল, 'তা বলি, এ পুরুষ-পিকিতি কিন্তু মিয়া-বিবির ঘর করা নয় বাবু। দুইজনের সাধনা, ছাওয়াল-পাওয়াল হতি পারবে না।'

দেহতত্ত্বের কথা বলেছিল। আর শেষ মুহূর্তের বিদায়ের সময় জানিয়েছিল, ঘরে তার চারটি ছাওয়াল-পাওয়াল নিয়ে নয়নতারা গাজীর অপেক্ষায় আছে। আমি থ হয়ে গিয়েছিলাম। তার জবাবে, 'অই মুরশেদের নাম নিয়িই ফিরি, সাধন-ভজন আর হল কমনে বাবু।'...এর নাম গাজী। তবু সেই চারটি ছাওয়াল-পাওয়ালের বাবা গাজীকে কিছু অর্থ দিয়ে বলেছিলাম, 'ছেলেপিলেদের একটু মিষ্টি কিনে দিও।'

জানি না, নয়নতারা পিকিতির সঙ্গে ছাওয়াল-পাওয়ালরাও আসবে কী না। তবে গাজী আর নয়নতারাকে আসতেই হবে। পীর গোরাচাঁদের স্মরণোৎসব বলে নয়। দু'জনের মিলনের স্মৃতির দিনও তো বটে। মিয়া-বিবি, কর্তা-গিন্নির বিবাহ বাৎসরিক না হতে পারে। প্রকৃতি প্রাপ্তি দিবস তো বটে। তাই হাড়োয়ার মেলায় একবার আসতে হবে। পীর গোরাচাঁদের থানে গান গাইতে হবে।

পথে শুধু মোটর বাস চলে না। তিন চাকার গাড়ি, যেগুলো মালপত্র টানে, আজ তাদেরও মালখানা থেকে ছুটি। তারাও মানুষ বহন করে চলেছে প্রায় মালের মতোই বোঝাই করে। তার শব্দ যেন আর্ত চিৎকার। গরুর গাড়ির তো কথাই নেই। হিন্দু মুসলমান, সব রকমের যাত্রী। গাড়ির ছইয়ের মধ্যে কর্তা-গিন্নি ছেলেমেয়ের গাদি। তার মধ্যে আবার নবীন প্রবীণদের ভাগাভাগি আছে। সাইকেল আর সাইকেল রিকশার যাত্রীও বিস্তর। পায়ে হাঁটার দলের কোনো হিসাব নেই। সব নদী যেমন সমুদ্রে যায়, এই লোকজন যানবাহন, সকলই পীর গোরাচাঁদে যায়।

দু' পাশের মাঠে এখন অনেকটাই শূন্যতা। কিন্তু নারকেল সুপারি আম জামের ঘন নিবিড়তা। ফাল্গুনের বাতাসে, তারাও যেন মত্ত মাতোয়ারা।

অনেকক্ষণ থেকেই, পাশে এক বুড়া দরবেশ কী যেন গুন গুন করছে। ঠিক গানের মতো না। সুর করে পাঁচালি বলার মতো। দেখলেই বোঝা যায়, হাড়োয়ার যাত্রী।

মুসলমান ফকির বিশেষ। কিন্তু তার জামা কালো। কালো আলখাল্লা, কালো পায়জামা, মাথায় কালো টুপি। গলায় গুচ্ছের কাঁচপাথর পুঁতির মালা আর হার। রুপোর চৌকো তাবিজ। চোখাচোখি হলেই একটু হাসে। গুনগুনানি চলে সমানেই। বাধা দেওয়া উচিত না। বোধহয় মন্ত্র জপ করে।

তারপর নিজেই এক সময়ে বলে, 'পীরের মেলায় চললেন বাবু?'

বাঙালী। একটু যেন সন্দেহ ছিল মনে। বলি, 'হ্যাঁ!'

দুই চারি কথার পরে সে আমাকে পীর গোরাচাঁদের কাহিনী শোনায়। অনেক তাঁর কিস্যা। তিনি ছিলেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী। এসেছিলেন দলের সঙ্গে মক্কা থেকে। বালান্ডার রাজা চন্দ্রকেতুকে মুসলমান করতে চেয়েছিলেন। তিনি লোহার দলা পাকাতে পারতেন। বেড়ার গায়ে চাঁপা ফুল ফোটাতে পারতেন। তার জন্যেই নাকি এ জায়গার নাম বেড়াচাঁপা। তাঁর অভিশাপেই, চন্দ্রকেতুর তিন দিনের মধ্যে সর্বনাশ হয়। হাতিয়াগড়ের রাজা আকানন্দ, তার ভাই বাকানন্দর সঙ্গে লড়াই করেছিলেন তিনি। আকানন্দ মরেছিল, বাকানন্দ হারিয়েছিল। তাতে এমন আহত হয়েছিলেন, মরবার মতো। সে সময় তাঁকে সেবা করে ভার্গবপুরের কানু আর কিনু ঘোষ। সেখানেই মারা যান। তাঁর হাড় যেখানে কবর দেওয়া হয়, তার নাম হাড়োয়া, আর ভার্গবপুর নয়। তাঁর অলৌকিকতার জন্যে, হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁকে পুজে। এই হলো ইতিবৃত্ত।

ইতিমধ্যে গাড়িও গন্তব্যে এসে পেঁছায়। মেলার অনেক আগেই গাড়ির পথ রুদ্ধ। মানুষের ভিড়ে সেখানে আর গাড়ির প্রবেশ অচল। থানা পেরিয়ে সড়ক ধরে খানিকটা সবাই সরে দাঁড়ায়। জনা পঞ্চাশের একটা মিছিল প্রায় দৌড়েই চলে যায়। হাতে হাত ধরে জড়াজড়ি করে, পতাকা আর রঙীন ডুলি কাঁধে করে তারা ছুটে যায়। তাদের ধ্বনির মধ্যে শুধু এইটুকু বুঝতে পারি, 'হজরত শাহ সৈয়দ পীর গোরাচাঁদ রাজী!'...কিংবা, 'আব্বাস আলী রাজী রহমতুল্লাহ!'...একটা রঙীন কাগজও তারা ছড়িয়ে দিয়ে যায়। ছাপানো কাগজ, ভিন্ন ভিন্ন পদ্য। পড়ে মনে হয়, পীর গোরাচাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনই তার উদ্দেশ্য। 'শিরিন সুরের আজান বহিয়া বহিছে বাতাস আজ ফজরে। ভক্তি উপহারে সাজিয়ে ডালি চল সে পীরের আরাধনে।' কিংবা, 'নুরের নবি ঘুমিয়ে আছে, হাড়োয়াতে দেখবি যদি আয়।'

আমি এগিয়ে যাই। বাঁধানো পাকা সড়ক ধরে যেতে যেতে এক সময়ে থামতে হয়। সামনে নদী, বিদ্যাধরী। ঘাটে নৌকার ভিড়। ওপারের খেয়া পারাপার চলেছে। বাঁয়ের রাস্তা চলে গিয়েছে অর্ধবৃত্তাকারে বাঁধের ওপর দিয়ে। পাশে পাশে ঘর। সেদিকেও ভিড়, তবে কম। ডান দিকে ঠাস বুনোট হাটের চালা। অনেক দিন পরে আবার কালীনগরের গঞ্জের কথা মনে পড়ে যায়। গাজী কোথায় আছে কে জানে।

হাটের দিকে চেয়ে মনে হয়, মেলার কলরবটা সেদিকেই বাজছে। কলের গানের যান্ত্রিক চিৎকার কেবল না। বাজীকরদের হাঁকডাকও যেন অস্পষ্টভাবে শোনা যায়। বিদ্যাধরী নদীর বুকে বেলা একটার রোদ ঝলকায়। পশ্চিম থেকে আসে নদী, দক্ষিণেতে যায়। সামনেই মাঝখানে এক চর। নাম-না-জানা এক ধরনের গাছে নিবিড় বনের মতো দেখায়। গাছগুলোর ডালে ডালে, অজস্র হলুদ ঠোঁট সাদা বকের ভিড়। সম্ভবত এ পাখিরা মানুষের শিকার না তাই মানুষের হাতের কাছে এমন নির্বিবাদে ভিড় করে আছে।

আমি হাটের মধ্যে ঢুকে পড়ি। দু' পাশে নানা দোকান। কালীনগরের থেকেও যেন এখানে দোকানপাট বেশী। হাটের দিন কী না জানি না। মেলার ভিড়েই ঠাসা-ঠাসি। জনস্রোতের চাপেই কোনো একদিকে চলতে থাকি। কোন্ দিকে নিয়ে যায় বুঝতে

পারি না।

খানিকক্ষণ চলার পরে এক জায়গায় এসে হাটের শেষ হয়। সামনেই দেখি এক মসজিদ। খোলা দরজা দিয়ে সামনে বাঁধানো চত্বর দেখা যায়। সেখানেও ভিড় কিন্তু কম। এক পাশে লেখা রয়েছে পীর গোরাচাঁদের সমাধি। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতেই আমার কানে এসে বাজে একতারার শব্দ, তার সঙ্গে, 'অহে, সাঁই আমার যখন খেলে, কী খেলা।'...

প্রায় বুক ধড়াসেই যায়। এমন চমক লাগে শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। কার গলা, কে গায়। সেই পাজী গাজীটা নাকি। কিছু না ভেবেচিন্তে আমি সমাধিক্ষেত্রের দরজা দিয়ে ঢুকে বাঁধানো চত্বর পেরিয়ে যাই। চত্বরের শেষে আর এক দরজা। তার বাইরে নানান ভিড়। দেখি এক মস্ত খোলা আঙিনা। গাছের ছায়ায় শীতল। শুকনো পাতার ছড়াছড়ি। তার মধ্যে এখানে সেখানে গুচ্ছে গুচ্ছে বসে সবাই গান গেয়ে গোরাচাঁদের ভজনা করে। এখানেও সেই ধূলি আলখাল্লা, ডারা ডুপ্‌কি খঞ্জনী একতারা।

একটা জায়গায় একটু বেশী ভিড়। সমাধির মূল দরজা সেখানে। সামনের এক মেলার যাত্রীকে জিজ্ঞেস করি, 'ওখানে কী হচ্ছে?'

'ওখানে সবাই পুজো-হাজোত দিচ্ছে। পীরের হাজোত দেয় না? তাই দিচ্ছে।'

হয়তো তা-ই। ব্যাপারটা সেইরকম দেখাচ্ছে। ডালি ভরে বাতাসা কিংবা আরো অন্যান্য মিষ্টি এনে দিচ্ছে। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা মৌলবীই হবে বোধ হয়, তার হাতে দিচ্ছে। সে ভিতরে নিয়ে একটু বাদে আবার ফিরিয়ে এনে দিচ্ছে। তাই মাথায় করে সব নিয়ে চলেছে। অনেকটা মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রসাদ করে নেওয়ার মতো। কিন্তু নিয়ে যেতে পারছে কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধের বিরাট দল ঝাঁপিয়ে পড়ছে, 'আমাকে দুখান দেন গো, দিয়ে যান বাবা।'...

এ সব পরে হবে, আগে গাজীকে দেখি। আমি গায়কদের দলের দিকে ফিরি। প্রতিটি মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ঘুরি। সে মুখ দেখতে পাই না। সেই কালো মুখের ভাঁজে ভাঁজে হাসি, পান খাওয়া লাল ছোপ দাঁত, গহীন দরিয়া চোখ, মাথার ঝাঁকড়া চুলে গেরুয়া ফালির ফেট্টি বাঁধা। কম্‌নে গেলে হে গাজী। তবে আজ সে একলা তো থাকবে না। সঙ্গে তার নয়নতারা পিকিতিও থাকবে।

চারপাশে পাঁচিল ঘেরা গোরাচাঁদের সমাধির আঙিনায় কোথাও তাকে চোখে পড়ে না। দক্ষিণের পাঁচিলের ওপারে আর জায়গা নেই, তারপরে বিদ্যাধরী নদী। সুদীর্ঘ বাঁকের কোলে স্রোতে বাঁকা ঝিলিক দেয়।

পশ্চিমের দেউড়ি দিয়ে বেরিয়ে দেখি অপর্যাপ্ত দোকান। সবই বাতাসা আর মিষ্টির দোকান। পুজো হাজোতের সিধের দোকান। হঠাৎ মনে হয় আমিও কিছু মিষ্টি কিনে হাজোত দিই। পীরের পুজো তাতে কতখানি হবে জানি না। গাজী আর নয়নতারাকে ডালি ধরে দিতে পারব। গাজীর নয়নতারার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সেটাই উপহার।

বাতাসা আর কিছু মিষ্টির একটা ডালি কিনি। তার মধ্যে দোকানিদের প্রতিযোগিতার হাঁকডাক, 'এখানে আসেন বাবু, কী চাইলেন বলেন না।' ডালি নিয়ে গিয়ে সকলের মতো সমাধিমন্দিরের দ্বারীর হাতে দিই। একটু বাদে আবার ফিরে পাই। হাতে নিয়ে বুঝতে পারি পুজোয় কিছু বাতাসা মিষ্টি লেগেছে। কিন্তু ডালি নিয়ে বেরোয় কার সাধ্য। চারদিক থেকে ছেঁকে ধরে। 'একখান দেন বাবু।...আমারে একটু মিষ্টি দেন। দেন দেন দেন।'...

মনে হয় অজস্র হাত আমার ডালি ঘিরে। আহ্, অভাগী একটা সোমত্ত মেয়ে

আমার ডালিটা ধরেই টান দেয়। আমি তাকে ধমক দিতেই সে দাঁত বের করে হাসে। কিন্তু সবাইকে দিতে গেলে গাজীদের জন্য কী থাকবে! আমি তো হরির লুট দিতে আসিনি।

এ সময়েই লাঠি হাতে এক গ্রামীন মানুষ খেঁকিয়ে ওঠে। লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে, 'এই, এই হাঘোরেরা, চক্ষির বিষ, যা সর্ বলতিছি। ঠ্যাঙায়ি শেষ করব।'

তাড়া খেয়ে অনেকেই সরে পড়ে। ধাক্কাধাক্কি করে আছাড় খায়। আমার সাধ্যানুযায়ী সবাইকে যা পারি দিয়ে ভিড় কাটিয়ে আসি। কাঁধের ঝোলার মধ্যে ডালি ঢুকিয়ে দিই। আবার পশ্চিমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাই। বাতাসা মিষ্টি সিধের দোকান পেরিয়ে নাকে পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ লাগে। দেখি, বড় বড় হাঁড়িতে মাংস রান্না হচ্ছে। অনেকেই খেতে বসেছে। এত বড় বড় মাংস আর রুটি-ভাতের ভোজনালয় কোনো মেলায় দেখিনি। হুগলির পান্ডুয়ার মেলায় কিছুটা দেখেছি বটে, এত নয়। দেখে মনে হয়, অধিকাংশ দোকানই মুসলমানরা খুলেছেন।

তারপরেই মিষ্টির দোকান। যেমন হতে হয় তেমনিই, খাজাগজা জিলিপি, রাজ-ভোগ, রসগোল্লা, লেডিকিনি। মুড়ি-মুড়কির দোকানও অনেক। তারপরে মনিহারি, তার সীমানাও কম না। এ সীমানা পেরিয়ে গেলেই বাজীকরদের তাঁবু। তাও কি একটা-আধটা। মৃত্যুকূপ থেকে শুরু করে অগ্নিকন্যা, কী নেই। হাড়োয়ায় এত বড় মেলা আশা করিনি। এত বড় মেলা দেখেছিও খুব কম।

বিদ্যাধরী নদীর বালি মাটির বিশাল বিস্তৃত চড়ায় তাঁবুর পরে তাঁবু। শুধু বাজীকরের ভোজবাজী না। হাতী বাঘের খেলাওয়ালা সার্কাসও এসেছে। সেখানে শূন্যের দোলনায় দোলাখেলার মেয়েরাও আছে।

আশেপাশে প্রচুর গরুর গাড়ি। তাতে যে শুধু গ্রামীণ নরনারীরা এসেছে তা না। কাজল মাখা চোখের কোলে কালি, পান রাঙানো ঠোঁট, চোখের ত্যারছা নজর আর সেই সঙ্গে বাঁকা সিঁথেয় একটু ঝ্যানো কেমন কেমন লাগতিছে। হারমোনিয়াম আর ডুগিতবলা পুরুষদের হাতে। কালীনগরের দুলীদের কথা মনে পড়ে যায়। কেঁদুলিতে পুবের দিকে বিন্দুরা দিকশূল দেবার কথাও মনে পড়ে। এসবও যেন মেলার একটা অঙ্গ।

কোথাও কোথাও পীর গোরাচাঁদের আখ্যায়িকা নিয়ে গানের আসর জমেছে। কোথাও ছোট ছোট ছেলেদের মেয়ে সাজিয়ে পায়ে ঘুঙুর দিয়ে নাচানো হচ্ছে। কোমর ঘুরিয়ে নাচতে নাচতে চোখে দেয় টিপ, ঘুরে ঘুরে গান করে, 'সজনী তর ভরা কলসী ছপছপায়ে পড়ে গো।'...

তা যেন হলো, নিমন্ত্রিত ঘুরে ফেরে, নিমন্ত্রণকর্তার দেখা নেই কেন। পারাপারের ঘাটের কাছে আসি। সবখানেই কিছু দরবেশ, ফকির বাবাজী বৈরাগীদের দেখা পাওয়া যায়। কেহ গায় বসে, কেহ ঘুরে ঘুরে। আমার গাজীটা কোথায়!

ঘাটে অনেক নৌকা। সেদিকেই এগিয়ে যাই। একটা নৌকা আমার দরকার। দু'-একজন মাঝি জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। একজন বুড়ো এসে জিজ্ঞেস করে, 'নৌকো চাই নাকি বাবু?'

'চাই।'

'যাবেন কমনে?'

'দক্ষিণে।'

'দক্ষিণে যাবেন? ফাগুন মাস, বাতাস উঠি গ্যাছে যে!'

'তাহলে কি যাওয়া যাবে না?'

'যেতি পারবেন, তয় ভালো মাঝি চাই। দাঁড়ান দিকি।'

BDBOI

বলে সে হাঁক দেয়, 'সত্য আছ নাকি, অ সত্য।'

মাঝারি একটা নৌকার ছইয়ের ভিতর থেকে একজন বেরিয়ে আসে। গেরুয়া রঙের লুঙ্গি না কাপড় তার পরনে বুঝতে পারি না। গলায় একখানি গামছা। বয়স বেশী না, একটু খাটোর ওপরে শরীরখানি যেন পাথরে খোদাই। যেমন শক্ত তেমনি বলিষ্ঠ। মাথায় উসকোখুসকো ঘাড় অবধি চুল। চোখ দুটি কেবল ডাগর না। বয়সের তুলনায় যেন অতিরিক্ত শান্ত, গভীর। এমন মাঝি কি সমুদ্রে যায়। কিন্তু গলার স্বর শুনে অবাক হয়ে যাই। গম্ভীর মোটা স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কী বল খুড়ো?'

'এই বাবু দক্ষিণে যেতে চায়, নিয়ে যেতি পারবা?'

সত্য মাঝি আমার দিকে চায়, বলে, 'পারব।'

'তবে কথা কয়ি নাও।'

সত্য আবার আমার দিকে চায়। শান্ত গভীর চোখে চেয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করে, 'যাবেন কমনে, জায়গার ঠিকানা আছে?'

বলি, 'না।'

'বনে যাবেন?'

'যাবো।'

'সাগরে?'

'যাবো।'

'চলেন। হিসাব করি যা হয় দিবেন। তবে কিছু চাল-ডাল তরিতরকারি এখান থেকিই কিনে নিতি হবে। দুইজন মাঝি আর আপনি। তিনজনের খাবার। মিঠে জল জালায় করে নেবো।'

এমনই একটা শান্ত উদাস গাম্ভীর্য সত্য মাঝির, তাকে কোনোরকমেই অবিশ্বাসী বা তস্কর ভাবতে পারি না। তার হাতে কিছু টাকা তুলে দিই। দিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'যাত্রা কখন?'

মাঝি বলে, 'জোয়ার আরো ঘণ্টা তিন আছে। ভাঁটায় যাবো।'

বলি, 'তাহলে আমি আর একটু ঘুরে আসি।'

'আসেন গিয়া। নৌকো এখানেই থাকব।'

তবু জিজ্ঞেস করি, 'তোমার পুরো নাম কী।'

'সত্য বাউল।'

বাউল! বাউল কি পদবীও হয় নাকি। জিজ্ঞেস করি, 'বাউল পদবী নাকি?'

'আজ্ঞা। এ দেশে, গুনীনকে বাউল কয়। আমাদের বাউলের বংশ।'

এ সেই বাউল না, গুনীন বাউল। তথাপি সত্য মাঝিকে যেন কেমন একরকম বাউল বলেই মনে হয়। তার এই গম্ভীর শান্ত নৈর্ব্যক্তিকতা আমার ভালো লাগে। তার গলায় তুলসীর মালা দেখে মনে হয়, সে ধর্মে বৈষ্ণব।

কিন্তু আমার আর দেরি সয় না। আবার মেলার দিকে ফিরে যাই। গাজী কি কোনো কারণে এবার আসতে পারেনি। নাকি, আমিই এত লোকের ভিড়ে খুঁজে পাই না। এই বিশাল ভিড়ের মধ্যে একজনকে খুঁজে বের করাও কঠিন।

মেলা পেরিয়ে হাটের ভিড় ভেঙে বড় সড়কের দিকে যাই। সড়কের পুবদিকেও ছোটখাটো মেলার আসর আছে। সেখানে একবার খুঁজে দেখি। কিন্তু হাট পেরিয়ে বড় সড়কে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াই। মুখোমুখি সামনাসামনি যার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, সেটা একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয়।

আমি কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই উদ্গত চোখের জলে রুদ্ধ স্বরে ঝিনি বলে ওঠে, 'খুম ভাঙিয়ে ডাক দিয়ে এলেও তোমাকে আটকে রাখতাম না।'

বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠবার আগেই অপরাধভঞ্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। বলি, 'সেজন্য নয়, ভাবলাম শেষরাত্রের ঘুম। তুমি একলা নাকি?'

ঝিনির চোখ ঝাপসা। কথা বলতে পারছে না। ওকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই ফাল্গুনের চড়া রোদে পুড়েছে। হাড়োয়ার হাটের যত ধুলো ওর সারা শরীরে, মুখের ঘামে, রুক্ষ চুলে। রেশমী কাপড়ের ছটা নেই। এই প্রথম ওকে আমি কাপাসী রঙ-হীন সাদা কাপড়ে দেখলাম। জামাটাও তা-ই। কাপড়ের পাড়ে পর্যন্ত কোনো ঔজ্জ্বল্য নেই। হাল্‌কা বাসন্তী রঙের পাড়। হাতের গোল, কাপড়ের ব্যাগটাই যা একটু নাগরিকতা রক্ষা করেছে। হাতে গলায় অলঙ্কার না থাক, হাতের ঘড়িটারও কি দরকার নেই।

ঝিনি কয়েক মুহূর্ত পরে নদীর দিকে ফিরে চোখ মোছে। আমি আবার জিজ্ঞেস করি, 'তুমি কি একলা এসেছ?'

মুখ না ফিরিয়েই বলে, 'সব সময় দোকলা পাবো কোথায় বলো।'

ওর গলা এখনো ভেজা শোনাচ্ছে। জিজ্ঞেস করি, 'কখন এলে?'

'সকালের দিকে।'

আমার দিকে ফিরে বলে, 'খুব বিরক্ত হলে তো।'

'না, খুব অবাক হয়েছি তোমাকে এখানে দেখে।'

ও আমার চোখের দিকে এক পলক চেয়ে থাকে। তারপরে বলে, 'তুমি আসবে বলেছিলে—গাজীর নিমন্ত্রণে। তাকে আমারও একটু দেখতে ইচ্ছে করল, তাই চলে এসেছি।'

বলতে পারি না, তা বলে এমনিভাবে। ঝিনি কি নিজেকে এমনি করে ভুলে যায়। তার কি স্থান কাল পাত্র ভুলে এমনি করে হঠাৎ ছুটে আসা চলে।

ঝিনি জিজ্ঞেস করে, 'কী হলো?'

বলি, 'তোমাকে দেখছি।'

ও যেন হঠাৎ একটু লজ্জা পায়। মুখ নামিয়ে বলে, 'না এসে থাকতে পারলাম না। দেড় মাস তো হয়ে গেল। তারপরে আবার কবে দেখা হবে কে জানে।'

এ বিষয়ে আমার কিছু বলবার নেই। জীবনের সবটাই আকস্মিকতায় ভরা, তা যেমন মানি না ; তেমনি জীবনের অনেক কিছুই অজানা বলে জানি। বলি, 'কিন্তু যার নিমন্ত্রণে আসা, তার দেখা এখনো পাইনি।'

ঝিনি বলে, 'তাকে আমিও এখনো পাইনি। ভাবলাম, তোমাকে দেখতে পেলে তাকেও দেখতে পাবো।'

আমি বলি, 'তবে চলো, তাকেই দেখি।'

বলে, পুব দিকে পা বাড়াতে যেতেই ঝিনি বলে, 'ওদিকে সে নেই, এটুকু বলতে পারি। আমি সব দেখেছি।'

আমার মনে নিরাশার ভার নামে। বলি, 'তবে?'

ঝিনি জিজ্ঞেস করে, 'তাকে খুব ভালোবাস, না?'

চেয়ে দেখি ঝিনির চোখে গভীর কৌতূহল আর অনুসন্ধিৎসা। বলি, 'তা জানি না। ভালোবাসার ধার সে ধারে কি না কে জানে। তবে সে আমাকে আসতে বলেছিল, সে কথা আমার মনে আছে।'

ঝিনি কী বলতে গিয়েও মুখ নামিয়ে নেয়। তারপরে যেন অন্যমনস্ক সুরে বলে, 'এ-ই বোধ হয় তুমি।'

কেন এ কথা ও বলে, জানি না। তারপরে হঠাৎ যেন ব্যস্ত হয়ে বলে, 'চলো, তাকেই খুঁজে বের করি। তাকে না দেখে আমিও যাবো না। সে নিশ্চয়ই সমাধির কাছে বা মেলার ওদিকে কোথাও আছে।'

সে-ই ভালো। আমারও সময় বেশী নেই। জোয়ারের কাল ফুরালেই আমার যাত্রা। হাটের ভিড়ে ঝিনি আমার সামনে চলে। আবার সেই সমাধির আঙিনায়। ঝিনি বলে, 'এখানেও তোমাকে খুঁজে গিয়েছি।'

'আমিও খুঁজেছি।'

আবার সকলের কাছে গিয়ে গিয়ে দেখি। সে মুখ দেখতে পাই না। একজন বুড়ো দরবেশ জিজ্ঞেস করে, 'কারুরে খোঁজেন নাকি বাবু?'

'হ্যাঁ।'

'কারে?'

'মাহমুদ নামে এক গাজীকে।'

বুড়ো যেন স্মরণ করতে চেষ্টা করে, আপন মনে উচ্চারণ করে, 'মামুদ গাজী! কমনেকার লোক কন তো?'

বলি, 'বসিরহাটের।'

তার আগেই সে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, দীঘির পাড়ে ছিল মামুদগাজী। গলাখানি বড় সোন্দর ছিল। জয় মুরশেদ।'

জিজ্ঞেস করি, 'সে কি আসেনি?'

বুড়ো দাড়ির খাঁজে উদাস হেসে বলে, 'আসবে কমনে বাবু, নালিশ রুজু, মোক্তারনামা সব তো তার খতম হয়ি গেছে, সে খালাস নিয়েছে।'

এ কথার অর্থ কী। বুকটা ধড়াস করে ওঠে। জিজ্ঞেস করি, 'তার মানে!'

বুড়ো বলে, 'সে তো আর নাই বাবু। এই মাঘ মাসের মাঝামাঝি সে তো ডানসায় ডুবি মরেছে।'

'ডানসায়?'

'ডানসা গাঙে নৌকা থেকে জলে পড়ি গিছল আর ওঠে নাই।'

মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের সামনে সব যেন অন্ধকার বোধ হয়। ডানসা গাঙে ডুবে গাজী মারা গিয়েছে। কেন, মুরশেদের নামের মজুরিতে বেরিয়েছিল নাকি। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আমি চুপ করে থাকি। কিন্তু আমার ভিতরে শুনতে পাই, 'পাজী পাজী, সত্যি গাজীটা যে এত বড় পাজী, তা কোনো দিন বুঝতে পারিনি। নিমন্ত্রণ জানিয়ে সে পালিয়ে যায়।'...আমি যেন তার সেই পাজী মুখটা দেখতে পাই। কালো মুখের ভাঁজে ভাঁজে পাজীর হাসি। গহীন দরিয়া চোখে পাজীর ঝিলিক।

বুড়ো ফকির জিজ্ঞেস করে, 'তাকে কোনো দরকার ছিল বাবু?'

ঘাড় নাড়ি। না, এই বিশাল পৃথিবীতে মানুষের সহস্র দরকারের কোনো কিছুই ছিল না গাজীর কাছে। বরং এক সুবিশাল অদরকারেই তাকে খুঁজেছি। যে অদরকারের কথা সংসারে কাউকে বলা যায় না। যে অদরকার, সংসারে নিতান্তই অদরকার।

বুড়ো দরবেশ বলে, 'অই যে দ্যাখেন মেয়েছেলেটি বসি রয়েছে, হাঁ, অই গাছতলার কাছে, ও মামুদের বিবি।'

নয়নতারা! গাজীর পিকিতি! ঝিনির সঙ্গে চকিতে একবার আমার চোখাচোখি হয়। জলে ভেজা চোখেই ওর আলো দেখা দেয়। কাছে যাবার আগে আমি আর একবার দেখি। আশ্চর্য, পুজো দিয়ে ফেরবার সময় এই মেয়েলোকটি আমার কাছে একবার হাত পেতেছিল। এই কি সেই নয়নতারা। যার জন্য ডালি নিয়ে ফিরি। সামান্য একটা ময়লা শাড়ি তার পরনে। মাথায় ঘোমটার পাশ দিয়ে তেলহীন রুক্ষ চুলের জটা বেরিয়ে আছে। দৃষ্টি যে তার কোন্‌দিকে বুঝতে পারি না। চুপচাপ বসে আছে। যৌবন তার গত না, কিন্তু জীবনযাপন শুষে নিয়েছে। শোকে শীর্ণ। পুরনোদিনের কিছু কিছু চিহ্ন যেন এখনো চোখের টানায়, বাহুর গঠনে রয়ে গিয়েছে।

গাজীহীন নয়নতারা কেন এসেছে পীর গোরাচাঁদের মেলায়। গাজীর জন্যেই নাকি। এই তো সে-ই স্থান, যেখানে তারা পুরুষ-প্রকৃতির প্রথম লীলায় নিজেদের দেখা পেয়েছিল।

আমি আর ঝিনি তার কাছে এগিয়ে যাই। সে খানিকটা অবাক কৌতূহলে আমাদের দিকে চোখ তোলে। জিজ্ঞেস করি, 'তোমার নাম কি নয়নতারা?'

সে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করে না। তাকিয়েই থাকে। আমার গলায় যেন কথা আসতে চায় না। জোর করে বলি, 'গাজীর সঙ্গে চেনাশোনা ছিল।'

সে একটু শব্দ করে, 'অ।'

তাড়াতাড়ি ঝোলা থেকে ডালি বের করি। আর সেই কয়েক প্যাকেট সিগারেট। ছিরগেট, যার বাস বড় মিঠে। বলি, 'এগুলো তার জন্যেই রেখেছিলাম, তুমি রাখো।'

সে হাত পেতে নেয়, বলে, 'অ।'

কিন্তু চোখে তার জল আসে। অথচ সে যে কিছু বুঝতে পারে তা মনে হয় না। কেমন একটা মূঢ় ভাবলেশহীন মুখ। এমন নয়নতারার কথা একবারও ভাবিনি।

আবার জিজ্ঞেস করি, 'ছাওয়াল-পাওয়ালরা কোথায়?'

আবার যেন একটু অবাক হয় নয়নতারা। বলে, 'রেখে এসেছি। এবারে যাবো। একবার না এসে পারলাম না, তাই। বাবু।'

নয়নতারা আমাকে ডাকে। গাজীর সেই চোখে ঝিলিক হানা, বৈষ্ণবী গায়িকা প্রকৃতি। ফিরে তাকাই, সে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কে?'

বলি, তুমি চিনবে না।'

'অ। কিন্তু ছিরগেটগুলন নিয়ে কী করব বাবু, সে তো নাই।'

বলতে বলতেই তার চোখ বুজে যায়। নিচু স্বরে কোনোরকমে বলি, 'তার নামে রেখে দিও।'

বলে, আর দাঁড়াই না। সেখান থেকে চলে যাই। ঝিনির স্পর্শ অনুভব করি। ও আমার গায়ে গায়ে চলে। মেলা খেলা সকল কিছু পেরিয়ে, ঘাটের কাছে যাই। ঘাটে নেমে যাবার আগে জামায় টান লাগে। ঝিনি জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাচ্ছ!'

বলি, 'নৌকায়।'

'কেন!'

'দক্ষিণে যাবো।'

ঝিনি যেন চমকে ওঠে। গলায় শব্দ হয়, 'ওহ্!'

আমি ঝিনির দিকে ফিরি। ঝিনি অসহায় করুণ চোখে তাকায়। আবার জিজ্ঞেস করে, 'আবার কবে কোথায় দেখা হবে?'

একটু চুপ করে থেকে বলি, 'বলতে পারছি না যে।'

'কেন?'

'জানি না যে!'

ঝিনির ঠোঁটের ফাঁকে অস্পষ্ট শব্দ বাজে, 'বিষ।'

সত্য মাঝি গম্ভীর গলায় ডাক দেয়, 'বাবু আসেন, ভাঁটা পড়েছে।'

ঝিনির দিকে তাকাই। ঝিনি আমার বুকের দিকে চোখ রেখে বলে, 'যদি না জানো, তবে কেমন করে বলবে। তবে আর কোথায় দেখা হবে। তবু দেখ—।'

ওর গলা বন্ধ হয়ে আসে। বলি, 'বল ঝিনি।'

ও ভাঙা ভাঙা নিচু গলায় বলে, 'বলি, বলি, বলবই তো। তবু দেখ নিতান্ত মেয়ে তো আমি। তাই একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে।'

'বলো।'

'মনে থাকবে, আমাকে?'

'থাকবে।'

যেন সাপের ছোবলে ঝিনি আর্তনাদ করে ওঠে, 'উঃ, কী ভীষণ বিষ। মনে হয় অমৃতের মতো গলায় ঢেলে দিই, দিয়ে জুড়িয়ে যাই। তবে, একটা কথা।'

আবার ও থামে।

বলি, 'বলো।'

'মনে থাকুক না থাকুক, আমি বলি, একটু মনে রেখো।'

আমার বুকের কাছে জামাটা একবার ধরে আবার ছেড়ে দেয়। আমি নেমে যাই ঘাটের দিকে। যাবার আগে আবার বলি, 'যাই।'

ও বলে, 'আমি আর একবার নয়নতারার কাছে যাই।'

ওর এই শেষ কথাটা যেন, সহসা কেমন এক তীব্র ভয়ংকর সুরে বেজে ওঠে। যেন মনে হয়, নয়নতারা আর ঝিনি, একাকার হয়ে গিয়েছে। তারা যেন দুজনে এক।

ও পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সত্য বাউল নোঙর তুলে নৌকা ঠেলে দেয় জলে। তারপরে হাত দিয়ে, বিদ্যাধরীর জলের গণ্ডূষ নিয়ে আমার মুখে মাথায় ছিটিয়ে দেয়। নিজের মনেই গম্ভীর স্বরে বলে, 'জয় গুরু, যাত্রা করি।'

বিদ্যাধরীর জল আমার মাথা থেকে মুখে এসে পড়ে। ঠোঁট চুইয়ে জিভে স্বাদ পাই, জল লবণাক্ত। কিন্তু আমার চোখ ঝাপসা। ঝিনিকে আর দেখতে পাই না। হাড়োয়ার ভূমি, পীর গোরাচাঁদের মেলা, কিছুই চোখে পড়ে না। কেবল মনে হয়, গাজীর গুনগুনানি শুনি যেন,

'ক্ষ্যাপা, তুই না জেনে তোর আপন খবর
যাবি কোথায়।'...

সত্য মাঝির নৌকা নামে বিদ্যাধরীর স্রোত বেয়ে।

boiRboi.net

boiRboi.net

মন মেরামতের আশায়

এ যাত্রাটা একটু ভিন্ন রকমের। কাজে আছি, তবু যেন কাজে নেই। মন বসে না। মন উড়ু উড়ু করে। মন গুণে ধন, কে বোঝাবে সে কথাটা। এমন না যে, মন বলছে, অনেক তো হলো, এবার পাততাড়ি গুটাও। ডানায় কাঁপন লেগেছে। চলো যাই ভ্রমণে।

উঁহু। মোটেও তা না। কাজে আছি, তবু কাজে নেই। কাজের মনটা কেমন অগোছালো। গালে হাত দিয়ে, দু'দণ্ড স্থির হয়ে বসলে, এ মন গুছিয়ে নেওয়া যেতে পারে। অথবা যাও মাঠের ঝোপঝাড়ের হাতায়। ঘুরে এলেই মন পাবে কাজের হদিস। শরীর যেমন ঢিস ঢিস করে, মনের অবস্থা তেমনি। মন ঢিস ঢিস করছে।

সময়টাও যে তেমনি। শরতের দীর্ঘবেলা দিনগুলো গত হয়ে গিয়েছে। হেমন্তের পাতা ঝরা শুরু হয়ে গিয়েছে কবেই। শহরে বসেও তা দেখতে পাচ্ছি। ফুটপাতের বিরল গাছটা ন্যাড়া হয়ে যাচ্ছে। শানের উপর দিয়ে শুকনো পাতা উড়ে গিয়ে, গাড়ির চাকার তলায় গুঁড়িয়ে চূর্ণ চূর্ণ। এমন কি, ঘ্রাণে যেন পাকা ধানের গন্ধও পাচ্ছি। ওদিকে ধান কাটা সারা। নবান্নের পার্বণ শেষ। উত্তরের বাতাসে মাঠে ধুলো। পায়রা চড়ুইয়েরা ঝাঁক বেঁধে উড়ছে।

কাজ করা যায়? কাজের একটা মন চাই। সব জানে, কাজের দায়িত্ব এড়ানো যায় না। তবু ওর এ কি অবাধ্যতা! সে কাজে থেকেও, অকাজের হাতছানি দেখছে। অকাজের ক্ষমতা কম না। তাকে প্রেম দিয়ে বশ করতে হয়। কাজের বৈঠা ধরতে হয় শক্ত হাতে। তবে মন বাধ্য থাকে।

তাহলে অকাজকেই আগে বশ করা যাক। তখন কাজের মনও বাধ্য হবে। বশ মানবে। অন্যমনস্কতা দূরে যাবে। চলো তবে, ঘরের বাইরে একটু পাক দিয়ে আসা যাক। খানিক চড়ুই ওড়া, পায়রার পাখা ঝাপটার তালে, কিঞ্চিৎ মাঠের ধুলো উড়িয়ে আসা যাক। নীল আকাশের ঝলক লাগিয়ে আসি। এ তো বৈরাগ্য না, মনের ধন্দ ঘুচিয়ে আসা। তীর্থক্ষেত্রের দেব দেউলের দর্শন না, ইতিহাসের ভাঙা গড়া ধুলো পড়া পথে পথে ফেরাও না। খেতে বসে, ভিন্ ব্যঞ্জনে একটু মুখ ফিরিয়ে নেওয়া।

কোথাকার টিকেট কাটা যায়? মেমারি না রসুলপুর? বর্ধমান পর্যন্তও যাবার দরকার নেই। নেমে পড়ে হাঁটা ধরলেই হলো। বিজলি গাড়ি দানাদ্দান পৌঁছে দেবে। এঞ্জিন একবার জাম্ ছাড়িয়ে দৌড়লেই হলো।

তবে তাই। ছোট একখানি ঝোলা কাঁধে নিয়ে, টিকেট কেটে দৌড়। গাড়ি তো নয়, হাটের মেলা। মাঠের মানুষ, কলের মানুষ, শহরের মানুষ, সব রকমের ভিড়। জায়গা না পেলেও কিছু যায় আসে না। কুল্যে এককুড়ি ইস্টিশান হবে কী না সন্দেহ। আর এ এমন গাড়ি, দেখ একটা কুকুর পর্যন্ত উঠে পড়েছে। কী বলবে বলো। সকলে দূর দূর করে, ও জিভ বের করে সন্ত্রস্ত চোখে সকলের দিকে তাকায়। আমি অবাক হয়ে ভাবি, সারমেয় মহাশয়েরও রেলগাড়িতে যাতায়াতের অভ্যাস আছে নাকি? ইস্টিশান

চেনা আছে তো?

মনে তো হলো সেই রকমই। পরের ইস্টিশানে এসে গাড়ি দাঁড়াতে না দাঁড়াতে লাফ দিয়ে প্ল্যাটফরমে নেমে পড়ল। মুখ তুলে একবার বাতাসে গন্ধ শুঁকল, তারপরে এক দিকে দৌড়। কেউ হেসে বলল, 'হেই শালা।' কেউ বলল, 'রোজকার ব্যাপার। শালার মাসকাবারি টিকেট আছে।'

তা যেন হলো, একজন এতগুলো পায়রার পায়ে সুতো বেঁধে হাতে জড়িয়ে নিয়ে চলেছে কেমন করে? আর ওই বাচ্চা মেয়েটি, যার কোলে কচি শিশু ছাগটি?

এ সব জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। পাশের লোকটা মুখের জ্বলন্ত সিগারেটটা দেখিয়ে বলল, 'একটু দেন তো, ধরিয়ে নিই।' দুই দাঁতের পাটিতে তার বিড়ি কামড়ানো। তারপর আলু চাষের খবর, রবি খন্দের আলোচনা, ঠাণ্ডা গুদাম ঘরের মালিকের বায়না, তারপরে, 'শালা, অমন খণ্ডার মাগ্ আমার হলে, চ্যালা কাঠ দিয়ে পিটিয়ে মারতাম।'

বাপ রে, কী বীরপুরুষ! তারও জবাব আছে, 'হ্যাঁ, ওসব পরের মাগের বেলায় খুব বলা যায়, নিজের মাগের কাছে সবাই ম্যা ম্যা।'

কান তখন চলে গিয়েছে অন্যদিকে, 'সে কি আর বলি নি ভেবেছেন। বি, ডি, ও, সাহেবকে অনেক ধরাধরি করেছি, দরখাস্তও দিয়েছি, বদলির অর্ডার আর আসে না। ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে দু'দণ্ড পড়াতে বসতে সময় পাই না।'

'আর আমার দেখুন, রোজ বর্ধমান আর চন্দননগর।'

আর একজনের স্বর, 'স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড হয়ে এই লাভ হয়েছে। এখন সরকারি চাকরি, যেখানে যেতে বলবে, সেখানেই যেতে হবে।'

সমস্যার কি অন্ত আছে? একবার কান পাতলে শোনা যায়। আর অন্ত নেই, রেল ফেরিওয়ালার। ওষুধ খাবার সেফটিপিন জামা কাপড়, যত ফর্দ তত বক্তিমে। বক্তিমে করতে কি আর প্রাণ চায়? গলার সঙ্গে যে বুক শুকিয়ে কাঠ। কিন্তু উপায় কী, পেট যে মানে না। তবু তার মধ্যেই তো শুনছি, 'হম তুম দুনো এক কামরে মে বন্ধ হ্যায়।'...'সেই যাত্রার দলটা যেন কবে আসছে?'

শুনতে শুনতেই এক সময় আমার ইস্টিশান এসে গেল। নেমে পড়লাম। দেশের পরিবর্তন অনেক হয়েছে। চোখ তাকালে বোঝা যায়। মন দিয়ে অনুভব করা যায় না। টিকেট বাবুর হাতটা বাড়ানোই আছে। কে টিকেট দিল না দিল, কোনো খেয়াল নেই। একজনকে বলতে ব্যস্ত, 'গোলককে বলে দিয়েছি, এ রকম লোকসান দিয়ে, ওকে আর আমার ছানা বেচতে দেবো না।'

টিকেট বাবুর ছানা! কে বুঝবে এই রহস্য। ইস্টিশান থেকে বেরিয়ে বাজারের মহল্লা পেরিয়ে, জি. টি. রোড। হুস হুস করে চলে যাচ্ছে ভারি মাল বোঝাই লরি। তার পাশ দিয়ে গরুর গাড়ি, তিন চাকার সাইকেল রিকশা। গাছতলায় গরু বাঁধা। চড়ুই শালিক ফিঙে, যে যার মতো উড়ছে বসছে ডাকছে।

মাঠের পথ দিয়ে হাঁটা দিলাম। ধান কাটা সারা, ধু ধু মাঠের হেথা হোথা আলুর নিড়েন দেওয়া, ভাঁজ ভাঙা জমি। সবুজ এখনো সব জায়গায় তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। ছোলা মটর কোথাও কোথাও হালকা সবুজের আভায় ছড়ানো। আমার গন্তব্য দু' ক্রোশের পথ।

মাঠের পথ দিয়ে গেলে, হাঁটা কিছু কম হয়। মাটি মেলা চওড়া রাস্তাটা বাঁদিকে দূরে দেখা যায়। আমার চেনা রাস্তা। গরুর গাড়ি চলে বলে, দু'পাশে খানার মতো গর্ত, মাঝখানটা উঁচু ঢিপি হয়ে গিয়েছে। মাঝখানটা শক্ত, ঘাসের চিহ্নও সেখানেই। প্রথম বারে এসেছিলাম, ইস্টিশান থেকে একটা মোটর গাড়ি নিয়ে। গাড়িটা হাওয়ার গাড়ির যুগের। নারকেল দড়ি দিয়ে শরীরের নানান্ জায়গায় বাঁধা।

লাট্‌টু গিয়ারে টান দিলে বুড়ো ইঞ্জিনের সে কী শব্দ! আসন শুদ্ধ উঁচু হয়ে ওঠে, আবার ধপাস করে নামে। ওই মাটির সড়ক দিয়ে যখন চলছিল, তখন বাঁদিকের সারেক দুই চাকা বরাবর খানার গর্তে, ডানদিকের দুই চাকা উঁচুতে। যতক্ষণ ছিলাম, বাঁদিকে ঢলে ছিলাম, আমার ওপরে আরো কয়েকজন। আর ধুলো কাকে বলে! তবে বেশীক্ষণ থাকতে হয়নি। খুব দূরের পথ না। মোটর গাড়িতে যেতে হলে, মেমারিতে নামতে হতো।

সেই ধকলের মধ্যে আমি আর নেই। একা মানুষ, এই বেশ ভালো। সেবারে অবিশ্যি উপায় ছিল না। নতুন মেয়ে জামাইকে নিয়ে, মেয়ের বাপের বাড়ি যাওয়া। জামাইয়ের প্রথম আগমন। পায়ে হেঁটে যাওয়ার কোনো কথাই ছিল না। গরুর গাড়িতে যাওয়া যেতো। তার দরকার কী? মেয়ের বাবা বলেছিলেন, 'আমাদের গাঁয়ে মোটর গাড়ি যায়, ইস্টিশানে মোটর পাওয়া যায়।' তবে? এর পরে তো কথা নেই।

কিন্তু রাস্তায় আমাকে উঠতেই হবে, সাঁকোর কাছে গিয়ে। বাঁধানো শানের সাঁকো। আজকাল নাকি মোটর লরিও গ্রামে যায়। গ্রামে ঢোকবার মুখে একটা হেল্‌থ্‌ সেণ্টার আছে। তা লরি যাবার মতোই চওড়া রাস্তা বটে, সাঁকোও তেমনি চওড়া। গ্রামের লোকের মুখেই শুনেছি, 'রাস্তা হয়ে লাভ কী হয়েছে? দরকার হলে, একটা কাঁচকলা পাওয়া যায় না, এক ফোঁটা দুধ নেই। শাকসবজি তো দূরের কথা। আগে তবু রয়ে সয়ে যেতো, এখন হুস্‌ করে সব চলে যায়।'

যাক গিয়ে ওসব আন্‌ ভাবনা। সবই ভালো লাগছে। ধান কাটা মাঠের ওপর দিয়ে গরুর গাড়ির চাকার দাগে দাগে চলেছি ধুলো উড়িয়ে। সাঁকোটা ঠেকে আছে উঁচুতে আকাশের গায়ে। লোকজন বিশেষ চোখে পড়ে না, তেমন ব্যস্ততার সময়ও এখন না। সড়কের ওপর দিয়ে দু-একটা গরুর গাড়ি চলেছে। কিন্তু উত্তর দিক থেকে সব সময় মাইকে কী সব গান ভেসে আসছে। টকির গান সন্দেহ নেই। গানের মাঝে মাঝে আবার কী সব বক্তিমে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

এখনকার গ্রাম এ রকমই হয়েছে। যে কোনো উৎসবেই মাইক। ঘরে ঘরে সকাল সন্ধ্যেয় ট্রানজিস্টর বাজে। কেবল ঘরে বা কেন? মাঠেও। প্রাচীন মন্দিরের গায়ে সিনেমা পোস্টার দেখেছি। দু-তিন ক্রোশের মধ্যেই স্থায়ী অস্থায়ী সিনেমা হল। সকাল সকাল রান্নাবান্না সেরে, গরুর গাড়িতে মেয়ে বউয়ের দল চলে যায়। ছেলেরা আগে ভাগেই গিয়ে টিকিট রাখে। ঘরের বেড়ায় রামকৃষ্ণ সারদার ছবির কাছে সিনেমার নায়ক নায়িকার ছবি।

অনেক কিছুরই চেহারা বদলিয়ে গিয়েছে। কিন্তু দরকার পড়লে একটা কাঁচকলা পাওয়া যায় না। সত্যনারায়ণের সিন্নি দিতে হলে, দশদিন আগে থেকে দুধের ব্যবস্থা করে রাখতে হয়। ডিম মাছ মাংসের কথা জিজ্ঞেস করো না। সব কিছুর সঙ্গে এগুলোরও পা বেড়েছে। গ্রামে আর তারা নেই।

সাঁকোটার ওপরে উঠতে যাব। আশে পাশে কয়েকটা বাবলা গাছ। এক পাশে এক বট। হঠাৎ কানে এলো, 'জামাই যে?'

অবাক চোখে তাকিয়ে দেখি, সাঁকোর নীচে কেদারদাদু বসে আছেন। সঙ্গে আরো কয়েকজন। আমি যে-গ্রামে যাচ্ছি, কেদারদাদু সেই গ্রামেরই সম্পন্ন ব্রাহ্মণ গৃহস্থ। জোতদার যাকে বলে। আমি হেসে বললাম, 'জামাই নই, জামাইয়ের বন্ধু।'

'অই হল, কী বলিস্‌ রে?' বলে আশেপাশের লোক কটিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন। বাকীরা যারা বসে ছিল, সকলেরই আদুর গা। বেলা হলেও, ঠান্ডা একেবারে নেই, এমন না। পরনে তাদের নেংটি, গলায় বা কোমরে জড়ানো গামছা। গায়ে খড়ি ওঠা দাগ। সকলেই একসঙ্গে কেদারদাদুর কথায় সায় দিয়ে আওয়াজ করল, 'হাঁ হাঁ।'

বিষয়টি বোঝবার নজর করে দেখবার মতো। অন্যথায় কেদারদাদু এমন লোকাস

কথা বলবেন কেন? আর এই সব কৃষাণ মজুরদের সঙ্গে, সাঁকোর নীচে, হাঁটুর ওপরে কাপড় তুলে, তিনিই বা খালি গায়ে বসে কেন? দেখতে পাচ্ছি তাঁর ফতুয়া চাদর এক পাশে জড়ো করা। আর এক পাশে গোটা দুই শূন্য বোতল, একটি কাঁচের গেলাস, বাকী কয়টি মাটির ভাঁড় দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু কেদারদাদুকে আগের বার এ রকম কোনো অবস্থায় দেখি নি। দশাশয়ী চেহারায়, গোঁফওয়ালা রাশভারি লোক তিনি। গ্রামে তাঁর মস্ত বড় কোঠা বাড়ি, পাশে আমার বাড়ি। ষাটের ওপর বয়স। তৃতীয়বার দার পরিগ্রহণ করেছেন, আগের দুই স্ত্রী গত হয়েছেন। তাঁকে সকলেই মান্যি গণ্যি করে। তাঁর একটাই অভিযোগ, 'গভরমেণ্টের আস্কারা পেয়ে ছোটলোক-গুলো মাথায় উঠে বসেছে।'

অতএব, এ দৃশ্য অতি চমৎকার! কেদারদাদু ধান্যেশ্বরীর সেবা করছেন তাঁরই কৃষাণ মজুরদের সঙ্গে। এমন সাম্য আর কোথায় দেখা যায়? জামাইয়ের বন্ধুরই বা জামাই হতে বাধা কোথায়?

আমি কথা না বাড়িয়ে, উঁচু দিকে পা বাড়ালাম। কেদারদাদু স্বর চড়িয়ে বললেন, 'ওহে অ জামাই, চলে যাচ্ছ যে? হরেনের মুখে শুনি নি তো, তুমি আসবে?'

হরেন আমার বন্ধুর শ্বশুর। বললাম, 'কোনো খবর না দিয়েই চলে এসেছি। ওবেলাই ফিরে যাব।'

'কেন কেন?' কেদারদাদু টলে উঠলেন, বা কিঞ্চিৎ ফিরে বসলেন, 'কোনো খারাপ খবর-টবর নেই তো?'

অন্যায় কিছু বলেন নি। না বলে কয়ে আসা, আবার ওবেলাতেই ফিরে যাওয়া ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক না। বিশেষ কোনো জরুরি ব্যাপার হলেই এমনটা ঘটে। কিন্তু ওঁকে তো আর বলতে পারি না, আমার অকাজের ধান্দাকে একটু সেরে নিতে এসেছি। হেসে বললাম, 'আঁজ্ঞে না, খবর সব ভালো। সবাই ভালো আছে। আমি হঠাৎ একটু বেরিয়ে পড়েছি। ইচ্ছে হলো, আপনাদের সবাইকে একটু দেখে যাই, খবর নিয়ে যাই।'

'বুঝেছি হে বুঝেছি।' কেদারদাদু হাত তুলে বললেন, 'তার মানে, আমাদের পুষি বাপের বাড়ির খবরের জন্যে ব্যস্ত হয়েছে, তাই তোমাকে পাঠিয়েছে। বুঝলি তো?' বলে তিনি তাঁর পান সঙ্গীদের দিকে তাকালেন।

সঙ্গীরা মাথা দুলিয়ে গা ঝাঁকিয়ে একসঙ্গে আওয়াজ করল, 'অঁয় অঁয়।'

পুষি মানে পুষ্প, গাঁয়ের যে মেয়েটির সঙ্গে আমার বন্ধুর বিয়ে হয়েছে। কেদারদাদুর সঙ্গে কোনো আত্মসুয়তা নেই। পড়শী বটে। বন্ধুর শ্বশুরমশাই হরেন ঘোষাল মানুষটি বড় ভালো। মধ্যবিত্ত ভূমিনির্ভর গৃহস্থ। মোটা ভাত কাপড়ে সোমবৎসর কোনো রকমে চলে যায়। বিপত্নীক, সব কটি সন্তানই মেয়ে, ছেলে নেই। ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত হলেই, লোকে একটু ধান্দাবাজ ধূর্ত হয়। ঘোষাল মশায়ের সেইটি নেই। এখন অবিশ্যি দিনকাল বদলিয়েছে। বর্গাদার ভাগীদারদের সঙ্গে সমঝিয়ে চলতে হয়। বাবা বাছা করে কথা কইতে হয়। তাদের জীবনটাই বা কী? চিরকাল এই মধ্য-স্বত্বভোগীদের খিদমৎ খেটে এসেছে, পরের জমি চাষ করেছে। এখন চোপা করলে, তারাও চুপ করে থাকে না। যা বলবে, তাই মাথা পেতে মেনে নেবে না। নিজেরটা বুঝে নিতেই বা ছাড়বে কেন? মাঠে লাঙ্গল দেবে তো তারাই। তারা ছাড়া আছে কে? তবে তাদেরই মুখে শুনেছি, ঘোষাল ঠাকুর নির্বিষ ভালো মানুষ। সেই হিসেবে বরং কেদারদাদু সম্পর্কে অনেক আন্ কথা শুনেছি। সে কথায় এখন দরকার নেই। অথচ দেখছি কৃষাণদের সঙ্গে বসে তিনি নেশা করছেন।

ঘোষাল মশাইয়ের কিছু কিঞ্চিৎ স্নেহ আমার প্রতি আছে। আন্তরিক ব্যগ্রতার

সঙ্গেই আমাকে বলেছেন, 'তুমি তো বাবা পরের চাকরি কর না। কলকাতা থেকে কতটুকুই বা পথ। যখন সময় পাবে, মন করবে, চলে আসবে।'

আজ এই অকাজের মনটাকে মেরামতের জন্য মন করল এখানে চলে আসতে। তাই আসা। আমি আবার উঁচু দিকে পা বাড়াতেই, কেদারদাদু হেঁকে উঠলেন, 'অ জামাই, চললে কোথায় হে? না দেখে, না খবর নিয়েই চলে যাচ্ছ যে? এসো, তোমার একটু সেবা করি।'

তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গীরা সমস্বরে সায় দিয়ে উঠল, 'হুঁ হুঁ, আসেন গ জামাইবাবু।' পোড়া কপাল আমার! প্রায় দ্বিপ্রহরে এখন কি মাতালের পাল্লায় পড়ব? মাতাল দাঁতালকে আমার বড় ভয়। আমি সাঁকোর দিকে উঠতে উঠতে বললাম, 'দাদু, আপনার বাড়িতে দেখা করব। এখন যাই, আপনি আসুন।'

কেদারদাদু বললেন, 'মনে বড় দুঃখ পেলাম হে জামাই। তবে বলছ যখন, তাই হবে।'

কী নিস্কৃতি! দৌড়ে উঠে এলেই হয়েছিল আর কী। আমি সাঁকোর ওপর উঠে এলাম। নিচে ক্যানেলের জল এখন তেমন ভরতি না। এটা ঠিক ক্যানেল কী না জানি না। আগেরবার শুনে গিয়েছি, নদী। কী নদী তার নাম শুনি নি। চেহারা দেখেও নদী বলে মনে হয় না। শীতে বা শুকোর সময়, বালির চরা যেমন নদীতে দেখা যায়, এ তেমন না। সাঁকোর ওপর উঠে, সর্পিল সড়কটাকে দেখতে পেলাম, আমার গন্তব্য গ্রামের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। লাউড স্পীকারের সেই গান এবং বক্তৃতার স্বর এখনো ভেসে আসছে, তবে ক্ষীণতর। খড় বোঝাই দুটো গরুর গাড়ি আমার সামনে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল এক ঝাঁক পায়রা।

গ্রামে ঢোকবার মুখেই, ডানদিকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এমন নিঝুমে আর চুপচাপ, কেউ আছে কী না, কিছু বোঝবার উপায় নেই। কিন্তু আছে, তার অনেক চিহ্ন ছড়ানো। সামনের দুর্বা ছাওয়া মাঠে, অনেকগুলো জামা কাপড় শুকোচ্ছে। কর্মচারিদের কোয়ার্টারের সামনে বেড়া ঘেরা বাগান। ইতিমধ্যেই গাঁদা ফুল ফুটেছে। টগর জবার গাছ রয়েছে। কোথাও কয়েকটি কলা গাছ। লাউয়ের মাচায় অংকুরিত নধর সবুজ ডগা। সীমের মাচায় নীল ফুলের ঝলক। লেবু গাছে পাতা ঝরছে।

গ্রামে ঢোকবার মুখে দ্বিধাবিভক্ত দুই রাস্তা। মাঝখানে চণ্ডীতলার বড় বটের গোড়া বাঁধানো। বাঁদিকে একটি বড় পুকুরের গা দিয়ে যে রাস্তা ভিতরে ঢুকেছে, আমি সেই পথে গেলাম। তারপরে দু'পাশেই বাড়ি, বাঁশ বাগান, আম জাম কাঁঠাল গাছের নিবিড় ছায়া। বেশ কয়েকটা ছোট বড় পুকুর এখানে ওখানে। পুকুর ঘাটে এখন তেমন ভিড় নেই। ভিড় কিছু টিউবওয়েলের চত্বরে। গ্রামে এখন বেশ কয়েকটা সরকারি টিউবওয়েল। মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে ভাঙা পুরনো পাকা বাড়ি আর মন্দির। কোনোটাতে লোক আছে, কোনোটাতে নেই। যে-বাড়িতে আছে, তার চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। ভাঙাচোরা পড়ন্ত অবস্থার মধ্যেও যতটা সম্ভব গোছগাছ করা। যে-বাড়িতে নেই, সেখানে একটা ভুতুড়ে খা খা ভাব।

ছেলে বুড়ো, অনেকেই আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে দেখল। গাঁয়ে অচেনা মুখ দেখলে, এই রকমই তাকায়। কিন্তু আগের সেই গ্রাম্যতা নেই, হঠাৎ দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করা, 'কোথায় যাওয়া হবে? কার বাড়ি? আগমন কোথা থেকে?' এখন চোখের ভাষাতেই স্পষ্ট। রাস্তার ওপরে ঘর কেটে ছোট ছেলে মেয়েদের এক্কা দোক্কা খেলা, তার মধ্যেই চোখে কালো ঠুলি আঁটা, কাঁধে ব্যাগ লোকটার দিকে একবার অনুসন্ধিৎসু চোখে দেখে নেওয়া। চলে যাবার পরে নিজেদের মধ্যে, লোকটার সম্ভাব্য গন্তব্য নিয়ে একটু কথাবার্তা।

বাঁদিকে মোড় নিয়ে, মন্দিরের চূড়াটা চোখে পড়ল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে পাকা ঠাকুর দালান ঘোষাল বাড়ি। বাড়ি অবিশ্যি মাটির, ঘরের মাথায় খড়ের ছাউনি। বাঁদিকে একটি ছোট মুদি দোকান, তার পাশেই গো-প্রজনন কেন্দ্রের ডাক্তারের বাড়ি। নিজের না, ভাড়াটে বাড়ি। গ্রামেও এখন শহরের মতো ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। মন্দির থেকে একটু এগিয়ে, রাস্তার ওপরেই ঘোষাল মশাই বিপরীত দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাতে বাছুরের গলায় বাঁধা দড়ি। বাছুরটা পাশের দূর্বা ঘাসে মুখ নিচু করে খাচ্ছে। নিশ্চয়ই এ অসময়ে গরু চরাতে বেরোন নি। তিনি গরু চরানও না। তার জন্যে রাখাল আছে।

আমি মন্দিরের সামনে, ডানদিকে ঘোষাল বাড়ির দিকে একবার দেখলাম। ঠাকুর দালানের সামনে অনেকখানি খোলা চত্বর। তার পরেই মাটির ঘরের দেওয়াল। দেওয়ালের গায়ে একটি ছোট জানালা। ঘরের পাশ দিয়েই, একটু ভিতর দিকে, বাড়ির ভিতরে যাবার দরজা ভেজানো। দরজার পাশ দিয়ে, বাঁদিকে সরু গলি পথ। সেই পথের ওপর ঘোষাল মশাইয়ের অন্যান্য শরিকদের বাড়ি।

ঘোষাল মশাইকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, আমি একটু ইতস্তত করলাম। পূব দিকে যেমন একটি ঘর, চত্বরের উত্তর দিকেও একটি ঘর। ঘোষাল মশাইয়ের বড় ভাইয়ের দক্ষিণ দুয়ারি ঘর। এ ঘরের দুটো জানালা। ঠাকুর দালানে বা আশেপাশে কারোকে দেখতেও পাচ্ছি না। তাঁর দুই কন্যা নিশ্চয়ই বাড়ির ভিতরে রয়েছে। তাঁর এক বিধবা দিদি সংসার দেখাশোনা করেন।

আমি একটু গলা খাকারি দিলাম। তিনি ফিরে তাকালেন না। সামনে গিয়ে দেখা করাই সাব্যস্ত করলাম। এগিয়ে গিয়ে কাছে এক পলক দাঁড়িয়েই নিচু হয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে কপালে ঠেকালাম। তিনি এমন বিস্মিত আর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, হাত থেকে বাছুরের দড়িটা পড়ে গেল। ছাড়া পেয়ে বাছুরটি আপন মনে উত্তরের দিকে এগিয়ে চলল। তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'কে?' পরমুহূর্তেই চিনতে পেরে, তাঁর চোখে মুখে খুশি হাসি ফুটল। বললেন, 'তুমি? এসো এসো। একলা নাকি?'

আমার উদ্বেগ তখন বাছুরটির জন্য। ও যে চলে যাচ্ছে। বললাম, 'হ্যাঁ, একলাই। খবর সব ভালো, সকলেই ভালো আছে।'

আগেই এ সংবাদটা দেওয়া দরকার, কোনো দুশ্চিন্তা মনে আসার আগেই। বললাম 'হঠাৎ খেয়াল হলো, ভাবলাম, একবার ঘুরে আসি।'

'আসবে বৈ কি, নিশ্চয়ই আসবে। খুব ভালো করেছ।' বলতে বলতে তিনি, হাঁটুর ওপরে গুটিয়ে রাখা কাপড়ের অংশ কোমর থেকে তাড়াতাড়ি খুলে ভদ্রস্থ হবার চেষ্টা করলেন। পায়ে রয়েছে চটি। গায়ে একটি হাফ-হাতা শার্ট। মাথার চুল ধূসর। যতো বয়স না, দেখলে তার থেকে বয়স্ক লাগে। সারা মুখে দু-তিনদিনের আকাটা দাড়ি।

আমি বললাম, 'বাছুরটা যে চলে যাচ্ছে।'

ঘোষাল মশাই বললেন, 'যাক, ও ঠিক জায়গায় যাবে। তুমি এসো বাবা।' বলে তিনি আমার হাত ধরে বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন, বললেন, 'আমি একেবারে চমকে গেছি। কিন্তু খুব খুশি হয়েছি। এসো এসো। পুষিদের খবর তাহলে ভালোই। বেশ বেশ।'

উত্তরের ঘরের জানালার পাল্লায় ক্যাঁচ্ করে শব্দ হতে, মুখ তুলে তাকালাম। একটি মুখ। মাথায় ঘোমটা নেই, কপালে সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে রেখা। কালো ডাগর চোখ, টিকলো নাক, পান পাতার মতো গড়ন মুখটির, বয়স বোধ হয় তিরিশ

হয় নি। মুখটি চেনা চেনা। দৃষ্টি বিনিময় হলো, দ্বিধাজড়িত লজ্জার হাসি ফুটল। পাশেই আর একটি মুখ দেখা দিল। মাথায় ঘোমটা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, দু' চোখে অপার কৌতূহল। এ মুখটিও কি চেনা?

আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললাম, 'আমি অবিশ্যি বীরুকে (আমার বন্ধু, ওঁর জামাই) কিছু বলে আসি নি। পুষ্পকেও না। হঠাৎ মনে হলো। ভাবলাম রাত্রে ফিরে গিয়ে খবর দেবো।'

ঘোষাল মশাই আকাশ থেকে পড়ার মতো অবাক হয়ে বললেন, 'রাত্রে! আজই! তা আবার কখনো হয় নাকি? নাও, এখানে দাঁড়িয়েই জগদ্ধাত্রীকে প্রণাম করে নাও, তারপরে বাড়িতে ঢুকি।'

এটাই রীতি। ঠাকুর দালানের পাশেই, মন্দিরে জগদ্ধাত্রী ঘোষালদের গৃহদেবী, নিত্য পুজো হয়। যে কেউ বাইরে থেকে আসুক, মন্দিরের সামনে দেবীকে প্রণাম করে গৃহ প্রবেশ রীতি। কারণ কিছু ব্যক্ত করতে পারি না, জগদ্ধাত্রী নামটি আমার বড় প্রিয়। আমি দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলাম। ঘোষাল মশাই আবার আমার হাত ধরলেন, ভিতরে যাবার দরজার দিকে এগিয়ে চললেন। কিন্তু কথার ভাবগতিক তেমন সুবিধার লাগল না। বললাম, 'হাতের কাজ কর্ম সব ফেলে হঠাৎ চলে এসেছি, আজ না ফিরলেই নয়।'

'তা তুমি তো বাবা হঠাৎ করেই আসবে।' ঘোষাল মশাই বললেন, 'তুমি হলে লেখক কবি মানুষ, অ্যাঁ?' হেসে উঠলেন।

লেখক, আবার কবিও। কোনোটাই শুনতে তেমন মধুর লাগে না। এমন ভাবে বলেন, তৎক্ষণাৎ আমাকে একটা ভিন্ জাতে ঠেলে দিলেন যেন। দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'তোমার তো পরের চাকরি না। তোমার আবার তাড়া কিসের? আজ এসে আজই যাওয়া, তোমার সে দায় কিসের?'

সে কথা ওঁকে কী করে বোঝাব? কাজ অকাজের দ্বন্দ্বে আমার আসা। দ্বন্দ্ব একটু মিটিয়ে নিয়েই, কাজের পালা। আমার যে কিসের তাড়া, কী দায়, ওঁকে কি বোঝাতে পারব? চাকরি করি না বটে, চাকরির বেশি দায় তাই আমার। পরের কাজে যদি বা ফাঁকি চলে, নিজের কাজে চলে না। কিন্তু এই মুহূর্তে, ওঁকে সে-কথা বলে কিছু লাভ নেই।

বাড়ির ভিতর দুটি ঘর, একটি বড় উঠোন। উঠোনের এক পাশে বড় বড় দুটি ধানের মরাই। খিড়কি দরজার দিকে, বাঁয়ে রান্নাঘর। কিন্তু সবই কেমন নিঝুম। বাড়িতে কেউ আছে বলে মনে হয় না।

ঘোষাল মশাই দাওয়ায় উঠে, আমার হাত ছাড়লেন, নিজেই বললেন, 'দিদির শরীরটা খারাপ। বয়স হয়েছে, বাতের রুগী, ঠান্ডা পড়লেই কাবু হয়ে পড়ে। নিরু আর অমু, ওরাই সকাল সকাল যা হোক দুটি ফুটিয়ে নিয়ে নিজেরা খেয়ে বেরিয়ে গেছে। আমার জন্যেও রেখে গেছে। আমার খাবার সময় সানু এসে বেড়ে দিয়ে যাবে।' বলতে বলতে তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।

নিরু আর অমু ঘোষাল মশাইয়ের দুই কন্যা। তারা রেঁধে-বেড়ে খেয়ে নিয়ে কোথায় গিয়েছে বুঝতে পারলাম না। সানু কে, চিনতে পারলাম না। অথচ নামটা শোনা শোনা লাগছে। পিশীমা অর্থাৎ ঘোষাল মশাইয়ের দিদি অসুস্থ, কথাটা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। যদিও আমার দু'দিনের দেখা, তবু মনে হয়েছিল পিশীমাকে বাদ দিয়ে এ সংসারকে ভাবা যায় না। তিনি দৌড়াদৌড়ি করেন না, ধীরে সুস্থে সারাটা বাড়ি ঘুরে বেড়িয়ে কাজ করেন। চড়া স্বরে কথা বলেন না, কিন্তু বলেন প্রায় অনর্গল। মুখে লেগে থাকে হাসি। মাথায় সব সময়েই থানের ঘোমটা, কপালের

দু'পাশে থোকা থোকা ফুলের মতো শাদা চুল দেখা যায়। ভাইয়ের থেকেও তাঁর এই বয়সে রঙ ফরসা। চোখ মুখ দেখলে বোঝা যায়, একদা রূপসী ছিলেন। বয়সের ভার তাঁর শরীরে নেমেছে, কিন্তু মেদবর্জিত শরীরে কোথায় বাত ব্যাধি আস্তানা নিয়েছে, কে জানে। তিনি দাওয়ার ওপর কুটনো কুটতে বসে ডাকেন, 'এসো, তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলি বাবা, তোমার কথা শুনি।' কুটনো কুটতে কুটতেই, রান্নাঘরে একবার পাক দিয়ে আসেন, উনোনে তখন হয়তো ডাল ফুটছে। সেই ফাঁকেই ডেকে বলেন, 'অমু গোবরাকে বল্, গরুটাকে একটু খড় দিতে। নাচ দুয়ারের ঘাটে একবার হাঁসগুলোকে দেখে আসিস। যা দিনকাল হয়েছে।'

হ্যাঁ, যা দিনকাল হয়েছে, গেরস্থের হাঁসও চুরি করে নিয়ে যেতে পারে। বর্ধমানে নাচ দুয়ার হলো খিড়কি দুয়ার। ঘোষাল মশাই ঘরের ভিতর থেকে একটি কাটির মাদুর নিয়ে বেরিয়ে এসে পেতে দিতে দিতে বললেন, 'এখানেই বসো। আমাদের এসব ঘর অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না।'

সেটা মিথ্যা না। কিন্তু আমি অপ্রস্তুত ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'আপনি এসব করতে যাচ্ছেন কেন, দিন, আমিই পেতে নিই।'

'এ আর এমন কি কাজ বাবা।' তিনি বললেন, 'তুমি আমার বাড়িতে এসে নিজে মাদুর পেতে বসবে? এসেছ, এই না কত ভাগ্যি। মেয়ে দুটো খবর পেলে এখুনি ছুটে বাড়ি চলে আসত।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'ওরা কোথায় গেছে?'

'ইস্কুলে, আর কোথায় যাবে?' ঘোষাল মশাই বললেন, 'বসো বাবা।'

কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম, নিরু আর অমু ইস্কুলে পড়ে। যত দূর মনে পড়ছে, নিরুর দশম শ্রেণী, অমুর অষ্টম। দুজনেই উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রী। আমি কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে বসলাম, চোখ থেকে খুললাম কালো ঠুলি। দুপুরের শীতের রোদ উজ্জ্বলতর হয়ে চোখে ঝিলিক দিল। ঘোষাল মশাই বসলেন না, খানিকটা আপন মনেই বললেন, 'ইস্কুলে পড়ছে বটে, কিন্তু পারলে আজই পাত্রস্থ করি। নেহাত হয়ে উঠছে না বলেই ইস্কুলে পড়া। আমাদের ঘরে মেয়েদের লেখাপড়া শিখেই বা কি হবে। ঘর গেরস্থালি নিয়েই থাকতে হবে। তোমাকে যা বলে রেখেছি, মনে আছে তো বাবা। অন্তত নিরুর জন্যে একটা ছেলে তাড়াতাড়ি দেখে দাও।'

বললাম, 'মনে আছে।' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললাম, 'পিশীমার অসুখ শুনে মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি এলাম, আর উনি অসুস্থ—'

'তাতে কী হয়েছে? রোগ ব্যামো কোথায় নেই? তা বলে তুমি আসবে না?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'পিশীমা কি ঘুমোচ্ছেন? তা না হলে, একবার দেখা করতাম।'

'দিদি ঘুমোবে?' ঘোষাল মশাই সামনের কয়েকটি শূন্য দাঁত দেখিয়ে হাসলেন, 'ও ঘরের পেছনে ধান সেদ্ধ হচ্ছে, সেখানে গিয়ে বসে আছে। গায়ে গতরে ব্যথা, নড়তে চড়তে পারে না, তা বলে শুয়ে থাকবে? সেটি হবে না।'

আমি উঠবার উদ্যোগ করতেই, বাড়ির ভিতরে এলো, জানালায় দেখা সেই প্রথম মুখ। এখনো তার ঘোমটা নেই। সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা, কপালে টিপ। ডাগর না বলে, চোখ দুটোকে টানা বলা ভালো। নাকের নাকছাবিটা এখনই যেন চোখে পড়ল, অথবা রোদে ঝিলিক দিচ্ছে বলেই। মুখে কোনো প্রসাধনের প্রলেপ নেই, অথচ স্নিগ্ধ চিকন। অনতিদীর্ঘ একহারা শরীর। সামান্য একটি ছিটের খাকি জামার ওপরে, লাল ডোরা, লাল পাড় শাড়ি। বয়স বোধ হয় অনধিক তিরিশ। চকিতে একবার আমার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে, ঠোঁট টিপে হাসি গোপন করার চেষ্টা চোখে পড়ল।

ঘোষাল মশাই দাওয়ার সিঁড়িতে পা দিয়ে বলে উঠলেন, 'ও মা সানু, তুই এসে

গেছিস? আমি তোকে ডাকতে যাব ভাবছিলুম।'

সানু যার নাম, সে সলজ্জ হেসে, চকিতেই আর একবার আমার দিকে দেখে নিয়ে বলল, 'আমিও সেই ভেবেই চলে এলুম মেজোকা। ওঁকে দেখলুম এলেন, মাকে গিয়ে বলতেই, মা বললে, তাড়াতাড়ি যা। পিশীর অসুখ, নিরু অমু বাড়ি নেই।'

ঘোষাল মশাই ডেকে বললেন, 'আয় মা আয়। এখন আর কী-ই বা পাওয়া যাবে। ডাল ভাতই দুটো রেঁধে দে।' বলে আমার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, 'সানুকে চিনতে পারছ তো বাবা, আমার বড়দার মেয়ে।'

প্রথম দর্শনেই তাই চেনা মনে হয়েছিল। পরিচয় হয়েছিল প্রথম বারেই। ভগ্নিপতির বন্ধুর সম্পর্ক ধরে, কিঞ্চিৎ হাসি ঠাট্টাও হয়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে বললাম, 'মনে আছে।'

মনে আছে, আমিও ওকে সানুদি বলে সম্বোধন করেছিলাম। সানুদি আমার নমস্কারের জবাবে, নিজের দু'হাত কপালে ঠেকাতে গিয়ে আরো যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল। ঘোষাল মশাইয়ের উদ্দেশে বলল, 'তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, যা করবার আমি করছি।'

'তোরা থাকতে আমি আর কী ভাবব। এসো, দিদির সঙ্গে দেখা করবে।' ঘোষাল মশাই আমাকে ডাকলেন।

আমি উঠে, ওঁকে অনুসরণ করতে গিয়ে, আর একবার সানুদির দিকে তাকালাম। সানুদিও তাকিয়ে ছিল। মুখে রঙের ছটা ফুটিয়ে চোখের পাতা নামাল। এবারে ওর আবির্ভাবটা একটু ভিন্ন রকমের। আগের বারে, সে ছিল অনেকের ভিড়ে। এবার একাকী, সেইজন্যই বোধ হয় ভিন্ন রকমের লাগছে। উঠোনের পশ্চিমে গিয়ে, মরাইয়ের সামনে ঘরের পাশ দিয়ে সরু গলি দিয়ে পিছনে যেতেই, চোখে পড়ল ঢেঁকি ঘর, পাশে বিরাট উনোনের ওপরে, কাঠের আগুনে ধানের জালা বসানো। ধোঁয়া উঠছে জালার খোলা মুখ দিয়ে। একটি চাষী বউ জালার মধ্যে কাঠ দিয়ে নাড়ছে। মাথায় কাপড় ছিল না। আমাদের দেখা মাত্র ব্যস্ত ত্রস্ত হয়ে মাথায় কাপড় দিল। কিন্তু পিশীমা কোথায়?

দেখা গেল, নিষ্পত্র আমড়া গাছের নিচে, রোদে পিঠ দিয়ে, পিশীমা মাথা কাত করে বসে আছেন। দু'চোখ বোঁজা, মনে হয় ঘুমোচ্ছেন। আমি বলে উঠলাম, 'থাক, এখন ওঁকে ডাকবেন না।'

কথাটা বলেই বোধ হয় অন্যায় করলাম। পিশীমার কান খড়খড়ি মাছের মতো, চকিতেই নড়ে উঠলেন, চোখ খুলে আমাদের দিকে তাকালেন। চোখে ভ্রূকুটি অবাক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। ঘোষাল মশাই এগিয়ে গিয়ে, আমার নাম করে বললেন, 'মনে আছে তো ওকে? পুষির বরের সেই বন্ধু গো, বই লেখে যে।'

আমি এগিয়ে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি আমার চিবুকে হাত দিয়ে, মুখে ছুঁইয়েই ; আমার একটি হাত ধরে, অবাক হেসে বললেন, 'ও মা, কোথ্ যাব গো! তুমি এসেছ? ভালো আছো? পুষিরা সব ভালো তো?'

বললাম, 'সবাই ভালো আছে, আমি হঠাৎ এক বেলার জন্যে বেড়াতে এলাম।'

'এক বেলার কথাটা ছাড়ো বাবা।' ঘোষাল মশাই তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন।

পিশীমা বললেন, 'আহা, কী লক্ষী ছেলে। আমাদের কথা কেমন মনে রেখেছে।'

মনে না রাখবার কোনো কারণ নেই। পিশীমার কথাবার্তা এই রকম। আবার বললেন, 'এক বেলার জন্যে আবার কেউ আসে নাকি? কিন্তু দেখছ তো বাবা, আমি হাঁটু আর কোমরের ব্যথায় পড়ে আছি। হ্যাঁ রে ললিত ওর—'

'সানু এসেছে।' ঘোষাল মশাই কথার মাঝেই বলে উঠলেন, 'তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। তুমি এখানে রোদে বসে আছ, তাই থাক। ওষুধ খেয়েছিলে?'

পিশীমা অন্য কথা বললেন, 'তা বললে কি হয়? আমি উঠি, একটু দেখিগে, সানু কী করছে।'

আমি বললাম, 'থাক না পিশীমা, আপনি বসুন। সানুদি তো এসে গেছেন।'

পিশীমা ততক্ষণে গাছের গায়ে হাত চেপে উঠে দাঁড়াতে আরম্ভ করেছেন, ব্যথা কাতর স্বরে বললেন, 'সানুই সব করবে, আমি তো পারব না। একটুখানি দাঁড়াব গিয়ে। তা নইলে মন মানবে না।'

এই সেই কথা, কাজে না পারি, মনের যত্ন চাই। মন ঠিক থাকলে, সব ঠিক। অতএব বাধার কোনো কথাই নেই। ঘোষাল মশাই তাড়াতাড়ি বাঁশের একটি লাঠি গাছ-তলা থেকে, পিশীমার দিকে এগিয়ে দিলেন। পিশীমা লাঠি নিয়ে, রীতিমত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চললেন। বেয়ুত হয়ে উঠছে এখন আমার মনটাই। আমরা উঠোনে এসে দাঁড়াতেই, বড় ঘোষাল মশাই হেঁকে এসে ঢুকলেন, 'কই, আমাদের অতিথি কোথায়?'

সানুদির বাবা এলেন। আর একবার প্রণামের পালা। তিনি কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'জয়স্তু। বাড়িতে সব বলাবলি করছে তোমার কথা।'

ঘোষাল মশাই ডেকে বললেন, 'এসো দাদা বসবে।'

পিশীমা ইতিমধ্যেই রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকেছেন। কিছু কচি কাঁচার দল কোথা থেকে এসে জুটেছে। যে-কোনো নতুন লোক এলেই, এদের অগাধ কৌতূহল। আমি দুই ঘোষাল ভ্রাতার সঙ্গে, দাওয়ায় পাতা মাদুরের ওপর গিয়ে বসলাম। বড় ঘোষাল একটু দূরে বসলেন। কথাবার্তার মধ্যে গ্রামের দিনকাল, ফসলের দাম, সরকারের মর্জি এসবই হচ্ছিল। কিন্তু থেকে থেকেই আমার নাসারন্ধ্র স্ফীত হচ্ছিল। বড় ঘোষাল আসার পর থেকেই যেন গন্ধটা পাচ্ছি। নাকি কেদারদাদুর সাঁকোর তলার আসর থেকে গন্ধটা ভেসে আসছে? সেটা বোধ হয় সম্ভব না, বড় ঘোষালের চোখ দুটিও দেখছি কিছু কিঞ্চিৎ লাল। বিড়ি টানছেন ঘন ঘন। তারপরে মক্ষিকাতেই জানান দিল। গোটা দুই মৌমাছি কেবলই বড় ঘোষালের মুখের কাছে বন বন পাক খেতে লাগল। তিনি মুখের সামনে হাত চালান আর কথা বলেন।

আমি কেদারদাদুর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা বললাম। বড় ঘোষাল বললেন, 'কেদার আমাদের সম্পর্কে মামা হয়। বড় মাতাল। সাঁকোর নিচে বসে নিশ্চয়ই মাল টানছিল?'

আমি হেসে বললাম, 'সে রকম কিছু দেখি নি।'

'নির্ঘাৎ মাল টানছিল, আর ওই মজুরদেরই পয়সায়।' বড় ঘোষাল বললেন, 'ও শালা মামাকে আমি ভালো চিনি।'

ছোট ঘোষাল গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'দাদা, তুমি নাইতে যাবে না?'

তাঁর অস্বস্তি স্পষ্ট। 'শালা মামা' শুনে আমিও একটু চমকিয়ে উঠেছিলাম। আসলে সবই দ্রব্যগুণ। বড় ঘোষাল বললেন, 'আরে যাব যাব, ও এসেছে, একটু কথা বলি। তোমাকে কি বলব বাবা, এমন চশমখোর ওই মামা শালা, আমাদের সঙ্গে মহাজনী করতে এসে বাটপাড়ি করে। সংসার করতে গেলে কোন্ শালার ধার দেনা না হয় বল? ধার মানে, ধান। তা মামা শালা—'

'দাদা, তুমি নেয়ে খেয়ে নাও গে।' ছোট ঘোষাল আবার বললেন।

বড় ঘোষাল যেন শুনেও শুনলেন না, বললেন, 'পিঁপড়ের পোঁদ টিপে খায়, ওদিকে দেখ, মাগীবাজীর বেলায়—।'

'বাবা!' তীক্ষ্ণ স্বরে ঝংকার দিয়ে আসরে অবতীর্ণ হলো সানুদি। তার কালো চোখে ভর্ৎসনার দৃষ্টি, বলল, 'যাও, তুমি এখন বাড়ি যাও, ও বেলা আসবে।'

বড় ঘোষাল বেশ তর্জে উঠেছিলেন, হঠাৎ নিরীহ আর নরম হয়ে গিয়ে বললেন, 'কেন, কী করেছি? তুই আবার এমন রণমূর্তি ধারণ করলি কেন? একটু সুখ দুঃখের

কথা বলছি বইতো নয়?'

সানুদি তেমনি ঝংকৃত স্বরে বলল, 'সুখ দুঃখের কথা বিকেলে বলো, এখন যাও।'

ছোট ঘোষাল সুবোধ বালকটির মতো মাথা নিচু করে বসে আছেন। বড় ঘোষাল একবার মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে, উঠে দাঁড়ালেন, দাওয়া থেকে নামতে নামতে বললেন, 'তবে তাই হবে।' বলে উঠোন পেরিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমারই মনটা খারাপ হয়ে গেল। সবে একটু মনের কথা মুখ খসিয়ে শুরু করেছিলেন, তার মধ্যেই কী আপদ! আমার হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু গর্বিত পুরুষটির হঠাৎ শান্ত মূর্তি ধারণ এবং সুড় সুড় গমন, একটা করুণ ছবি। সানুদির সঙ্গে চকিতেই আমার একবার চোখাচোখি হলো। সে খোলা চুলে ঝাপটা দিয়ে পিছন ফিরে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঘোষাল মশাই নিচু স্বরে বললেন, 'এ বলে আমার দ্যাখ, ও বলে আমার দ্যাখ। কেদার মামার সঙ্গে ওরই ভাব যত, বিবাদ তত। দুজনের কেউই কম যান না। একজন সাঁকোর নিচে বসে আছেন, ইনিও এই সকাল বেলাতেই বাউরি বাড়ি ঘুরে এলেন।'

বাউড়ি বাড়িই বোধ হয় রসের আগার, বড় ঘোষাল যেখান থেকে ঘুরে এলেন। কিন্তু এ বিষয়ে আমার মন্তব্যের কোনো অধিকারই নেই। ঘোষাল মশাই আবার বললেন, 'দাদার সবই ভালো, ওই একটিতে সব নষ্ট। তুমি বাবা ঘরের ছেলের মতো, বলতে বাধা নেই, দাদার একমাত্র ছেলেটিও বাপের মতন হয়েছে। কাজকর্মের নামে নেই, গাওনা বাজনা করে বেড়াচ্ছে। আর আজকাল আবার পলেটিক্স করছে। অমন সুন্দর বউ, দেখলে দুঃখ লাগে।'

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, অনধিকার চর্চাও বটে। ঘোষাল মশাই একবার রান্নাঘরের দিকে দেখে নিয়ে বললেন, 'তার ওপরে বুকে বসে ওই মেয়ে।'

বুকে বসে! কথাটার ধরতাই পেলাম না, অথচ কৌতূহলও নিবারিত হবার না। জিজ্ঞেস করলাম, 'বুকে বসে কেন?'

'বুকে বসেই তো।' ঘোষাল মশাই গলার স্বর নামিয়ে উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, 'পঁচিশ বছরের মেয়ে, বাপের ঘরে জীবন কাটাচ্ছে, এ তো বুকে বসাই বলে।'

কৌতূহল হলো ধোঁয়াটে আগুন। বাতাস পেলেই বাড়ে। আমার অবস্থা তাই। জিজ্ঞেস করলাম, 'বাপের ঘরে জীবন কাটাচ্ছেন কেন?'

'কপাল।' তিনি কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'তা ছাড়া কী বলব? বিয়ের পরে তিন রাত্রি কাটে নি, মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাপের বাড়ি ফিরে এলো। কেন? না, সৎ শাশুড়ি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আর ওঁর স্বামী? তিনি কিছু বললেন না?'

'সেটা নাকি সৎ মায়ের ভ্যাড়া।' ঘোষাল মশাই বললেন, 'কিছু বলা দূরের কথা, নিজেও সৎ মায়ের সাপুটি গেয়ে, বউকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

জীবনের এই সব বাস্তবগুলো সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা একেবারে শূন্য। একটা অসহায় যন্ত্রণা বোধ করা ছাড়া, আর কিছুই করতে পারি না। অথচ মানুষের এই মন মতি কিছু বুঝি না। ভদ্রলোকটি সৎ মায়ের না-ই হোক, বিয়ের আগেও তো নিশ্চয় তাই ছিলেন। তাহলে এমন বিবাহ ঘটে কেমন করে? সৎ মা-ই বা তখন তাঁর পুত্রটিকে বর বেশে পাঠিয়েছিলেন কেন? যার সব পরিণতি মাত্র তিনদিনের মধ্যেই সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল?

আকাশের নীলের ছটায়, হলুদ গরম রোদের মধুর উত্তাপ, ধান সেদ্ধর গন্ধ, মরাইয়ের গর্বিত চেহারা, লাউমাচার সবুজ অবাধ্যতা, সবই আমার কাছে কেমন যেন ম্লান আর বিষণ্ণ হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কখনো আর স্বামী ওকে নিতে

আসেন নি?'

'এসেছিল, দশ বছরের মধ্যে একবার।' ঘোষাল মশাই বললেন, 'দু'দিন বাদেই আবার কেঁদে ফিরে এসেছিল। ঘটনা সেই একই। সৎ মা'টি না ম'লে বোধ হয় আর কোনো দিন ওর স্বামীর ঘর করা হবে না। অথচ কেমন মেয়ে দেখলে তো? একটু বেচাল নেই। দাদার মতন মানুষও ওকে ভয় পায়। সেই কথায় বলে না, অতি বড় সুন্দরী না পায় বর, অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর, ওর হয়েছে সেই অবস্থা।'

সৎ মা আর ছেলে, ব্যাপারটা এঁদের চোখে কোনো জটিলতার সৃষ্টি করে নি। যা সত্যি, আর সরল, সেই নিষ্ঠুরতাকেই এঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন। আমি বললাম, 'কিন্তু সানুদিই বা তাঁর অধিকার ছেড়ে দেবেন কেন?'

'খোরপোষের কথা বলছ?' ঘোষাল মশাই বললেন, 'কে এসব করে বলো তো। পাড়াগাঁয়ে এমন ঘটনা তো আখ্‌চার। লোকে পেটের ধান্দা করবে না এসব ভাববে।'

একদিক থেকে হয়তো ঠিক, কিন্তু পল্লীগ্রামের পরিবর্তনটা মূলে কোথায় হয়েছে, বুঝতে পারছি না। বড় ঘোষালের ছেলে শুনছি পলেটিক্স করে, সে-ই বা ভগ্নির এ দুর্দশা মেনে নিচ্ছে কেমন করে? এ জিজ্ঞাসা আমার জিজ্ঞাসাই থেকে যাবে, কারোকে পুছ করতে পারব না। আমি আবার একটা কথা জিজ্ঞেস করবার উদ্যোগ করতেই, আঁচলে হাত মুছতে মুছতে সানুদি দাওয়ার সামনে এগিয়ে এলো। এখন আর তার মুখে ঠিক সেই লজ্জা রাঙানো হাসিটি নেই, কিন্তু কোনো বিব্রত ভাবও নেই। আমার দিকে একবার দেখে বলল, 'মেজোকা, এবার তোমার কথা শেষ কর, ওঁকে চান করতে দাও।'

ঘোষাল মশাই যেন চমকিয়ে উঠে, হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, চল, চানটা সেরে নেবে।'

সানুদি খুব সহজেই আমার চোখের দিকে একবার তাকাল। আর মুহূর্তেই আমার মনে হলো, ঘোষাল মশাই যে তার বিষয়েই বলছিল, সে যেন তা বুঝেছে। হয় তো তার জন্যে খুব বুদ্ধিমতী হবার দরকার হয় না, নিজের অভিজ্ঞতাই বুঝিয়ে দেয়। চান করবার তাগাদা দিতে আসা বোধ হয় সেই কারণেই। তার আলোচনা হচ্ছে, ভেবেই তার অস্বস্তি। দেখলাম, তার ঠোঁটে আবার হাসি ফুটল, বলল, 'চল বলে কোথায় চান করাতে নিয়ে যাবে? ওঁকে কি তুমি শিবের পুকুরে নাইতে নিয়ে যাবে, না কানন দীঘিতে?'

ঘোষাল মশাই যেন অসহায় ব্যস্ততায় বললেন, 'তাই তো, কোথায় নিয়ে যাব তবে সানু?'

সানুদি খিলখিল করে হেসে উঠে, মুখে আঁচল তুলে চাপা দিল। বলল, 'কোথাও নিয়ে যাবে না। আমি টিউব কল থেকে জল এনে দিচ্ছি, নাচ দুয়ারে চান করে নেবেন। ওঁদের কি পুকুরের জল সহ্য হবে? কলের জলে চান করা অভ্যেস।'

এবার আমি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলাম, 'টিউবওয়েল থেকে জল আপনাকে আনতে হবে না। কলের জলে নাওয়া অভ্যাস বটে, তবে পুকুরে সাঁতার কেটে স্নানও করতে পারি। আর তাতেই আমার ভালো লাগবে বেশি।'

সানুদির ঘাড়ে যেন একটু মোচড় লাগল, চোখের তারকা ঘুরল, বলল, 'পাড়া-গাঁয়ের এঁদো পুকুরে চান করে, আপনার শরীর খারাপ করলে?'

'নিশ্চয়, ঠিক বলেছিস সানু।' ঘোষাল মশাই বলে উঠলেন, 'ওরে বাবা! তোমাদের ওসব সইবে-টইবে না। সানু ঠিকই বলেছে, কল থেকে জল এনে দিক।'

আমি হেসে বললাম, 'আমার স্নানের আনন্দটা যদি মাটি করতে চান, তাহলে কিছু বলার নেই। আমি কিন্তু পুকুরেই স্নান করতে যেতে চাই।'

সানুদি আমার দিকে তাকালেন। ঘোষাল মশাই শব্দ করলেন, 'অ্যাঁ?'

সানুদি ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'বেশ, তেল দিচ্ছি, ভালো করে রোদে বসে মাখুন, তারপরে যাবেন। সাঁতার জানা আছে তো?'

হেসে বললাম, 'গঙ্গায় সাঁতার কাটা আমাদের অভ্যাস।'

সানুদি চলে যেতে যেতে বলল, 'সময় করতে পারলে, দেখতে যাব।' বলে রান্নাঘরে ঢোকবার মুহূর্তে আর একবার পিছন ফিরে তাকাল।

ঘোষাল মশাই বললেন, 'চল এবার ঘরের মধ্যে। জামা কাপড় ছেড়ে নেবে। তোমাকে চান করার জন্যে একটা কিছু পরতে দিই।'

যখন যেমন, তখন তেমন। না হলে বেকায়দা। ক্ষেত্র বিশেষে কাজটা অতি কঠিন। যখন যেমন তখন তেমন চলতে পারলে, মানুষের দুঃখ কী ছিল। কিন্তু গ্রামে এসে ঘাটে নাইতে যাবার কালে, বিশেষত এমন শীতের দুপুরে, গায়ে কিঞ্চিৎ তৈল মর্দন, বড় বিলাস। অকাজের মন মেরামতীতে এসে, এ বিলাসটুকু ছাড়ব কেন? নিরু কিংবা অমুরই হবে, কারোর একটা শাড়ি জড়িয়ে নিয়েছিলাম। গামছার বদলে ঘোষাল মশাই আমাকে একটা ধোপদুরস্ত তোয়ালে বের করে দিয়েছেন, যা থেকে উগ্র নেপথালিনের গন্ধ ছড়াচ্ছে। তৈল মর্দনে বসেছিলাম শিবের মন্দিরেরই এক গাছতলায়।

ঘোষাল মশায়ের স্নান সাঙ্গ হয় ভোরে। তাঁকে প্রভাতী পুজা করতে হয়। তবু সঙ্গে আসতে চেয়েছিলেন। হাতের চেটোয় লুকানো ধূমায়িত সিগারেটটা তিনি দেখতে পান নি। তাই সানুদিকেই রান্নাঘর থেকে বোধ হয় বলতে হয়েছিল, 'মেজোকা, ওঁকে যেতে দাও। জামা কাপড় আর তেলের বাটি সঙ্গে দিয়ে রাধুকে পাঠাচ্ছি।'

রাধু হলো রাধা, সানুদির বছর দশেকের সহোদরা। ও ছিল কাছে পিঠেই। তবু ঘোষাল মশাই দ্বিধা করেছিলেন। সানুদি বলে উঠেছিল, 'সব সময়ে তুমি সঙ্গে থাকলে হয়?' বলে আমার দিকে একবার সকৌতুকে তাকিয়ে, রান্নাঘরে ঢুকেছিল।

ঘোষাল মশাই বলেছিলেন, 'তাহলে যাও, একলাই যাও। তবে দীঘিতে যেও না, ওটা অনেক দূরে। পাড়ার পুকুরেই নেয়ে এসো।'

শিবের পুকুর। পাড়ার পুকুর, অচেনা মানুষ, ভিন্ পাড়াতে যেতে আমারও অস্বস্তি। এখন ভর দুপুর বেলা যায়। শিবের পুকুরে ভিড় তেমন নেই। বলতে গেলে এ পুকুরও গ্রামের বাইরে। পশ্চিম পারে একটি ছোট পাড়া। দু-একজন মেয়ে পুরুষ ওদিকেই স্নান করছে। পুবদিকে একটা বাঁদাড়, বাবলা বন, কিছু আসশ্যাওড়ার ঝোপ জঙ্গল। মন্দিরের পথের ধারেই বাঁশঝাড়। আশেপাশে কয়েকটি গরু বাঁধা। উত্তরে, পুকুরের ওপারে কয়েক বিঘা জমির পরে শান বাঁধানো সাঁকোর ঢালাই করা রেলিং দেখা যায়। তারপরে ধূ ধূ ধান কাটা মাঠ। মাঠের ওপারে একটি গ্রামের রেখা আকাশে জেগে আছে। আকাশের নীল রৌদ্রকিরণে ঝলকাচ্ছে। প্রজাপতিরা একা বা জোড়ায় জোড়ায় উড়ছে রঙের ছটায়। বাঁশঝাড় থেকেই বোধ হয় থেকে থেকে কী একটা পাখি পিক পিক করে ডেকে উঠছে।

এই আমার অকাজের তুষ্টি বিধান। মন মেরামত হচ্ছে। এমন একটি থানে, আকাশের নীচে বসব বলেই আশা। মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই, রাধার সঙ্গে চোখাচোখি। ও আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। কী লজ্জা! হেসে চোখ নামাল। গায়ে একটি ফুল ছাপা ছিটের ফ্রক। তেলতেলে আঁচড়ানো চুল খোলা। চোখে কিন্তু কাজল আঁকা। তেল ছাড়া মুখে আর কোনো প্রসাধন নেই। সানুদির আদল আছে মুখে, ফরসা আরো বেশি। অবিশ্যি হাতে পায়ের নখে রঙ আছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'রাধা, তুমি ইস্কুলে যাও নি?'

রাধা আরো লজ্জা পেয়ে গেল, মুখ নিচু করলো, তারপরে মাথা নাড়াল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

রাধা মাথা নিচু করেই বলল, 'চার মাসের মাইনে জমেছে, ইস্কুল থেকে বারণ করেছে।' কথাটা ওর পক্ষে লজ্জারই। কিন্তু বড় ঘোষাল মশায়ের অবস্থা কি এমনই, ইস্কুলের বেতন দিতে পারেন না? জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের ইস্কুল কোথায়?'

রাধা উত্তরের ধু ধু মাঠের ওপারে, আকাশের গায়ে কৃষ্ণ রেখাটি দেখিয়ে বলল, 'ওই গ্রামে। নিরুদি অমুদিও ওই স্কুলে পড়ে।'

মাঠের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি, দূরত্বটা নেহাৎ কম না। তবু জিজ্ঞেস করি, 'কত দূর?'

'দেড় ক্রোশ।' রাধা বলল।

তার মানে তিন মাইল। দিনে যাতায়াত ছ' মাইল। এতেই বোঝা গেল, পাড়া গাঁ ব্যাপারটা এখনো আছে। এখন শীতের সময় তবু এক রকম, গ্রীষ্ম আর বর্ষায় এই মাঠ পার হয়ে ইস্কুলে যাওয়া, শহরের ছেলেমেয়েদের কাছে চিন্তার অতীত। কিন্তু রাধার কাছে বিস্ময় প্রকাশ অর্থহীন। আমার তেল মাখা শেষ। উঠে জিজ্ঞেস করলাম, 'রাধা, তুমি সাঁতার জানো নাকি?'

রাধা লজ্জিত হেসে ঘাড় কাত করে জানাল, জানে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'পুকুর পারাপার করতে পারো?'

ও পশ্চিমের পাড়াটা দেখিয়ে বলল, 'বাউরিপাড়া পর্যন্ত যেতে আসতে পারি।'

'ওটা বুঝি বাউরিপাড়া?'

'হ্যাঁ। এখন দু-তিন ঘর বাঙালও আছে।'

অর্থাৎ দু-তিন ঘর পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা ঘর বেঁধেছে। জলের দিকে যেতে যেতে বললাম, 'তোমার চান না হলে, একসঙ্গে সাঁতার কাটতে পারতাম।'

রাধা বলল, 'কাল একসঙ্গে সাঁতার কাটব।'

কাল ইস্তক কি আমি আছি? বোধ হয় না। জলে ঝাঁপ দিলাম। এক ডুবেতেই শীত গা ছাড়া। পিছন ফিরে দেখলাম রাধা মন্দিরের দাওয়ার ওপর উঠে তাকিয়ে আছে। সাঁতার কেটে উত্তরের মাটি ছুঁয়ে ফিরে এলাম। অবগাহনের আনন্দে মন মেরামতী চলছে। রাধা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। আমার নজর গেল বাঁশঝাড়ের কাছে। ছায়াতে গা মিশিয়ে একজন দাঁড়িয়ে। চিনতে পারলাম, সানুদি। দেখতে আসার সময় করতে পারা গেছে তাহলে?

তীরের কাছে আসতে আসতেই, বাঁশঝাড়ের ছায়া মন্দিরের আড়ালে পড়ে গেল। স্নান শেষ করে উঠে, সানুদিকে আর দেখতে পেলাম না। তোয়ালে দিয়ে গা মুছে, জামা কাপড় পরতে পরতে রাধাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেউ এসেছিল?'

রাধা অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, 'না তো।'

সানুদি তার কথা রেখে চলে গিয়েছে। ভগ্নিকেও আওয়াজ দিয়ে যায় নি।

যে দাঁওয়ার ওপরে মাদুরের ওপর বসেছিলাম, সেখানেই আমার আর ঘোষাল মশায়ের খাবারের ঠাঁই হয়েছে। একটু দূরে এক পাশে বসেছেন পিশিমা। সানুদি খেতে দিল। প্রথম পাতে পেঁয়াজ পোস্ত। তারপরে সবুজ শাক। কী শাক? পিশিমা বললেন, 'আলু শাক।'

তার মানে কচি আলু গাছের পাতা। জীবনে এই প্রথম আলু শাক খাওয়া। বাহ্। অকাজের মনটা ধাতস্থ হচ্ছে। ঘোষাল মশাই আর পিশিমার এক কথা, 'পাড়া-

গাঁ জায়গা, ঘরে আর কী-ই বা আছে। কষ্ট করে খেতে হবে।'

কষ্ট হচ্ছে না বললেই বা বিশ্বাস করছেন কে? এই লেপে দেওয়া দাওয়ার ওপরে এত বড় ঝকঝকে কাঁসার থালা, কাঁসার গেলাস, মোটা ভাতের সুখটা বোঝাতে পারল না। সানুদির স্পষ্ট কথা, 'কেন মিছে বলছ? উনি কি আর বলবেন, কষ্ট হচ্ছে। যা দিয়েছি, তাই খেতে হবে।' তারপরে ডালের সঙ্গে ভাজা বড়ি, থোড় ছেঁচকি, আলু কুমড়োর মিষ্টি তরকারি। বিপরীত হয়ে গেল, আস্‌কে পিঠের মতো মোটা ডিম ভাজা। মাছের বদলে এটাই আমিষ পদ। এবং বাড়তিও। শেষ পাতে কালো পাথর বাটিতে কাঁচা তেঁতুলের টক ঝোল। নাকে তো সরষের তেল আগেই টেনেছি।

এমন একটি নিরিবিলি নিবিড়তার নাম কী? খেতে খেতে দেখলাম, লাউমাচায় প্রজাপতি উড়ছে, মৌমাছিরা গুঞ্জন করছে ফুলে ফুলে। উত্তরের পাঁচিলের ওপরে একটা বুলবুলি গা ফুলিয়ে, রেগে টং হয়ে কাককে তাড়া করছে। এমন অসম বিবাদ আর কখনো দেখি নি। হার মানল কাকটাই। মরাইয়ের পাশে গোটা কয়েক পায়রা ঠুকে ঠুকে কী খাচ্ছে। ধানই হবে। রান্নাঘরের দরজায় আম গাছের ছায়া। সেখানে সানুদি দাঁড়িয়ে, লক্ষ্য তার আমার পাতের দিকে। সম্ভবত খাবার রুচির দিকেও। থালা পরিষ্কার করেই খেয়েছি।

সানুদি বলল, 'খাওয়াটা লক্ষী ছেলের মতো হয়েছে।'

ঘোষাল মশাই হেসে বললেন, 'কী যে বলিস।'

আমি বললাম, 'জামাইদের থেকে ভালো।'

পিশিমাও ফোকলা দাঁতে হেসে উঠলেন। নাচ দুয়ারের কাছে গিয়ে আঁচানো। সানুদি হাতে জল ঢেলে দিল। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার খাওয়া তো হয় নি?' বললো, 'এবার গিয়ে খাব। পান খাবেন তো?'

খাই না। কিন্তু এখন না খেলে, পর্বটা বাকি থেকে যায়। বললাম, 'খাব।'

ঘোষাল মশাই বললেন, 'সানু, পুবদিকের ঘরে বিছানাটা পেতে দিস বাবা।'

তক্তপোষের ওপর সামান্য বিছানা। একপাশে একটা বড় কাঠের সিন্দুক। কুলুঙ্গিতে পাঁজি। কিন্তু নাকে সরষের তেল টেনেও, চোখে ঘুম নেই। নতুন ধানের গন্ধ চারদিকে। আমাকে মন্দিরটা টানছে। বাড়িটা এখন একেবারে নিঝুম। জামাটা গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পথে ঘাটে লোক প্রায় নেই।

শিবমন্দিরের দু'পাশে দুটো প্রাচীন গাছ। একটি বট। অন্যটি কদম। এখন পাতা ঝরার দিন। শুধু ছায়ায় নিবিড়। রোদের থেকে এই ছায়াটা ভালো লাগছে। রাস্তার দক্ষিণ গায়েই বাঁশঝাড়। আশে পাশে আরো কিছু আম কাঁঠালের গাছ। মাঝে মাঝে বনগাঁদার ঝাড়ে ফুল ফুটে আছে। মৌমাছির গুঞ্জন সেখানে।

মন্দিরের দাওয়ায় উঠে বসলাম। মন্দিরের শিকের দরজা বন্ধ। ভিতরে শিবলিঙ্গ দেখা যায়। একটা সিগারেট ধরালাম। মন মেরামত হচ্ছে।

'ঘুমোলেন না?' সানুদির স্বর।

ডানদিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি, বাঁশঝাড়ের ছায়া ঘেঁষে সে দাঁড়িয়ে। বোঝা গেল, ওখান দিয়ে ঘোষালবাড়ি যাতায়াতের পথ আছে। পুকুরের মাঝখান থেকে তখন, ওখানেই সানুদিকে দেখেছিলাম। এমন নিরালা বিজনে একটু চমকেই উঠেছিলাম। বললাম, 'ঘুম এল না।'

সানুদির চোখের তারায় চিকন হাসি। বলল, 'আমি কিন্তু আপনার সাঁতার কাটা দেখে গেছি।'

বললাম, 'জানি।'

সানুদির চোখের হাসিতে বিস্ময়, বলল, 'কেমন করে জানলেন?'

বললাম, 'পুকুর থেকেই দেখেছি। ওখানটাতেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন।'

সানুদি ঠোঁট টিপে, একটু ভুরু কোঁচকাল। তার সিঁদুর টিপ কাঁপল। তারপর হেসে বলল, 'বলেন নি তো?'

'কিন্তু জেনে গেলাম, আপনি কথা রেখেছেন।'

সানুদি এক পলক আমার চোখের দিকে তাকাল, তারপরে দূরের মাঠে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি ঘুমোতে গেলেন না?'

সানুদি তার কালো চোখে অবাক দৃষ্টি মেলে বলল, 'দিনের বেলা ঘুমোব? কাজ নেই? বাসন কোসন মেজে এলাম। এবার যাবো হাঁসগুলোকে একবার খেতে দিতে। ছাগলগুলোকে দিয়ে এসেছি শ্যামের পোড়োয় বেঁধে। এবার বাড়ি নিয়ে আসব।'

একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ছাগল আপনি নিয়ে আসবেন?

সানুদি হেসে বলল, 'আমার আর আছে কে বলুন? আমার কাজ তো আমাকেই করতে হবে।'

ছাগল বাড়ি আনা তার কাজ? কিছু না বলেই, জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। সানুদি যেন লজ্জা পেয়ে হাসল, বলল, 'এ বয়সে বাবার ঘাড়ের ওপর বসে তো খাওয়া চলে না, চলে কী? তাই ওই কিছু ছাগল পেলে, হাঁস পেলে, যা হোক কিছু পাই।'

মেরামতী মনটা কেমন একটা বিকল হয়ে উঠল। কথাটা মনে ছিল না, সানুদির স্বামীর ঘর থেকেও নেই। অতএব নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হয়। বড় ঘোষালের অবস্থা অনুমান করা যাচ্ছে। কিন্তু হাঁস ছাগলের আয় কতটুকু? জিজ্ঞেস করলাম, 'অনেক ডিম হয় বুঝি?'

সানুদি হেসে উঠে বলল, 'তা এখন উনিশটা হাঁসি আছে। ছাগলের দুধ দিই দু'বাড়িতে। ফি বছরে গোবরা বাউরিকে দিয়ে একটা দুটো খাসি বানাই। ওই করেই যা হোক সংসারে কিছু দিতে পারি। লেখাপড়া তো কিছু শিখি নি তেমন, শহরে গিয়ে কাজ করতে পারব না। পারলে যেতাম।'

না না, শীতের এমন উদাস বেলাটাকে ভার করে তুলতে ইচ্ছে নেই আমার। কিন্তু ছায়া যে তবু ঘনায়। ছায়া ঘনায় আরো কিছু কথা ভেবে। সানুদির বয়সটার কথা ভোলবার নয়। নিজের আয়ের যা হোক কিছু দুঃখের ভাতেও, তার নাতিদীর্ঘ শরীরের ঔজ্জ্বল্য চাপা পড়ে নি। উদ্ধত না হলেও, তার স্বাস্থ্যের দীপ্তি চোখে পড়ে। হাসিটি এখনো অম্লান, এখনো চোখের তারায় ঝিলিক। দীর্ঘশ্বাসগুলো প্রাণের কোথায় চাপা আছে? এখনো যে সে কুমারী।

'আচ্ছা, একটা কথা' সানুদি বলল, 'কলকাতায় নাকি আজকাল মেয়েরা গেঞ্জি কলে-টলে চাকরি করে? তার জন্যে তো লেখাপড়ার দরকার হয় না?'

কথাটা শুনেছে ঠিক, কিন্তু সানুদির পক্ষে সে কাজ সম্ভব না। বললাম, 'আপনার পোষাবে না। কলকাতায় কোথায় কার কাছে যাবেন? গেঞ্জি কলে কাজ করে ঘর ভাড়া দিয়ে, আপনি একলা থাকতে পারবেন?'

'তা অবিশ্যি ঠিক' সানুদি বলল, তারপরে ফিক করে একটু হেসে আবার বলল, 'তা আমার আর দোকলাই বা কী। গেলেই হলো। ভয় তো নষ্ট হয়ে যাবার, তাই না?'

আমি সানুদির চোখের দিকে তাকালাম। তার টানা চোখের কালো তারায় তেমনি চিকন হাসি। ঘাড়ে একটি জিজ্ঞাসার বাঁক। কথাটার জবাব দিতে পারছি না। আমার কথার আসল উদ্বেগটা তাই নয় কি?

হঠাৎ দক্ষিণ থেকেই একসঙ্গে অনেকগুলো হাঁসের আর্ত ডাক ভেসে এলো। মুহূর্তে সানুদির চোখের হাসি উদ্বেগে পরিণত হলো, বলল, 'এই রে, শেয়াল বেরিয়েছে বোধ হয়।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'দিনের বেলা শেয়াল?'

'ধান্দাবাজদের দিন আর রাত্তির সমান ভাই।' বলেই সানুদি পিছন ফিরে, প্রায় একটি বালিকার মতোই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল।

এই বয়সে ও রকম দৌড়টা সহজ না। দৌড় প্রতিযোগিতায় মেয়েরা কি এর থেকে জোরে দৌড়ুতে পারে? কিন্তু নিজের দিকে ফিরে দেখছি, মেরামত করা মনটা অনেকখানি বিকল হয়ে গিয়েছে। একে সারানো দরকার। তাকে দিদি বলে ডাকতে পারি। কারণ সে আমার বন্ধু পত্নীর দিদি। সেই সুবাদে দিদি ডাকলেও, সানু আমার থেকে বয়সে ছোট। পঁচিশ বছরের একটি মেয়েকে অনায়াসে তরুণী বলতে পারি। বিবাহ না হবার দুঃখ বুঝতে পারি। কিন্তু পাট চুকেছে, অথচ পালন হলো না কিছুই। নতুন করে আর কোনোকালে এক্ষেত্রে হবেও না। বিহিত আছে কিছু? ঘর নেই, বর নেই, একটি স্বাস্থ্যবতী শ্রীময়ী রমণী, শেয়াল তাড়াতে ছোটে। শ্যামের পোড়োয় ছাগল চরাতে যায়।

সানুদি নষ্ট হচ্ছে কী না জানি না। সংসারে কোথাও কিছু কি নষ্ট হচ্ছে না?

থাক ওসব, মন মেরামত করি।

শীতের বেলা যখন ছায়ায় নিবিড় হয়ে এলো, নিরু আর অমু ফিরল ইস্কুল থেকে। আমাকে দেখে, ওদের আকস্মিকতার চমকটা প্রায় অবিশ্বাস্য দেখাল। তারপরে খুশির উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল। খাওয়ার কথা ভুলে গেল। দশ কাহন জিজ্ঞাসা। তারপরে এক জবাব, 'এখন সাতদিন যাওয়া হবে না।'

তারপরে ওরা হাঁসের মতোই গপ্‌গপ্‌ করে খেল। নাচ দুয়ারের ঘাটে গা ধুয়ে এসে, জামা কাপড় বদলাল। চুল বাঁধল। মুখে হিমানি মাখল। সবই আমার চোখের সামনে। উদ্দেশ্য, আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে। ফিরে এসে রাতের রান্না রাঁধবে। শোনা গেল ঘোষালমশাই বাউরিপাড়ায় গিয়েছেন, যদি ভাগে খাসি কাটানো যায়। তবু নাকি কাকে মেমারিতে পাঠিয়েছেন মাছের সন্ধানে। ইতিমধ্যে একটা বিষয় আমার নজর এড়াল না। সানুদি এল, আমার সঙ্গে দু-একটা কথা হলো। কিন্তু নিরু অমুর সঙ্গে প্রায় একটি কথাও না। ওরাও যেন কেমন গম্ভীর মুখে ঠোঁট টিপে রইল।

বেড়াতে যাবার সময় সন্ধ্যের শাঁখ বাজল। জিজ্ঞেস করলাম, 'অন্ধকারে কোথায় যাব?'

নিরু বলল, 'আজ তো শুক্লাপক্ষের দ্বাদশী। এত বড় চাঁদ উঠবে। চলুন, সাঁকোর ধার থেকে বেড়িয়ে আসব।'

পাড়াগাঁ বলে এখনো বোঝা যায়। কারণ এই বয়সের মেয়েরা জানে, এটা শুক্লপক্ষ চলেছে। আজ দ্বাদশী। আমি আবার বললাম, 'সানুদিকে ডেকে নিয়ে গেলে হতো না?'

'সানুদি কেন?' নিরুর স্বরে যেমন তীব্রতা, তেমনি রুক্ষতা।

বললাম, 'এমনি। যদি যেতেন।'

নিরু বলল, 'কোনো দরকার নেই। ওর সঙ্গে আমরা কোথাও যাই না।'

ওদের ভাবে ভঙ্গিতে বোঝা উচিত ছিল আগেই। কিন্তু সানুদির অপরাধটা কী? সে-ই তো এ বাড়িতে রেঁধে বেড়ে ওবেলা আমাকে খাইয়েছে। ঘোষাল মশায়ের ব্যবহারে এ রকম কিছু দেখি নি। তবে মেয়েদের ব্যাপার বলে কিছু থাকতে পারে। কিছু জিজ্ঞাসাটা সমীচীন না।

মনটা আবার জোড়াতালি লাগতে আরম্ভ করল। পাড়াগাঁ এখনও আছে, এমন

একটি জ্যোছনা রাতে, সেটা আরো ভালো করে বোঝা যায়। কারণ জ্যোছনা দেখা যায়, মাখা যায়। আর এ জ্যোছনার কি ফিনিক! মন্দিরের কাছে জায়গাটা একেবারে বদলে গিয়েছে। গাছের নিবিড় ছায়ায়, আর জ্যোছনার আলোয়, সবই স্বপ্নের মতো অবাস্তব। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। নতুন ধানের সঙ্গে গাঁদা ফুলের হালকা গন্ধ ভাসছে। তার সঙ্গে নিরু আর অমুর মুখের হিমানীর গন্ধও পাচ্ছি। এমন পরিবেশে, মেয়েদের প্রসাধনের এই হিমানীটুকুর গন্ধ যে কখনো পায় নি, সে অনেক কিছুই পায় নি।

শিবের পুকুরের ধার দিয়ে, আমরা সাঁকোর দিকে গেলাম। সাঁকোয় পেঁছে, আকাশের দ্বাদশী চাঁদকে দেখলাম, নদীর বাঁকের স্রোতে ঝিলিমিলি খেলছে। নিরু জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে?'

জবাব কিছু নেই। তবু বলি, 'সুন্দর।'

'ওখানটায় শ্মশান।' চোদ্দ বছরের অমু আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, উত্তরের বাঁদিকে হাত তুলে দেখাল। বলল, চাপা ফিস ফিস স্বরে।

বললাম, 'যাবে নাকি?'

অমু আমার বুকের জামা খামচে ধরে শিউড়ে উঠে বলল, 'মা গো!'

নিরু হেসে উঠল। কারণ ওর ষোল বছর বয়স, ও বড়।

অমু বলল, 'আহা, হাসছিস যে বড়? তুই যেতে পারবি?'

নিরু বলল, 'আমি কি তাই বলছি?'

'তবে হাসিস না।' অমু ঝামটা দিয়ে বলল।

আমি হেসে বললাম, 'এ সময়ে সব থেকে ভালো গান গাওয়া। কে গাইবে?

'অমু।' নিরু প্রথমেই বলল।

অমু আবার মুখ ঝামটা দিল, 'আহা, নিজে গাইতে জানে বলে, প্রথমেই আমার নাম করা হচ্ছে।'

আমি নিরুর দিকে তাকালাম। জ্যোছনার আলোয় ওর চোখ চিকচিক করছে। বললাম, 'তাহলে নিরু গান ধর।'

নিরু লজ্জায় নানাবিধ আপত্তি জানিয়ে, শেষ পর্যন্ত গান ধরল, এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত, 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে......।' গানটা আমার প্রিয় না।

গান শেষ হবার আগেই, হঠাৎ চারটি সাইকেলে, চারজন আরোহী, উত্তর দিক থেকে সাঁকোর ওপর এসে পড়ল। সাঁকোয় তাদের গতি মন্থর হলো। একজনের গায়ে খাকি প্যান্ট শার্ট। আমাদের দিকে কয়েক পলক দেখে, তারা দ্রুত গ্রামের দিকে চলে গেল।

অমু সভয়ে বলে উঠল, 'ছোড়দি!'

নিরুর স্বরে উৎকণ্ঠা, বলল, 'হ্যাঁ। চল তাড়াতাড়ি। চলুন, বাড়ি যাই।' বলে আমার হাত ধরে টানল।

ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হলো না। লোকগুলোর আসা, আর ওদের কথা ও চোখ মুখের চেহারা, সব মিলিয়ে কেমন একটা অশুভ সূচনার ইঙ্গিত। চলতে চলতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে? ওরা কারা?'

নিরু বলল, 'পরে বলব।' তারপরেই হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এখান থেকে একলা যেতে পারবেন?'

বললাম, 'পারব।'

'তাহলে আমরা যাচ্ছি।' নিরু বলল, এবং দুজনেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল।

আমি খানিকটা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আস্তে আস্তে পা বাড়ালাম। নিরু আর অমু মুহূর্তেই অদৃশ্য। শিবের পুকুরের উত্তর তীরের কাছাকাছি আসতেই,

ডানদিকের তেঁতুলতলার কালো ছায়ায় কেউ যেন থমকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম। কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। আওয়াজ না দিয়ে পারলাম না, 'কে ওখানে?'

ছায়া থেকে ছায়ামূর্তি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এলো, কাছে এসে বলল, 'আপনি? ভালো হয়েছে।'

সানুদি। আমি কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই সে ঘোমটা টেনে দিয়ে, আমার হাত ধরে টেনে বলল, 'চলুন, নিজের বর তো কোনোদিন নিয়ে গেল না। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন, বউ নিয়ে চলেছেন, ঘোষাল বাড়ি যাবেন। তা হলেই হবে।'

সানুদির হাত-ধরা হয়ে পুকুর ধার দিয়ে এগিয়ে চললাম। আমার ভিতরের অন্ধকারে জিজ্ঞাসা আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু এখন বোধ হয় তার সময় নয়। কী ঘটতে যাচ্ছে জানি না।

এ সময়েই বাউরিপাড়ায় চিৎকার কোলাহল শোনা গেল। সানুদি বলে উঠল, 'আহ্, সব বোধ হয় ভাঙচুর করছে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কারা? কী ভাঙচুর করছে?'

'বলব। মন্দিরটা পার হই।' সানুদি বলল।

মন্দিরের কাছাকাছি আসতেই জ্যোছনাকে চমকে দিয়ে, মুখে টর্চের আলো পড়ল, গম্ভীর পুরুষ স্বর শোনা গেল, 'কে?'

বললাম, 'আমি। মুখ থেকে আলো সরান।'

আলো সরল, একজন এগিয়ে এলো। সেই খাকি শার্ট প্যাণ্ট পরা সাইকেল আরোহী। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবেন? কি নাম আপনার?'

লোকটির ঘন ঘন দৃষ্টি পড়ছে সানুদির দিকে। বললাম, 'ঘোষাল বাড়ি যাব।'

'এ কে?' লোকটি জিজ্ঞেস করল।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'এ নয়, ইনি বলুন। ইনি আমার স্ত্রী। আপনি কে জানতে পারি?'

লোকটি বোধ হয় একটু ধাতস্থ হলো, বলল, 'আমি আবগারি ইন্সপেক্টার। কিছু মনে করবেন না, আপনি বাইরে থেকে এসেছেন, জানেন না। মশাই ভদ্রাভদ্র লোক নেই বাড়ি-বাড়িতে চোলাই মদের ব্যবসা। মেয়েরাও 'বাদ যায় না।'

সানুদি স্পষ্ট স্বরে বলল, 'চলো, আমরা যাই।'

আমি যেন একটা দিগন্ত দেখতে পেলাম। ইন্সপেক্টারকে বললাম, 'ওহ, এই ব্যাপার! আমি তো আপনাদের সাঁকোর ওপর দিয়ে আসতে দেখলাম।'

ইন্সপেক্টার বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বটে। কিছু মনে করবেন না।'

'কিছু না।' বলে আমি সামনে এগোলাম।

সানুদি আমার হাতটা জোর করে ধরে, বাঁশঝাড়ের দিকে টেনে নিয়ে গেল। সংক্ষিপ্ত পথে, একেবারে বড় ঘোষালের নাচ দুয়ারে এসে পড়লাম। সানুদি ঘোমটা খুলে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'রাগ হচ্ছে তো?'

বললাম, 'কিন্তু কিছুই তো বুঝতে পারলাম না।'

'তোমার আর কি আছে ভাই।' সানুদি বলল, 'হাঁস ছাগল পেলে কি আর পেট চলে? বাবার সংসারটাও একটু আধটু দেখতে হয়। স্বামীর ঘর করলেও হয়তো দেখতে হতো। গোবরা বাউরির বাড়িতে চোলাইয়ের কাজ করি। অবিশ্যি নিজের খরচেই করি। আয় খারাপ না।'

মনটা কেমন বিষিয়ে উঠল। বিরক্ত হয়ে সানুদিকে কিছু বলতে গিয়ে জ্যোছনার আলোয় তার মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেলাম। না, চোখে জল-টল নেই, কিন্তু

মুখে এক অপরিসীম অসহায় লজ্জার ছাপ। বলল, 'রাগ করবেন না যেন, আর পুষির বরকে এসব বলবেন না। আপনাকে না পেলে, আজ মরতাম।'

'কেন, আপনাকে ওরা কী করবে?'

সানুদি গায়ের আঁচল সরিয়ে দেখাল। সাপের মতো কোমরের কাছে প্যাঁচানো সাইকেলের টিউব। আবার ঢাকা দিয়ে বলল, 'বড় দুঃখের ধন, নিয়ে পালিয়ে এসেছি। চলুন, আপনাকে মেজোকার বাড়ি দিয়ে আসি।'

রাত্রে খাবার পরে, নিরু আর অমুর সঙ্গে সব কথাই হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু তোমাদের ছোটবার কারণটা কী? তোমরা তো ওসব কর না।'

নিরু বলল, 'কী করব বলুন! এই কাজের জন্যে সানুদির মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু নিজেদেরই দিদি তো।'

তাও তো বটে। ভালো, এই কি আমার মন মেরামত? এ ভাবে বোধ হয় সংসারে কোথাও মন মেরামত হয় না। এখন দেখছি, ভিতরটা বেবাক বিকল হয়ে গিয়েছে। সানুদির মুখটা ভাসছে চোখের সামনে।

boiRboi.net

হারায়ে সেই মানুষে

মন চল যাই ভ্রমণে না। চল রে মন, মনে মনে। চলতে-চলতে দেখতে-দেখতে না। দেখে আসা, ছেড়ে আসা, সেই সে নিকুঞ্জে, যেথায় মন বিরাজে স্মৃতির ঘরে। তবে কী না, সেও এক প্রকারের ভ্রমণ। কী যেন সেই বলে তোমাদের বিদেশিয়া বয়ানে, রিটার্ন জার্নি। ফেরত যাত্রা—প্রত্যাবর্তন। ফেরত যাত্রা—মনে মনে। কিন্তু সে দুস্তর পথ, বহু দূর দেশ। বিশাল জনস্রোত। চোখের জলে ধোয়া, হাসিতে মোছানো, ঝকঝকে হাজারো বৃত্তান্ত। সেই অকূলে পাড়ি দেবো, দিতে গিয়ে ঘাটে ঘাটে ভিড়ব, নগর মানুষের কথা বলব, মনের এই ফেরত যাত্রায়, এবারে তা সম্ভব না। দেহে যতই বাঁধো, মন কারোর দাস না। আজ মন চলেছে, মনে মনে, ছেড়ে-আসা-কালের এক ছবিতে। ছবি না, এক পুরনো খেলার পরিচ্ছেদে। চল যাই, সেই এক পরিচ্ছেদে।

সেই এক পরিচ্ছেদে, যেথায় অকূল কালিয়া বিল কল-কল ছল-ছল, ঢেউ ফণা-তোলা। সেই বিলের এক কূলের দুস্তর ঢালু চর, নেমেছে গিয়ে শীতলক্ষা নামে নদী-গহীনের বুকে। বিলের আকাশে যখন মেঘ ভেসে আসে, বিল তখন শীতলক্ষার দিকে চেয়ে জপ করে। তার কূল ভাসাবার মন্ত্র পড়ে। বর্ষা নামতে না নামতেই, শীতলক্ষ্য ছুটে আসে বিলে। সেই কোলাকুলি হল, কোনো এক ভূমির কূলে রেখে যাওয়া, আপন তনুজার সঙ্গে। মায়ের সঙ্গে মেয়ের স্নেহ-কোলাকুলি, লক্ষা মিলে বিলে। হ্যাঁ, শীতলক্ষার কূলবাসীরা, নদীকে ডাক-নামে ডাকে, লক্ষা।

বিলের আর এক কূলে উঁচু ভূমি, সোনার ডাঙা। ঋতুতে ঋতুতে ফসলের বর্ণ-বাহার। ধান আর পাট, সরষে তিল আখ, মটর মশুর আর ছোলা। ঋতুতে ঋতুতে চোখ-জুড়ানো হরিৎ আর হরিদ্রা। হরিতের সঙ্গে মেলে মেঘ আর মেঘ-রৌদ্রের খেলা। তখন ধান আর পাট। হরিদ্রা তখন মাঠে মাঠে ফুল ফোটায়, তখন আকাশ নীল, শীত কন্-কন্, মিষ্টি রোদ। যখন সরষে আর তিল ফুল, মটর মশুরের শিশিরে ভেজা নীল আর বেগুনি ফুলের হাসি। তারপরে গ্রাম। বট অশ্বত্থ আম জাম কাঁঠাল, তেঁতুল রোয়াইল লটকন ডেউয়া ড্যাফল, সুপুরি আর বাঁশের ঝাড়ের নিবিড় ছায়ায়, এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম।

বর্ধিষ্ণু, কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে, সেই নিবিড় গাছপালার মধ্যে, একটি বাড়ির টিনে-কোঠার ছাদ দেখা যায়। সারা গ্রামে একটি পাকা বাড়ি। আর সব টিনের ছনের ঘর, খুঁটি পোঁতা বাঁশ ছ্যাঁচা বেড়া, মাটির দাওয়া, গোবরে নিকানো। চালে চালে সীম লাউয়ের মাচা। মাঝখানে গোবরে নিকানো বিশাল উঠোন। চার দিকে চার ঘর। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম, চার দিকে চার ভিটা। যে বাড়িতে যাও, এক দৃশ্য। তিন ভিটার তিন দিকে পথ পাবে, গ্রামের যেদিকে খুশি হাঁটা দাও। একদিক বন্ধ। বন্ধ না, পাশে পাটখড়ির বেড়া। যাকে বলে পাটকাটি, তাতেও যদি অ-বুঝ লাগে, তবে বাঁশ পাকাটি। মোটা মোটা পাটখড়ির বেড়া, দু-দিক থেকে এসে, মাঝখান দিয়ে যাতায়াতের রাস্তা

রেখেছে। কিন্তু বেড়া বাঁধার কেরামতি আছে, যাতায়াতের পথ এমন ভাবে তৈরি, বেড়ার ওপারে কী দৃশ্য কী বৃত্তান্ত, তা দেখতে জানতে পাবে না। পাটখড়ির গায়ে লেপা আছে মাটি। এই সব বাড়ির সেই হল অন্দর মহল।

সামনের বিশাল উঠোনে পাবে, রোদ পোহানো ফসল। ওটা সদর দুয়ারের উঠোন। পাছ-দুয়ারের উঠোন হল ছোট। সেখানে ঝি-বউদের রাজত্ব। সেখানে রান্নাঘর, রান্নাঘরের পাশে বেড়া ছাড়া, চাল দিয়ে ঢাকা আর এক ঘর, পেল্লায় জোড়া উনোন, ধান সেদ্ধর ঘর। তার একপাশে ঢেঁকি-ঘর, জাঁতা পেষাইয়ের কোণ্। তার পাশে ধানের গোলা, গাবের আঠা দিয়ে মাজা, খয়েরি রং চকচকে। গোলার মুখের কাছে, সিঁদুরের স্বস্তিকা আঁকা।

এই সবের পিছনেই পাবে, চার দিকে বেড়া ঘেরা কিছু খোলা জায়গা। দু-একটা আম জাম কাঁঠালের ছায়ায় আর রোদে, বেগুন আর ডেঙোডাঁটার চাষ। রান্নাঘরের প্রয়োজনে। তারপরে ছোট একটি পুকুর, গাছের গুঁড়ি পেতে ধাপে ধাপে সিঁড়ি। চারপাশে নিবিড় গাছপালা। সেখানে বাসন ধোয়া, পাটে কাপড় কাচা, আর ঝুপ ঝুপ ডুব কেবল নয়, দেখ গিয়ে, কালো গভীর জলে, বধূর অঙ্গ ভাসে। কাজের বাহু তখন মৃণাল ভুজের খেলায়, আলতা পরা পায়ের নৃত্যে, জল ছিটোয়।

এখন বর্ণনা থাক। মন চল মনে মনে, মন-পবনের ডিঙা ভাসিয়ে, ফিরে যাই সেই গ্রামে। তার আগে বল, এমন একটি গ্রাম, বঙ্গের কোন্ অঙ্গে বিরাজ করে। বিশেষ করে, সেই একটি গ্রাম, যেথায় মন চলে ফেলে-আসা-কালের এক ছবিতে। তবে চল পূবে। মানচিত্রখানি খুলে ধরে দেখ, জেলার নাম ঢাকা। মহকুমা নারায়ণগঞ্জ। মহকুমার সদরে গিয়ে কাজ নেই, মস্ত এক বন্দর। নৌকা জাহাজের গাঁদি, তাদের মাস্তুলে আকাশ বেঁধানো। নদী শীতলক্ষ্যা।

আমার যাত্রা বুড়িগঙ্গার কূল থেকে। জমজমাট শহর ঢাকার, জমপেষ গলি, পঁচিশ নম্বর জীয়স লেন থেকে। ঠিকানা বাতলে দিই। ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে ওঠ, তারপরে শোন কথাশিল্পী ঢাকার ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানের কথা, 'চল্‌রে পঙ্খীরাজ, ছোটকা বাবুরে উড়াইয়া লইয়া চল্। বাবু আমার বুইনের বাড়ি যায়, ইস্টিশনে র‍্যালগাড়ি ধরাইতে হইব। আইজ তর কপালে হালায় দানার উপুর দানা। ভাড়া এক ট্যাহা, (টাকা) ছোটকা বাবুর বুনই (ভগ্নিপতি) তার উপুরে দিবো আরো দুই ট্যাহা।'

বোনাই কখনো এমন কথা মুখ থেকে খসায় নি। ওটা হল গাড়োয়ানের প্রার্থনার ভাষা। চলতে চলতে এমন অনেক কথা শুনতে পাবে। তারপরে চল, একরামপুর থেকে লক্ষীবাজারের পথ ধরে। লক্ষীবাজারের শেষে, রেলিং-ঘেরা গোল ময়দান, নাম ভিক্টোরিয়া পার্ক। কাছে-পিঠে আর একটু দূরে, দেখতে পাবে, নর্মাল ইস্কুল, কলেজিয়েট ইস্কুল, মেডিকেল ইস্কুল, একটু দূরে জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ। ঘোড়ার গাড়ি না থেমে, টগবগ টগবগ চলছে নবাবপুরের দিকে। বাঁয়ে থাকবে জজেস কোর্ট, ডাইনে রেস্তোরাঁ সিনেমা। পোল পেরোবার আগে, রায়সাহেবের বাজার। তারপরে বসাকদের রাজত্ব। নবাবপুরের বসাক, জানবে লক্ষ্মীর বরপুত্র, রূপকথার মতন, সোনায়-দানায় ভরা। সোনার পালঙ্ক চোখে দেখা ঘটে নি। কিন্তু হাতীর পিঠে, হাওদায় পাতা, সোনা দিয়ে মোড়া, মখমলের গদী দেখেছি। সোনার ঝালর দিয়ে মোড়া মখমলের চাদর দেখেছি, ঘোড়ার পিঠে পাতা। বসাকদের বাড়ি বাড়ি অনেক ঐশ্বর্য দেখেছি, ভোগ দেখেছি। কিন্তু সে আর এক কাহিনী।

আজ মন-পবনের ডিঙা ভেসেছে, এক গ্রামের পথে। নবাবপুরের শেষে রেললাইন, তারপরে শুরু ধানমণ্ডি আর রমনা। ওদিকে যাবার দরকার নেই। বাঁয়ে চল, ইস্টিশনের

পথে। বলতে পারো, ঢাকা ইস্টিশন। কিন্তু তার একটি আদরের নাম আছে, ফুলবেড়িয়া। সেখানে রেলগাড়ি। আরো একটু পৌঁছিয়ে যাবো নাকি? বাবা-পিতামহের কালে? তা হলে আর রেলগাড়ি না, বল হাওয়ার গাড়ি। দুপুরবেলা, বউদি-দিদিদের জমজমাট আসরে, আমাদের পরিচয় পুরুষমানুষ ছিল না, ছিল পোলাপান। তাই প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না। তাদের মজলিশি মেজাজের গান শুনেছি :

হাওয়ার গাড়ি চলে গেল, গো
আমার বন্ধু এল না।
কলকাতার রেশমী চুড়ি এনে দিল না।

ওসব গান, শহুরে বউদি-দিদিদের কাছে ছিল হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার। কিন্তু আমার নিজের বউদি, তাঁর সরু মিষ্টি স্বরে যখন সেই কলি কয়টি গুণ গুণ করত, আমি হাঁ করে শুনতাম। কেননা, আমার দাদা যে সত্যি কলকাতায় থাকতেন। বউদি ঢাকায়। হাওয়ার গাড়ি রোজই চলে যেত। ভাবতাম, বউদির বড় কষ্ট। দাদা রেশমী চুড়ি এনে দেয় না।

পরে, অনেক পরে, বড় হয়ে বুঝেছি, সেই গ্রাম্য গানের কলি ক'টিতে, যতই হাসি-ঠাট্টা থাক, সেও বউদির বিরহেরই গান। সে কথা থাক, আজ চল সেই গ্রামে। তবে হাওয়ার গাড়ি যে রেলগাড়িকে বলে ছেলেবেলায় শুনেছি, কারণ জানতাম না। বড় হয়ে জেনেছি, যাকে বলে বাষ্প-চালিত গাড়ি কিংবা বল বাষ্পীয় শকট, তারই সেকালের গ্রামীণ নাম হাওয়ার গাড়ি।

ইষ্টিশনে আসা হল, সাঁঝ-বেলাবেলি। রাতের বেলায় গাড়ি। গাড়ি যখন চলে, তখন শোন, কে যেন তালে তালে বাজায় ডুগ্‌ডুগি। মাঝে মাঝে একতারাটার বাঁধনে ঢিল দিয়ে, কে যেন আওয়াজ তোলে, গ্যাঁও গ্যাঁও। শরীরে লেগে যায় তাল। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে, চোখের তারা দীপ্ত হয়ে উঠবে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, তবু যেন কী দেখা যায়। তবু যেন কী ভেসে ওঠে চোখের সামনে। চোখ কি মন, তা কি তুমি জানো হে। জানো না। কেবল দেখবে, রাতের গাড়ি চলে, যেন পক্ষীরাজ ওড়ে। পিছনে পড়ে থাকে, কত না দেশ-দেশান্তর, রাজ্য-রাজত্ব, পাহাড় নদ-নদী। গভীর জঙ্গলে বাঘ সিংহ হাতী অজগর ফোঁসে। কত রাক্ষস-খোক্কস, আঁউ-মাঁউ-খাঁউ চিৎকার করে। তারই মধ্যে গম্ গম্ শব্দে সেতু পেরিয়ে যায়। রাতের গাড়ি জানবে চির-রহস্যে ভরা। তারপরে কখন ঘুম নামে চোখে, চক্ষের পাতা দুটোও জানতে পারে না।

ঘুম ভাঙে না, ভাঙানো হয়। রেলগাড়ির যাত্রা শেষ। তখনো রাতের ছায়া যায় না। ঘুম-চোখে, তিন ধাপ পা-দানি নেমে মাটি পাবে। কেরোসিনের টিমটিমে আলোয়, ইস্টিশনের নাম চোখে পড়বে। পড়তে একটু সময় লাগে: 'জিনারাদি।' সেখান থেকে পদযাত্রা, গ্রামের দূরত্ব দুই ক্রোশ।

মন, এবারে সহজে চল। বৃত্তান্ত বল। কোথা যাও, কেন যাও, কে তুমি?

তবে বলি, বালক দ্বাদশ বর্ষীয়। আগে বলেছি, এলাম বুড়িগঙ্গার কূল থেকে। ঠিকানা দিয়েছি পূর্বেই। জমাট শহর, ঘিঞ্জি গলি, পঁচিশ নম্বর জীয়স লেন থেকে। পৌরসভার পরিচয় চাও? তাও বলি, এক নম্বর ওয়ার্ড। চলেছি দিদির শ্বশুরবাড়ি। সপ্তদশী দিদি, সঙ্গে ভগ্নিপতি। এ যাত্রা-ই, শ্বশুরবাড়িতে, দিদির প্রথম যাত্রা না। এটা দ্বিতীয় যাত্রা। বিয়ের পরে, একবার শ্বশুরবাড়ি ঘুরে গিয়েছে। ছ'মাস পরে, এই দ্বিতীয় যাত্রার সঙ্গী, আমি কনিষ্ঠতম ভ্রাতা। প্রথম বারে, কেঁদে-কেটেও, বাড়ির কারোর মন গলাতে পারি নি। বাবা মা দাদারা যে কত নিষ্ঠুর, তা জানতেন একমাত্র লক্ষ্মীনারায়ণজী। যিনি অবস্থান করতেন, লক্ষ্মীবাজার থেকে, কে. জি গুপ্তের

লেনের এক প্রাচীন বিশাল অট্টালিকার দ্বিতল মন্দিরে। অনেকবার সেই মন্দিরে গিয়েছি। বিগ্রহের সামনে যে প্রকাণ্ড ঘণ্টাটি আছে, বাজিয়ে ঠাকুরকে জাগানোর জন্য. জানানোর জন্য. সেটা একদিনও বাজাতে পারি না। পারব কেমন করে, হাত দিয়ে যে নাগাল পাই না। ঠাকুর জাগলে, মনের কথা শুনবে, তাও কেবলমাত্র বড়দের। সবই বড়দের জন্য। ছোটদের জন্য কিছু না। মনে বড় দুঃখ। ভাবি, লক্ষ্মীনারায়ণজীকে জানাতে পারলাম না বলেই, দিদির সংগে প্রথম বারের যাত্রা ফসকে গিয়েছিল। কিন্তু এটা তো জানি. ঠাকুরের চোখে কিছু ফাঁকি যায় না। সে অন্তর্যামী। বাবা-মা যে কত নির্দয়, তা সে ভালো করেই জানত। তাই, প্রথম বারের কান্নাটা বিফলে যায় নি। লক্ষ্মীনারাণজী তা দেখতে পেয়েছিল। অতএব দ্বিতীয় বারে বর, তথাস্তু।

কিন্তু তার আগে অনেক উপদেশ নির্দেশ শুনতে হল। মনে রাখবে, যাচ্ছ দিদির শ্বশুরবাড়ি। প্রথম নির্দেশই হল. দিদিকে সেখানে 'তুই' বলে ডাকা চলবে না। সে যে কী কঠিন কাজ, তা বাবা-মাকে কেমন করে বোঝাব। জন্মের পরে, প্রথম যেদিন ডাকতে শিখেছি, 'তুই' বলে ডেকেছি। সেই সম্বোধন আমার রক্তে। দিদিকে 'তুমি' বলে ডাকব কেমন করে? ভাবলে হাসি পায়, লজ্জা করে। মনে হয়, দিদিকে ডাকছি না, আর কারোকে। দিদিরও চোখে-মুখে দেখেছি. বিব্রত ভাব, অস্বস্তি। শুনতে অভ্যস্ত না।

কিন্তু বালক, এখন বাবা-মায়ের সামনে. সুবোধ বালকের মতন ঘুট ঘুট ঘাড় নেড়ে যাও। যাহা আদেশ করিবে, তাহাই মানিয়া চলিব। পরে যখন গাছে উঠিবে, তখন হনুমানের লাঙুল বাহির হইয়া পড়িবে। প্রথম নির্দেশের পরে, বাকীগুলোতেও, ঘাড় এক ভাবেই নাড়া খেল। গুরুজনদের প্রণাম করতে হবে। দিদির ভাসুরঠাকুর মহাশয়ের ছেলেমেয়েরা আছে। কোনো কারণেই যেন তাদের সংগে ঝগড়া বিবাদ মারামারি না করা হয়। দিদির কথা শুনে চলতে হবে, ওকে যেন অমান্য করা না হয়, বিশেষ করে, রাগের মাথায়, কখনোই যেন দিদির চুল টেনে, ঘোমটা খুলে, মাটিতে পেড়ে ফেলা না হয়। কেন না, এ রকম ঘটনা বাড়িতে ঘটলেও, শ্বশুরবাড়িতে একেবারেই না। তাহলে বেত্রাঘাত থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। একলা একলা ক্ষেতে বা বিলের ধারে যেন না যাওয়া হয়। যখন-তখন যেন খেতে না চাওয়া হয় ইত্যাদি।

ইথেই বুঝহ বন্ধুগণ. আমি কেমন সুবোধ বালক। তাও আমার দু'বছরের বড়, মেজদা সংগে নেই। তাহলে বলা যেত, একা রামে রক্ষা নেই. সুগ্রীব দোসর। তা বলে ভেবো না, বালকের আত্মসম্মান বোধ নেই। তা আছে। কিন্তু আপন প্রকৃতিটি তো ত্যাগ করতে পারি না। মাঠ দেখলে ছুটতে ইচ্ছা করে, জল দেখলে সাঁতার কাটতে ইচ্ছা করে, গাছ দেখলে উঠতে ইচ্ছা করে, ফল দেখলে ঢিল মারতে ইচ্ছা করে। এবং সেই সব বিষয়ে, সমবয়সীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলে, অথবা বাধা পেলে, যুদ্ধও অনিবার্য। আর খিদে পেলে, খেতে চাইব না, এমন কথা তো ভূ-ভারতে শুনি নি।

এখন মনের কথা মনে রাখো। আগে চল তো। সব দেখা যাক, শোনা যাক। তারপরে তুমি তোমার, আমি আমার।

জিনারদি ইস্টিশন। দেখতে দেখতে রাতের ছায়া শেষ। আকাশে, আলো দেখা দিল। দেখি, দিদির মাথায় এখন আর শুধু মুখ-ঢাকা ঘোমটা না। গায়ে আবার একটা রেশমী চাদর। দেখাচ্ছে যেন একটা জবুথবু বুড়ি। বোরখা-ঢাকা মুসলমান মেয়েদের জন্ম থেকেই দেখে আসছি। এ যেন তার চেয়েও বিচ্ছিরি। দিদির শাঁখা চুড়ি রুলি পরা হাত দুটো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। একটা ট্রাঙ্কের ওপর দিদি বসেছে।

ভগ্নিপতি তখন যাঁর সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁকে আমি চিনি। তিনি হলেন, ভগ্নিপতির বড় দাদা। দিদির বিয়ের সময় দেখেছি। বেশ শক্ত সমর্থ লম্বা চেহারা। চোখ-মুখও বেশ ভালো। কিন্তু মুশকিল হল, পোশাকে আশাকে, মোটেও আমার জামাইবাবুর মতন না। তাঁর ফিনফিনে মিলের ধুতি, কোঁচা লোটানো। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী। গোঁফ-দাড়ি কামানো ঝকঝকে মুখ। পায়ে চকচকে গ্রীসিয়ান কাট পাম শু্য। হাতে ঝকঝক করছে ঘড়ি। আর তাঁর দাদাকে দেখ। মোটা একটা ধুতি, তাও পায়ের পাতা থেকে ওপরে। গায়ের ঢলঢলে হাতা মোটা পাঞ্জাবীটা অতিরিক্ত নীল দেওয়া। পায়ে ফিতেওয়ালা কালো জুতো। তার দু-এক জায়গায় মাটি লেগেছে। বুকপকেটে পকেট-ঘড়ির সুতো দেখা যাচ্ছে। হাতে মোটা একগাছা লাঠি। একেবারে গ্রাম্য। গেঁয়ো যাকে বলে। অথচ জামাইবাবুর থেকে এমন কিছু বড় দেখাচ্ছে না। দেখলাম, ছোট ভাই গিয়ে, বড় ভাইকে প্রণাম করলেন। বড় ভাই মাথা নেড়ে বললেন, 'থাউক থাউক।'

বলে দিদির দিকে তাকাতে গিয়ে, আমার দিকে চোখ পড়ল। হেসে ডাকলেন, 'আইয়ো ভাই, আইয়ো।'

আমি মোটেই সে পাত্র নই! আর একটু দিদির কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালাম। গায়ে একটু স্পর্শ পেলাম, সেই সঙ্গে চুড়ি রুলির ঝনাৎকার। দিদি ঘোমটার ভিতর থেকে, ফিস ফিস করে আমাকে ডাকল। আমি দিদির কাছে ঘন হয়ে, মাথা নিচু করে, ঘোমটার ফাঁকে ওর মুখ দেখতে চেষ্টা করলাম। খুব ইচ্ছা করছে, একটানে ওর ঘোমটাটা টেনে খুলে দিই। কিন্তু একেবারে নতুন জায়গা, ভগ্নিপতির বড় ভাই সামনে দাঁড়িয়ে। আরো কয়েকজন যাত্রী এদিকে ওদিকে। তার মধ্যে লুঙ্গি পরা, দাড়িয়ালা মিয়া সাহেবও আছে। সবাই আমাদেরই দেখছে। ঠিক ভরসা পেলাম না।

দিদি নিজেই ঘোমটা একটু ফাঁক করে, আমার দিকে তাকাল। ওর গায়ে সেন্ট-পাউডারের গন্ধ। নাকছাবি পরা মুখটা যেন এখন অন্য রকম দেখাচ্ছে। যেন ও আমার সেই দিদিটা না, কোন্ বাড়ির একটা বউ। ভাবলে মন মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ও আমাকে ফিস ফিস করে বলল, 'বট্‌ঠাকুরকে প্রণাম কর গে।'

মনে রাখতে হবে, লিখনে পশ্চিমা। বচন কিন্তু সব পুরবিয়া। বট্‌ঠাকুর কথাটা এই প্রথম ওর মুখে শুনলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কার কথা বলছিস?'

দিদি একটু চোখ পাকালো। বলল, 'আমাকে 'তুই' করে বলছিস? বাড়ি থেকে বারণ করে দিয়েছে না?'

যে যায় লঙ্কায়, সে-ই হয় রাবণ। বললাম, 'ওসব আমি পারব না।'

দিদি এক মুহূর্ত আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। বোধ হয় বুঝল, এখন এই ইস্টিশনে সুবিধা হবে না। বলল, 'আচ্ছা, এখন যা, বট্‌ঠাকুর ডাকছেন ওঁকে প্রণাম করে আয়।'

একবার তাঁকে দেখে নিয়ে বললাম, 'তোর ওই ভাসুরটাকে? আমি করব না।'

দিদি এবার ঘোমটার মধ্যে চোখ রাঙাল, বলল, 'ছি ছি ছি, গুরুজনদের সম্পর্কে এ রকম করে বলছিস? বাড়ি থেকে কী বলে দিয়েছে, মনে নেই?'

বললাম, 'তোর ভাসুরকে চাষার মতন দেখাচ্ছে।'

দিদি চোখ আরো বড় করে রাঙাল। ফিস ফিস করেই ধমক দিয়ে বলল 'আবার! খুব খারাপ হচ্ছে বলে দিচ্ছি। আমি বাড়ি গিয়েই বাবাকে চিঠিতে লিখে সব জানাব। যা, শীগগির নমস্কার করে আয়, তা না হলে উনি ভাববেন তুই একটা অভদ্র।'

উনি কী ভাববেন, সেটা বড় কথা না। বাবার ফরসা রাঙা রাগী মুখটাই আমার চোখে ভেসে উঠল। দিদি যদি চিঠিতে লিখে দেয়, তাহলে ব্যাপার খুব সুবিধার

হবে না। মুখটা যাচ্ছেতাই করে, দিদিকে জিভ ভেংচে দিলাম, বললাম, 'পেত্নি।'

তারপরে ভগ্নিপতির দাদার কাছে এগিয়ে গেলাম। নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। পা ছুঁতে না ছুঁতেই, তাঁর বড় বড় শক্ত দুই হাতে, আমাকে ছোঁ মেরে, বুকের কাছে তুলে নিলেন। গাল টিপে দিয়ে, আদর করে বললেন, 'এসো ভাইটি আমার, এসো। কী সুন্দর ছেলে। রাত্রে গাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলে তো?'

মনে মনে খুশি হলাম। লজ্জাও করল। তাঁর স্নেহ এবং সহৃদয় ব্যবহারেও একটি গ্রাম্য লোককেই দেখতে পেলাম। কিন্তু তাঁকে আমার ভালো লাগল।

'ঘুমিয়েছি।'

জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি তোমার কে হই বল তো?'

আমি যেন আরো লজ্জিত হয়ে পড়লাম। বললাম, 'জানি না।'

তিনি হা হা করে হেসে উঠলেন। জামাইবাবুও তাঁর সঙ্গে হেসে উঠলেন। আমাকে বললেন, 'জানো না কেন? উনি তোমার বেয়াইমশাই হন।'

আমাদের পুরবিয়ার চালটা তখনো তাই। ভগ্নিপতির ভাইয়েরা হলেন বেয়াই। কিন্তু জামাইবাবুই আবার বলে দিলেন, 'তবে বেয়াইমশাই বলতে হবে না। তুমি ওঁকে দাদা বলেই ডেকো।'

ওঁর নাম সুরেন্দ্রনাথ। ছোট ভাইয়ের নাম যোগেন্দ্রনাথ। যিনি আমার ভগ্নিপতি। জানি ওঁদের আর এক ছোট ভাই আছেন, বীরেন্দ্রনাথ। এখনো অবিবাহিত। তাঁকে দেখেছি, দিদির বিয়ের সময়। সুরেন্দ্রনাথ আরো একটু সময় আমাকে তাঁর গায়ের কাছে জড়িয়ে ধরে রইলেন। এমন সময় দেখতে পেলাম, ইস্টিশনের বাইরে বেহারারা পালকি এনে নামাল। তাদের সঙ্গে আর একজন। খাটো ধুতি পরা, গায়ে একটা নীল রংয়ের জামা। কাঁধে গামছা, হাতে লাঠি। বয়স বিশ-পঁচিশের বেশি না।

সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রে কালা, এত দেরি করলি যে?'

কালা তো কালাই, একেবারে মিশমিশে। কিন্তু দাঁতগুলো ঝকঝকে সাদা। বলল, 'আর বলেন কেন কত্তা, রাম বেহারার সর্দি-জ্বর হয়েছে। তখন আবার আর একজনকে খুঁজতে গিয়ে দেরি হল।'

যোগেন্দ্রনাথ বললেন, 'রোদ উঠে পড়বে, আর দেরি না করাই ভালো। রওনা দেওয়া যাক। করিম আসেনি?'

কালা বলল, 'এসেছে, টিউব-কলে জল খায়।'

সুরেন্দ্রনাথ ভাইকে বললেন, 'নে, বউমাকে উঠতে বল্। পালকিতে গিয়ে ভাইকে নিয়ে বসুক। কালা আর করিম মালপত্র নিয়ে হাঁটা দিক।'

জামাইবাবু দিদিকে গিয়ে বললেন, 'এসো।'

দিদি সেই ঘোমটা-ঢাকা চাদর-জড়ানো, জবুথবু ভাবেই উঠে দাঁড়াল। আমাকে হাতের কাছে পেয়ে, হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত ধরল। ভালো করে সব কিছু দেখতে পাচ্ছে না, পড়ে যাবার ভয়। সুরেন্দ্রনাথ ইস্টিশনের অন্যদিকে কোথায় চলে গেলেন। জামাইবাবু বললেন, 'দাদা কাছে নেই, ঘোমটা একটু সরিয়ে নিয়ে চল।'

দিদি ঘোমটা একটু সরিয়ে, চারপাশে তাড়াতাড়ি একবার চোখ বুলিয়ে নিল। জামাইবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হল। বলল, 'বাবা, আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। বটঠাকুরকে নিয়ে তুমি আগে আগে যেও, আমি পালকির দরজা বন্ধ করে থাকতে পারব না।'

জামাইবাবু হেসে বললেন, 'রাস্তার লোকে যখন বউয়ের মুখ দেখে ফেলবে?'

দিদি বলল, 'দেখুক। দম বন্ধ হয়ে মরব নাকি?'

জামাইবাবু বললেন, 'আগের বার তো বেশ গিয়েছিলে।'

'সেবার প্রথম। এবার পারব না।'

'কাপড় ঢাকা দেওয়া থাকবে। হাত দিয়ে তুলে রেখো। লোক দেখলে নামিয়ে দিও।'

'পালকিতে আমার গা গুলোয়। যদি বমি পায়?'

'ভাইকে দিয়ে, বেহারাদের পালকি নামাতে বোলো।'

দিদি ভুরু কুঁচকে বলল, 'ভারি যন্ত্রণা।'

জামাইবাবু বললেন, 'কী আর করবে। এখন তো আর তুমি শহরের মেয়ে না। গ্রামের বউ।'

দিদি ঘোমটাটা একটু বেশি তুলে, জামাইবাবুর মুখের দিকে তাকাল। বলল, 'না হলেই ভালো ছিল দেখছি।'

জামাইবাবু হেসে বললেন, 'তোমার কপাল।'

এসব কথার কী অর্থ, তা বুঝি না। ঝগড়া-বিবাদ না, এইটুকু অনুমান করতে পারছি। দিদির হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে, আমি পালকির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আগেও অনেক পালকি দেখেছি কিন্তু তার গায়ে এমন চিত্রবিচিত্র আঁকা দেখিনি। পালকিটার গায়ে লাল-নীল রং দিয়ে ফুল-লতা-পাতা আঁকা। মস্তবড় একটা মোটা কাপড় পালকির মাথায়, গুটিয়ে রাখা হয়েছে। কালা পালকির মধ্যে চাদর পেতে দিল। একটা বালিশ ঢুকিয়ে দিল। দিদি গিয়ে তার মধ্যে বসল। জামাইবাবুকে দেখে, বেহারারা কাছে এসে প্রণাম করল। আমাকে একজন পান-খাওয়া দাঁতে হেসে বলল, 'তুমিও যাইতানি কোহন বাবু?'

এটাই হল, দিদির শ্বশুরবাড়ির লোকদের উচ্চারণ আর ভাষার রীতি। বুড়িগঙ্গা ধলেশ্বরী আর পদ্মাপারের ঢাকার লোকেরা এ রকম করে কথা বলে না। মানিকগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ মহকুমার অধিবাসীদের উচ্চারণ আলাদা। এই অঞ্চল ময়মনসিংহের কাছা-কাছি, উচ্চারণ আর সুরের প্রবণতাও সেই দিকে। তাছাড়া আরো খবর জানি। এ দেশকে, আমাদের দেশের লোকেরা বলে, পারজোয়ারের দেশ। মানে জিজ্ঞেস করো না। বলতে পারব না। তবে এইটুকু জানি, বিক্রমপুরের অধিবাসী, আমার কুলিন কায়স্থ পিতা, দিদির বিয়েতে প্রথমে এই কারণেই আপত্তি তুলেছিলেন। 'পারজো-য়ারের দেশে মেয়ের বিয়ে দেবো না।'

সেই নিয়ে অনেক অশান্তি হয়েছিল। কেন পারজোয়ারের দেশ, কী তার অপরাধ, কিছুই জানি না। কিন্তু পরে যে কথাটা বুঝেছি, তা হল, প্রেম না মানে দেশ-কালের সীমানা। দিদি-জামাইবাবুর বিয়েতে, সেই একটা ব্যাপার ছিল। আমরা তো ছেলে-মানুষ, আমাদের বুঝতে নেই, ভাবতে নেই, জানতে নেই, কইতে তো নেই-ই। কিন্তু দেখ, তোমাদের বলি, শিশু বালক বলে আমাদের বোধ-বুদ্ধিহীন কানা কালা জড়পদার্থ মনে করো না। বিয়ের আগে যোগেন্দ্রনাথ মহাশয়কে, অনেক দিনই দেখেছি, দিদির দিকে যখন তাকান, তখন তাঁর চোখ-মুখের ভাব আলাদা। কথা যখন বলেন, তাঁর স্বর সুর কথার ধাঁচ অন্য রকম। দিদিরও তা-ই। ওর মুখের হাসি যেত বদলে, দৃষ্টি অন্য রকম। দেখে বিশ্বাস করতাম না, এই দিদি চান করতে না চাইলে, কেমন ভাবে কুয়োর পাড়ের শানে নিয়ে ফেলত। গামছা দিয়ে ঘষে ঘষে চান করাত। গায়ে সাবান মাখিয়ে দিত। তার জন্য অবিশ্যি, ওকেও কম খোয়ার সইতে হত না। সুযোগ পেলেই, মেরে ধরে একাকার। তারপরে দে ছুট, সিঁড়ি দিয়ে ছাদে। আমাদের দিদিও কম না। ও সমানে তাড়া করত। তারপরে বন্দী। তখন মার কাকে বলে। মনে হত, অমন ডাকাতিয়া দিদি আর কারোর হয় না।

বিয়ের পরে, দিদিটা একটু বদলে গিয়েছে। এখন ও দেখতেও সুন্দর হয়েছে। আর একটু শান্ত ভাব। তা বিয়ের আগে দেখতাম, যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলতে

গেলেই, ওর রসা মুখে রাঙা ছটা। নাক ঠোঁটের ওপর বিন বিন করে ঘেমে উঠত।

তাহলে, বৃত্তান্ত একটু বলে নেওয়া যাক। আমার তখন ন' বছর। বাবার এক বন্ধু একদিন বললেন, 'গ্রামের একটি ভদ্রসন্তান, শহরে থেকে কলেজে পড়ছে। ভবিষ্যতে আইন পড়বার ইচ্ছা, অন্যথায় চাকরির সন্ধান। ছেলেটি ভালো। হোটেলে খেতে পারে না। নিজের হাতে রাঁধতেও জানে না। তোমার ছেলে দুটিকে দু'বেলা পড়িয়ে যাবে, দু'বেলা খাবে। আমার অত্যন্ত চেনা-শোনা। ছেলেটি লক্ষ্মীবাজারে থাকে, তোমার বাড়ির কাছেই। আমার খুব ইচ্ছা, ছেলেটিকে তুমি মাস্টার হিসাবে নাও।'

দুই ছেলে মানে, আমি আর মেজদা। বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বললেন।

মা বললেন, 'কেমন ছেলে জানি না। তুমি আগে দেখ। ভালো বুঝলে নিও। ভদ্রলোকের ছেলে, শহরে থেকে পড়ছে, দু'বেলা খাবে বৈ তো না।'

বাবা বললেন, 'দখি। ছেলে দুটোর পড়াশোনার একজান মাস্টারও দরকার। বড় হচ্ছে।'

বাবা দেখলেন, তাঁর ভালোই লাগল। অতএব, পড়া শুরু হল।

যাউক গিয়া, এ কাহিনী হেথাতেই আপাততঃ মুলতুবি রইল, বারান্তরের জন্য। আমাদের গৃহশিক্ষক তিন বছরে, আমার ভগ্নিপতি। যমুনার জলে তো, অন্তর্স্রোত বহে। ওপর থেকে কিছু দেখা যায় না। তাতে আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি কিছুমাত্র কমে নি। খুশি হয়েছি। পড়া না বলতে পেরে যাঁর চোখের দিকে তাকাতে সাহস পাই নি, মাথা হেঁট করে বসে থেকেছি, এখন তাঁর হাত ধরে, ঘোড়ার গাড়ি চেপে, সদরঘাটে বেড়াতে যাই। ফ্ল্যাশ গর্ডনের মতন বায়স্কোপ দেখতে যাই। এ কি কম কথা! তা যে কথা বলছিলাম, অতএব বাবার 'পারজোয়ারের' আপত্তি টেকে নি। মায়ের উদ্যোগে, বাবার বন্ধুবর্গ এবং আত্মীয়-স্বজনেরা বাবাকে বুঝিয়ে রাজী করালেন। দিদিরই জয়। গোরার বাদ্যি বাজল। বরযাত্রীরা এলেন ঘোড়ার গাড়ির সার দিয়ে। রং-বেরংয়ের বাজী পুড়ল ছাদে।

আমি পালকি-বেহারার কথার কোনো জবাব দিলাম না। তার বোঁচা নাক, ছোট চোখ, কালো মুখের হাসিটা ভালো লাগল। পেটানো পেশি-ফোলানো শরীরটা যেন মানুষের না, এমনি ভাবে তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম।

জামাইবাবু আমাকে বললেন, 'পালকির মধ্যে গিয়ে বোস।'

তৎক্ষণাৎ আমার ঘাড় বাঁকা, প্রতিবাদ সারা শরীরে। পালকির মধ্যে, দিদির কাছে! মরে গেলেও না। পারজোয়ারের দেশের ওপর দিয়ে আমি হেঁটে যাব। সব দেখতে দেখতে যাব। বউদের মতো পালকিতে আমি উঠব না।

বেহারা এসে আমার হাত ধরল, বলল, 'এসো সোনাবাবু।'

যেন বিজলি বাতির শক্। তার হাত ছাড়িয়ে নিলাম। জামাইবাবুর কাছে সরে দাঁড়ালাম। বললাম, 'আমি পালকিতে যাব না।'

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, 'তুমি এত দূর হাঁটতে পারবে না ভাই। এটা ঢাকার শহর না, গ্রাম। ধান-কাটা মাঠের মাঝখান দিয়ে রাস্তা। তুমি চলতে পারবে না।'

যা বল, তাই বল। আমি ও খোঁয়াড়ে ঢুকতে যাচ্ছি না। আমি আর একটু অন্য দিকে সরে দাঁড়িয়ে, ঘাড় নেড়ে বললাম, 'না, আমি হেঁটে যাব।'

সেই সে অবাধ্য আমাকে হতে হচ্ছে। সব উপদেশ ভুলে গেলাম। দিদির পক্ষেও এখন কিছু বলবার উপায় নেই। ওর বটঠাকুর সামনে দাঁড়িয়ে। ওর পালকির চারপাশে কাপড়ের ঢাকনা পড়ে গিয়েছে। জামাইবাবুরা দু-ভাই চোখাচোখি করে হাসলেন। জামাইবাবু বললেন, 'হেঁটেই চলুক। যখন নিজে থেকে বলবে, তখন তুলে দিলেই হবে।'

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, 'তা-ই কখনো হয়। বেহারারা একবার ছুটতে আরম্ভ করলে

আমরা আর ওদের নাগাল পাব না।'

আমি উঠে বললাম, 'আমি পালকিতে উঠতে চাই না। আমি আপনাদের সঙ্গে হাঁটব।'

সুরেন্দ্রনাথ বেয়াইমশাই হাসলেন। বললেন, 'আচ্ছা বেয়াই ভাই, হেঁটেই চল, আজ দেখছি, তোমাকে কাঁধে করে বাড়ি পেঁছতে হবে।'

ইতিমধ্যে কালা আর করিম বাক্স-তোরঙ্গ মাথায় তুলে নিয়েছে। বাহকেরা পালকি তুলল কাঁধে। পালকি দুলে উঠল। দিদিটা ভিতরে কী করছে, কে জানে। বেহারারা বলে উঠল, 'জয় মা ঢাকেশ্বরী! চল হে।'

দিদিকে নিয়ে পালকি এগিয়ে গেল। আমি জামাইবাবু আর সুরেনদাদার সঙ্গে। এখন থেকে তাঁকে সুরেনদাদা বলব। সুরেনদাদা তাঁর পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখলেন। দেখাদেখি জামাইবাবুও কবজি উল্টে তাঁর ঘড়ি দেখলেন। বললেন, 'সাড়ে ছ'টা।'

ইতিমধ্যে রোদ উঠতে আরম্ভ করেছে। মাঠে এখন কোন্ ধানের চাষ, আমি জানি না। কিন্তু ধানক্ষেত রয়েছে। তা ছাড়া আখ সরষে তিলও রয়েছে। মাঠের পথে গাছপালা কম। প্রথমে রাস্তা বড় ছিল। দু-ধারে মাঝে মাঝে, বট অশ্বত্থ আম জামের দেখা পাওয়া যাচ্ছিল। মাঠের পথে নেমে পড়ার পরে, আর ছায়া নেই। ছায়ার দরকারও নেই। শীতের আমেজ ভালোই লাগছে।

কিন্তু 'কোহনবাবু', গরীবের কথা বাসি হলে কাজে লাগে। এক ক্রোশ চলার পরে, ইসালামপুরের বুটজুতো যেন বিছের দাড়া দিয়ে দু-পা আঁকড়ে ধরছে। পায়ে ব্যথা লাগছে। আলের পথে, পায়ের তাল ঠিক থাকছে না। কখনো ডাইনে পড়ি, কখনো বাঁয়ে। শহুরে বালকটির কী দুর্দশা। বেচারীদের সরু গলিটাও সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো। এখন কী রকম বুঝছ হে মাস্টের?

মাস্টেরের আর কি। আমি তো পেছিয়ে পড়ছি। মুশকিল হয়েছে ভ্রাতা দুটির। একজনের নিজের শ্যালক, আর একজনের ভাইয়ের শ্যালক। এখন বুঝতে পারি, সাধে কি আর শালা বলে! তাঁদের দুজনকেও, আমার জন্য আস্তে আস্তে হাঁটতে হচ্ছে। পালকি যে কোথায় পেঁছে গিয়েছে, কে জানে। চোখে তো দেখি না। কালা আর করিমকে তবু দূরে, মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি।

সুরেনদাদা বললেন, 'তখনই বলেছিলাম কী না। এখন আর দিদির পালকিও পাচ্ছ না।'

ভাঙি তো মচকাই না। বলি, 'আমি তো হাঁটছি।'

'তবে খোঁড়াচ্ছ কেন?'

'কই, না তো।'

'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি, পায়ে কি ব্যথা লাগে?'

তাই কি কখনো স্বীকার করা যায়? বলি, 'না।'

জামাইবাবু বললেন, 'এই যে কথা শোন না, এইটিই অন্যায় কর।'

জামাইবাবুর গলায় বকুনির সুর। শহুরে বালকটি এবার বিব্রত। চুপ করে হাঁটতে লাগলাম। তারপরে হঠাৎ বসে পড়লাম। বসে পড়ে, ফিতে খুলে, পায়ের জুতো খুলে ফেললাম। আহ্, অনেক স্বস্তি। পায়ের মোজা টান মেরে খুলে, জুতোর মধ্যে পুরে, হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ওঁরা দুজনে আমার কাণ্ডটা দেখছিলেন। সুরেনদাদা হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'রামো রামো, এবারে সবাই চাষা বলবে যে।'

তা বলুক গিয়ে, পায়ে তো বেশ আরাম লাগছে। বাকী পথটা চলে যেতে পারব। জামাইবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন ঠিক আছে?'

ঘাড় নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

একটু মাস্টারি করবার জন্যই, ওঁদের দুজনকে ছাড়িয়ে গিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

রসো হে শহুরে। এত বেশি মাস্টারি করো না। এদিকে তো টেংরিতে টন টন করছে। এত পথ পায়ে হেঁটেছ আর কখনো? এত না হলেও, হেঁটেছি। সিরাজদিঘা থেকে হেঁটে গিয়েছি চাঁরগায়ে। কিন্তু সে এত পথ না। এ পথ যেন আর ফুরোতে চায় না। এদিকে দম ফুরিয়ে যায়।

যখন মনে হল, আর কিছুতেই পারা যাচ্ছে না, তখনই সুরেনদাদা বললেন, 'এসে গেছি, ওই যে গ্রাম দেখা যাচ্ছে।'

তাকিয়ে দেখলাম, সামনের মাঠটা বড় নয়। তার ওপারেই, ঘন নিবিড় গাছপালার মধ্যে, দু-একটা ছনের চালা দেখা যায়। দখিন বাংলায় যেমন গোলপাতা দিয়ে ঘর ছায়, ছন হল তেমনি এক পাতা। এই দেশে, ছন দিয়ে ঘরের চালা হয়। আমি আবার তাড়াতাড়ি মাঠের ওপর বসে, মোজা পায়ে গলিয়ে জুতো পরে নিলাম। সুরেনদাদা আবার হা হা করে হাসলেন। বললেন, 'আমি কিন্তু সবাইকে বলে দেবো।'

সেইটা একটা দুশ্চিন্তা। ব্যাপারটা বড় লজ্জার তো। জুতো খুলে হাতে করে নিয়ে এসেছি। মনে মনে আশা করলাম, এমন কথা সুরেনদাদা কারুকে বলবেন না।

অবশেষে সেই মাঠের মতো উঠোনে এসে পোঁছানো গেল। দেখলাম, উঠোনের একটি ঘরের দাওয়ার কাছে, পালকি রাখা রয়েছে। কাপড়ের ঢাকনা খোলা। দিদি নেই। চারদিকে চার ঘর। তার মধ্যে একটি ঘরের সামনে মস্ত বড় দাওয়া। বাকী তিন ঘরের দাওয়া নেই। মাটির পৈঠা দিয়ে উঠে, দরজা খুলে ঘর।

একজন বয়স্ক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে। সোজা শক্ত কালো শরীর। বেশ লম্বা। গায়ে একটি সামান্য সুতোর চাদর। পরনের ধুতিটি হাঁটুর একটুখানি নিচে। পায়ে খড়ম। হাতে একটি হুঁকো। চিনি। দিদির বিয়ের সময় দেখেছি। জামাইবাবুর বাবা, আমার তালুই-মশাই। দেখলে মনে হয়, মাঠে খাটা মানুষ। জামাইবাবু তাঁকে প্রণাম করলেন। তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। জামাইবাবুকে প্রণাম করতে দেখে, এবার চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। এগিয়ে গিয়ে, নিচু হয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। তালুই-মশাই তাঁর শক্ত মোটা হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে, তাঁর নিজের উচ্চারণে বললেন, 'এটি আমার ছোট পুত্রা না? এসো বাবা এসো, আমার চাঁদ বাবা এসো।'

তালুইমশাইয়ের গায়ে তামাকের গন্ধ। কিন্তু আমার বাবার তামাকের গন্ধ আলাদা। মিষ্টি একটা সুগন্ধ তাতে আছে। আর এ তামাকের গন্ধ যেন উগ্র, নাকে ঝাঁঝ লাগে। সেও এক বৃত্তান্ত। দিদির বিয়ের সময় দেখেছি, বাবা তালুইমশাইকে আপ্যায়ন করে বসালেন। গড়গড়ার নলটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'আসুন বেয়াইমশাই, একটু তামাকু সেবন হোক।'

তালুইমশাই নলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটা আমাকে কী দিচ্ছেন?'

'গড়গড়ার নল।'

তালুইমশাই বললেন, 'এ-রকম নেশা তো করি না। দশ হাত দূর থেকে, নল দিয়ে ধোঁয়া আসে, ওতে আর তামাকের স্বাদ কী থাকে? আমাকে ডাবা হুঁকা দেন।'

তালুইমশাইকে তাই দেওয়া হল। তিনি সেটি দু'হাতে ধরে, ফুটোয় মুখ লাগিয়ে টান দিলেন। গুড়-গুড় শব্দ হল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে, মুখখানিকে বিকৃত করলেন। বললেন, 'বেয়াইমশাই, এ আমাকে কী তামাক দিয়েছেন?'

বাবা একটু অবাক হয়ে বললেন, 'কেন, ইসলামপুরের তামাক, বিষ্টুপুরি মশলা দেওয়া।'

তালুইমশাই হেসে বললেন, 'তা-ই তো দিয়েছেন দেখছি। এ তো মশাই নবাবী তামাক। মেয়ে দিয়েছেন চাষার ঘরে, আমাদের নিজেদের চাষের তামাকপাতা দিয়ে বাড়িতে দা-কাটা তামাক তৈরি হয়, তা ছাড়া তো খেতে পারি না। আমাকে একটু

তা-ই আনিয়ে দিন।'

বাবা হেসে বললেন, 'বেশ, তা-ই আনিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।'

বাবা দা-কাটা তামাক আনতে দিলেন। তালুইমশাই বললেন, 'আমরা গ্রামের মানুষ, বুঝলেন তো বেয়াইমশাই। দোকানপাটে কেনাকিনি বিশেষ নেই। কেবল কেরোসিন তেল আর নুন, সংসারের প্রয়োজনে, ও তিনটে জিনিস বাজার থেকে কিনতে হয়। আর খাদ্য বস্ত্র যা বলেন, তা ঘরেই তৈরি হয়।'

বাবা বললেন, 'বলুন, খনিজ দ্রব্য ছাড়া, বাজার থেকে কিছুই কেনেন না।'

'তা এক রকম বলতে পারেন। তবে হাওয়া বদলাচ্ছে। আজকাল বউ-ঝিদের মিলকলের শাড়ি পছন্দ। বাড়ির তাঁতীর তৈরি কাপড়ে মন ওঠে না। ছেলেদেরও আজকাল তা-ই দেখছি। তারা আজকাল দোকান থেকে অনেক কিছু কেনে। আমার দরকার হয় না।'

এসব কথা আগেই শোনা ছিল। পরে বাবার মুখে তালুইমশাইয়ের অনেক প্রশংসা শুনেছি। তালুইমশায়ের আলিঙ্গনে দাঁড়িয়ে, এসে অবধি খট্ খট্ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। শব্দটা আসছে, উঠোনেরই একধারের একটি ঘর থেকে। আমার কাছাকাছি, আমার বয়সী এবং ছোট, কয়েকটি ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারছি, ওদের দ্রষ্টব্য আমি। ছেলেদের প্যাণ্টগুলো ঢলঢলে, হাঁটুর কাছে এসে নেমেছে, জামাগুলোও সেই রকম। মেয়েদের ফ্রকগুলোও বেঢপ দেখাচ্ছে। আর পুঁচকে পুঁচকে মেয়েগুলো, নাকে একটা করে নাকছাবি পরে আছে। সেই তুলনায়, আমার হাফ-প্যাণ্টের কাটিং আলাদা। ডোরাকাটা শার্টের তলা, প্যাণ্টের ভিতরে গোঁজা, কোমরে বেল্ট বাঁধা। গায়ে সোয়েটার।

ওরা আমাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে দেখে, একটু লজ্জা করছে। দু'একটা ছেলেমেয়ের নাক থেকে পোটা ঝরছে, তা দেখে আমার খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু খট্-খট্, খট্-খটা-খট্ শব্দটা আমাকে টানছে। আমি তালুইমশায়ের আলিঙ্গন ছাড়িয়ে, শব্দের ঘরে যাবার চেষ্টা করলাম। তিনি আমাকে ছাড়লেন না। জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাবে আমার সোনাবাবা?'

বারে বারে এ রকম সুরে সোনাবাবা ডাক শুনতে আমার ভালো লাগে না। বললাম, 'আমি ও ঘরে যাব। ওখানে কিসের শব্দ?'

তালুইমশাই বললেন, 'তাঁত-ঘরে যাবে? কাপড় বোনা দেখবে? সারাদিন দেখতে পাবে। এখন খেয়ে নাও।'

আমার কৌতূহল তখন তুঙ্গে। বললাম, 'একটু দেখব।'

তালুইমশাই হাসলে, তাঁর সারা গালে ভাঁজ পড়ে। দেখে আমার খুব মজা লাগে। আমার হাত না ছেড়ে বললেন, 'তবে চল, আমিই তোমাকে নিয়ে যাই।'

তাঁর সঙ্গে চলবার আগেই, যে সব ছেলেমেয়েরা আমাকে দাঁড়িয়ে দেখছিল, তাদের মধ্যে একটা ঝগড়ার লক্ষণ দেখা গেল। একটি মেয়ে, সে-ই সব থেকে বড়। ফ্রক পরা, খালি পা। ফর্সা টকটকে রং, রোগা রোগা লম্বা গড়ন। মাথার চুলে বেড়াবিনুনি বাঁধা। হাতে কতগুলো রঙিন কাঁচের চুড়ি। ঠোঁট দুটো টুকটুকে লাল, সাদা দাঁতগুলো প্রায় সব সময় বেরিয়েই আছে। চোখ দুটো বড় না, গালের হাড় দুটো কেমন উঁচু দেখাচ্ছে। ও কয়েকজনকে তাড়া দিয়ে বলল, 'যা, তোরা এখন বাড়ি যা।'

তালুইমশাই ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে গো হেলেন?'

মনে হল, মেয়েটার চেহারার মতোই ওর নাম। ও ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'দ্যাখো না ঠাকুদ্দা, এরা বাড়ি যাচ্ছে না।'

তালুইমশাই বললেন, 'কেন, ওদের তাড়াস কেন, থাকুক না। ওরা আমাদের কুটুম দেখতে এসেছে।'

হেলেন বলল, 'কতক্ষণ থাকবে? কাকীমাকে তো ওরা দেখে নিয়েছে।'

কথা শুনে মনে হচ্ছে, ও সুরেনদাদার মেয়ে। তালুইমশাই আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'আর এই যে একজন বড়কুটুম রয়েছে, শহরের কুটুম। তাকে দেখবে না?'

হেলেন আমার দিকে তাকাল। একটু যেন লজ্জা পেল। তারপরে কয়েকজনের দিকে কাঁচকলা দেখিয়ে, ঠোঁট উলটে বলল, 'খবরদার, আমাদের সঙ্গে আসবি না, এখানে দাঁড়িয়ে থাকবি।' বলে, কালো মতো গোলগাল একটি মেয়ের হাত ধরে বলল, 'আয় রেণু। গান্ধী আয়।'

গান্ধী বলে যাকে ডাকল, সে-ও কালো মতো। কপালের ওপর খোঁচা খোঁচা রুক্ষ চুল। আমার দিকে অনেকক্ষণ থেকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। আমার থেকে অনেক ছোট। বোধ হয় আট বছর বয়স হবে। আর হেলেনের বছর দশেক।

তালুইমশাই আমাকে নিয়ে চললেন। পিছনে পিছনে, হেলেন, রেণু, গান্ধী। গান্ধী যে কারুর নাম হয়, আমি আগে কখনো শুনি নি। পৃথিবীতে একজনই গান্ধী আছেন বলে জানি, তাঁকে সবাই মহাত্মা গান্ধী বলে। আমি তাঁর ছবি দেখেছি। আরো জানি, তিনি ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে চান। ইংরেজরা তাঁকে বারে বারে জেলে ধরে নিয়ে যায়। প্রায়ই উপবাস করেন। সেই উপবাসকে অনশন ধর্মঘট বলে।

কিন্তু আমাদের বাড়িতে, আমার সম্পর্কিত দুই মেসোমশাই রাজনীতি করেন। তাঁরা গান্ধীকে ভালো বলেন না। তাঁরা গান্ধীবিরোধী। তাঁরা বাড়িতেও থাকেন না। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ান। তাঁদের খোঁজে, আমাদের বাড়িতে প্রায়ই পুলিস আসে। সারা বাড়ি সার্চ করে। এমন কি, উনোনের তলা থেকে, মেথর ডাকিয়ে, আমাদের খাটা পাইখানা পর্যন্ত তল্লাসী চালায়। এক একদিন রাত দুটো তিনটের সময় পুলিস এসে আমাদের বাড়ি ঘিরে ফেলে। কিন্তু আজ অবধি, দুই মেসোমশায়ের কারোকেই ধরতে পারে নি। অথচ তাঁরা মাঝে মাঝে আসেন। এমনও হয়েছে, মেসো-মশাইদের কেউ বাড়িতেই আছেন। হঠাৎ পুলিস এসে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে মেসোমশাই, দোতলার ছাদে উঠে, আমাদের বাড়ির পিছনে, মসজিদের উঠোনে লাফিয়ে পড়ে, লক্ষ্মীবাজার রোড দিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন। এ রকম ঘটনা একবারই দেখেছি।

কিন্তু সে সব কথা আজ না। আজ আমার এই গ্রামের কথা। কেবল কোনো ছেলের নাম গান্ধী হতে পারে, এটা জানতাম না। আমি তালুইমশায়ের সঙ্গে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। তাঁত কখনো চোখে দেখি নি। হাতে চালানো তাঁত, এই প্রথম দেখছি। দুটো তাঁত দু'দিকে। দু'জন লোক তাঁতের টুলে বসে, ডান হাত দিয়ে একটা ঝোলানো হাতল ধরে জোরে জোরে টানছে, আর খট্-খট্ শব্দ হচ্ছে। বাঁ হাত দিয়ে, তাঁতের গায়ে, কী একটা ধরে, সামনে পিছনে ঠেলছে। আবার পা দুটো দিয়ে, অর্গানের মতো চাপ দিচ্ছে।

আর একজন লোক, চরকা ঘোরাচ্ছে, একটা কাঠের চাকার পেটে সুতো জড়িয়ে নিচ্ছে। ঘরটার মধ্যে অদ্ভুত গন্ধ। মেশিনের তেলের সঙ্গে, ঠিক কোরা কাপড়ের নতুন গন্ধ মেশানো। সারা ঘরের মেঝেয়, নানা রংয়ের সুতো ছড়ানো। সবাই আমার দিকে তাকিয়ে দেখল।

তালুইমশাই বললেন, 'তোমরা কাজ করো। আমার শহুরে পুত্রা কাপড় বোনা দেখবে।'

তালুইমশাই আমাকে পুত্রা বলেন কেন জানি না। শুনেছি, আমি নাকি সম্পর্কে ওঁর পুত্রা হই। তিনি কখনো আমার নাম ধরে ডাকেন না। আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে

তাঁত চালানো দেখলাম। ব্যাপারটা বুঝলাম না কিছুই। কেবল, দু'দিকে ছুঁচালো একটা কাঠের জিনিস, খট্-খট্ করে দু'দিকে যাতায়াত করছে, শব্দটা তারই। খুব ইচ্ছা করল, আমি বসে বসে, তাঁতীর মতো তাঁত চালাই। কিন্তু সেটা বলতে পারলাম না।

তালুইমশাই বললেন, 'এবার বাড়ির মধ্যে চল, মুখ ধুয়ে খেয়ে নেবে। তারপরে যতক্ষণ খুশি, তাঁত চালানো দেখো।'

এ সময়েই সুরেনদাদা এলেন, আমার নাম করে বললেন, 'কোথায়? তাই ভালো, আমরা ভাবছি, একলা একলা কোথাও চলে গেল নাকি। ওর দিদি ভয় পেয়ে গেছে।'

তালুইমশাই বললেন, 'না না, সোনাবাবা আমার কাছে আছে। নাও, একে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যাও। খেতে দিতে বল।'

সুরেনদাদা ছেলেদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোরা এখানে কী করছিস? আয়, বেরিয়ে আয়।'

রেণু যার নাম, ও ছুটে গিয়ে সুরেনদাদার একটা হাত চেপে ধরল। সুরেনদাদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে মা? এই মামাটিকে চিনতে পারছ?'

রেণু কিছু না বলে বড় বড় চোখে, হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। সুরেনদাদা আমার দিকে ফিরে বললেন, 'এরা সবাই তোমার ভাগ্নে-ভাগ্নি, বুঝলে তো? তোমার বড়দিদির ছেলেমেয়ে।'

আমি ওদের সকলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। রেণু ওর ফর্সা মুখে, ঝকঝকে দাঁতে, আমার দিকে চেয়ে হাসল। গান্ধীটা সেই এক ভাবেই তাকিয়ে আছে। ওকে ভীষণ হাঁদার মতো লাগছে। সুরেনদাদার সঙ্গে পাটখড়ির বেড়ার কাছে গেলাম। সেখান থেকেই তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'ও গো ধন-মা, সোনাবউয়ের ভাই, বাবার সঙ্গে তাঁত-ঘরে গেছল। এই নিয়ে এসেছি।'

বলতে বলতেই, বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমার মায়ের থেকেও বয়সে বড় একজন মহিলা বেরিয়ে এলেন, 'কই, আমার সোনার চাঁদ কই?'

বলেই এসে আমাকে হাত ধরে কোলের কাছে টেনে নিলেন। আমার ভালো লাগল না। ওঁর গায়ে কেমন যেন শ্যাওলার মতো গন্ধ, তার সঙ্গে আবার তামাকের গন্ধও মেশানো। আর কেন যে সবাই আমাকে সোনা সোনা বলে, বুঝতে পারি না। কিন্তু আমি ওঁর কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম না। সুরেনদাদা ওঁকে কেন ধন-মা ডাকলেন, বুঝতে পারলাম না। মাকে আবার কেউ ও রকম করে ডাকে নাকি!

উনি আমাকে নিয়ে একটা ছোট উঠোনে এলেন। ওঁর গায়ে কোনো জামা নেই। শুধু একটা মোটা খয়েরী পাড় শাড়ি পরা। হাতে শাঁখা চুড়ি, কপালে সিঁথেয় সিঁদুর। উঠোনে আর একজন দাঁড়িয়ে ছিলেন। দিদির থেকে একটু বড়, কিন্তু খুব সুন্দর আর ফরসা। তিনি একটা লালপাড় শাড়ি পরেছেন। ওঁর গায়েও জামা নেই। কপালে সিঁথেয় সিঁদুর। চোখ দুটো কালো আর বড়। পায়ে আলতা, নাকে নাকছাবি। তিনি আমার দিকে এমন করে তাকিয়ে হাসছেন, যেন আমাকে অনেকদিন থেকে চেনেন। ওঁকে দেখতে এত সুন্দর, আমার খুব ভালো লাগছে। মনে হল, ইনি আমার দিদির থেকেও সুন্দর।

উনি এসে আমার হাত ধরলেন। বললেন, 'এসো গো ভাই, তোমার দিদির কাছে নিয়ে যাই। সে তোমাকে দেখতে না পেয়ে ভয় পেয়েছে।'

যিনি ধন-মা, তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'সোনাবউয়ের কাছে একে নিয়ে যাও বড়বউ। সোনাকে খেতে দাও।'

যিনি বড়বউ, তিনি উঠোনের একদিকে, আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। দেখ

বড় ঘর। একটাই মাত্র জানালা। ঘরের আর একটা দরজা আছে। সেই দরজা দিয়ে, বাইরের বড় উঠোনটা দেখা যাচ্ছে। ঘরটা যেন অন্ধকার মতো। একদিকে একটা বড় খাট, তার ওপরে এলোমেলো বিছানা। চালের মাথার সঙ্গে কয়েকটা শিকে ঝুলছে, তাতে পর পর হাঁড়ি সাজানো। একদিকে কাঠের মাচা, চালের কাছাকাছি। সেখানে একটা মই ঠেকানো রয়েছে, মাচার ওপরে ওঠবার জন্য। আর এক দিকে পিতলের কলসী, হাঁড়ি, একটা বড় মাটির জালা। কাছাকাছি ছোট একটা কাঠের রথের মতো। তার মধ্যে কালী আর লক্ষ্মীর পট।

খাটের এক পাশে আমার দিদি বসে ছিল। এখন ওর ঘোমটা কম, প্রায় পুরো মুখটা দেখা যাচ্ছে। গায়ের চাদরটা খুলেছে। যিনি আমাকে নিয়ে এলেন ঘরে, তিনি দিদির কাছে আমাকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'নাও টোকানি, তোমার ভাইকে নাও। ভারি মিষ্টি তোমার ভাই।'

বলে আমার গাল টিপে দিলেন। দিদি আমাকে বলল, 'এঁকে প্রণাম করেছিস? ইনি হলেন বড়দিদি। প্রণাম কর।'

আমি বড়দিদির আলতা-পরা পায়ে, ঝুঁকে প্রণাম করলাম। উনি আমাকে কোলের কাছে টেনে নিলেন। বললেন, 'লক্ষী ভাইটি আমার, থাক থাক।'

আমি ওঁর গায়ে একটা সুগন্ধ পেলাম। মনে হয় তেলের। ঘরের মধ্যে হেলেন গান্ধী রেণুরা এসে দাঁড়িয়েছে। দিদি আমাকে আবার জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ রে, মাউইমাদের প্রণাম করেছিস?'

মাউইমা মানে দিদির শাশুড়ি। ক'জন মাউইমা, আমি জানি না। বললাম, 'চিনি না।'

দিদি বলল, 'চল্ আমি নিয়ে যাই। তুই দেখছি সূর্যবংশের ছেলে, মাথা নোয়াতে শিখিস নি। তাল্‌ইমশাইকে প্রণাম করেছিস?'

বললাম, 'তোর শ্বশুরকে? করেছি।'

বড়দিদি হেসে উঠে বললেন, 'বাহ্, ভারি মিষ্টি কথা তো ভাইটির।'

দিদি বলল, 'ও কিছুতেই আমাকে 'তুমি' বলতে চায় না।'

বড়দিদি বললেন, 'তুই-ই তো সুন্দর। আমার খুব ভালো লাগে। দাও, টোকানি, (আমার দিদির ডাক-নাম) ওকে আমার হাতে দাও, আমি মায়েদের কাছে ওকে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি আমার নাইবার যোগাড় দেখ।'

বড়দিদি আমাকে নিয়ে, ছোট উঠোনের ধারে অন্য একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি বড় উনোন জ্বলছে. উনোনের ওপরে বড় কড়া ভর্তি দুধ জ্বাল হচ্ছে। আমাদের শহরে. মিষ্টির দোকানে এত বড় কড়াতে, এতটা দুধ জ্বাল দেওয়া হয়। কোনো বাড়িতে যে এত দুধ জ্বাল দেয়, আমি দেখি নি। উনোনের ধারে, ধন-মায়ের থেকে বয়স কম, একজন বসে আছেন। তাঁরও একটি মাত্র শাড়ি পরনে। হাতে একটা হাতা। পাশে বসে ধন-মা, সামনে পানের বাটা। পান সাজছেন।

বড়দি তাঁদের দেখিয়ে বললেন, 'এঁরা তোমার দুই মাউইমা।'

আমি দুজনকেই প্রণাম করলাম। তাঁরা আমাকে তেমনি 'সোনাবাবা, সোনার চাঁদ' ইত্যাদি বলে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। দুজন মাউইমা কেন, বুঝতে পারলাম না। দিদির কি দুটো শাশুড়ি? এ ঘরেও হেলেন ওরা এসেছে। ওরা আমার সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরছে। বাইরে আসতে, দিদিকে ঘরের দরজায় দেখতে পেলাম। দিদি বলল, 'টুথ পাউডার নিয়ে যা, দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে নে।'

কিন্তু আমি আগেই ভেবে রেখেছিলাম, দিদির শ্বশুরবাড়ি এসে, মটখুরার ডাল দিয়ে দাঁত মাজব। মটখুরা মানে আসশ্যাওড়া। বললাম, 'আমি মটখুরার ডাল

দিয়ে দাঁত মাজব।'

বড়দিদি হেসে উঠলেন খিল খিল করে। দিদিও। দেখলাম। হেলেনও হাসল। ভারি পাকা মেয়ে তো। বড়দের সঙ্গে হাসছে। আবার আমার দিকে চেয়ে চেয়ে, দিদি বলল, 'এখন কোথায় মটখুরার ডাল পাওয়া যাবে। 'এখন পাউডার দিয়ে মেজে নে। আমি ব্রাশ দিচ্ছি।'

আমি মাথা নাড়লাম। আমার দাঁতন করার খুব শখ। হেলেন বলে উঠল, 'আমি নিয়ে আসছি।'

বলেই ছুট দিল। ওর পিছনে পিছনে গান্ধী আর রেণুও। আমি গায়ের থেকে সোয়েটার খুলে ফেললাম। মাটিতে বসেই জুতো-মোজা খুলে ফেললাম। বড়দিদি হাসতে লাগলেন। মাটিতে বসেছি বলে দিদি নিশ্চয় মনে মনে রাগ করছে। আমি সোয়েটার জুতো মোজা, দিদির সামনে ঘরের পৈঠায় ছুঁড়ে দিলাম। তারপরে যেদিকে হেলেনরা গিয়েছে, সেইদিকে চলতে গেলাম। দিদি ডেকে উঠল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

আমি জবাব না দিয়ে, রান্নাঘরের পিছন দিকে গেলাম। বড়দিদির হাসির শব্দ পেলাম। সামনেই দেখলাম, অনেক বেগুন গাছ। একধারে একটা লাউ-মাচা। তাতে কয়েকটা বড় বড় লাউ ঝুলছে। আমি ছোট বেগুনক্ষেতের পাশ দিয়ে, যেদিকে উঁচু ঢিবি মতো দেখা যাচ্ছে, সেদিকে এগিয়ে গেলাম। ঢিবিটার ওপরে উঠে দেখলাম, এটা একটা পুকুরের উঁচু পাড়। নিচে টলটলে কালো জল, একটুও শ্যাওলা নেই। পুকুরের ওপারে, নিবিড় গাছপালা। পুকুরের জলে তার ছায়া পড়েছে। দেখলাম হেলেনের বয়সী একটা মেয়ে, ঘাটের পাড়ে বসে, কী যেন করছে। আমার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে। আমাকে টের পায়নি। ফ্রক পরা মেয়েটা, রংটা ময়লা ময়লা, আমার মতো। চুলগুলো পিঠের ওপর খোলা। ফ্রকটাকে দুই ঠ্যাঙের মাঝখানে এমন ভাবে গুঁজে দিয়েছে, ওর ইজেরটা দেখা যাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছি, মেয়েটা গুণ গুণ করে গান করছে।

ঘুঘু ডাকছে টেনে টেনে, যেন কেঁদে কিছু বলছে। পুকুরধারের জংগলে একজোড়া বড় প্রজাপতি গায়ে গায়ে উড়ছে। একসঙ্গে গাছের পাতায় বসছে। একসঙ্গে উড়ছে। মনে হচ্ছে, নিজেদের মধ্যে ওরা খেলা করছে। একটা টুনটুনি কোন্ ঝোপ থেকে শিস দিয়ে উঠল।

আমার খুব ইচ্ছা করল মেয়েটাকে লুকিয়ে ঢিল মারি। কিন্তু একদম চিনি না বলে মারতে পারলাম না। অথচ ও আমাকে দেখুক, এটা আমি চাই। আমি গম্ভীর ভাবে ডাকলাম, 'এই।'

মেয়েটা আমার দিকে ফিরে তাকাল। তখন ওর হাতে আমি, পেতলের রেকাবি আর নারকেল ছোবড়া দেখতে পেলাম। মেয়েটা হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। হেলেনের থেকে ওর মুখটা সুন্দর, চোখগুলো বড় বড়, নাকটা চোখা মতো। অনেকটা প্রতিমা-প্রতিমা ভাব। কে মেয়েটা? দিদির শ্বশুরবাড়ির মেয়ে? জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কে?'

মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। হাতে রেকাবি আর ছোবড়া। উঠে দাঁড়িয়ে, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। অদ্ভুত তো! আমাকে ভয় পেয়েছে নাকি? আমি তো বড় মানুষ নই, ওকে বকিও নি। তবে ও রকম করে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

এই সময়ে, আমার পাশে এসে, হেলেন দাঁড়াল। মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। হাতে তিন-চারটে মটখুরার সরু সরু ডাল। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে ধরল। ওর পিছনে গান্ধী আর রেণু। গান্ধী এখন ল্যাংটো। বোধ হয় ওর ঢলঢলে প্যান্টটা দৌড়তে গিয়ে কোথাও খুলে পড়ে গেছে। আমি হেলেনের হাত থেকে মটখুরার ডালগুলো নিয়ে,

ঘাটের দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ও কে?'

হেলেন এতক্ষণ দেখে নি। এবার দেখে বলল, 'ও-ই, ও তো সোরি। ওইটা ওদের বাড়ি।'

বলে উত্তর দিকে দেখাল। দেখলাম, সেদিকে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ছনের চালের ঘর দেখা যাচ্ছে। হেলেন আবার বলল, 'ওদের তো পুকুর নেই, তাই আমাদের পুকুরে আসে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'ও ও রকম করে দাঁড়িয়ে আছে কেন?'

হেলেন পাল্টা আমাকেই জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

বললাম, 'তা আমি কী জানি। আমি খালি জিজ্ঞেস করেছি, তুমি কে।'

এবার গান্ধী রাগতভাবে চিৎকার করে উঠল, 'এই সোরি, তুই কী করছিস?'

হেলেন গাছের গুঁড়ির ধাপ দিয়ে নেমে, সোরির কাছে গেল। শুনতে পেলাম, ও জিজ্ঞেস করল, 'এই সোরি, তোর কী হয়েছে রে?'

সোরি একবার হেলেনের দিকে দেখল। তারপরে আমার দিকে। দেখে ঘাড় নাড়ল, কথা বলল না। হেলেন ওর গায়ে একটা ছোট করে ধাক্কা দিল। বলল, 'আহা, ন্যাকা মেয়ে। কথা বলতে পারিস না?'

সোরি যেন কিছু বলল। হেলেন বলল, 'ও আবার কে। ও তো নতুন সোনা-কাকীমার ভাই। ঢাকা শহর থেকে এসেছে। তুই কী ভেবেছিলি?'

সোরি যেন আবার কী বলল। হেলেনের গলা জোর। জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

সোরি কিছু বলল না। ঘাট থেকে মুখ তুলে আবার আমাকে দেখল। আট বছরের ল্যাংটো গান্ধী চেঁচিয়ে বলল, 'দ্যাখ সোরি পেত্নি, তোকে এক ঘুসি মারব।'

কেন ঘুষি মারবে বুঝতে পারলাম না। গান্ধীর মুখটা কাঠগোঁয়ারের মতো দেখাচ্ছে। ওকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। গায়ে জামা, তলায় কিছুই নেই।

হেলেন ঘাট থেকে বলল, 'দ্যাখ গান্ধী, তোর চুলের মুঠি টেনে দেবো।'

গান্ধী তেমনি চেঁচিয়ে বলল, 'ও ও রকম করে দাঁড়িয়ে আছে কেন? দেখে আমার রাগ হচ্ছে।'

হেলেন বলল, 'হোক গিয়ে।'

বলে ও উঠে আসতে লাগল ওর পিছনে পিছনে সোরি। হেলেন আমার কাছে এসে বলল, 'মামা, ও তোমাকে দেখে ভয় পেয়েছে।'

সোরি ঢিবিতে উঠে, একটু সরে দাঁড়িয়েছে। মুখটা অন্যদিকে। ও লজ্জা পেয়েছে, সেই ভাবেই ঠোঁট টিপে হাসছে, আর চোখের কোণ দিয়ে, আমার দিকে দেখছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

হেলেন কিছু বলবার আগেই, গান্ধী সোরির দিকে ছুটে গিয়ে ওর পিঠে দুম করে একটা ঘুষি কষিয়ে দিল। দিয়েই চোঁ চোঁ ছুট। সোরির নাকের ডগা কেঁপে উঠল, চোখ পাকিয়ে গান্ধীকে দেখল। বলল, 'হেলেন, আমি কিন্তু শোধ তুলব, বলে দিলাম।'

হেলেন বলল, 'তুলিস. ওকে খুব মারিস। ও তো ড্যাকরা পাজী শয়তান।'

গান্ধীটা সত্যি শয়তান। ঘুষি মেরে পালিয়ে গেল। সোরির মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। ও হন হন করে উত্তর দিকে চলে গেল। হেলেন বলল, 'চলে যাচ্ছিস সোরি?'

সোরি কোনো কথা না বলে, একবারও ফিরে না তাকিয়ে চলে গেল। হেলেন আমার দিকে ফিরে বলল, 'তোমার সামনে মেরেছে তো, তা-ই সোরি রাগ করেছে।'

রেণু হাঁ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি ডাল ছোট করে ভেঙে মাজতে আরম্ভ করে, জিজ্ঞেস করলাম, 'সোরি আমাকে ভয় পেয়েছে কেন?'

হেলেন একবার তার দিকে দেখে নিয়ে, চোখ বড় করে, চুপি চুপি গলায় বলল, 'এই মঙ্গলবারের আগের মঙ্গলবার বীণাকে সাহেবের বেশে দেখা গিয়েছিল।'

ব্যাপারটা কিছুই বোঝা গেল না। মটখুরার মিষ্টি ডাল চিবোতে চিবোতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে দেখা দিয়েছিল?'

হেলেনের যেন শিউরে ওঠার ভাব দেখা গেল। ভয়-ভর চোখে, আবার পুকুরের ওপারের দিকে দেখে নিয়ে বলল, 'বিশ্বাসদের বাড়ির পিছনে, তেঁতুল গাছে যে থাকে।'

কথাটা শুনে, আমার ভিতরেও ধক্ করে উঠল। গাছে কে থাকতে পারে, সেটা আমার কিছু কিছু জানা আছে। আমাদের বাড়ির পাশেই একটা পোড়োবাড়ি আছে। পাঁচিল-ঘেরা বাড়িটায় অনেকখানি খোলা জায়গা। সেই খোলা জায়গায় আগে বাগান ছিল। এখন কিছুই নেই, ঘাস আর জঙ্গল। পেল্লায় একটা কুয়ো। গভীর, অন্ধকার, শ্যাওলা জড়ানো। সেই বাড়ির পূর্বদিকের পাঁচিল ঘেঁষে মস্ত বড় একটা শিমুলগাছ আছে। সেই গাছে একজন থাকে, আমি জানি। শুনেছি, যে-চিলটা সারাদিন উঁচু মগডালে বসে থাকে, সে-ই সে। চিলের রূপ ধরে সারাদিন থাকে। অন্য রূপও ধরে।

একদিন আমি মায়ের পাশে রাত্রে ঘুমিয়ে আছি। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে যায়। দেখলাম পূর্বদিকের জানালা দিয়ে, আমার গায়ে জ্যোৎস্না পড়েছে। মায়ের গায়েও পড়েছে। জানালা দিয়ে শিমুলগাছটাকে দেখা যায়। মগডালের দিকেই আমার নজর গেল। স্পষ্ট দেখলাম, পেট বুক মাথা কিছু নেই। অথচ কেউ বসে যেন দুটো লম্বা লম্বা ঠ্যাঙ দোলাচ্ছে। ঠ্যাঙ দুটো কালো আর বোঁজির মতো লোমওয়ালা। মগডাল থেকে প্রায় মাটিতে এসে ঠেকেছে। কোমরের কাছে মাটির হাঁড়ির মতো, সেখানে লাল ভাঁটার মতো, জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। অনেক দূরের দিকে সেই চোখের নজর। আমাকে দেখতে পাচ্ছিল না।

আমি ভয়ে চোখ বুজেছিলাম। খুব আস্তে আস্তে মায়ের গায়ে হাত রেখেছিলাম। একটু পরেই আবার যখন চোখ খুলেছিলাম, সে একটা ঠ্যাঙ বাড়িয়ে, আমাদের ছাদের ওপর তুলে দিল। তারপরে আর একটা ঠ্যাঙও। সে আমাদের ছাদে উঠে গেল, আর নিচেই আমি শুয়ে ছিলাম। অথচ ছাদে কোন শব্দ শুনতে পাই নি।

পরের দিন সকালবেলা উঠেই আগে দিদিকে কথাটা বলেছিলাম। মা বলেছিল, 'কাল রাত্রে শোবার আগে ভাল করে হাত ধুস নি, তাই দেখেছিস। নোংরা হয়ে থাকলে ওরা দেখা দেয়।'

কথাটা শুনে ভালো লাগে নি। বাবাকে গিয়ে বলেছিলাম। বাবা আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, আমার পেটে টোকা মেরেছিলেন। জিভ দেখেছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কতদিন আমি পাইখানা করি নি।' 'রোজই করেছিলাম।' শুনে বাবা জানতে চেয়েছিলেন, আগের দিন কী কী খাবার খেয়েছি। ও সবের সঙ্গে খাবার বা পাইখানার কী সম্পর্ক কিছুই বুঝি নি। বাবার একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স ছিল। তার থেকে একটা শিশি নিয়ে, আমার মুখে কয়েকটা বড়ি ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, 'আজ তিনবার এ ওষুধটা খাবি। আমাকে বলবি, আমি দিয়ে দেবো।'

থাক, ঢাকা শহরের বৃত্তান্ত এখন ঢাকা থাক। যে বচনের যে সময়। সময় এলে বলব। হেলেনের কথা শুনে, আমার মটখুরার ডাল চিবনো বন্ধ। জিজ্ঞেস করলাম, 'সে তেঁতুলগাছটা কোথায়?'

রেণু হেলেনের ফ্রক চেপে ধরল। ব্যাপারটা ও-ও বুঝতে পেরেছে।

হেলেন বলল 'আমাদের বাড়ির দক্ষিণের বাড়িটা বিশ্বাসদের। তেঁতুলগাছটা

ওদের বাড়ির পশ্চিমে। আর বীণা হল অন্য বাড়ির মেয়ে। ও কিন্তু তেঁতুলতলায় যায় নি, অনেক দূর দিয়ে যাচ্ছিল। তখন দেখতে পেয়েছিল, প্যান্ট কোট হ্যাট পরা একটা সাহেব তেঁতুলগাছের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে, বীণাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। বীণা ভাবল তেঁতুলতলায় সাহেব এল কোত্থেকে? সারা গাঁয়ে কোথাও একটা সাহেব নেই। ও যেতে যেতে দেখেছিল। খানিকটা চলে যাবার পরে, পিছন ফিরে দেখেছিল, তেঁতুলতলায় কেউ নেই। একটা কাক-পক্ষীও না। তখন ও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল।'

হেলেন বলতে বলতেই শিউরে উঠল। বুকের কাছে ফ্রকটা সরিয়ে, একটু থুতু ছিটিয়ে দিল। রেণুও সঙ্গে সঙ্গে তাই করল। হেলেন আমাকে বলল, 'তুমিও থুকু দিয়ে নাও, তাহলে কোনো ভয় থাকবে না।'

বুকে থুতু দিতে আমার ভালো লাগে না, কেমন ঘেন্না ঘেন্না করে। কিন্তু আমি জানি, শরীরের সঙ্গে লোহা ছোঁয়ানো থাকলে, ওরা কিছু করতে পারে না। আমি কোমরের বেল্টের আংটা দেখিয়ে বললাম, 'আমার থুতু দেবার দরকার নেই, এই যে লোহা রয়েছে। লোহা থাকলে, ওরা কিছু করতে পারে না।'

হেলেন বলল, 'তা ঠিক। তবু থুতু দিতে হয়।'

বলেই হেলেন নিজেই, আমার বুকের শার্ট সরিয়ে থুতু দিয়ে দিল। বুকে থুতু লাগতেই আমার ঘেন্না করে উঠল। রাগও হল। ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললাম, 'কেন থুতু দিলে? এসব আমার ভালো লাগে না, ঘেন্না করে।'

বলে শার্ট দিয়েই বুকটা ঘষে দিলাম। এখন আর আমি আগের মতো ভয় পাই না। আমার বন্ধু নলিন যে কথা শিখিয়ে দিয়েছিল, সেটা বললাম ;

'ভূত আমার পুত
পেত্নি আমার ঝি
রাম-লক্ষ্মণ কাছে আছে
করবি আমার কী?'

বলে জিজ্ঞেস করলাম, 'সোরি ভেবেছিল, আমি তেঁতুলগাছের 'সে' এসেছি?'

হেলেন বলল, 'হ্যাঁ। ভেবেছিল, তোমার বেশ ধরে 'সে'-ই এসেছে। তুমি দেখতে পাও নি, সোরির হাত-পা কাঁপছিল?'

'না তো।'

'হ্যাঁ, আমাকে ও বললে, ওর হাত-পা কাঁপছিল।'

আমি মটখুরার দাঁতন দিয়ে, দাঁত মাজতে মাজতে বললাম, 'সোরি খুব ভীতু। আমি সেই তেঁতুলগাছটা দেখতে যাব।'

হেলেন বলল, 'তা যেতে পারো। কিন্তু 'সে' তোমাকে দেখা দেবে না।'

'কেন?'

'সে ছেলেদের দেখা দেয় না, শুধু মেয়েদের দেখা দেয়।'

এ রকম কথা এর আগে আমি শুনি নি। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

হেলেন বলল 'ও তো পালেদের বাড়ির আইবুড়ো ছেলে মধু। মধুর যখন বিয়ের বয়স হয়েছিল, তখন সে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল।'

হেলেন আবার একবার শিউরে উঠল। রেণু ওর ফ্রক চেপে ধরে, গায়ের কাছে আরো লেপটে দাঁড়াল। হেলেন আবার বলল, 'সেই জন্য ও কেবল মেয়েদেরই দেখা দেয়।'

আমার মনে প্রশ্ন জাগল, জিজ্ঞেস করলাম, 'মধু কেন গলায় দড়ি দিয়েছিল?'

হেলেন বলল, 'মধু তো শ্যাকেদের (শেখ—মুসলমান) মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, ও শ্যাক হয়ে যেতে চেয়েছিল। সেটা পারে নি বলে, মনের দুঃখে গলায় দড়ি দিয়েছিল।'

তার মানে মধু এক মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, মুসলমান হতে চেয়েছিল। তা পারে নি বলে গলায় দড়ি দিয়েছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি মধুকে দেখেছ?'

হেলেন বলল, 'তখন আমি জন্মাই-ই নি।'

আমি মনে মনে মধু সম্পর্কে ভাবলাম। ঠিক মধুর মতো ঘটনা আমি জানি না। কারণ সে মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, মুসলমান হতে চেয়েছিল। কিন্তু বিয়ে করতে চেয়ে, বিয়ে করতে পারে নি, তার জন্য বিষ খেয়ে মরে গিয়েছে, এ রকম ঘটনা আমি জানি। শহরে, আমাদের পাড়ার কাছেই এ রকম ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনা নিয়ে, পাড়ায়, দোকানে, বাড়িতে দিদি-বউদিদের আসরে অনেক কথা শুনেছি। আমাদের পাড়ার মধ্যেই দিদিদের গার্লস ইস্কুল, একেবারে আমাদের জীবনে খেলার মধ্যেই। দিদির ইস্কুলের বন্ধুরাও, সেই ঘটনা নিয়ে আলোচনা করত। সবাই ছেলেটাকে ভালো বলত। মেয়েটাকে দোষী করত। কিন্তু যাকে কেউ বিয়ে করতে চায়, তাকে না পেলেই সে মরে যেতে চায় কেন, আমি বুঝতে পারি না।

এমনিতেই মরার কথা ভাবতে খুব অদ্ভুত লাগে। কেউ ইচ্ছা করে মরে গেলে, আরো অদ্ভুত লাগে। বিয়ে করতে চেয়ে, না করতে পেরে যখন কেউ গলায় দড়ি দেয়, বিষ খায়, তখন মনে হয়, তার মধ্যে কী একটা রহস্য যেন আছে। যারা এভাবে মরে, তাদের কথা ভেবে আমার খুব অবাক লাগে। কোনো কূল-কিনারা পাই না।

আমি কাঠের গুঁড়ির ধাপ বেয়ে, ঘাটের পাটায় নেমে, দাঁতনকাটি ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। পুকুরের জলে মুখ ধুয়ে উঠে এলাম। আমার মনটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছে। সোরি আমাকে মধুর ভূত ভাবল? গেঁয়ো তো, তা-ই। হেলেন জিজ্ঞেস করল, 'মামা, তুমি রাগ করেছ?'

বললাম, 'না।'

'তবে কথা বলছ না কেন?'

'এমনি।'

হেলেন আর রেণু আমার পিছু পিছু বাড়িতে এল।

বড়দিদি এত খাবার দিয়েছেন, দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

দিদি যে বড় ঘরে ছিল, সে ঘরের মাটির মেঝেয়, আসন পেতে আমাকে খেতে দেওয়া হয়েছে; মস্ত বড় একটা কাঁসার থালায় মুড়ি আর চিঁড়ের মোয়া, নারকেলের নাড়ু আর ছাঁচ, তিলের নাড়ু, খানিকটা ক্ষীর, আর জামবাটিতে করে এক বাটি দুধ। দুধ থেকে ধোঁয়া উঠছে। জামাইবাবুও আমার পাশে বসে খাচ্ছেন। তাঁর খাবার আরো বেশি।

দুই মাউইমা-ই কাছে বসে আছেন। ছোট আর বড়। দুজন মাউইমা অথচ দুজন তালুইমশাই কেন দেখতে পেলাম না, জানি না। জামাইবাবু একজনকে বড়-মা বলছেন, আর একজনকে শুধু মা। আমি বড়দিদিকে বললাম, 'আমি এত খাবার খেতে পারব না।'

বড়দিদি আমার গায়ের কাছে বসে, পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'এত কোথায়, সামান্য জল খাবার তো। খেয়ে নাও আমার ভাইটি।'

রেণু কোথায় গিয়েছে জানি না। হেলেন খাটের কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের খাওয়া দেখছে। জামাইবাবু আর মাউইমায়েরাও আমাকে খেয়ে নিতে বললেন। আমি মুড়ির মোয়া, নারকেলের ছাঁচ আর ক্ষীর খেতে ভালোবাসি। তা বলে চারটে মোয়া চারটে ছাঁচ খেতে পারি না। যা পারলাম, তাই খেয়ে নিলাম। ক্ষীর সবটা খেয়ে নিলাম।

তারপরেই জল খেয়ে উঠে পড়লাম। বড়দিদি হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'দুধ—দুধটা সব খেয়ে নাও ভাই।'

বললাম, 'দুধ খেতে আমার ভালো লাগে না।'

বড়দিদি বললেন, 'বোকা ছেলে, দুধ না খেলে শরীর ভালো হয় না।'

সে কথা আমি অনেকবার শুনেছি। কিন্তু আমার পেট ভরে গিয়েছে। বড়দিদি জামাইবাবুকে বললেন, 'সোনা ঠাকুরপো, আপনার শালাকে দুধ খেয়ে নিতে বলুন।'

জামাইবাবু অনেক সময় আমাকে 'তুই' করেও বলেন। বললেন, 'আরে পাগলা, দুধ খেয়ে নে। শহরের দুধের থেকে এ দুধের স্বাদ অনেক ভালো।'

মাউইমায়েরা 'সোনা', 'বাবা' ইত্যাদি বলে, অনেক করে খেতে বললেন। কী করে এঁদের বোঝানো যায়, আমার পেটটা জালার মতো ফুলে উঠেছে। কিন্তু আমার লজ্জা করতে লাগল, অস্বস্তিও হল। দুধের বাটি তুলে, চুমুক দিয়ে খানিকটা খেয়ে রেখে দিলাম। বড়দিদি হাসলেন, বললেন, 'হেলেন, তুই বাকী দুধটুকু খেয়ে নে।'

হেলেন আমাকে বলল, 'ওইটুকু দুধ, খেয়ে নাও না।'

বড়দিদি ভুরু কুঁচকে হেলেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মামা তোর বড় না? 'তুমি' করে বলছিস যে বড়, 'আপনি' বলবি।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বালক এমন কথা কোনদিন শোনে নি। একমাত্র বাড়ির দরজায় দু-একজন ভিখিরি, তাও বৈরাগী বৈষ্ণবরা নয়, আমাকে 'আপনি' করে বলেছে। আর বাড়িতে, রাজমিস্তিরির কাজের সঙ্গে যে মজুররা ছিল, তারা আমাকে 'আপনি' বলেছে।

হেলেনের মতো কোনো মেয়ে আমাকে কোনোদিন 'আপনি' বলে নি।

হেলেন কোনো প্রতিবাদ করল না। কাছে এসে, দুধের বাটিটা নিয়ে, চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলল। ফ্রক দিয়ে মুখটা মুছে নিল। আমি জামাইবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'জামাইবাবু, আর একজন তালুইমশাই কোথায়?'

জামাইবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'আর একজন তালুইমশাই আবার কোথা থেকে আসবেন?'

মাউইমাদের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'দুজন মাউইমা রয়েছেন তো।'

জামাইবাবুর সঙ্গে, ঘরের সবাই হেসে উঠলেন। বড়দি হেসে উঠে, আমাকে জড়িয়েই ধরলেন। এমন কি হেলেনও ঝকঝকে দাঁতে হাসছে। জামাইবাবু বললেন, 'দুজনেই তো আমার মা। শোন, তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

বলে, ধন-মাকে দেখিয়ে বললেন, 'তোমার তালুইমশাই এঁকে আগে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের অনেক দিন পরেও, এই মাউইমার কোনো ছেলে হয় নি। তখন উনি ওঁর ছোট বোনকে আবার তালুইমশাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। আমরা ওঁর ছোট বোনের ছেলেমেয়ে। আমরা পাঁচ ভাই বোন, তোমার এই ছোট মাউইমার পেটে জন্মেছি। বুঝলে?'

বুঝলাম। তার মানে, তালুইমশাই মাউইমাদের দু বোনকে বিয়ে করেছেন। তাঁরা এখনো হাসছেন। কিন্তু আমার খুব আশ্চর্য লাগে, একজনের ছেলেমেয়ে হয়, আর একজনের কেন হয় না। মাউইমাদের দিকে একবার দেখে, আমি বড় উঠোনে চলে গেলাম। দেখলাম, পশ্চিম দিকের ঘরের দরজা খোলা। ঘরের মধ্যে তালুইমশাই দাঁড়িয়ে আছেন। ঘরটা প্রকান্ড, ভিতরে অন্ধকার মতো। তালুইমশাই যেন কার সঙ্গে কথা বলছেন। আমি সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম। দেখলাম, ঘরের একটা অংশ জুড়ে, নিচু করে মাচা পাতা। তার ওপরে চালের উঁচু পর্যন্ত পাট ডাঁই করা রয়েছে। দু'জন লোক সেই পাট মেঝেতে নামাচ্ছে।

তালুইমশাই আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'এস গো পুত্রা, একে কী বলে, জানো তো?'

বললাম, 'পাট। এত পাট দিয়ে কী হবে?'

তালুইমশাই বললেন, 'হাটে নিয়ে যাবে, বিক্রী করবে। আমরা হলাম গাঁয়ের চাষী মানুষ, এ সব হল আমাদের কাজ।'

তালুইমশাইকে চাষীর মতোই দেখায়; তাঁর কথাবার্তা ভাব-ভঙ্গিও সেই রকম। হাতে সব সময় একটি থেলো হুঁকো আছে। ধোঁয়া বেরোক না বেরোক, ফুটোয় মুখ চেপে টেনে যান। আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। হেলেন ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তাঁতঘরের দিকে দেখলাম। এক ভাবে খট্-খট্ শব্দ হয়ে যাচ্ছে। হেলেনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সেই তেঁতুলগাছটা কোন্ দিকে?'

হেলেন চোখ বড় বড় করে বলল, 'আপনি সেখানে সত্যি যাবেন?'

হেলেন আমাকে 'আপনি' করে বলল। আমি বললাম, 'তুমি আমাকে 'আপনি' করে বোল না। আমার ভালো লাগে না।'

হেলেন বললে, 'তা হলে আমার ওপর সবাই রাগ করবে।'

বললাম, 'রাগ করবে তো কী হয়েছে। সবাই যা বলবে, তাই শুনতে হবে?'

হেলেন অবাক হয়ে বলল, 'হবে না? মা বলতে বলেছে যে!'

'আমাকেও তো, আমার দিদিকে 'তুমি' করে বলতে বলে। আমি কি বলি?'

'কে বলে?'

'বাবা মা সবাই।'

'তবু আপনি তাঁদের কথা শোনেন না?'

গম্ভীর হয়ে বললাম, 'না, সব কথা আমার শুনতে ইচ্ছে করে না। আমার ভালো লাগে না। তুমি আমাকে আপনি করে বলবে না।'

হেলেন চোখ বড় করে, ভয় পাওয়া মুখে, ঘাড় নাড়ল। বলল, 'ওরে বাবা, মাকে আমার ভীষণ ভয় লাগে। কথা না শুনলে, মা আমাকে মেরে, পিঠের হাড় ভেঙে দেবে।'

আমি বললাম, 'তা আবার কখনো হয় নাকি। মায়েদের গায়ে এত জোর নেই। বাবাদের গায়ে জোর আছে, বাবারা পিঠ ভেঙে দিতে পারে।'

হেলেন আমার কথা বিশ্বাস করল না। বলল, 'মোটেই না। বাবা আমাকে কখনো মারে না। মা রেগে গেলে ভীষণ মারে।'

আমি বড়দিদির মুখটা ভাবলাম। তাঁর গায়ে যে মিষ্টি গন্ধ আছে, সেটাও মনে পড়ল। তিনি যে ভীষণ মারতে পারেন, আমার ঠিক বিশ্বাস হতে চাইল না। আমার আবার উল্টো ব্যাপার। মা একদম মারেন না। ওটা বাবার কাজ। বাবা ভীষণ রাগী মানুষ। এমনিতে খুব হাসি-খুশি মানুষ। রেগে গেলে একেবারে চেহারা বদলে যায়। ফর্সা মুখটা টকটকে লাল হয়ে যায়, চোখ দুটো জ্বল জ্বল করতে থাকে। কিছুই না, তখন কেবল একটি পাখার বাঁট। তার মধ্যে কথা আছে। দুষ্টামি বা অবাধ্যতা, যা-ই করি, বাবা কোনো খোঁজখবরই রাখেন না। মা আর দিদিই হচ্ছে মারাত্মক। মায়ের একটা কথা তো কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। কথাও একটিই, ফলাফল যা, তাতেই হয়, 'উনি আজ বাড়ি আসুন, তারপরে দেখা যাবে।'

দিদির কথাও তাই, 'বাবা আসুন, তোর কী হয় আজ, দেখিব।' কথাটা কোনো না কোনো কারণে রোজই শুনতে হয়। তবে বাবার কানে ওঠানো হয় কমই। তেমন একটা গুরুতর কিছু না ঘটলে, বাবার কানে বিশেষ কিছু তোলা হয় না। যথা, পাড়ার বুড়ি হরিমতী ব্রাহ্মণীর বাড়িতে ঢুকে, তার চোখের সামনে দিয়ে, একতলার

ছাদে উঠে, বিলিতি কুল আর পেয়ারা পেড়ে নিয়ে আসা। হরিমতী বুড়ি, পরিত্রাহি চিৎকার করেন, যেন বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। তখন আমরা কষুটে পেয়ারা কুল সব নষ্ট করে দিই। বুড়ি আমাদের কোনোদিনই যেচে কিছু দেন না। বাড়ির ভিতর শান-বাঁধানো রকে, খালি গায়ে বসে সারাদিন হাঁপান, গোটা গা থেকে পুরনো ঘিয়ের গন্ধ বেরোয়। রকে বসে বসে, যক্ষিনীর মতো সব কিছু আগলে থাকেন। গলার স্বরটা যে কী খারাপ, তা বলা যায় না।

আমরাও কিছু মানি না। যখন গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি, একেবারে হনুমানের পালের মতো। বুড়ি তখন আমাদের অভিশাপ দিতে থাকেন। বাইরের দরজার কাছে গিয়ে, আমার দিদির নাম ধরে চিৎকার করতে থাকেন। দিদি বা মায়ের, আসলে রাগ হয়ে যায়, হরিমতী বুড়ির অভিশাপগুলো শুনে। মা তো ভয়ে কাঁপতে থাকেন। যেন সেই রাত্রেই আমি কলেরায় ভুগে মরে যাব। দিদি গিয়ে হরিমতী বুড়িকে কাতর ভাবে অনুনয় করে, 'জেঠিমা, আর শাপশাপান্ত করবেন না, চুপ করুন। ওর ব্যবস্থা করছি।'

আসল কারণটা হচ্ছে অভিশাপ। মাকে কাঁদতেও দেখেছি। বুড়ির অভিশাপকে মায়ের বড় ভয়। তারপরে আর ধৈর্য রাখা সম্ভব হয় না। বাবা বাড়ি এলেই, অভিযোগ। বাবারও দেখেছি, তিনি যেন প্রস্তুত হয়েই আছেন। এক হাঁক। বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে বাবার কাছে। কোথা থেকে যে পাখা খুঁজে পান। শুরু হয়ে যায়, ঠাস ঠাস। তারপরে অবিশ্যি মাকেই এগিয়ে আসতে হয়, 'থাক, আজকের মতো ছেড়ে দাও। এর পরে আবার করলে, হাত-পা বেঁধে মারা হবে!'

বাবাও শান্ত হয়ে যান, যদিও তখনো তাঁর চোখ-মুখ প্রায় জহ্লাদের মতো মনে হয়। তারপরে কয়েকদিন মায়ের সঙ্গে, বিশেষ করে দিদির সঙ্গে, কথাবার্তা একদম বন্ধ। পুরো বয়কট যাকে বলে।

যাই হোক, বড়দিদি মেরে হাড় ভেঙে দিতে পারেন শুনে, মনটা খারাপ হয়ে গেল। তিনিও তাহলে আমার দিদির মতোই। দিদিরও মারের হাতটি বেশ শক্ত। দেখছি, চেহারায় কিছু আসে যায় না। সুন্দরী দিদিরাও মারতে পারে। তবু আমি হেলেনকে বললাম, 'আমার মতো ছোট ছেলেকে কেউ আবার 'আপনি' করে বলে নাকি?'

হেলেন বলে, 'মামা হলে বলতে হয়।'

বললাম, 'এ সব তোমাদের পাড়াগাঁয়ে হয়।'

হেলেন বলল, 'তা আমি জানি না। মা যা বলে দিয়েছে, তাই করতে হবে।'

হেলেনের ওপর আমার রাগ হল। ওকে ভেংচে দিতে ইচ্ছা করল। মা যা বলে দিয়েছে তাই করতে হবে। করুক গিয়ে, আমার ওসব ভালো লাগে না।

বললাম, 'চল তো, সেই তেঁতুলগাছটা দেখে আসি।'

হেলেন চোখ বড় করে বলল, 'সত্যি যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কিন্তু যাব না।'

'তাহলে আমি যাব কী করে! আমি তো চিনি না।'

'আপনাকে আমি দূর থেকে দেখিয়ে দেব।'

'তাই দেবে চল।'

boiRboi.net

তেঁতুলগাছটা দেখবার জন্য, আমার মনটা ছটফট করছে। ভয়ও লাগছে। একেবারে

গাছটার তলায় যেতে পারব কী না জানি না। 'সে' যদি নেমে-টেমে আসে, তখন কী একটা ঘটবে, কে জানে। তবে 'সে' মেয়েদের দেখা দেয়। ছেলেদের দেয় না। আমি আর হেলেন, একটা আম-কাঁঠালের বাগান পেরিয়ে ; কতগুলো সুপুরি গাছের তলা দিয়ে, একটা বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে, খোলা জায়গায় এসে পড়লাম।

হেলেন থমকে দাঁড়াল। সেখান থেকে আমি দেখলাম, গ্রামের গাছপালা যেন লাইনবন্দী হয়ে সোজা চলে গিয়েছে। বাকী সবই চাষের মাঠ। গ্রামের গাছপালার প্রায় কাছাকাছি, একটু আলাদা ভাবে, প্রকাণ্ড একটা ঝাড়ালো তেঁতুলগাছ দাঁড়িয়ে আছে। হেলেন সেই গাছটা আমাকে দেখিয়ে দিল। গাছটা যেন গ্রামের গায়ে থেকেও, গ্রামের মধ্যে নেই। সে একলা আর আলাদা। আমি বললাম, 'তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি ঘুরে আসছি।'

হেলেন খপ্ করে আমার একটা হাত চেপে ধরল, বলল, 'মামা, যাবেন না। আমার ভীষণ ভয় করছে।'

গাছটার দিকে তাকিয়ে, আমারও ভয় করছে। গাছটা যেন একটা সাধারণ গাছ না, তার ঘন ডালপালা পাতায়, কেমন একটু আলাদা লাগছে। দেখলেই মনে হয়, একজন কেউ সেখানে আছে। আমি বললাম, 'তুমি যে বললে, মধু ছেলেদের দেখা দেয় না?'

হেলেন সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরল, চুপি চুপি স্বরে বলল, 'চুপ, নাম ধরবেন না। ভীষণ রেগে যায়। আমি ভাবছি, যদি আপনাকে দেখা দেয়!'

কথাটা ভেবে, গায়ের মধ্যে কেমন শির শির করে উঠল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী সেজে দেখা দেবে?'

হেলেন বলল, 'তা কী জানি। আপনি যাবেন না।'

আমি হেলেনের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'একটুখানি যাব, খুব কাছে যাব না। তুমি এখানে দাঁড়াও।'

হেলেন বলল, 'আমি এখানে একলা দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।'

বললাম, 'তাহলে আমার সঙ্গে এস।'

হেলেন ঘাড় নেড়ে, শব্দ করল, 'উঁহু!' বলেই পিছন ফিরে দৌড়তে লাগল। কাছেই কোনো গাছ থেকে ছাতারে পাখি ডেকে উঠল। চারদিকে রোদ ঝলমল করছে। আমার সামনেই বড় একটা আখের ক্ষেত। দূরে সরষে আর তিলের হলুদ ফুলের ক্ষেত দেখা যাচ্ছে। আমি হেলেনের ছোটবার পথের দিকে একবার দেখলাম। শুনেছি, কোনো ক্ষতি না করলে, 'ওরা' কিছু করে না। আমি কোনো ক্ষতি করি নি। কোমরের বেল্টের লোহার আংটায় হাত রেখে, আস্তে আস্তে, তেঁতুলগাছের দিকে এগোতে লাগলাম। এখন আমার মনে হচ্ছে, গাছটা যেন আমার দিকে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কেমন একটা থম্‌কে থাকা ভাব। 'সে' কি আমাকে দেখছে? 'সে' কি সব সময়েই গাছে থাকে? কোথাও যেতেও পারে। এখন কেউ হঠাৎ আমার সামনে মাটি ফুঁড়ে দাঁড়ালেই বুঝতে হবে, 'সে'-ই এসেছে। আমাকে তখন দেখে নিতে হবে, তার কোনো ছায়া পড়েছে কী না। আমি আমার নিজের ছায়াটা দেখে নিলাম। ছায়াটাকে বেঁটে দেখাচ্ছে। ছায়া এক এক সময়, এক এক রকম হয়। কখনো লম্বা, কখনো বেঁটে।'

কিন্তু কারোকেই দেখা গেল না। আমি প্রায় তেঁতুলগাছটার কাছে চলে এলাম। তেঁতুলের গন্ধ পাচ্ছি, গাছে অনেক তেঁতুল হয়ে রয়েছে। গাছের নিচেও অনেক পড়েছে। আমি কাছে আসতেই, ঝপ্ করে একটা শব্দ হল। একটা পাখিকে উড়ে যেতে দেখলাম। 'সে' কী না, জানি না। কিন্তু আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, গাছের তলাটা কেমন থম্ থম্ করছে। না দেখতে পেলেও, সেখানে যে কেউ আছে, তা

বুঝতে পারছি। একেবারে গোড়ায় যাওয়াটা ঠিক হবে না বোধ হয়।

আমি গাছের ওপর দিকে তাকালাম। ছায়ায় যেন অন্ধকার হয়ে আছে। বেল্টের আংটা ঠিক ধরে আছি। বাঁ দিকে তাকিয়ে, অন্যান্য গাছপালার মাথার ওপরে, একটা চিলেকোঠার ছাদ দেখতে পেলাম।

ঠিক এ সময়েই শুনলাম, আমার নাম ধরে কেউ ডেকে উঠল। আমি পিছন ফিরে দেখলাম, সুরেনদাদা আসছেন। তাঁর পিছনে, একটু দূরে, হেলেন, রেণু, গান্ধী, আরো দু-তিনটে ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুরেনদাদা এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, 'ওখানে কী করছ, চলে এস।'

সুরেনদাদাকে দেখে আমার সাহস বেড়ে গেল। আমি তখন একেবারে গাছটার গোড়ায় চলে গেলাম। গাছের গায়ে হাত ছোঁয়ালাম। সুরেনদাদা এসে আমার হাত ধরে বললেন, 'মাঠে জঙ্গলে এ রকম একলা আসতে আছে? শীগ্‌গির চল।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'এলে কী হয়?'

সুরেনদাদা আমাকে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'কত কী হয়। হায়েনা আসতে পারে। পাগলা শেয়াল তাড়া করতে পারে।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'শেয়াল পাগল হয় নাকি?'

সুরেনদাদা বললেন, 'হয় না? কুকুর যেমন পাগল হয়ে যায়, শেয়ালও তেমনি পাগল হয়। তখন সে সবাইকে কামড়ে দিতে আসে। পাগলা শেয়ালের দাঁতে খুব বিষ থাকে।'

শেয়াল পাগল হয়, কোনোদিন শুনি নি। জিজ্ঞেস করলাম, 'দিনের বেলা কি তারা বেরোয়?'

সুরেনদাদা বললেন, 'সব সময়েই বেরোয়।'

হেলেনদের কাছে এসে দেখলাম, ওরা সবাই আমার দিকে ভয়-ভয় চোখে তাকিয়ে আছে। বুঝতে পারলাম, হেলেন গিয়ে সুরেনদাদাকে ডেকে নিয়ে এসেছে। আমরা সবাই গিয়ে, বাড়ির উঠোনে ঢোকবার আগেই দেখলাম, জামাইবাবু খুব তাড়াতাড়ি এদিকে আসছেন। সুরেনদাদাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় চলে গেছল?'

সুরেনদাদা বললেন, 'এই কাছেই, বিশ্বাসদের পেছনের বাগানের ধারে।'

জামাইবাবু বললেন, 'আমি শুনলাম, একলা একলা নাকি কোথায় চলে গেছে।'

সুরেনদাদা বললেন, 'হ্যাঁ, আমাকে হেলেন গিয়ে বলল। আমি গরুগুলোকে দেখতে গেছলাম।'

জামাইবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'একলা একলা আর কোথাও যাবে না। যাও, তোমার দিদির সঙ্গে দেখা করে এস।'

তালুইমশাইও উঠোনে বেরিয়ে এসে বললেন, 'আমার পুত্রা কোথায় গেছিল?'

সুরেনদাদা বললেন, 'বিশ্বাসদের বাড়ির পেছনে।'

বোঝা গেল, হেলেন এমন ভাবে এসে বলেছে, সবাই ভেবেছে, আমি বোধ হয় হারিয়ে যাব। কিন্তু মধু পালের বাসস্থান, তেঁতুলগাছ নিয়ে, কেউ কোনো কথা বললেন না। আমি বাড়ির ভিতরে গেলাম। দেখলাম, দিদি ঘোমটা মাথায়, রান্নাঘরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। যেতেই, রাগ-রাগ ভাবে বলে উঠল, 'কোথায় তুই একলা একলা গেছিলি? সবাই ভাবছে।'

বললাম, 'বাড়ির কাছেই তো ছিলাম।'

দিদি চোখ বড় করে বলল, 'খবরদার, আর একলা একলা কোথাও যাবি না। তাহলে আমি বাবাকে চিঠিতে সব কথা লিখে দেব।'

আমি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললাম, 'দিস। খালি বাবা আর বাবা।'

রান্নাঘরের ভিতরে হাসির শব্দ পেলাম। বড়দিদি হাসছেন। দিদি রান্নাঘরের ভিতর দিকে মুখ ফেরাল। হেলেনদের দলটাও আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। হেলেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। আমি ওর সঙ্গে, রান্নাঘরের পিছনে গেলাম। গান্ধী রেণুরাও আমাদের চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল। হেলেন জিজ্ঞেস করল, 'কিছু দেখতে পেলে?'

'কিছু না।'

'কিচ্ছু না?'

'না।'

তারপরে বললাম, 'তবে 'সে' যে ওখানে ছিল, তা আমি বুঝতে পেরেছি।'

হেলেনের গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপরে হঠাৎ ফ্রক সরিয়ে, বুকের কাছে থুতু দিল। রেণু আর বাকীরাও তাই দিল। গান্ধীর গায়ে তখন জামাও নেই। সে ধ্যাবড়া করে, নিজের বুকে থুতু ছিটিয়ে দিল।

হেলেন বলল, 'যাই সোরিকে বলে আসি।'

বলে ও উত্তর দিকে ছুটে গেল।

দু'দিন পরেই, সোমবার এল। সুরেনদাদার সঙ্গে আমি হাটে গেলাম। বেলা দশটার মধ্যেই আমরা চান-খাওয়া সেরে নিলাম। শুনলাম, হাটে গেলে, সন্ধ্যের আগে ফেরা হবে না। দেখলাম, দুজন লোক, গামছা আর শাড়ির বড় বড় দুটো মোট মাথায় নিয়ে, হাটের পথে আগেই বেরিয়ে গেল। সবই বাড়ির তাঁতের তৈরি। আজ হাটে সব বিক্রী করা হবে। দু'দিন ধরে দেখলাম, পশ্চিমের ঘর থেকে অনেক পাট বেরোল। রোজই মাথায় করে হাটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাও বিক্রীর জন্য।

সোমবার দিন, সকাল থেকেই সবাই ব্যস্ত। রান্না-বান্না আগেই হয়ে যায়। সবশুদ্ধ এ বাড়িতে প্রায় পঁচিশজন লোক। কৃষাণ, রাখাল,, তাঁতী, চাকর আর বাড়ির লোক। মনে হয়, রোজ যেন এ বাড়িতে নিমন্ত্রণের ভিড় লেগে আছে। দুই মাউইমা, বড়দিদি আর আমার দিদি, এঁরাই রান্না করেন। চাকর-বাকরদের মাউইমারা খেতে দেন। বাকীদের দিদিরা। হেলেন কোনো কাজই করে না। কেবল পান ধুয়ে, মাঝখান দিয়ে চিরে রেখে দেয়। রেণু আর গান্ধীকে চান করাতে নিয়ে যায়।

আমি দু'দিন পুকুরের জলে খুব সাঁতার কেটেছি। তা নিয়ে দিদির সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গিয়েছে। কিছুতেই পুকুরে চান করতে যেতে দিতে চায় না। খালি বলে, আমার অসুখ করবে। পরশু দিন আমাকে জোর করে ধরে রেখেছিল। আমি ধস্তাধস্তি করে, ওর কাপড়-চোপড় টেনে, জোর করে পালিয়ে গিয়েছিলাম। দিদিও আমার সঙ্গে, পুকুরঘাট অবধি ছুটে গিয়েছিল। আমি দৌড়ে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। দিদি বলেছিল, 'আজই আমি বাবাকে সব কথা লিখে পাঠাচ্ছি।'

আমি সাঁতার কাটতে কাটতেই বলেছিলাম, 'একশোটা লিখে পাঠাস। আমিও তোর শাশুড়িদের বলে দেব, তুই একটা পাজী।'

দিদির বোধ হয় হাত-পা নিষপিষ করছিল, একবার আমাকে ধরতে পারলে হয়। কিন্তু আমি জানি, এ বাড়িতে ও আমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। এখানে ও খুব আস্তে কথা বলে, গলার স্বর শোনা যায় না। এমন কি, হাসিও শোনা যায় না। এখানে ও একেবারে ঢিট। আমার পিছনে দৌড়নো তো অসম্ভব। বাড়ির ভিতরে হলে, আশপাশে শাশুড়িরা না থাকলে, এক রকম। আমি যদি বাইরের দিকে ছুটি, তাহলে কোনো উপায় নেই।

কিন্তু গতকাল আর আজ আমি পুকুরে নামতে পাই নি। টিউবওয়েলের জলে নাইতে হয়েছে। জামাইবাবু, সুরেনদাদা, তালুইমশাই, মাউইমায়েরা, বড়দিদি, সবাই আমাকে পুকুরে যেতে বারণ করেছেন, এবং খুব আদর করেই বলেছেন। অথচ হেলেনদের নাইতে মানা নেই। ওরা গাঁয়ের মেয়ে, ওদের কোনো অসুখ-বিসুখ করবে না। অথচ ঢাকার মতো শহরে, আমিও যে পুকুরে, নদীতে, খালে বিলে ঘুরে সাঁতার শিখেছি, সে কথা কারোর মনে থাকে। সাত বছর বয়সেই আমি সাঁতার শিখেছি। বুড়িগঙ্গায় নিয়ে গিয়ে, বাবা নিজে, আমাকে আর মেজদাকে সাঁতার শিখিয়েছেন। পাছে ডুবে যাই, সেই জন্য শুকনো নারকেল, যার ভিতরে একফোঁটাও জল নেই, এ রকম একজোড়া নারকেল দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতেন, সেই দড়িটা পেটের মাঝখানে রেখে দুটো নারকেলের সঙ্গে জলের ওপর ভেসে থাকতাম। তখন তো বাবা কোনো দিন বলেন নি, যেখানে-সেখানে সাঁতার কাটা চলবে না। আজকালই বলেন, যে-কোনো পুকুরে চান করা চলবে না। তাতে নাকি শরীর খারাপ করে।

আজকাল ঢাকা শহরেও, বাড়ির কাছে পুকুরে বা খালে, সচরাচর যাওয়া হয়ে ওঠে না। একমাত্র ছুটির দিনে, সাঁতার কাটতে যেতে পারি।

সবাই মিলে বলতে, আমি কাল আর আজ পুকুরে নামি নি। কিন্তু রোজ আমি সে কথা শুনব না। পুকুরের জল দেখলেই, আমার হাত-পা নাচতে আরম্ভ করে দেয়। এঁরা কেউ সে কথা বোঝেন না।

সোরির সঙ্গে আমার কোনো কথা ছিল না। আমাকে মধুর ভূত ভেবেছিল বলে, আমি ওর সঙ্গে প্রথমে কথা বলি নি। প্রথম দিন বিকেলেই ও এসেছিল। আমি তখন বাড়ির পশ্চিমে, বিরাট খড়ের গাদার ধারে বসে, হেলেনকে ঢাকা শহরের গল্প বলছিলাম। ও কোনোদিন ঢাকা শহর দেখে নি। সেই সময় সোরি এসেছিল। হেলেন ওকে কাছে ডেকেছিল। আমাকে বলেছিল, 'মামা, ওর ভালো নাম সরযু।'

আমি বলেছিলাম, 'ওর সঙ্গে আমি কথা বলব না।'

'কেন?'

'ও আমাকে ভূত ভেবেছিল।'

সরযুর শ্যামবর্ণ মুখ, প্রতিমার মতো চোখ নাক সব কেমন গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। একবার হেলেনের দিকে তাকিয়ে, দৌড়ে চলে গিয়েছিল। হেলেনও দৌড়ে চলে গিয়েছিল, ডেকেছিল, 'সোরি।'

সোরি বুঝি রাগ করেছে? করুক গিয়ে, আমার বয়ে গেল। একটু পরেই হেলেন আবার ছুটতে ছুটতে এসেছিল। বলেছিল, 'সোরি খুব রাগ করেছে। আপনি ও রকম বললেন কেন?'

'ও আমাকে ভূত ভেবেছিল কেন?'

'ও কি ইচ্ছে করে ভেবেছে? বীণার কথা মনে করে, ও ভয় পেয়েছিল। আপনার মতো ছেলেকে ও আগে দেখে নি।'

আমি চুপ করে ছিলাম। হেলেন আবার বলেছিল, 'ও আপনার সঙ্গে ভাব করতে এসেছিল।'

'তবে চলে গেল কেন?'

'আপনি যে বললেন, কথা বলবেন না।'

'ও আমার সঙ্গে ভাব না করলে কী হবে?'

হেলেন কিছু বলে নি। একটু পরে বলেছিল, 'সোরি ভারি অহংকারি, ঠিক হয়েছে।'

তারপর দিন সোরি আর আসে নি। কিন্তু কাল বিকেলে এসেছিল। তখন আমি

আমার সঙ্গে নিয়ে আসা মার্বেল পাথরের গুলিগুলো নিয়ে খেলা করছিলাম। গান্ধী আর রেণু আমাকে গুলি কুড়িয়ে এনে দিচ্ছিল। ওরা খেলতে জানে না। গান্ধীর তাল, আমার গুলি ও দু-একটা নিয়ে নেবে। কিন্তু ও থ্রি, সিক্স খেলতে জানে না। মিছি-মিছি গুলি নিয়ে কী করবে। কয়েকবারই ও গুলি নিয়ে, মুখে দিয়ে চুষেছে। কখনো হয়তো খেয়েই ফেলবে। ছেলেবেলায় (এখন কত বড়!) আমিও খেয়ে ফেলেছিলাম। মা তো ভয়ে ভেবেই অস্থির। বাবা আমাকে রাত্রে জোলাপ খাইয়ে দিয়েছিলেন। পরের দিন সকালেই, যেমন গুলি তেমনি বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই গুলিটা আর হাতে করা যায় নি। গান্ধীও সেই রকম কিছু করুক, আমি তা চাই না।

আমি বড় উঠোনে খেলছিলাম। হেলেনের সঙ্গে সোরি এসেছিল। হেলেনের মতো সোরিও পরিষ্কার জামা পরেছিল। লাল ফিতে দিয়ে চুল বেঁধেছিল। সোরি আমার দিকে তাকায় নি, আমার গুলির দিকেও না। বোধ হয় ওর নিজের আলতা-পরা খালি পায়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। হেলেন আমাকে ডেকেছিল, 'মামা শুনুন।'

আমি গুলিগুলো কুড়িয়ে, প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়েছিলাম। হেলেন ডেকেছিল, 'আসুন।'

'কোথায়?'

'আসুন না।'

বলে সরষুর হাত ধরে, উঠোনের পুব দিকে গিয়ে, আবার উত্তর দিকে হাঁটতে আরম্ভ করেছিল। রেণু আর গান্ধীও আমাদের পিছন পিছন আসছিল। দেখতে পেয়ে হেলেন থমকে দাঁড়িয়ে ধমকে বলেছিল, 'তোরা আসিস না।'

কিন্তু ওরা কথা শুনছিল না। আমাদের পিছন পিছন আসছিল। হেলেন আবার বলেছিল, 'বাড়ি যা বলছি। আমাদের সঙ্গে আসিস না। এলে মারব।'

গান্ধী বলেছিল, 'মেরে দ্যাখ, মাকে বলে দেব।'

হেলেন ছুটে এসেছিল। গান্ধী দৌড় দিয়েছিল। খানিকটা গিয়েই, মাটির ঢ্যালা তুলে, হেলেনের গায়ে ছুঁড়ে মেরেছিল। ওর হাতের খুব টিপ। ঠিক হেলেনের গায়ে গিয়ে লেগেছিল। হেলেন আর্তনাদ করে উঠেছিল। গান্ধী পালিয়েছিল। রেণু তখন মানে মানে আপনিই চলে গিয়েছিল। হেলেন আমাকে হেসে বলেছিল, আসলে নাকি ওর লাগে নি।

কেন? এত বড় মাটির ঢ্যালা লেগেছে, তাতেও লাগল না? আবার আমাকে ডেকে নিয়ে ওরা আগে আগে চলল। হেলেনের থেকে সোরি একটু খাটো। হেলেনের থেকে ওর স্বাস্থ্য ভালো।

আমরা একটা বাড়ির সামনে এসেছিলাম। রাস্তার ধারেই ঘর। যেমন জামাইবাবুদের পুবের ঘর। ঘরটা পেরিয়ে, বাঁ দিকে গিয়ে, একটা নির্জন জায়গায় ওরা দুজনে দাঁড়িয়েছিল। পেঁপে গাছ, সীমের মাচা, আর গাঁদা আর অতসী ফুলের কয়েকটা গাছ, তাতে ফুল ফুটে আছে। আমি ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে, হেলেন সোরিকে বলেছিল, 'দে।'

সোরি যেন লজ্জা পাচ্ছিল। ওর একটা হাত পিছনে ছিল। সেটা সামনে আনতে, দেখেছিলাম একটা ছোট্ট পেতলের বাটি। তার মধ্যে কতগুলো নকুলদানা। সোরি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে, আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী করব?'

সোরি হেলেনের দিকে তাকিয়েছিল। ওর ঠোঁটে হাসি। হেলেন ভুরু কুঁচকে বলেছিল, 'আহা, হাতে করে দিচ্ছিস, আর বলতে পারছিস না?'

সোরি আমার দিকে চেয়ে বলেছিল, 'খাও।'

না। আমি আর সোরিই যা বলছিলাম। লুকোচুরির সব থেকে বড় খেলা, 'টিলোট' খেলা, আর জলের মধ্যে, 'হলডুপ' খেলার কথাই বিশেষ ভাবে বলেছিলাম। তা ছাড়া টকিতে কাননবালাকে দেখেছি, সে কথাও বলেছিলাম। তারপরে গানের কথা উঠতে, সোরি গুণ গুণ করে গান গেয়েছিল,

'আমি যখন বসে থাকি গুরুজনের মাঝে
নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশি, আমি মরি লাজে।'

আমার শোনা গান। কৃষ্ণযাত্রার ও-গান অনেকবার শোনা ছিল। ও আমাকে গান গাইতে বলেছিল। এমনিতে লজ্জা করছিল না। গান গাইতে বলাতে লজ্জা হয়ে গিয়েছিল। অথচ সোরি আমাকে আগেই গান শুনিয়ে দিয়েছিল। সোরি বলেছিল, 'তোমাকে গাইতেই হবে।'

যে-গানটা তখন আমার রেকর্ড থেকে নতুন শেখা ছিল, সেটাই গেয়েছিলাম।

'নিশিথে যাইয়ো ফুল বনে রে ভ্রমরা
নিশিথে যাইয়ো ফুল বনে।'

সোরি বলেছিল, 'ইস, কী সুন্দর! আমি তোমার মতন গাইতে পারি না।'

বলেছিলাম, 'তোমার গলাটা আমার বউদির মতন।'

গানের পরেই হেলেন আর এক মিনিটও দাঁড়াতে চায় নি। সন্ধ্যেও হয়ে আসছিল। সোরি আমাদের সঙ্গে, দিদিদের ভিতরবাড়ি অবধি এসেছিল। যাবার সময় আমাকে বলেছিল, 'কাল তোমাকে রোয়াইল খাওয়াব।'

বলেই ছুটে চলে গিয়েছিল।

রোয়াইল খেতে বেশ ভালো লাগে। টক টক রসালো ফল, ছোট ছোট খাঁজ কাটা, রংটা অনেকটা জামরুলের মতো। বাড়ি ঢুকে, হেলেন আমার কাছ থেকে সরে গিয়েছিল। দিদি আমাকে হাত-মুখ ধুয়ে নিতে বলেছিল। আমার পড়ার বই সঙ্গে আনা হয়েছিল। দিদি আমাকে পড়তে বসতে বলেছিল। বড়দিদি হেলেন আর গান্ধীকেও পড়তে বসতে বলেছিলেন। গান্ধীর গোটা গায়ে একটা চাদর মুড়ি দেওয়া, ঘাড়ের পিছন দিকে জড়িয়ে, গিঁট দিয়ে বাঁধা। যেন খুলে না যায়। পরনে একটা প্যাণ্ট। ওর বই বাংলা প্রথম ভাগ। হেলেনের দ্বিতীয় ভাগ। বড়দিদি এসে একবার আমাদের কাছে বসেছিলেন। বলেছিলেন, 'ভাই, তুমি তোমার ভাগ্নে-ভাগ্নিদের পড়া দেখিয়ে দাও।'

হেলেন ওর বই টেনে নিয়ে বলেছিল, 'না, আমি পড়ব না।'

বড়দিদি বলেছিলেন, 'ও কি, ছি! মামার কাছে পড়।'

বলে চলে গিয়েছিলেন। হেলেন মুখটা অন্ধকার করে বসে ছিল। গান্ধী বলেছিল, 'এই দিদি, পড় না।'

হেলেন গোঁজ হয়ে বসে ছিল। গান্ধী ওর মুখের ভাবটা অনুভব করেছিল। চোখ পাকিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল। তারপর হঠাৎ হেলেনের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, চুল টেনে, একটা লড়াই লাগিয়ে দিয়েছিল। আমি থামাতে পারছিলাম না। আমরা খাটের বিছানার ওপরে বসেছিলাম। লেপ আর বালিশের মধ্যে, হেলেন যে কোথায়, খুঁজেই পাচ্ছি না। রেণু চিৎকার করে কাঁদছে। দু মিনিট পরেই, গান্ধী খাট থেকে লাফ দিয়ে, নিচে পড়ে, ভিতরবাড়ির উঠোনের দিকে দৌড়ে গেল। হেলেনও আলুথালু অবস্থায় ওর পিছনে পিছনে ছুটল। ব্যাপারটা বোঝবার জন্য আমিও বাইরে গিয়েছিলাম।

সবাই রান্নাঘরে। গান্ধীর গলা শোনা যাচ্ছিল, বলছে, 'ও মামার সঙ্গে আড়ি

করেছে, পড়তে চায় নি।'

মাউইমায়েরা কী সব বলছিলেন। তার মধ্যে বড়দিদির গলাও মিশে গেছে। হেলেনের গলা শুনতে পাচ্ছিলাম, 'আমি মামার সঙ্গে মোটেও আড়ি করি নি। আমি খালি কথা বলি নি। ও আমাকে খামচি কেটেছে, চুল টেনে খুলে দিয়েছে, পা দিয়ে লাথি মেরেছে।'

আমি রান্নাঘরের দরজায় যাবার আগেই, বড়দিদির গলা শুনেছিলাম, 'গান্ধী, তোকে আজ আমি দেখাচ্ছি।'

বড়দিদি যেমনি পিঁড়ি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, গান্ধী অমনি ওর ধন-ঠাকুমার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বড়দিদি হেলেনকে বলেছিলেন, 'আড়ি করিস নি তো, মামার সঙ্গে কথাই বা বলছিলি না কেন?'

হেলেন কোনো জবাব দেয় নি। আমার দিদি, আমাকে দেখতে পেয়ে, হাতের ইশারায় কাছে ডেকেছিল। নতুন বউ বলে, শাশুড়িদের সামনে, এখনও গলা শুনিয়ে কথা বলতে পারে না। আমি ওর কাছে গিয়েছিলাম। ও আমার একটা হাত ধরে, ফিস ফিস করে বলেছিল, 'হেলেনকে মেরেছিস?'

'না তো।'

'তবে ও তোর সঙ্গে কথা বলছে না কেন?'

'কী জানি।'

'কী জানি না, নিশ্চয়ই তুই কিছু করেছিস।'

আমার রাগ হয়ে গিয়েছিল। আমি এক ঝটকা দিয়ে, দিদির হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিলাম, 'ধুত্তেরি শালা!'

দিদির ফিস ফিস গলা আর থাকে নি, আর্তস্বর শোনা গিয়েছিল, 'শালা! হে ভগবান, কী সর্বনাশ!'

বড়দিদি তখন আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছিলেন। দিদিকে হেসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী হল তোমাদের দিদি-ভাইয়ের?'

একটা খারাপ কথা উচ্চারণ করে ফেলেছি, সেটা আমি বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু তখন আর কোনো উপায় ছিল না। একবার মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছে। এর জন্য বিশেষ করে, জামাইবাবুর কাছেই আমাকে বকুনি খেতে হবে, জানতাম।

দিদি ফিস ফিস করে বড়দিদিকে কী বলেছিল। বড়দিদি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'ও কথা আর বোল না ভাই।'

আমি বলেছিলাম, 'দেখুন না, বলছি আমি হেলেনকে কিছু বলি নি। তবু খালি বলছে, আমি কিছু বলেছি। ও একটা পেত্নী।'

বড়দিদি বলেছিলেন, 'ছি ভাই, দিদিকে ও রকম বলতে নেই।'

মাউইমায়েরা সব সময়ে কিছু বলছিলেন। কী বলছিলেন, আমি কিছুই শুনছিলাম না। একজন উঠে এসে বলেছিলেন, 'কী খাবে বাবা, চল, তোমাকে খেতে দিই।'

মাউইমায়েরা খালি খাওয়াতে চান। তখন আমার মোটেই খেতে ইচ্ছা করছিল না। তখন খাওয়ার সময়ও না। মাউইমায়েরা বোধ হয় ভেবেছিলেন, আমি আমার দিদির কাছে খেতে চাইছি, বা খাবার খেলেই আমি শান্ত হয়ে যাব। আমি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে, আবার বড় ঘরে চলে গিয়েছিলাম। হেলেনের ওপর আমার এত রাগ হচ্ছিল! মনে মনে ভেবেছিলাম, গান্ধী ওকে মেরেছে, বেশ করেছে। আরো মারল না কেন। সোরিদের বাড়ি যাবার সময় থেকে ও রকম করছিল। এই জন্য মেয়েদের আমার একটুও ভালো লাগে না।

আমি ঘরে গিয়ে, খাটের ওপর উঠে, বেড়ার কাছে সরে গিয়েছিলাম। বেড়ার গায়ে

কাঠের বাতি-দানের ওপরে হ্যারিকেনটা জ্বলছিল। আমি সবে বই খুলে নিয়ে বসেছি, হেলেন ঘরে এসে, খাটের ওপর উঠেই, প্রায় আমার গা ঘেঁষে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। আমি একটু সরে বসেছিলাম। দেখেছিলাম, ও লেপের ঢাকা থেকে মুখটা বের করে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। চুলের বিনুনি দুটো খুলে গিয়েছিল। ফিতেটা ঝুলছিল। বেশ হয়েছে।

কিন্তু হেলেন তাকিয়ে তাকিয়ে আমাকে দেখছিল দেখে, রাগ হচ্ছিল। উঠে যাব কী না ভাবছিলাম। হেলেন আমার গায়ের কাছে আরো সরে এসেছিল। বলেছিল, 'মামা, আপনি রাগ করেছেন?'

'না।'

'আমার খুব মন খারাপ হয়েছে।'

হেলেনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন?'

হেলেন আমাকে পাল্‌টা জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি কি সোরির মামা?'

অবাক হয়ে বলেছিলাম, 'আমি ওর মামা হতে যাব কেন?'

হেলেনের গলা বন্ধ হয়ে আসছিল। তবু বলেছিল, 'তবে আপনি ওকে এত ভালোবাসেন কেন?'

হেলেনের কথা শুনে আমি আরো অবাক হয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'সোরি তো ভালো মেয়ে।'

হেলেন আমার সে কথার কোন জবাব দেয় নি। বালিশে মুখ কাত করে কেঁদেছিল। ওর ফরসা মুখটা, টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল। মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বরং ভাবছিলাম, দিদি বা বড়দিদি হেলেনকে কাঁদতে দেখলে ভাববেন, আমি ওকে বকেছি বা ঝগড়া করেছি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি কাঁদছ কেন?'

হেলেন সে কথার কোন জবাব দেয় নি। আমি খাটের থেকে নেমে, ঘরের বাইরে, বড় উঠোনে চলে গিয়েছিলাম। আধখানারও কম চাঁদ আকাশে ছিল। উঠোনে আমার ছায়া পড়েছিল। বাইরে কেউ নেই। সবাই ঘরে। হুঁকোর গুড়-গুড় শুনতে পাচ্ছিলাম। তালুইমশায়ের ঘর থেকে শব্দটা আসছিল। ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছিল। আমি দূরে বিলের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। জল দেখা যায় না, কিন্তু মনে হচ্ছিল, ওখানে বিল আছে।

খালি পায়ে আমার শীত করছিল। তাঁতের ঘরের দরজাটা খোলা। টিম-টিম করে একটা আলো জ্বলছিল। তখন সেখানে কোনো কাজ হচ্ছিল না। রাত্রে তাঁত চলে না। সেই সময় নিশ্বাসের শব্দে চমকে তাকিয়ে দেখেছিলাম, হেলেন এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়েছে। বলেছিল, 'মামা, ঘরে চলুন। আমি আর কাঁদব না।'

আমি হেলেনের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। হেলেন আমার দিকে চেয়ে হেসেছিল।

আমি ঘরে ফিরে গিয়েছিলাম। তখন আর আমার পড়তে ইচ্ছা করছিল না। খাটের ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। হেলেন আমার গায়ে লেপটা টেনে দিয়েছিল। চোখ বুজে থেকে আমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপরে আর দিদি বড়দিদি কারোর ডাকেই খেতে উঠি নি। কিছুতেই আমার ঘুম ভাঙতে চাইছিল না।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে, তাড়াতাড়ি স্নান করে, সুরেনদাদার সঙ্গে বসে ভাত খেয়ে নিয়েছি। আজ হাটের দিন। আজ খুব ব্যস্ততা। মালপত্র নিয়ে যাদের যাবার, তারা চলে গিয়েছে। সুরেনদাদা না গেলে, কোনো কিছু তদারকি হবে না। জামাই-বাবু এ-বাড়িতে শহুরে ছেলে। তিনি হাটে যান না, যাবার দরকারও নেই। তিনি

কারবার ব্যবসায়ের কিছুই জানেন না। দিদি জামাইবাবু থেকে শুরু করে, সবাই আমাকে সাবধান করে দিলেন, আমি যেন একলা কোথাও না যাই। বিরাট হাট, হাজার হাজার লোক। হারিয়ে গেলে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মনে মনে ভাবলাম, আমাদের সুত্রাপুর বা রায়সাহেবের বাজার থেকে নিশ্চয় বড় কিছু ব্যাপার না। সেখানে যখন হারিয়ে যাই নি, পাড়াগাঁয়ের হাটে নিশ্চয় হারিয়ে যাব না। সুরেনদাদা হাতে লাঠি, পকেটে ঘড়ি ঝুলিয়ে, আমাকে নিয়ে চললেন। যাবার সময় গান্ধী খুব কান্নাকাটি করল। ও হাটে যেতে চায়। সুরেনদাদা বললেন, 'না, তুই স্কুলে যা।'

জামাইবাবু গান্ধীকে নিয়ে অন্য দিকে চলে গেলেন। আমি এখন মুক্ত। আহ্! আমাকে কেউ এখন স্কুলে যেতে বলবে না। কী মজা! যাবার সময়, সোরিদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে হয়। দেখলাম সোরি ওদের বাড়ির রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে হাসল। বলল, 'হাটে যাচ্ছ?'

ঘাড় নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

সোরি বলল, 'তাড়াতাড়ি চলে এস, আমরা গল্প করব।'

'আচ্ছা।'

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, সোরি আমাকে কাল নকুলদানা খাইয়েছিল। ওকে আমি কিছু খাওয়াব। হাট থেকে কিছু কিনে নিয়ে আসব। খানিকটা যেতেই, আমার পাশে পাশে একটি ছেলে এসে চলতে আরম্ভ করল। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমি একে চিনি না, দেখি নি। কালো বড় বড় চুলে গাদা-গুচ্ছের তেল মেখেছে। তার ওপর চান করে এসেছে, এখনো জল ঝরছে। মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরেছে, তার ওপরে হাফ-শার্ট। পায়ে মেটে রংয়ের কাপড়ের জুতো। ঠোঁটের ওপরে, কালো গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'হাটে যাচ্ছ?'

আমি ওকে চিনি না শুনি না, কেন ওর কথার জবাব দিতে যাব। আমি হাঁটতে হাঁটতে সুরেনদাদার দিকে তাকালাম। সুরেনদাদা তখন একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলেছিলেন। যাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁর পরনে লুঙ্গি আর সাদা পাঞ্জাবী। হাতে লাঠি, পায়ে চামড়ার বুট জুতো, সুরেনদাদার মতোই। মাথার সাদা চুল ছোট করে কাটা, কিন্তু মুখে বড় বড় দাড়ি।

রাস্তায় অনেক লোক চলেছে। সুরেনদাদা সকলেরই চেনাশোনা। আমরা যে গ্রামের ওপর দিয়ে চলেছি, সেখানে বাড়ির সামনে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের সঙ্গেও সুরেনদাদা কথা বলছিলেন। সকলেই আমাকে দেখিয়ে, জিজ্ঞেস করছিল, 'এটি কে?'

সুরেনদাদা প্রত্যেককেই বলছিলেন, 'আমাদের যোগেন্দ্রর শালা।' বলে আমার দিকে চেয়ে একটু হাসছিলেন। কিন্তু আমার পাশে পাশে যে ছেলেটা চলেছে, তাকে সুরেনদাদা দেখলেন, কিছু বললেন না। ছেলেটা আমাকে আবার জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের মাধবদীর হাট আগে কখনো দেখেছ?'

ঘাড় নেড়ে বললাম 'না।'

ছেলেটা বলল, 'বিরাট বড় হাট।'

মাধবদীর হাটের কথা অনেকদিন থেকেই শুনে আসছি। মাধবদীর হাটকে বাবুর হাটও বলে। শুনে আমার অবাক লাগে, কত বড় হাট হতে পারে? পৃথিবীতে কি এত বড় হাট আর নেই?

ছেলেটা আবার বলল, 'তুমি নাকি খুব ভালো গান গাইতে পারো?'

ছেলেটা কে, আমি চিনি না। অথচ আমাকে এসব কথা জিজ্ঞেস করছে। ছেলেটা আমার থেকে বড়। জিজ্ঞেস করলাম, 'কে বলল?'

'সোরি।'

আমি ছেলেটার দিকে তাকালাম। ও হেসে বলল, 'সোরি আমার বোন। আমার নাম মাখন।'

তখন আমি মাখনের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। আমি ওকে 'তুমি' করেই বললাম, 'কাল তোমাদের বাড়ি গেছিলাম।'

'জানি। আমি তখন সরকার-বাড়িতে খেলতে গেছিলাম। আমরা ভলিবল খেলি। তুমিও আমাদের সঙ্গে খেলতে এস।'

সত্যি কথা বলতে কি, ফুটবল, ভলিবল, ও সব খেলতে আমার মোটেই ভালো লাগে না আমার সব বন্ধুদেরই প্রায় ভালো লাগে। অনেকে ভালো খেলতেও পারে। বললাম, 'আমার ভলিবল খেলতে ভালো লাগে না।'

'তাহলে দাড়িয়াবান্ধা খেল। সেটা ভালো লাগে?'

দাড়িয়াবান্ধা মানে গাদি। বললাম, 'লাগে।'

'ডাংগুলি?'

'হ্যাঁ।'

আসলে আমার মাঠ ঘাট বন বাদাড় ঘুরতে যত ভালো লাগে, সেই তুলনায়, খেলাধুলো ভালো লাগে না। হাঁক-ডাক চেঁচামেচি ছুটোছুটি খেলা খেলতে ইচ্ছা করে না। সেই জন্য মেজদার সঙ্গে আমার বনে না। ও খুব ভালো ফুটবল খেলতে পারে। আমার বড়দাও ভালো খেলতে পারেন। আমিই শুধু পারি না। তবে ব্রতচারিটা মন্দ লাগে না। ব্রতচারির গানগুলো গাইতে আর তার সঙ্গে নাচতে আমার ভালো লাগে। জামাইবাবু খুব ভালো পারেন। ওঁর ব্রতচারিতে স্পেশাল ট্রেনিং আছে।

মাখন জিজ্ঞেস করল, 'বিলে নৌকা বাইতে যাবে একদিন?'

আমার মন-প্রাণ নেচে উঠল। বললাম, 'হ্যাঁ যাব। কবে যাবে?'

মাখন ঠোঁটে আঙুল চেপে, চোখের ইশারায় আমাকে সুরেনদাদাকে দেখাল। স্বর নামিয়ে বলল, 'এখন কিছু বোল না। কাল ইস্কুল থেকে এসে, তোমাকে নিয়ে যাব।'

আমি খুশি-ডগমগ হয়ে, মাখনের দিকে তাকালাম। ওকে আমার খুব ভালো বন্ধু বলে মনে হল। নৌকায় চাপতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। তার ওপরে সে নৌকার মাঝি যদি আবার নিজেই হতে পারি, নিজেই লগি-বৈঠা চালাতে পারি, তাহলে তো কথাই নেই আহ্, কী মজা!

হাটের কাছে যত আসতে লাগলাম, ততই রাস্তায় ভিড় বাড়তে লাগল। এত লোককে আমি কখনো একসঙ্গে হাটে যেতে দেখি নি। বহু লোকের মাথায় নানা রকমের মোট। চাল ডাল পাট কাপড় তো আছেই। অনেকের মাথায় হাঁস-মুরগীর ঝাঁকা। অনেকে গোরু-ছাগলও নিয়ে চলেছে। সেগুলোও যে হাটে বিক্রী করতে যাচ্ছে, আমি তা বুঝতেই পারি নি। দুধের হাঁড়ির তো কথাই নেই।

হায় দ্বাদশবর্ষের বালক, উনিশশো একাত্তর সালে পৌঁছে, এ-সবই তোমার কাছে একদিন স্বপ্নবৎ মনে হবে, তুমি কি তা বুঝতে পারছিলে? সেই সাবেকি পয়সার হিসাবে, খাঁটি মাখন-ভাসানো দুধ, সকালে তিন পয়সা সের। একটু বেলায় দেড় পয়সা সের। জানতে না, দেড় পয়সার দুধ দেড় টাকায়ও পাওয়া ভার হবে। মাখন-ভাসানো তো দূরের কথা। জল আর দুধ সমান মাপে মেশানো। তৃতীয় অবশিষ্ট যা, এইটুকুই। জল মাত্র অর্ধেক।

কিন্তু তোমার পরের চিন্তা পরে। বেঁচে থাকার দাম হিসাবে, গোটা জাতিকে তা দিতে হবে। এটা বিশ্বেরই নিয়ম। আমার চারপাশ দিয়ে, বহু লোক বহু পশরা নিয়ে চলেছে। তারপরে ক্রমে ক্রমে একটা কোলাহলের সুর ভেসে আসতে লাগল। যত

এগোলাম, কোলাহল বাড়তে লাগল। যখন দূর থেকে হাট দেখতে পেলাম, তখন নিজেরই যেন ভিরমি লেগে গেল। শুধু মানুষ আর মানুষ।

এতক্ষণ পরে, সুরেনদাদা মাখনের দিকে ফিরে, আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'ওর হাতটা চেপে ধরে রাখত মাখন। দেখিস যেন এদিক ওদিক না চলে যায়। আমরা আগে ধীরেনের দোকানে যাব।'

মাখন সঙ্গে সঙ্গে আমার একটি হাত চেপে ধরল। ওর হাত যেমন বড়, তেমনি শক্ত। ওর সঙ্গে আমি কোনোদিনই পাঞ্জায় পারব না। সোয়েটার গায়ে দিয়ে, এখন আমার ঘাম হচ্ছে। শীতের রোদকে চড়া মনে হচ্ছে।

হাটের মধ্যে ঢুকে, মাখন আমাকে শক্ত হাতে ধরে, ভিড়ের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে চলল। সুরেনদাদা আমাদের আগে আগে চলেছেন। হাটের কোথায় শুরু, কোথায় শেষ, কিছুই বুঝতে পারছি না। সারি সারি অনেকগুলো ঘরের সামনে চলে এলাম আমরা। টিনের বা বেড়ার ঘর। ঘরগুলো সবই বড় বড়। কাপড়ের দোকানই বেশি। লোকজনের ভিড়ও খুব। আমি মনে মনে স্বীকার করলাম, আমাদের শহরের বাজার এর কাছে কিছুই না। আমাদের কতগুলো বাজার একত্র করলে যে এত বড় একটা হাট হয়, বুঝতে পারছি না। এ কথাও ঠিক, এখানে কেউ হারিয়ে গেলে, তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তবু আমার হাটের চারদিকে ঘুরে দেখবার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে। কেবলই মনে হচ্ছে, কত মানুষ, কত কিছুই না এই হাটে দেখবার আছে। এখানে কেউ হারিয়ে যায়? তাহলে তো সবাই হারিয়ে যেত। এখানে কেউ হারায় না। সকলে সবাইয়ের সঙ্গে মিশে যায়। আর তেমনি সবাইয়ের সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা করছে। ইচ্ছা করছে, সব জায়গায় গিয়ে, সব কিছু ঘুরে ঘুরে, বেড়িয়ে দেখি।

মাখনকে বললাম, 'হাটটা ঘুরে বেড়িয়ে দেখা যায় না?'

মাখন বলল, 'আমি তোমাকে নিয়ে যাব। এখন না, একটু বেলা পড়ুক, তখন নিয়ে যাব।'

মাখনের মতো সঙ্গী পেলে ভয় কী, কিন্তু এতদিন ধরে শুনে এসেছি, মাধবদীর বাবুর হাটের কথা। সবাই যা বলত, সবই সত্যি। আমরা একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। বেশ বড় ঘর। মেঝের এক পাশে চারটে সেলাই মেশিন, চারজন সেলাই করে চলেছে। আর এক পাশে মস্ত বড় একটা চৌকি। তার ওপরে শীতলপাটি পাতা। চৌকির এক পাশে, টিনের দেওয়াল ঘেঁষে বড় কাঁচের আলমারি। তার মধ্যে নানান্ রকম রঙীন জামার কাপড়। চৌকির ওপরে, এক দিকে কাঠের বাক্স। কয়েকটা খেরো-বাঁধানো খাতা তার পাশে।

ও রকম কাঠের বাক্স দেখলেই মনে হয়, তার মধ্যে অনেক টাকা-পয়সা আছে। বাক্সের কাছে একজন বসে আছেন। পরনে লুঙ্গি, গায়ে পাঞ্জাবী। আরো দু-তিনজন বসে আছেন তাঁকে ঘিরে, কারোকেই শহরের মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। যিনি কাঠের বাক্সের সামনে বসে ছিলেন, তিনি আমাকে দেখেই হেসে উঠে এলেন। আমার নাম ধরে ডেকে, হাত ধরে কাছে টেনে নিলেন। দেখেই চিনতে পারলাম জামাইবাবুর ছোট ভাই, বীরেন্দ্রবাবু। বীরেনদাদা। এই দর্জির দোকানটা উনি চালান। আরো কী করেন জানি না। শুনেছি উনি এখানেই থাকেন। মাঝে মধ্যে বাড়ি যান। বীরেনদাদার বিয়ে হয় নি।

বীরেনদাদা বললেন, 'বোস ভাই বোস। হেঁটে আসতে কষ্ট হয় নি তো?'

'না।'

'আজ তুমি আমার অতিথি। কী খাবে বল?'

অতিথি হলেই খেতে হয় জানি। কিন্তু এখন আমার কিছুই খেতে ইচ্ছা নেই। চৌকিতে যাঁরা বসেছিলেন, তাঁরা আমাকে দেখছিলেন। একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'বীরেন, এই মিষ্টি ছাওয়ালটি কে?'

বীরেনদাদা বললেন, 'সোনাদাদার শালা।'

ভদ্রলোকটি চৌকি থেকেই হাত টেনে আমাকে কাছে বসালেন। আমার পায়ে জুতো। চৌকিতে উঠতে পারি না। উনি চিবুক ধরে, আমার মুখ তুলে বললেন, 'যোগেন্দ্রর শালা! চমৎকার, ঢাকা শহরের ছেলে বল।'

সুরেনদাদা বললেন, 'বিক্রমপুরের ছেলে।'

ভদ্রলোকটি বললেন, 'সে কথা তুমি বলবে, তবে আমি জানব? তোমাদের বাড়িতে, যোগেন্দ্রর বৌ-ভাতে খেতে যাই নি? পাকস্পর্শের খাওয়া খেয়ে আসি নি?'

আর একজন জোরে হেসে উঠে, যেন ভরা কলসীর জল পড়ার মতো বগ বগ করে বললেন, 'আহা, বুঝলেন না কেশবঠাকুর, সুরীন আমাদের জানাচ্ছে, ওর আত্মীয় হল বিক্রমপুরের লোক।'

সবাই গলা মিলিয়ে হাসলেন। বীরেনদাদা তার মধ্যেই গলা তুলে বললেন, 'আরে কেষ্ট, তাড়াতাড়ি দু-কল্‌কে তামাক সাজ।'

ঘরের পিছন থেকে জবাব এল, 'আপনার বলবার আগেই কাজে লেগেছি।'

তাড়াতাড়ি দু-কল্‌কে তামাক সাজতে হবে কেন, বুঝলাম না। আমাকে কি তামাক খেতে দেওয়া হবে? সুরেনদাদা বললেন, 'হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি এক ছিলিম তামাক খেয়ে বেরিয়ে যাই। হ্যাঁ রে বীরেন, মাল কি ওরা গৌরাঙ্গর ঘরে জমা দিয়েছে?'

বীরেনদাদা বললেন, 'দিতে গেছে। আপনি তামাক খান, ব্যস্ত হবেন না। গৌরাঙ্গর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। আপনি গেলেই, আপনার হাতে টাকা দিয়ে দেবে।'

যাঁকে, কেশবঠাকুর বলা হল, তিনি সুরেনদাদাকে বললেন, 'বসো হে মহাজন, বসো। তামাক খাও, জিরোও। মা-লক্ষ্মী নিজে তোমার টাকা নিয়ে বসে আছেন।'

সুরেনদাদাকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে। তবু বললেন, 'মা-লক্ষ্মী আর তেমন দিচ্ছেন কোথায় কেশবদাদা। সুতোর দাম, মজুরির খরচ, সবই তো আস্তে আস্তে বাড়ছে।'

আমি এ রকম একটা জায়গায়, এ রকম মানুষের মধ্যে কখনো আসি নি। বীরেনদাদা আবার গলা তুলে ডাক দিলেন, 'বংশী শোন।'

সেলাই-মেশিন বন্ধ করে একজন উঠে দাঁড়াল। বীরেনদাদা বললেন, 'আদারির ঘর থেকে ক্ষীরমোহন আর বার্সাভোগ নিয়ে এস।'

চৌকির ওপরে যাঁরা বসে ছিলেন, তাঁরা একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'জয় গৌর, জয় গৌর!'

কেশবঠাকুর বললেন, 'সাধুর চরণ ভরসা। বীরেনের ঘরে এসে আজ লাভ হল।'

বলে তিনি, আমার চিবুক তুলে ধরে, আমার মুখের দিকে তাকালেন। ওঁর মাথায় কাঁচা-পাকা বড় বড় চুল, ঘাড়ের কাছে ছাঁটা। গায়ের রংটা কালো। কিন্তু চোখ-মুখ বেশ ভালো। নাকটা বেশ লম্বা আর চোখা। চোখ দুটো ডাগর। দাঁতে পান খাওয়ার দাগ আছে। হাসিটা দেখে মজা লাগে। বেশ খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। আমার লজ্জা করল। বলে উঠলেন, 'দেখেছ বীরেন, যোগেন্দ্রর শালার চোখ দেখেছ?'

বীরেনদাদা বললেন, 'আপনি দেখুন।'

'আমি তো দেখছিই। চোখ যেন কথা কয় হে। মুখখানি দেখেছ? আর এই গজদাঁতের হাসি? আমি হরির শরণ নিয়ে বলছি, এ ছাওয়াল গান গাইতে পারে।'

কেশবঠাকুরের কথা শুনে আমার আরো লজ্জা করল। আমি মুখ নামিয়ে নিলাম। মাখন বলে উঠল, 'হ্যাঁ জানে। কাল আমাদের ঘরে বসে গান করেছে।'

কেশবঠাকুর মাথায় ঝাঁকি দিলেন। তাঁর বাবরি চুলে ঝাপটা লাগল। বললেন, 'আরে আমি হরির শরণ নিয়ে বলেছি, তা মিথ্যা হতে পারে না।'

একজন বলে উঠলেন, 'ওহে সুবীন, ভাইয়ের শালা সামলাও, কোঁচায় বেঁধে নিয়ে পালাও, কেশবদাদার নজরে পড়েছে।'

এসব কথার মাথা-মুন্ডু আমি কিছুই বুঝি না। কেশবঠাকুর বললেন, 'সত্যি বলেছ ভাই, একে আমার নজরে ধরেছে। একে পেলে আমি বৃন্দাবন-লীলার আর একখানি নতুন পালা লিখব। একে পীত বসন পরিয়ে, মাথায় ময়ূর-পাখার চূড়ো দিয়ে, হাতে বাঁশীটি ধরিয়ে যদি আসরে তুলতে পারি, সকলের মন-প্রাণ হরণ হবে।'

সুরেনদাদা বললেন, 'হ্যাঁ, একবার গিয়ে বলুন না যোগেন্দ্রকে। সে কী বলে শুনবেন?'

কেশবঠাকুর বললেন, 'যোগেন্দ্রকে বলব! ঠাকুর ঠাকুর! সে শহরের বাবু মানুষ, আমার মতো কেষ্ট-যাত্রাওয়ালাকে লাঠি নিয়ে তাড়া করবে। কিন্তু আহা, এমন চাঁদবদন যদি পেতাম হে, সবাইকে হাসিয়ে কাঁদিয়ে মাত করতাম। তবে এ যা মুখের ছাঁদ-বাঁধ, চোখের নজর, হাসির ধার, একে নীলবসনা সুন্দরীও চমৎকার মানাবে।'

একজন বললেন, 'গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল।'

কেশবঠাকুর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'হ, যা কইছ। যারে মনে ধরে, তারে মিলে না।'

বলে, আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, যাত্রা করবে?'

দ্বাদশ বর্ষের বালক যে সে-সব জানে না, তা ভেবো না। আসরে আমার নামা হয়ে গিয়েছে। তবে সে বৃত্তান্ত এখানে না। বারান্তরে হবে। কিন্তু সে আসরের ব্যাপার আলাদা। এখন আমার মালিক আমি না। তবু, কেশবঠাকুরকে আমার ভালো লাগছে। আমার ইচ্ছা করছে, ওঁর সঙ্গে চলে যাই, যাত্রা-গান করি। ভাবতে ভালো লাগে, দলের সঙ্গে চলে যাব নানান দেশে। দেশে দেশে গান গেয়ে বেড়াব। যাত্রা দেখে দেখে, যাত্রার নায়ক হওয়ার শখ অনেক কাল। তাই বলেই ফেললাম, 'করব।'

কেশবঠাকুর চিৎকার করে ধ্বনি দিলেন, 'জয় গৌরাঙ্গ!'

বাকীরা সব হাসলেন। সুরেনদাদা আমাকে বললেন, 'অমন কথাটি মনেও এনো না ভাই। তাড়াতাড়ি বাড়ি চল, ঘরের ছেলে ঘরে নিয়ে যাই।'

ইতিমধ্যে তামাক এল। দুটি হুঁকোর, একটি গেল সুরেনদাদার হাতে, আর একটি কেশবঠাকুরের। যে তামাক সেজে নিয়ে এল, নাম আদারি। দেখলাম, প্রায় আমার বয়সী একটি ছেলে। ও আমার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে। বীরেনদাদা ওকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ আমার অতিথিকে কী খাওয়াবি আদারি? কী রান্না করবি?'

আদারি বলল, 'কবুতরের ঝোল।'

কবুতরের ঝোল! মানে পায়রার মাংস? কোনদিন খাই নি। কিন্তু শুনেছি। শুনেছি, খেতে নাকি খুব ভালো। আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'কাটবার সময় আমি দেখব!'

কেশবঠাকুর বলে উঠলেন, 'হরি হরি! দ্যাখো দ্যাখো, এমন মনচোরা শ্রী, সেই ছেলে বলে কী না, কবুতর কাটা দেখবে। অমন কাজটি কোরো না বাবা, ওসব দেখতে নেই। তুমি হলে জীবের রক্ষক।'

তা বললে কী হবে। কেমন করে কবুতরকে কাটা হবে, দেখতে বড় কৌতূহল। বালককে তোমরা কী বুঝলে হে মশাইরা? নিমাই সন্ন্যাসের পালা দেখতে গিয়ে যার চোখের জলে বুক ভেসে যায়, তারই চোখে অপার কৌতূহল জাগে, কেমন করে পাখি হত্যা হয়, তাই দেখবে। একে বলে বালকের মন।

কেশবঠাকুর আদারিকে ধমক দিয়ে বললেন, 'আরে হারামজাদা আদারি, তুই আমার কৃষ্ণকে কবুতর মেরে খাওয়াবি কেন? ছানার ব্যঞ্জন রেঁধে দে। পরমান্ন রেঁধে খাওয়া।'

সুরেনদাদা একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, কৃষ্ণের জাত মারিস না আদারি। ননী মাখন এনে খাওয়া। মালপোয়া তৈরি কর।'

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। এসব আমার খেতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু আমি তো ভাত খেয়ে এসেছি। আবার ভাত খাব নাকি? যার নাম কেষ্ট, সে মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে এল। অন্য হাতে কয়েকটা ধোয়া কলাপাতা। সেই পাতায় করে, সবাইকে খাবার দেওয়া হল। বার্সাভোগের চেহারা কী! একটা বড় মানুষের থাবার থেকে বড়। গোল আর চ্যাপটা, রসে ভেজানো ছানার মিষ্টি। দেখে আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। একটুও খেতে ইচ্ছা করছে না। বললাম, 'আমি খাব না।'

বীরেনদাদা বললেন, 'ও কথা বোলো না, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।'

'না, আমি কিছুতেই পারব না। ভাত খেয়ে এসেছি।'

'এতটা রাস্তা হেঁটে এসেছ, ওসব হজম হয়ে গেছে।'

'সত্যি বলছি, হজম-হয় নি।'

সবাই হেসে উঠলেন। সুরেনদাদা বললেন, 'আচ্ছা, বার্সাভোগ এখন থাক, একটা ক্ষীরমোহন খেয়ে নাও।'

এঁরা বোঝেন না, আমার কত খারাপ লাগছে। তবু একটা ক্ষীরমোহন পাতায় করে নিতে হল। হঠাৎ মাখনের কথা মনে পড়ল। এদিকে-ওদিকে চেয়ে দেখি মাখন ঘরে নেই। সুরেনদাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মাখন কোথায় গেল? ও মিষ্টি খাবে না?'

সুরেনদাদা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'তাই তো, মাখন কোথায় গেল রে আদারি?'

আদারি বলল, 'কী জানি।'

বীরেনদাদা বললেন, 'মাখনের জন্য মিষ্টি রেখে দে। যখন আসবে, তখন খাবে।'

আমার মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। সবাই যখন মিষ্টি খাচ্ছে, মাখন তখন কোথায় চলে গিয়েছে। এ সময়েই কেন চলে গেল ও? কোথায় চলে গেল? ক্ষীরমোহনের স্বাদ আমার কাছে আরো বিস্বাদ লাগল।

এক আসর ভাঙল। আর এক আসর জমল। বেচা-কেনার আসর। সুরেনদাদা বেরিয়ে গেলেন। যাবার আগে আমাকে বলে গেলেন, 'তুমি বোসো, আমি ঘুরে আসছি।'

এক সময়ে দেখলাম, সবাই কাজে ব্যস্ত। আমি একলা একলা বসে আছি। বাইরে হাজার হাজার লোক। বিরাট কোলাহল। আমি দোকানের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। বুঝতে পারলাম না, আমাকে স্রোত টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম, সারি সারি দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখি। লাইন ধরে যাব, লাইন ধরেই ফিরব। দূরে তো কোথাও যাচ্ছি না।

কত রকমের দোকান। প্রথম সারিটায় কাপড়ের দোকানই বেশি। দর্জির দোকানও কম না। একসঙ্গে অনেকগুলো সেলাই মেশিনের আওয়াজ হচ্ছে। তারপরে দেখি, কাঁসা-পিতলের দোকান। চোখ ঝলসে যায়, এমন ঝকঝকে বাসনপত্র। দেখতে দেখতে, কখন

কোন্‌দিকে মোড় ফিরলাম, বুঝতে পারলাম না। দেখলাম, বড় বড় পাটের আড়ত। বীরেনদাদার দোকানের জন্য, আবার একদিকে মোড় নিলাম। দেখি, শত শত গোরু। গোরু আর মানুষের ভিড়ে চলা যায় না।

তারপরে কোথায় যে হারিয়ে গেলাম, নিজেই বুঝতে পারলাম না। কোথাও বোঝা হাঁস মুরগী পায়রা। কোথাও ধান চাল ছোলা ডাল। কোথাও কাপড় আর রং-বেরংয়ের সুতোর বাণ্ডিল। এমন কি তাঁতের যন্ত্র।

এক জায়গায় ফুলুরি ভাজতে দেখে, খেতে ইচ্ছা হল। আমার পকেটে তিনটে রাজা পঞ্চম জর্জের ছাপ দেওয়া রুপোর টাকা। ছ'সাত আনা খুচরো পয়সা। সবই রুমালে বাঁধা। আসবার সময় দিদি রুমালটা দিতে চায় নি। জোর করে নিয়ে এসেছি। রুমালটায় দিদির বাক্সের গন্ধ। এক জায়গায় খানিকটা সিঁদুর লেগে আছে। রুমালের গিঁট খুলে, একটা আনি বের করলাম। এক পয়সার ফুলুরি কিনে, তিন পয়সা পকেটে নিয়ে, খেতে খেতে ঘুরতে লাগলাম।

ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে এসে পড়লাম জলের ধারে। নদী না খাল, বুঝতে পারছি না। নদী কি এত সরু হয়? এপার ওপার খুব চওড়া না। অনেক নৌকা দাঁড়িয়ে আছে। মাল নামছে, মাল উঠছে।

এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কয়েকটা ছোট নৌকা, ছই-ঢাকা। ভিড় নেই। একটা নৌকার সামনে, ডাঙার ওপরে রান্নাবান্না চলেছে। সবাই মেয়ে। বুড়ি আর অল্পবয়সী। দু-তিনটে বাচ্চা আশে-পাশে হামা দিয়ে খেলছে। খুঁটিতে কয়েকটা ছাগল বাঁধা। বড় ঝাঁকায় কয়েকটা মুরগী। একটা বুড়ি আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। তার পাশে, আমার দিদির বয়সী একটি মেয়ে, কালো, কিন্তু বেশ সুন্দর। সে আমার দিকে চেয়ে হাসল। তার কালো চোখের তারা দুটো দেখে, সেই ধাঁধার কথা মনে পড়ে গেল, 'তাকের ওপর কালো শিশি, নড়ে চড়ে পড়ে না, বল তো সেটা কী?' তার মানে হল চোখ। আমার বউদির কাছে শিখেছি।

মেয়েটির চোখ দেখে, আমার সেই রকম মনে হল। আমি তাদের সামনে গেলাম।

বুড়ি বলল, 'আইয়ো আমার নদ্যার চাঁন্, তোমারে ভানুমতীর খেলা দেখাই।'

বুড়ির হাতের কাছে একটা চটের থলি। তার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে নিয়ে এল, ছোট কাঠের হাতলে গাঁথা ছুঁচলো লোহার শলা। বুড়ি নিজের একটা চোখের পাতা ফাঁক করে, চোখের মধ্যে সেই লম্বা ছুঁচলো লোহার শলাটার সবটা ঢুকিয়ে দিল। দেখে আমার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। কিন্তু এত বড় শলাটা ঢোকাল, একফোঁটা রক্ত পড়ল না। একবার না, কয়েকবার। আমার গায়ে কাঁটা দিতে লাগল। বুড়ি বলল, 'দেখেছ চাঁন্?'

আমি ঘাড় নাড়লাম। বুড়ি হাত পেতে বলল, 'একখানা পয়সা দাও।'

আমি তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে একটা পয়সা বের করে দিলাম। বুড়ি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'আহ্, আমার সোনার চাঁন্।'

এবার সেই মেয়েটি আমার সামনে এসে দাঁড়াল। বাতাস লাগলে ডগডগে কচুরিপানা যেমন কাঁপে, মেয়েটি তেমনি করে যেন কাঁপছে। হাসছে কী না। হেসে আমার গাল টিপে বলল, 'এস আমার কালিয়া নাগর, তুমি আমার ছোট বর। (আইয়ো আমার কালিয়া নাগর, তুমি আমার ছোট সোয়ামী।)'

আশে-পাশে আরো যে সব মেয়েরা রান্না করছিল, তারা হেসে উঠল। আমার লজ্জা করল, কিন্তু ভালোও লাগল। একটি মেয়ে বলল, 'ওলো সারি, তোর ছোট বরটি বড় সুন্দর। ছেড়ে দিস না যেন।'

সারি ওর হাতের কাঁচের চুড়ি রিনরিনিয়ে, কোমর বেঁকিয়ে, যাত্রার দলের সখীদের

মতো নাচের ভঙ্গি করল। তারপরে বুড়ির হাত থেকে সেই শলাটা নিয়ে বলল, 'এস, তোমার চোখে বিঁধিয়ে দিই, ও নজর আর আমার সইছে না।'

আমি ভয়ে সরে গেলাম। সারি খিলখিলিয়ে হাসল। বলল, 'তবে নিজের নজর খাই।'

বলে শলাটা বারে বারে চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। বলল, 'বুলির মাথা খাই।' বলেই শলাটা জিভের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। বলল, 'অঙ্গের মাথা খাই।'

বলে, বুকের কাছ থেকে কাপড় একটু সরিয়ে, বিঁধিয়ে দিল। দেখছি আর সিঁটিয়ে যাচ্ছি, শিউরে উঠছি। রক্ত কেন বেরোচ্ছে না, বুঝতে পারছি না।

সারি বলল, 'লাগ্ ভেলকি লাগ্, আমার কালিয়া নাগরের চোখে লাগ্।'

'কেমন লাগছে গো?'

বললাম, 'ভালো।'

সারি হাত বাড়িয়ে বলল, 'তবে দুটো পয়সা দাও।'

আমি পকেট থেকে দুটো পয়সা বের করে ওর হাতে দিলাম। পয়সা দুটো ঝন্ ঝন্ করে বাজিয়ে, ও আবার নাচের ভঙ্গি করল। সবাই হেসে উঠল। একটি আধ-বুড়ি বলল, 'ওগো, নাগর চুরি হয়ে গেল।'

সারি আমার হাত ধরে বলল, 'কালী নাগের খেলা দেখবে গো আমার বর?'

আমার মন মেতে উঠল। বললাম, 'দেখব।'

ও আমার হাত ধরে নিয়ে গেল একটা গাছের তলায়। দুর্বা ঘাসের ওপর বসিয়ে দিয়ে বলল, 'তবে এই কামরাঙা গাছের নিচে বোসো, আমি কালী নাগ নিয়ে আসি।'

বলে সে ছুটে একটা নৌকায় উঠে গেল। নৌকাটা দুলে দুলে উঠল। একটা বাচচা হামা দিয়ে আমার সামনে এল। গলায় একটা সুতোর সঙ্গে কয়েকটা কাঠির মতো কী যেন ঝুলছে। মাড়ি দেখিয়ে, আমার দিকে চেয়ে হাসল। সারি এল ঝাঁপি নিয়ে। বাচচাটকে তুলে রেখে এল একটু দূরে। তারপরে ঝাঁপি খুলতেই, কালো চকচকে সাপ, খাড়া হয়ে ফণা তুলল। জিভ বের করে হিস হিস শব্দ করতে লাগল।

সারি হাতের মুঠি পাকিয়ে সাপের মুখের কাছে নিয়ে, সুর করে বলতে লাগল, 'ও বাবা মনসার ছেলে হে, নাচ কর গো।'

সাপটা দুলছে, ফুঁসছে, সারির হাতের মুঠি দেখছে। হঠাৎ ছোবল মারছে।

সারি বলে উঠছে, 'খাইল রে খাইল, মনসার পোলায় খাইল।'

আমি চোখ বড় বড় করে দেখছি, আর গায়ের মধ্যে শির শির করছে। এত বড় সাপ আমি আর দেখি নি। আমাদের শহরের বাড়িতে, সাপুড়ের খেলা দেখেছি। তাদের সাপ এত বড় ছিল না। খেলতে খেলতে সাপটা হঠাৎ মাথা নামিয়ে, হিল হিল করে মাটিতে চলতে আরম্ভ করল। সারি তার ল্যাজ ধরে টেনে তুলল। আর এক হাতে ফণা ধরে, মুখের কাছে নিয়ে বলল, 'আমাকে ছেড়ে কোথায় যাস রে কালী নাগ? আমার কালিয়া নাগরের কাছে যাবি?'

বলে একেবারে আমার গায়ের কাছে এসে, জানু পেতে বসল। সাপের ফণাটা মুখের কাছে এনে বলল, 'নেবে গো নাগর?'

নিতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু কামড়ে দেয় যদি। রাখব কোথায়? আমার পোয় মানবে কি? খেলা দেখাতে পারব? বললাম, 'বাড়িতে সবাই রাগ করবে।'

সারি বলল, 'তাহলে থাক। তোমার ভালো লেগেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কাকে? আমার নাগকে, না আমাকে?'

বললাম, 'দুজনকেই।'

সারি আমার গাল টিপে দিয়ে বলল, 'ওগো আমার নাগর গো। তবে আমাকে

চার আনা পয়সা দাও।'

আমি পকেট থেকে এবার রুমাল বের করে গিঁট খুললাম। রুপোর টাকা চকচক করে উঠল।

সারি বলল, 'ওহে আমার ছোট বর। আমাকে একখানি টাকা দাও।'

আমি একটি টাকা তুলে ওর হাতে দিলাম। সারি দাঁড়িয়ে উঠে, সাপটাকে গলায় জড়িয়ে নিল। টাকাটা তুলে, সবাইকে দেখিয়ে বলল, 'দ্যাখো গো তোমরা দ্যাখো, আমার কালিয়া নাগর দিয়েছে।'

মেয়েরা সবাই একসঙ্গে হেসে উঠে, অনেক কথা বলে উঠল। সারি বলল, 'আমার নাগরের কাছে আরো টাকা আছে। নাগর আমাকে সব দিয়ে দেবে।'

বলে আমার দিকে চেয়ে, চোখ নাচিয়ে বলল, 'দেবে না গো নাগর?'

এবার আমার মনে একটু ঠেক লাগল। বলতে পারলাম না, সব দেবো। সোরির জন্য যে কিছু খাবার কিনে নিয়ে যেতে হবে। শুধু সোরি না, হেলেন আছে, গান্ধী রেণু আছে। এখন আবার মাখনও আছে। আমি কিছু বললাম না। সারি নিশ্বাস ফেলে বলল, 'না, সব দেবে না গো, ঘরের জন্য কিছু নিয়ে যাবে।'

তারপরে বলল, 'তা নাগর, মুলো দিয়ে কাছিমের মাংস রেঁধেছি। দুটো গরম ভাত খেয়ে যাও।'

রান্নার গন্ধ আমার ভালো লাগছিল। খেতে ইচ্ছা করল। সারি আবার বলল, 'তারপরে তোমাকে আমি গান শোনাব।'

কিন্তু ইতিমধ্যে বেলা যে কোথায় উঠেছে কোথায় গিয়েছে, মন্ত্রমুগ্ধ বালকের সে খেয়াল নেই। কেমন করে, বেদেদের সান্‌কিতে করে, মুলো-কাছিমের মাংস দিয়ে ভাত খেলাম, তাও জানি না। একে সম্মোহন বলে না তো, আর কাকে বলে! খাবার পরে, বুড়ি বেদেনী (বাইদ্যানি) হুঁকো বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। এই বেলাতে ঠেক খেলাম। তামাক খাব নাকি! কেমন মজা লাগছে আমার। বুড়ি বলল, 'একটু খাও চাঁন্, হজম হয়ে যাবে।'

হাত বাড়িয়ে হুঁকো নিতে লজ্জা করছে। খাব নাকি সত্যি সত্যি? বুড়ি হুঁকোটা আমার হাতে ধরিয়ে দিল। আমি সারির দিকে তাকালাম। সারি আমার থালার মধ্যেই ভাত বেড়ে খেতে আরম্ভ করেছে। বলল, 'একটু সেবা কর নাগর।'

হুঁকোর ফুটোয় মুখ দিয়ে, টান দিলাম। ধোঁয়া বেরোলো। আবার টানলাম। ধোঁয়া বেরোলো। ভীষণ হাসি পেতে লাগল। হাসতে হাসতে জোরে টান দিলাম। কাশি শুরু হল। কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে যায়। বুড়ি আমার হাত থেকে হুঁকো নিয়ে, মাথার তালু চাপড়াতে লাগল, বলল, 'ষাট ষাট ষাট, চাঁনের কষ্ট আমার বুকে লাগ্।'

সেই সময়েই দেখলাম, সুরেনদাদা কোমরে চাদর বেঁধে উপস্থিত। সঙ্গে কেশবঠাকুর, আরো কয়েকজন। একজন নীল কোট পরা চৌকিদার। সে এসেই হাঁক দিল, 'হারামজাদীর দল, আজ তোদের শেষ। সবগুলোকে ফাটকে পুরে ছাড়ব।'

সুরেনদাদা এসে, আগেই আমার হাত ধরে টেনে নিলেন। তারপর চেঁচিয়ে বললেন, 'মার, এদের ধরে ধরে মার!'

কেশবঠাকুর হাত তুলে বললেন, 'আরে, মারামারির দরকার কী। ছাওয়াল পাওয়া গেছে, নিয়ে চল।'

বুড়ি বেদেনী কেশবঠাকুরের পায়ের কাছে পড়ে বলল, 'বলেন গো, বলেন, আমাদের কী দোষ। আমরা সোনার চাঁন্ বাবাকে একটু কষ্ট দিই নি। এসেছেন, খেলা দেখেছেন।'

চৌকিদার হাঁক দিল, 'সোনার চাঁদের কাছ থেকে কত পয়সা নিয়েছ?'

বুড়ি বলল, 'আমার চানু বাবাকে জিজ্ঞেস কর।'

সুরেনদাদা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কাছে পয়সা ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'এদের দিয়েছ?'

সারির সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল। ওরে সারির নিশি পাওয়া বালক, কোন্ গুণে তুই মন হারালি? মিথ্যা কথা বলতে তোর হৃৎকম্প হল না? বললাম, 'না।'

সুরেনদাদা আবার বললেন, 'ঠিক তো? আমি কিন্তু সোনাবউয়ের কাছে জানতে পারব, কত পয়সা তোমার কাছে ছিল।'

বললাম, 'ঠিক। দিই নি।'

সুরেনদাদা আর কেশবঠাকুর আমাকে নিয়ে চললেন। চৌকিদার তখনো ধমক-ধামক দিচ্ছে। যাবার আগে, সারির সঙ্গে চোখাচোখি হল। ও চোখ নাচিয়ে হাসল। ওরে বালক, তুই সেই চিরদিনের পুরুষ। প্রকৃতির কাছে যার বয়স দিয়ে হিসাব হয় না। মিথ্যা বলে, নষ্ট হলি, না ভ্রষ্ট হলি, সে বিচারের ভার রইল ভবিষ্যতের হাতে।

ব্যাপার অনেকখানি গুরুতর হয়ে গিয়েছে। মাখনকে বাড়িতে পাঠানো হয়ে গিয়েছে, আমি একলা বাড়ি ফিরে গিয়েছি কী না, সেই খোঁজের জন্য। এদিকে বেলা প্রায় শেষ। বীরেনদাদা বললেন, 'ঠাকুরভাই, আপনি ওকে নিয়ে বাড়ি চলে যান। তা না হলে, সোনাবউ কান্নাকাটি করবে। সোনাদাও হয়তো এসে পড়বে।'

বিরাট হৈ-চৈ ব্যাপার। দোকানে ভিড় করে সবাই জানতে এল, বীরেন্দ্রর কুটুম ছেলেকে পাওয়া গিয়েছে কী না। কেশবঠাকুর বললেন, 'যা ভেবেছি তা-ই। এ আমার রাখাল ঠাকুর, গোষ্ঠের সবাইকে কাঁদিয়ে ছাড়বে।'

সুরেনদাদা আমাকে নিয়ে বাড়ির পথে রওনা হলেন। যেতে যেতে অনেক কথা বললেন। এখন মনে মনে আমি অপরাধ বোধ করছি। আদারিও আমাদের সঙ্গে চলেছে। হাতে ওর অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি। তার মধ্যে কবুতরের মাংস। অন্য হাতে মিষ্টির ভাঁড়।

বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার। উঠোনে হ্যারিকেন জ্বলছে। তালুইমশাই আর জামাইবাবু তো ছিলেনই। মাউইমায়েরাও বাইরের দাওয়ায়। হেলেন গান্ধী রেণু সোরি মাখন, সবাই সেখানে রয়েছে। জামাইবাবু এসেই আমাকে চেপে ধরলেন, 'কোথায় গেছিলি তুই বল্! আজ তোকে আমি পিটব।'

তালুইমশাই আমাকে টেনে নিলেন তাঁর কাছে। সুরেনদাদা হেসে বললেন, 'তোমার শালা বেদেনীর প্রেমে পড়েছিল। সময় মতো না গেলে বোধ হয় ওদের সঙ্গে নৌকোয় করে চলেই যেত।'

মাউইমায়েরা এসে, আমাকে তালুইমশাইয়ের কাছ থেকে ঘরে নিয়ে গেলেন। বড়দিদি এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'চল, তোমার দিদি কাঁদছে, আগে তার সঙ্গে দেখা করবে।'

রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি, লম্ফর আলোর সামনে দিদি সত্যি কাঁদছে। কিন্তু আমাকে দেখা মাত্র উঠে এসেই, আমার চুল টেনে ধরল। ঠাস ঠাস করে গালে মুখে থাপ্পড় মারল, 'অসভ্য, পাজী, ছুঁচো, হাড় জ্বালিয়ে খাবি তুই আমার?'

বড়দিদি আমাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে, ধমকে উঠলেন, 'আহ্, কী কর টোকানি!'

আমি দিদিকে বাধা দিলাম না। কিন্তু ভীষণ অভিমান আর রাগ হল। বিশেষ করে, হেলেন সোরিদের রান্নাঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, অপমানিত বোধ

করলাম। বলে উঠলাম, 'আমি আর তোর শ্বশুরবাড়িতে থাকতে চাই না। কালই আমি চলে যাব।'

দিদি বলল, 'সে কথা তোকে বলতে হবে না। আমিই তোকে কাল পাঠিয়ে দেবো।'

ঝেঁজে বললাম, 'দিস্। তোর শ্বশুরবাড়িতে আমি আর কোনোদিন আসতে চাই না।'

'আর কোনোদিন তোকে আমি আনবও না।'

আমি আবার ঝেঁজে বললাম, 'তুই একটা পেত্নি রাক্ষসী, তাড়কা রাক্ষসী, সূর্পণখা।'

বড়দি হঠাৎ হেসে উঠলেন। আমাকে টেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন, 'ছি, দিদিকে ও রকম বলতে নেই। চল, তুমি কোথায় গেছলে, আমি শুনব।'

কিন্তু দিদির হাতে মার খেয়ে, আমার তখন কান্না প্যাচ্ছে। যদিও আমি কাঁদলাম না। আমি বড়দিদির সঙ্গে, ঘরে ঢুকে খাটের বিছানায় বসলাম। জুতো-মোজা খুলে ফেললাম। বাইরে তখনো তালুইমশাই, জামাইবাবু, সুরেনদাদারা কথা বলছেন। মাঝে মাঝে ওঁরা হাসছেন। এ ঘরে হেলেনরাও এল। সোরির সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল। আমার দিকে তাকিয়ে ওর চোখের পলক পড়ছে না যেন। আমার খুব লজ্জা করল। ও আমাকে মার খেতে দেখেছে। মাখন আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমার দিকে চেয়ে হাসল। তখনই আমার হাসি পেল না।

বড়দিদি বারে বারে আমাকে প্রশ্ন করতে লাগলেন, 'লক্ষ্মী ভাই আমার, বল তো কোথায় গেছলে, কাদের কাছে গেছলে?'

অনেকক্ষণ পরে, আমার মন একটু শান্ত হল। আরো লজ্জা করতে লাগল। বড়দিদির দিকে চেয়ে হাসলাম। তারপরে সব কথা বললাম। হেলেন সোরিদের চোখগুলো অপলক আর বড় হয়ে উঠল। বড়দি যেন শিউরে উঠে বললেন, 'ওদের রান্না মুলো-কাছিমের মাংস ভাত খেলে?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'ঘেন্না করল না?'

'না। রান্না ভালো ছিল।'

বড়দিদি খিল খিল করে হেসে উঠলেন। হেলেন শব্দ করল, 'ওয়াক্, থুঃ!'

আমার মনে মনে খুব রাগ হয়ে গেল। কিছু বললাম না। সোরি বলল, 'কাকীমা, ওকে তুলসী জল খাইয়ে দিন।'

বললাম, 'ওসব আমি খাব না।'

বড়দিদি বললেন, 'তোমাকে খেতে হবে না। ভালো লেগেছে, তাই খেয়েছ। চুকে গেছে।'

মাখন বলল, 'ওদের রান্না খুব ভালো।'

সোরি বলল, 'তুই তো একটা পিশাচ।'

আমি মাখনের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। মাখনও হাসল। তারপরে ও আর সোরি চলে গেল। রাত্রে খেয়ে-দেয়ে যখন শুলাম, তখন লেপের তলা দিয়ে, হেলেন গুঁড়ি মেরে আমার কাছে এল। ডাকল, 'মামা।'

কোনো জবাব দিলাম না। ওর ওপর আমার রাগ আছে। ও বলল, 'আপনার নেদে হতে ইচ্ছে করছিল?'

কথা বললাম না। ও আবার জিজ্ঞেস করল, 'মামা, কথা বলছেন না কেন?'

বললাম, 'তুমি তখন ওয়াক্ থুঃ করলে কেন? তুমি আমার সঙ্গে কথা বোলো না।'

হেলেন খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে করুণ স্বরে বলল, 'মামা, আমা

ও রকম করব না।'

'ঠিক তো?'

'হ্যাঁ।'

তখন আমি ওর দিকে পাশ ফিরে শুয়ে কালো নাগের গল্প বলতে লাগলাম।

হায় বালক, বেদেনী সারি-প্রেমের কী শিক্ষা!

পরের দিন সকালবেলা হেলেনের সঙ্গে, সোরিদের বাড়ি গিয়ে, সোরিকে বললাম, 'কাল সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। তোমার জন্য খাবার আনব ভেবেছিলাম, আনা হল না।'

সোরি খুব খুশি হয়ে বললে, 'কী খাবার আনতে?'

'তা জানি না। যা ভালো তা-ই আনতাম।'

এ কথা শুনে, হেলেন গেল চটে। ও মুখ ভার করে রইল। তারপরে বলল, 'আমি সোনাকাকীমাকে গিয়ে বলে দিচ্ছি, আপনি সোরির জন্য খাবার আনতে চেয়েছিলেন।'

অবাক হয়ে বললাম, 'তাতে কী হয়েছে?'

সোরি বলল, 'তুই ও রকম করিস কেন রে হেলেন? খাবার কি আমি একলা খেতাম?'

আমি রাগ করে বললাম, 'যাও, বলে দাও গে, আমি ভয় পাই না।'

হেলেন তা গেল না। গোঁজ হয়ে বসে রইল। সোরি আমাকে নারকেল নাড়ু এনে খেতে দিল। হেলেনকেও দিল। তারপর আমরা বাড়ির সামনে ধরা-ছোঁয়া খেলতে লাগলাম। খেলতে খেলতে হেলেন আবার হাসল। মাখন কোথায় গিয়েছিল। ফিরে এসে, ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের ছুটোছুটি দেখল। তারপরে আমাকে বলল, 'বিকেলের কথা মনে আছে তো?'

মাখন নৌকা বাইতে যাবার কথা বলছে। বললাম, 'আছে।'

'তা হলে আমি এখন স্কুলে যাচ্ছি।'

ও চলে গেল। আমরা আরো কিছুক্ষণ খেলা করে, রোয়াইল গাছের নীচে বসে গল্প করতে লাগলাম। এক সময়ে সোরি আমাকে বলল, 'আর যেন কোনোদিন বেদেদের কাছে যেও না।'

'কেন?'

'ওরা মন্ত্র দিয়ে, ভুলিয়ে নিয়ে চলে যায়। তারপরে ভেড়া বানিয়ে রাখে।'

চোখের সামনে কল্পনায় দেখতে পেলাম, আমি খুঁটিতে বাঁধা একটি ভেড়া হয়ে গিয়েছি। সারি আমাকে কাঁঠালপাতা খাওয়াচ্ছে। জানি না, সেটা সম্ভব কী না। তবে শুনেছি, ডাইনিরা মন্ত্র দিয়ে মানুষকে ভেড়া বানিয়ে রাখতে পারে। এমন কি কুমীরও বানিয়ে দিতে পারে, বাঘও বানিয়ে দিতে পারে। তবে সেটা হয়, মন্ত্র-পড়া জল ছিটিয়ে দিয়ে। আর সেটা খুব ভয়ের। বাঘ হলে, তখুনি খেয়ে ফেলতে পারে। কুমীর হলে, বাড়ির পুকুরেই সে বাসা বাঁধতে পারে। এ রকম ঘটনা আমি বউদির মুখে শুনেছি।

এই সময়ে, বড়দিদি এলেন রোয়াইল তলায়। বললেন, 'হেলেন তোরা স্কুলে যা। মামার সঙ্গে পরে এসে গল্প করিস।'

হেলেন বলল, 'সোরি স্কুলে যাবে না?'

বড়দিদি বললেন, 'কেন যাবে না। সোরিও যাবে।'

বড়দিদি আমাকে ডাকলেন, 'এস ভাই, আমরা গল্প করি গে।'

আমি বড়দিদির সঙ্গে গেলাম বটে, কিন্তু বাড়ির একদিকে ঝপ ঝপ শব্দ শুনে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওখানে কী হচ্ছে?'

বড়দিদি বললেন, 'তামাকপাতা কাটছে, তামাক তৈরি করবে বলে।'

আমি তাই দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, কালা একটা কাঠের গুঁড়ির ওপরে, মুঠো করে তামাকপাতা চেপে ধরে, দা দিয়ে ছক-ছক করে কাটছে। সে আমাকে বলল, 'দেখুন, তামাকপাতা কাটছি।'

কালা আমাকে 'আপনি' বলল। দেখলাম, তার সামনে একটা পাত্রে জল, আর একটা পাত্রে গুড়ের মতো কী রয়েছে। সেটা দেখিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ওটা কী?'

কালা বলল, 'রাব্।'

'রাব্ কী?'

'গুড়ের থেকে তৈরি হয়। এই দিয়ে তামাক মাখা হবে।'

সেখান থেকে আমি তাঁত-ঘরে গেলাম। তাঁত চলছে খটাখট্। এদের সকলের সঙ্গেই এখন আমার চেনা হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে পবন তাঁতী। তার গান আমার ভালো লাগে। সে বলল, 'এসো হে ঢাকার বাবু। তাঁত বুনবে নাকি?'

বললাম, 'বুনবো।'

সে কাজ থামিয়ে বলল, 'এসো, তাঁত চালাবে।'

আমি তার কাছে গেলাম। সে আমাকে তার টুলটা ছেড়ে দিল। তার ওপরে বসে, আমি তাঁতের পা-দানির নাগাল পেলাম না। মাথার কাছে দড়িটা ধরে হ্যাঁচকা টান দিলাম। খট্ করে শব্দ হল না। মাকুটা খানিকটা সরে গেল মাত্র। আরো জোরে টান দিলাম। মাকুটা আর একবার একটু নড়ল মাত্র। তখন পবন আমাকে দু-হাতে ধরে টুল থেকে নামিয়ে দিল। বলল, 'আর একটু বড় না হলে, তাঁত চালাতে পারবে না।'

তাঁতের দড়ি ধরে টান দিতে যে এত জোর লাগে, জানতাম না। ভেবেছিলাম, আস্তে টানলেই হয়। হঠাৎ দেখি, সোরি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকে চেয়ে হাসছে। আমি ওর কাছে গেলাম। ও বলল, 'চল, আমাদের ইস্কুল দেখে আসবে।'

বললাম, 'চল। হেলেন কোথায়?'

'ও আসছে।'

বাড়ির সামনে দিয়েই রাস্তা চলে গিয়েছে দক্ষিণে। সেই পথে ওর সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। সোরি বলল, 'আমার একদম ইস্কুলে যেতে ইচ্ছা করছে না।'

'কেন?'

'তোমার সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছা করছে।'

'তা হলে চল আমরা বিলের ধারে বেড়াতে যাই।'

'ইস্কুলে যাব না?'

'না গেলে কী হবে?'

'মা বকবে।'

এমন সময় হেলেন এল ছুটতে ছুটতে। ওর মুখ লাল। বলল, 'সোরি, তুই মামাকে নিয়ে এসেছিস কেন?'

সোরি বলল, 'আমাদের ইস্কুল দেখার বলে।'

BoiRboi.net

হেলেন আমাকে বলল, 'মামা, আপনাকে সোনাকাকীমা খুব বকবে। না বলে এলেন কেন?'

বললাম, 'আমার ইচ্ছে।'

কয়েক মিনিট হাঁটতেই, ওদের ইস্কুল এসে পড়ল। দেখলাম, খোলা মাঠের সামনে, পাটের গুদামঘরের মতো মস্ত বড় বেড়ার ঘর। অনেক ছেলেমেয়ে তখনো মাঠে খেলা করছে। আমাকে দেখে, কেউ কেউ তাকিয়ে রইল। কয়েকটা মেয়ে সোরি আর হেলেনের কাছে ছুটে এল। আমাকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। একটা মেয়ে আমার সামনেই চুপি চুপি স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কে রে?'

হেলেন বলে উঠল, 'আমার মামা, ঢাকা থেকে এসেছে।'

আমি যেন একটা কী, এই ভাবে হেলেনের বন্ধুরা দেখতে লাগল। এই সময় গান্ধী এসে হেলেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, 'কেন আমাকে ফেলে চলে এসেছিস?'

হেলেনও গান্ধীকে মারতে লাগল। দুজনের মধ্যে ঝুটোপুটি লড়াই লেগে গেল। বই-শ্লেট ছড়িয়ে গেল। কে যেন গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, 'এই, এই দামড়া দামড়ি দুটো, থাম্, থাম্ বলছি।'

হেলেন থেমে গেল। গান্ধী দৌড় দিল। আরো কয়েকটি ছেলেমেয়ে দৌড়ে পালাল। তাকিয়ে দেখলাম, জামাইবাবুর বয়সী একজন লোক। সুরেনদাদার মতো জামাকাপড় পরা। হাতে একগাছি বেত। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে?'

আমি আমার নাম বললাম। হেলেন জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল, 'আমার মামা।'

ইনি নিশ্চয় ইস্কুলের মাস্টারমশাই। বললেন, 'ওহ্, যোগেন্দ্রর শালা?'

সবাই এক কথাই বলে। যেন যোগেন্দ্রর শালা ছাড়া আমার আর কোনো পরিচয় নেই এখানে। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্ ক্লাসে পড়?'

'ক্লাস সিক্স।'

'ইংরেজি পড়?

'পড়ি।'

'কী পড়?'

'সেকেন্ড বুক।'

'আচ্ছা, আমি যা জিজ্ঞেস করছি, তার মানে বল তো। বেশ জোরে বলবে, কেমন? বল তো, আই ডোণ্ট নো, মানে কী?'

আমি মাস্টারমশাইয়ের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে দেখলাম। ঠোঁট উল্টে হাসলাম। বললাম, 'আমি জানি না।'

মাস্টারমশাই হেসে উঠে বললেন, 'এ হে হে, দেখলি হেলেন, তোর মামা জানে না।'

আমি ভুরু কুঁচকে তাকালাম। কয়েকটা ছেলেমেয়ে হেসে উঠল। সোরি আর হেলেন মুখ কালো করে, আমার দিকে চেয়ে আছে। আমার নিজের কানেই যেন আমার কথাটা কেমন লাগল। মাস্টারমশাই তখন আমার গাল টিপে দিয়ে বললেন, 'না না, তুমি জানো, তুমি ঠিক বলেছ। হেলেনের মামা বলে, তোমার সঙ্গে একটু মজা করলাম। তোমাক শিখিয়ে দিই। ঠকাবার জন্য যখন এ কথার মানে কেউ জিজ্ঞেস করবে, তখন তুমি বলবে, আই নো। অন্য প্রশ্ন করুন।'

ওঁর কথা শুনে আমার খুব ভালো লাগল। হাসি পেল। উনি আমার হাত ধরে বললেন, 'আমাদের এখানে ক্লাস ফোর অবধি আছে। তুমি বসবে?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'না, আমি বাড়ি যাব।'

সোরি বলে উঠল, 'বোসো না।'

হেলেন বলল, 'না, মামা বাড়ি যাবে।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'একলা যেতে পারবে?'

'পারব।'

আমি সোরি আর হেলেনের দিকে তাকিয়ে, পিছন ফিরে ছুট দিলাম। পরে জেনেছি, হেলেনের মাস্টারমশাই আমাকে যা বলে ঠকিয়েছেন, সেটা বইয়ের গল্প।

আরো প্রায় সাত-আট দিন কেটে গেল। এখন আমাকে গোটা গ্রামটাই চেনে। এমন কি মুসলমান-পাড়াতেও অনেকে চেনে। তার মধ্যে কেরালি আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছে। কেরালিকে এখানে ক্যারালি বলে। ওদের বাড়ি গেলেই আমাকে মুরগির ডিম-সেদ্ধ খাওয়ায়। কেরালির সঙ্গে মেশামেশিতে, জামাইবাবুদের বাড়িতে কেউ খুশি না। এই নিয়ে দিদির সঙ্গে একটা যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। মাখনই আমাকে কেরালির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

আরো অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। পদা, ভোলা, মণি, রতন, জহর, অনেকের সঙ্গে। অনেকের বাড়িতেও আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছে। বাড়ির বড়রা সবাই আমার চেনা। কেবল তাঁরা সবাই আমাক 'যোগেন্দ্রর শালা' বলেন, সেটাই আপত্তি। ইতিমধ্যেই অনেক বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাওয়া হয়ে গিয়েছে। কম করে পাঁচটি বাড়িতে। তালুইমশাই মাউইমাদের আর দিদিদের খুবই আপত্তি। জামাইবাবু বলেন, 'তোমার আর ঢাকায় ফিরে গিয়ে কাজ নেই। এই গ্রামে এ ভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দাও।'

ভেবে আমার মনটা আনন্দে টলটলিয়ে ওঠে। নৌকা বাওয়া তো আছেই। তবে সেটা চুরি করে। এখনো কেউ টের পায় নি। ধনুক-ঘুড়িও ওড়াই। প্রকাণ্ড ঘুড়ির মাথায়, একটা ছোট ধনুক লাগানো থাকে। ধনুকের ছিলাটা কঞ্চির পাতলা আঁশ। সেটা থেকে উড়োজাহাজের মতো ভোঁ ভোঁ শব্দ ওঠে।

তারপরে গোপাল এল। জামাইবাবুর দিদির ছেলে। আমার থেকে দু-এক বছরের বড়। ও এসে প্রথমেই আমাকে বলল, 'তুমি কি পুকুরের পাশে পাইখানায় যাও নাকি?'

অবাক হয়ে বললাম, 'তবে কোথায় যাব?'

'বোকা কোথাকার! ওখানে তো মেয়েরা আর বড়রা যায়। এবার থেকে আমার সঙ্গে মাঠে যাবে।'

গোপালের সঙ্গে তা-ই গেলাম। গোপাল পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করে, তার ভিতর থেকে সরু সরু সিগারেট বের করল। প্যাকেটে নাম লেখা আছে, ইংরেজিতে, কিংকং। আমাকে বলল, 'নাও, সিগারেট ধরাও। এ সময়ে সিগারেট খেতে হয়।'

বড়দের অনেককে এ রকম দেখেছি। কিন্তু আমি কোনোদিন এ ভাবে খাই নি। দু-একবার মেজদার সঙ্গে সিগারেট খেয়েছি। ধরা পড়ে বড় শাস্তি পেতে হয়েছে। বললাম, 'বাড়িতে গন্ধ পাবে।'

গোপাল বলল, 'লটকন খাব, গন্ধ থাকবে না।'

দুজনেই সিগারেট ধরালাম। গোপাল আমার সামনেই প্রাকৃতিক কাজ শুরু

করল। আমি অন্যদিকে তাকালাম। বড় লজ্জা করছে। গোপাল বলল, 'বসে পড়, এখনো পাইখানা পায় নি?'

পেয়েছে, কিন্তু ওর সামনে বসতে পারব না। আমি অন্য এক দিকে চলতে লাগলাম। যেখান থেকে গোপালকে দেখা যাবে না। কিন্তু কাছে-পিঠে সে-রকম জায়গা দেখতে পেলাম না। আরো খানিকটা গিয়ে, একটা আখের ক্ষেতের আড়ালে চলে গেলাম। একটু পরেই গোপাল সেখানে এসে দাঁড়াতেই, উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম। গোপাল হেসে বলল, 'তুমি একটা বোকা। এতে আবার লজ্জা কী।'

তবু পারলাম না। কাছেই একটা ছোট জলাশয়ে কাজ সেরে নিয়ে, ফিরে চললাম। গোপাল একটা বনের মধ্যে ঢুকে, লটকন পেড়ে নিয়ে এল। পিঁপড়ের কামড়ও খেল। লটকনগুলো কাঁচাটে, বেশ টক। তাই কয়েকটা চিবোলাম।

কিন্তু ঘটনা ঘটল অন্য রকম। গোপাল পুবের ঘরে ওর জামা ছেড়ে রেখেছিল। গান্ধী ওর পকেটে হাত দিয়ে, সিগারেটের প্যাকেট বের করে, একেবারে সুরেনদাদার হাতে তুলে দিয়েছে। সুরেনদাদা যে এত রাগী, তা জানতাম না। গোপালকে বেদম মারলেন। গোপাল নাকে খত দিয়ে বলল, আর কোনোদিন খাবে না। কিন্তু গোপাল আমার নাম একবারও করল না।

আমি হেলেন সোরি প্রায়ই মৌমাছি ধরতে যাই তিল-ক্ষেতে। তিনজনের হাতেই থাকে তিনটি ঢাকনা-বন্ধ কৌটো। তিল ফুলের মধ্যে মৌমাছি ঢুকে পড়ে। মধু খায়। তখন দুটি আঙুল দিয়ে ফুলের পাপড়ি চেপে ধরলেই, মৌমাছিটা আটকা পড়ে যায়। তখন কৌটোর ঢাকনা খুলে, মৌমাছি শুদ্ধু ফুলটা কৌটোর মধ্যে ফেলেই মুখটা বন্ধ করে দিতে হয়। কৌটোর মধ্যে, অনেকগুলা মৌমাছি যখন জমে যায়, তখন বন্ বন্ শব্দ হয়। কৌটোটা কানের কাছে ধরে, সেই শব্দ শুনতে খুব মজা লাগে।

প্রথম প্রথম সোরি আমাকে ধরে দিত। আমি ধরতে গেলেই, মৌমাছি পালিয়ে যেত। একদিন তো আমার আঙুলে হুল ফুটিয়েই দিল। যন্ত্রণায় আমি কৌটো ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। সোরি এসে আমার হাতটা টেনে ধরতেই ওকে এক ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলাম। তার ফলে, ওর কৌটোটা পড়ে গিয়ে, মুখের ঢাকনা খুলে গেল। মৌমাছিগুলো সব পালিয়ে গেল। সোরি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে গেল।

হুলটা ফুটেছিল হাতের তালুতে। একটু সামান্য ফুটল, আর লাল হয়ে উঠল। কিন্তু আমি আবার উঠে হেলেনের সঙ্গে মৌমাছি ধরতে লাগলাম। যখন দশ-বারোটা ধরা হয়ে গেল, তখন বাড়ির দিকে ফিরলাম। কিন্তু সোরির জন্য মনটা কেমন করছিল। একে তো মাটিতে পড়ে গিয়ে ওর লেগেছে। তার ওপরে ওর মৌমাছিগুলো সব উড়ে গিয়েছে। আমি ওদের বাড়ির দিকে গেলাম। হেলেন বলল, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'সোরিদের বাড়িতে। ওকে এই মৌমাছিগুলো দিয়ে দেব।'

হেলেন জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'না না, দিতে হবে না। ও অনেক ধরতে পারবে।'

আমি হেলেনের কথা না শুনে, সোরিদের বাড়ি গেলাম। ওকে ঘরে বা উঠোনে দেখতে পেলাম না।

রান্নাঘরে ওর মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সোরি কোথায়?'

সোরির মা রান্না করছিলেন। বললেন, 'জানি না তো বাবা। শোনো এদিকে।'

'বলুন।'

'কুমড়োফুলের বড়া ভাজছি, দুটো খেয়ে যেও, কেমন?'

বললাম, 'আচ্ছা।'

উনি তখন রান্নাঘর থেকেই গলা তুলে ডাকলেন, 'সোরি, অ সোরি কোথায় গেলি?'

সোরির কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। হেলেন বলল, 'আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি।'

বললাম, 'যাও।'

তবু ও গেল না। আমি সোরিদের বাড়ির পিছনে গেলাম। দেখলাম অতসীফুলের ঝাড়ের কাছে ও অন্যদিকে মুখ করে, বসে আছে। আমি কাছে গিয়ে দেখলাম, ওর চোখ তখনো ভেজা। আমি কৌটোটা ওর সামনে বাড়িয়ে ধরে বললাম, 'নাও।'

সোরি কথা বলল না, তাকাল না। আমি ওর কানের কাছে কৌটো ধরলাম। ও কানে আঙুল ঢুকিয়ে দিল। বললাম, 'তোমার জন্য ধরে এনেছি। এই রইল।'

বলে কৌটোটা ওর পায়ের কাছে বসিয়ে দিলাম। তখন ও আমার দিকে তাকাল। বললাম, 'বাড়ি যাচ্ছি।'

সোরি উঠে দাঁড়াল। বলল, 'হাতটা দেখি?'

হাতের তালুটা ওর সামনে পাতলাম। সোরি আমার হাত ধরে দেখল। বলল, 'চল ঘরে যাই, ওখানে চুন লাগিয়ে দেব।'

হেলেন বলে উঠল, 'তোকে লাগাতে হবে না। আমার মা লাগিয়ে দেবে।'

সোরি বলল, 'আমি লাগিয়ে দিচ্ছি।'

ও আমাকে টেনে নিয়ে গেল। মৌমাছির কৌটোর দিকে তাকাল না। হেলেন হঠাৎ সোরির পিঠে একটা ঘুষি মেরে বলল, 'তোকে মধুতে পাক।'

বলেই দুপদাপ করে চলে গেল। মধুতে পাক মানে, সেই তেঁতুলগাছের 'সে' যেন সোরিকে ধরে।

সোরি বলল, 'দেখলে, হেলেন কী বলে গেল। ও আমাকে একটুও দেখতে পারে না।' বলে বুকের জামা ফাঁক করে, থুতু দিল। ঘরে নিয়ে গিয়ে, আমার হাতের তালুতে চুন লাগিয়ে দিল। বললাম, 'তোমার মা আমাকে কুমড়োফুলের বড়া খেয়ে যেতে বলেছেন।'

সোরি ছুটে গিয়ে, একটা বাটিতে করে, গরম কুমড়োফুলের বড়া নিয়ে এল। বলল, 'আমি তোমাকে খাইয়ে দিই, আঁ?'

বলে আমার মুখে বড়া তুলে দিল। আমি কামড়ে মুখে নিলাম। বেশ হয়েছে। চাল-বাটা দিয়ে ভাজা, সেইজন্য এ রকম মচমচে লাগছে। আমার মা-ও খুব ভালো করে। বললাম, 'তুমিও খাও।'

সোরি বলল, 'তোমার এঁটোটা খাব?'

'কেন, আলাদা রয়েছে তো।'

'আমি তোমার এঁটোটা খাব।'

বলে আমার আধ-খাওয়া বড়াটা ও মুখে পুরে দিল। খেতে খেতে আমার দিকে চেয়ে হাসল। বললাম, 'আমি পরের এঁটো খেতে ভালোবাসি না।'

সোরি বলল, 'তুমি কি পর?'

'তবে আমি কে?'

'তোমাকে আমার খুব আপন লাগে।'

হেসে বললাম, 'ভারি মজা তো। আমি তো তোমার কেউ হই না।'

সোরি মুখটা ভার করে বলল, 'তাইতে আমার খুব কষ্ট হয়। হেলেনের বেশ মজা, তুমি ওর মামা।'

এই সময়ে মাখন কোথা থেকে এসে আমাকে ডাকল। আমি বাটি থেকে বড়া তুলে মুখে দিয়ে, ওর সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে গেলাম।

আর আমার মন টিকছে না। আমাদের শহরের জন্য, জীয়সের গলির জন্য, বন্ধুদের জন্য মন কেমন করতে লাগল। তালুইমশাই আর মাউইমাদের সঙ্গে একদিন এক

আশ্রমে গেলাম। সেখানে এক সাধু থাকেন। সোরি আর হেলেনও গেল। আশ্রমে খিচুড়ি আর তরকারি খেলাম। কিন্তু সবই নুন ছাড়া। আর এক ঘটি করে দুধ খেলাম।

সেইদিন বিকালে ফিরে এসে, সোরিদের বাড়িতে, অতসীঝাড়ের কাছে বসে, আমরা অনেক গান করলাম। আমার মনে বিশেষ আনন্দ। পরের দিন, আমি জামাইবাবুর সঙ্গে ঢাকায় ফিরব। জামাইবাবুর ছুটি শেষ হয়ে গিয়েছে। দিদি এখন থাকবে। জামাইবাবু ঢাকায় গিয়ে, মেসে থাকবেন।

আজ সোরি আমাকে ওর বাক্স খুলে দেখাল, ওর কত জামা আছে। পুঁতি আর মোমের মুক্তোর মালা আছে। একটা রাংতা লাগানো, ময়ূরপাখার চূড়াও আছে। ও নিজে পিজবোর্ড কেটে তৈরি করেছে। সেটা আমার মাথার পরিয়ে দিল। গলায় মুক্তোর মালা ঝুলিয়ে দিল। তারপরে বলল, 'আমার লাল শাড়ি আছে একটা, সেটা পরবে?'

'শাড়ি পরব কেন?'

'কাছা দিয়ে পরবে, বেশ দেখাবে।'

আমি মাথার চুড়ো খুলে ফেললাম। বললাম, 'দূর, ওসব আমি পরব না।'

সোরি বলল, 'চুড়োটা তুমি নিয়ে যাও।'

বললাম, 'এর থেকে ভালো চুড়ো আমাদের শহরে পাওয়া যায়।'

সোরির প্রতিমার মতো মুখটা ভার হয়ে গেল। হেলেন চুড়োটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'এটা তো পচা।'

সোরি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে এল। বলল, 'তবে মুক্তোর মালাটা নিয়ে যাও।'

বললাম, 'যাহ্ বোকা, আমি মেয়ে নাকি?'

সোরি বলল, 'তবে কী নেবে?'

বললাম, 'কিছুই নেব না।'

'কাল বাড়ি ফিরে যাবে বলে তোমার খুব আনন্দ, না?'

'হ্যাঁ।'

সোরি বড় মেয়েদের মতো গালে হাত দিয়ে বসে রইল। তারপরে দেখলাম, ওর চোখ ছলছল করছে। হেলেন সোরির কাছে গিয়ে ওর হাত ধরে ডাকল, 'সোরি।'

সোরি কিছু বলল না। হেলেন রাগ করল না। সোরির হাত ধরে চুপ করে বসে রইল। আমি মাখনের কাছে চলে গেলাম।

পরের দিন সকালেই আমাদের যাত্রা। গোপাল আমাদের সঙ্গে ইস্টিশনে যাচ্ছে। কালা আমার আর জামাইবাবুর স্যুটকেস নিয়েছে।

আজ সবাই আমাকে আদর করছেন। মাউইমায়েরা বড়দিদি কাঁদলেন। বড়দিদি জড়িয়ে ধরে, বারে বারে আদর করলেন। আমার দিদি অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। শেষ পর্যন্ত ও আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। হেলেন গান্ধী রেণুও কাঁদছে। সোরিকে প্রথমে দেখতে পাই নি। বেরোবার সময়, ওকে দেখলাম, খড়ের গাদায় হেলান দিয়ে আছে। মাথা নিচু। কাঁদছে কী না বুঝতে পারলাম না। আমি গোপালের হাত ধরে এগিয়ে চলে গেলাম।

ঢাকায় ফিরে যাবার কয়েক দিন পরে, বাবুর কাছে তালুইমশাইয়ের একটি চিঠি এল। এক জায়গায় আমার কথা লিখেছেনঃ 'আমার পুত্র, আপনার কনিষ্ঠ পুত্রটি, আমাদের পরিবারকে এবং গ্রামকে হাসাইয়া মজাইয়া কাঁদাইয়া চলিয়া গিয়াছে। গৃহ বড় শূন্য বোধ হইতেছে। আমার নাতি-নাতনী সকল তাহাদের মামার কথা বলিতে

গিয়া কান্নাকাটি করে। গ্রামের ছেলেরা গৃহস্থেরা আসিয়া তাহার কথা জিজ্ঞাসা করে। উহার অভাবে আমরা সকলে বড়ই কষ্ট বোধ করিতেছি।'...

সেকথা মনে করে, আজ আমারও তালুইমশাইয়ের ভাষায় বলতে ইচ্ছা করছেঃ 'সেই সময়ে যে বয়সে, এই বালক মজে নাই কাঁদে নাই। সে আপনার বেগে ভাসিতে ভাসিতে এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার বেগ বাহিরে স্তিমিত হইয়াছে, ভিতরে বাড়িয়াছে। সে নিজেকে প্রশমিত করিতে পারে না। তথাপি আজ মনে হইতেছে, জীবন-ফসলের শীর্ষে, একটি শিশিরবিন্দু টলমল করিতেছে।'

বর্তমান খণ্ডের গ্রন্থ-পরিচয়

কোথায় পাবো তারে ॥ দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

মন মেরামতের আশায় ॥ ১৩৮৩ সালের নববর্ষ সংখ্যা 'প্রসাদ' পত্রিকার প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি।

হারায়ে সেই মানুষে ॥ ১৯৭১ সালে শারদীয় 'সিনেমা জগৎ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন 'দে'জ পাবলিশিং' আশ্বিন, ১৩৮২ সালে। গ্রন্থটির উৎসর্গ-পত্রে লেখা ছিল, 'স্বর্গতঃ যোগেন্দ্রনাথ দাস-এর স্মরণে'। উল্লেখ্য, যোগেন্দ্রনাথ দাস ছিলেন তাঁর একমাত্র জামাইবাবু। গ্রন্থটির ভূমিকা প্রসঙ্গে লেখা ছিলঃ

'হারায়ে সেই মানুষে' ছাপতে ছাপতে দীর্ঘকাল ছাপাখানায় পড়েছিল। তার একমাত্র কারণ, সেই এক আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়। ইচ্ছা ছিল, রচনাটিতে আরো অনেক ঘটনা সংযোজন করবো, যা এই রচনার আবশ্যিক অঙ্গ ছিল। অথচ নানান কারণে, বিশেষ করে অসুস্থতাবশতঃ কিছুতেই তা সম্ভব হলো না। আশার ছলনার কথা সেই কারণেই। ফল যা লাভ হয়েছে, তা হলো, অধিককাল ছাপাখানায় পড়ে থাকার জন্য, প্রথম দিকের কয়েকটি ফরমায় কালের রঙ ধরে গিয়েছে। এ ত্রুটি একান্তই আমার।

রচনাটি অপূর্ণ নয়, কিন্তু সমগ্রের অঙ্গসজ্জায়, কিছু বাকী থেকে গেল। পরবর্তী সংস্করণে, সমগ্র রূপটি দেবার চেষ্টা করবো। আশা করি, সেটা নিতান্ত আশার ছলনা হবে না। ইতি—১০. ৯. ৭৫

কালকূট

boiRboi.net